আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

৮

www.banglabooks.in
B.B.

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.banglabooks.in

Click here

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

—দু'শো কুড়ি টাকা—

সম্পাদনা
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন—অমিয় ভট্টাচার্য
মুদ্রণ—সান লিথোগ্রাফী

ASUTOSH MUKHOPADHYAY RACHANAVALI VOL-VIII
An anthology of collection of complete works Vol. VIII by Asutosh Mukherjee. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073

Price Rs. 220/-

I S.B N : 81-7293-388-6

শব্দগ্রন্থন : লেজার ইম্প্রেশন্‌স্

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা—বিজিতকুমার দত্ত

মুখোমুখি
- মুখোমুখি ১
- সহাবস্থান ১৩
- দাম্পত্য ১৯

দুজনার ঘর
- তপ ৩১
- সৈনিক ৪৫
- তৃষ্ণা ৫২
- মেজব সেবকরাম ৬১
- তিলে তিলে তিলোত্তমা ৬৮
- বিবেচনা সাপেক্ষ ৭৬
- আকাঙ্ক্ষা ৯২
- দুজনাব ঘর ১০৯

ফেরারী অতীত
- ফেবারী অতীত ১২১
- বাঘিনীর নিঃশব্দ গর্জন ১৩১
- মধুবঙ্গ ১৪৮
- ক্ষুধা ১৫৫
- রূপ ১৭৩

চলো জঙ্গলে যাই
- চলো জঙ্গলে যাই ১৮২
- বমা মিত্র এবং মালবী মিত্র ১৮৯
- যৌবন ২০০
- পবনে ঢাকাই শাড়ি ২০৬
- আহুতি ২১০
- তমোঘ্ন ২১৭
- স্মৃতি যদি ফেবে ২২২
- ঘৃণা ২৩৪
- পরিতাপ ২৩৮
- আশা আর বাসা ২৪৭

মডেল
- আচরণ ২৮৯
- মা ২৯৭
- দিনবদল ৩০২
- পথচিত্র ৩১৩
- বোবখা ৩১৮
- আরোগ্য ৩২৫

রূপসী বাংলার মুখ
- রূপসী বাংলাব মুখ ৩২৯
- আতসী ৩৪১
- দ্বীপ জ্বেলে যাই ৩৭৬
- বাবমুড়া লিলি ৩৮৩

সোনালী রেখা
- সোনালী বেখা ৪০৩
- সুলক্ষণা ৪৩৭

ত্রিবর্ণা
- দ্বিতীয বাসব গাঁজাখুবি ৪৬৭
- একাকী জোনাকী ৫০২

একজন মিসেস নন্দী
- মহাবিহার ৫৭৩
- অভিবতি ৫৮৩
- মান ৫৮৯
- সম্পাদক ৫৯৭
- নাগবী ৬০৭
- ঝড ৬১৬
- মন পবনেব নাও ৬২৫
- বীতশোক ৬৩০
- একজন মিসেস নন্দী ৬৩৮

কথামালা
- বানীদিন ৬৪৫
- ফল ৬৫২
- আপস ৬৫৯
- হিসেবেব বাইরে ৬৬৬

মীনা রাখি সাধিকা
- সাধিকা ৬৭৫

গ্রন্থ-পরিচিতি ৭০৭

ভূমিকা

আশুতোষ কর্মজীবনে সাংবাদিক। হয়ত সাংবাদিকতা তাঁব পেশা এবং নেশা। 'সংবাদপত্রেব সেকালের কথা' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ এমন কিছু সংবাদকণা প্রকাশ করেছেন যেগুলিকে আমরা গল্পই বলতে পারি। বাবুদের নষ্টামি আর বেলাল্লাপনা নিয়ে সমাচাব দর্পণে যে লেখা বেরিয়েছিল তার নাম ছিল বাবু উপাখ্যান। 'উপাখ্যান' শব্দটি ছোট গল্পেব কথাই মনে করিযে দেয়। অন্যদিকে কৌলীন্যপ্রথার কুৎসিত ঘটনার নাম দেওয়া হযেছিল 'কাহিনী'। সংবাদ যে উপাখ্যানেব মেজাজ নিয়ে আসতে পারে 'সংবাদপত্রে সেকালেব কথায়' তার দৃষ্টান্ত কম নেই।

আশুতোষ এই ঘরানার লেখক। সিনেমাতে যাই হোক 'দীপ জ্বেলে যাই' গল্পটি তো একটি সংবাদই। অথবা মধুরঙ্গেব কাহিনীতে দুর্গা এবং মধুবঙ্গেব জীবনকথা প্রায সংবাদপত্রেব ভাষাতেই বর্ণিত হয়েছে। এমন কি কোনো কোনো গল্পে কিছু সংবাদ পবিবেশন কবে লেখক সংবাদেব বাহুল্যটুকু যে বর্জন করেছেন তা পাঠককে জানিযে দেন। আশুতোষ যখন গল্প বচনায প্রবৃত্ত হযেছিলেন তখন সংবাদপত্র জগতেও দিক পবিবর্তনেব সূচনা হয়েছিল। নিউজ-ভিউজ তো মিলেমিশে গিয়েছিল। সাদামাটা সংবাদে আব গ্রাহক-পাঠক টানা যাচ্ছিল না। আব আন্তর্জাতিক ঘটনাপবিবেশন অথবা গুরুতব সংবাদনিবেদনের ফাঁকে ফাঁকে এমন কিছু পারিবারিক বা সামাজিক ঘটনাব ঝলক পাই যা স্পর্শকাতব লেখককে উদবেজিত করে। তখনই প্রবাদবাক্যটি সত্য মনে হয 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জাব দ্যান ফিকশন'। আশুতোষ হাতে যে সংবাদপত্রেব সংবাদে একটা গল্পেব বীজ পেয়ে যেতেন, লেখকজীবনে যে সব মুহূর্ত আসে তাব কোনোটিকেই তিনি নষ্ট হতে দিতে চান না। এরকম সাহসে কোনো গল্প যেমন জমে যায আবাব কোনো গল্প কিছুটা ফিকে আর তরলই থেকে যায়। সংবাদকণাকে অবশ্য লেখকেব কল্পনাব তাপে-উত্তাপে গলিয়ে নিতে হয। এখানেই লেখকের শিল্পকর্ম এবং এখানেই সংবাদসাহিত্য শিল্পগুণে হযে ওঠে সমৃদ্ধ। সেজন্য সংবাদের উপর আশুতোষকে নাটকীযতাব সঞ্চার কবতে হয়। তাঁব অনেক গল্পেই নায়ক-নায়িকার মিলন বা সাক্ষাৎ আকস্মিকভাবে ঘটে যায। গল্পটিও যেন তখন মাটি পেযে যায আর বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র গল্প সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীতে তা স্পষ্ট। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উপন্যাসে গল্পের উপর ঠাঁই দিলেন প্লটকে আব তার সঙ্গে বুনে দিলেন প্যাটার্ন যার ছন্দে পাঠকচিত্ত আন্দোলিত হতে থাকে। আর সেই ছন্দে দুলতে থাকে এই বাণী—'এ জীবন লইয়া কি করিব?'

শরৎ গল্পকে আশ্রয় করলেন আরও দৃঢভাবে। দত্তা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীকান্ত উপন্যাসে গল্পের মালা। লেখক প্রায়শই কথক হয়ে ওঠেন। গৃহদাহেব অচলার ট্রেন বদল নাটকীয়। চবিত্রহীনে নাটকীয়তা আরও বেশি। তারকেশ্বরে রমা-রমেশের সাক্ষাৎ আরও রোমাঞ্চকর। আমরা বলতে পারি আশুতোষের ছোটগল্পে নদীজঙ্গল পেরিয়ে বাংলোয় হাসিরাণীকে আবিষ্কার, অথবা রামেশ্বরে মাতাজীর আবির্ভাব এরকমই ঘটনা।

আশুতোষ কেবল সাংবাদিক নয়, একটি সাংবাদিক সত্তাও যেন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল তাঁকে ঘিরে। যে সত্তা বিশ্বাস করে কৌশল, ইশারা, ইঙ্গিত-এর তেমন প্রয়োজন নেই। যা যা ঘটছে তা একটানা বলে যেতে হবে। বালিকা-কিশোরী-যুবতীর হাসির জীবনকে কয়েকপৃষ্ঠার মধ্যে তিনি বেঁধে ফেলেন। রেখা মিত্রের সেবিকা জীবনের কাহিনীটুকুর মধ্যে বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নেই কিন্তু তিনি মোচড় দিলেন গল্পের শেষে যেখানে দেখি রেখা ভালোবাসার অভিনয় করে যে সব মানসিকরোগীকে বাঁচিয়েছিল সে অকৃত্রিম ভালোবাসাই তাকে গ্রাস করল। এবারে সে-ই রোগিণী। আশুতোষ গল্প বলতে চান। শরৎচন্দ্রের পর আমরা গল্প বলার যাদুকর পাই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গল্প মানে তো কৌতূহলকে উসকে দেওয়া। কিন্তু উসকে দিলেই হবে না। বর্ণনা, ঘটনা, বিকৃতি বিশ্বাস্য হওয়া চাই। তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই কৌতূহলকে অতি সহজে জাগিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। আবার ব্যোমকেশের কাহিনী তো কৌতূহলের তারা মুদারা উদারা। ছোট গল্পেও তিনি গল্পের মর্যাদাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তুলনা না করেও বলা চলে বিমল মিত্র এই পর্যায়েরই লেখক। গল্পের কৌতূহলকে টেনে নিয়ে যান শেষ পর্যন্ত। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই গোষ্ঠীরই লেখক। কীভাবে তাঁরা এই সার্থকতা পেয়েছেন? শরদিন্দুর পথ বিচিত্র। কখনও ঐতিহাসিক, কখনও রোমান্টিক, কখনও ডিটেকটিভ রচনা লিখে তিনি বৈচিত্র্য বাড়িয়ে দেন কথাসাহিত্যের। মধ্যবিত্ত জীবনের রোজনামচায় কিছুটা ঢেউ তোলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। অ্যাভারেজ বাঙালী পাঠকের চাহিদা আজও বোঝা যায় টেলিভিশনের সিরিয়ালের দিকে লক্ষ করলে। সিরিয়ালের কাহিনীতে মধ্যবিত্তের সোনার সংসারের ওলোটপালট দর্শককে টেনে নিচ্ছে। এ কথা তো ঠিক, মধ্যবিত্ত জীবনের পড়ার মতো বই রবিনসন ক্রুসো। আজও যার আবেদন অম্লান। কেন? মধ্যবিত্ত দেখতে পায় তার জীবনযাপনে যে সংগ্রাম আছে, উদরপূর্তির জন্য যে দৈনন্দিন যুদ্ধ সে তো আমাদেরই প্রতিচ্ছবি। আশুতোষ এই সংগ্রামে, যুদ্ধে হাত রাখেন। এই গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দের মধ্যে যাঁদের নাম করেছি তাঁরা বেস্ট সেলারের পর্যায়ে পড়েন। 'বেস্ট সেলার' মানেই সেসব লেখক নন—একথা মানি। আবার সাময়িক হুজুগকে আশ্রয় করে যে রচনা বেস্ট সেলারের পর্যায়ে পড়ে তার জাত কিঞ্চিৎ আলাদা। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চমক সৃষ্টি করবার জন্য গল্প লেখেন না। তিনি একালের এক শ্রেণীর পক্ষে *জনপ্রিয় লেখক*—এবং এই *জনপ্রিয়তাতে* তিনি অভিভূত।

এবারে কিছু গল্পের পরিচয় নিই।

মুখোমুখি আত্মজৈবনিক। নিজেকেই বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। সেটা সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু লেখকের প্রয়াসকে স্বাগত জানাতে হয়। একজন লেখক যখন স্মৃতিরোমন্থনে নিমজ্জিত হন তখন উঠে আসতে থাকে তাঁর লেখার নানা প্রকরণ কৌশলের ইঙ্গিত। চরিত্রচিত্রণে তার বিন্যাসগতভাবে কতটা খাঁটি ছিলেন, এ সংশয়ও তাঁকে উতলা করে। আর লেখা যদি জীবনেরই অভিজ্ঞতা হয় তবে জীবনে তাঁর চাওয়া-পাওয়ার টানাপোড়েনের সুখদুঃখের কথাও এসে পড়বে। একের পর এক প্লট উদ্ভাবন করে নিজেকেই যেন তিনি জানতে চেয়েছেন। আর জানার ধাপে ধাপে তৈরি হতে

থাকে একের পর এক গল্প অথবা উপন্যাস। লেখক-জীবনের সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে লেখক শেষ পর্যন্ত বলছেন 'মানুষের চরিত্র নিয়ে সমস্ত লেখকজীবন ধরে যে এ-ভাবে ভাঁওতাবাজী করে গেলাম, নিজেই জানতাম না। যে লোক নিজের চরিত্রের ঠিকানা জানে না, হদিস জানে না, সেই লোক অনন্য চরিত্রস্রষ্টা—এর থেকে হাসির ব্যাপার আর কি হতে পারে।' সত্যিই কি তাই? কেবল ভাঁওতাবাজী? প্রশান্ত যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন ছোটগল্পের পরিসরে তাকে বিশ্বাস্য করে তোলা কিঞ্চিৎ দুরূহ। কেননা প্রশান্ত সফল লেখক। পাঠকধন্য লেখক। পাঠক কি করে এই ফাঁকিতে ভুলে যায়? নাকি লেখক প্রশান্ত এই কথাই বলতে চান শৌখিন মজদুরিতে ভুলিয়ে তিনি সাময়িকভাবে পাঠকচিত্ত জয় করেছেন? তাই শৌখিন মজদুরির প্রতিই তাঁর অবজ্ঞা? মুখোমুখি হলে এরকম নৈরাজ্য পীড়িত করে লেখককে? 'সহাবস্থান' গল্পটিতে একালের সমস্যাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন লেখক। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বিবাহ। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভালোবাসা ছাই হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে বিবাহপূর্বজীবনে একজনের স্খলন অন্যজনের বিবাহপরজীবনে আনুগত্যের অভাব। বলা বাহুল্য স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের অভিনয় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অভিনয় দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। দুজনেই পাপবোধে জর্জরিত হয়। ডিভোর্স ছাড়া অন্য সকল পথ তখন বন্ধ। কিন্তু একদিন সাহস করে স্ত্রী খুলে বলে তার পাপের কথা। স্বামীও তার পাপবোধকে লুকিয়ে রাখেনি নিশ্চয়ই। এই পাপবোধই দুজনের চৈতন্যে ঘা দেয়। হয়ত বা মিলনের সেতুবন্ধও রচিত হয় এইখান থেকেই। উত্তরণের একটা দিশাও পেয়ে যায় দুজনে। বোঝা গেল না স্বামী দিলীপ তার গোয়ার জীবনকে কোথায় নিক্ষেপ করবে? বোধ করি যেমন করে দিলীপ শীলার বড় ছেলেকে (যে অন্যের সন্তান) টেনে নেবে, তেমনি শীলাও গোয়ার দিলীপের সন্তান দুটিকে বুকে করবে। এর বেশি প্রশ্নের উত্তর লেখক দেননি, সম্ভবত পাঠককেও তা বিশ্বাস করতে বলেছেন।

'দাম্পত্য' আমাদেরই ঘরোয়া জীবনের কাহিনী। উঁচু ঘরের মেয়ের প্রেমে পড়ে যে সাধারণ ঘরের ছেলেটি নিজের সুখের চাইতে বিপর্যয়কে ডেকে আনল, তার কাহিনী বলেছেন লেখক এখানে। ছেলেটির মধ্যে এসে যায় এক প্রতিযোগিতার উত্তেজনা। প্রাণপণে যে হয়ে উঠতে চায় সুমিত্রার অর্থকৌলীন্যের প্রতিস্পর্ধী। বলা বাহুল্য এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। কেননা প্রতিস্পর্ধায় দাম্পত্যজীবনের ফাটলে জোড়া লাগে না। অর্থ সব সময় শান্তি নাও দিতে পারে। এই গল্পেও দেয়নি। শুরু হল নানা বিষয় নিয়ে ঝামেলা। এই ঝামেলায় যোগ দেয় সুমিত্রার বাবা। তিনি মেয়েকে নিয়ে আসেন নিজের বাড়িতে। সুমিত্রাও ঝগড়াঝাঁটি করে বাপের বাড়ি চলে যায়। এ কি বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের মতো ভ্রমর-চরিত্র? বাপের বাড়ি চলে গিয়েই তো ক্ষণস্থায়ী অভিমানকে ভ্রমর দীর্ঘস্থায়ী তিক্ততায় পৌঁছে দিল। এক্ষেত্রে অবশ্য কেমন চেষ্টা করেছে সুমিত্রাকে ফিরিয়ে আনবার। কিন্তু বাদ সেধেছে সুমিত্রার বাবা। যখন ডিভোর্স একরকম অনিবার্য হয়ে উঠল তখন দেখা গেল সুমিত্রার ছেলেকে নিয়ে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন। কিভাবে এই অঘটন ঘটল? লেখক দেখালেন মাদ্রাজে এক শেঠজীর দোকানে কোল্ড ড্রিংস খেতে খেতে একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হল। পরিচয়ের ফলে সহানুভূতি।

সকালে স্কুল করে ছেলেটি দোকানে চলে আসে। সারাদিন খাটে, খদ্দের সামলায়। খদ্দের আপ্যায়ন করে। রাত্রে তার ছুটি। কথায় কথায় জানাল ছেলেটি যে শেঠজীই তার বাবা। শেঠজী নিজে দোকান করেছেন, এখন বয়সে ছেলেকে শেখাচ্ছেন তার দোকানবিদ্যা। সুমিত্রার সঙ্গে বমেনের এবারের ঝগড়ার উদ্দেশ্য ছিল অনেকটা অনুরূপ। সুমিত্রা চেয়েছিল ছেলে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট হবে, বাপ বলেছিল ছেলে তার কারখানায় কাজ শিখুক। সুমিত্রা ঠাণ্ডা পানীয় খেতে খেতে ছেলেটির জীবনের যে পরিচয় পেল তাতে তার সম্বিত ফিরে এল। সে বাপকে উপেক্ষা করেই নিজের গৃহে চলে এল। দাদু চেয়েছিল ছেলে ডাক্তার হবে, মামা চেয়েছিল এঞ্জিনিয়ার হবে। সবগুলিতেই ছেলে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। তারপর চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট। এখন শেঠজীর দোকানে বসে বুঝে ফেলে বমেনের কথাই ঠিক। বাপের কারখানা জীবনেই ছেলের সাফল্য আসবে। বাইস বছর পরে স্বামী-স্ত্রী 'দুজনে দুজনকে নতুন করে দেখছেন।' এইভাবেই সত্যপরিচয় উদঘাটিত হয়। গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক গল্পের নমুনা হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু আশুতোষ বহির্বঙ্গ একটি ঘটনা নিক্ষেপ করলেন বমেন-সুমিত্রা-সুমু (ছেলে)র জীবনে। তার ফলে কঠিন সমস্যার সমাধান। আশুতোষ গল্পের জন্য প্লটের কথা খুব কি ভাবেন? আমার মনে হয় তিনি ঘরের মধ্যেই যে ঘর আছে তারই আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়ান। আর গল্পের টুকরো পেয়ে যান সেখানে। এটাই তাঁর যথার্থ এলাকা।

'তপ' আশুতোষের একটি বিশিষ্ট গল্প। বিশিষ্ট এই অর্থে যে এই গল্পে যেমন একদিকে পারিবারিক জীবনের এদিক-সেদিক ঘুরে দেখার কৌতূহল আছে তেমনি একলাফে গল্পটি রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে নারীর রহস্যময় গতিপ্রকৃতিতে। আশুতোষের গল্পে নারীচরিত্র প্রায়শই শক্তিময়ী হয়ে ওঠে। সাধারণ নারীর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন তাপ-উত্তাপ সঞ্চিত থাকে আশুতোষের গল্পে তা দপ করে জ্বলে ওঠে। তপ গল্পে আসামের চা-বাগানের এলাকায় যে নারীর সন্ধান পাই আমরা তার দেখা সচরাচর শহরের কোলাহলে মেলে না। মনোরমা দ্বিজেন গাঙ্গুলির মেয়ে বলে সকলে জানে। কিন্তু দ্বিজেন গাঙ্গুলি মনোরমাকে লালনপালন করে বড়ো করেছেন। অসামান্য সুন্দরী মনোরমা। তাকে দেখে প্রেমানন্দ পাগল। বিবাহ হয়ে গেল। কিন্তু কলকাতায় মনোরমা বেমানান। সে শ্বশুরের ঘর করতে পারল না। স্বামী বাপমায়ের বাধ্য সন্তান। মনোরমাকে সন্দেহও সে করে। ক্ষিপ্ত প্রেমানন্দ মনোরমাকে শাসায়। অন্তঃসত্ত্বা মনোরমা ফিরে আসে। মনোরমার জীবন শেষ হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যেই। পঁচিশ বছর পরে মনোরমার ছেলে মহানন্দ ঘোষ এসে প্রেমানন্দের হাতে মায়ের গয়না ফেরত দেয়। সঙ্গে একটি কবচ। এখন প্রেমানন্দ স্ত্রী সুমিত্রাকে নিয়ে রীতিমত প্রৌঢ়। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মহানন্দের দিকে। সে জানত মনোরমা মৃত। গল্পটির পরিণতিতে এসে দেখি যার কাছ থেকে মনোরমার জীবনকাহিনী শুনতে পেলাম সে মনোরমা নয়—সুমিত্রা। নানা প্রশ্নে পাঠক অস্থির হয়ে ওঠে এই গল্প পড়ে। মনোরমা কেন প্রতিবাদী হয়ে উঠল, কেন গল্পে চলে এল সংক্ষিপ্ত শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কাহিনী? মনোরমা-সুমিত্রার মেলবন্ধনই বা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? আসলে আশুতোষ লক্ষ রেখেছেন মনোরমা-সুমিত্রার দিকে। কতকগুলি পরিস্থিতির বাতাবরণে নারীর রহস্যময়তাকে উদঘাটন

কবেছেন লেখক। অতিকথনেব ত্রুটিও আছে এই গল্পে। লেখক কিছুটা আবোপও কবেছেন নিজস্ব ভাবনা এই গল্পে এবকমই মনে হয়।

আশুতোষেব একটি আত্মজৈবনিক গল্প 'বিবেচনা সাপেক্ষ'। এ গল্পটিতেও বিভাবতী চবিত্র আশুতোষকে প্রেবণা দিযেছে। বিভাবতীব দীপ্তি গল্পটিতে বিস্তৃত হযেছে। এ বিস্তাব আশুতোষ সবল বেখায গডিযে দিযেছেন। কীভাবে বিভাবতী সংসাব চালনা কবেছে তাব কিছু দৃষ্টান্ত দিযে বিভাবতীব মধ্যবিত্ত জীবনেব সহনশীলতা, ধৈর্য, বুদ্ধিবৃত্তিব অসামন্যতাকে প্রকাশ কবেছেন লেখক। কিছু নাটকীযতাও এনেছেন গল্পে। এই গল্পটি কি আশুতোষ লিখেছেন নিজেবই লেখা বিশ্লেষণেব জন্য? গল্পেব শেষে কিছু কৈফিযৎ আছে। গল্পে কি কি উপাদান প্রত্যাশিত পাঠকেব কাছে? গল্পেব শৈলী কেমন হবে? এসব প্রশ্নেব উত্তব দিযেছেন লেখক। গল্পে কি সত্যেব ছাযা থাকে, গল্প কি আকাডা বাস্তব হবে, প্রথম পাঠে যাকে অবাস্তব বলে মনে হয, হযত সূক্ষ্ম বিচাবে তা ভ্রান্ত বলেই প্রতিপন্ন হবে, গল্পে কি উদ্দেশ্যমূলকতা প্রধান হবে অথবা পাঠকেব কৌতূহলকে জাগিযে বাখবাব জনা উদ্দেশ্যমূলক ভাবকে গোপন কবতে হবে, পাঠকেব ইচ্ছাপূবণেব জন্যই গল্প তৈবি হবে? এসব প্রশ্ন লেখকেব যেমন পাঠকেবও তেমনি। লেখকেব জিজ্ঞাসা থেকে যা উঠে আসে তা হল গল্পে প্রত্যক্ষ বস্তব ছাযা থাকে, উদ্দেশামূলকতাকেও বিসর্জন দেওযা যায না, কৌতূহলকে জাগিযে বাখতে হবে শেষ পর্যন্ত, হচ্ছাপূবণ গল্পে না থাকাই বাঞ্ছনীয। শেষ জিজ্ঞাসাটি কিন্তু আশুতোষ সর্বদা মেনে চলেন না। অনেক সমযেই আশুতোষেব গল্পেব বৃত্ত তৈবি হয ইচ্ছাপূবণে। আশুতোষ নাবীব মধ্যে শক্তিমযীকে দেখেছেন। আবাব মঙ্গলময়ী নাবীব ভূমিকাকে আশুতোষ স্বাগত জানান তাঁব গল্পে . যে মেযেব মঙ্গল আব কল্যাণেব আকাঙ্ক্ষায মহিলাব উনিশ হাজাব টাকা সম্বলেব থেকে দশ হাজাব খবচ কবাব প্রেবণা আব অনাযাসে আইন ভঙ্গ কবাব তাডনা—কল্পনায সেই মেযেব মাথায হাত বেখে কেন বলতে ইচ্ছে কবছে, মঙ্গল হোক, সুখী হও। লেখক এখানে ধবা দেন পাঠকেব কাছে।

আশুতোষ প্রেমেব গল্প লেখেননি এমন নয। কিন্তু আমবা যে গল্পগুলি আলোচনা কবেছি তাতে পূর্ববাগেব বোমান্সেব বিস্তৃতি নেই। বোমান্টিক নাযক-নাযিকা গল্পে লুকোচুবি খেলে না। অথচ সুন্দবী, কুশলী, বুদ্ধিদীপ্ত, আবেগপ্রবণ নাযিকাব সাক্ষাৎ তাব গল্পে সব সমযেই উঠে আসে। আশুতোষ যেন বোমান্সেব ঘন পবিবেশে স্বচ্ছন্দ হতে পাবেন না। বুদ্ধিব প্রৌঢত্বে ছোটগল্পে সহজে তাবা পাঠকচিত্তকে আশ্বস্ত কবে ঠিকই, কিন্তু উর্বশীরূপে পুরুষেব চিত্তকে উথালপাতাল কবে না। অপর্ণা আব মেজব ঘোষ চৌধুবীব বিবাহ প্রেমজসূত্রে কিন্তু সেটুকু সংক্ষেপে বলে লেখক মৃত্যুশয্যায শাযিত অপর্ণাব জন্য সৈনিক মেজবেব উৎকণ্ঠা, আবেগ উত্তেজনা এবং ভালোবাসাকে বিবৃত কবেছেন। গল্পটিকে তিনি সৈনিকেব জীবনযাপনেব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। একটি দুষ্প্রাপ্য ওষুধ খাওযাতে পাবলে অপর্ণা বেঁচে যাবে এই আশায দ্রুত গাডি চালিযে দোকান থেকে সংগ্রহ কবলেন ওষুধটি। নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছতে পাবলে স্ত্রী বেঁচে যাবে। মেজব গাডি চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল গতিতে চালাতে লাগলেন। কিন্তু ক্রসিং-এ এসে গাডি থামাতে হয। অস্থিব হয়ে ওঠেন মেজব। এক একটা ক্রসিং-এব লাল আলো

মেজবেব বুকে আগুন হযে জ্বলে কিন্তু তিনি নিযম ভেঙ্গে বেবোতে পাবেন না। একদিকে স্ত্রীব প্রতি ভালোবাসা, অন্যদিকে শৃঙ্খলিত সৈনিকেব জীবনেব ক্রসিং-এব বিধিবিধান মানাব দাযিত্ব মেজবেব জীবনকে অস্থিব কবে তোলে। যখন তিনি পৌঁছলেন, তখন সব শেষ। বিষয হিসাবে তুচ্ছই বলতে হবে, কিন্তু আশুতোষকে বোধ কবি ভাবিযেছে মানুষেব দুর্ভাগ্যেব উৎস কোথায। এবকম গল্প খুব বেশি পডেছি বলে মনে কবতে পাবছি না।

আগেই বলেছি আশুতোষ নাবীচবিত্রেব বৈচিত্র্য লক্ষ কবেছেন নানা দিক থেকে। 'দুজনাব ঘব' গ্রন্থনামেব গল্পটিতে কাজললতা এইবকম একজন বৈচিত্র্যময়ী নাবী। স্বাচ্ছন্দ্য আব অনটনে যে নাবী নূতন মাত্রায বদলে বদলে যায। কাজলতাব মধ্যে সৃষ্টিধর্মী এক সত্তাব পবিচয আমবা পেযে যাই। এ নাবী স্বপ্ন দেখে, পবিশ্রম কবে সে স্বপ্নকে বাস্তবে সৃষ্টি কবে তোলে। স্বামীব সঙ্গে দুজনে মিলে নিজেদেব ব্যবসাকে উন্নতিব পথে নিযে যায। কিন্তু ব্যবসাযে ওঠা-পডা আছে। পডাব দিনে আগন্তুক তৃতীয ব্যক্তিটি দুজনাব ছিমছাম জীবনে গণ্ডগোল পাকিযে দেয। ধাবদেনা কবে কাজললতা ব্যবসাযকে বাঁচিযে বাখে, ধাব নেয বটুকেব কাছ থেকে। বটুক সুযোগ নেয। স্বামী বাধাকান্ত একদিন টেব পায। কাজললতাকে নিযে পালিযে যায বটুক। বটুকেব শযতানিব হাত থেকে বেহাই পাবাব জন্যে কাজল একদিন ফিবে আসে। বস্তিতে ঘব বাঁধলেও তাব সৃষ্টিসত্তা মবে যাযনি। সে আবাব খুঁজে পায দুজনাব ঘব। কপালে বডো কবে সিঁদুবটিপ। এটা যেন তাব বক্ষাকবচ। সে নন্দন দোকানে চাকবি জুটিযে নেয। দিনে দিনে নন্দব দোকানেব উন্নতি ঘটতে থাকে। কাজললতাব শ্রম আব পবিকল্পনা দোকানেব লক্ষ্মীশ্রী ফিবিযে আনে। নন্দ খুশি। যে মেযেটি কাজ কবত তাকে কাজললতাব সঙ্গে খাবাপ ব্যবহাবেব জন্য তাডিযে দেয। তাবপব নন্দ একদিন কাজললতাকে টেনে নিতে চায সঙ্গিনী হিসাবে। তাদেব নিভৃত খেলায এসে দাঁডায তৃতীয ব্যক্তি নন্দব স্ত্রী। কাজললতা সবে যায। জীবন দিযে সে বুঝতে পাবে দুজনাব ঘবে তৃতীয ব্যক্তিব স্থান নেই। বাঁচাব লডাইযেও তৃতীয ব্যক্তি প্রতিবন্ধক। পাবিবাবিক জীবন এবং বহির্জীবনেব দ্বন্দ্ব মেটানো সম্ভব নয। আশুতোষ এখানে আবাব নাবীব দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটিকে তৈবি কবলেন। লেখকেব ইচ্ছাশক্তিব কাছে বাধাকান্ত, বটুক, নন্দ তিনজনই কুচবিত্রেব পর্যাযে নেমে আসে। বাধাকান্তব ঈর্শা, ক্ষোভ এবং খুনেব ইচ্ছা অবশ্য সঙ্গত। কিন্তু তাব বদমেজাজেব প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত নয এই গল্পে। এখানেও পবিস্থিতিব মধ্যে নিক্ষেপ কবেছেন কাজললতাকে লেখক। আমবা কি কাজললতাকে অপাপবিদ্ধ ধবে নিতে পাবি? বোধ কবি এ ভাবা সম্ভব নয। বটুক কিংবা নন্দেব তাপউত্তাপে কাজল গলে যায কেন এব উত্তব বোধ কবি এই কাজললতা তাব সাচ্ছন্দ্যেব জন্য যে কোনো মূল্য দিতে বাজী। গল্পটি একালেব, হযত মূল্যবোধ হাবানোব দৃষ্টান্ত হিসাবে গল্পটিকে গণনা কবা যায।

আশুতোষ মুখোপাধ্যাযেব গল্পেব চবিত্রনির্মাণকলা কিছুটা সিনেমাব ফ্ল্যাশব্যাক কাহিনীগ্রন্থনেব মতো। নাযকেবা তাদেব গল্প যখন নিবেদন কবেছে পাঠকেব কাছে তখন তাদেব মধ্যে অনেকেই প্রৌঢত্বে পৌঁছে গেছেন। শ্রোতাদেব আসবে বসিযে

বাতির আলো ধীরে ধীবে কমিয়ে আনেন। আর নায়ক তখন বর্তমানকে শ্রোতার চিত্ত থেকে সরিয়ে দিতে থাকেন। অতীতের পর্দা খুলতে থাকে, আমরা আর এক আলোব জগতে পৌঁছতে থাকি। ভূতেব গল্পে এই পরিবেশটি গা-ছমছম-করা। আশুতোষ কিন্তু ভূতেব গল্প লেখেন না। অতীতকেই বর্তমানের ঘটনা, দৃশ্যে, সংলাপে রূপান্তরিত করেন। বোধ কবি গল্প শোনার কৌতূহল এতে বেড়ে যায়। আসলে আশুতোষ যেন নাটক কিংবা চরিত্রবিহীনবিহীন গল্প অথবা চরিত্রবিরোধী গল্পে বিশ্বাসী নন। গল্প বলাব বঙ্কিমী পদ্ধতিতে তাঁব পূর্ণ আস্থা।

স্ত্রী-ব মৃত্যুব পব প্রতিষ্ঠিত লেখক বামকৃষ্ণ চক্রবর্তী বামেশ্বরমে বেড়াতে গিয়েছেন নিছক ভ্রমণেব নেশায। আব কিছুক্ষণেব মধ্যেই দক্ষিণ ভারতেব বামেশ্বরমের বহস্যময়ী মাতাজীকে দেখতে পান। বিকেলে সর্বজনশ্রদ্ধেযা, সঙ্গীতজ্ঞ, পবম ধর্মাচাবী মাতাজী বামকৃষ্ণকে ডেকে পাঠান। সকালেব দেখায (ঘোমটাব আড়ালে) যে কৌতূহল জেগেছিল বিকেলে তাকে চিনতে পাবলেন। আব গল্পের শুরুও এখানে। এক সময়ের প্রেমিক-প্রেমিকা। বামকৃষ্ণেব যেন কেবল পালিযে-বেড়ানো প্রেমিকাকে ভালোবাসার সম্পুটে ধবে রাখবাব চেষ্টা। প্রচণ্ড আবেগে প্রেমিকা শুভ গাঙ্গুলিকে কিন্তু তিনি পেলেন না। বামকৃষ্ণেব প্রচণ্ড ভালোবাসাকে গ্রাহ্য না কবে শুভ উধাও হল। এখন সে মাতাজী। ভক্তজনেব ভক্তির পাত্র। বামকৃষ্ণবাবুর অনুমান কবতেন শুভা অন্য কোনো পুরুষেব সঙ্গে পালিযেছে। কৌতূহলবশেই জিজ্ঞেস কবলেন কেন শুভা পালিযেছিল এবং সেই প্রেমিকা পুরুষটিই বা কে? শুভাব উত্তর শুনলেন তিনি। বামকৃষ্ণের বড়ো হযে ওঠার জন্যই শুভা সেদিন নিজেব ভালোবাসাকে বিসর্জন দিযেছিল। বামকৃষ্ণের লেখকজীবনে এবকম বিচ্ছেদযন্ত্রণা থাকলেই তাঁব লেখায ফুটে উঠবে নায়িকাদের জীবনের সাধ আহ্লাদ, প্রেম রোমান্স আব শুভাব মতো সাধারণ কালো মেয়ে নয়, দেখা দেবে সুন্দরীরা। নাবীব এই ত্যাগ আমাদেব কাছে কিছুটা অবাস্তব মনে হলেও আশুতোষ মানবিকতার দৃষ্টান্তরূপে গল্পটিকে প্রতিষ্ঠিত কবতে চান। আমাদেব ইচ্ছাপূরণের গল্প এটি। লোকনাথবাবুব গল্প বলাব কাহিনীও ওই অতীতেব দবজা খুলে দিয়ে তাব অন্দবমহলের চিত্র প্রদর্শন। রামকৃষ্ণবাবুর অভিজ্ঞতা অনেকটা ববীন্দ্রনাথেব বাখী সুমিত্রাব (রাজা ও রানী) মতো—তোমাকে যে ছেড়ে যাই সে তোমাবি প্রেমে। আব লোকনাথবাবুও বহুদিন বাদে তাঁব গ্রামের বাড়িতে এসে গ্রাম-পবিক্রমায় এসে সন্ধ্যাব আলোআঁধারে আবিষ্কার করেন বোবা হাসিবাণীকে। গল্পটিব মধ্যে মানুষেব স্বার্থচিন্তা, অর্থলোভ, ঠকানোব চিত্র আছে। গল্পেব স্বাদ ঘন কবেছেন প্রায ডিটেকটিভ উপন্যাসের শৈলীতে। কিন্তু নাবীর পালযিত্রী এবং বক্ষায়িত্রীর ভূমিকাকে তিনি মেলে দেন এই গল্পেব শেষে। নারীব অন্তবশক্তিব পবিচয পাই আমরা এ গল্পে। বোবা হাসিরানী নিজেব অধিকার বক্ষা করাব জন্য এক ধরনের নৃশংসতাব আশ্রয়ও নিযেছিল। এটা কি পাপ? গল্পের শেষে এর উত্তর পাই আমবা। লোকনাথবাবু বললেন, 'কোনো পাপ করোনি, কোনো অন্যায় করোনি—তুমি যা করেছ তোমার ছেলেবা তা সোনাব অক্ষবে লিখে রাখে যেন, বংশ বংশ ধরে সকলে জানতে পারে'। গল্পটার শেষ ছত্র 'বাঘিনীর নিঃশব্দ গর্জন কেউ শোনেনি'। অনেক গল্পেই আশুতোষ নিজেই চবিত্রের জবানিতে গল্পের মর্ম উদঘাটন

করেন। এ প্যাটার্নও বঙ্কিমী। আর লেখক ধরা দেন পাঠকের কাছে এইভাবে। প্রয়োজনে নারী যে বাঘিনী হয়ে উঠতে পারে গল্পের মর্ম তাই। আবার সেই শক্তিময়ীর ভূমিকার বিস্তার লক্ষ করি আমরা।

আমরা আগে বলেছি আশুতোষ রোমান্সের রহস্যঘটনা তাঁর গল্পে বিস্তার করেন না। তবে কি তাঁর গল্পে প্রণয়কলার ছলনা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগবর্জিত? সেরকম নয় অবশ্য। কিন্তু পূর্বরাগ থেকে মিলনে উত্তরণ খুব দ্রুত ঘটে যায় আশুতোষের গল্পে। পূর্বরাগ অনেক সময়েই নায়কের পক্ষে একতরফা। এবং প্রেমিক তখন দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। যতটা না মধুচন্দ্রিমার ভাষায় প্রেমিক অভ্যস্ত, তার চাইতে অনেক বেশি সে মরিয়া। কোনো বাধাই সে মানতে চায় না। প্রেমিকা-কে সে জোর করে ছিনিয়ে নেবে —এই তার পণ। কিন্তু মিলনের পর হঠাৎ যেন সংসারের চাপে এবং দাপে অথবা স্বভাবে সে হয়ে পড়ে দুর্বল। সেই জায়গায় এসে দাঁড়ায় প্রেমিকা। আশুতোষের নায়িকাদের গৃহিণীপনার বৈচিত্র্য কর্তব্যপালনে, সন্তানপালনে, সংসারবিন্যাসে, কখনও বা সংসারত্যাগে। তার নারীরা লক্ষ্মী ও প্রিয়া একথা বলেছি, কিন্তু সময়বিশেষে তারা উগ্র। বাঙালির সংসারে ঘানি টেনে (আধুনিকাদের দেখতে পাই না বিশেষ। বঙ্কিমচন্দ্রের নবীনা ও প্রবীণার সাক্ষাৎ পাই নিশ্চয়ই। বঙ্কিমচন্দ্রের নবীনারাও কিন্তু একালের উপন্যাসে নিতান্তই প্রবীণা। আশুতোষ বঙ্কিমগোষ্ঠীরই লেখক।) নারীরা। সেই সূত্র ধরেই উঠে আসে বিভাবতী, হাসিরানী চরিত্র। মধুরঙ্গ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। অভিনয়জীবনে সে মানুষকে হাসায়। চরিত্রটির মধ্যে আমরা এক অনাস্বাদিত জীবনরসের পরিচয় পাই। তার শিক্ষাদীক্ষা খুব বেশি নয়। কিন্তু অভিনয়জীবনে সফল। সে ভালোবাসে দুর্গাকে। দুর্গা ধনীঘরের মেয়ে। উচ্চ শিক্ষিত। সে মধুরঙ্গকে উপেক্ষা করে। ঘৃণাই করে বলতে হবে। মধুরঙ্গ দুর্গাকে পাবার জন্য দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে তার মধ্যে জেগে ওঠে খুন করবার প্রবৃত্তি। কিন্তু একদিন সে অভিনয়ের ছলচাতুরির দ্বারাই দুর্গার চিত্ত জয় করে। দুর্গা পরিবর্তিত হয়। মধুরঙ্গকে সে ভালোবাসতে আরম্ভ করে। কিন্তু প্রেমের ফাঁদ সে জানে না। মধুরঙ্গের জীবনকে গড়ে তোলাই তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে। মধুরঙ্গ মানতে চায় না। দুর্গা ক্ষেপে ওঠে। মধুরঙ্গের জীবনকে সে সুন্দর করে তুলতে চায় বলেই কখনও কখনও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে দুর্গা। এই দুর্গা মরে গেল একদিন। দুর্গার শোকে শ্মশানে যখন সকলে বিহ্বল তখন মধুরঙ্গের মনে পড়ে যায় দুর্গাকে যেদিন অভিনয়-ছলার দ্বারা জয় করেছিল। সে অভিনয়ই সে করতে লাগল এখানে এসে। সে অভিনেতা। জীবনের সঙ্গে অভিনয়ের জন্য মেলবন্ধন ঘটে যায়। আর দুর্গা? সে যেন সরস্বতী নদী। যার বুকে বালি আর খুঁড়লেই অন্তঃশীলা ফল্গু। যদিও দুর্গা অবাঙালী কিন্তু আশুতোষ তার মধ্যে খুঁজে পান বাংলার বধূর জীবনযাপনের আদর্শ। যাকে আমরা প্রায় ফেলে এসেছি, আসছি ইতিহাসেরই অমোঘ নিয়মে। আশুতোষের মূল্যবোধ সারেকি, ঐতিহ্যনিয়ন্ত্রিত।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে বাঙালী-অবাঙালী মধ্যবিত্তের সুখদুঃখের মেলা। তিনি দাম্পত্যজীবনের বিশেষ একটি ঝোঁকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। তিনি যখন গল্প লিখতে শুরু করেন তখন বাংলা গল্পে নূতন কালের ইশারা। নূতন গল্পে বচনাশৈলী

পালটে যাচ্ছিল। মননের বিস্তার গল্পে দীপ্ত হচ্ছিল। সূক্ষ্ম কারুকার্যের দিকে লেখকবৃন্দের ঝোঁক তখন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আশা ও আশাভঙ্গের উৎসাহ ও বিষাদ বাংলা গল্পে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে। মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব তখন বিপন্ন। অবক্ষয়ের এক গভীর খাদের মুখোমুখি মধ্যবিত্ত। সিসিফাসের মিথ টানছে লেখকবৃন্দকে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের কাঠামো পরিবর্তিত হলো। মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে সে পরিবর্তন জড়িয়ে গেল। বাংলা গল্পে তারও পদাঙ্ক পড়ল।

কিন্তু আশুতোষ এই পরিবর্তনের আবর্তে উঠে আসতে চাননি। তিনি লক্ষ করেছেন মধ্যবিত্তের জীবনে এমন কতকগুলি প্রবণতা, টানটোন আছে যা প্রায় গত শতাব্দের মাঝামাঝি থেকে চলে আসছে। সেই ট্রাডিশন সমানে না চললেও, উচ্চাবচ কিছু তরঙ্গ সৃষ্টি হলেও—বাঙালী মধ্যবিত্তের একটা সারেকি প্যাটার্ন থেকেই গেছে। আমরা যে গল্পগুলি চুম্বকে দেখেছি সেখানে এই গড়পড়তা বাঙালিরই চেহারা। মধ্যবিত্তের এই চিত্রচরিত্র-কে আশুতোষ ভোলেননি। তিনি মননের ধার দিয়ে যাননি এমন কথা বলি না, তবে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষের ভাষায় তিনি এ জীবন একে গেছেন। আমাদের কেবলই বাংলা কবিতায় অক্ষয়কুমার বড়ালের এষা কাব্যের কথা মনে পড়ে যায় আশুতোষের গল্পমালায়। অক্ষয় বড়াল প্রীতিবিরহের কাব্য রচনা করেছিলেন। প্রিয়ার বিরহের স্পর্শ ঘরের আনাচে-কানাচে মধুর রূপ নিয়ে আনাগোনা করছে—এমন কি গৃহস্থালির প্রতিটি খুঁটিনাটি জীবনে কবি প্রিয়ার স্পর্শ পেয়েছিলেন। দুর্দান্ত পুরুষকে স্নেহবন্ধনে বেঁধেছে নারী। আশুতোষ এই জীবনকেই খুঁজে পান বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারীজাগরণের বিস্তার। এই জাগরণের একটা আত্যন্তিক দিকও তার গল্পে উঠে আসে। তাকে যেন তিনি ঠিক মেনে নিতে পারেন না। সমর ঘোষাল আর অতসীর কাহিনীতে প্রেম ভালোবাসা মিলনে এবং চিরবিচ্ছেদে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতসী (কুল) যেন আতসী (এক জাতীয় কাঁচ যা সূর্যকিরণকে ঘনীভূত করে প্রচণ্ড তাপে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া যায়)। নারীর দীপ্তি দাহ যেমন আমরা এ গল্পে পাই তেমনি দেখি ব্যর্থতার কারুণ্য। একটি গল্পে হাসি নামে মেয়েটির অবহেলা আর উৎপীড়নের শিকার হতে দেখি, অন্যদিকে আর একটি গল্পে শোনা যায় হাসিরানীর গর্জন। আশুতোষ মধ্যবিত্ত জীবনের এই কান্নাহাসির রূপকার।

ডঃ বিজিতকুমার দত্ত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

মুখোমুখি

প্রশান্ত মিত্র দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে বসেছিলেন। ঘণ্টাখানেক আগে ইন্দিরা নিজে ওই চেয়ার পেতে তাঁকে ধরে ধরে এনে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। এখানে বসে ইচ্ছে করলে রাস্তার লোক-চলাচল দেখা যায়। ইচ্ছে করলে সামনের আকাশের খানিকটা দেখা যায়। ইচ্ছে করলে রাস্তার উল্টোদিকের বাড়ি ক'টার জানলা দরজা বা বারান্দার মুখগুলো দেখা যায়। আর কিছুই ইচ্ছে না করলে ইজিচেয়ারে মাথা রেখে চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকা যায়।

বেরুবার আগে ইন্দিরা এই শেষের নির্দেশই দিয়ে গেছেন।—কিছু চিন্তা করবে না, কিচ্ছু ভাববে না, মনটাকে একেবারে ফাঁকা করে দিয়ে চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে থাকবে, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে মার্কেটিং সেরে ফিরে আসছি—ঘরে কি আছে আর কি নেই ক'দিনের মধ্যে তো আর হুঁশ ছিল না—ছেলেমেয়ে দুটোরও যদি বিবেচনা বলে কিছু থাকত—বাবার জন্যে কেবল চিন্তা করতেই ওস্তাদ তারা, ফাঁক পেলেই ছুটছাট বেরিয়ে পড়েছে—নিজে না বেরিয়ে করি কি। মহেশ কাছেই থাকবে, কিছু দরকার হলে ওকে বলো, আর খবরদার টেলিফোন এলে তুমি চেয়ার ছেড়ে নড়বে না—মহেশ ধরবে, কেউ খোঁজ নিলে কি বলতে হবে ওর এতদিনে মুখস্থ হয়ে গেছে। ঠিক আছে?

প্রশান্ত মিত্র হেসে মাথা নাড়লেন, ঠিক আছে। বললেন, আমার চিন্তা নিয়ে বেরিয়ে তুমি আবার গাড়ি-চাপা পড়ো না।

ইন্দিরা ব্যস্ত পায়ে চলে গেলেন। কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরলেন। হাতে একটা ছোট টুল। পায়ের সামনে ওটা পেতে দিয়ে বললেন, যখন ইচ্ছে হবে পা তুলে বোসো—আর ভালো কথা, আমি বেরুচ্ছি, এই ফাঁকে লুকিয়ে একটা সিগারেট খেলেও কিন্তু ধরা পড়ে যাবে—মহেশ ঠিক আমাকে বলে দেবে।

প্রশান্ত মিত্র মুখ টিপে হেসে বললেন, পি. এম'এর আদেশ শিরোধার্য।

—আ-হা, পি. এম'এর কথা কত শোনো তুমি! এ-কানে ঢুকলে ও-কান দিয়ে বেরোয়—শুনলে আর এই বিপাকে পড়তে হত না।

চলে গেলেন। পি. এম অর্থাৎ প্রাইম মিনিস্টার। নামে মিল, তাই ইন্দিরা গান্ধী যেদিন থেকে প্রধানমন্ত্রী সেই দিন থেকে ঘরের এই রসিকতা চালু। প্রশান্তবাবু সময়ে সময়ে এখনো ঠাট্টা করেন, ইন্দিরা সাম্রাজ্যের তবু একবার পতন হয়েছিল, মিত্র সাম্রাজ্যের পতন বলে কোনো কথা নেই। লাই পেয়ে ছেলেমেয়ে দুটো পর্যন্ত ওই নাম নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে।

...গত চার সপ্তাহ ধরে বাড়ির বাতাসে চাপা উত্তেজনা থিতিয়ে ছিল। সম্ভাব্য শোকের উত্তেজনা। শোক ঠেকানোর উত্তেজনাও বলা যেতে পারে। মোট কথা, সমস্ত ব্যাপারটাই প্রশান্তবাবুর বিবেচনায় একধরণের উত্তেজনা গোছেরই মনে হয়েছিল। হঠাৎ সত্যি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বিনা নোটিসে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছিল। বাঁ-কাঁধে আর বুকের বাঁদিকে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। বেজায় গরম লাগছিল। ঘাম হচ্ছিল। সমস্ত শরীরে যেন পিন ফোটানো হচ্ছিল। এ রোগ তিনি চেনেন। বাবা

এই রোগে গেছেন। এক শালা গেল বছর এই রোগে গেছে। অন্তরঙ্গ এক খুড়তুতো ভাই ছ'মাস আগে গেছে। গত দেড় বছরের মধ্যে দু'জন সতীর্থ অর্থাৎ প্রবীণ সাহিত্যিক আর একজন কবিবন্ধু এই রোগে চোখ বুজেছে।

তাই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে ডেকে তিনি কি হয়েছে বলেছেন। তারপর শুধু বলেছেন, মনে রেখো, যাই হোক কক্ষনো হাসপাতালে নয়।

তারপর আর কথা বলার শক্তি ছিল না। কিন্তু জ্ঞান পুরোমাত্রায় ছিল। দশ মিনিটের মধ্যে পাড়ার ডাক্তার এসেছে। আধঘণ্টার মধ্যে দু'জন বড় ডাক্তার। যে লোকের নাম-ডাক আছে তার বেলায় অন্তত তড়িঘড়ি বড় ডাক্তার কলকাতায় মেলে। পটাপট কটা ইনজেকশান দেওয়া হল প্রশান্তবাবু টের পেয়েছেন। তারপর দুটো দিন ঘুম আর ঘুমের ঘোরে কেটেছে।

তৃতীয় দিনে একটু সুস্থ হবার পর থেকে চিকিৎসার আড়ম্বর আর সেই সঙ্গে এই চাপা উত্তেজনা দেখে যাচ্ছেন। দু'দিনের সমাচারও শুনেছেন। দু'জন বড় ডাক্তারই রোগীকে তক্ষুনি হাসপাতালে সরাতে চেয়েছিল। ইন্দিরা বেঁকে বসতে তা হয়নি। দু'জন ডাক্তারই দস্তুরমতো অসন্তুষ্ট তাতে। তারা ছেলেমেয়েকে ডেকে বলেছে, এ অবস্থায় পেশেন্টকে বাড়িতে রাখা নির্বোধের কাজ হবে। ছেলেমেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে মাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। ইন্দিরার এক কথা, চিকিৎসা বাড়িতেই হবে—তার জন্যে দশগুণ খরচ হয় হোক—হাসপাতালে নয়।

হাসপাতালে কেন নয় ছেলেমেয়েও মোটামুটি আঁচ করতে পারে। দাদু থেকে শুরু করে আত্মীয়-পরিজন আর বাবার বন্ধুদের এই রোগে যে ক'জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের একজনও জীবিত অবস্থায় ফেরেনি। বাবা খোলাখুলি বলতেন, যাবার সময় হলে কোনো পাতাল থেকেই কেউ ফিরবে না—আমার কিছু হলে কেউ হাসপাতালে নেবার নামও করবি না।

প্রশান্তবাবু নিজেও জানতেন হাসপাতাল সম্পর্কে এরকম একটা ধারণা থাকা কোনো শিক্ষিত মানুষের উচিত নয়। এমন অনেক রোগ আছে যার যথাযথ চিকিৎসা আর আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা শুধু হাসপাতালেই হতে পারে। কিন্তু হাসপাতাল নামটাই তাঁর ব্যক্তিগত অ্যালার্জির মতো। ইন্দিরারও ভয়, জ্ঞান হবার পর স্বামীটি যদি দেখেন হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে আছেন, তক্ষুনি আবার অঘটন ঘটে যেতে পারে।

যাই হোক, প্রশান্ত মিত্র বাড়ির শয্যাতেই ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেন। ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছেন এ ধারণা শুধু তাঁর নিজের—বাড়িতে আর একজনেরও না। তার ওপর বড় ডাক্তাররা নাকি বলে গেছেন, আরো কিছুদিন না গেলে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এই আরো কিছুদিনটা কত দিন তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রশান্তবাবুর।

দুশ্চিন্তা নিজের শারীরিক দিক ভেবে নয়, চিকিৎসার আড়ম্বর, স্ত্রী ছেলেমেয়ে আর খুব ঘনিষ্ঠ দু'চারজনের গার্জেনগিরির দাপটে। ডাক্তাররা সম্পূর্ণ সুস্থ ঘোষণা করলেও আর চলাফেরা কাজকর্মের স্বাধীনতা দিলেও এরা তা মানবে কিনা সন্দেহ। একটু অনিয়ম করা হয়েছে মনে হলে ইন্দিরা স্নেহমাখা ধমকের সুরে কথা বলেন, ছেলে সুশান্ত আর মেয়ে অনীতা সোজাসুজি ধমকায়, বলে, আর তোমার কথামতো

কোনো কিছু চলবে না জেনে রাখো। আর খুব ঘনিষ্ঠরা খবর নিতে এলে মা ছেলেমেয়ে তাদের কাছে নালিশ জানায়, এই এই অনিয়ম করা হচ্ছিল বা হতে যাচ্ছিল। শুনে তারাও শুভার্থীর মতো হিতোপদেশ দিয়ে যায়।

ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত মাইলড্ করোনারি অ্যাটাক। কিন্তু স্ত্রী ছেলেমেয়েদের দুশ্চিন্তার কারণে আর প্রচারগুণে রোগীর অবস্থা সকলের কাছেই সংকটজনক হয়ে উঠেছিল। রেডিও থেকে ফোনে বাড়ির লোকের মুখেই খবর নেওয়া হয়েছে। তারা জেনেছে অবস্থা সংকটজনক—এবং সেই প্রচারই করেছে। খবরের কাজগুলোতেও একইভাবে এই সংকটজনক অবস্থার খবরই ছড়িয়েছে। ছেলের সঙ্গে কথা বলে কোনো কোনো কাগজের প্রতিনিধি এও লিখেছে, মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রচিত্রনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক প্রশান্ত মিত্রর নিষেধেই তাঁকে হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে সরানো সম্ভব হয়নি। শেষের সময় যদি উপস্থিত হয়েই থাকে, তিনি স্বগৃহেই তার জন্য প্রস্তুত। পরে অপ্রস্তুত ছেলে অবশ্য সরোষে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করেছে, কাগজগুলো মিথ্যেবাদী, আমি কখনো এ-রকম কথা বলিনি।

প্রশান্তবাবু হাসি মুখেই জবাব দিয়েছেন, বলে থাকলেও তো সত্যি কথাই বলেছিস, তোর রাগ হবার কি হল।

এমন প্রচারের যা ফল, তার উত্তেজনা ঠাণ্ডা হতে সময় একটু লাগবেই। প্রথম দিনকতক তো বাড়ির সামনেই কত চেনা অচেনা মেয়েপুরুষের ভিড়। অবস্থা জানোনোর জন্য সুশান্তর দুই বন্ধুকে নিচের দরজায় মোতায়েন রাখতে হয়েছে। এদিকে মুহুর্মুহু টেলিফোন। প্রশান্তবাবুর লেখার ঘর থেকে টেলিফোন অবশ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। কারণ শোবার ঘরের পরেই লেখার ঘর। তবু ফোন এলে এ ঘর থেকেও রিং শোনা যায়। ফোনে খবর জানানোর দায়িত্ব অনীতার অথবা ইন্দিরার। তৃতীয় দিনে একটু সুস্থ হবার পর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পঞ্চাশ-ষাটটা করে ফোন আসার খবর প্রশান্তবাবু পেয়েছেন। ফোনে কারা কারা খবর নিচ্ছে নোট রাখা উচিত এবং এই উচিত কাজে গাফিলতি হয়নি। সমবয়সী আর অনুজ লেখক, পাবলিশার, ছোট বড় মাসিক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক, সিনেমার পরিচালক প্রযোজক, প্রশান্তবাবুর স্নেহভাজন অভিনেতা অভিনেত্রী গায়ক গায়িকারা সকলেই বাড়িতে এসে খবর নেবার কর্তব্য পালন করে চলেছে। রোগীর সঙ্গে দেখা করা নিষেধ। ফলে তাদের রোগীর খবর জানানোর দায়িত্ব ইন্দিরার বা ছেলেমেয়ের। প্রত্যহ কারা কারা খবর নিতে এলো ইন্দিরা সন্ধ্যার পর সময় বুঝে স্বামীকে বলেন।

এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে প্রশান্ত মিত্র হাল ছেড়ে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কি করতে পারেন? প্রচুর সিগারেট খেতেন। পনের দিনের মাথায় ডাক্তার তিনটে পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছে। এ সপ্তাহ থেকে পাঁচটা। তাতেও ইন্দিরা আর ছেলেমেয়ের রেজায় আপত্তি। একটু আধটু ড্রিংক করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছল। ডাক্তারের মতে এ রোগে সিগারেটের থেকে ড্রিংক কম ক্ষতিকর—আরো কিছু দিন গেলে একটু আধটু খাওয়া চলতে পারে। ইন্দিরা আর ছেলেমেয়েরাও ডাক্তারের ওপর রেগে আগুন। তাদের ধারণা, ডাক্তার নিজে খায় বলেই অমন উদার। ছেলে তার এক বন্ধুর ডাক্তার

বাবাব সঙ্গে কথা বলে বাড়িতে এসে ঘোষণা কবল, এই ডাক্তাব আব চলবে না, বাবাব মুখ চেযে ফতোযা দেয, আমি খুব ভালো কবে জেনে এসেছি ড্রিংক সিগাবেট কোনোটাই একদম চলা উচিত নয।

মেযে আব মাযেব কাছে এই ফতোযাই অভ্রান্ত। প্রশান্তবাবু মনে মনে বিবক্ত। বাপেব পযসায ছেলে দিনেব মধ্যে ক'প্যাকেট সিগাবেট ওডায ঠিক নেই—লুকিযে চুবিযে ড্রিংকও একটু আধটু চলে কিনা সে সম্পর্কেও একেবাবে নিঃসংশয নন। কিন্তু মুখে তিনি বাদ প্রতিবাদ কিছু কবেন না। এখন বে-কাযদায পড়েছেন—সময হলে নিজেব যা কবাব কবেই যাবেন এ ওবাও ভালো কবেই জানে। জানে বলেই এত কড়া নজবে এখন।

কাঠেব টুলে দু'পা তুলে দিযে দূবেব আকাশেব দিকে চেযে গা ছেড়েই শুযেছিলেন প্রশান্ত মিত্র। মাথাব মধ্যে সেই হিজিবিজি ব্যাপাবটা শুরু হযে গেল। হিজিবিজি ব্যাপাব বলতে কতকগুলো এলোমোলো চিন্তা। কোনোটাব সঙ্গে কোনোটাব মিল নেই, এমন সব আধা ঘুমেব মধ্যে যেমন অজস্র ছাড়া-ছাড়া চিত্র ভেসে ওঠে আবাব মিলিযে যায, তেমনি। কাউকে বলেন নি, একেবাবে ছেলেবেলা থেকে এ-বকমটা হযে আসছে।

একবাশ বিক্ষিপ্ত চিন্তাব মিছিল মগজেব মধ্যে যেন মূর্তি ধবে সাব বেধে চলতে থাকে। মানুষেব চবিত্র বিস্তাবে সিদ্ধহস্ত শিল্পী তিনি। যে চবিত্র কলমেব ডগায অবযব ধবে, তাব ভেতব-বাব পাঠককে আযনায দেখিযে দিতে পাবেন। অতিবড় কঢ সমালোচকও চবিত্র বিশ্লেষণে প্রশান্ত মিত্রব মুক্তি নেই ভাবেন। অনেক সমযেই তাঁবা লেখেন, মানুষেব চবিত্রেব গভীবতম অন্তঃপুবে অনাযাসে ঢুকে পড়াব যাদুকাঠিটি এই এক লেখকেব হাতেব মুঠোয। আব তাঁবই মগজেব মধ্যে এমন এমন এলোমেলো হিজিবিজি চিন্তাব মিছিল সাব বেধে চলতে থাকে এ নিজেব কাছেই ববাবব একটা কৌতুকেব ব্যাপাব।

নড়েচড়ে সোজা হযে বসলেন প্রশান্তবাবু। মাথায একটা মতলব এসেছে। ওই এলোমেলো অথচ জীবন্ত চিন্তাব মিছিলকে যদি কাগজে কলমে ধবে বাখা যায তো কি দাড়ায? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মহেশকে ডেকে হুকুম কবলেন, আমাব কালো নোটবই আব পেনটা দিযে যা—

মহেশ দ্বিধান্বিত। মনিব এটা উচিত কাজ কবছেন না, আব মা শুনলে বকবেন এ সে-ও জানে।

—কি বললাম কানে গেল?

মেজাজেব আভাস পেযে মহেশ ঘব থেকে মস্ত কালো নোটবই আব কলম বেখে গেল। এ নোটবইটা বাড়িব সকলেবই খুব চেনা, কিন্তু কেউ আব এখন এটা খোলে না। লেখাব কোনো প্ল্যান বা প্লট মাথায এলে এতে লিখে বাখেন। কিন্তু নোট কবাব পদ্ধতি এমন বিচিত্রি যে দেখে বা পড়ে কাবোই তেমন বোধগম্য হবে না। জ্যামিতিক নক্সাব মতো মনে হবে। তাব মধ্যে দু'চাবটে নাম, দু'চাব অক্ষবে একটা-দুটো ঘটনা, তাব মধ্যে অ্যাবো টেনে কোথাও সার্কেল কোথাও ট্রাযেঙ্গেল কোথাও বা বেকট্যাঙ্গেল। তিনশ পাতাব লম্বা বাঁধানো এই নোটবইয়েব প্রায দু'শ পাতা এই গোছেব

প্লটের নক্সায় বোঝাই। আর তার প্রায় সবগুলোতেই লাল দাগ মারা। অর্থাৎ যে প্লট বা প্ল্যানগুলো নিয়ে গল্প বা উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে তাতে ওই লাল দাগ পড়ে। ইন্দিরা আর ছেলেমেয়েও তাঁর এই প্ল্যান অথবা প্লটের বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হয় না বলে কৌতূহল গেছে।

নোটবইটা খুলে ছোট টুলের ওপর রেখে আজ আর কোনো প্লটের ছক কাটতে বসলেন না প্রশান্ত মিত্র। ওই চিন্তার এলেমেলো মিছিল যেমন আসে তেমনি সাজানোর সংকল্প। ...খুব ছেলেবেলা থেকেই ধরা যেতে পারে। চোখ বুজলে সেই ন'বছরের ছেলেটাকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পান। তার উদ্ভট চিন্তার কারিকুরিও।

"...ইস্কুল যেতে ইচ্ছে করছে না। অঙ্কের মাস্টারটা বেত নিয়ে ক্লাসে ঢোকে। অঙ্ক ভুল হলে শপাশপ মারে। হি-হি-হি-হি—ওই মাস্টারের পিঠেই বৃষ্টির মতো বেতের ঘা পড়ছে। যন্ত্রণায় মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। হি-হি-হি—কিছু দেখতেও পাচ্ছে না বুঝতেও পারছে না। অদৃশ্য মানুষ হয়ে কে মারছে জানবে কি করে?...মা-টা যাচ্ছে তাই। অতবড় পাটালি থেকে এক ডেলা মাত্র ভেঙে দিল। কি দারুণ খেতে। বেশি খেলে পেট কামড়ায় না হাতি। বড় হয়ে অনেক টাকা রোজগার করতে হবে। আর প্রাণের সাধে পাটালি খেতে হবে। ওই ঘাড় গোঁজা ধ্যাবড়া মোটা জলের কলটা। বিচ্ছিরি। ভূতেরা নিশ্চয় ওই রকম দেখতে। ও-মা! তীরের মতে সাইকেলটা যে গায়ের ওপর এসে পড়ছে। দাঁড়াব? ছুটব? দাঁড়াব? দাঁড়াব? না ছুটি। গেল গেল গেল! সব অন্ধকার। দারুণ যন্ত্রণা। মাটি থেকে কে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। অন্ধকার একটু কমছে। দাওয়ায় আঠের-উনিশ বছরের যে মেয়েটা সে-ই বুকের সঙ্গে জাপটে নিয়ে ছুটে বাড়িতে ঢুকছে। তার বুকটা কি নরম আর কেমন অদ্ভুত লাগছে। হি-হি-হি-হি। এ-মা ব্যাটাছেলে সাইকেল চাপা পড়ে। পাশের বাড়ির খুকুটা ছুটে ভিতরে পালিয়ে গেল। ধরা গেল না। হাত পা গা মুখের ছাল উঠে একাকার আর ওই মেয়ের হাসি। ধরতে পারলে মজা বুঝবে। ..আচ্ছা, ওই যে মেয়েটা বুকে জাপটে তুলে নিয়ে গেছল, খুকুটা বড় হলে তার মতো হবে? ওরও ওই রকম বুক হবে? মা মাসি খুড়ি জেঠি নয়, তাদের থেকে ঢের কমবয়সী মেয়েদের সকলের মধ্যে কিছু একটা মজা লুকিয়ে আছে। খুব জানতে ইচ্ছে করে। বুঝতে ইচ্ছে করে। খুকুটা বেজায় ছোট। তবু ওকেই একদিন ধরে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আর টিপেটুপে দেখতে হবে।..."

প্রশান্তবাবু কলম রাখলেন। ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসি। একটা আস্ত না হোক আধখানা সিগারেট খেলে ভালো লাগত। থাকগে। ইন্দিরা চেঁচামেচি করবে। এই কড়াকড়ি ক'দিন আর চলবে। পাঁচ সাত মিনিট ইজিচেয়ারে মাথা রেখে পড়ে রইলেন। এবারে ঠোঁটের ফাঁকে আগের থেকে একটু বেশি হাসি। সোজা হলেন। নোটবইয়ের পাতা উল্টে কলম নিয়ে আবার ঝুঁকে বসলেন।

"...মফঃস্বলের কলেজ নয় তো যেন স্কুল। এক ঘর ছেলে আর সাত-সাতটা মেয়ের চোখের ওপর নাম ধরে দাঁড় করিয়ে পড়া জিজ্ঞেস করা। আগের দিন কোলরিজের বাইন অফ দি এনসেন্ট মেরিনার শেষ করে আজই আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর ইয়ারো আনভিজিটেড ইয়ারো ভিজিটেড ধরে এতটা এগিয়ে যাওয়া হয়েছে সেদিকে

কাল মন যখন ছিলই না, চুপ করে না থেকে বোকার মতো কেন জবাব দিতে গেল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কাব্য-প্রকৃতির প্রশ্নের জবাবে কোলরিজের কাব্য-প্রকৃতি দিয়ে উত্তর শুরু করলে ক্লাসসুদ্ধু সকলে হেসে উঠবে না তো কি? অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেই যে ওই ত্যাঁদর প্রফেসার এই একজনকেই ধরেছে তাতে কোন ভুল নেই। সকলের সঙ্গে মেয়েদের আলাদা বেঞ্চ থেকে গায়ত্রীও নাস্তানাবুদ মুখখানার দিকে চেয়ে কম হাসছিল না—এটাই বেশি যন্ত্রণার মতো। বয়সে দু'তিন মাসের বড় আর দিদির সঙ্গে ভাব বলে গায়ত্রীরও কথাবার্তায় দিদি-দিদি ভাব। বিকেলে বাড়ি এসে কিনা বলল, এই হাঁদারাম, ক্লাসে তোমার মনটা থাকে কোথায়?...ফস করে যদি মুখের ওপর বলে বসতে পারত কোথায় থাকে? ক্লাসে বসে আয়েস করে এই গায়ত্রীর মুখখানাই তো দেখছিল।...শুধু মুখখানা? কত কিছু দেখার মধ্যে ডুবে গেলে ক্লাসে অমন ভুলের মাশুল দিতে হয়?...রং একটু কালো হলেও ওই সুঠাম ঢলেশ্বরীর পাশে অন্য মেয়েগুলো সব প্যাকাটি।...হকির নক আউট ফাইনালে নিজের দোষেই কলেজ টিমের হার হয়ে গেল। দু'দুটো সোজা গোল মিস করে বসল। বিজয়ীর কাপ হাতে গায়ত্রীকে শৌর্যের মূর্তিখানা দেখানো গেল না। .কলেজ ম্যাগাজিনে গল্পটা ছাপা হয়েছে আর গায়ত্রীও সেটা পড়েছে নিশ্চয়। নইলে বারো গজ দূরে মেয়েদের আলাদা জায়গায় বসে টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছিল আর ঠোঁট টিপে হাসছিল কেন? সুলতা সিংহ আর রঞ্জিতা বোস ক্লাস শেষ হতে বলেই গেল, 'জিত' গল্পটা দারুণ হয়েছে। না, প্রেম বা বিয়ের গপপ নয়, একটি খুব সাধারণ ছেলে শুধু হৃদয়ের আশ্চর্য প্রসাদগুণে কেমন করে এক অহংকারী মেয়ের চোখে অসাধারণ হয়ে উঠল— সেই গল্প। বিকেলে গায়ত্রী বাড়ি এলো। ওর সামনেই হেসে হেসে দিদিকে বলল, তোমার ভাই এচড়ে পেকে গেছে বমাদি, মেয়ে কাকে বলে জানে না, মেয়ে নিয়ে গপপ লেখা শুরু করেছে। ...ক্লাসে গায়ত্রীর সেই চাউনি আর টিপটিপ হাসি দেখেই ভিতরটা কেমন গরম গরম লাগছিল। এই কথা আর এই হাসির পর একটা উষ্ণ বাষ্প ভেতরে সেদোচ্ছে। রাতে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত ওই কথা আর ওই হাসি একটা স্পর্শ হয়ে এক অব্যক্ত যন্ত্রণার আগল ভেঙে চলেছে। কত জানে গায়ত্রী যদি জানত। বুক আর দুটো হাতের চাপে পাশবালিশটার দফা প্রায় রফা। কিন্তু ওটা কি পাশবালিশ নাকি?..বাত দুটো। আর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ক্লাবের ওরা চুপিসাড়ে এসে জানলায় একবার টর্চ ফেলবে। ফেলল। বালিশের তলা থেকে নিজের টর্চ বার করে একবার জ্বেলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে পাঁচিল টপকে রাস্তায়। ভূতুড়ে অন্ধকারে সকলে মিলে সোজা আড্ডা-বাগানে। গা ছমছম করছে। গোটা বাগানটাই কোনো এক কালের কবরে ছাওয়া। নিজেদেরই পায়ের খসখস শব্দ, অথচ মনে হচ্ছে অশরীরীরা যেন আপত্তি জানাচ্ছে। ছেলেবেলার সেই ঘাড়-গোঁজা থ্যাবড়া মোটা কলের মতো ভূতগুলো অন্ধকারের শরীর ধরে আশপাশে ঘুরঘুর করছে। ধ্যেৎ। এতগুলো জোয়ান ছেলে একসঙ্গে, ভূতের নিকুচি করেছে। একজন টর্চের আলো ফেলতে সামনেই ওই মস্ত লম্বা লোহার বীমটা দেখা গেল। মণ পনেরু ওজন হবে ভেবেছিল। আঠেরো জনে মিলে হিমসিম খেয়ে ওটা কাঁধে তুলতে মনে হল বিশ মণের কম হবে না। আধমাইল পথ

ভেঙে রাতের অন্ধকারে লোহার বীমটা ক্লাবঘরের পিছনে এনে ফেলতে সকলের কালঘাম ছোটার দাখিল। কাজ সেরে আবার যে-যার বাড়ি। বিছানা। কালই ওই লোহার বীমটা ঠেলায় করে গণেশ সাহার দোকনে চলে যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখন ঘরের দোরে। লোহালক্করের আগুন দাম। পনের যোল মণ ওজন ধরেই গণেশ সাহা অনেক টাকা কবুল করেছে। সেই টাকায় ক্লাবের ব্যায়ামের সরঞ্জাম আসবে। নিজের সেই স্বাস্থ্যশ্রী বিছানায় শুয়ে চোখ চেয়েই কল্পনা করতে পারছে। দেখতে পাচ্ছে। গায়ত্রীও। তার মুগ্ধ চোখে পলক পড়ে না। আঃ, কেলো হারামজাদা আজ আবার পাশবালিশটা দিতে ভুলেছে। কাল ওর মাথাটা ভাঙবে। টর্চ জ্বেলে পাশবালিশটা নিয়ে আসতে হল। তারপর ওই মেয়ের আর কত তফাতে থাকবে সাধ্যি?...কত রোগের কত ওষুধ বেরুচ্ছে, টাইফয়েডের ওষুধ এখনো নেই কেন? এখন পর্যন্ত কেবল কাজ ভরসা আর সেবা ভরসা কেন? তাহলেও এই সেবাটুকুর ভার কেবল একজন পেলেই গায়ত্রী ম্যাজিকের মতো সেরে উঠতে পারে। কল্পনায় সেবার ভার নেবার সঙ্গে সঙ্গে দেখছে গায়ত্রী সেরে উঠছে।...এ কি হল। এনসেস্ট মেরিনারের নাবিকরা পাপ করেছে। তাদের সামনে মঙ্গলের দূত গুলিবিদ্ধ বিশাল অ্যালবেট্রস পাখিটা মরে পড়ে আছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুর্যোগে নাবিকেরা সব পাগল। তারা হিংসা ভুলে আকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকছে। শান্তির অনুভূতি ফিরে আসছে।.. করবের শান্তি ভঙ্গ করা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ অশরীরীরা সব মশারির বাইরে অন্ধকারে ঘুরঘুর করছে। তারা প্রতিশোধ নেবে।...একজনের লোভের পাপ, বাসনার পাপ গায়ত্রীকে স্পর্শ করেছে। গায়ত্রী চরম প্রতিশোধ নিল। গায়ত্রী শ্মশানের আগুনে নিজেকে শুচিসুদ্ধ করে নিল। আরামের শয্যায় শুয়ে ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে এই একজনের। ওই নাবিকদের মতো আকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে চেষ্টা করছে। মা—মাগো। ভোররাতে দু'চোখে ঘুম নামল। মনে হল বালিশে নয়, মায়ের কোলে শুয়ে আছি।... ... ..."

নোটবই আর কলম বন্ধ করে প্রশান্তবাবু আরাম ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন। ভিতরটা বেশ হালকা লাগছে। আরো মিনিট দশেক বাদে ইন্দিরা ফিরলেন। টুলে নোটবই আর কলম দেখে আঁতকে উঠলেন। —এইজন্যেই তো আমি বেরুতে চাই না, এরই মধ্যে নোটবই আর কলম নিয়ে তুমি লেখার ছক কাটতে বসে গেলে? ঘুরে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা ঝাঁঝালো গলায় ডেকে উঠলেন, মহেশ।

সন্ত্রস্ত মহেশ তক্ষুনি হাজির। ইন্দিরা কিছু বলার আগেই প্রশান্তবাবু আদেশ দিলেন, দরকার নেই, যা—

মহেশ সরে যেতে হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, মহেশও আমার ওপরে গার্জেনগিরি করতে পারেনি কেন সেই কৈফিয়ত তলব করতে যাচ্ছিলেন?

ইন্দিরা মনে মনে অপ্রস্তুত একটু। ফলে জবাবের ঝাঁঝ আরো বেশি।—তুমিই বা এমন অবুঝপনা করবে কেন—এখন তোমার লেখার প্লট ঠিক করার সময়?

কালো নোটবই মানেই লেখার প্লটের নক্সা বা খসড়া ভাবেন। জবাব না দিয়ে প্রশান্ত মিত্র গম্ভীর মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ডাকলেন, এসো—

ফোনটা যে ঘরে সরানো হয়েছে সেই ঘরে চলেলেন। ইন্দিরা পিছনে। দ্রুত এগিয়ে হাত ধরতে পারলেন না। হঠাৎ কি হল ভেবে পেলেন না। স্বামীর এই গোছের গাম্ভীর্যকে একটু সমীহ করেন।

ঘরে ঢুকে প্রশান্তবাবু ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। ডায়েল করলেন। ইন্দিরা এখনো কিছু না বুঝে চেয়ে আছেন। একটু বাদেই স্বামীর কথা থেকে বুঝলেন, কাকে ফোন করা হল এবং লাইনের ও-ধারে কে। হার্ট স্পেশালিস্ট, যিনি গত একমাসের মধ্যে অনেক দিন বাড়ি এসে রোগী দেখে গেছেন।

সাড়া পেয়েই প্রশান্তবাবু বললেন, আমার স্ত্রীর আমার বিরুদ্ধে ভীষণ নালিশ আছে।...তাঁর মুখেই শুনে আপনার যা বলার ওঁকে বলুন —আমার মনে হচ্ছে একমাসেরও পরে এমন কড়াকড়ি চললে আবার আমাকে বিছানা নিতে হবে। ধরুন—

রিসিভারটা ইন্দিরার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর বিড়ম্বিত মুখখানা মিষ্টি লাগছে। অপেক্ষা না করে গম্ভীর মুখেই প্রশান্তবাবু ঘর থেকে নিজের শোবার ঘরে চলে এলেন।

মিনিট পাঁচেক বাদে ইন্দিরা এলেন। অনুযোগের সুরে বললেন, তুমি ডাক্তারকে ঘুষ-টুষ খাইয়ে রেখেছিলে নাকি?

প্রশান্তবাবু শব্দ করেই হেসে উঠলেন। নালিশের জবাবে স্পেশালিস্ট ডাক্তার কি বলে থাকতে পারেন এই থেকেই বোঝা গেল।

ইন্দিরা এবারে উৎসুক একটু।—তা এতবড় অসুখ থেকে উঠেই হঠাৎ কি প্লট মাথায় এল তোমার?

ভিতরে ভিতরে একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেলেও প্রশান্তবাবু নির্লিপ্ত জবাব দিলেন, নোটবইটা খুলে নিজেই দেখো কি প্লট।

পাছে সত্যি ওটা খোলে সেই জন্যেই বলা। কাজ হল। ইন্দিরা বললেন, আ-হা, তোমার ওই নক্সা আর আঁকিবুকি দেখে কি বুঝব। শুনিই না কি প্লট, এই অসুখ নিয়ে কিছু না তো?

প্রশান্তবাবু হাসি মুখেই মাথা নাড়লেন। এ-সব কিছু না।

পরদিন। বিকেলে আগের দিনের মতোই প্রশান্তবাবু বারান্দার ইজিচেয়ারে বসেছেন। কাঠের টুলের ওপর নোটবই কলম। ইন্দিরা আজ এ নিয়ে কোনো আপত্তি তোলেননি। বড় ডাক্তার কাল বলেছেন, একটু একটু করে নিজের কাজের মধ্যে ফিরে আসতে চাওয়াটাই সব থেকে সুস্থতার লক্ষণ। পাশের মোড়ায় বসে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন। তারপর স্বামীর বিমনা ভাব লক্ষ্য করে উঠে গেছেন। নতুন কিছু সৃষ্টির আগের এই তন্ময়তা খুব ভালো চেনেন।

প্রশান্ত মিত্র সত্যিই বিমনা আর তন্ময় হয়ে পড়েছেন কোনো সৃষ্টির তাগিদে নয়। মগজের মধ্যে সেই হিজিবিজি ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেছে। চিন্তার এলোমেলো মিছিল সচল অবাক ছবির মতো সার বেঁধে চলেছে। তারই ভিতর থেকে চোখের সামনে একখানা মুখ ধরে রাখার চেষ্টা। তারই ভিতরের আর একখানা মুখ।

খুব স্পষ্ট করে ধরা গেল। প্রশান্তবাবুর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির টুকরো। নোটবই খুলে কলম নিয়ে ঝুঁকলেন।

"...তাড়াতাড়ি দাড়ি কাটতে গিয়ে গাল কেটে গেল। কাটুক। গলাটাই কাটতে ইচ্ছে করছে। নাকেমুখে গুঁজে এক্ষুনি দশটা-পাঁচটার অফিসে ছোটো। চাকরি না তো ফাঁসির দড়ি। ভাবতে গেলে কান্না পায়। পায়ের তলায় মাটি সরে সরে যায়। গলা বুক শুকিয়ে আসে। দু'চোখ সত্যি সত্যি জলে ভরে যায়। রাগে নিজের ওপরেই হিংস্র কিছু করে বসতে ইচ্ছে করে। সকলের অগোচরে বাথরুমে ছুটে যেতে হয়। চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে আসতে হয়। তারপর চোখ মুখ মুছে পাউডার বুলিয়ে নিলেই সক্কলের চোখে সপ্রতিভ স্মার্ট। ...যে কাণ্ড এ পর্যন্ত অনেকবার ঘটে গেছে আবারও সেই কাণ্ড। সেকশন অফিসারের সঙ্গে সামান্য কারণে কথা-কাটাকাটি, তারপরেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সোজা রাস্তায়। মুক্তির স্বাদ। তারই সঙ্গে অনিশ্চয়তার আতঙ্ক। মুক্তির স্বাদ থেকে দিনে দিনে আতঙ্কটাই বড় হয়ে উঠছে। শুভার্থীজনেদের উপদেশ শ্লেষের মতো কানে বেঁধে। লিখে আবার এ-দেশের মানুষ খেতে পরতে পায়। নিজের চেষ্টায় আর রোজগারের সর্বস্ব খুইয়ে এ-পর্যন্ত চার-চারটে উপন্যাস ছাপা হয়েছে কিন্তু এতটুকু আলোর হদিস কোথাও নেই। কেউ চেনে না। কেউ জানে না। পাবলিশারের কাছে খোঁজ নিতে গেলেও মুখঝামটা খেতে হয়—বই বিক্রি হয় নি। হলেও হিসের চাইলে আবার মুখঝামটা। মাসিকে সাপ্তাহিকে লেখা পাঠালে অবধারিত ফেরত। পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকের দরজায় ধর্না দিলেও কেউ উল্টে দেখতে চায় না। সম্মানবোধ প্রখর, অথচ সর্বদা মাথা নিচু। আত্মীয়-পরিজনের করুণার পাত্র। ...নির্জন দুপুরে ছাতে উঠেছে। তারপর সভয়ে সরে গেছে। নিচের দিকে তাকাতে কে যেন মন্ত্রণা দিচ্ছিল, ইচ্ছে করলে এক্ষুণি সব যন্ত্রণার শেষ হতে পারে।...মায়ের ঠাকুরঘর। ভিতরে ঢুকে নিঃশব্দে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল। তারপর মায়ের পটের সামনে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। মা-গো শুধু এই দাও, যেন কোনদিন কারো গলগ্রহ হতে না হয়।...মা কি শুনল? নইলে দু'মাস না যেতে হঠাৎ অমন যোগাযোগ কেন? যেখানে ফিচার লিখে ভিক্ষের মতো পাঁচিশ তিরিশ টাকা করে হাত পেতে নিতে হত, সেখান থেকেই গল্প লেখার আমন্ত্রণ পেল কেন—গল্পের পরে উপন্যাস লেখার ফরমাস!...সেই থেকে বৃত্তবদল। বাজারে ফি বছর দু'তিনটে করে উপন্যাসের জমজমাট বিক্রি। ক'টা উপন্যাস সিনেমায় পরপর হীট। প্রকাশকরা যেচে আসছে। ছবির প্রযোজকরা খাতির করছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছেও খাতির কদর বেড়ে চলেছে।...সুরমা সরকারের ফোন। খিলখিল হাসি। আপনি প্রোডিউসারের কাছে আপনার গল্পের নায়িকা হিসাবে আমার নাম সাজেস্ট করেছেন শুনলাম, অনেক ধন্যবাদ। মঞ্জুশ্রী গুপ্তর সামনাসামনি অভিমান, কিছু বলছেন না মানেই আমার অভিনয় আপনার ভালো লাগেনি। এই শটটা আর একবার নিয়ে দেখব?...রাতের শয্যায় কল্পনার পথ ধরে ওই দুই অভিনেত্রীকেই চোখের সামনে দেখা যায়। কখনো সুরমা সরকার। কখনো মঞ্জুশ্রী গুপ্ত। ভেতরটা লালায়িত হয়ে ওঠে। হাত দুটো পাশবালিশের ওপর নিশপিশ করে। ইচ্ছে করলেই কল্পনায় ওদের খুব কাছে টেনে আনা যায়। তারপরেই

হাতের ধাক্কায় পাশবালিশটা ছিটকে মাটিতে পড়ল। আবার ? আবার পাপ ? গায়ত্রীকে মনে নেই ? গায়ত্রী কি-ভাবে শুচিশুদ্ধ হল মনে নেই ?...সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে ইন্দিরার ওপর। ওধারে ঘুমে বিভোর হয়ে লতিয়ে পড়ে আছে। ও জেগে থাকলে তো এরকমটা হয় না। ভালো যাকে বাসে সে ইন্দিরা ছাড়া আর কে ? ফের মিথ্যে ? অন্তত নির্জলা সত্যি কি ?...ইন্দিরা যখন তোমার বুকে মাথা গুঁজে ঘুমোয় তখনো কি এক-একসময় ওই রমণী-দেহকে কেন্দ্র করে সিনেমার অভিনেত্রী ছেড়ে তোমার বইয়ের নায়িকারা পর্যন্ত কেউ কেউ ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসে হাজির হয় না ?...

প্রশান্ত মিত্র নোটবই বন্ধ করলেন। কলমও। সিগারেট না খেয়ে পারা যাচ্ছে না। হাঁক দিলেন, মহেশ।

মহেশ এলো।

—তোর মা কোথায় ?

—এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছেন।

—চলে গেলে ডেকে দিস।

সাত আট মিনিটের মধ্যে ইন্দিরা এলেন। —ডাকছিলে ?

—হ্যাঁ। বড় তেষ্টা।

—সে কি। ইন্দিরা সচকিত। —মহেশ কোথায়, এক গেলাস জলও দিতে পারেনি ?

—জলের তেষ্টা নয়। সিগারেটের।

ইন্দিরা থমকে দাঁড়ালেন। চোখে চোখ।—আজ এরই মধ্যে একটা বেশি খেয়েছ না ?

মুখ কাঁচুমাচু প্রশান্তবাবুর।—তাহলে অন্তত আধখানা...

ইন্দিরা হেসে ফেললেন।—কি যে করো না তুমি! সত্যি আধখানা কেটে আনছি।

দু' মিনিটের মধ্যে ফিরলেন। হাতে আধখানা সিগারেট আর দেশলাই।

প্রশান্তবাবু সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বড় টান দিলেন। ইন্দিরা মোড়া টেনে বসলেন।

—কে এসেছিল ?

—'এই বাংলা'র সম্পাদক সঞ্জয় ঘোষ। তোমার শরীরের খবর নিচ্ছিলেন, কিন্তু আসল মতলব করে থেকে তোমাকে লেখানো যাবে জানা। ওঠার আগে বলেই গেলেন, এবারে প্রথম যে লেখাটি ধরবে সেটা তাঁর—তোমাকে যেন বলে রাখি।

আধখানা সিগারেট আর দু'তিন টানে ফুরিয়ে এলো। ইন্দিরা বললেন, তার খানিক আগে তোমাদের প্রোডিউসার বিজন চাকলাদার ফোন করেছিলেন, তোমার কি গল্প নিয়ে জরুরী আলোচনা দরকার। আমি বলে দিয়েছি সামনের সপ্তাহের আগে হবে না—তাও কেমন থাকো না থাকো ফোন করে আগে জেনে নিতে।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে প্রশান্তবাবু বললেন, আসতে বললেই পারতে, টাকাও তো দরকার।

—থাক। যা আছে ওই দুটোর উচ্ছন্নে যাবার মতো যথেষ্ট। নিজের বিশ্রামের কথা ভাবো।

প্রশান্তবাবু হাসলেন।—ওদের ওপব তোমার এত রাগ কেন? সুশান্ত চাকরি কববে কি করে, চাকরিব নামেই আমার তো হৃৎকম্প হত। আর অনীতা তো বলেই দিয়েছে এম. এ পাশ কবাব পর বিয়ের কথা।

ইন্দিরা অখুশি মুখ কবে জবাব দিলেন, জানি না বাপু, কারো মতিগতি বুঝি না।

ক'টা দিন ভেতরটা বেশ হালকা লাগছিল প্রশান্তবাবুর। মনের বিজ্ঞানীবা বলেন, নিজের ভেতর দেখা গেলে অনেক দুর্বোধ্য বা অগোচরেব জট খুলে যায়, স্নায়ু শিথিল হয়, বশেও থাকে। প্রশান্তবাবুর সদ্য অনুভূতিও অনেকটা সেই গোছেব। কিন্তু পরের ছ'সাত দিন আব ওই নোটবই খুলে বসাব অবকাশ পেলেন না। ছেলেমেযে আর সপরিবাবে শ্যালক এসেছে দিল্লি থেকে। ভগ্নিপতিব অসুস্থতার খবর পাওযার পব থেকেই আসতে চেষ্টা কবছিল।

ছ'দিন বাদে তাবা চলে যাবাব পব এতবড বাড়ি আবার খালি। বিকেলেব দিকে ইন্দিবা কি কাজ সাবতে বেরিযেছেন। ছেলেমেযেও বাড়ি নেই। প্রশান্তবাবু বাবান্দায ইজিচেযাবে। সামনেব কাঠেব টুলে সেই মোটা বাঁধানো নোটবই আব কলম। ওটা খুলে বসাব জন্য ভেতবটা অনেকক্ষণ ধবে লালাযিত হযে উঠেছিল। এই রকম নিবিবিলি ফুরসতেব অপেক্ষাতেই ছিলেন। ভিতবেব যে মানুষটা ওই হিজিবিজি চিন্তাব মিছিলেব নাযক, আযনায দেখাব মতো তাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাবণ প্রশান্তবাবুর মতো সেও এক পরিণতিব মোহনাব দিকে পা বাড়িযেছে। তফাৎ শুধু, তার সত্তা সকলের দেখা সকলেব জানা প্রশান্ত মিত্রব থেকে ববাববকাব মতো আজও বিচ্ছিন্ন। নোটবই খুলে প্রশান্তবাবু কলম নিয়ে ঝুঁকলেন।

"...হবে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হবে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হবে হবে।" কতক্ষণ আব কতটা এমনি নামের আশ্রযে একাগ্র হতে পাবলে ভিতবটাকে নিরাসক্ত নির্লিপ্ত কবা যায? হবে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ...। টেলিফোন।...হ্যালো। হ্যাঁ বুঝেছি। শুনুন জীবনবাবু, বই পেযেছি। শুনে দেখেছি সমস্ত বইয়ে তিরিশটা ছাপার ভুল। আব আপনাকে বই দেব কিনা ভাবতে হবে। আপনাব পাবলিসিটিও আমার খুব পছন্দ হচ্ছে না। যাক, পুবো তিন এডিশনেব টাকা পাঠিযে দিন। আচ্ছা।...হবে বাম হবে বাম...বই লেখাটা নেশা না টাকা বোজগাব নেশা? একটাব সঙ্গে আর একটা। তফাৎ কবা যায না। যেমন গোলাপ আর তাব গন্ধ। তফাৎ কবা যায না। এই পৃথিবীতে আসা কেন? গাদা গাদা বই লিখতে? আব টাকা বোজগাব কবতে? ঠিক আছে, অনেক বই অঢেল টাকা—তাবপব কি? তারপবে কিছু না থাকলে ভিতরটা আশ্রয খোঁজে কেন? সেটা কেমন আশ্রয? তাব ঠিকানা কি? "হবে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...।" টেলিফোন। হ্যালো...না, অনীতা বাড়ি নেই। জানি না। জানি না। ...মেয়েটার চালচলন আবার অন্যরকম ঠেকছে। আবার কাব সঙ্গে গিয়ে ভিড়ল কে জানে? প্রায়ই এই গলাব ফোন আসে। একবাব ঘা খেয়েও মেয়েটার শিক্ষা হযনি। বিকেলে বেরোয় বাত করে ফেবে। খুব বুদ্ধিমতী ভাবে নিজেকে। সকালের কাগজ খুলেই অঘটনেব ছড়াছাড়ি। সেভাবে কাগজ পড়ে না, সাবধান হওয়ার দরকাবও ভাবে

না। অঘটনের বরাত যেন সব সময়েই অন্যদের, ওদেব নয়!...শুধু মেয়ে কেন, ছেলেটাও কোন্ রাস্তায় হাঁটছে ঠিক নেই। মেযেদেব ফোন তো লেগেই আছে। বাপ প্রেমের গপ্প লেখে আর বাপেব পয়সায় খেয়ে ছেলে প্রেম করে। মা সে-ভাবে বেঁকে না বসলে একবার তো কোন যাত্রাপার্টির মেয়ে এনে ঘরে ঢুকিয়েছিল প্রায়। যাকগে, ভেবে কি হবে? যার যেমন অদৃষ্ট। "হবে কৃষ্ণ হবে রাম, রাম রাম...।" টেলিফোন। হ্যা-লো।...হ্যাঁ শর্মাজী বলুন। ছবি সুপারহীট শুনেছি। থ্যাঙ্ক ইউ, কিন্তু গল্পেব পিছনে আপনি এভাবে লেগেছিলেন বলেই এতটা সাকসেস।...কোন্ গল্পটা? ও হ্যাঁ...না এখনো কনট্রাক্ট হয়নি, ফ্রী আছে। বেশ তো, কিন্তু এতবড সাকসেসের পব নতুন গল্পে লেখকও একটু বাড়তি মর্যাদাব আশা বাখে—হাঃ হাঃ হাঃ।...বাংলাব সঙ্গে হিন্দীও কনট্রাক্ট হবে? ওযাণ্ডাবফুল। ঠিক আছে, একটা দিন দেখে সকালের দিকে চলে আসুন, নমস্কাব নমস্কাব।...বাংলা হিন্দী একসঙ্গে কনট্রাক্ট মানে খুব কম হলেও পঞ্চাশ হাজাব টাকা। সাদা কালো আদাআধি। বাবান্দায দাঁড়িযে দক্ষিণেব বাতাসটুকু বেশ মিষ্টি লাগছে। বাঃ, ভারী সুন্দর দেখতে তো মেযেটা। ফর্সা লম্বা সুঠাম স্বাস্থ্য। মেযেটা নয়, কাবো ঘবেব বউ হবে। বাস্তাব অনেক জোডা চোখ টেনে হেসে হেসে আব এক মেযেব সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছে।...ধেৎ! সুন্দর মেযে মিষ্টি মেযে দেখতে সকলেবই ভালো লাগে—ভালো কথা। কিন্তু তিবিশ বছর আগেব চোখ দিযে দেখা কেন? ছিঃ! "হবে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হবে বাম হবে বাম, বাম বাম হবে হবে।..."

পবদিন সকালে বেশ হাসি-হাসি মুখে ইন্দিবা ঘবে ঢুকলেন। তাঁর হাতে একখানা 'এই বাংলা' মাসিকপত্র। কাছে এসে ওটা খুলে প্রশান্তবাবুর সামনে ধবলেন। তাতে ছবিসহ অনন্য লেখক প্রশান্ত মিত্রর দ্রুত আরোগ্য-সংবাদ। ফাঁকে ফাঁকে তাঁর প্রতিভাব প্রশস্তি। বিশেষ করে তাঁর চরিত্রচিত্রণ আব বিশ্লেষণ ক্ষমতাব ঢালাও প্রশংসা।

হাসিমুখে 'এই বাংলা' ইন্দিবাকে ফেবত দেওয়াব সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তবাবুর কি মনে হল। চট করে উঠে কালো নোটবই আর কলমটা নিযে পাশেব লেখাব ঘবে চলে গেলেন। ওতে কিছু লিখে আবাব চাব পাঁচ মিনিটেব মধ্যে ফিবে এলেন।

ইন্দিবা অবাক একটু।—কি হল, এই থেকেই আবাব নতুন কিছু প্লট মাথায এসে গেল নাকি!

প্রশান্ত মিত্রব ঠোঁটেব হাসিটুকু বহস্যের মতো। নোটবই যথাস্থানে অর্থাৎ ডেস্কে রাখতে বাখতে জবাব দিলেন, ওই তেলেব প্লট নিযে গপপ তো কত বারই লেখা হয়ে গেছে!

দিন কুডি বাদে নীল আকাশ থেকে আচমকা বাজ পড়াব মতোই ঘটে গেল ব্যাপাবটা। লেখক প্রশান্ত মিত্র চিকিৎসার চার ঘণ্টাও সময় দিলেন না। ডাক্তাবরা বললেন, ম্যাসিভ স্ট্রোক। বাংলা সাহিত্য জগতে নিখাদ শোকেব ছায়া নেমে এলো। প্রশান্ত মিত্র নেই।

দিন যায়। একটা মাস গড়ালো। শোকের স্তব্ধতা থেকে ইন্দিরাকেও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে হল। এই নিয়ম।

ক'দিন ধবে টেলিভিশনেব লোক এসে এসে ঘুরে যাচ্ছে। তাদের প্রস্তাব, প্রয়াত অনন্য লেখকেব সাহিত্যজীবন আর ঘরের জীবন নিয়ে স্বয়ং ইন্দিরা মিত্র একটা প্রোগ্রাম করুন। এই প্রোগ্রাম শত সহস্র দর্শক শ্রোতার কাছে পরম সমাদবের জিনিস হবে।

কিন্তু গোড়ায় গোডায ইন্দিরা টিভিব লোকের সঙ্গে দেখাই কবেন নি। ছেলেমেযে অনুরোধ কবেও ফিরে গেছে। আজ আবাব এসেছে। সুশান্ত অনীতা দু'জনেই তাগিদ দিচ্ছে, নিচে এসে ভদ্রলোকেব সঙ্গে একটু আলাপ করো না মা, এই নিযে তিন দিন এলেন।

—বসতে বল।

ইন্দিবা উঠলেন। পরনেব শাডিটা খুব পবিষ্কার নয়। বদলালেন। সেই মুহূর্তে স্বামীর সেই নোটবইটাব কথা মনে হল তাঁব। চবিত্রচিত্রণের প্রসঙ্গে কি-ভাবে নক্সা কেটে স্বামী কি কবতেন, দেখাবেন।

বাব কবলেন। শেষের দিকেব ক'টা দিন কি আঁকিবুকি করেছেন দেখার জন্য ওটা খুললেন। তারপবেই অবাক একটু। আঁকিবুকি নয, লেখা। বিছানায বসে পডতে লাগলেন। যত পডছেন ততো গম্ভীব।

একেবাবে শেষেব কটা লাইন—ওপবে তাবিখ দেওয়া। "...মানুষের চরিত্র নিযে সমস্ত লেখক জীবন ধরে যে এ-ভাবে ভাঁওতাবাজী করে গেলাম, নিজেই জানতাম না। যে লোক নিজের চরিত্রেব ঠিকানা জানে না, হদিস জানে না, সেই লোক অনন্য চবিত্রস্রষ্টা—এব থেকে হাসিব ব্যাপার আব কি হতে পারে!"

ইন্দিরা নিষ্প্রাণ স্তব্ধ মূর্তিব মতো বসে আছেন। ছেলে আবার তাগিদ দিতে এলো, মা এলে না?

—না, চলে যেতে বল।

মায়ের এই মুখ দেখে আব তাঁব হাতে এবার কালো নোটবই দেখে ছেলে স্মৃতির শোক ভাবল। বলল, তাহলে আব এক দিন আসতে বলি?

—কোন দিন না। আমাব দ্বাবা এ-সব হবে না বলে দে।

নোটবইটা হাতে নিয়ে ইন্দিরাই আগে ঘব ছেড়ে চলে গেলেন।

সহাবস্থান

মস্ত বাড়ি, দু'তিনখানা ঝকঝকে গাড়ি আর টাকাপয়সার ছড়াছড়ি—কিন্তু এমন পরিবারেও কি ঝগড়া-ঝাঁটি, খিটির-মিটির লেগেই থাকে না? অথচ স্বভাবে দু'জনের একজনেও ঝগড়াটে নয়?

প্রশ্নটা আমাকে করেছিল বোম্বাইয়ের মাস্টার সাহেব।

বোম্বাইযেব মাস্টাব সাহেব বলতে সেখানকাব লোক নয। বাঙালী। পঁচিশ বছব বয়সে ভাগ্য ফেবানোব চেষ্টায বম্বে চলে গেছল। বেশ শক্তসমর্থ পুরুষেব চেহাবা ছিল তখন। বি-এ পাশ। বাপ দাদা কেবানী। ফলে কেবানীগিবিব ওপব ঘেন্না। কলকাতাব সিনেমা এলাকায কিছুকাল ঘোবাঘুবি কবেছে। আব এদিকে এক চৌকস হিন্দুস্থানী শিক্ষকেব কাছ থেকে বেশ মন দিযে হিন্দী শিখেছে। তাব জন্য পযসা খবচ কবতে হযনি। তাব আগ্রহ দেখে ভদ্রলোক নিজেই যত্ন কবে শিখিযেছে। হিন্দীব দু'দুটো ডিপ্লোমা পবীক্ষাযও ভালো পাশেব সার্টিফিকেট তাব ছাত্রেব পকেটে এসেছে। মোট কথা, কলকাতায সুবিধে হল না দেখে মাস্টাব সাহেব (তখন নাম অমব ঘোষ) যখন বোম্বাই পাড়ি দিযেছিল, তখন সে টগবগ কবে হিন্দী বলতে পাবে, ইংবেজী বলতে পাবে —বাংলা তো পাবেই।

কিন্তু অর্থভাগ্যটা কোনদিনই তাব সুবিধেব নয। বোম্বাইযেব ছবিব বাজাবে তখন বাজপুত্র মার্কা হিবোব কদব। অনেক কষ্টেও ভদ্রলোক পাত্তাই পেল না। ছোটখাটো বোলে কিছু চান্স পেযেছিল। কিন্তু সেখানে তৃতীয-চতুর্থ সাবিব আর্টিস্টদেব কোন অস্তিত্বই নেই। নাযক-নাযিকা ছেড়ে টেকনিসিযানদেবও তাবা করুণাব পাত্র। কিন্তু একজন মাঝাবি প্রোডিউসাবেব চোখে তাব যে গুণটি ধবা পড়েছিল সেটা অভিনয নয। সেই প্রযোজকটিব নাম অজিত ববিসকব। তাব একটি বুদ্ধিমান কর্মঠ বিশ্বস্ত লোকেব দবকাব ছিল। সে সোজাসুজি তাকে বলেছিল, অভিনয-টভিনয কোনোদিন তোমাব দ্বাবা হবে না। আমাব এদিকেব হিসেবপত্র বাখা, আব বাড়িতে তিনটি ছেলেকে পড়ানোব জন্য একজন ভালো লোক দবকাব। এ-জন্য মাস গেলে আমি তোমাকে তিনশো টাকা মাইনে দেব। থাকাব জন্য আমাব বাড়িতেই আলাদা ঘব পাবে—বিনে পযসায খাওযা-দাওযাও পাবে। সকালে ছেলে পড়াবে, দুপুবে স্টুডিওতে এসে আমাব কাজকর্ম দেখবে। ছোটখাটো এক-আধটা বোল যদি পাও কববে—সেটা তোমাব বাড়তি বোজগাব।

মাস্টাব সাহেব অর্থাৎ অমব ঘোষ এককথায বাজি হযে গেছল। তাব তখন বীতিমতো দৈন্যদশা চলেছে। যত্রতত্র খাওযা আব যত্রতত্র শোওযা। আশা কবেছিল ববিসকব সাহেবেব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকতে পেলে একদিন তাব অভিনযেবও কদব হবে। তা আব হল না। সেই থেকে সে মাস্টাব সাহেব। ছোট ভূমিকায অভিনযে নামলেও পর্দায নাম লেখা থাকে মাস্টাব সাহেব। এতদিনে নিজেব নাম নিজেই সে ভুলতে বসেছে, কাবণ নাম বললে চেনা মহল বা স্টুডিও মহলেব কেউ তাকে চিনবে না।

বযেস এখন পঞ্চাশেব কাছাকাছি। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। ফর্সা কোনদিন ছিল না, গাযেব বঙে এখন আবো পোড খেযেছে। তবে এখনো সুশ্রী, আব বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। নিজেব ভাগ্য নিযে আব কোন আক্ষেপ নেই। ববং বেশ হাসিমুখে কৌতুকবসে জাবিযে নিজেব দুর্ভাগ্যেব গল্প করতে পাবে। এখন এক স্টুডিও এলাকাতেই নামমাত্র ভাড়ায একখানা ঘব নিযে আছে। সেই স্টুডিওব খাতাপত্র দেখাব চাকবি করে, মাইনে সর্বসাকুল্যে চাবশো। বোম্বাই শহবে এ-টাকায মাস চালাতে হলে প্রতিটি পযসাব হিসেব বেখে চলতে হয। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ বেজাব মুখ দেখে না তাব।

এই বয়সেও এত কম মাইনে। তার কারণ আছে। স্টুডিওর এই চাকরি খুব বেশি দিনের নয় তার। মাত্র দেড়-দু' বছরের। তাও আগে চেনা-জানা ছিল বলে স্টুডিওর মালিকরা দয়া করে তাকে এই কাজটুকু দিয়েছে। চাপাচাপি করলে মাইনে আরো কিছু বাড়তে পারে, কিন্তু মাস্টার সাহেব তা করে না। দিব্যি চলে যাচ্ছে। নিজে বেঁধে খায়, আর নেশার মধ্যে শুধু বিড়ির খরচ।

এখানকার চাকরির আগে মোটামুটি ভালভাবেই দিন কেটেছে তার। টানা বারো-তেরো বছর অজিত রবিসকরের কাছে বাড়ির লোকের মতোই ছিল। সেই ভদ্রলোকের ছোট ছেলেটাও সেকেণ্ডারি পাশ করে বেরিয়ে যাবার পর মাস্টার সাহেবের ডাক পড়েছে তার বড় মেয়ের বাড়িতে। বড় মেয়ের নাম শীলা। বিয়ের পর তিড়কে হয়েছে। মাস্টার সাহেব যখন রবিসকর বাড়ির বাসিন্দা, শীলার বয়েস তখন উনিশ-কুড়ি। আরো বছর দেড়েক বাদে দিলীপ তিড়কের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের পৈতৃক ব্যবসা। শীলাদের থেকেও বড় অবস্থা। মেয়ে পছন্দ হতেই তুলে নিয়ে গেছে। পছন্দ হবার মতো মেয়ে তো বটেই। কলেজে পড়ে, চেহারাপত্রের চটক খুব, কালো চোখের শরে পুরুষ ঘায়েল করার কেরামতি রাখে। বিয়ে হবে না কেন! বিয়ের একমাস বাদে দিলীপ তিড়কে লণ্ডন চলে গেছল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে। বছর দুই বাদে ধৈর্য খুইয়ে চলে এসেছে। শীলা ততদিনে এক ছেলের মা। বিয়ের ন'মাসের মধ্যেই তার ছেলে হয়েছে। ছেলের অন্নপ্রাশনের উৎসবে দিলীপ তিড়কে সাত দিনের জন্য এরোপ্লেনে চেপে চলে এসেছিল। ধুমধামের পর আবার ফিরে গেছে।

যাই হোক, দিলীপ তিড়কে ফিরে আসার দশ-বারো বছরের মধ্যে শীলার আরো দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে হয়েছে। তার বছর কয়েকের মধ্যে শীলার ছোটভাইয়ের পড়া সাঙ্গ হতে বাপের কাছে আব্দার জানিয়ে মাস্টার সাহেবকে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছে। আর ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ভার তার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। শিক্ষক হিসেবে মাস্টার সাহেবের গুণ কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কারণ শীলার তিন-তিনটি সাদা-মাটা ভাই-ই দিব্যি ভালো রেজাল্ট করে বেরিয়ে এসেছে।

তিড়কের বাড়ি এসে মাস্টার সাহেবের দিন আরো ভালো কেটেছে। বাড়ির কর্ত্রী অর্থাৎ শীলা যাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে, অন্যেরাও তাকে কিছুটা সমীহ করে চলবে বইকি। তার ওপর দিলীপ তিড়কে কিছুটা নির্বিলিক মানুষ। তারও গোঁ আছে বটে, কিন্তু না ঘাঁটালে সে কারো সাতে-পাঁচে নেই। মাস্টার সাহেবের মাইনে সর্বসাকুল্যে তখন সাড়ে সাতশো টাকা। শীলা দেয় সাড়ে চারশো, আর স্টুডিওর কাজের জন্য তার বাপ দেয় তিনশো। প্রায় সবটাই ব্যাঙ্কে জমা পড়ার কথা। খাওয়া-পরার খরচ এক পয়সা নেই। কিন্তু দু'দুটো বড়লোকের বাড়িতে থাকার ফলে মাস্টার সাহেবের একটু খারাপ অভ্যেস হয়ে গেছল। মদ খাওয়া ধরেছিল। এ-জিনিসটা দু'বাড়িতেই জল-ভাত ব্যাপার। আর সিগারেট খরচাও ছিল তখন। তখন তো আর বিড়ি ফুঁকত না। বছর দুই আগে বলা নেই, কওয়া নেই, বাড়ির মেজাজী কর্ত্রী শীলা তিড়কে হুট করে তাকে বিদায় করে দিতে বেশ ফাঁপরে পড়েছিল মাস্টার সাহেব। এ-রকম হবে বা হতে পারে ভাবেনি, কারণ তখনো তার ছোট ছেলের স্কুলের পড়া শেষ হতেই

বেশ বাকি। আবার ততদিনে মাস্টার সাহেবের সিনেমার চাকরিও গেছে। শীলার বাবা চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে ব্যবসায় যবনিকা পড়েছে। বাবার দেওয়া মাইনেটাও শীলা পুষিয়ে দিচ্ছিল। মেয়েটার, এখন আর মেয়েটার নয়, মহিলাটির এমনিতে দরাজ মন, কিন্তু তার মেজাজ বোঝা ভার। মাস্টার সাহেবও কোনরকম আবেদন না জানিয়ে চলেই এসেছে। তারপর এই স্টুডিওর চাকরিটুকু জোটাতে পেরে নিশ্চিন্ত।

মাস্টার সাহেবের সঙ্গে এই স্টুডিওতেই গেল বছরে আলাপ আমার। নিজের গল্পের একটা ছবির কাজেই কিছুদিন ছিলাম। লোকটিকে আমার ভালো লেগেছিল। আমার অঢেল সময়। তার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে তার হাতের রান্নাও খাইয়েছে আমাকে। তখনই নিজের জীবনের গল্প করেছে।

এবারেও ছবির কাজে আসা। আমাকে দেখে মাস্টার সাহেব ভারী খুশি। তার সঙ্গে থাকার আমন্ত্রণ পর্যন্ত জানিয়েছিল। বলেছিল, আপনার মতো একজনের সঙ্গে আমার খাতির দেখলে এরাও আমাকে একটু অন্য চোখে দেখবে। সেটা সম্ভব হয়নি, কিন্তু আড্ডা দিতে তার ঘরে প্রায়ই গেছি।

স্টুডিওতে বসেই আমার আগামী ছবির বাঙালী ডাইরেক্টরের সঙ্গে স্ক্রিপট নিয়ে একটু কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় অকারণ ঝগড়া আর বচসার ব্যাপারগুলো আমার পছন্দ হচ্ছিল না। মাস্টার সাহেব সেখানে চুপচাপ বসেছিল। শুনছিল। পরে তার ঘরে ধরে এনে চা খেতে খেতে প্রথমেই ওই প্রশ্ন। যথা, মস্ত বাড়ি, দু-তিনখানা ঝকঝকে গাড়ি আর টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি—এমন পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অকারণ ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকতে পারে কিনা। অথচ স্বভাবে দু'জনের একজনও ঝগড়াটে নয়।

আমি কৌতূহল বোধ করেছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এ-রকম দেখেছ?

হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে মাস্টার সাহেব জবাব দিল, না দেখলে বলছি। অথচ আশ্চর্যভাবে এই ঝগড়াঝাঁটি, খিটির-মিটির একেবারে থেমে যেতেও দেখেছি।

তার চোখ-মুখের দিকে চেয়ে আমার কৌতূহল আরো বাড়ল। বললাম, ব্যাপারখানা বলো তো মাস্টার সাহেব—শুনি? সমস্ত জীবন তো মাস্টারি করে কাটালে, কোথায় দেখলে?

—এই মাস্টারি জীবনেই। গেলবারে দিলীপ তিড়কে আর শীলা তিড়কের ছেলেমেয়েদের পড়াতুম—সে গল্প করেছি তো?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

—সেখানেই। দিলীপ আর শীলার মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ কি যে তুমুল লেগে যেত, আপনি ভাবতেও পারবেন না। ছেলেমেয়েরা ছেড়ে দিলীপ তিড়কেও স্ত্রীর তিরিক্ষি মেজাজের হদিশ না পেয়ে প্রথমে হাঁ করে থাকত। পরে সে-ও ক্ষেপে যেত। আমার মাঝে মাঝে ভয় হত, এতগুলো ছেলেমেয়ে, কিন্তু এ-রকম অকারণে বা তুচ্ছ কারণে দু'জনের একটা ডিভোর্সের ব্যাপার না হয়ে যায়। এ-রকম বছরের পর বছর ধরে দেখেছি। তারপর মাত্র এই দু'বছর আগে সব ঠাণ্ডা—স্বামী-স্ত্রীতে বেশ সদ্ভাব।

মুখের দিকে চেয়ে মাস্টার সাহেব এমন টিপ টিপ হাসতে লাগল যে আমার মনে হল, গল্পের সবে শুরু। জিগ্যেস করলাম, বছরের পর বছর ধরে অত ঝগড়া কেন, আর পরে হঠাৎ সদ্ভাবই বা কেন—কেউ জানে না?

—শীলা তিড়কে নিশ্চয় জানে, আর দিলীপ তিড়কের হয়তো ধারণা কোন দৈব অনুগ্রহেই স্ত্রীর মন-মেজাজ ঘুরে গেছে।... কিন্তু ব্যাপারটা আমি আঁচ করতে পারি বলেই শীলা তিড়কে হুট করে আমাকে জবাব দিয়ে বসল।

এরপর আমি শোনার জন্য উদগ্রীব। মাস্টার সাহেবও বলতেই চায়। সংক্ষেপে চিত্রটা এই রকমঃ

..শীলা তিড়কের এখন বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস। কিন্তু এখনো দেখলে কেউ চল্লিশ ভাববে না। মাস্টার সাহেব লক্ষ্য করেছে তার মনমেজাজ বিগড়োতে শুরু করেছে বছর সাত-আট আগে থেকে। কারণে অকারণে ক্ষেপে যায়। রাগ সব থেকে বেশি স্বামীর ওপর। সে বেচারা যতক্ষণ পারে সহ্য করে। তারপর সে-ও পালটা ঝাপটা মারতে আসে। বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো ভয়ে তটস্থ তখন। কারণ ঝগড়ার পরের জেরটা প্রায়ই ওদের ওপর এসে পড়ে। রাগারাগির পর ওদের বাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আর মা ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে পড়ে। তুচ্ছ কারণে মারধোরও করে। মাস্টার সাহেব বাধা দিতে চেষ্টা করলে তাকে সুদ্ধ চোখের আগুনে ভস্ম করতে চায়। এরই মধ্যে শীলা তিড়কের আবার ধর্মে মতি এসেছে কিছু । নিজের একটা ঠাকুরঘরও করেছে কিন্তু ধর্মে মন দিলে সাধারণত মেজাজপত্র ঠাণ্ডা আর সুস্থির হতে দেখা যায়। শীলা তিড়কের ঠিক উল্টো। দিনে দিনে আরো তিরিক্ষি হয়ে উঠছে।

এদিকে দিলীপ তিড়কে তার ব্যবসা নিয়ে সত্যি ব্যস্ত। ব্যবসার কাজে প্রায়ই তাকে বোম্বাইয়ের বাইরে বেরুতে হয়। বেশি যায় গোয়ায়। গোয়ার সঙ্গে কিছু আমদানি-রপ্তানির যোগ আছে। সেখানে তার এক খুড়তুতো ভাই ব্যবসার দেখাশুনা করত। বছর চারেক আগে সেই ভাই হঠাৎ মারা যাওয়ায় দিলীপ তিড়কের আরো ঘন ঘন গোয়ায় যেতে হয়। অন্য দায়ও আছে। সেই খুড়তুতো ভাইয়ের দুটো ছেলে। ভাই মারা যাবার সময় একজনের বয়েস চার, আর একজনের দেড়। ওদের বা ওদের মায়ের তখন একমাত্র দিলীপ তিড়কে ছাড়া তিন কুলে আর কেউ নেই। পরের এই ক'টা বছরে সেই ভাইয়ের বউটি ব্যবসার কাজ মোটামুটি বুঝে নিয়েছিল। বম্বে টু গোয়া দূর কিছু নয়। দিলীপ তিড়কের সেই ভাই জীবিত থাকতেও শীলা কোনদিন তাদের বম্বে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য আপ্যায়ন করেনি। আশ্রিতদের সে আশ্রিতের চোখেই দেখে। সেই ভাই মারা যাবার পরেও তাদের ডাকেনি। মাস গেলে মাসোহারা যাচ্ছে, এর বেশি আর কি করার আছে? স্বামীকে সে-ই পরামর্শ দিয়েছিল, হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে তোমার ভাইয়ের বউকে ওখানকার ব্যবসার কাজ একটু আধটু বুঝে নিতে বলো—শুধু দয়ার ওপর কতকাল আর চলতে পারে। দিলীপ তিড়কে খুশিমুখে স্ত্রীর প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল।

যাক, বাড়ির অশান্তি এদিকে বাড়ছেই—বাড়ছেই। শীলা তিড়কের উঠতে বসতে রাগ। স্বামী ঘরে থাকলে রাগ, ব্যবসার কাজে ব্যস্ততা বাড়লে রাগ, আগের

মতো উৎসব-আনন্দে যোগ দিতে পারে না বলে রাগ, আবার পূজোআর্চায়ও মন দিতে পাবে না বলে বাগ। এরই মধ্যে এই পবিবাবে আবাব একটা বড রকমেব পরিবর্তন দেখা দিল। নিজের চাব-চারটে ছেলেমেযে নিযেই অস্থিব আব অসহিষ্ণু শীলা তিড়কে, তার মধ্যে বলা নেই, কওয়া নেই, হুট কবে আবো দু-দুটো নাবালককে গোয়া থেকে বোম্বাইতে তুলে নিযে এলো দিলীপ তিড়কে।

ভদ্রলোক সত্যি নিরুপায। কাবণ গোয়াব সেই ভাইযের বউও তিন দিনের অসুখে দুম কবে মাবা গেল। তাব বড় ছেলেটার বযেস তখন ন'য়ের কাছাকাছি, আব ছোটটাব ছয়। ভাবী মিষ্টি ছেলে দুটো। দেখলে মায়া হয। আর বোঝা যায, ওদের বাবা বা মাযেব দু'জনেব একজন অন্তত ভারী রূপবান বা রূপসী ছিল। শীলা তিডকে যে মেজাজের মহিলাই হোক, স্বামীকে খুব একটা দোষ দেবে কি কবে? বাপ-মা-মবা ছেলে দুটো যাবে কোথায? অসন্তুষ্ট হলেও এ নিযে খুব একটা রাগাবাগি কবতে পাবল না। দিলীপ তিডকে আশ্বাস দিল, আর একটু বড হলেই ছেলে দুটোকে হস্টেলে পাঠিযে দেওয়া হবে।

ভদ্রলোকেব বুকেব তলায বেশ একটা নরম জায়গা আছে বটে। স্ত্রীব ভযে বাইবে কোনরকম হাঁক-ডাক নেই, কিন্তু ভিতরে ভিতবে অসহায ছেলে দুটোব প্রতি সজাগ চোখ। চুপচাপ ওদেব ভালো স্কুলে ভর্তি কবা হযেছে। মাস্টাব সাহেবকে চুপি চুপি অনুবোধ করে ওদের দুজনেব জন্য আলাদা একজন টিউটর বাখা হযেছে। বডঘবেব ছেলেব মতোই ফিটফাট পোশাক-আসাক ওদেবও।

এবই মধ্যে মাস্টাব সাহেব লক্ষ্য কবছে, শীলা তিডকে হঠাৎ কি-রকম গুম মেরে যাচ্ছে। তাব চিৎকাব চেঁচামিচি বাগাবাগি কমে আসছে। সব দেখে লক্ষ্য করে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। মাস্টাব সাহেবের ভয়, খুব বড বকমেব কিছু বিস্ফোবণেব লক্ষণ এটা।

মাস চাবেক বাদে এক দুপুরে খোদ কর্ত্রীর শোবাব ঘবে ডাক পডল মাস্টাব সাহেবের। ছেলেমেয়েবা সব স্কুলে। দিলীপ তিডকে অফিসে। মাস্টাব সাহেব পডার ঘবে বসে বই পডছিল। নিজে এসে ডেকে নিয়ে গেল।

সেই থমথমে মুখ দেখেই প্রমাদ গুনছিল মাস্টার সাহেব।

শীলা খুব ঠাণ্ডা গলায তাকে কিছু বলল, তাবপর কিছু হুকুম কবল। সেই হুকুম মতো সেই দুপুরেই মাস্টাব সাহেব গোয়ায় চলে গেল। তাব বুকেব তলায় সর্বক্ষণ তখন হাতুড়ির ঘা। দুদিন বাদে ফিবল। বুকেব তলায তখন এক ধরনের হিংস্র আনন্দ। এই পরিবার এখন তছনছ হয়ে যাবে—ওই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ডিভোর্স হযতো আর কেউ রুখতে পারবে না।

ফিরেছেও দুপুরে। বাড়িতে যখন আব বিশেষ কেউ নেই। শীলা তিড়কে আবাব তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা মুখে মাস্টার সাহেব তাকে সমাচার জানালো। তার সন্দেহ সবটাই সত্য। গোয়াতে দিলীপ তিড়কেব কোনরকম ভাই বলে কেউ ছিল না। ওখানকার ব্যবসা দেখাব দায়িত্ব নিয়ে একজন খুব রূপসী মহিলা নিযুক্ত

ছিল। সেখানকার লোক জানে দিলীপ তিড়কে পরে তাকে বিয়ে করেছে। ছেলে দুটো তাদেরই।

এরপর শেষ দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল মাস্টার সাহেব। কিন্তু এমন শেষ দেখবে কল্পনাও করেনি। তাকে আবার একদিন চুপি চুপি ডেকে বলেছে, এ-খবর যেন প্রকাশ না হয়। আর পনের দিনের মধ্যে অন্য মূর্তি দেখেছে শীলা তিড়কের। সেই আগের মতো হাসি-খুশি, উচ্ছল স্বামীর সঙ্গে পার্টিতে যায়, সিনেমায় যায়। বাড়ির ছটা ছেলেমেয়েকেই আদর করে, জিনিস কিনে দেয়, সমান চোখে দেখে।

মাস শেষ হতেই তিন হাজার টাকা মাস্টার সাহেবের হাতে দিয়ে বলল, প্রাইভেট টিউটর আর দরকার নেই—সে আর মিস্টার তিড়কে ছেলেমেয়েদের অন্যভাবে মানুষ করার কথা ভাবছে। তারা দুজনেই মাস্টার সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই পর্যন্ত বলে মাস্টার সাহেব থামল। আমি বিমূঢ় মুখে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

ঘোরালো দু'চোখ মাস্টার সাহেব আমার মুখের ওপর তুলে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার বুঝলেন কিছু?

মাথা নাড়লাম।—না। একদিকে মহিলার এমন উদার পরিবর্তন, অন্যদিকে তোমার ওপর হঠাৎ বিরূপ কেন?

অনুচ্চ অথচ ক্ষোভ-ঝরা গলায় বিড় বিড় করে মাস্টার সাহেব জবাব দিল, উদার পরিবর্তন না ছাই—সে নিজের এতকালের বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেল। বিয়ের এক মাস বাদেই দিলীপ তিড়কে দু'বছরের জন্য বিলেত চলে গেছল, আর ন'মাসের মধ্যে শীলার বড় ছেলে ঘরে এসেছে...সেই ছেলে দিলীপ তিড়কের নয়।

শুনে আমি হতভম্ব, বিমূঢ় খানিকক্ষণ। সেই বিস্ময়ের ঝোঁকেই জিগ্যেস করলাম, কিন্তু এ-রকম একটা ব্যাপার তুমি জানলে কি করে।

মাস্টার সাহেব অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। গলার স্বরে চাপা বিরক্তি। জবাব না দিয়ে মন্তব্য করল, কি-যে ছাইয়ের গল্প লেখেন বুঝি না।

দাম্পত্য

ঘুম থেকে উঠতে একটু বেলাই হয় রমেনবাবুর। খাটুনির জীবনে এইটুকুই বিলাসিতা। আজ চোখ মেলে তাকিয়েই তাঁর মনে হল কোথায় যেন এই সকালটার একটু ব্যতিক্রম অনুভব করছেন। বিছানায় শুয়েই চারদিকে তাকালেন। সামনের ছোট টেবিলে ট্রে-তে বেড-টি পট আর পেয়ালা। গত পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি বেড-টি খেয়েছেন মনে পড়ে না। তার আগে অবশ্য ঘুম-চোখে এক পেয়ালা চা কোনরকমে গলাধঃকরণ করে আবার শুয়ে পড়তেন। চোখ মেলে ভালো করে তাকাতেনও না। সুমিত্রার তাগিদে উঠছি উঠছি করে মাথার ওপরের পাখার হাওয়ায় চা কিছুটা ঠাণ্ডা হলে দু'চুমুকে পেয়ালা শেষ করে আবার শুয়ে পড়তেন। চা সমস্তদিনে রমেন চৌধুরী অনেকবার খান। কিন্তু ওই সাতসকালে সুমিত্রার তাকে চা গেলানোটা বিরক্তিকর লাগত। না

খেলে, সেও যেন কালচাবেব হানি। বমেনবাবু অবশ্য কখনো এ নিযে আপত্তি কবেননি। আজ থেকে বাইশ বছব আগে সুমিত্রা এ বাড়িতে পা-দিযে যা-কিছু কবেছেন তাব সবু কিছুই তখন বমেনবাবু অম্লানবদনে মেনে নিযেছেন। তাই পবে আব আপত্তিব কোন প্রশ্নই ওঠেনি।

কিন্তু পাঁচ মাস বাদে বঘু ব্যাটা ভুল কবে আবাব চাযেব ট্রে বেখে গেছে বোধহয। পবক্ষণে নিজেব গাযেব পাতলা চাদবটাব দিকে চোখ গেল। ভোবেব দিকে এখন সামান্য ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা পড়ে। তাব মধ্যে মাথাব ওপব পুবোদমে পাখা ঘোবে। ভোববাতে বেশ শীত কবছিল বমেনবাবুব মনে আছে। কিন্তু ঘুম-চোখে পাযেব তলাব চাদবটা আব খুঁজে পাননি তিনি।

বঘুটা সেদিন চাদব দিতে ভুলেছে ভেবে কুঁকড়ে শুযেছিলেন আবাব। কিন্তু এখন নিজেব পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদবে ঢাকা দেখছেন। ঘুমেব মধ্যে আবাব কখন উঠে চাদব হাতড়ে পেযেছেন এবং গাযে দিযেছেন মনে কবতে পারছেন না।

আবো অবাক সামনেব খোলা দবজাব দিকে চোখ পড়তে। বঘু ভুল কবে না হয় বেড-টি বেখে গেল, কিন্তু দবজা দুটোও খোলা বেখে গেল? তাছাড়া তাঁব ঘুমেব মধ্যেই দবজায পাট-ভাঙ্গা নতুন পর্দা লাগিযে দিযে গেল? ও-বকম মুগোবঙ্গেব পর্দাগুলো সব সুমিত্রা নিযেই গেছে ধবে নিযেছিলেন। কাবণ গত পাঁচ মাসেব মধ্যে মাঝে একবাব মাত্র এই ঘবেব পর্দা বদলানো হযেছে মনে পড়ছে। তাও বঘু নিজেব পছন্দমতো ভাবী একটা নীল পর্দা এনে লাগিযেছিল। গত তিন মাস ধবে সেই পর্দাই ঝুলছিল। কি ভেবে বালিশেব ওপব দিযে মাথা উঁচিযে পিছনেব জানলা দুটোব দিকে তাকালেন বমেনবাবু। তাবু পবেই হাঁ একেবাবে। দবজায ওই মুগোপর্দা লাগালেই তাব সঙ্গে ম্যাচ কবে জানলায ওই বংযেব পর্দাই টাঙাতো সুমিত্রা। এখনো জানলায সেই ম্যাচ কবা ঝকঝকে পর্দাই দেখছেন বমেনবাবু। তিনি ঘুমুচ্ছেন আব সেই ঘবে ঢুকে বঘু নিঃশব্দে এত সব কবে গেল দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না।

আস্তে আস্তে শয্যায উঠে বসলেন তিনি। ঘবেব চাবদিকে ভালো কবে তাকালেন আবাব। ড্রেসিং টেবিলটা সাজানো, কোণেব আলনাটা গোছানো। পাঁচ মাস আগে যেমন থাকত, সে বকমই অনেকটা।

ঘড়ি দেখলেন। ন'টা বাজে প্রায। এত বেলা পর্যন্ত আগে ঘুমোতেন না তা বলে। ইদানীং বেলা হচ্ছে। অনেক বাত পর্যন্ত বই পড়েন বা জার্নাল-টার্নাল পড়েন। বাতেব ঘুম কমেছে, ফলে সকালেব ঘুম বেড়েছে।

—বাবা এখনো ওঠেনি বে বঘু?

বাইরে থেকে এই গলার শব্দ কানে আসাব সঙ্গে সঙ্গে বুকেব ভিতরটা যেন ধপধপ করে লাফিযে উঠল বমেনবাবুব। একি শুনলেন তিনি? কাব গলা শুনলেন? এখন তিনি জেগে আছেন না ঘুমিযে স্বপ্ন দেখছেন?

ওই গলার স্বপ্ন নাকি, যে পর্দা উঠলে গলা বাড়ালো। তাঁকে বসে থাকতে দেখে মু[illegible] ভাঙ্গা দুচোখ আনন্দে চকচক কবছে।

২০

F 3132

সুমু— সৌমেন, বমেনবাবুব একমাত্র ছেলে। কুড়ি বছর বযস। তাড়াতাড়ি ঘবে ঢুকে একমুখ হেসে বাবাকে প্রণাম কবল। বলল, খুব অবাক কবে দিযেছি তো? মা একটা চিঠি লিখে তোমাকে জানাতে বলেছিল আমবা আসছি। আমি বলেছি, না, যাচ্ছি যখন না জানিযেই যাবো। বাবাকে অবাক কবে দেব।

ছেলেকে দুহাতে জড়িযে ধবলেন বমেনবাবু। বুকে চেপে ধবলেন। তাবপব কি যে হযে গেল, নিজেও অপ্রস্তুত। যা কখনো হযনি তাই হযে গেল। কেঁদে ফেললেন তিনি।

বাবাব চোখে জল দেখে ছেলেটাও অপ্রস্তুত। তাড়াতাড়ি বলল, তুমি আব কিছু ভেব না বাবা। সব ঠিক হযে গেছে। মা আব তোমাকে ছেড়ে যাবে না, আমিও না। কি যে এক মজাব কাণ্ড হযেছে না মাদ্রাজে—একদিনে মাযেব মেজাজ জল—মনই ঘুবে গেল একেবাবে, বলব'খন তোমাকে—চুপ মেবে যেতে হল, পর্দা সবিঁযে সুমিত্রা ঘবে ঢুকলেন। বাপে-ছেলেতে তখনো জড়াজড়ি, বমেনবাবুব চোখে তখনো জল।

তাড়াতাড়ি ছেলেকে ছেড়ে দিলেন। নিজেব ওপব হঠাৎ প্রচণ্ড বাগ হল বমেনবাবুব। এই একজনেব কাছে চোখেব জলসুদ্ধ ধবা পড়তে চাননি।

সুমিত্রা চুপচাপ তাব মুখেব দিকে চেযে বইলেন একটু। সুমুও এই ফাঁকে মাকে দেখে নিচ্ছে।

সুমিত্রা স্নান সেবে এসেছেন। ভেজা চুল। ফর্সা মুখে ফোঁটা ফোঁটা জলেব দাগ। আযনাব দিকে চলে গেলেন। ড্রযাব খুলে চিরুনি বাব কবলেন।

পাঁচ মাস বাদে দেখা হবাব পবে ঘবেব তিনজনেই একেবাবে চুপ মেবে গেলো অস্বস্তিতে। ছেলে একবাব মাকে দেখে নিযে অনেকটা বেপবোযাব মতো বলে ফেলল, তোমাকে প্রথমেই একটা সুখবব দিযে বাখি বাবা। এবাব থেকে আমি তোমার সঙ্গে কণ্ট্রাক্টবিব কাজে লেগে যাবো। তোমাব কাছে হাতেকলমে কাজ শিখবো।

এ-কথা শুনে বমেনবাবুই যেন ফাপবে পড়লেন। তাড়াতাড়ি বললেন, না না, ও-সব তোকে কবতে হবে না।

সুমিত্রা মোটা চিরুনি দিযে মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। অনেক চুল। সেই চুলে চিরুনি সুদ্ধ হাত থেমে গেল। সামান্য মুখ ফিবিযে তাঁব দিকে তাকালেন।

বমেনবাবু ছেলেকে বললেন, মা যা বলবেন তাই কববি।

বা বে, মা-ই তো ওই কথা বলেছে— তোমাব সঙ্গে কাজ কবব, তোমাব কাছে কাজ শিখব—

বমেনবাবু আবাবও হতচকিত একটু। এতো বিশ্বাস কবতে হবে।

সুমিত্রাব হাতে আবাব চিরুনি চলছে। আযনাব দিকে মুখ। ছেলেকে বললেন, বঘুকে ওই চাযেব ট্রে নিযে যেতে বল, চা-জলখাবাব সব একেবাবে নিযে আসুক, গল্প কবতে হয মুখ হাত ধোওযা হলে তাবপব কব, সকাল ন'টা বেজে গেল—

পবোক্ষ শেষেব উক্তিটা বমেনবাবুব উদ্দেশ্যে সেটা ছেলেও বুঝল। খাট ছেড়ে মাযেব নির্দেশ পালন কবতে চলল সে।

সুমিত্রা ধীরেসুস্থে মাথা আঁচড়াচ্ছেন। অত চুলের জন্য শরীরের ওপরের দিকটা একটু বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। লোভীর মতোই দেখতে ইচ্ছে করছে রমেনবাবুর। আগে তাই দেখতেন। আয়নার ভিতর দিয়ে সুমিত্রার সঙ্গে আবার চোখাচোখি হতে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে এলেন। যেন তাড়া আছে এমনি ভাব করে মুখ হাত ধুতে চলে গেলেন।

হঠাৎ কি হল বা হতে পারে মাথায় ঢুকছে না। এই ছেলেকে অর্থাৎ সৌমেনকে নিয়েই মর্মান্তিক বিচ্ছেদ সুমিত্রার সঙ্গে। এবারে কোর্টে নিষ্পত্তি হবার কথা। শ্বশুরের শেষ কড়া চিঠিতে এ-রকম আভাসই পেয়েছিলেন তিনি। আর গোঁ ধরে সেই অবাঞ্ছিত পরিণামের অপেক্ষাতে ছিলেন। তার মধ্যে ছেলে নিয়ে সুমিত্রা হঠাৎ ফিরে আসবে এ তিনি ভাববেন কি করে? শুধু তাই নয়, সুমু বাপের কাছে কাজ শিখবে, বাপের সঙ্গে কাজ করবে—সুমিত্রাই নাকি এ-কথা বলেছে। এ কানে শুনলেও সত্যিই বিশ্বাস করেন কি করে?

তোয়ালেতে মুখ মুছে আবার ঘরে ফিরলেন রমেনবাবু। মাথা আচড়ানো শেষ করে সুমিত্রা মনযোগ দিয়ে কপালে সিঁদুরের লাল শিখা দিচ্ছে দেখলেন রমেনবাবু। রঘু চা আর সকালের খাবার রেখে গেছে। আয়নায় আবার চোখাচোখি হতে রমেনবাবু মুখ ফিরিয়ে পট থেকে পেয়ালায় চা ঢালতে লাগলেন।

—আগে টোস্ট আর পোচ খাও, তারপর চা ঢালবে।

আগে যে মেজাজে কথা বলত সুমিত্রা তার খুব একটা বরমফের হয় নি। হাব-ভাব-আচরণও বদলায়নি। তবু একই মধ্যে কোথায় যেন একটু ভিন্ন স্বাদ পাচ্ছেন রমেন চৌধুরী। টোস্ট আর ডিমের পোচ টেনে নিলেন। সুমিত্রা সামনে এগিয়ে এলেন। তাঁর দিকে চেয়ে রমেনবাবু হাসতে চেষ্টা করলেন একটু। আজ অনেককাল বাদে টোস্ট আর পোচের থেকে হঠাৎ এই মুখখানা ঢের বেশী লোভনীয় লাগল তার। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে বেশী তাকাতেও পারছেন না।

—এই পাঁচ— মাসে চেহারার তো বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি।

সুমিত্রার গলায় একটু শ্লেষের আভাস আছে কি নেই ঠিক ধরতে পারলেন না। সহজ হবার চেষ্টায় একটু হাসলেন রমেনবাবু।—কেন, খারাপ দেখছ?

—রঘু বলল, সকালে তিন চার পেয়ালা চা ছাড়া আর কিছু খেতে না। রাতেও দুটোর আগে ঘরের আলো নিভত না। শরীর খারাপ হবে না তো কি ভালো হবে?

রঘু ব্যাটা এইভাবে তাকে ডুবিয়েছে। কিন্তু চেষ্টা করেও তিনি রঘুর উপর রাগ করতে পারলেন না। পারলেন না, কারণ সুমিত্রার সেই চিরাচরিত কর্তৃত্ব আর ব্যক্তিত্বের ফাটল দিয়ে আজ তিনি ভিন্ন রকমের কিছু দেখতে পাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন ছিলে?

—কেমন ছিলাম পাঁচ মাসের মধ্যে একটা চিঠি লিখে তো খবর নিতে পারতে? না কি ভেবেছিলে, দূর হয়েছে ভালই হয়েছে।

জবাবে রমেন চৌধুরী বলতে পারতেন, তিনি চিঠি লেখার জন্যে প্রস্তুত হবার আগেই শ্বশুরের দু'দু'খানা কড়া চিঠি পেয়েছেন। একটাতে তাঁর উপদেশ ছিল, নিজে

এসে মেয়েব কাছে মাপ চেয়ে তাকে যেন ঘবে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কবা হয। মাস দেডেক প্রতীক্ষার পবে শ্বশুব দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছিলেন, তিনি এবং সুমিত্রা দু'জনেই ডিভোর্স সুট ফাইল কবাব কথা ভাবছেন। আশা কবা হচ্ছে, এ নিযে সে (অর্থাৎ বমেন চৌধুবী) বেশী তিক্ততা সৃষ্টিব চেষ্টা কববে না। এবং সৌমেনেব ভবিষ্যতেব যথাযথ ব্যবস্থাও তাব বাবা বিনা জোবজুলুমেই করবেন।

এই দ্বিতীয় চিঠিব জবাব বমেন চৌধুবী শ্বশুবকে দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, সৌমেন সাবালক, সে ইচ্ছে কবলে তার বাবাব কাছে থাকতে পাবে, ইচ্ছে কবলে মাযেব কাছে থাকতে পাবে। আইনগতভাবে তাব প্রতি আর কোন দাযিত্ব বমেনবাবুর নেই। তবে ছেলে যদি তাব বাবাব কাছে থাকা সাব্যস্ত কবে, তাব ভবিষ্যৎ-চিন্তাও তিনিই কববেন।

এ সব কথা মনে এলেও আজকেব এই অপ্রত্যাশিত পবিস্থিতিতে তা বলা যায না। টোস্ট চিবুতে চিবুতে সুমিত্রাব মুখেব দিকে চেযে একটু ঠাট্টাই কবলেন বমেনবাবু। বললেন, এ-বযসে স্ত্রী দূব হযে গেলে আব ভালোটা কি হতে পাবে?

এইটুকুতেই সেই চিবাচবিত অসহিষ্ণুতা সুমিত্রাব, থাক! পযসার গরম হলে ষাট বছর বযেসটাকেও তোমাবা খুব একটা বযেস ভাব না—বুঝলে?

বমেন চৌধুবী হাসছেন।—আমাব ছে'চল্লিশ...এটা কি তাহলে পুবো যৌবন?

সুমিত্রা চোখেব কোণে মানুষটাকে আব একবাব দেখে নিলেন। সকালে যখন পাখাব হাওযায কুঁকড়ে অঘোবে ঘুমোচ্ছিল তখনো দাঁড়িযে দাঁড়িযে দেখেছেন। নিরীহ ঘুমন্ত মানুষটাব দিকে চেযে তখনো একটা জোবেব দিক আবিষ্কার কবছিলেন তিনি। এখনো সেই জোরেব দিকটাই দেখছেন। একটুও বাগ হচ্ছে না, ববং ভালো লাগছে। এই ভালো লাগাব স্বাদটা আশ্চর্য বকমেব নতুন। হঠাৎ হাসলেন সুমিত্রা একটু। বললেন, যাক শোন, সুমু ঠিকই বলেছে— এখন থেকে সে তোমাব সঙ্গে কাজে বেরুবে।

শুনে রমেনবাবুই হাঁসফাস কবে উঠলেন। সুমিত্রা ফিবেই যখন এসেছে এ প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আব ঘোঁট পাকাতে চান না। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, না-না, ও তুমি যা চাও তাই হবে। সুমু চার্টার্ড অ্যাকাউনটেনসিই পড়ুক, দেখেশুনে ভালো একটা ফার্মে ভর্তি হয়ে যাক, তাবপব টাকা খবচ কবলে গাইড কবাব লোকও ঠিকই পাওযা যাবে।

সুমিত্রাব চোখদুটো এমনিতেই বড। মুখেব দিকে স্থিব তাকিযে থাকলে আবো বড দেখায়। তেমনি চেযে বইলেন কযেক পলক। বললেন, কিন্তু আমি এখন আব তা চাই না—যা চাই তাই তোমাকে বললাম। কাল থেকেই ও তোমাব সঙ্গে কাজে বেরুবে।

উঠে চলে গেলেন। বমেনবাবুব ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখ। না, সুমিত্রাব এ-রকম পবিবর্তনেব জন্য তিনি কোনো ঠাকুর-দেবতাব দোরে ধর্ণা দেননি। তবু এ কি করে সম্ভব হল ভেবে পাচ্ছেন না। সুমিত্রা যে বাগ কবে নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে বাতিল করে এ-ভাবে ফিবে এসে আত্মসমর্পণ করল, রমেনবাবুর সেবকমও মনে হচ্ছে না। তার নিজেব ইচ্ছেটাই সব। সে কোনবকম আপোসের ধাব ধারে না।

অথচ এই সুমু আর সুমুর ভবিষ্যৎ নিয়েই পাঁচ মাস আগের সেই চরম ব্যাপার। অবশ্য এর আগেও স্বামী-স্ত্রীতে অনেক ঝগড়া হয়েছে আর সুমিত্রা রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। ঝগড়া বলতে যে গোছের বাকবিতণ্ডা বা বচসা বোঝায় তা নয়। সেভাবে কথা-কাটাকাটি করতে সুমিত্রার রুচিতে বাধে। আর রমেনবাবুও সবসময় কটকট করার মানুষ নন। যতক্ষণ সম্ভব সহ্য করেন, আর চুপচাপ দেখে যান বা শুনে যান। তারপর নিতান্ত অসহ্য হলে দুমদাম দু-পাঁচ কথা বলে বসেন। সুমিত্রা তখন এমনভাবে চেয়ে থাকেন যে তাঁর সামনে কোনো ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে না ইতরজন— তাই যেন সন্দেহ। তাই দেখে রমেনবাবুর মেজাজ এক-এক সময় দ্বিগুণ বিগড়োতো। তখন মাত্রাজ্ঞান ছাড়িয়েই যেত। ওরকম অশালীনতার একটাই জবাব, সুমিত্রার বাপের বাড়ি প্রস্থান। এরপর রমেনবাবু প্রথমে ছেলেকে পাঠাতেন, তারপরে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করতেন। শেষে মুখ কাঁচুমাচু করে নিজেই শ্বশুরবাড়ির দিকে পা বাড়াতেন।

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সর্বদাই তাঁদের মেয়ের পক্ষে। শাশুড়ী ঠারেঠোরে কিছু মন্তব্য করেন, শ্বশুর গম্ভীর মুখে দুই-একটা জ্ঞানের কথা শুনিয়েছেন। বড়শালা বা শালার বউও দুই-একটা বিদ্রূপাত্মক কথা শোনাতে ছাড়েন না। তখনও ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে থাকেন রমেনবাবু। কিন্তু তখন তার কানে তুলো, পিঠে কুলো। তবু নিজে গেলেই যে সুমিত্রাকে আনা যেত এমন নয়, তবে তাতে কাজ হত। রাগের মাত্রা অনুযায়ী একদিন বা দুদিন বা পাঁচদিন বাদে সুমিত্রা ফিরে আসতেন।

রমেনবাবুর মতো ঠাণ্ডা মানুষের হঠাৎ-হঠাৎ ধৈর্যের বাঁধ কেন ভাঙে সুমিত্রা সেটা কখনো বোঝেননি বা বুঝতে চেষ্টা করেননি। তার কারণ রমেন চৌধুরী মানে এক সাধারণ কনট্রাকটারের জীবনে তিনি দয়া করে পদার্পণ করেছেন এবং নিজের মর্যাদা অনুযায়ী সেখানে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করে চলেছেন।

সুমিত্রার বাবা এক মস্ত এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং চার আনার মালিক। বড় অবস্থা। তেমনি চালচলন। আর রমেনবাবুর বাবা ছিলেন ওভারসিয়ার। নিজের উদ্যমে কনট্রাকটরি ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন তিনি। বিশ্বস্ত মানুষ। সুমিত্রার বাবা তাঁকে পছন্দ করতেন। অনেক কাজও দিতেন। বি.এ পাশ করে রমেনবাবু আর চাকরির চেষ্টায় না গিয়ে বাপের ব্যবসায়ে লেগে গেছলেন, আর নিজের সততা আর পরিশ্রমের ফলে অল্পদিনের মধ্যে তিনিও সুমিত্রার বাবার সুনজরে এসে গেছলেন। বছর দুই-আড়াইয়ের মধ্যে রমেনবাবুর বাবা মারা গেলেন। আর সত্যি কথা বলতে কি, সুমিত্রার বাবা তখন ওই উদ্যোগী ছেলেটা অর্থাৎ রমেনবাবুর প্রতি একটু বেশী উদার হয়েছিলেন। কর্মঠ, বুদ্ধিমান ছেলে। কাছে ডেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। কাজও আগের থেকে আরও বেশীই দিয়েছেন ক্রমশ। আর তার ফলাফল দেখে খুশীই হয়েছেন।

—রমেনবাবুর তখন পঁচিশ বছর বয়েস। একটা চাপা প্রলোভন দুর্বার হয়ে উঠল। কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে একেবারে মুখথুবড়ে পড়লেন। অর্থাৎ ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের একমাত্র মেয়ে সুমিত্রাকে একখানা চিঠি লিখে বসলেন। তার চার বছর আগে থেকে এ বাড়িতে

আনাগোনা। ওই মেয়েকে অনেকবার দেখেছেন। খুব যে রূপসী তা নয়, সুখের ঘরে ওটুকু রূপ অনেক মেয়েরই থাকে। কিন্তু তাঁকে দেখে দেখে বমেন চৌধুরীর পাগল হওয়ার দাখিল। সুমিত্রার তখন সবে উনিশ। কলেজে পড়ছেন। তাঁর দাদা বিলেতে। সেখানে তিনি এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন। ভাবতে গেলে এই লোভ আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়নোর সামিল। কোন যুক্তির দিকে না গিয়ে দীর্ঘদিনের একটা যন্ত্রণার অবসান করে দেবার সংকল্পে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

—চিঠিতে চার বছরের স্বপ্ন আর সেই দুঃসহ যন্ত্রণার কথাই লিখেছিলেন। আর লিখেছিলেন, যদি এতটুকু আশা পান তাহলে মৃত্যু পণ করেও তিনি সুমিত্রার যোগ্য হয়ে উঠতে চেষ্টা করবেন।

স্বাস্থ্যবান সুঠাম এবং সশ্রী লোকটাকে চোখের কোণ দিয়ে সুমিত্রাও বহুবারই দেখেছেন। ও-রকম করে দেখা আর নিজেকে যাচাই করারই বয়েস সেটা। কিন্তু ঐ দেখা পর্যন্তই। বাবার আশ্রিতজনের প্রতি এতটুকু দুর্বল চিন্তার প্রশ্রয় ছিল না। তাই চিঠি পেয়ে সুমিত্রা প্রথমে স্তম্ভিত। এ দুঃসাহস ছাড়া আর কি? চিঠিটা বাবাকে দেখিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলার ইচ্ছে। কিন্তু লোকটার মুখখানা মনে পড়তে তখনকার মতো ইচ্ছেটা বাতিল করলেন। কেন যেন একটা গুরুতর শাস্তি মাথায় চাপিয়ে দিতে ইচ্ছে করল না। দরকার হলে ধৃষ্টতার জবাব নিজেই দিতে পারবেন। তাছাড়া বাবাকে যখন খুশী বলা যেতে পারে।

সেই বিকেলেই লোকটার দেখা পেলেন। তার খানিক আগেই বাবা বেরিয়েছেন। দূর থেকে তাকে দেখে সুমিত্রা ভুরু কোঁচকালেন। তারপর হন-হন করে সামনে এসে দাঁড়ালেন— কাকে দরকার? বাবাকে না আমাকে?

—উনি তো একটু আগে বেরিয়ে গেলেন দেখলাম। আমতা-আমতা জবাব।

ঘুরিয়ে বলা হল তাঁকেই দরকার।

সুমিত্রার গলার স্বর এবারে ঝাঁঝালো।—চিঠির জবাব চাই?

—পেলে নিশ্চিন্ত হতাম।

—তাহলে একটু অপেক্ষা করতে হবে। বাবা ফিরলে চিঠি তার হাতে যাবে। তিনিই জবাব দেবেন।

বমেন চৌধুরী চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক পলক। ভীত চাউনি নয়— বিমর্ষ বললেন, তাতে আর লাভ কি। চিঠি পড়ে তিনি গলাধাক্কা দেবেন, আর তুমি না চাইলে আমি বরাবরকার মতো চলে যাবো। তোমার কাছ থেকে এটুকু সম্মান অন্তত দুষ্প্রাপ্য ভাবি নি।

—তুমি। তোমার। সত্যিকারের ঝলসেই উঠেছিলেন সুমিত্রা।

বিব্রত মুখে বমেন চৌধুরী বলেছিলেন, খুব অন্যায় হয়েছে।... নিজের মনে 'তুমি' 'তুমি' করে চার বছর এত কথা বলেছি যে ওটা আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

এ কথা শুনে ওই মুখ দেখে কেন যেন সুমিত্রা সেরকম জোরের সঙ্গে রাগ করে উঠতে পারেন নি। তবু তাঁর গলায় ব্যঙ্গ ঝরেছে। নিজেও তুমি করেই বলেছেন। —তাহলে তুমি আশা করছ, জবাবটা আমিই দিয়ে তোমাকে একটু সম্মানিত করব!

—হ্যাঁ।

—আব জবাব পেলে তুমি নিজে থেকেই বাবাকে ছেড়ে চলে যাবে!

—তা না গেলে নিজেব আত্মসম্মানে লাগবে।

—আব সেই জবাবটা যদি অত হৃদযবিদাবক না হয়, তাহলে বাবাব অনুগ্রহে থেকে আমার যোগ্য হতে চেষ্টা কববে! সুমিত্রাব গলাব স্বব একটুও নরম নয়।

—তাঁব অনুগ্রহ ছাডাই চেষ্টা করব। রমেন চৌধুবীব শান্ত জবাব।

সুমিত্রাব এবারে একটু মজাই লাগল।—বেশ, বাবাব অনুগ্রহ ছাড়া যোগ্য হতে পাবলে আমাব আপত্তি নেই। কিন্তু তাতে কত বছব লাগবে?

—ভবসা পেলে দু'বছবেব বেশী লাগবে বলে মনে হয় না।...আমাব বাবাব একটা জমি কেনাই ছিল, দু'বছরেব মধ্যে সেখানে তোমার পছন্দমতো একটা বাডি তুলতে পাবলে যোগ্যতাব পবীক্ষায তোমার যদি পাস-নম্বব দিতে আপত্তি না হয, তাহলে গডগড কবে আবো বড পবীক্ষায উতবে যাওযা কঠিন হবে না।

প্রস্তাবে বৈচিত্র্য ছিল। মানুষটাব জোবেব দিক যাচাই কবাব লোভও হযেছিল। সুমিত্রা কথা দিয়েছিলেন, দু'বছব অপেক্ষা কববেন।

...শ্বশুববাডিব আদবকাযদাব সঙ্গে কোনদিনও নিজেকে মেলানো সম্ভব হযনি বমেন চৌধুবীব। এই বকম অসম বিযেতে সুমিত্রাব বাবা-মাযেব এবং বিলেত-ফেবৎ এঞ্জিনিযব দাদার একটুও সায ছিল না। কিন্তু আদবকাযদা ভুলে কালচাবড মেযেব সিদ্ধান্তও সবাসবি কেউ বাতিল কবে দেননি। সুমিত্রা বিজযীব গলায মালা যেমন দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে বাপেব বাডির আভিজাত্যেব ছটাও তেমনি পুবেপুবি সঙ্গে কবে নিযে এসেছিলেন। এদিক থেকে স্বামীটিকে উপযুক্ত কবে তোলা যেন একটা বড দাযিত্ব তাঁব। গোডায় গোডায় মজাই পেতেন রমেনবাবু। পবে সন্তর্পণে শ্বশুববাডিব সংস্রব এডিযে চলতে চেষ্টা কবতেন। নিবলস প্রবল কর্মী পুরুষ তিনি, কিন্তু শ্বশুববাডিব অন্য সকলের কথা বাদ দিযে সুমিত্রাবও এজন্যে তাঁব প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আছে মনে হত না। সুমিত্রার যা কিছু পবামর্শ সব তাঁব বাবা মা দাদাব সঙ্গে।

বমেনবাবু সহজে কিছু বলতেন না। আব যদি কখনো কিছু বলেন, সুমিত্রা সঙ্গে সঙ্গে টেনে ধবতেন—তুমি যা বোঝ না তা নিযে মাথা ঘামিও না।

এই থেকেই বিরোধেব সূচনা ক্রমশ। বছব না ঘুবতেই কোলে ছেলে এলো, সুমিত্রাব চোখে এও যেন মেহনতী মানুষেব বিবেচনার অভাব। সাফ জানিযে দিযেছেন, আব ছেলেপুলে নয। এই লোকেব প্রতি নির্ভর করতে না পেরে নিজেই তিনি সাবধান হয়েছেন। আব এই এক ছেলে সুমুও বড হতে থাকল তাঁব মাযেব আব মামা-বাডিব হেপাজতে থেকে। এ ব্যাপাবেও বমেনবাবুব বক্তব্য বা বিবেচনা কেউ গাযে মাখেন না।

কিন্তু ওপবওযালা শোধ নিচ্ছেন। ছেলেটা বাপের নেওটা, বাপেব কাছে আসতে পেলে মা বা মামাববাডির দিকে ঘেঁষতে চায় না। দু'-দুটো মাস্টার বাখা সত্ত্বেও স্কুলের পরীক্ষায় কোনদিন প্রথম দশজনেব মধ্যেও তার নাম দেখা যায় না। মা শাসন করতে গেলে ছেলে বাপের কাছে পালায়। ওকে নিযে স্বামী-স্ত্রীব মধ্যে ঝগডা বেড়েই চলে। বাপ ছুটির দিনে বাগানের কাজে হাত দিলে ছেলে সোৎসাহে কোদাল দিযে মাটি

কোপায়, জলনিকাশের নালা তৈরি করে। আর তাই দেখে মাযেব হাড়পিত্তি জ্বলে। সুমিত্রার মনেব তলায় সব থেকে বড় আশঙ্কা, ছেলেটা বাপেব মতো হযে উঠছে। এই আশঙ্কা চাপাও থাকে না সব সময়। তখন স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া অনিবার্য।

এঞ্জিনিযব দাদুব ইচ্ছে ছিল নাতি মস্ত ডাক্তার হোক। আর এঞ্জিনিযর মামাব ইচ্ছে ভাগনে বড় এঞ্জিনিযবই হোক। কিন্তু দু'দুটো বাছাই করা মাস্টার রাখা সত্ত্বেও সুমু সকলেব আশায ছাই দিযে হাযাবসেকেণ্ডাবিতে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস কবে বসল। এব ফলে সুমিত্রাব যত বাগ গিযে পডল ছেলেব বাপেব ওপর। আব বাপ বলল যা হযেছে হযেছে, কত ছেলে তো থার্ড ডিভিসনে পাশ কবে।

এই নিয়ে শেষে তুমুল বির্তক আব তাবপব সুমিত্রাব বাগ কবে বাপেরবাড়ি প্রস্থান। ইদানীং এই বাগারাগি আব প্রস্থান একটু ঘন-ঘনই হচ্ছিল।

বাবা আব ভাইযেব পবামর্শে সুমিত্রা এবপব ছেলেকে বি. এসসি অনার্স পডালো। উদ্দেশ্য, এতেও ভাল ফল হলে ডাক্তাব অথবা এঞ্জিনিযাব কিছু একটা হওয়া সম্ভব। অনেক টাকা মাইনে গুনে গোডা থেকে দু'জন প্রোফেসার বাখা হল। পডাশোনাব ব্যাপারে সুমিত্রা এবাব ছেলেব ওপরেও নির্মম। কিন্তু বি. এসসিব ফল বেরুতে এবাবেও সুমিত্রাব মাথায় বজ্রাঘাত। ছেলে অনার্সই পায় নি, পাস কোর্সে পাস কবেছে।

পাঁচ মাস আগেব সেই মর্মান্তিক ব্যাপারটা ঘটে গেল এই নিযে। দোষের মধ্যে হেসে হেসে বমেনবাবু বলেছিলেন, অনেক তো দেখলে, এবারে ছেলেটাকে বেহাই দিয়ে আমাব হাতে ছেড়ে দাও। আমাব সঙ্গে বেবোক, কাজকর্ম শিখুক—ভালোই কববে।

শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন সুমিত্রা।—ওব ভবিষ্যৎ নিযে কেউ তোমাকে মাথা ঘামাতে বলেনি, তুমি কুলিমজুব ঠেঙাচ্ছো ঠেঙাও—

বমেনবাবুও সশ্লেষে বলে উঠেছেন, আমাকেও তুমি একটু বডগোছেব কুলিমজুবই ভাবো জানি—আব ঠিকই জানো, আমাব ছেলে ওই কুলিমজুবেব কাজটাই ভালো পাববে। আব তাতে লজ্জাবও কিছু নেই, সেটা মগজে একটু বুদ্ধি থাকলে এত দিনে বুঝতে। তোমাব বাবা আব দাদা শুনলাম এবাবে সুমুকে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্সি পডাতে বলেছে আব তুমিও তাই শুনে নাচছ—কিন্তু আমাব কাছে শুনে বাখো তাতে ভস্মে ঘি ঢালা হবে—আব কিছু হবে না।

সুমিত্রাব খবখবে দু'চোখ তাঁব মুখেব ওপব স্থিব খানিকক্ষণ।—অভদ্রেব মতো চেঁচিও না, সুমুর ব্যাপাবে কেউ তোমাব পবামর্শ চাযনি।

রমেনবাবু আবো উগ্র।—কেন কেউ চায নি? কেন তুমি চাও নি?

—তোমার সে যোগ্যতা আছে ভাবি না।

—সেটা ভাবতে হলে নিজেবও কিছু যোগ্যতা থাকাব দবকার। ভাববে কি কবে, বক্ত-জল-কবা টাকা মুঠো মুঠো খরচা করতে পেলে তোমাব মতো কালচাবের ছটা সকলেই দেখাতে পারে—বুঝলে?

বাগে মুখ সাদা সুমিত্রার।—আবাব বলছি, ছোটলোকেব মতো চেঁচিও না। এই কালচাবের পিছনেই হাতজোড করে ছুটেছিলে একদিন—

ছোটলোক শুনে মাথায় রক্ত উঠল রমেনবাবুর।—আমি সত্যিকারের গাধা বলেই এমন ভুল করেছিলাম, এখন সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

খাটের বাজু ধরে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলেন সুমিত্রা।— এখন সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছ?

—স্বামীকে ছোটলোক বলার পরেও বুঝতে পারা উচিত নয় ভাবছ?

—ঠিক আছে। বুঝতে যখন পেরেছ, আমার ব্যবস্থা আমি এখনো করব— ছেলে সি. এ. পড়বে কি পড়বে না!

—পড়বে না, পড়বে না। রমেনবাবু এতকালের সব আক্রোশ উজাড় করে দিতে চাইলেন।—আমার মতো ছোটলোকের ছেলে আমার মতোই ছোটলোক হবে। তোমার বাবা-মাকে গিয়ে বলো, তাঁদের ঘরের নাতি-নাতনীকে এক-একখানা করে হীরে-জহরত বানাতে—আমার ছেলের দিকে তাকাতে হবে না।

সুমিত্রা শেষবারের মতোই যেন দেখে নিলেন তাঁকে। তারপর বললেন, তোমার ছেলেও আর তাহলে তোমার ছেলে থাকবে না।

ছেলেকে নিয়ে সুমিত্রা বাপেরবাড়ি চলে গেলেন। সুমুর যাবার ইচ্ছে থাকুক আর না থাকুক, মার অবাধ্য হবার সাহস নেই। এবারে যাওয়াটা অন্যান্য বারের যাওয়ার মতো নয় রমেনবাবু সেটা অনুভব করেও চুপ একেবারে। তাঁর গোঁ চেপে গেছে। শ্বশুরের প্রথম চিঠি পেয়ে আরও তেঁতে উঠেছিলেন। মেয়ের কাছে তাকে মাপ চাইতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় চিঠিতে ডিভোর্সের হুমকি— সে চিঠির জবাব রমেনবাবু দিয়েছেন। আর তারপর থেকে শেষ ফয়সলার জন্যেই প্রস্তুত হতে চেষ্টা করছেন।

কিন্তু বুকের ভিতরটা খালি-খালি লাগে। তার ফলে নরম হবার বদলে নিজের ওপরেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন তিনি।

পাঁচ মাস বাদে এই সকালে আচমকা পট পরিবর্তন। ছেলেকে নিয়ে সুমিত্রা নিজে থেকে ফিরে এসেছেন। শুধু তাই নয়, ছেলের প্রতি মায়ের নির্দেশ, এবার থেকে সে বাপের সঙ্গে বেরোবে, তাঁর কাছে কাজ শিখবে।

বঘুর সঙ্গে সুমিত্রাও রান্নায় হাত লাগিয়েছেন আজ। সেই ফাঁকে সুমুকে আবার কাছে ডাকলেন রমেনবাবু। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার রে, তোর মায়ের হঠাৎ এরকম মত বদলালো কেন?

শুনে ছেলে প্রথমে হাসতে লাগল। তারপর বলল, মা আমাকে কিছু বলেন নি, কিন্তু আমি জানি কেন বদলালো।

—কেন? রমেনবাবু আরো উদগ্রীব।

চাপা আনন্দে সুমু এবারে যে চিত্রটি তাঁর সামনে তুলে ধরল, রমেনবাবুর মুখে আর কথা সরে না। দু'কান ভরে শোনার মতোই বটে।

...মায়ের মেজাজ খারাপ, সুমুর দাদু তাই সকলকে নিয়ে মাদ্রাজে বেড়াতে গেছলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে ধীরেসুস্থে ডিভোর্সের মামলার ব্যবস্থা করার কথা। সুমুর মামাও দাদুর দিকে।

...মাদ্রাজে মস্ত সফট ড্রিংক-এর বেস্তোরাঁ আছে। সকলে সেটাকে শেঠজীর 'ঠাণ্ডা ঘর' বলে। বিরাট ব্যাপার। বড় বড় লোকেরা গাড়ি হাঁকিয়ে আসে সেখানে। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত জমজমাট ব্যাপার। দিশী বিলিতি যাবতীয় কোল্ড ড্রিংক-এর বিশাল এয়ারকনডিশন বেস্তোরাঁ। কত বেয়ারা আর বয় খাটছে ঠিক নেই।

সুমুরা দল বেঁধে সেই কোল্ড ড্রিংক-এর বেস্তোরাঁয় তিন-চার দিন গেছে। ঠাণ্ডা ঘরের মালিক আধবয়েসী শেঠজীকে মারসিদিস গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে। কিন্তু সুমুরা তাঁর ওপর মনে মনে খুশী নয় তেমন। গদিতে বসে শ্যেনদৃষ্টি মেলে সকলের কাজের তৎপরতা দেখেন, খদ্দেরকে খুশী করার ব্যাপারে বয় বা বেয়ারাদের এতটুকু ত্রুটি দেখলে তাকে কাছে ডেকে চাপাগলায় বেশ করে ধমকে দেন।

এদের মধ্যে একটি 'বয়' সকলের দৃষ্টি কেড়েছিল। বছর তের-চৌদ্দ বয়েস। ফুটফুটে গায়ের রং-ভারী মিষ্টি চেহারা। একমাথা কোঁকড়া চুল। ডাগর চোখ। ছেলেটা যেন সারাক্ষণ উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ফুটছে। খদ্দের দেখলেই ছুটে যাচ্ছে, ছাপা মেনু কার্ড সামনে রেখে যাচ্ছে। খদ্দের জিজ্ঞাসা করলে কোন ড্রিংক-এর কি বৈশিষ্ট্য গড় গড় করে বলে যাচ্ছে। প্রথম দিন কি নেবে সুমুরা ঠিক করে উঠতে পারছিল না বলে ছেলেটা মিষ্টি গলায় সুমিত্রাকে বলল, চকোলেট দেওয়া ক্রিম মিলক শেক সিন ম্যাডাম, আমি বলছি ভালো লাগবে।

চার্ট দেখে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, প্লেন পাইনঅ্যাপেল মিলক শেক-এর থেকে দাম বেশী কেন?

সোৎসাহে ছেলেটা বোঝালো কেন দাম বেশী। একটা ইলেকট্রিকে তৈরী হয়, অন্যটা হাতের কাজ। এতে রিস্ক বেশী, মেহনত বেশী। গড় গড় করে আরো কত কি বলে গেল ঠিক নেই।

সমস্ত বেস্তোরাঁয় ওই একটা ছেলে যেন ফুলের মতো মিষ্টি সৌরভ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সকলে তাকে ডাকে, সকলে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ফলে ছেলেটার ছোটাছুটির বিরাম নেই। অমন সুন্দর ছেলেটা যেন এই কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছে।

সুমুর মামী আবার একটু-আধটু গল্প-টল্প লেখেন। তাঁর ধারণা, বড় দুঃখের জীবন নিশ্চয় ছেলেটার। ভদ্রঘরের ছেলে যে তাতেও সন্দেহ নেই। অভাবের দায়ে হয়তো অসুস্থ বাপ-মা এই বয়সের এমন ছেলেকে এমন কাজে ঠেলে দিয়েছে।

সেদিন রাত সাড়ে দশটায় সুমুরা সকলে মিলে সেই ঠাণ্ডাঘরে গেছল।

খদ্দেরের ভীড় তখন বেশ হালকা। এবারে দোকান বন্ধ হবার কথা। তাদের দেখে সেই ছেলেটা ছুটে এল। এই ক'দিন তার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে। কিন্তু গল্প করার সময় ছেলেটা পায় না, ছেলেটা তখন দস্তুরমতো ক্লান্ত, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম— তবু হাসি মুখ।

তাকে দেখে সুমিত্রার বাবা মা দাদা বৌদি সকলের মায়া হল। আর রাগ হল দোকানের মালিক ওই শেঠজীর ওপর। দোকান বন্ধের আগে গদিতে বসে তখন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গুনছে। এদের রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের ষোল আনা ওই লোকটাই শুষে নিচ্ছে। এরা হয়তো দু'বেলা ভালো করে খেতেও পায় না, আর ওই নিষ্ঠুর মালিক

মাবসিদিস হাঁকিযে বেডাচ্ছে।

ছেলেটাব নাম শঙ্কব। সেই বাতে সুমিত্রা তাকে এক গেলাস কোল্ড ড্রিংক খাওযাতে চেষ্টা কবলেন, কিন্তু ছেলেটা একবাব দূবেব মালিকেব দিকে চেযে হাসিমুখেই মাথা নাডল। অর্থাৎ এখন খাবে না। পাছে ছেলেটাব কাজেব ক্ষতি হয, সেজন্য কেউ আব তাকে পীডাপীডি কবল না। কাজেব ক্ষতি হলেই তো ওই অককণ মালিকেব কাছে বকুনি খাবে। সুমিত্রা জিজ্ঞাসা কবলেন, আজও তুমি সেই বিকেল সাডে পাঁচটায এসেছ?

—না, আমি পাঁচটায আসি। আধ ঘণ্টা আগে এসে সব দেখেশুনে নিতে হয।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা কবলেন, সকাল থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কি কবো?

—সকালে বাডিতে পডি, তাবপব স্কুলে যাই— তাবপব বিকেলে খেযেদেযে দোকানে আসি।

—বোজ?

—বোজ।

সুমিত্রাব বউদি জিজ্ঞাসা কবলেন, বাডিতে তোমাব কে আছেন?

—সবাই আছে।

—বাবা-মা?

ছেলেটা মাথা নাডল। অর্থাৎ আছে। তাবপব মিষ্টি হেসে বলল, আমাব ভাইবোন দুটো ছোট তো, তাই মা আব দোকানে আসতে পাবে না। তাবপব সকলকে হতবাক কবে দিযে অদূবে গদিতে বসা দোকানেব মালিক শেঠজীকে দেখিযে বলল, ওই তো আমাব বাবা, দোকান বন্ধ হলে বাবাব সঙ্গেই আমি বাডি ফিবি। তাবপব লজ্জা-লজ্জা মুখ কবে বলল, বাবা বুডো হেযে গেলে আমাকেই তো এত বড দোকানখানা চালাতে হবে, তাই বোজ বিকেলে বাবা আমাকে সঙ্গে কবে নিযে আসে আব সেই বাতে একেবাবে দোকান বন্ধ কবে একসঙ্গে বাডি যাই। আমাব খুব ভালো লাগে। আব বাবা যখন নিজে কডা খদ্দেব সেজে টেবিলে বসে আমাকে সার্ব কবতে বলে আব গম্ভীব মুখে মিথ্যে মিথ্যে দোষ বাব কবতে থাকে, তখন কি মজা লাগে না! আমাব কিন্তু তখনো হাসাব উপায নেই, সত্যিকাবেব খদ্দেবেব মতোই তাকে বুঝিযে ঠাণ্ডা কবতে হয।

সুমুব শেষ কথায সস্মিত ফিবল যেন বমেনবাবুব। সুমু বলছে, ছেলেটাব সেই মিষ্টি মিষ্টি হাসি দেখে আব মিষ্টি কথা শুনে মাযেব মুখখানা যা হযে গেল না—তুমি বিশ্বাস কবতে পাববে না বাবা।

তাবপব বাডি এসেই আমাব ওপব ওই হুকুম। শুনে দাদু আব দিদা বাগ কবলে, কিন্তু মা আব কোন কথায কানও দিল না। তাবপব আজ হাওডা স্টেশানে পা দিযেই আমাকে নিযে সোজা এখানে চলে এলো।

সুমিত্রা ঘবে ঢুকতেই ছেলে আব বাবা সচকিত। মাযেব সঙ্গে চোখাচোখি হতে সুমু যেন ধবাই পডে গেল। লজ্জা পেযে তক্ষুনি প্রস্থান কবল।

বমেনবাবু সুমিত্রাব দিকে চেযে আছেন। সুমিত্রা তাঁব দিকে।

...বাইশ বছব বাদে দু'জনে দু'জনকে নতুন কবে দেখছেন।

তপ

মহিলাকে প্রথম দিন দেখেই মনে হয়েছিল, গল্প আছে।

কথাটা সুবল মিশ্রকে বলেছিলাম। সুবল মিশ্রর দেশ উড়িষ্যায়, বিদ্যালাভ পশ্চিম বাংলায় তথা কলকাতায়, কর্মস্থল এই সুদূর ব্রহ্মপুত্রের দেশে। আমার সঙ্গে আলাপ এবং হৃদ্যতা ছাত্রজীবন থেকে। একই হস্টেলে একই ঘরে থাকতুম। এখন সে পয়সাঅলা লোক, চা-চালানের কারবারী। বছরে বার পাঁচেক কলকাতায় আসে। তাই যোগাযোগ আছে। আগে সে নিজে থাকত উড়িষ্যায়, তার কর্মচারী থাকত আসামে। বছর তিনেক হল নানা কারণে সে নিজেই আসামে স্থায়ী প্রবাসী হয়েছে।

সম্প্রতি আমি তার অতিথি।

তার ডেরা থেকে দু' মাইল দূরে মাতৃকুটীরের মায়ের প্রসঙ্গে আমার ওই উক্তি যে তার কাছে এমন কৌতূকের ব্যাপার হবে জানতাম না। দু'দিন বাদে আবার যখন তাকে সঙ্গে করে এলাম মহিলার কাছে, তখন সে একঘর লোকের সামনেই আমাকে নাজেহাল করল। বলল, মা ভালো ডাক্তার, শুনেছি বাতাস টেনে রোগের গন্ধ পায়, আমাদের সাহিত্যিকও তেমনি আপনাকে দেখেই গল্পের গন্ধ পেয়েছে। সেদিন আপনাকে দেখে গিয়ে বলছিল, গল্প আছে।

ঘরে আমার অপরিচিত যে ক'জন ছিল সুবল মিশ্রর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারা হেসে উঠল। ঘরে মা অর্থাৎ মহিলার কৃতী ছেলে আর ছেলের বউ ছিলেন। ছেলে আমাদেরই বয়সী। আগের দিনের আলাপে তাঁকে স্বল্পভাষী মনে হয়েছিল। সুবল মিশ্রর কাছে শুনেছি মহানন্দ ঘোষ অর্থাৎ ওই ছেলে কলকাতার নাম-করা ব্যারিস্টারদের একজন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বছরে দু'বার মায়ের কাছে আসেন—পুজোর ছুটিতে আর গরমের ছুটিতে। মায়ের ছেলে-অন্ত প্রাণ, কিন্তু এ-জায়গা ছেড়ে তিনি নড়তে চান না। তাই ছেলেকেই ছুটে আসতে হয়। সুবল মিশ্র শুনেছে, এখানে বছর পনের আগেও ছোট পড়ো বাড়ি ছিল একটা। জায়গাটা এখনই নির্জন, এর থেকে অনেক বেশি ফাঁকা ছিল তখন। দেখতে দেখতে ছেলের পসার হয়েছে, উপার্জনের টাকা দিয়ে প্রথমেই তিনি এই ছিমছাম বাংলো প্যাটার্নের মাতৃকুটীর স্থাপন করেছেন। শোনা যায় সেই পড়ো বাড়িতে সকন্যা এক বৃদ্ধ থাকতেন। সে প্রায় তিন যুগ আগের কথা।

শুধু মাতৃকুটীর স্থাপন নয়, সুবল মিশ্রর মুখে শুনেছি মাতৃভক্ত এই ব্যারিস্টার ছেলে মায়ের নির্দেশে এখানকার গরিবদের হাসপাতালে কত টাকা দিয়েছেন আর ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় গ্রাম থেকে মানুষ বাঁচানোর জন্য কত সময় কত টাকা ঢেলেছেন ঠিক নেই।

শুনে ভালো লেগেছিল। তবু প্রথম দিনের আলাপে ভদ্রলোকের বাকসংযম কিছুটা কৃত্রিম মনে হয়েছিল আমার। ওটুকু পয়সাঅলা নাম-করা ব্যারিস্টারের মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলাম। আর মনে হয়েছিল, চেহারাখানা ভদ্রলোকের এখনো বহুজনের মধ্যে চোখে পড়ার মতই নিখুঁত সুন্দর, সেই কারণেও হয়ত একটু সচেতন এবং মিতভাষী।

হাটে হাঁড়ি ভাঙার মত করে সুবল মিশ্র মায়ের প্রসঙ্গে আমার মন্তব্য ফাঁস করার সঙ্গে সঙ্গে আজ এই নামী ব্যারিস্টার ভদ্রলোকের দৃষ্টিটা যেন আমার মুখের ওপর থমকাতে দেখলাম কয়েক মুহূর্ত। শুধু তাই নয়, তাঁর স্ত্রীটির চোখেমুখেও নীরব চাপা বিস্ময় দেখা গেল। আর এই কারণেই আমার আবারও মনে হল, গল্প আছে।

মা হাসছেন মিটি মিটি। ষাটের কাছাকাছি বয়েস এখন। বয়েসকালে বেশ সুশ্রী ছিলেন বোঝা যায়। হাসিটুকু আরো কমনীয়। তার ওপর বুদ্ধির ছাপ।

ঘরে আর যারা ছিল তার বেশির ভাগই ওষুধপ্রার্থী। কেউ ওষুধ নেবে, কারো বা পুরনো ওষুধ ফুরিয়েছে, এখন কি করবে জিজ্ঞাসা। মা একে একে তাদের বিদায় করলেন, কাউকে ওষুধ দিলেন, কাউকে বা বললেন, অনেক ওষুধ খেয়েছ আর কাজ নেই। সুবল মিশ্র বলে, মা পাকা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। আগে যাদের পয়সা জুটত না তারাই শুধু চিকিৎসার জন্যে মায়ের কাছে এসে জুটত। অনেকের অনেক কঠিন ব্যামোও মায়ের ওষুধে ভালো হয়েছে নাকি। ওষুধে ভালো হয়েছে কি মায়ের কোন রকম দৈবশক্তি আছে সেই বিশ্বাসে—বলা শক্ত। প্রচারের ভার তারাই নিয়েছে। অনেক দূর থেকেও হামেশাই রোগী আসে এখন। আর শুধু অভাবী লোকই আসে না, পয়সাঅলা লোকও অনেক আসে। এ সব ব্যাপারে বিশ্বাস বস্তুটা রোগের মতই সংক্রামক বলা যেতে পারে।

মা ডাক্তার কেমন জানি না, কিন্তু রীতিমত শিক্ষিত যে তাতে সন্দেহ নেই। এই বসার ঘরেই একটা আলমারি হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত নানা রকম বিদেশী বইয়ে ঠাসা। কোথাও কোনো নতুন বই আর ভালো বইয়ের সন্ধান পেলেই তিনি ছেলেকে লেখেন আর ছেলে দেশ থেকে হোক বা বিদেশ থেকে হোক সে-বই সংগ্রহ করে মাকে পাঠাবেন। সবসময় লিখতেও হয় না, ছেলে নিজে থেকেও কোনো নতুন বইয়ের সন্ধান পেলে মায়ের জন্য কিনে ফেলেন। সুবল মিশ্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে মাকে এ-সব বই পড়তে দেখেছে—পড়ে পড়ে দাগ দিতে দেখেছে।

মহিলাকে প্রথম দিনই আমার ভালো লেগেছিল। সকলেরই লাগে শুনি। তার হাসিমাখা চোখ দুটিতে সকলের জন্যেই যেন স্নেহ সঞ্চিত। কথাবার্তা স্বচ্ছ, স্পষ্ট। বড়লোকের স্ত্রী ছিলেন নাকি, আর মস্ত বড়লোকের মা তো বটেই। তাঁর এ-রকম অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা মানুষকে কাছে টানবে তা আর বিচিত্র কি। ছুটি ফুরোলে ছেলে যখন সপরিবারে কলকাতা যাবেন তখনো তার মায়ের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তার মা এই তিন চার মাইল জোড়া গোটা এলাকার অজস্র লোকের মা। বাড়িতেও বারোমাস ক'টি দরিদ্র ছেলে থাকে। তাছাড়া কাজকর্ম করার লোকজন তো আছেই।

মহিলা বিধবা। কোরা বা এমনি সাদা থান পরেন না কখনো। সর্বদাই তসরের বা মুগোর থান পরেন। এও সুবল মিশ্রর মুখে শোনা। কতজনে কত দামী তাঁতের থান এনে মাকে প্রণাম করে যায়। মা সে-সব গরিব দুঃখী বিধবাদের চুপিচুপি বিলিয়ে দেন। এমনি থান পরতে দেখলেই নাকি তাঁর ছেলের মুখ ভার হয়। অতএব ছেলের যেভাবে মাকে সাজিয়ে আনন্দ সেইভাবেই সাজেন তিনি।

ছেলেব এই পছন্দেব সঙ্গে আমি নিজেও দ্বিমত হতে পাবিনি। সত্যিই এই বেশে ভাবি সুন্দব দেখায তাঁকে। সামনে এলে প্রথমেই মনে হয না তিনি বিধবা। শুচিস্নিগ্ধ এই বেশ দেখলে দৃষ্টি প্রসন্ন হয।

ওষুধপ্রার্থী আব উপদেশপ্রার্থীদেব বিদায দিযে তিনি আমাব দিকে ফিবলেন। সকৌতুকে নিবীক্ষণ কবলেন একটু। তাবপব বললেন, হ্যাঁ, আছে তো গল্প, তুমি লিখবে?

আমি অপ্রস্তুত। সুবল মিশ্রব পুলকিত বদন। নামী ব্যাবিস্টাব ছেলেব মুখে বিড়ম্বনা গোপনেব প্রযাস। তাঁব স্ত্রীব মুখে কৌতুকব্যঞ্জনা।

মা আবাব বললেন, সেদিন তুমি চলে যাবাব পব বউমা বলছিল, লেখক হিসেবে তোমাব নাকি খুব নাম-ডাক, তোমাব অনেক গল্প-উপন্যাস ওব পড়া। এখন তো দেখছি ও ঠিকই প্রশংসা কবছিল, দিব্বি চোখ আছে—গল্প যে আছে সেদিন একঘন্টা এখানে বসেই তুমি বুঝলে কি কবে?

তামাসা কবছেন কিনা বোঝা গেল না, কাবণ সুবল মিশ্রব মুখে মহিলাটিব হাসি-কৌতুকেব গল্পও শোনা আছে। বললাম, আব লজ্জা দেবেন না।

তিনিও হেসে উঠলেন, লজ্জা কি, অনুভব কবাব মত চোখ আব মন আছে বলেই ধবে ফেলেছ—উল্টে বাহাদুবীব কথা তো। হাসিমুখে তিনি ছেলেব বউযেব দিকে তাকালেন একবাব, তাবপব আবাব বললেন, ওই বউমাকে যদি ভালোমত ধবতে পাবো, একটা গল্প পেযেও যেতে পাবো—তবে তোমাকে খুব সাবধানে লিখতে হবে, ও গল্প লিখতে না পাবুক বাড়িযে বলতে ওস্তাদ।

ছেলেব বউযেব নাম উর্মিলা। বছব সাঁইতিবিশ-আটতিবিশ হবে বযেস। ইনিও মন্দ সুশ্রী নন, তবে তাঁব রূপবান স্বামীটিব তুলনায কিছুই নয। কিন্তু ভদ্রলোকেব তুলনায অনেক বেশি হাসিখুশী। এই গুণেবও একটা রূপ আছে। শাশুড়ীব কথায লজ্জা পেলেন হযত, কিন্তু ঠিক দেখলাম কিনা জানি না, তাব দিকে চেযে একটা চাপা উদ্দীপনাব আভাসও চোখে পড়ল যেন।

মাযেব হাসিমাখা দৃষ্টি এবাবে ছেলেব মুখখানা চড়াও কবেছে।—ও কি! তোব মুখ অত গম্ভীব কেন? পাছে মাযেব ঠুনকো মর্যাদায ঘা পড়ে সেই ভযে বুঝি?

এবাবে ছেলে অপ্রস্তুত। হেসেই জবাব দিলেন, তোমাব মর্যাদায ঘা দিতে হলে একে কলম ছেড়ে অন্য কিছু ধবতে হবে।

মা-টি ছদ্মগাম্ভীর্যে তক্ষুনি আমাব দিকে ফিবলেন, থাক বাবা, তোমাব লিখে কাজ নেই, কোর্টে কাড়ি কাড়ি মিথ্যেব ব্যবসা কবে তো ও আগে থাকতেই ওব বউকে চাটুব বাস্তায চালাতে চাইছে, আব কানাকড়িও সত্যি পাবে না তুমি—এব পব বউমা বলে যদি কিছু, আমাব কাছে যাচাই কবে নিও।

ফেববাব পথে সুবল মিশ্র বলল, আমাব কেমন মনে হচ্ছে, তুমি ঠিকই ধবেছ—মাযেব জীবনে কিছু একটা ব্যাপাব আছে।

—মনে হচ্ছে কেন?

—মাযেব কথা শুনে আব ওই ছেলে আব ছেলেব বউযেব হাবভাব দেখে।

একটু বাদে নিজে থেকেই জানালো, মাকে এখানে স্কুলে সক্কলে ভালবাসে, ভক্তি কবে, আপদে-বিপদে ছুটে আসে তাঁব কাছে। মাযেব সর্বদাই হাসিমুখ আব সর্বদাই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত। বিশেষ কবে ছেলে, ছেলেব বউ, নাতি-নাতনী এলে তো কথাই নেই। যত হাসিখুশী ততো ব্যস্ত।...কিন্তু একদিন মাযেব সে-এক অদ্ভুত মূর্তি দেখেছিল সুবল মিশ্র। কাব মুখে শুনেছিল, মাযেব একটু জ্বব-ভাব হযেছে। কিন্তু সমস্ত দিন দেখতে যাওযাব ফুবসত মেলেনি। সময হল বাত আটটাব পবে। শীতকাল তখন। ঘবেব মধ্যেই হাড়ে-হাড়ে ঠোকাঠুকি, নেহাত দাযে না ঠেকলে বাইবে কেউ বেবোয না। কিন্তু সুবলেব ভিতবটা কেমন খুঁতখুঁত কবতে লাগল। তাব পবদিনই বড লেন-দেনেব ব্যাপাব আছে একটা। এব মধ্যে মাযেব শবীব খাবাপ শুনেও যাওযা হল না বলে খুঁতখুতুনি আবো বেড়েই গেল। শেষে আপাদমস্তক গবম পোশাকে নিজেকে মুড়ে সাইকেল আব টর্চ নিযে বেবিযেই পডল সে। মা যদি ঘুমিযে পড়ে থাকেন, খববটা তো নিযে আসতে পাববে।

কিন্তু গিযে দেখে, বাড়িতে যাবা থাকে তাবাই ঘুমুচ্ছে—বাইবেব ঘবে কম্বল মুড়ি দিযে একজন চাকব বসে। চাকবটা জানালো, মা তখনো পূজোব ঘব থেকে বেবোননি।

কি খেযাল হল, পাযে পাযে সুবল ভিতবে ঢুকল। মাযেব বাড়িতে অন্দবমহল বলে কিছু নেই। ভিতবে আগেও দুই একবাব এসেছে। পূজোব ঘবেব দবজাব এক পাট খোলা। গিযে যে দৃশ্য দেখল ভোলবাব নয। গোবিন্দজীব বিগ্রহেব সামনে মা দু'হাত জোড কবে দাঁড়িযে আছেন। চোখ বোজা। সেই হাড়কাঁপানো শীতে মাযেব গাযে একটা গবম জামা বা চাদব পর্যন্ত নেই। তসবেব থানেব আচলটা শুধু গাযে জড়ানো। কিন্তু মা যেন পাথবেব মূর্তি। একটু কাঁপছেন না, একটু নড়ছেন না—নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও নিচ্ছেন কিনা খুব ভালো কবে লক্ষ্য না কবলে বোঝা যায না। সেই পাথবেব মূর্তিব দুই গাল বেযে অজস্রধাবে ধাবা নেমেছে।

হতবুদ্ধিব মত কতক্ষণ দাঁড়িযেছিল সুবল মিশ্র খেযাল ছিল না। কম কবে আধঘণ্টা হবে। ঠায দাঁড়িযে সেই এক দৃশ্য দেখেছে সে। মাযেব সমস্ত দেহে কোনো অনুভূতিব লেশমাত্র নেই। কেবল ওই নীবব নিঃশব্দ কান্না ছাড়া। কেদে কেঁদে মা বুঝি নিজেকে নিঃশেষে ক্ষয না কবা পর্যন্ত ওমনি চোখ বুজে হাত জোড কবে গোবিন্দজীব সামনে দাঁড়িযেই থাকবেন।

যেমন এসেছিল সুবল মিশ্র তেমনি নিঃশব্দেই ফিবে গেছে।

মাতৃকুটীতে আমাব আনাগোনা নৈমিত্তিক হযে দাঁড়াল।

মাযেব সঙ্গে কথা হয। তিনি ব্যস্ত থাকলে ব্যাবিস্টাব মহানন্দ ঘোষের সঙ্গে গল্প কবি। তাঁব স্ত্রী ঊর্মিলাব সঙ্গে কথাবার্তা গল্পগুজব আবো বেশি হয। মা তাও এক এক সময লক্ষ্য কবেন আব মুখ টিপে হাসেন। কখনো বা জিজ্ঞাসা করেন, তোমাব গল্প কতদূব এগোলো?

গল্প এগোচ্ছে কিনা সেটা আমি জানি আব ঊর্মিলা জানেন। একজনেব জানাব

আগ্রহেব সঙ্গে আর একজনেব জানানোর আগ্রহ মিলেছে। কিন্তু সোজাসুজি আমি তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা কবি না, তিনিও সরাসবি কিছু বলেন না। এই জানা আব জানানোর মধ্যে কখনো স্পষ্ট কখনো অস্পষ্ট অথচ অনাযাসে একটা লুকোচুরি খেলা চলেছে যেন। কথাপ্রসঙ্গে কথা ওঠে, যেটুকু বললে চলে, তিনি হযত তাব থেকে একটু বেশি বলেন। আব যেটুকু শুনলে কৌতূহল মেটে, আমি তাব থেকে একটু বেশি শুনতে চাই।

মাকে নিযে সত্যিই কিছু লেখা হবে কিনা ঊর্মিলা নিঃসংশয নন। কিন্তু আগ্রহ যে তাঁবই সব থেকে বেশি সেটা সহজেই বোঝা যায। কথাব মাঝে থমকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কবেন, সত্যিই আপনি লিখবেন নাকি কিছু?

মৃদু হেসে ব্যাবিস্টাব সাহেব আমাকে সতর্ক কবেছেন, লিখতে গিযে আপনি না মশায ফ্যাসাদে পডে যান, মাকে যিনি চেনাচ্ছেন আপনাকে, তিনি নিজেই কিন্তু অন্ধ—

ঊর্মিলা হাসিমুখেই বাগ কবেছেন, বেশ, তুমিই তাহলে ভদ্রলোককে সাহায্য কবো না একটু, মা তো পাবমিশন দিযেইছেন।

হাসিব মধ্যে মহানন্দ ঘোষকে অন্যমনস্ক হতে দেখেছি। একটু চুপ কবে থেকে বলেছেন, মানুষেব ভিতবটা বড বিচিত্র ব্যাপাব, কখন কোন ছোঁযা লেগে কি কাণ্ড যে ঘটে যায!...আমাব এই মাকে দেখা, আকাশ দেখাব মতই সহজ, কিন্তু চেনা বড কঠিন। কথা ক'টা বলেই আত্মস্থ হযে হেসেছেন আবাব, বলেছেন, জোডা অন্ধেব হাতে পডাব থেকে এক অন্ধেব হাতে পডাই নিবাপদ আপনাব পক্ষে।

তবু কথাপ্রসঙ্গে হোক বা জ্ঞাতসাবেই হোক, সাহায্য তিনিও কবেছেন আমাকে। যেটুকু আমি পেযেছি তাই দুর্লভ মনে হযেছে।

ছুটি ফুবোতে ব্যাবিস্টাব সাহেব সপবিবাবে কলকাতা বওনা হয়ে গেলেন। আমাব আবো আগেই ফেবাব কথা ছিল। শিগগীবই ফিবব শুনে তাঁবাও সাগ্রহে আমাকে তাঁদেব সঙ্গী হবাব আমন্ত্রণ জানিযেছিলেন। কিন্তু আমাব কবে যাবাব সময হবে যে শুধু আমিই জানতাম।

তাঁরা চলে যাবাব ঠিক চাব দিন বাদে সন্ধ্যাব পব আমি মাযেব কাছে এলাম। একা। মা তখন পূজোব ঘবে যাবেন বলে পা বাডিযেছেন। আমাকে দেখে দাঁডালেন।

—সুবল বলছিল, তুমি দুই-একদিনেব মধ্যেই চলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, কাল যাব ভাবছি।

মা সাদা মনে বললেন, তাহলে তো নন্দদের সঙ্গে গেলেই পাবতে, এত পথ একা-একা যেতে কষ্ট হবে।

—আপনার জন্যেই থেকে গেছি, আপনি বলেছিলেন লেখা যাচাই করিয়ে নিতে।

মাযেব মুখে প্রথমে বিস্ময, পরে কৌতুক-মাধুর্যেব নীরব বিন্যাস দেখলাম আমি। তাঁর চোখে হাসি, মুখে হাসির আভাস।

—সত্যি লিখেছ নাকি?

আমি মাথা নাডলাম— সত্যি।

—আচ্ছা, এসো।

আমাকে সঙ্গে করে সোজা পুজোর ঘরেই ঢুকলেন তিনি। তাঁর আসন পাতাই ছিল, অদূরে আর একখানা আসন পেতে দিলেন।—বসো, এখানে বসেই শুনি কি লিখেছ।

আমি যা লিখেছি সেটা আর যাই হোক চমকপ্রদ গল্প কিছু নয়। হৃদয়ের চিত্র বলা যেতে পারে। তবে বিচিত্র বটে।

আমি পড়ছি। বাহুল্যবর্জিত খুব সংক্ষেপে আঁকা চিত্র। অদূরের আসনে বসে মা নিষ্পলক আমার মুখের দিকে চেয়ে শুনছেন।

ঘটনার প্রথম পটভূমি এখানেই। এই মাতৃকুটীরের জায়গায় যে ভাঙা বাড়ি ছিল, সেখানে। বাড়িতে থাকতেন বৃদ্ধ দ্বিজেন গাঙ্গুলি আর তাঁর মেয়ে মনোরমা। বয়েস হিসেব করলে দ্বিজেন গাঙ্গুলিকে প্রৌঢ় বলা যেত। অরশাঙ্গ রোগী তিনি, অকালে বার্ধক্য এসেছে।

কলেজের খাতায় মনোরমার নাম ছিল। কিন্তু যেতে কমই পারতেন। প্রথম বাধা বাপের ব্যাধি, দ্বিতীয় বাধা মেয়ের রূপ, তৃতীয় বাধা তাঁর মেজাজ। রূপের কারণে স্তাবকদের অত্যাচার আর মেজাজের কারণে প্রায়ই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব। অসচ্ছল ঘরের রূপের প্রতি মানুষের লোভ বেশি অশালীন হয়ে উঠতে চায়। আর সেই রূপের ওপর মেজাজের ছটা দেখলে তাদের আচরণ আরো বেশি ক্রূর হয়। মনোরমা কলেজে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলেন প্রায়।

(এইটুকু পড়েই আমি মায়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। তাঁর মুখ নির্লিপ্ত, ভাবলেশশূন্য।)

ওই ভাঙা বাড়িতে নতুন একজনের পদার্পণ ঘটল একদিন। কলকাতার প্রেমানন্দ ঘোষ। সবে ল' ফাইন্যাল দিয়েছেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সহপাঠী রণদা চ্যাটার্জীর সঙ্গে আসামে বেড়াতে এসেছেন। রণদা চ্যাটার্জীর বাবার তখন আসামে কর্মস্থল।

বন্ধুকে সঙ্গে করে রণদা চ্যাটার্জী গাঙ্গুলি কাকাকে দেখতে এসেছেন। পাড়ার সম্পর্কে কাকা। কাকার অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গরা এখনো তাঁদের পাশের বাড়িতে থাকেন। এক গাঙ্গুলি কাকাই শুধু সকলের সংস্রব ছেড়ে ওই বাড়িতে বাস করছেন ওই মেয়ের জন্মের আগে থেকে। আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে তাঁর পোষায়নি। কিন্তু বাড়ি ছাড়লেও রণদা চ্যাটার্জীর বাবার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে হৃদ্যতা এবং যাতায়াত।

রণদা চ্যাটার্জী গাঙ্গুলি কাকাকে দেখলেন এবং তাঁর শয্যার পাশে বসে সুখদুঃখের কথা কইতে লাগলেন। প্রেমানন্দ ঘোষ বাড়ির আর একজনকে দেখলেন বার কয়েক, এবং দেখে সাবাক্ষণ বোবা হয়ে বসে থাকলেন। সকলের অগোচরে দু'চোখ তাঁর এই ভাঙা বাড়ির আনাচে-কানাচে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল। যাঁকে এই ঘরের মধ্যে দুই একবার দেখেছেন তাঁকে আবার দেখার জন্য তাঁর নির্বাক দৃষ্টি থেকে থেকে উসখুস করে উঠতে লাগল।

দ্বিজেন গাঙ্গুলি প্রেমানন্দ ঘোষের নামধাম লেখাপড়া ইত্যাদির খোঁজখবর নিলেন।

প্রেমানন্দকে লক্ষ্যও কবলেন ভালো কবে। লক্ষ্য অনেকেই কবে থাকে, অমন সুন্দব চেহাবা শতেকে চোখে পড়ে না। যেমন গাযেব বঙ, তেমনি উঁচু লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্য। দেখে দু'চোখ হঠাৎ চকচক কবে উঠল দ্বিজেন গাঙ্গুলিব। এবপব বাব কযেক মেযেকে তিনি ঘবে ডাকলেন—চা-জলখাবাব দেবাব জন্য, পেযালা নিযে যাবাব জন্য, মশলা দিযে যাবাব জন্য।

তাবপব বণদাব উদ্দেশে অনুযোগ কবলেন, আমাকে একটি ভালো ছেলে দেবাব জন্য কলকাতায তোমাকে চিঠি পর্যন্ত লিখেছি, কিছুই তো কবলে না, এদিকে আমাব এই হাল, কবে আছি কবে নেই, আব সুযোগ পেযে বাজে লোকে হামলাও কবে, দুর্ভাবনায আমি ঘুমুতে পাবি না জানো?

বাড়ি থেকে বেবিযেই বণদা চাটুজ্যে প্রেমানন্দব জেবায পড়লেন।—মেযেব জন্য ভদ্রলোক আসলে তোমাকেই চান বোধ হয?

—না।

—কেন? তুমি দুর্লভ?

—না, ওই মেযে আমাব দুর্লভ। মেযে বাজী হলে সকলেব অমতেই বিযে কবতুম।

—আশ্চর্য! মেযে বাজী নয?

—প্রস্তাব দিইনি কখনো, দিলেও বাজী হবে না। মেযেব দোষেব মধ্যে মেজাজ কড়া।

—কেন বাজী হবে না কেন, তুমি যোগ্য নও?

—একটু বেশি যোগ্য বলে। মনোবমা বামুনেব মেযে নয, কাযস্থ। তোমাব পছন্দ হযে থাকে তো বলো, দ্বিজেন কাকা আকাশেব চাঁদ হাতে পাবেন।

প্রেমানন্দ ঘোষেব হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ লাফিযে উঠেছিল বুঝি। স্তব্ধ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কবেছেন মেযেটি তাহলে তোমাব দ্বিজেন কাকাব মেযে নয বলছ?

—না। তবে মেযেব থেকে ঢেব বেশি।

বণদা চ্যাটার্জী এবপব খোলাখুলিই বলেছেন সব। কাবণ তিনি অনুমান কবেছেন মনোবমাব রূপ দেখে বন্ধুব মাথা ঘুবেছে, আবাব বন্ধুব রূপ দেখে ওদেবও মাথা ঘোবা বিচিত্র নয। নইলে গাঙ্গুলি কাকা অত আগ্রহ নিযে খোঁজখবব কবছিলেন কেন?

যা তিনি নিবেদন কবলেন, তাব ইতিবৃত্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু জটিল একটু। বযেস-কালে দ্বিজেন গাঙ্গুলি ভযানক বেপবোযা ছিলেন আব তাঁব চবিত্রেবও দুর্নাম ছিল। মদ-গাঁজা খেতেন, গান-বাজনা কবতেন। পৈতৃক জমিদাবিব আয ছিল, তাতেই চলে যেত। আজকেব এই ব্যাধিও সে-সমযেব অপচযেব ফল বলেই অনেকে সন্দেহ কবেন।

এক বডলোকেব মেযেকে মনে ধবেছিল তাঁব। তাঁকে সত্যিই ভালোবাসতেন। মেযেটি ঘৃণা কবতেন তাকে, কিন্তু তাঁব গান পছন্দ কবতেন। সেই বাসনায মোহগ্রস্ত। মেযেব দাদাব বন্ধু ছিলেন গাঙ্গুলি কাকা। তাঁবা কাযস্থ। তবু সেই মেযেকে বিযে কবাব জন্য ক্ষেপে উঠেছিলেন তিনি। ফলে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ, গাঙ্গুলি কাকাব বাড়িতেও এ নিযে গঞ্জনা-লাঞ্ছনা। সব বাধা উপেক্ষা কবে ওই মেযেকে নিযে পালানোব ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ কবেছিলেন। কিন্তু মেযেটি টেব পাওযাব ফলে ষড়যন্ত্র বানচাল। আব তা প্রকাশ

হবার ফলে গাঙ্গুলি কাকার অদৃষ্টে দ্বিগুণ লাঞ্ছনা।

মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেল। বড়লোকের বাড়িতেই বিয়ে হল। অনেক দূরে, আসামের বাইরে।

আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে গাঙ্গুলি কাকা এই বাড়িতে এসে আস্তানা নিলেন। আর আত্মঘাতী আনন্দে, অপচয়ের পাঁকে ডুবতে লাগলেন।

বছর দেড়েক বাদে সকালে ঘুম ভেঙে দেখেন, তাঁর শয্যার একধারে দেড়মাসের একটা মেয়ে ঘুমুচ্ছে। রাতের নেশার ঘোর কাটেনি কিনা বুঝলেন না। চোখ কচলে আবার দেখলেন। সত্যিই মেয়ে একটা।

রাতে ঘরের দরজার কপাট খোলা রেখেই শোন তিনি। কোন বাড়ির মেয়ে, কে কখন এসে রেখে গেল। মেয়ের হাতে বাঁধা একটা ভাঁজকরা কাগজ চোখে পড়ল। তাড়াতাড়ি সুতোটা ছিঁড়ে নিয়ে খুললেন সেটা। ছোট্ট চিরকুট।—দয়া করে রেখো ওকে। নিরুপায় হয়েই তোমার আশ্রয়ে রেখে গেলাম। কেউ জানবে না।—মণিমালা।

সেই মেয়ের নাম মণিমালা।

গাঙ্গুলি কাকা হতভম্ব। অনেক ভেবে একসময় মণিমালার বাপের বাড়ি গেলেন। জিজ্ঞাসাবাদ না করেও বুঝলেন, সেখানে কেউ তাঁর খবর রাখে না। ভাবতে ভাবতে গাঙ্গুলি কাকা ফিরে এলেন।

এর ঠিক তিন দিন বাদে কাগজে মণিমালার আত্মহত্যার খবর বেরুলো। তার নাকি মাথাখারাপ হয়েছিল। আত্মহত্যা করার আগে নিজের মেয়েকেও হত্যা করে গেলেন লিখেছেন। কিন্তু সেই শিশুর দেহের কোনো সন্ধান মেলেনি।

কেন এরকম একটা ব্যাপার ঘটল সেই রহস্য আজও অগোচর।

ঘরে একটা শিশু পুষছেন, ছ'মাসের মধ্যেও গাঙ্গুলি কাকা সেটা বাইরে কাউকে জানতে দিলেন না। পরে সকলে জানল, গাঙ্গুলি কাকারই মেয়ে, কোথায় কি কাণ্ড করে বসেছিলেন, এ তারই ফল।

সেই শিশুকন্যাই এই মনোরমা।

গাঙ্গুলি কাকার বাড়িতে প্রেমানন্দ ঘোষের যাতায়াত বেড়েছে। পরে সেটা দু'বেলায় দাঁড়িয়েছে। মনোরমাকে যত বেশি দেখেছেন তিনি তত বেশি নিজেকে হারিয়েছেন। হারাবার নেশাতেই আবার ছুটে এসেছেন। কিন্তু ভিতরে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তাঁর। রক্ষণশীল পরিবার তাঁদের, বাপ সাধারণ উকীল, চেহারার জোরে ছেলে দেখেশুনে শাঁসালো মুরুব্বি ধরবে—ঘরে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা আসবে—সেই আশায় আছেন। অতএব দুর্ভাবনার কারণ বইকি তাঁর। কিন্তু দ্বিজেন গাঙ্গুলির বাড়ি এলে তাঁর সব ভাবনা-চিন্তা নিঃশেষে তলিয়ে যায়। দুনিয়ার বিঘ্ন ঠেলে সরিয়ে ওই মেয়েকে ঘরে নিয়ে তুলতে চান তিনি।

ফেরার দিন দশেক আগে ঘোষণা করলেন, মনোরমাকে বিয়ে করবেন। শুধু তাই নয়, একেবারে বউ নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন। এ প্রস্তাবে আপত্তি একমাত্র রণদা চ্যাটার্জী তুলেছিলেন, সেটা ঠিক হবে না, আগে বাবা-মাকে জানানো দরকার।

প্রেমানন্দ বলেছেন, তাহলে বিয়ে হবে না, তাঁরা রাজী হবেন না।

অন্য কেউ হলে আপত্তি কবতেন, কিন্তু দ্বিজেন গাঙ্গুলি সেই চবিত্রেব মানুষ যিনি অন্য কাবো মতামত বা অনুমোদনেব গুরুত্ব দেন না। তিনি শুধু জিজ্ঞাসা কবেছেন, প্রেমানন্দ মেযেব সম্পর্কে বিস্তাবিত জানেন কিনা। আব বিযে কবলে আব কিছু যে প্রাপ্তিব আশা নেই তাও তিনি স্পষ্ট কবেই বুঝিযে দিযেছেন।

উকীলেব ছেলে প্রেমানন্দ টাকা চেনেন, টাকাব প্রতি তাঁর টানও আছে। কিন্তু তখন সমস্ত চিন্তা তাঁব একটাই। বলেছেন, আর কিছু তিনি আশা কবেন না।

বিয়ে হযে গেল। এমন অনাড়ম্বব বিযে প্রেমানন্দ কল্পনাও কবতে পাবেন না। তবু তখনকাব মত আত্মবিস্মৃত তিনি।

মনোবমাকে নিযে যেদিন কলকাতায বওনা হবেন, তাব আগেব দিন বাত্রিতে দ্বিজেন গাঙ্গুলি মানুষটিকে সত্যিই চেনা গেল। মনোবমাকে তিনি আদেশ দিলেন—ভাবী কাঠেব সিন্দুকটা খুলতে আব তাব ভিতবে একটা উবুড কবা বড হাঁড়িব মধ্যে যে শাড়ি জড়ানো বড পুঁটলিটা আছে, সেটা নিযে আসতে।

নির্দেশ পালন কবা হল। পুঁটলি খুলতেই চক্ষুস্থিব প্রেমানন্দ ঘোষেব। একবাশ পুবনো ধাচেব সোনাব গযনা।

দ্বিজেন গাঙ্গুলি বললেন, বিশ বছব আগেব পঁচিশ হাজাব টাকাব গযনা এখানে, এখন এব দাম কম কবে পযতিবিশ হাজাব হবে—খুব সাবধানে নিযে যাও।

প্রেমানন্দ হতভম্ব! সত্যি দেখছেন বা সত্যি শুনছেন কিনা সেই সংশয। দ্বিজেন গাঙ্গুলি আবাব বললেন, এসবই ওব, পাছে গযনাব লোভে কেউ ওকে বিযে কবতে চায সেজন্যে বলিনি। দেড়মাস বযসে ওব মা শুধু ওকেই বেখে যাযনি ওব মাথাব কাছে এই পুঁটলিটাও বেখে গেছল।

কলকাতা।

প্রেমানন্দব বাবা মা বা আত্মীয পবিজন কেউ এ বিযে ক্ষমাব চোখে দেখেননি। বউ রূপসী সেটা সকলেই দেখেছেন, এমন রূপ সচবাচব চোখে পড়ে না, কিন্তু এই রূপেব পিছনে কাটাব ছাযাও দেখেছেন সকলে। এমন রূপসী মেযেকে এ-ভাবে কে গছিযে দেয? যে-লোক ছেলেব বাপ-মাযেব অনুমতি না নিযে এ-ভাবে মেযে পাব কবল, সেই লোককে ভালো বলা যাবে কেমন কবে? আব ভালো না হলে তাবই আশ্রযে ছিল যখন—এই মেযেই বা কেমন?

প্রেমানন্দ নিজেব বাড়িতে চোবেব মত কাটালেন কিছুদিন। উত্তেজনা একটু থিতিযে আসতে সব খুলে বলে মা-কে বোঝাতে চেষ্টা কবলেন তিনি। ফল তাতে আবো বিপবীত হল। মা-টা কেন আত্মহত্যা কবল? মাযেব স্বভাব-চবিত্র কেমন ছিল? একজন পব-পুরুষেব বাড়িতে মেযে ফেলে বেখে গেল কেন?

যাক, বাড়িব কর্তা পঁযতিবিশ হাজাব টাকাব গযনা পাওযা গেছে শুনেই হযত শেষ পর্যন্ত ত্যজ্যপুত্র কবলেন না ছেলেকে। মোট কথা, ওই গযনা ছাড়া আব কিছুই পছন্দ হল না প্রেমানন্দব বাবা-মাযেব।

তবু মনোবমা যতদিন মুখ বুজে ছিলেন, একবকম কেটেছে। মুখ খুলতেই

গণ্ডগোল শুরু হল। দু'মাস না যেতেই বউযের এক-এক সময় উগ্র মূর্তি দেখে বাড়ির মানুষেরা তাজ্জব। অন্যায় কিছু কানে এলে মনোরমা ফুঁসে ওঠেন। আর কানে তো হরদমই আসছে। বউ সহ্য করে না বলে প্রেমানন্দও বিরক্ত। কখনো বা ক্রুদ্ধ। তারও ফল বিপরীত। কাপুরুষের মত স্বামী অত্যাচারের প্রশ্রয় দেয় বলে তাঁর ওপরেও এক-এক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মনোরমা।

বউযের সাহস আর স্পর্ধা দিনে দিনে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল শ্বশুর-শাশুড়ীর। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তাঁরা সাহস দেখেন, স্পর্ধা দেখেন। কথার জবাবে কথা বললে রাগে সাদা হয়ে ওঠেন তাঁরা। আর সবকিছুর অবধারিত গঞ্জনার ঝাপটা এসে পড়ে প্রেমানন্দর ওপর। রোজার নতুন উকীল, পসারের চেষ্টায় মাথা ঘামাবেন কি, বাড়ির অশান্তিতে নাজেহাল। ফলে বউযের ওপরেই ক্রোধে আরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

এদিকে রণদা চ্যাটার্জী ঘন ঘন বাড়িতে আসেন আজকাল। তাঁর সঙ্গে অমন দেমাকী আর অতি রাগী বউযের সম্প্রীতি একটুও সুনজরে দেখেন না শ্বশুর-শাশুড়ী। ওদিকে এই একমাত্র মানুষকে বেশ সমীহ করতে দেখে প্রেমানন্দর নিভৃতের চিন্তাও বিকৃত রাস্তায় চলতে শুরু করল। মনোরমা রাজী হলে জাত-বর্ণের বাধা বা বাপ-মায়ের আপত্তি তুচ্ছ করেও বিয়ে করতে আপত্তি ছিল না রণদার, এ তো তার নিজেরই মুখেই শুনেছেন। সামনা-সামনি বন্ধুর সঙ্গে কোনো বিবাদের সূচনা হল না বটে, কিন্তু অশান্তির আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকল।

শেষে তুচ্ছ কারণেই দপ করে জ্বলে উঠল একদিন।

কোন এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে পৈতের নেমন্তন্ন ছিল সকলের। প্রেমানন্দ সকালে উঠেই সেখানে চলে গেছেন। বউকে নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীরও সকাল-সকালই যাওয়ার কথা। কিন্তু মনোরমা জানালেন, তাঁর শরীর ভালো না, তিনি যাবেন না।

বউ সাত মাস অন্তঃসত্ত্বা; শরীর ভালো নাও থাকতে পারে, শ্বশুর-শাশুড়ী তার আপত্তিতে কান দিতে চাইলেন না। হুকুম করলেন, যেতে হবে। মনোরমা শাশুড়ীকে জানালেন তাঁর যাওয়া সম্ভব হবে না।

ছুটির দিন। এর একটু বাদে রণদা এলেন গল্প করতে। শ্বশুর-শাশুড়ী দেখলেন বউ তাঁর সঙ্গে দিব্যি কথাবার্তা কইছে।

নেমন্তন্ন বাড়িতে এসে ছেলেকে ডেকে তাঁর বাবা নিজেদের অপমানের ফিরিস্তি দিলেন, আর রণদার সঙ্গে বসে বউ গপ্পসপ্প করছে জানিয়ে তাকে বললেন বউকে নিয়ে আসতে।

মাথার মধ্যে অগ্নিকাণ্ড শুরু হল প্রেমানন্দর। ট্যাক্সি হাঁকিয়েই বাড়ি ফিরলেন তিনি। এসে অবশ্য দেখেন বউ একাই আছে। তবু যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি করলেন। রণদাকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না, একথাও ঘোষণা করলেন। আর বিয়ের ন'মাসের মধ্যে জীবনটা যে তাঁর অশান্তিতে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেল সরোষে তাও বার বার বলতে বাকি রাখলেন না।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, অশান্তির শেষ হবে কেমন করে?

ক্রুদ্ধ গর্জনে প্রেমানন্দ জবাব দিলেন, শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে চিতায় শুইয়ে

দিতে পারলে? বুঝলে? সেই রাস্তা কবে দিতে পারো?

মনোরমার দুই চোখেও তেমনি জ্বলন্ত আক্রোশ আর বিদ্বেষ। জবাব দিলেন না।

প্রেমানন্দ চিৎকার করে উঠলেন, তুমি এক্ষুনি আমার সঙ্গে যাবে কিনা আমি জানতে চাই।

মনোরমা বললেন, না।

প্রেমানন্দ চলে গেলেন, আর ফিরে এসে এর শেষ দেখবেন বলে গেলেন।

কিন্তু সন্ধ্যায় ফিরে এসে বউকে আর বাড়িতে দেখলেন না কেউ। মনোরমা নেই, তাঁর বড় ট্রাঙ্কটাও নেই।

বাড়ির মানুষেরা স্তম্ভিত।

দু'মাস বাদে আসাম থেকে দ্বিজেন গাঙ্গুলির টেলিগ্রাম এলো, মনোরমা মারা গেছে।

ব্যস। বিয়ের এগারো মাসের মধ্যে একটা অধ্যায় শেষ।

প্রেমানন্দ জানেন না ছেলে হতে গিয়ে মারা গেল কি আর কোনো কারণে? মনোরমার মা মণিমালা আত্মহত্যা করেছিলেন। মেয়েও তাই করল কিনা কে জানে?

বউয়ের জন্য এ-বাড়িতে শোক করার কেউ নেই। সংবাদের একঘন্টার মধ্যে প্রেমানন্দর বাবা ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, যাবার সময় বউমা সব ক'টি গয়না তো গুছিয়ে নিয়ে গেছলেন, সেগুলির কি হবে?

এরপর রণদাকেও ডেকে গয়নার কথা বলেছেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেছেন, যাতায়াতের খরচ দিলে আসামে গিয়ে রণদা সেগুলি নিয়ে আসতে পারেন কিনা।

রণদা চাটার্জী মাথা নেড়েছেন— পারেন না।

অগত্যা দিন পনের বাদে তিনিই বউয়ের গয়না চেয়ে অদেখা দ্বিজেন গাঙ্গুলির নামে চিঠি দিয়েছেন একখানা।

জবাব মেলেনি।

প্রেমানন্দ ঘোষের ধাক্কা সামলাতে খুব বেশি সময় লাগেনি। গয়নার কথা শেষে তাঁরও মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। মাস চারেক বাদে দ্বিজেন গাঙ্গুলির নামে শেষে তিনিও চিঠি দিয়েছেন একখানা। লিখেছেন, তাঁর নির্দেশ পেলে বউয়ের গয়না আনতে লোক পাঠাবেন, না নিজেই যাবেন।

নির্দেশ পাননি। জবাব আসেনি।

পরের যবনিকা উঠেছে পঁচিশ বছর বাদে। অ্যাডভোকেট প্রেমানন্দ ঘোষ বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন, বাইরে জায়গাজমি কিনেছেন, ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকাও জমিয়েছেন। কিন্তু মনে শান্তি নেই।

সুমিত্রাকে বিয়ে করেছিলেন বউয়ের মৃত্যুসংবাদ আসার ছ'মাসের মধ্যে। সে সময়ের নাম-করা সিনিয়রের মেয়ে। তা সে-ভদ্রলোক যতই বড়লোক হোন, তাঁর আটটি মেয়ে। সুমিত্রা মাঝের দিকের একজন। অতএব প্রেমানন্দর প্রতি চোখ পড়েছিল তার। সুমিত্রারও পড়েছিল। সে-দিক থেকে প্রেমানন্দর চেহারা প্রধান সহায়। ছেলেটা কালে-দিনে ভালো করবে এটা সিনিয়র ভদ্রলোক বুঝেছিলেন এবং বাড়িতে

বুঝিযেছিলেন। অতএব ঝঞ্ঝাটশূন্য প্রথম স্ত্রী-বিযোগেব বাধাটা বড হযে ওঠেনি।

দ্বিতীয শ্বশুবেব অনুমানে ভুল হযনি। দেখতে দেখতে পসাব বেড়েছে প্রেমানন্দব। কিন্তু দ্বিতীয স্ত্রী অর্থাৎ সুমিত্রাব সঙ্গেও খুব মনেব মিল হল না প্রেমানন্দব। বিযেব দশ বছব বাদেও ঠাট্টাব ছলে বণদা চ্যাটার্জীকে শুনিযেই সুমিত্রা বলেছেন, আপনাব বন্ধুব মনমেজাজ ভালো থাকবে কি কবে, প্রথম বউ মবাব ছ'মাসেব মধ্যে আবাব বিযে কবলেও তাব স্মৃতিতে যে এখনো বুক ভবে আছে।

বণদা চাটুজ্জে টিপ্পনী কাটতেন, গযনাব স্মৃতিতে নয তো?

যত হাসিমুখেই বলুন, জ্বালা ছিলই সুমিত্রাব। দু'জনেব মতেব মিল কমই হত, খিটিমিটি লেগে থাকত। অশান্তি বাড়তে থাকল ছেলেবা বড হযে উঠতে। তিন ছেলে। বড ছেলেব তেইশ বছব বযস, মেজ ছেলেব একুশ, ছোট ছেলেব উনিশ। বাপেব পযসাব দরুন হোক বা মাযেব প্রশ্রযেব কাবণে হোক—পড়াশুনা একজনেবও তেমন হযনি। তাবা বড়লোকেব ছেলে, বড়লোকেব ছেলেব মতই চাল-চলন। এই চাল-চলন দেখে অনেক বকম সন্দেহও প্রেমানন্দব মাথায ঘোবে। সন্দেহ কেন, বড দুই ছেলেব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ হতাশ। ছোটটাও দাদাদেব বাস্তায চলা শুরু কবেছে।

সুমিত্রা ছেলেদেব দোষত্রুটি ঢেকে বাখতেন, ভদ্রলোকেব কাছ থেকে তাদেব আগলে বাখতে চেষ্টা কবতেন। এই কাবণেই সুমিত্রাব সঙ্গে এক-একদিন তুমুল বচসা হযে যেত তাঁব।

প্রেমানন্দব শবীব ভালো যাচ্ছিল না। হঠাৎ কোর্টেই স্ট্রোক হযে গেল একদিন। চিকিৎসাব দাপটে সেবে উঠলেন এ-যাত্রা, কিন্তু এখনো শয্যাশাযী। ডাক্তাব সতর্ক কবেছেন, দ্বিতীযবাব হলে ভযেব কথা। কিন্তু বিপদেব সম্ভাবনাই বেশি দেখছেন প্রেমানন্দ ঘোষ। হার্ট দুর্বল, প্রেসাব হঠাৎ ওঠে হঠাৎ নামে। ভিতবে ভিতবে বিদাযেব জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি।

এই প্রস্তুতিব আভাস ছেলেবা পেযেছে, সুমিত্রা পেযেছেন। প্রেমানন্দ ঘোষেব ধাবণা ছেলেবা দিন গুনছে, বাপ চোখ বুজলে সব তাদেব হাতে আসতে পাবে। স্ত্রীব সামনেই বণদা চ্যাটার্জীকে সেদিন ডেকে বললেন, ছেলেদেব ইচ্ছে কোথায কি আছে না আছে তাদেব বুঝিযে দিই, ওদেব মাযেবও সে-বকমই ইচ্ছে কিনা জানি না—কিন্তু ছেলেদেব হাতে সব পড়লে ফল কি হবে ভগবান জানেন। তাই ভেবেছি একটা উইল কবব, তুমি ব্যবস্থা কবো—এঁব জন্যে অর্ধেক অন্তত আলাদা কবে বাখব ঠিক কবেছি।

বণদা চাটুজ্জে স্পষ্টই সুমিত্রাকে সচকিত হতে দেখলেন।

বন্ধুব কথাব জবাব দিলেন না বণদা চ্যাটার্জী। গম্ভীব। অন্যমনস্ক। হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবলেন, আসাম থেকে কেউ দেখা কবতে এসেছিল তোমাব সঙ্গে?

প্রেমানন্দ ঘোষ অবাক।—না তো, আসাম থেকে কে আসবে?

—একটি ছেলে, এলে শুনো। তাড়া আছে, চলি।

চলে গেলেন। শুধু প্রেমানন্দ নয, সুমিত্রাও বিস্মিত।

পবদিন। প্রেমানন্দ শুযে, তাঁব সামনে বসে বেদানা ছাড়াচ্ছেন সুমিত্রা। বুড়ো

চাকব এসে খবব দিল, সাহেবপানা একটি ছেলে কর্তাবাবুব সঙ্গে দেখা কবতে চান, বললেন, আসাম থেকে আসছেন—অসুখেব জন্যেই দেখা কবা বিশেষ দবকাব।

প্রেমানন্দ ঘোষ ভেবে পাচ্ছেন না কে হতে পাবে? অসুখেব খবব বণদাব কাছে জেনে থাকবে। বললেন, নিযে এসো—

সুমিত্রা চলে গেলেন না অথবা যেতে পাবলেন না। তাছাড়া বাড়িব কর্তাব ঘবে একলা থাকা নিষেধ, আব বাইবেব কেউ এলে বেশি কথা বলাও নিষেধ। চাকবেব কথায মনে হযেছে— অল্পবযসীই কেউ হবে।

যিনি এলেন তাঁকে দেখে ঘবেব দু'জনেই একটু বিশেষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য কবলেন। হাজাবেব মধ্যে এবকম চেহাবা বড দেখা যায না। আব সাহেবপানাই বটে। তাঁকে দেখামাত্র প্রেমানন্দ ঘোষ কেমন বিমূঢ় যেন।

আগন্তুকেব হাতে বড চামডাব ব্যাগ একটা। পবনে ট্রাউজাব আব চকচকে হাফ-শার্ট। তাতেই রূপ ঠিকবে পডছে। ব্যাগসুদ্ধ হাত তুলে ঘবেব দুজনেব উদ্দেশেই নমস্কাব জানালেন।

প্রেমানন্দ ঘোষ ইঙ্গিতে সামনেব খালি চেযাবটা দেখালেন।

চেযাবে বসে হাতেব মোটা ব্যাগেব খুপবি থেকে ছোট্ট একটা মোডক বাব কবে আগন্তুক বললে, এতে একটা কবচ আছে, আপনাব অসুখ জেনে আমাব মা আপনাকে পবাব জন্য বিশেষ কবে অনুবোধ কবেছেন।

প্রেমানন্দ এবং সুমিত্রা দু'জনেই হতভম্ব। ফ্যালফ্যাল কবে খানিক চেযে থেকে প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা কবলেন, আপনাব...মানে তোমাব মা আমাব অসুখ জানলেন কি কবে?

—মাস দুই আগে বণদা কাকাব সঙ্গে দেখা কবতে এসে আমিই শুনে গিযে বলেছিলাম। মাযেব বিশ্বাস, এটা পবলে আপনাব উপকাব হবে।

—তা তোমাব নাম কি বাবা?

—আমাব নাম মহানন্দ ঘোষ।

কোন দুর্বোধ্য কাবণে প্রেমানন্দ আব সুমিত্রা দু'জনেই কি চমকে উঠলেন একটু?

সুমিত্রা চেযেই আছেন ছেলেটিব দিকে। তাঁব কাছে ছেলেব বযসীই, বছব পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বযেস।

আত্মস্থ হযে প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা কবলেন, বণদাব সঙ্গে তোমাদেব কতদিনেব পবিচয?

আমি গেলবাবেই প্রথম দেখলাম।...বিলেতে গিযে ব্যাবিস্টাবি পডাব ব্যাপাবে তাঁব তদবিব-তদাবকে কোনবকম সুবিধে হয কিনা, আলাপ কবতে এসেছিলাম। আমাব বাবাব বিশেষ বন্ধু তিনি।

—তোমাব বাবাব নাম কি?

খুব ধীব স্পষ্ট জবাব এলো, আমাব বাবাব নাম প্রেমানন্দ ঘোষ।

আকাশ থেকে বাজ পডল একটা? নাকি সুমিত্রা আব প্রেমানন্দ দু'জনেই স্বপ্ন দেখছেন? নিঃশ্বাস বন্ধ হবাব উপক্রম প্রেমানন্দব। এত উত্তেজনা ভাল নয। কিন্তু

দু'জনের কারোই তা খেয়াল থাকল না, খেয়াল শুধু মহানন্দ করলেন। বললেন, আপনি উত্তেজিত হতে পারেন ভেবে মা আমাকে আসতে দেবেন কিনা ভাবছিলেন।

প্রেমানন্দব গলা দিয়ে স্বর বেবোয না প্রায়। বিমূঢ় মুখে বললেন, কিন্তু তিনি তো পঁচিশ বছব আগে মারা গেছেন!

—মারা যাননি। আপনি যা চেযেছিলেন টেলিগ্রামে তাই শুধু জানিয়েছেন।

স্তব্ধ মুহূর্ত অনেকগুলো। প্রেমানন্দ ঘোষেব নিষ্ক্রিয মস্তিষ্ক সক্রিয হতে লাগল খুব আস্তে আস্তে। দু' চোখের সমস্ত দৃষ্টি ঢেলে লক্ষ্য কবছেন। ...ভাঁওতা নয, হতে পাবে। চেহাবাই বলছে, হতে পারে। মাযেব মুখের আদল কি নিজেব মুখেব, জানেন না—কিছু একটা বড বেশি স্পষ্ট। কিন্তু পঁচিশ বছব বাদে আজ হঠাৎ এই কবচ পাঠানো কেন? অসুখ বলে?...নাকি বণদাব কাছে সঙ্কটেব সময উপস্থিত শুনে ছেলেব জন্য কোনো সংগতিব ব্যবস্থা চায়? ছেলেকে বিলেত পাঠিযে ব্যাবিস্টাব কবে আনাব উদ্দেশ্যও হতে পাবে। অনেককাল ধবে আইন আব কোর্ট কবে মানবচবিত্রেব দুর্বলতা কিছু বেশিই জেনেছেন তিনি।

অপেক্ষা কবছেন। চেযে আছেন।

মহানন্দ ঘোষ বললেন, বেশি বিবক্ত কবব না, আব একটু কাজ সেবেই আমি যাব—

বড চামডার ব্যাগ খুলে মস্ত একটা প্যাকেট বাব কবে তাঁব সামনে বাখলেন। —এতে আপনাব সব গযনা আছে, মা স্কুলে মাস্টাবি কবে আমাকে মানুষ কবেছেন, এব একটাও খরচ হযনি। দিযে গেলাম—

বুকেব ঠিক মধ্যিখানে প্রচণ্ড একটা আঘাত এসে লাগল যেন। সুমিত্রা মর্তিব মত বসে। প্রেমানন্দ ঘোষ ঘামছেন। পবক্ষণে উঠে বসতে চেষ্টা কবে আর্তনাদ কবে উঠলেন তিনি।

—এগুলো তোমাব মা তোমাকে দিযে পাঠিযে দিযেছেন?

—হ্যাঁ, এগুলোব জন্যে আপনি চিঠি লিখেছিলেন। মা তখন বাগ কবেই দেননি বোধ হয়।

—তা বলে আজ—আজ এই প্রতিশোধ নিল! প্রতিশোধ নেবাব জন্য তোমাকে দিযে এগুলো পাঠাতে পাবল।

সুমিত্রা তাডাতাডি ধবে শুইযে দিলেন তাঁকে। প্রেমানন্দ ঘোষ কাঁপছেন থবথব।

একটু চুপ কবে থেকে মহানন্দ বললেন, তিনি ঠিক পাঠাননি, তাঁব ইচ্ছে বুঝে আমিই নিযে এসেছি। মাযেব কাছে এত গযনা দেখে আমি ভেবেছিলাম আমার জন্যেই বেখেছেন। বিলেত যাবাব জন্য এগুলো চেযেছিলাম। মা তখন বলেছেন, ওগুলো আপনাব, আপনাকে ফেরৎ দেবেন বলে বেখেছেন। সব শোনাব পবেও পাছে আবার আমাব লোভ হয, তাই এবাবে আসার সময নিযে এলাম।

আর কিছু বলার বা শোনার জন্য অপেক্ষা না কবে উঠে দাঁডালেন মহানন্দ ঘোষ।—এবপব আপনার আবো ক্ষতি হতে পারে, আচ্ছা চলি—

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘবেব বাইবে চলে এলেন তিনি। কিন্তু বাইবে এসেও

প্রেমানন্দব আর্তস্বব শুনলেন। স্ত্রীকে বলছেন। দেখলে সব? শুনলে সব? এসব গযনা এখন তুমি নাও, তুমি দেখো, ছেলেদেব দেখাও—খুব খুশী হবে, আমাব শুধু এই কবচ থাক—বুঝলে? বুঝলে?

এই পর্যন্তই চিত্র।

আমি মাযেব দিকে তাকালাম। নিস্পন্দেব মত বসে আছেন তিনি, কিন্তু পবক্ষণেই হতভম্ব আমি। হঠাৎ সবোষে মা বলে উঠলেন ওই সুমিত্রাব ওপবে তুমি পক্ষপাতিত্ব কবেছ—তাব ভিতবে অনেক বিষ ছিল—স্বামীব স্ট্রোক হবাব পবে ছেলেদেব ওপব বিশ্বাস হাবিযে সেও মনে মনে চাইছিল স্বামী উইল কবে দিযে যাক—জানো?

তীক্ষ্ণ শোনালো কণ্ঠস্বব। এমন মহীযসী যিনি, এত তেজ আব এত ক্ষমা যাব মধ্যে, তাঁব এই কঢতা আমি আশা কবিনি। আঘাতই পেলাম যেন। বললাম, আপনি নিশ্চযই বণদাবাবুব মুখে শুনেছেন এ-কথা, কিন্তু পুবোপুবি সত্যি তো না-ও হতে পাবে.. ।

মা নীবব একটু। নিজেকে সংযত কবলেন। শান্ত কমনীয আবাব। একটু থেমে নিযে বললেন, গল্প মোটামুটি ঠিকই হযেছে। কেবল তোমাব ভাবনায সামান্য একটু ভুল থেকে গেছে।

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে চেযে আছি।

তেমনি সহজ সুবেই তিনি আবাব বললেন, আমি মনোবমা নই। সে ভাগ্যবতী সিঁথিব সিঁদুব নিযেই চোখ বুজেছে। আমি সুমিত্রা।

আমি নির্বাক বিমূঢ় নিস্পন্দ কাঠ।

সৈনিক

অপর্ণা এবাবে সত্যিই চলল তাহলে। অনেক দিন যাবে যাবে কবেছে, অনেক দিন বলেছে সময হযে এলো। মেজব ঘোষ চৌধুবী এ-কানে শুনে ও-কান দিযে বাব কবে দিযেছেন। অপর্ণা উপেক্ষা ভেবেছে কিনা কে জানে। সদা ব্যস্ত স্বামীব কান-মন সজাগ নেই ভাবত কিনা কে জানে। নইলে অত কবে বলত কেন?

ভিডেব বাস্তা ছেড়ে গাড়ি বেড বোডে পডতেই স্পিডেব কাটা তিবিশ থেকে এক লাফে পযতাল্লিশেব দাগে গিযে দাঁড়াল। কিন্তু সে কাটা কেউ দেখছে না। মেজব ঘোষ চৌধুবী ঘড়িব কাটা দেখলেন একবাব। বেলা চাবটে বাজতে দশ। বাস্তা ফাঁকা। কতক্ষণ আব লাগবে। যাবেন আসবেন। এই জন্যেই আব কাউকে না পাঠিযে নিজে গাড়ি হাঁকিযে চলেছেন। প্রতিটা মুহূর্তেব অনেক দাম এখন। মবণ-বাচনেব দাম। জীবনেব একটাই মিনতি বাখা না-বাখাব দাম। না, একটানা তেত্রিশ বছবেব যুক্ত জীবনে অপর্ণাব আব কোনো প্রার্থনা বা মিনতি এই মুহূর্তে অন্তত মনে পডছে না মেজব ঘোষ চৌধুবীব। অপর্ণা বলেছিল, তুমি এত ব্যস্ত, তাই ভয হয। শেষ সময়ে

কাছে থেকো, নইলে ভযানক খাবাপ লাগবে আমাব—থাকবে তো?

একবাব নয, অনেকবাব কবে বলেছিল। এই গত পবশুও বলেছিল। কালও একবাব বোধহয বলতে চেষ্টা কবেছিল। আব আজ সকাল থেকে মুখে বলতে না পাবুক হঠাৎ-হঠাৎ তাকিযে দেখেছিল তিনি আছেন কিনা।

চোখদুটো ভযানক চকচক কবছে মেজব ঘোষ চৌধুবীব। অথচ ঝাপসা ঝাপসা দেখছেন। কাঁচাপাকা লোমশ দুই পবিপুষ্ট হাতে স্টিযাবিং ধবে আছেন। একটা হাত প্যান্টেব পকেটে ঢুকল। হুইস্কিব ছোট বোতল বেবুলো। দাঁতে কবে মুখ খুললেন। বাস্তাটা ফাঁকা, তাছাড়া কে দেখল না দেখল পবোযা কবেন না। দবকাব বলেই খাচ্ছেন। মাথা ঝিমঝিম কবলে চলবে না, চোখে ঝাপসা দেখলে চলবে না।— সমযেব অনেক দাম এখন। হাত শক্ত, স্নাযু সবল বাখা দবকাব। ছোট বোতল উপুড় কবে গলায ঢাললেন খানিকটা। অর্ধেকেব বেশিই খালি হযে গেছে গত দু-ঘণ্টাব মধ্যে। সাধাবণত বেশি খান না। দুদিন ধবে বেশিই খাচ্ছেন। দুদিনে এবকম চাবটে ছোট বোতল খালি হযে গেল...না, দিস ইজ দি ফোর্থ, খালি হতে চলেছে।

দাঁতে কবে বোতলেব মুখ আটকে আবাব পকেটে বাখলেন। স্পীডেব কাঁটা প্রায পঞ্চাশ ছুঁযে আছে। একটু আধটু কমছে, আবাব পঞ্চাশেব কাছে দাঁডাচ্ছে। হাত একটুও কাঁপছে না মেজব ঘোষ চৌধুবীব। এজনোই আব কাউকে না পাঠিযে তিনি নিজে ছুটেছেন। আর্মিতে তাঁব দুবন্ত গাডি ছোটানো দেখে কত লোকেব তাক লেগে যেত। তিনি গাডি চালাবেন শুনলে ভযে অনেকে সে-গাডি এডাতে চাইত।

...সেই অপর্ণা সত্যিই চলল তাহলে।

মেজব ঘোষ চৌধুবীব মনে হচ্ছে, এই তো সেদিনেব কথা। কি কাণ্ড কবেই না তিনি ঠিক-ঠিক ঘবে এনে ছেডেছিলেন তাকে। অথচ এবই মাঝে কিনা তেত্রিশটা বছব কেটে গেল।

আবাব দুচোখ চকচক কবছে, আবাব একটু একটু ঝাপসা দেখছেন। সেই সঙ্গে ঠোঁটেব ফাঁকে হাসিব আভাসও।...তেত্রিশ বছব আগেব নয, মাত্র সেদিনেব দৃশ্য যেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে থেকে থেকে।

...ডাক্তাবী পডাব চতুর্থ বছব সেটা। পডাব চাপ বেশি। একটা পাঁচমিশিলি নামী হস্টেলে থাকতেন। জানালা খুললেই পডায ব্যাঘাত হত। অথচ না খুলেও পাবতেন না। বাস্তাব উল্টোদিকেব বাডীব মেযে অপর্ণা। নাম আবো দেড বছব আগেই জানেন। তাঁব যখন ডাক্তাবীতে ফোর্থ ইযাব, অপর্ণাব তখন কলেজেব থার্ড ইযাব। সেই সমযে গণ্ডগোলটা হল। এমন নতুন কিছুই কবেননি। সেদিন চতুর্থ বছবেব ডাক্তাবী নবিশ ত্রিদিবেশ ঘোষ চৌধুবী বোজকাব মতই মাঝে মাঝে জানালায এসে দাঁডিযেছিলেন, অন্য দিনেব মতই মৃদু মৃদু হেসেছিলেন চোখাচোখি হতে। বাডতিব মধ্যে আভাসে হযত বা কথা বলাব বাসনা ব্যক্ত কবেছিলেন।

ব্যস, অপর্ণা ঠাস কবে মুখেব ওপব দবজা বন্ধ কবেছিল। আধ ঘণ্টাব মধ্যে অপর্ণাব মাবমুখী দাদা-কাকাবা হস্টেলে এসে হাজিব হযেছিল। অন্য ছেলেবা তাব

হযে তুমুল বচসা কবেছিল। আব তাঁব কান দিযে আগুন ছুটেছিল। সেইদিনই ডাকে তিনি অপর্ণাব নামে চিঠি ছেডেছিলেন। সাব কথা, একদিন তাকে তাদেব বাডীতে তাঁব ঘবে আসতেই হবে। ইচ্ছে হলে একথা সে তাব বাবা মা দাদা কাকাদেব জানিযে দিতে পাবে।

মেজব ঘোষ চৌধুবী হাসছেন একটু একটু। ওই বকম গোঁযাবই ছিলেন বটে। জানালায এবপব আব খুব বেশি দাঁডাতেন না। হঠাৎ একদিন কানে এলো—অপর্ণাব বিযে পাকা হযে এসেছে। পডাশুনা সিকেয উঠল তাঁব। মাথায আগুন জ্বলল। একটা দিনেব অক্লান্ত চেষ্টায ও বাডীব দূব-সম্পর্কীয এক লোকেব মাবফৎ বাব কবলেন কোথায বিযে পাকা হযে এসেছে। ঠিকানাও সংগ্রহ কবলেন। তাবপব উডো চিঠি ছাডলেন।—অপর্ণা এবং একটি ছেলে পবস্পবকে বিযে কববে বলে অঙ্গীকাববদ্ধ। অতএব ছেলেব অন্যত্র বিযে কবাই ভালো।

বিযে ভেঙে গেল। কাবণও একেবাবে গোপন থাকল না হযত। কাবণ দিনকতক বাদেই অপর্ণাকে হস্টেলেব এই ঘবেব দিকে চেযে তাদেব জানালায স্থিব দাঁডিযে থাকতে দেখা গেল। আব ধীব পদক্ষেপে তিনিও নিজেব জানালায এসে দাঁডালেন। নিঃশঙ্কচিত্তে নির্দ্বিধায স্পষ্ট কবেই বুঝিযে দিলেন তিনিই এই ব্যবস্থা কবেছেন।

পবীক্ষা হযে গেল। তিনি হস্টেল ছাডলেন। বেজাল্ট বেরুলো। ভালো পাস কবলেন। অপর্ণা জানেও না তিনি কি পডতেন বা কোথায চলে গেলেন।

অভাবিত একটা ভালো সম্বন্ধ পেলেন অপর্ণাব বাবা-মা একজনেব মাবফৎ। সেই একজন ত্রিদিবেশ ঘোষ চৌধুবীবই লোক সে আব কে বলতে গেছে। তাবা জানালেন, বডঘবেব ছেলে, ববাবব ভালো বেজাল্ট কবে ডাক্তাব হযেছে।

মিথ্যে জানলেন না তাঁবা।

অপর্ণাব বাবা নিজে এলেন খোঁজখবব কবতে। এই ভদ্রলোক দেড বছব আগেব বিবাহেব ঘটনা কিছুই জানেন না। তাঁব সবই ভাবী পছন্দ হল। এত সহজে মেযেব বিযে হযে যাবে আশা কবেননি। ছেলেব বাবা-মাযেব উদাবতা দেখে তিনি মুগ্ধ। ছেলে দেখেও খুশি। মুখখানা চেনা চেনা লাগল। ফলে বাবা বলেই দিলেন, ছেলেব পছন্দ বলেই তিনি এগোচ্ছেন, ছেলে মেযে দেখেছে—উল্টোদিকেব হস্টেলই ছেলে থাকত।

জানাজানি হওযা সত্ত্বেও বিযেতে বিঘ্ন হল না। আব তাবপব কটা দিন কি কাণ্ড। দুচোখ চকচক কবছে মেজব ঘোষ চৌধুবীব, কিন্তু অল্প অল্প হাসছেনও।...বিযেব পব অপর্ণা তাঁব দিকে আব চোখ তুলে যেন তাকাবেই না, এমন অবস্থা।...সব যেন সে-দিনেব কথা মাত্র।

পিচেব বাস্তা ঘষটে ঘ্যাঁচ কবে থামল গাডিটা। লাল আলো জ্বলে উঠেছে—বেড লাইট। গলা দিযে অস্ফুট একটা বিবক্তিব শব্দ বাব কবলেন মেজব ঘোষ চৌধুবী। সবুজ না হওযা পর্যন্ত থাকো বসে। আবো অসহিষ্ণু বোধ কবলেন তিনি, কাবণ বিপবীত দিকে অর্থাৎ যে-দিকটাব লাইন ক্লিযাব—সেই বাস্তায একটিও গাডি আসছে না বা যাচ্ছে না। যান্ত্রিক ব্যবস্থায সময ধবে বোড সিগন্যাল পডে, এ-দিক বন্ধ তো ও-দিক খোলা, ও-দিক বন্ধ তো এ-দিক।

পকেটে হাত। হুইস্কির বোতল। খুললেন। গলায় ঢাললেন। বন্ধ করে ওটা পকেটে রাখার অবকাশ পেলেন না— সবুজ আলো। বোতল পাশে পড়ে থাকল। গাড়ি ছুটল।

...সময় নেই।

আর্মিতে চাকরি নিতে অপর্ণা বারণ করেছিল। অনেক নিষেধ করেছিল, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার জন্য ঝকাঝকি করেছিল, তার ভয় তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। সর্বদাই ও যে একটা চাপা আতঙ্কে ভুগত সেটা তিনি টের পেতেন। সিভিল পোস্টিং হলে তবু স্বস্তি, সঙ্গে থাকত বলে অত ছটফট করত না। ইমারজেন্সি এরিয়ায় বদলী হলেই অপর্ণার আহার-নিদ্রা ঘুচত যেন। এই জন্যেই অসময়ে পুজো-আর্চা ধরেছিল বলে বিশ্বাস। মেজর ঘোষ চৌধুরী হাসতেন, আবার বিরক্তও হতেন।...লেফটানেন্ট থেকে ক্যাপ্টেন হয়েছেন, ক্যাপ্টেন থেকে মেজর, তবু অপর্ণার ভয় ঘোচেনি। সে ছেলেমেয়েগুলোকে ঠিকমত মানুষ করে তুলেছে, তাঁর প্রতি সকল কর্তব্য করেছে আর সেই সঙ্গে একটা অহেতুক ভয় পুষেছে। আশ্চর্য, দৈব বিড়ম্বনায় অসময়ে আর্মি থেকে অবসর নিতে হল তাঁকে, তবু অপর্ণার ভয়ে ভয়ে থাকাটা যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। পাথর পড়ে পা ভাঙার ফলে আর্মির চাকরি থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তাঁকে। মেজর ঘোষ চৌধুরী ঠাট্টা করেছিলেন, ঠাকুর তোমার ডাক শুনেছে, মিলিটারির চাকরি ছাড়িয়েছে।

অপর্ণার নির্বাক চাউনিটা স্পষ্ট মনে আছে। দু'চোখে জল টলমল করছিল।

গাড়ি থামল। এই দোকানই। নেমে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন মেজর ঘোষ চৌধুরী। পরক্ষণে আরো বেগে ছুটে এসে গাড়িতে উঠলেন। মুখ শুকনো, চোখের নিমেষে গাড়ি ওধারের বড় রাস্তার দিকে ঘোরালেন।

...অপর্ণা চললই তাহলে। বড় দোকানে ওষুধ মিলল না। মিলবে কিনা সন্দেহ ছিলই। পাওয়া গেলেও অপর্ণা থাকবে কিনা সন্দেহ—ডাক্তার তো তিনিও, আর নামী ডাক্তারই—সবই বোঝেন। তবু আশা, শহরের সব থেকে নামজাদা ডাক্তার বলেছেন, এই ওষুধটা একটা কেসএ জাদুর কাজ করেছিল—পান কিনা এক্ষুনি দেখুন। ওমুক জায়গায় যান—

সেই জন্যেই টেলিফোনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বাঁচিয়ে নিজেই গাড়ি হাঁকিয়েছেন। আর কারো ওপর নির্ভর করতে পারেননি। ওষুধটা কোথাও থাকলে তাকে পেতে হবে। ওদিকের বড় রাস্তা ধরে গেলে আরো দুটো দোকান আছে।

কিন্তু ওদিকটায় আবার ট্রাম বাস মোটর চলাচলের ভিড়। তার ফাঁক দিয়েই বেগে ছুটেছে। এই ওষুধটার জন্য তিনি যেন সর্বস্ব দিতে পারেন। টাকার তো অভাব নেই, অভাব যার ঘটতে চলেছে টাকা দিয়ে তা পূরণ হবে না।. .অপর্ণা রাগই করত, সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—তোমার এত টাকার কি দরকার?

মিলিটারি চাকরির যা পেনশন পান, সেদিকে তাকানোও দরকার হয় না তার। যে টাকা তিনি প্র্যাকটিস করে রোজগার করেন, তা কল্পনার বাইরে। সেই এক আট

টাকা ভিজিট কবে রেখেছেন তিনি—তাই রোগী আসে কাতারে কাতাবে। প্রায তিন বেলাই হিমসিম অবস্থা হয তাঁব। বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে চেম্বার। কিন্তু খোঁড়া মেজবের কাছে বোগী আসে পাঁচ সাত মাইল দূব থেকেও। পা জখম হবার পব থেকে একটু খুঁড়িযে চলেন বলে বোগীদের মুখে মুখে এখন এই নাম।

ওযার্থলেস।

মুখ বিকৃত কবে চাব বাস্তার মুখ সবেগে পার হবাব মুখেই ঘ্যাঁচ কবে গাড়িটা থামাতে হল। লাল আলো। ভ্রূকুটি কবে ওধাবেব বাস্তাব গাড়িগুলোব দিকে তাকালেন তিনি, গ্রীন পেযে এখনো নড়তেও শুরু কবেনি। এই ফাঁকে অনাযাসে পেবিযে যেতে পাবতেন। বাবুবা সব গদাই লস্করি চালে গাড়ি চালায।

ঘন ঘন লাল আলোব দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। অসহিষ্ণু হাতে পাশেব হুইস্কিব বোতল ট্রাউজাবেব পকেটে ঢোকালেন। গাযে তো শুধু পুরু গেঞ্জি একটা।

সর্বদা অত ভযে ভযে থাকত বলেই একে একে হাটেব দু'দিকেবই ভালব খাবাপ হযে গেল কিনা অপর্ণাব, মেজব ঘোষ চৌধুবীব এখন সেই সন্দেহ হয। শয্যা নিযেও তাব দুশ্চিন্তা যায না তাঁব জন্য। ঘড়ি ধবা সময়ে খেতে না এলে বা সময়ে শুতে না এলে বিছানায শুযেই ছটফট কববে। ছেলেবা আব মেযেবা অনেকবাব সেই নালিশ কবেছে। আব এখন তো মুখে কেবল এক কথা, শেষ সময়ে তুমি যেন কখনো আমাব কাছছাড়া হযো না, কাছে থেকো—থাকবে তো?

মেজব ঘোষ হেসেছেন, শেষ সময অত সস্তা নয, বুঝলে?

—তবু তুমি কথা দাও— কথা দাও না গো।

কথা দিতে হযেছে। শুধু তাই নয, তাব তবু ভয যায না দেখে বিছানাব গাযে টেলিফোন এনে দিতে হযেছে। একটু খাবাপ বুঝলেই অপর্ণা চেম্বাব থেকে ডাকবে তাঁকে।

মা-কে বাবাব এই কথা দেওযাব খববটা ছেলেমেযেবাও কি কবে যেন জেনেছে। মাযেব অসুখ বাড়বাড়িব দিকে গড়াবাব আগে তাবা এই নিযে হাসাহাসিও কবেছে। টেলিফোন হাতে পেযে ওদেব মা যেন পবীক্ষা কবাব জন্যেই এ পর্যন্ত দিনতিনেক ডেকেছে তাঁকে।

গ্রীন লাইট। গাড়ি ছুটল।

দ্বিতীয বড় দোকানেও নেই। চললই তাহলে অপর্ণা। মিথ্যেই দুর্বল হচ্ছেন তিনি, ওষুধ পেলেও যাবেই। তবু অন্য দোকানটাও দেখতে হবে। সময নেই।...বাড়িব সঙ্গে কানে একটা টেলিফোন লাগানো থাকলে বুঝি ভালো হত। বাকি বড় দোকানটা দেখেই সোজা বাড়ি। তিনি কথা দিযেছেন পাশে থাকবেন, সে-কথা যে কি-কথা সেটা এখন অনুভব কবছেন। যে অবস্থায দেখে ঝোঁকেব মাথায বেবিযে পড়েছেন—আব দেবি কবা ঠিক হবে না।

আশ্চর্য! অপর্ণা কি তাহলে থাকবে এ-যাত্রা? ওষুধ পেয়েছেন। তিনি তো ডাক্তাব,

জীবন-মন্ত্র ভাবছেন নাকি এটা? ওষুধ হাতে পাবার পর আশাও তেমন করতে পারছেন কই? এই অবস্থা থেকেও ফেরে কেউ? সত্যি মিরাকল হয়?

এবারে আরো বেগে ছুটেছেন।

খাইয়ে তো দেবেন, যেমন করে হোক কিছুটা পেটে যাওয়া চাই। চাই-ই।

ইমপসিবল। ইমপসিবল। বিরক্তিতে অসহিষ্ণুতায় গলা দিয়ে জোরেই শব্দ বার করে ফেললেন মেজর ঘোষ চৌধুরী।

লাল আলো। অর্থাৎ থামো।

অথচ মাত্র দুটো সেকেণ্ডের জন্য বোধহয়। প্রথম সাদা দাগ ছাড়িয়েই এসেছিলেন। দ্বিতীয় দাগটা ছাড়াতে পারলেই আর থামতে হত না। কিন্তু তার আগেই সবুজ আলো হলদে হয়েছে, তারপর লাল। ও-ধারের রাস্তার গাড়ি স্টার্ট নেবার আগে এমন কি হলদে আলো সবুজ হবার আগেই তিনি হাওয়া হয়ে যেতে পারতেন।

কিন্তু কি আর করা যাবে। পিছনের দিকে দেখে নিয়ে দ্বিতীয় সাদা দাগের কাছ থেকে গাড়ি বরং হাতকয়েক পিছিয়ে নিতে হল।

এ-রকম হয় না কেন, যে রাস্তায় গাড়ি যাবে সে রাস্তায় শুধু যারেই, যে রাস্তায় আসবে, শুধু আসবেই—চার রাস্তা থাকবে না—ক্রস রোড থাকবে না।

মাথা গরম হয়েছে বোধহয় তাঁর, কিন্তু এখানে বোতল খোলা মুশকিল।

নাকের ডগা দিয়ে যে গাড়িগুলো যাচ্ছে, সেগুলিকে ভস্ম করার চোখ মেজর ঘোষ চৌধুরীর।

আশ্চর্য, অপর্ণা যে তাঁর এতখানি এ কি নিজেই জানতেন। পাশে থাকতে কথা দিয়েছেন যখন, তখনও কি জানতেন? তখনো কি এরকম করে অনুভব করতে পেরেছিলেন?

ক্রস রোডে গাড়ি চলেছে তো চলেছেই। এক মিনিট এত বড় হয় কি করে?

' তবু তুমি কথা দাও, কথা দাও না গো।'

কথা যখন দিয়েছিলেন, তখনো কি সেই আকৃতি এমন করে শিরাতে শিরাতে ওঠা-নামা করেছিল তার? তিনি তো তার পরেও লোকের চিকিৎসা নিয়ে সদা ব্যস্ত ছিলেন, এমন দম-আটকানো শূন্যতা তো কখনো অনুভব করেননি?

চিকিৎসার বাইরে আর সকল দিক অপর্ণা এ ভাবে ভরাট করে রেখেছিল বলেই অনুভব করেননি। তাই বটে। কোনদিন আর কোনদিকে তাকানোর দরকারই হয়নি তার। দুটো মেয়ের বিয়ে হয়েছে, বড় ছেলেটার বিয়ে হয়েছে, আর একটা ছেলেও আগামী বারে ডাক্তারী পাস করে বেরুবে। এরা সব ছোট থেকে হঠাৎ চোখের ওপর দিয়ে কেমন করে যে বড় হল, যোগ্য হল, তাও যেন ভালো জানেন না মেজর ঘোষ চৌধুরী। সব-দিক এমনিই ভরে রেখেছিল বটে অপর্ণা। তেত্রিশ বছরের এই ভরাট দিকটাই শূন্য হওয়ার দাখিল। তাই সবদিকই শূন্য। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে কষ্ট। চোখে ভয়ানক ঝাপসা দেখছেন।

বিষম চমকে উঠলেন— সবুজ আলো। গ্রীন। ব্লেসেড গ্রীন।

হাওয়ার বেগে গাড়ি ছুটল। আশ-পাশের গাড়িওয়ালারা তাঁর গাড়ির এই গতি

পছন্দ কবছে না। অ্যাকসিডেন্ট হতে পাবে ভাবছে। হলেই হল। মিলিটাবি চাকবিতে কোন পথ দিযে কি স্পীডে গাডি চালাতে হযেছে তা কে জানবে কি কবে। চকচকে চোখ, কিন্তু ঠোঁটে আবাব যেন হাসিব আভাস একটু—জানলে অপর্ণা বোধহয সুস্থ শবীবেই হার্টফেল কবত। নির্ভযে শক্ত হাতে স্টিযাবিং ধবে আব দুটো চোখ আব সবগুলো স্নায়ু একত্র কবেই অ্যাকসিলাবেটবে চাপ দিচ্ছেন তিনি। গাডিতে বসলে তাঁব খোঁড়া পা আব খোঁড়া থাকে না—ওনলি ডোন্ট ডিসটার্ব মি এনিবডি অ্যাণ্ড লেট দেযাব বি নো বেড লাইট এনি মোব।

বাডি।

সিঁডিব গোডায পা বেখেই নিশ্চল স্থাণুব মত দাঁডিযে গেলেন তিনি। কানে গলানো শিসে ঢুকল এক ঝলক। ঝলকে- ঝলকে ঢুকছে। তিনি নিস্পন্দ কাঠ।

দোতলাব ওই অনেক গলাব আর্তনাদেব একটাই অর্থ। ..অপর্ণা থাকল না। গেলই।

কযেক নিমেষেব মধ্যে বুঝি বুডিযে গেলেন মেজব ঘোষ চৌধুবী। এত বুডিযে গেলেন যে সিঁডিব শেষ নেই মনে হচ্ছে। ঝকঝকে দু'চোখে মুক্তোব মত দুটো কি। হাপ ধবছে। দাঁডালেন। কি যেন একটা ভুল হযে গেছে।...কি? মাথাব ভিতবে এবকম লাগছে কেন? তিনি ডাক্তাব, জানতেনই তো অপর্ণা থাকবে না।

পকেটেব বোতলটা উবুড কবে নিঃশেষে গলায ঢাললেন।

দোতলা। অপর্ণা শুযে আছে। মেযে দুটো আব ছোট ছেলেটা আছডা-আছডি কবে কাদছে। বড ছেলে, ছেলেব বউ কাদছে। জামাইবা কাঁদছে।

তাকে দেখেই ছোট ছেলে আর্তনাদ কবে উঠল, বাবা, তুমি আব একটা মিনিট দেডটা মিনিট আগে এলে না? আব একটু আগে এসে কথা বাখতে পাবলে না বাবা? যাবাব দশ সেকেণ্ড আগেও মা যে চোখ তাকিযে চাবদিকে খুঁজল তোমাকে?

মেজব ঘোষেব এইবাব মনে পডেছে। তিনি কথা দিযেছিলেন। বলেছিলেন পাশে থাকবেন। কি আশ্চর্য, তিনি কি পাশে ছিলেন না এতক্ষণ?

অপর্ণাব দিকে তাকালেন। ঘুমুচ্ছে যেন। হাসি-মাখা ঘুম। চিৎকাব কবে গলা ফাটিযে ডেকে ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা কববেন তাব? বলবেন, শোনো অপর্ণা, আমি চেষ্টা কবেছিলাম, আমিও তাই চেযেছিলাম—চেযেছিলাম।

নির্বাক, বোবা তিনি।

ঘণ্টাখানেক বাদে কান্নাব প্রাথমিক আবেগ স্তিমিত হল। জামাইবা দেহ নেবাব যোগাডযন্ত্রে বেবিযেছে। দুই ছেলে শিযবে আব পাযেব কাছে বসে। পাশে তিনি।

ধবা-গলায এক সময বড মেযে বলল, আব একটু যদি আগে আসতে বাবা...মাযেব কাছে তুমি শেষ কথাটা বাখতে পাবলেই না ....!

ক্লান্ত-ক্লিষ্ট মুখে মেজব ঘোষ চৌধুবী আস্তে আস্তে বললেন, হবাব নয বলেই হল না বে,...তিন-তিনবাব বাস্তাব লাল আলোয আটকে গেলাম—বড ক্রসিং, এক মিনিট কবে থামতে হল। যাবাব সময অন্য বাস্তায একটাও গাডি নেই, অথচ লাল আলো, আব আসাব সময একেবাবে বেবিযে মুখে-মুখে দু'বাব।

বড ছেলে বেশ জোবেই বলে উঠল, বেবিযে আসাব মুখে তো বেবিযেই এলে না কেন? কে কি কবত? বড জোব একশ' দেডশ' টাকা জবিমানা হত—এব বেশি আব কি হত?

মেজব ঘোষ চৌধুবী হতভম্ব বিমঢ হঠাৎ। বেবিযে আসা যেত ঠিকই। অনাযাসেই যেত। আব একশ' দেডশ' টাকা ছেডে কথা বাখাব জন্য এক হাজাব দু হাজাব দশ হাজাবও বাব কবে দিতে আপত্তি ছিল না তাঁব। কিন্তু লাল আলো দেখেও বিধি নাকচ কবে ওভাবে বেবিযে আসা যেতে পাবে সেটা মাথাযও আসেনি তাঁব। এখনো যেন ভালো কবে আসছে না।

ছেলেব মুখেব দিকে ফ্যালফ্যাল কবে চেযে বইলেন মেজব ঘোষ চৌধুবী।

তৃষ্ণা

প্যাট মেনডোনসা, এই ঘবে তুমি এসেছ আমি বুঝতে পাবছি। আমি আব যুঝব না, বাধা দেব না, আমাব ক্ষমতা ফুবিযেছে—তুমি যা চাও তাই হবে। কিন্তু তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাই ভয হচ্ছে। তুমি সামনে এসে দাডাও, তোমাব কাকে ভয?

ঘবে যে ক'টি প্রাণী ছিল সকলে চমকে উঠেছিল। এমন কি অমন নামজাদা ডাক্তাবও। বোগেব ঘোবে অনেকে অনেক বকম প্রলাপ বকে, সেটা অসংলগ্ন হয। জডতা থাকে। কিন্তু এ যেন কেউ সর্ববকমভাবে হাব মেনে ক্লান্ত বিষণ্ণ থমথমে গলায স্পষ্ট কবে শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কবল। অনেকেব কানে সেটা নিজেব মৃত্যুঘোষণাব মত লাগল।

অসুখেব ঘোবে বোগী আগেও অনেকবাব ভুল বকেছে, বিকাবগ্রস্ত দুই চোখ টান কবে অনেকবাব ঘবেব চাবদিকে চেযে চেযে দেখেছে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বব এমন স্পষ্ট হযে কানে লেগে থাকেনি কাবো, সেই চাউনি এত স্পষ্ট, স্বচ্ছ মনে হযনি। তাতে নিজেকে আগলে বাখাব ব্যাকুলতা ছিল, সেই দৃষ্টিতে অব্যক্ত দুর্বোধ্য যাতনা ছিল। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইনজেকশন আব ঘুমেব ওষুধ দিযে তখন বোগীকে ঘুম পাডিযেছেন। আজ ছ'দিন ধবেই তাই কবছেন। দেহগত লক্ষণ তিনি সুবিধেব দেখছেন না। অথচ আবো দুজন সতীর্থ চিকিৎসকেব সঙ্গে সলাপবামর্শ কবেও সঠিক বোগেব হদিস পেযেছেন বলে মনে হয না। এক-একবাব ভেবেছেন হাসপাতালে এনে ফেলা দবকাব। আবাব মনে হযেছে, এই অবনতিব লক্ষণ গোটাগুটি স্নাযবিক প্রতিক্রিযাব দরুন। ধবা-ছোঁযাব মধ্যে কোন বোগ যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন তেমন ভযেব কিছু নেই বোধ হয। স্নাযু সে-বকম বিকল হলে দেহেব অন্যান্য লক্ষণও তাব সঙ্গে যুক্ত হতে পাবে।

তিনি শুনেছেন বোগীব প্রকৃতি ভাবপ্রবণ। এব ওপব বড বকমেব মানসিক বিপর্যযেব যে কাবণ ঘটেছে তাও শুনেছেন। তিনি বিশ্বাস কবেননি, সম্ভব-অসম্ভবেব চিন্তাও তাঁব মাথায আসেনি। সুপ্ত বাসনাব একটা বিকৃত প্রকাশ ছাডা আব কিছু

ভাবেননি তিনি। যে বাতের কথা শুনেছেন সেই বাতে, ছোকরা যে প্রকৃতিস্থ ছিল না তাতেও ডাক্তারের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আজকালকার বোমান্সসর্বস্ব দুর্বলচিত্ত অতি আধুনিক ছেলে-ছোকরাদের জানতে বাকি নেই তাঁর। যে কারণেই হোক বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছে, সেটা সামলে ভালো কোনো মানসিক চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ হতে পারে ভাবছিলেন তিনি।

কিন্তু লক্ষণ দেখে ভিতরে ভিতরে তিনিও শঙ্কা বোধ করছেন এখন।

রোগীর এই শেষ কথা শুনে আর তার এই চাউনি দেখে সব থেকে বেশি চমকে উঠেছিল খবরের কাগজের চ্যাটার্জী। বন্ধুদের মধ্যে আরো দুই-একজন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। চ্যাটার্জীর কাছ থেকেই তারাও ঘটনার কিছু কিছু আভাস জেনেছিল। আর সাতদিন আগে উৎসবের সেই রাত্রিশেষে একটা মজার প্রহসন তারা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করেছিল। কেউ কেউ অসংযত ঠাট্টা-বিদ্রূপে জর্জরিত করেছে নরিসকে, হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলি? সঙ্গে ঢুকলি না? তোর মত হাঁদা প্রেমিককে কলা দেখাবে না তো কি, কোটের শোক করতে করতে এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমুগে যা—।

ঠাট্টা যারা করেছিল, ফিলিপ নরিসের অন্তরঙ্গ বন্ধু খবরের কাগজের চ্যাটার্জীও তাদের একজন।

ফিলিপ নরিসের এই কণ্ঠস্বর শুনে আর এই চাউনি দেখে ঘরের অনেকেই নিজেদের অজ্ঞাতে দরজার দিকে তাকালো। মনে হল এই কথার পর, এই আত্মসমর্পণের পর দ্বারপ্রান্তে বুঝি সত্যই কোন রমণীর নাটকীয় আবির্ভাব ঘটবে। তা ঘটল না। রোগীর দৃষ্টি ধরে চ্যাটার্জীর চোখ যেদিকে ফিরল ঘরের সেখানটায় আলনা। আলনার হ্যাঙ্গারে গরম কোট ঝুলছে একটা। ফিলিপ নরিস সেদিকেই চেয়ে আছে, রিকারের চাউনি জানে, কিন্তু বড় অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। যেন সেদিকে চেয়ে সত্যিই কাউকে দেখছে সে। ঠোঁট দুটো নড়ছে। বিড়বিড় করে বলছে কিছু। শোনা যায় না, কিন্তু চ্যাটার্জীর মনে হল সে বলছে, প্যাট মেনডোনসা, প্যাট মেনডোনসা...।

ঘরের মধ্যে সব থেকে বেশি অস্বস্তি বোধ করছে চ্যাটার্জী। এই ছ'দিনে অনেকবার যে কথা মনে হয়েছে, কোটটার দিকে চেয়েও আবার সেই কথাই মনে হল। দিয়ে যখন দিয়েই ছিল, এই কোটটা নরিস আর ফিরিয়ে না আনলেই পারত। এই আনাটাই যেন ভুল হয়েছে। কি ভুল, কেন ভুল— চ্যাটার্জীও জানে না। অথচ তার সামনেই তো ওটা ফিরিয়ে এনেছে নরিস, চ্যাটার্জী নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল—অস্বস্তি বোধ করেছিল, কিন্তু বাধা দেবার কথা মনে হয়নি।

ডাক্তার আবার ওষুধ খাওয়ালেন, ইনজেকশন দিলেন।

বাইরে এসে এক বন্ধু ভেবেচিন্তে চ্যাটার্জীকে বলল, দেখো এক কাজ করো, উৎসবের পরদিন পর্যন্ত তোমারও মাথা খুব সাফ ছিল না বুঝতে পারছি, তোমাদের কাগজে প্যাট মেনডোনসার নামে একটা বিজ্ঞাপন দাও—ফিলিপ নরিসের এই অবস্থা জানিয়ে অতি অবশ্য তার সঙ্গে এসে দেখা করতে লেখো—এই বোম্বাই শহরে প্যাট মেনডোনসা হয়ত ডজন দুই বেরুবে, কোথায় কার সঙ্গে লটঘট বাঁধিয়ে বেখেছে কে জানে—বিজ্ঞাপন চোখে পড়লে যে আসবার ঠিক এসে হাজির হবে'খন দেখে

নিও। তোমরা যে ঠিকানায় গেছলে সেটা একটা যোগাযোগ হতে পারে আর তার আগের রাত থেকে ফিলিপেরও মাথার গোলযোগ ঘটে থাকতে পারে—সে তো বেসামাল কথাবার্তাই বলছিল তখন, কেউ কি এক বর্ণও বিশ্বাস করেছে।

করেনি সত্যি। চ্যাটার্জী নিজেই করেনি। কিন্তু তারপরে যা সে দেখেছে অবিশ্বাস করবে কি করে। তবু নিজেরই তার বার বার ধাঁধা লাগছে, ধোঁকা লাগছে। ফিলিপের না-হয় মাথার গণ্ডগোল হয়েছিল, কিন্তু তারও কি হয়েছিল? বন্ধুর কথামত কাগজে বিজ্ঞাপন একটা দিয়েই দেখবে? পরমুহূর্তে কি আবার মনে পড়েছে— না, ভুল কিছু হয়নি, যারা জানে না তাদের এ-রকম ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু চ্যাটার্জী ভাববে কি করে? এ যদি ভুল হয় তা হলে তার এই মুহূর্তের অস্তিত্বও ঠিক কিনা সন্দেহ।

যাক, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশও আর কিছু থাকল না। ডাক্তারের ওষুধ আর ইনজেকশনে ফিলিপ নরিস চোখ বুজেছে। সেই চোখ মেলে সে আর তাকায়নি। তার সেই রাতের ঘুম আর ভাঙেনি। কখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে নার্সও টের পায়নি। বন্ধুরাও পরদিন এসে তাকে মৃত দেখেছে।

এবারে আগের ঘটনাটুকু যোগ করলেও কাহিনী সম্পূর্ণ হবে কিনা বলা শক্ত।

ঘটনাস্থল বোম্বাইয়ের এক মস্ত নামজাদা ইঙ্গ-ভারতীয় ধাচের ক্লাব। নামজাদা ক্লাব না বলে নামজাদা সংস্থা বললেই বোধ করি ঠিক হবে। অনিবার্য কারণে নাম অনুক্ত থাক। এই ক্লাব বা ক্লাবের নিজস্ব প্রাসাদ-সৌধ সেখানকার সকলেই চেনেন। মেম্বাররা সর্বভারতীয় এবং কিছুটা সর্বদেশীয়। তবে একক সংখ্যার বিচারে গোয়ান মেয়ে-পুরুষের সংখ্যাই বোধ করি বেশি। এই গোয়ানদের মধ্যে আবার জাতের বেষারেষি আছে। গোঁড়া ব্রাহ্মিন-ক্রিশ্চিয়ান গোয়ানদের মাথা উঁচু—সামাজিক ব্যাপারে অধস্তন গোয়ানদের সঙ্গে সচরাচর তারা আপস করে না। কিন্তু এই ক্লাব অনেকটা শ্রীক্ষেত্রের মত। এখানে জাত-বর্ণের খোঁজ বড় পড়ে না।

এখানে প্রবেশের প্রধান ছাড়পত্র আর্থিক সংগতি। যার টাকা আছে আর তারুণ্যের পিপাসা আছে তার কাছে ক্লাবের দ্বার অবারিত। বহু লক্ষপতি বা ক্রোড়পতি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক। নবীন সভ্য-সভ্যাদের টাকার জোরের থেকে দিল-এর জোর বেশি। টাকার থেকেও তাদের বড় মূলধন আনন্দ আহরণের উৎসাহ আর উদ্দীপনা। এই উৎসাহ আর উদ্দীপনার ফলেই সাধারণত সংস্থার মুরুব্বীদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যায়। এখানে ইচ্ছার বেগই প্রধান। এখানে এসে হিসেবের খাতার পাতা খোলে না।

চ্যাটার্জী এখানে ভিড়তে পেরেছে টাকার জোরে নয়, তার কাগজের জোরে। আর কিছুটা তার সুপটু যোগাযোগের ফলে। সুমার্জিত কৌশলে সব-জান্তায় আসরে যে নামতে পারে, দুনিয়া উলটে-পালটে গেলেও খুব একটা কিছু যায় আসে না এমনি নির্লিপ্ত মাধুর্যে যে অবকাশ যাপন করতে পারে—এখানে তারই কদর বেশি। সেই হিসেবে চ্যাটার্জী প্রিয়পাত্র এখানকার। ফিলিপ নরিসের বিশেষ গুণ হল সে টাকা যা রোজগার করে তার থেকে বেশি খরচ করতে জানে। নিজের গতিবিধি আচার-আচরণ

সবল, সংযত—অথচ বন্ধুবান্ধববা তাব বেশিব ভাগই বেপবোযা, সদা মুখব। কাবো টাকাব দবকাব হলে অসঙ্কোচে হাত পাতো ফিলিপ নবিসেব কাছে, হাতে থাকলে সে তক্ষুনি দিযে দেবে। না থাকলে, আব টাকাব প্রযোজন যাব সে প্রিযপাত্র হলে, ধাব কবে এনে দেবে। দিযে অনুগ্রহ কববে না, নিজেই অনুগৃহীত হবে। ব্যাঙ্কে মোটামুটি ভালো চাকবিই কবে, ব্যাচিলব, তাই ভালো হোটেলে আলাদা একখানা ঘব নিযে থাকাব সংগতি আছে।

তাহলেও ফিলিপ নবিস ক্লাবেব প্রথম সাবিব কেউ নয। অর্থাৎ চ্যাটার্জীব মত নিজেব গৌববে প্রতিষ্ঠিত নয। সকল সভ্য বা সভ্যাবা ভালো কবে চেনেও না তাকে। তাব উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিব দরুন সভাব আলো উজ্জ্বল বা স্তিমিত হয না। তাব মত সাদামাটা সভাসংখ্যা শতকেব ওপব। দুদশজনেব কাছে যেটুকু খাতিব সে পায তাও চ্যাটার্জীব সঙ্গে তাব অন্তবঙ্গতাব দরুন। এইজন্যই চ্যাটার্জীব প্রতি সদা কৃতজ্ঞ সে। কৃতজ্ঞতাব আবো কাবণ আছে, চ্যাটার্জীব সক্রিয সহযোগিতায তাব কাগজে নবিসেব দুই-একটা আবেগমুখব প্রবন্ধও ছাপা হযেছে। তিবিশ টাকা দক্ষিণা পেলে আনন্দাতিশয্যে ষাট টাকা খবচ কবে বসেছে সে, তবু চ্যাটার্জীব ঋণ শোধ হযেছে ভাবেনি।

গুণমুগ্ধ দুই-একটি ভক্ত সকলেই পছন্দ কবে। চ্যাটার্জীবও ভালো লাগে ফিলিপ নবিসকে।

ক্লাবেব বার্ষিক উৎসবেব বাত সেটা। গোটা প্রাসাদ আলোয আলোয একাকাব। ছ'মাস আগে থেকেই এই একটা বাতেব প্রতীক্ষা কবে থাকে সকলে। এক বাতেব উৎসবে কত হাজাব টাকা খবচ হয সে প্রসঙ্গ অবান্তব। সভ্য এবং অতিথি-অভ্যাগতদেব গাড়িব ভিড়ে প্রাসাদসৌধেব সামনেব দুটো বড বড বাস্তাব অনেকটাই আটকে থাকে।

সমস্ত বাতেব উৎসব—খাওযাদাওযা নাচগানেব ঢালা ব্যবস্থা। যে সময়েব ঘটনা, বোম্বাই শহব তখন 'ড্রাই' নয, অতএব বহুবকম বঙিন পানীযেব ব্যবস্থাবও ত্রুটি ছিল না কিছু। বাত বাবটাব পবে ডান্স হলে যখন নাচেব ডাক পড়ল, নিজেব নিজেব দুটো পাযেব ওপব তখন অনেকেবই খুব আস্থা নেই।

..সেই মেযেটিব দিকে আবাব চোখ পড়ল ফিলিপ নবিসেব। এই নিযে বাবকযেক চোখ গেল তাব দিকে। খুব রূপসী না হলেও সুশ্রী। বছব পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে বযস। এই উৎসবে এই বযসেব সঙ্গীহীন মেযে বড দেখা যায না। ডান্স হলেব দবজাব ওধাবেব দেযাল ঘেষে কেমন যেন বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িযে আছে। একা। সকলেই যে নাচছে তা নয, কিন্তু ওই মেযেটিব মত একা কাউকে মনে হল না নবিসেব। মুখখানা মিষ্টি কিন্তু বড শুকনো—এক ধবনেব বিষণ্ণ ঘুম-জড়ানো চোখ-মুখ-চাউনি। এই পবিবেশ মেযেটিব যেন পবিচিত নয খুব—মনে হল সেই থেকে সে যেন কাউকে খুঁজছে। অন্যমনস্কেব মত নাচ দেখছে এক-একবাব, আবাব শ্রান্ত দৃষ্টিটা এদিক-ওদিক ফিবিযে আগন্তুকদেব মুখ দেখে নিচ্ছে।

এখানে, বিশেষ কবে এই সময়ে কাবো দিকে কাবো চোখ নেই। সকলেই যে যাব সঙ্গী-সঙ্গিনী বা বন্ধু-বান্ধব নিযে ব্যস্ত। এই বাতেব মত বাতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী

থাকাব কথা নয ফিলিপ নবিসেবও। সে নাচতে একটু-আধটু জানে বটে, কিন্তু এগিযে এসে কাউকে ডেকে নিতে জানে না। সে মদও সচবাচব খাযই না, তবে আজ সামান্য খেয়েছে, আব তাইতেই বেশ একটু আমেজেব মত লাগছে। ভালো লাগছে। একটু আনন্দ কবাব ইচ্ছে তাব মধ্যেও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কিন্তু সহজাত সঙ্কোচে কাবো দিকে এগোতেও পাবছে না। আব এগোবেই বা কাব দিকে, সকলেই ব্যস্ত, আনন্দমগ্ন।

মেযেটিব বিষণ্ণ ঠাণ্ডা দৃষ্টিটা ফিলিপ নবিসেব মুখেব ওপবেও আটকালো দুই একবাব। লোকটিও তাকে দেখছে মনে হতেই দৃষ্টিটা চট কবে সবে গেল না মুখ থেকে।

ফিলিপ নবিস উঠে মেয়েটিব কাছে এলো একসময। সবিনযে জিজ্ঞাসা কবল, আপনি কি কাবো অতিথি এখানে?

সামনে এসে মেযেটিব চোখ-মুখ আবো নিষ্প্রভ বিষণ্ণ মনে হল নবিসেব। কেমন এক ধবনেব আত্মবিস্মৃত জডতাব ভাব। মুখ তুলে তাব দিকে তাকাল মেযেটি। কযেক মুহূর্ত চেযেই বইল। তাবপব আস্তে আস্তে মাথা নাডল। অস্ফুট শ্রান্ত স্ববে বলল, না...আমি কেমন কবে যেন এসে পডেছি।

সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ নবিস উদাব হযে উঠল, বলল, বেশ কবেছেন, ইউ আব মোস্ট ওযেলকাম মাদাম, দযা কবে নিজেকে আপনি আমাব অতিথি ভাবুন। আগে কি খাবেন বলুন? মেযেটি নিঃশব্দে চেযেই আছে তেমনি। অথচ নবিসেব মনে হল সে যেন কিছু স্মবণ কবতে চেষ্টা কবছে। বলল না, কিছু খাব না। একটু থেমে আবাব বলল, দেখো আমি সেই থেকে একজনকে খুঁজছি, পাচ্ছি না...ভাবলাম এখানে থাকতেও পাবে। তুমি কি বলতে পাববে...

হঠাৎ 'তুমি' শুনে নবিস বীতিমত অবাক। অথচ মেযেটি যে খেযাল না কবেই বলেছে তাতেও ভুল নেই। ব্যস্ত হযে জিজ্ঞাসা কবল, এখানকাব মেম্বাব? কি নাম?

নবিস বিস্মিত। কি নাম তাও চট কবে মনে কবতে পাবছে না। স্মবণেব চেষ্টা। বেশি মাত্রায মদটদ খেযেছে কিনা নবিসেব সেই সন্দেহ হল একবাব। না, তাহলে টেব পেত। মনে পডেছে। মনে পডাব দরুনই যেন মেযেটিব শ্রান্ত মুখখানা উজ্জ্বল দেখালো একটু। অস্ফুটস্ববে বলল, ডিসুজা...মার্টিন ডিসুজা...চেনো?

নবিস মাথা নাডল, চেনে না।

মেযেটিব বিষণ্ণ মুখখানা বড অদ্ভুত লাগছে নবিসেব। বাজ্যেব অন্যমনস্কতাব দরুন সে যেন খুব কাছে নেই। একটা লোকেব সন্ধানে এখানে এসে পডেছে তাও কম আশ্চর্যেব ব্যাপাব নয। কোথায থাকে ডিসুজা, কি কবে তাও স্মবণ কবতে পাবল না। নবিসেব কেমন মনে হল, মেযেটি যে কাবণেই হোক বড অসুখী, তাই খুব প্রকৃতিস্থ নয। কিছু মানসিক বোগ থাকাও বিচিত্র নয। যাব নাম কবছে, তাব কাছে থেকেই হযত বা বড বকমেব কোনো আঘাত পেযেছে।

নবিস বলল, দেখো এটা আনন্দেব হাট, এই আনন্দেব টানেই তুমি এসে পডেছ—বি চিযাবফুল অ্যাণ্ড হ্যাপি, আমাকে তোমাব বন্ধু ভেবে নাও, নাচবে একটু?

ঠোঁটেব ফাঁকে হাসিব আভাস ফুটল একটু। ঘুম-জডানো ভাবটা কাটিয়ে উঠছে

যেন। দেখছেই তাকে। এত কি দেখছে নবিস ভেবে পেল না। তাব মুখেব দিকে চেয়ে যেন বিস্মবণেব ধাপগুলো উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা কবছে।

মাথা নাড়ল— নাচবে।

ডান্স হল। তাবা আস্তে আস্তে নাচছে। বাহু স্পর্শ কবে নবিসেব মনে হযেছে মেযেটি বড দুর্বল, হযত অনেকটা পথ পাব হযে নিজেব অগোচবে এখানে চলে এসেছে। সহৃদয সুবে বলল, আগে কিছু খেযে নাও না, এই উৎসব সমস্ত বাত ধবে চলবে।

তাব চোখেব আত্মবিস্মৃত দৃষ্টি এখন আবো একটু বদলেছে। নাচেব ফাকে নবিসেব মুখখানাই দেখছে ঘুবে ফিবে, এই চোখ ঈষৎ প্রসন্ন। মেযেটিব তাকে পছন্দ হযেছে বোঝা যায়। মাথা নেড়ে জানালো খাবাব ইচ্ছে নেই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবল, তোমাব নাম কি?

নবিস...ফিলিপ নবিস। তোমাব?

প্যাট মেনডোনসা।, তুমি খুব ভালো.. ডিসুজাব মতই দবদী.. তুমি কি ব্রাহ্মিন ক্রিশ্চিযান?

নবিস হঠাৎ এ প্রশ্নেব তাৎপর্য বুঝল না।—না, কেন বলো তো?

নয শুনে প্যাট মেনডোনসাব চোখে-মুখে খুশিব আভাস। জবাব না দিযে চুপ কবে বইল। একটু বাদে বলল, আমাব কেমন শীত-শীত কবছে।

নবিস কি কবতে পাবে। আধঘণ্টাব আলাপে মেযেটিব প্রতি মাযা অনুভব কবছে কেন জানে না। আব কোনো মেযেব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কখনো আসেনি বলেও হতে পাবে। এ যেন এবই মধ্যে তাব প্রতি নির্ভবশীল হযে পড়েছে। আব একটু কাছে টেনে আনল, নাচেব গতি বাড়িযে দিল। সঙ্গী এত সদয বলেই যেন প্যাট মেনডোনসা কৃতজ্ঞ, সে কাছে ঘেষে এসেছে, মন্থব পাযে নাচছে, আব প্রসন্ন চোখে দেখছে তাকে।

বিশ্রামেব জন্য দুজনে একটা নিবিবিলি কোণে গিযে বসল একটু। আব তখনি প্যাট মেনডোনসা অস্ফুট ক্লান্ত সুবে বলল, আমাব ভযানক শীত কবছে। আমি আব থাকতে পাবছি না.

জামাব ওপব তাব কাধে হাত বেখে নবিস বিচলিত হল একটু। গা'টা সত্যি বড বেশি ঠাণ্ডা। আবাব আগেব মতই শ্রান্ত আব ক্লান্ত মনে হল তাকে। তাড়াতাড়ি উঠে নবিস নিজেব দামী গবম কোটটা নিযে এসে তাব গাযে পবিযে দিল। বলল, তোমাকে খুব সুস্থ লাগছে না, আব বাত না কবে তুমি একটা ট্যাক্সি ধবে বাড়ি চলে যাও— বাড়ি কোথায?

বান্দ্রা...।

বেশি দূবে নয তাহলে। প্যাট মেনডোনসাব গাযে তাব নিজেব কোটেব পকেট হাতড়ে এক টুকড়ো কাগজ আব কলম বাব কবল। পলকে কি ভেবে সে দুটো তাব দিকেই বাড়িযে দিল।—তোমাব বাড়িব ঠিকানা লিখে দাও, কাল সকালে গিযে আমি কোটটা নিযে আসব'খন।

এ-বকম বিদাযটা যেন খুব পছন্দ নয মেযেটিব, মুখেব দিকে খানিক চেযে থেকে

নাম, বাড়িব নম্বব আব ঠিকানা লিখে দিল। কাগজটা নিজেব পকেটে বেখে নবিস বলল, চলো তোমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিযে আসি।

দোতলাব সিঁড়িব কাছে আসাব আগেই সামনেব লম্বা প্যাসেজেব দিকে চোখ পডতে মেনডোনসা দাঁডাল।—ও-দিকটা কি?

বাথ.

অস্ফুট স্ববে বলল, আমি যাব, দেখিযে দাও—

প্যাসেজ ধবে পাযে পাযে খানিকটা এগিযে নবিস দাঁডাল। প্যাট মেনডোনসা হালফ্যাশানেব মস্ত বাথরুমেব দবজা পর্যন্ত গিযে ঘুবে দাঁডাল। গম্ভীব ক্লান্ত দুটো চোখ আবাব নবিসেব মুখে এসে আটকালো। মাথা নেডে ডাকল তাকে।

ঈষৎ বিস্মিত মুখে সে কাছে আসতে বলল, তুমিও এসো।

হঠাৎ হতভম্ব বিমূঢ় নবিস। বলে কি। এ কাব পাল্লায পডল সে। তাডাতাডি বাধা দিযে বলে উঠল, না না, কিছু ভয নেই, তুমি যাও, আমি এখানে দাঁডাচ্ছি।

বমণীব নিষ্পলক দুই চোখ তাব মুখেব থেকে নডছে না। এই মুখে আব চোখে একটা কঠিন ছাযা পডছে। শান্ত ঠাণ্ডা গলায আবাব বলল, তুমিও এসো।

প্রায আদেশেব মত শোনালো। নবিস ঘাবডেই গেল। কপালে ঘাম দেখা দিল। এ কি সাঙ্ঘাতিক মেযে। ভয নেই, সঙ্কোচ নেই—নাকি এও মানসিক বোগ কিছু। বিস্ময সংববণ কবে এবাবে জোব কবেই মাথা ঝাঁকালো নবিস, বলল, আঃ, কেউ এসে পডলে কি ভাববে। বলছি তুমি যাও, আমি এখানে দাডাচ্ছি—

প্যাট মেনডোনসা চেযেই আছে— চেযেই আছে। তাবপব আস্তে আস্তে বাথরুমেব দবজা খুলল সে। ভিতবে ঢুকল। দবজাটা বন্ধ হযে গেল। ঘাম দিযে জ্বব ছাডল নবিসেব। ভালয ভালয এখন ট্যাক্সিতে উঠলে হয।

জানালায ঠেস দিযে একটা সিগাবেট ধবালো সে। অদ্ভুত মেযেটাব কথাই ভাবছে।

হঠাৎ সচকিত। একটা আস্ত সিগাবেট শেষ হযে গেল, আব একটা কখন ধবিযেছে এবং আধাআধি শেষ কবেছে খেযাল নেই—অথচ প্যাট মেনডোনসা এখনো বেবোযনি। বাথরুমেব দবজা বন্ধ।

দ্বিতীয সিগাবেট শেস হল। নবিস পাযচাবি কবছে। কিন্তু দবজা খোলাব নাম নেই।

তাবপব আবো আধঘণ্টা কেটে গেল। নবিস বিলক্ষণ ঘাবডেছে। দবজা ঠেলেছে, দবজায মৃদু আঘাত কবেছে, ডেকেছে—কিন্তু ভিতব থেকে কোন সাডাশব্দ নেই। তাবপব একটা কবে মিনিট গেছে আব নবিসেব ভয বেডেছে। গোডা থেকেই কেমন লাগছিল মেযেটাকে—ভিতবে অজ্ঞান-টজ্ঞান হযে গেল, নাকি কোনো অঘটন ঘটিযে বসল।

ঘডি দেখল। সাডে তিনটে বেজে গেছে বাত্রি। তাব মানে একঘণ্টাব ওপব সে দাঁডিযে আছে প্যাসেজে। বিমূঢ় নবিস কি কববে দিশা পেল না। জোবে জোরে দবজায ধাক্কা দিল কযেকবাব। মজবুত দবজা একটু কাঁপল শুধু।

নবিস দৌডলো হঠাৎ। আধভাঙা আসব থেকে চ্যাটার্জীকে খুঁজে বাব কবল।

চ্যাটার্জী প্রকৃতিস্থই আছে বটে, কিন্তু নিজের হাতপায়ের ওপর দখল খুব নেই। তাকে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে এলো নবিস। চ্যাটার্জীর পিছু পিছু আর দুই-একজন উৎসুক বন্ধুও এলো। খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা শুনে তারাও অবাক। খানিকক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করল তারাও।

শেষে কেয়ারটেকারের তলব পড়ল। বেগতিক দেখে কেয়ারটেকার পুলিসে ফোন করল। পুলিস এসে দরজা ভাঙল যখন, তখন প্রায় সকাল।

ভিতরে কেউ নেই।

একসঙ্গে বহু জোড়া বিস্মিত দৃষ্টির ঘায়ে নবিস বিভ্রান্ত, বিমূঢ়। বাহ্যচেতনা লোপ পাবার উপক্রম তার।

সুরার ঝোঁকে দুই-একজন ঠাট্টা করল, নবিসের প্রেয়সী বাথরুমের জানালা দিয়ে নিশ্চয় পাখী হয়ে উড়ে পালিয়ে গেছে। নইলে ভিতর থেকে উধাও হবার আর কোন পথ নেই!

কেয়ারটেকার বা পুলিসের লোকেরও ধারণা হল, নবিস বেসামাল হয়েছিল হয়ত, ভিতরে যে ঢুকেছিল সে কখন বেরিয়ে চলে গেছে খেয়াল করেনি—আর বাইরে থেকে দরজার হ্যাণ্ডেল টানাহেঁচড়ার ফলে হোক বা অন্য কোন অস্বাভাবিক কারণে হোক ভিতরের ল্যাচ আটকে গেছে। বাইরে থেকে টানাহেঁচড়া করে বা কোনরকম অস্বাভাবিক কারণে এই দরজার ল্যাচ আটকে যেতে পারে কিনা—এই দিনের এই সময়ে তা নিয়ে গবেষণা করার মত ধৈর্য কারো নেই।

চ্যাটার্জী হতভম্ব নবিসকে একদিকে টেনে এনে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, বাস্তবে কতটা খেয়েছিলে?

নবিস সত্যি কথাই বলল, কিন্তু চ্যাটার্জীর সংশয় গেল না। বলল, অভ্যেস নেই—ওটুকুতেই গণ্ডগোল হয়েছে।

তাকে বিশ্বাস করানোর ঝোঁকে পকেট থেকে চিরকুট বার করল নবিস. এই দ্যাখো. আমার কোট গায়ে দিয়ে গেছে. নিজের হাতে নাম বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছে—

চ্যাটার্জী দেখল। রাতের ধকলে তার মাথাও খুব পরিষ্কার নয়। তবু একমাত্র সংগত মন্তব্যই করল সে। বলল, তাহলে তুমি যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট খাচ্ছিলে তখনই বেরিয়ে চলে গেছে সে— তুমি টের পাওনি। নিশ্চয় তোমার মতলব ভালো মনে হয়নি তার. তাই—

নবিস তখন আদ্যোপান্ত ব্যাপারটাই বলল তাকে। মতলব যে কার ভালো ছিল না তাও গোপন করল না। শুনে চ্যাটার্জী হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে—বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পেল না।

এদিকে চ্যাটার্জীর ওই শেষের যুক্তিই সম্ভবপর মনে হয়েছে নবিসের। সে যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল. মেয়েটা তার অলক্ষ্যে তখনই চলে গিয়ে থাকবে। এ ছাড়া কি আর হতে পারে! তার অনভ্যস্ত জঠরে ওই সামান্য সুরাই হয়ত কিছুটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাকে। আর, মেয়েটা

যে রুষ্ট হয়েছিল সে তো বোঝাই গেছে—তাই কোনরকম বিদায়সম্ভাষণ না জানিয়েই চলে গেছে।

ঘণ্টাতিনেক নবিসের ঘরেই ঘুমালো চ্যাটার্জী, তারপর নবিস ঠেলে তুলল তাকে। তাকে নিয়ে সে প্যাট মেনডোনসার বাড়ি যাবে কোট আনতে।

ঘুম তাড়িয়ে নবিসের সঙ্গ নিল চ্যাটার্জী। যে মেয়ে ওভাবে নিজেকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল, তাকে একবার দেখার কৌতূহলও ছিল। চিরকুটের নম্বর মিলিয়ে বান্দ্রার বাড়ির ঠিকানায় এসে দাঁড়াল তারা। কড়া নাড়তে এক বৃদ্ধ দরজা খুলে দিলেন।

নবিস প্যাট মেনডোনসার খোঁজ করতে বৃদ্ধটি খানিক চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কে?

নবিস জানালো তারা কে এবং কেন এসেছে। গত রাতের ফাংশানে শীত করছিল বলে প্যাট মেনডোনসা তার কোট গায়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, সেই কোটটা ফেরত নিতে এসেছে তারা। নাম ঠিকানা লেখা চিরকুটটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল নবিস।

বৃদ্ধ দেখলেন। গম্ভীর। বললেন, আচ্ছা আপনারা বসুন একটু—

ভিতরে চলে গেলেন তিনি। একটু বাদে বাঁধানো একটা ফোটো হাতে ফিরলেন। সেটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখুন তো, এর মধ্যে কেউ কাল আপনার কোট নিয়ে এসেছিল কিনা।

বৃদ্ধের ব্যবহারে এরা দুজনেই মনে মনে বিস্মিত। সামনে আট-দশটি নারীপুরুষের বড় গ্রুপ ফোটো একটা। সেটার দিকে এক নজর তাকিয়ে আঙুল দিয়ে প্যাট মেনডোনসাকে দেখিয়ে দিল নবিস। বলল, ইনি—

দু' চোখ টান করে বৃদ্ধ নবিসের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। নবিস জিজ্ঞাসা করল, ইনি কি এ বাড়িতে থাকেন না?

থাকতেন— এখন থাকে না। আমার এই মেয়ে দু'বছর আগে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

নবিস আর তার সঙ্গে চ্যাটার্জীও কি সত্যি শুনছে, নাকি এখনো রাতের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে। সত্যিই কোথায় তারা?

চেতনারহিতের মত আরো একটু খবর শুনল। বৃদ্ধ জানালেন, বাড়ির সব থেকে সেরা মেয়ে ছিল এই প্যাট মেনডোনসা—মার্টিন ডিসুজা নামে এক ছেলেকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সকলে ধরেও নিয়েছিল বিয়ে হবে। কিন্তু ডিসুজার বাপ-মা'র বড় গর্ব তারা ব্রাহ্মিন ক্রিশ্চিয়ান—বিয়ে হতে দিলে না। বিয়ে হবে না শুনে মেয়েটার মাথাই হয়ত বিগড়ে গিয়েছিল, নিজে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল ডিসুজার বাড়ি থেকে—দাদারে সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট হল—তক্ষুনি শেষ। অ্যাকসিডেন্টের খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল।

অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটাল নবিস। চ্যাটার্জী ঠেলে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারল না। মুখে কথা নেই। কেমন যেন হয়ে গেছে। খানিক বাদে ফুল কিনল এক গোছা, চ্যাটার্জীকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠল।

সমাধিক্ষেত্র। নিঃশব্দে খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছে দুজনে। বেশি খুঁজতে হল না। হঠাৎ একদিকে চোখ পড়তে নিস্পন্দ কাঠ দুজনেই। ওই ছোট সমাধি একটা—। সমাধির

ওপব ক্রস। ক্রস-এ ঝুলছে নবিসেব সেই কোট। সমাধিব গাযে নামেব হবপ—প্যাট মেনডোনসা।

নির্বাক স্তব্ধ দুজনেই। অভিভূতেব মত কতক্ষণ দাড়িযেছিল সমাধিব সামনে হুঁশ নেই।

নবিস ফুল দিল। ক্রস-এব ওপব থেকে কোটটা হাতে তুলে নিল। বলল, চলো—

ফিলিপ নবিসেব হাতে কোটটা দেখে কি এক অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ কবছিল চ্যাটার্জী। কিন্তু বলা হযনি, ওটা থাক।*

মেজর সেবকরাম

সন্ধ্যাব পব আজ বেশ একটু সময নিযে আব বেশ একটু যত্ন কবে প্রসাধন পর্বে মনোনিবেশ কবেছেন মিসেস সেবকবাম। মুখখানা হাসি-হাসি। হাসি-হাসি কেন, আযনায নিজেব দিকে চেযে মাঝে মাঝে হাসছেনও মিটি-মিটি। কিছুদিন আগেও পার্টি শুনলে গাযে জ্বব এসেছে। গোমড়ামুখ কবে প্রসাধন সেবেছেন। বিশেষ কবে মেস ক্লাবেব ডিনাব পার্টি শুনলে না যাবাব ফিকিব খুঁজেছেন এই বযসেও। যে হৈ-হুল্লোড কাণ্ড সব, বযসেব বাছবিচাব নেই, ছেলে-বুড়োতে মিলে ফষ্টি-নষ্টিব হাট। মিসেস সেবকবাম একবাব এক বছবেব একটা লিস্ট কবেছিলেন—গোটা বছবে কতগুলো পার্টি হল। তাতেও অফিস পার্টি অর্থাৎ যাতে তাদেব নিমন্ত্রণ নেই, সেগুলো বাদ দিযেছিলেন। তাবপব কর্তাকে ঠাট্টা কবেছিলেন, মিলিটাবী চাকবি মানে তো শুধু পার্টি আব পার্টি।

এই ঠাট্টাব পবেই অবশ্য দুর্দৈব ঘটেছিল। চীনা আক্রমণে হিমালযেব শান্তি নড়ে উঠেছিল। তখন এক এক কর্মক্ষেত্রেবই আবাব আব এক রূপ দেখেছেন মিসেস সেবকবাম। সার্ভিসেব লোকগুলোকে নিযে যেন হবিব লুট লেগেছিল। কে কোথায ছিটকে পড়েছিল ঠিক নেই। আজ যে এখানে কাল সে কোন সীমান্তে ঠিক নেই। সেদিনেব কথা মনে পড়লেই একখানা হাসি-হাসি-মুখ বুকেব তলায খচখচ কবে মিসেস সেবকবামেব। তাঁব থেকে অনেক ছোট অথচ কি নজবে যে দেখেছিল তাকে, কে জানে।—ক্যাপ্টেন বিঠঠল, বড জোব চল্লিশ হবে বযস। মিসেস সেবকবাম কোন পার্টিতে গেলেই কাছে কাছে ঘুব-ঘুব কবত, তিনি এদিক ওদিক তাকালেই পাঁচবাব কবে ছুটে আসত কিছু চাই কিনা জিজ্ঞাসা কবতে। চাই বললে খুশি হত, চাই না বললে মুখখানা বেজাব কবত। মিসেস সেবকবাম তাব ওপবঅলাব স্ত্রী, সেই হিসেবে কিছুটা অনুকম্পাব পাত্র। তা এসব পার্টিতে লেডিদেব অনুকম্পাব পাত্র সকলেই --সে লেফটেনেন্ট কর্ণেলই হোক আব নবাগত লেফটেনেন্টই হোক। সম্মিলিত পার্টিতে সামান্য অফিসাবেব স্ত্রীবও বাজবাণীব মর্যাদা।

---

* আখ্যানেব বক্তা খববেব কাগজেব চ্যাটার্জী আমাব বন্ধু। মূল ঘটনাটি সত্যি বলে তাঁব দাবি।

তবু বড় অফিসারদের স্ত্রীদের ছোট অফিসাররা নিজেদের অগোচরেও কিছুটা সমীহ করে থাকে। কিন্তু সেদিন ক্যাপ্টেন বিঠঠলের পানের মাত্রা বোধ হয় একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। সবিনয়ে চুপি চুপি প্রস্তাব করেছিল, মাদাম, আজ যদি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে নাচেন। মিসেস সেবকরাম পার্টির এই অধ্যায়টা রবারর সন্তর্পণে পরিহার করে এসেছেন। আঠার-কুড়ি বছর বয়স থেকেই এই এক ধরণ তাঁকে সামলে আসতে হয়েছে। বুড়ো বুড়ো ওপরঅলা অফিসারগুলো পর্যন্ত হ্যাংলার মত এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছে। কিন্তু মিসেস সেবকরাম নাচ শেখেনইনি মোটে। গোড়ায় গোড়ায় মেজর চেষ্টা করেছিলেন শেখাতে—অবশ্য চেষ্টা যখন করেছিলেন তখন তিনি মেজর নন, নতুন রয়সের লেফটেনেন্ট। ছদ্ম কোপে তখন চোখ পাকিয়েছেন মিসেস সেবকরাম, তোমাদের মিলিটারী চাকরিতে এত রঙ ধরে টানাটানি কেন, নিজেরা যা করছ করোগে।

কিন্তু এই রয়সে বিঠঠলের ওই প্রস্তাবে যেমন অবাক হয়েছেন তেমনি বিরক্ত হয়েছিলেন। মেজরকে বলেছিলেন, ছোকরার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করো, ওর মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে, আজ আবার আমার সঙ্গে নাচতে চেয়েছিল।

মেজর সেবকরাম হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, এবার থেকে তোমার রয়সের একটা কার্ড তুমি গলায় ঝুলিয়ে যেও।

সেই ক্যাপ্টেন বিঠঠলের বিদায় পার্টি ছিল সেদিন—সুদূর ফ্রন্ট-এ হাজিরা দেবার নির্দেশ এসেছিল তার উপর। বিদায় সম্বর্ধনার পরে মেজরের সামনেই সে এসেছিল মিসেস সেবকরামের কাছে। সৌজন্যের রীতি অনুযায়ী মিসেস সেবকরাম তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, সুস্থ পরমায়ু কামনা করেছিলেন। ছেলেটা চুপচাপ খানিক তাকিয়েছিল তাঁর দিকে, তারপর অনুমতি প্রার্থনা করেছিল, আপনার হাতখানা ধরতে পারি?

মিসেস সেবকরাম বিব্রত বোধ করেছিলেন, ওদিকে স্বামী নীরবে একটু ইশারা করেছিলেন। মিসেস সেবকরাম একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দুই হাতে প্রগাঢ় আবেগে সেই হাতখানা নিয়ে নিজের ঠোঁটে ঠেকিয়েছিল ক্যাপ্টেন বিঠঠল। তারপরেও ধরে রেখেছিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সসম্ভ্রমে ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, মাদাম, এই দুটো বছর আপনাকে বড় ভালো লেগেছে। হাসি-খুশি দরদ মর্যাদাবোধ—সব মিলিয়ে আপনাকে দেখলেই মনে হয়েছে, ইউ রিপ্রেজেন্ট মাদার ইণ্ডিয়া।

মিসেস সেবকরাম স্বামীর দিকে চেয়ে দেখেছেন, চোখ দুটো তাঁর অদ্ভুত চকচক করছে। দেশের প্রসঙ্গে এই চোখ তিনি জীবনে অনেক দেখেছেন।

মাসখানেকের মধ্যে ফ্রন্ট থেকে ক্যাপ্টেন বিঠঠলের মৃত্যুসংবাদ এসেছে। তার বীরত্ব আর দুঃসাহসিক মৃত্যুবরণের বিবরণও এসে পৌঁচেছে। সকলে গর্ব অনুভব করেছে। গোপনে অনেকবার চোখের জল মুছেছিলেন মিসেস সেবকরাম।

এর কিছুদিন বাদেই নিজের স্বামীকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। মেজরকে হাজিরা দিতে হয়েছে সুদূর লদাকে। সেই দীর্ঘ সময়টা কি ভাবে কেটেছিল মিসেস সেবকরামের তিনিই জানেন। এই দুটো ঘটনার পর থেকে বাকি এ-কটা বছর পার্টির অনেক প্রগলভ

হৈ-চৈ এমন কি অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অশালীন ফূর্তি দেখেও তিনি বিরক্ত হননি।...আহা, কে কবে আছে আর নেই কে জানে, জীবনের তো এই দাম সব!

কিন্তু আজ নিজের খুশির আমেজেই সুচারু প্রসাধন সম্পন্ন করছেন মিসেস সেবকবাম। তাঁব বয়স পঞ্চাশ ছুঁয়েছে। চুলের বোঝার ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলোতে পাক ধবেছে। কিন্তু সাজগোজ কবে পার্টিতে গেলে সেখানকাব পঞ্চাশোর্ধেবা তাঁব দিকেই বেশি ঘেঁষে। মেজরের এখন আটান্ন, সব চুল সাদা। দুই ছেলে মিলিটারী কলেজে ভবিষ্যৎ সৈনিক হবাব জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মেজব ঠাট্টা কবেন, আমাব সঙ্গে তোমাব পার্টিতে যাওযার অনিচ্ছাব কাবণটা বুঝতে পাবি, ছেলেদেব যখন বড় বোঁন ভাবে লোকে তোমাকে, আমাকে কি ভাবে কে জানে।

এই বেপবোযা বসিকতাবও হেতু আছে। ছেলেবা সেবাবে ছুটিতে বাড়ি আসতে একজন সদ্য পবিচিত ভদ্রলোক মিসেসকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, এঁবা দুটি আপনাব ছোট ভাই নাকি?

কিন্তু মুখে যাই বলুন মেজব, তাঁব ওই চুলই শাদা হয়েছে। এখনো চওড়া বুকের ছাতি, পবিপুষ্ট হাতের কব্জা। আনন্দে অনেক নব্য তরুণেব হাত ধরে ঝাঁকুনি দেন যখন, তাদেব কাঁধেব হাড়ে লাগে। এই বসিকতা শুনলেই মিসেস সেবকবাম বাগ কবেন আবাব হেসেও ফেলেন।

কিন্তু প্রসাধনবত মিসেস সেবকবাম আজ হাসছেন অন্যকাবণে। আজকেব বিশেষ পার্টি বিশেষ কবেই তাঁদেব জন্যে—সেই কাবণেও নয়। জীবনেব এক বিবাট অধ্যায় শেষ হযে গেল, চাকবি থেকে অবসব গ্রহণ কবছেন মেজর সেবকরাম—সেই বিদায উপলক্ষে এই সাড়ম্বর পার্টি। কিন্তু মিসেস সেবকবামের ঠোঁটেব ফাঁকে কৌতুকেব হাসিটুকু লেগে আছে একেবারে ভিন্ন কারণে। আজও এই খানিক আগে স্বামীব সঙ্গে সেই চিরাচবিত ব্যাপাব নিযে ছদ্ম বাকবিতণ্ডা হযে গেছে একপ্রস্থ। ঠোঁটেব হাসিটুকু তাবই বেশ। মেজব বলেছিলেন, যাব জন্যে জীবনেব ঠিক এইখানটায আজ এসে দাঁড়ানো গেছে, তাকে সত্যি সত্যি কেউ চিনল না।

মিসেস সেবকবাম হাসি চেপে দেযালেব মস্ত অয়েলপেন্টিং ছবিটা দেখিযে নিরীহ মুখে জবাব দিলেন, কর্নেল ব্রাউনেব কথা বলছ?...চিনবে না কেন, মস্ত নামী লোক— তার ওপব তোমাব মত এমন একজন মেজব তৈবি কবে গেল।

সেবকবাম মাথা নেড়েছেন, কর্নেল ব্রাউন নয়, আমি আমাব ঝুমবিব কথা বলছি। আজকে এই জাযগায় এসে দাঁড়ানোব পিছনে ঝুমবিবাঈযেব কেরামতি কতখানি কেউ জানলই না, বোকাগুলো জীবনভোব শুধু আমাকেই বাহবা দিযে গেল।

মিসেস সেবকরামেব নাম ঝুমবিই বটে, ঝুমবিবাঈ। কিন্তু এখন ভদ্রলোকটিও তাঁকে ঝুমরি বলে ডাকলে লজ্জা-লজ্জা করে—কেমন ছেলেমানুষ লাগে নিজেকে। ছেলেদেব সামনে ডাকলে তো চোখ রাঙান তিনি। মহিলাদেব উদ্যোগের কোনো চাঁদাব খাতাটাতায় সই কবতে হলেও সংক্ষেপে লেখেন মিসেস জে, সেবকবাম। ঝুমবিবাঈ শুনলে তবু একবকম, শুধু ঝুমরি শুনলে বযস যেন অর্ধেক কমে যায়।

সেই রকমই ভ্রূকুটি করেছিলেন ঝুমরিবাঈ, এই প্রসঙ্গ উঠলে যেমন করে থাকেন। বলেছিলেন, হুঁঃ, আমার কেরামতি কত জানা আছে। আসলে যার কেরামতি সে তোমার ওই গলায় ঝুলছে—তোমার এই চাটুবাক্যে যে ভুলবে সে একটি আস্ত বোকা।

মেজরের গলায় ঝুলছে বড় লকেটসুদ্ধু একটা হার। আজ ছত্রিশ বছর ধরেই এটা গলায় ঝুলছে তাঁর। ছত্রিশ বছর আগে প্রথম যখন ফৌজের চাকরিতে ঢোকেন তিনি—তাঁর ঠাকুরদা এটি উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে।

উপদেশ দিয়েছিলেন, মন্ত্রপূত কবচের মত এটি যেন সর্বদা গলায় রাখা হয়। ঠাকুরদা ছিলেন দূর অতীতের স্বাধীন মারাঠা বীর সৈনিকবংশের সন্তান।

পরদেশী ফৌজে চাকরি নেবেন তাঁর নাতি এটা আদৌ মনঃপূত ছিল না। নিলেনই যখন, এটা তখন তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তোমার দেশের সম্মান তোমার গলায় থাকল। সেই থেকে অনেকবার হার ছিঁড়েছে আর বদলেছে, কিন্তু মূল জিনিস অর্থাৎ সেই লকেট তেমনি আছে। ঝুমরিবাঈ এটা ইঙ্গিত করেই মুখঝামটা দিয়েছিলেন। আর তারপর প্রসাধন করতে করতে আপনমনেই হাসছিলেন।

সভার মধ্যে মেজর যে এই কাণ্ড করে বসতে পারেন, ঝুমরিবাঈ তা কল্পনাও করেননি।

জীবনের যে একটি বিশেষ ঘটনা মেজরের কর্মজীবনে সোনার অক্ষরে চিহ্নিত হয়ে আছে, সেই কাহিনীটিই আন্তরিক আনন্দে সভার বৃদ্ধ সভাপতি জুনিয়র অফিসারদের শোনালেন। মেজরের সেই কাহিনী অনেকে অনেকবার শুনেছে, তবু বারবারকার মতই সরস লাগল আরারো। আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। ঝুমরিবাঈ তখনো খুশিতে গর্বে মাঝে মাঝে স্বামীর মুখখানা দেখে নিচ্ছিলেন। এবারে মেজরের কিছু বলার পালা। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, আমি এই দীর্ঘদিন ধরে খানিকটা অপরের প্রাপ্য অপহরণ করে আসছি। আজকের বিদায়ের দিনে সেটুকু স্বীকার করে যাওয়াই ভালো—এইমাত্র জীবনের যে ঘটনা শুনে আপনারা আমাকে অভিনন্দন জানালেন তার সবটুকু আমার প্রাপ্য নয়—

এ পর্যন্ত বলে তিনি অদূরে ঝুমরিবাঈয়ের দিকে তাকালেন একবার। মিসেস সেবকরামের শঙ্কটাপন্ন অবস্থা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে তিনি যেন নীরবে নিষেধ করতে চেষ্টা করলেন। এখানকার হুল্লোড়ের ব্যাপার তিনি জানেন।

কিন্তু মেজর তা দেখেও দেখলেন না, উৎসুক শ্রোতাদের দিকে চেয়ে বলে গেলেন, বয়সকালে একটি মেয়েকে মনে ধরেছিল আমার, তাকে বিয়ে করার জন্য ভিতরে ভিতরে ক্ষেপেই উঠেছিলেন, কিন্তু তখন ফৌজে সেই সামান্য চাকরি করি আর জীবনটা করে আছে করে নেই ভেবে সেই মেয়ের বাপ আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে রাজি নন। যেদিন আমি ওই কাণ্ড করে আপনাদের কাছে ফেমাস হয়েছিলাম, ঠিক তার আগেই বিয়ের নাকচপত্র এসেছিল। ফলে আমার মাথায় তখন আগুন জ্বলছিল—এবং যা আমি করে বসেছিলাম সেই মেয়েটিকে না পাওয়ার সম্ভাবনার প্রতিক্রিয়াতেই বোধ হয় করতে পেরেছিলাম। অতএব আমার সেই ছেলেমানুষি বীরত্বের সঙ্গে একটি

মেয়েরও পরোক্ষ কৃতিত্ব জড়িত ছিল—সেদিনের সেই মেয়েটি উনি—ওই মিসেস সেবকরাম।

হিয়ার হিয়ার! হিয়ার হিয়ার! ওয়াণ্ডারফুল! আরো শুনব! আরো শুনতে চাই আমরা!

আনন্দে খুশিতে সভাস্থল সরগরম। মিসেস সেবকরামের মুখ টকটকে লাল। আনন্দোচ্ছল অজস্র জোড়া দৃষ্টির আঘাতে তিনি ফাপরে পড়লেন।

মেজর সেবকরাম গম্ভীর। বললেন, আপনারা আজ আমায় বিদায় দিচ্ছেন, কিন্তু উনি তো দিচ্ছেন না— তাই নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে আমি আর একটি কথাও বলব না।

সভা এইবার মিসেস সেবকরামকে নিয়ে পড়ল। তাঁকেও কিছু বলতেই হবে। বিব্রত বিড়ম্বিত মুখে মিসেস সেবকরামকে উঠে দাড়াতে হল। শ্রোতারা উন্মুখ।

মিসেস সেবকরাম বললেন, পুরুষেরা মেয়েদের চিরদিনই নির্লজ্জ তোষামোদ করে থাকেন, মেজরের উক্তি সেই নির্লজ্জতারই চরম নিদর্শন। আসলে কার অপমান বরদাস্ত করতে না পেরে তিনি সেদিন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই বিচিত্র কাণ্ড করে বসেছিলেন, তার সঠিক প্রমাণ আছে আপনাদের মেজরের গলার ওই হারের লকেটটিতে। আপনারা ওটি দেখলে খুশি হব।

এবারে মেজর বিড়ম্বিত। চারদিক থেকে তরল রব উঠেছে, দেখব, দেখব—উই মাস্ট সি।

সভাপতি হাত বাড়াতে নিরুপায় মেজরকে গলা থেকে হারটা খুলে দিতে হয়। তারপর সেই লকেটসুদ্ধ হার সকলের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। সকলের মুখেই শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম।

লকেটের পিছনে সুন্দর করে খোদাই করা ভারতের মানচিত্র, তার মধ্যে ভারতমাতা দাঁড়িয়ে।

পার্টি শেষ হতে গাড়ি বাড়ির দিকে ছুটেছে। পিছনের সীটে মেজর এবং মিসেস সেবকরাম দু'জনে দু'ধারে বসে। মাঝখানে ফুলের ঝোঝা। তাদের ছদ্ম গাম্ভীর্যে ফাটল ধরছে মাঝে মাঝে। আড়ে আড়ে এক-একবার দুজনেই দুজনকে দেখে নিচ্ছেন।

ফুলের আড়াল দিয়ে একখানা হাত মিসেস সেবকরামের হাতে ঠেকল। ড্রাইভারের অলক্ষ্যে তিনিও ঈষৎ আগ্রহেই হাতখানা ধরলেন।

গাড়ি নির্দিষ্ট পথে ছুটে চলেছে।

এবারে বহুকালগত মেজরের জীবনের সেই স্মরণীয় ঘটনাটি ব্যক্ত করলে এই কাহিনী সম্পূর্ণ হতে পারে।

সেই নতুন বয়সে মেজর সেবকরাম ছিলেন এক তোপখানার হাবিলদার মেজর। হাবিলদার মেজর থেকে হওয়া আর মন্ত্রী দপ্তরের আরদালী থেকে মন্ত্রী হওয়া প্রায় একই পর্যায়ের বিচিত্র ব্যাপার। মেজর সেবকরাম তাই হয়েছিলেন।

ইংরেজ আমলে তোপখানার তিনি সিপাই হয়ে ঢুকেছিলেন। খাওয়া পরা ছাড়া তখন মাইনে ছিল মাসে আট টাকা। অল্প লেখাপড়া জানতেন, সাহেবী আমলের

ভাঙা ইংরেজী বলায় তাঁর সুনাম ছিল। আর ছিল প্রচুর উৎসাহ আর উদ্দীপনা। ফলে ওপরেব অফিসার ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীর প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। সিপাই থেকে নায়েক হয়েছেন, নায়েক থেকে হাবিলদার এবং সেই অল্প বয়সেই হাবিলদাব থেকে মেজর। মাইনে তখন অলফাউণ্ড কুড়ি টাকা—তাঁদেব পর্যাযে সেদিনেব মস্ত চাকবি। হাবিলদার মেজর নিজের ইউনিটের জোয়ানদের মধ্যে সর্বেসর্বা—তাঁকে ডিউটি ভাগ কবে দিতে হয়, জোয়ানদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায বাখতে হয। জোযানেরা যেমন সমীহ কবত তেমনি ভালও বাসত তাঁকে। মোট কথা সেই অল্প বযসেই জোযানদেব আকাঙ্ক্ষাব স্বর্ণচূড়ায উঠে বসেছিলেন হাবিলদাব মেজর সেবকবাম।

কিন্তু এই উন্নতিব তেমন কদব ছিল না শুধু ঝুমবিব বাবাব কাছে।

সেবকবাম ফৌজে চাকবি কবে, বছবেব ছুটিতে একবার মাত্র দেশে আসে, কোনো গণ্ডগোল বাধলে কোথায কোথায চলে যেতে হবে জামাইকে— এইসব ভেবে ঝুমবিব বাবাব এই বিযে মনঃপূত ছিল না। তাব থেকে ফলেব ব্যবসাযী প্রভুজীব ছেলেকেই বেশি পছন্দ তাব।

ঝুমবি সেবকবামেব পডশিনী, ছেলেবেলা থেকে ভাবী ভাব দুজনেব। বড় হযে ফৌজে ঢোকার ফলে সেবকবাম ভেবেছিলেন তাঁব কদব বাডল। কিন্তু উল্টো ব্যাপাব দেখে তাঁব চক্ষুস্থিব। পাবলে তক্ষুনি চাকবি ছেডে দেন। কিন্তু ফৌজেব চাকবিতে একবাব ঢুকলে ছাডতে প্রাণান্ত। ঝুমবিব বাবাকে চিঠিপত্রে অনেক বোঝালেন তিনি। ওদিকে ঝুমবিবাঈও দোটানায পডলেন, গোলামী কবতে যাওযাটা তাঁব আদৌ পছন্দ ছিল না। তাছাডা বাপও ন্যাযা কথাই বলছেন মনে হল, বিযেব পবেও তো জীবনেব অর্ধেক ছাড়াছাডি হয়ে থাকা।

কর্মস্থলেব প্যাবেড গ্রাউণ্ডে দাঁডিযে মাযেব লেখা ওদেব শেষ জবাব পডলেন সেবকবাম। মা লিখেছেন, ওবা শেষ পর্যন্ত এই বিযেতে বাজি হল না।

চিঠি পডে সেবকবামেব দুনিয়া বসাতলে পাঠানোব আক্রোশ। পায়ে পায়ে তিনি চললেন টেন্ট-এব দিকে।

এদিকে অস্ট্রেলিযা থেকে এক নতুন ক্যাপ্টেন এসেছেন তখন। গ্রাউণ্ডে দাঁডিযেই তিনি তাঁকে কম্যাণ্ডিং অফিসাব—অর্থাৎ এই ইউনিটেব সর্বাধিনাযক লেফটেনেন্ট কর্নেল ব্রাউনেব কাছ থেকে কিছু জ্ঞান আহবণ কবছিলেন। জোযানদেব ভালোভাবে জেনে বুঝে পরিচালিত কবাব সুবিধে হয এবকম কোনো বই আছে কিনা খোঁজ কবছিলেন নতুন উৎসাহী ক্যাপ্টেনটি।

লেফটেনেন্ট কর্নেল ব্রাউন জবাব দিলেন, আছে কিন্তু তাব কিছু দরকার নেই। জাস্ট গিভ দেম এ কিক অন দি ব্যাক অ্যাণ্ড দে উইল ডাই ফব ইউ। অর্থাৎ পিছনে একটি করে লাথি কসাবে, তা'হলেই তাবা তোমার জন্যে প্রাণ দেবে।

ঠিক সেই সমযেই সেবকবাম তাঁদেব পিছন দিয়ে যাচ্ছিলেন। ক্যাপ্টেনেব প্রশ্ন কানে আসতে দাঁড়িয়ে গেলেন আর কম্যাণ্ডিং অফিসাবের জবাব শুনে পায়ে পায়ে কাছে এগিযে এলেন। তাঁরা পিছন ফিবে দাঁড়িয়ে।

পিছন থেকে আচমকা এক বিপুল পদাঘাতে তিন হাত দূরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রাউন। নবাগত ক্যাপ্টেন বিমূঢ় হঠাৎ। কম্যাণ্ডিং অফিসার মাটি থেকে উঠে দেখলেন পিছনে কে দাঁড়িয়ে।

সেরকরাম শান্ত মুখে প্রশ্ন করলেন, ইউ মিন হি সুড কিক দিস ওয়ে সার? অর্থাৎ, কি এইভাবে লাথিটা মারতে বলছেন ওঁকে?

কম্যাণ্ডিং অফিসারের কোমরে বিভলভার থাকলে হয়ত তক্ষুনি সব শেষ হয়ে যেত। তাঁর হাতে ছিল একটা স্টিক। তাই নিয়েই বাঘের মত সেরকরামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। তারপর লপটা-লপটি দু'জনে। সেরকরামের কপাল ফেটেছে, কম্যাণ্ডিং অফিসারেরও নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই ব্যাপার ঘটে গেল। তারপরেই লোকজন ছুটে এলো। সেরকরামকে অ্যারেস্ট করা হল, নিরস্ত্র করা হল।

এরপর কোর্ট মার্শাল। যুদ্ধের সময় হলে এই অপরাধে সেরকরামের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারত— এখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে জানা কথাই।

কোর্ট মার্শাল শুরু হল। আইন অনুযায়ী নিম্ন পর্যায়ের তিনজন ভারতীয় অফিসারও থাকবেন। তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যদি বারো-চৌদ্দ বছরে এনে দাঁড় করানো যায়। এদিকে এই বিচারে আসামী নিজেরও একজন সমর্থক বা আইনজ্ঞ দাঁড় করানোর রীতি। যত টাকা খরচ হোক, সরকার তাকে আসামীর ইচ্ছানুযায়ী এনে দিতে বাধ্য।

সমর্থক প্রসঙ্গে সেরকরাম তাঁর প্রিয় অফিসার ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীর শরণাপন্ন হলেন। চতুর ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী আবার এক ইংরেজ লেফটেনেন্ট কর্নেলকেই এনে দাঁড় করালেন সেরকরামের হয়ে সওয়াল করার জন্য—এমন লোক বাছাই করলেন যার সঙ্গে ওই অফিসার কম্যাণ্ডারের খুব সদ্ভাব ছিল না। এই ইংরেজ লেফটেনেন্ট কর্নেল এসেই হৈ-চৈ কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন, প্ররোচনার কারণ থাকলে কবে কোথায় কোন ইংরেজ সৈনিক অফিসারকে লাথি মেরেছিল তার নজির বার করলেন। অফিসার কম্যাণ্ডার অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেনকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেটা অস্বীকার করেননি। সেটাই তো প্ররোচনা। নিপুণ সুদক্ষ কর্মী সেরকরামের দেশপ্রীতির জন্য শাস্তি না হয়ে তাঁর পুরস্কার পাওয়া উচিত বলে গলা ফাটালেন তিনি।

হুলস্থুল বেধে গেল এই নিয়ে। শেষ পর্যন্ত অফিসার কম্যাণ্ডারের সম্মান রক্ষার্থেই কোর্ট মার্শালে মাত্র একমাস কারাদণ্ড হল সেরকরামের। হাবিলদার মেজরের পদমর্যাদা অবশ্য গেল, দণ্ডের মেয়াদ ফুরালে আবার সিপাই থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হবে তাঁকে।

ওদিকে সেরকরামের দেশে পর্যন্ত নানাভাবে পল্লবিত হয়ে এই খবর চলে গেছে। সেখানে তিনি বীরের আসন লাভ করেছেন। ঝুমরিবাঈ ঘোষণা করেছেন, জেল থেকে বেরুলে সেরকরামকেই বিয়ে করবেন তিনি। তাঁর বাবা এবারে হৃষ্টচিত্তে সায় দিয়েছেন।

জেল থেকে বেরিয়েই সেরকরাম দেখেন, সামনে দাঁড়িয়ে সেই কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রাউন যাঁকে তিনি পদাঘাত করেছিলেন। দু'জনে দু'জনকে দাঁড়িয়ে দেখলেন কয়েক

মুহূর্ত। সাহেব এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। হেসে বললেন, আমার মাজায় এখনো ব্যথা আছে।

নিজে কাঁধ ধরে নিয়ে গিয়ে কাজে বহাল করলেন, আর তক্ষুনি আবার হাবিলদার মেজরের পদে প্রমোশন দিলেন তাঁকে।

বিয়ে কর্মস্থলেই হল। কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রাউন বউ দেখতে এলেন। এসে এক ফাকে খুশী হয়ে বউকে বললেন, বি কেয়ারফুল, হি ক্যান কিক ওয়েল।

হাবিলদার মেজর সেরকরাম সলজ্জে হেসে এই প্রথম ক্ষমা চাইলেন তাঁর কাছে। বললেন, সাহেব, সেই দিন ঝুমরির বাবা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল আর এই দেখো— বলে গলার লকেটটা তাঁকে উল্টে দেখিয়েছিলেন, বলেছিলেন, সেই ব্যথার ওপর তুমি আরো কোথায় ব্যথা দিয়েছিলে দেখো—এই দেশ যে আমার প্রাণ সাহেব। সাহেবের দুই চক্ষু চকচক করছিল। একবার ঝুমরিকে দেখছিলেন তিনি, একবার সেরকরামের গলার লকেটটা।

এরপর কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রাউন ক্রমশ অনেক ওপরে উঠেছেন, পুরোদস্তুর কর্নেল হয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে অলক্ষ্য থেকে সেরকরামকেও টেনেছেন। সকলে অবাক হয়ে দেখেছে—হাবিলদার মেজর সেরকরাম হঠাৎ ভাইসরয়েস কমিশনড অফিসার হয়েছেন একদিন—লেফটেনেণ্ট হয়েছেন। তারপর প্রশস্ত রাস্তা, লেফটেনেণ্ট থেকে ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন থেকে মেজর। এর অনেক আগেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। কর্নেল ব্রাউন বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু যাবার আগে তিনি এঁদের সঙ্গে দেখা করে যেতে ভোলেননি। সেই পুরনো ঠাট্টাও করেছেন মিসেস সেরকরামের দিকে চেয়ে, হি কিকস ওয়েল—দ্যাট ওয়ান ব্রিলিয়াণ্ট কিক ব্রট বোথ ইউ অ্যাণ্ড মি নিয়ারার—ডোণ্ট ইউ এগ্রি উইথ মি ম্যাডাম?

তিলে তিলে তিলোত্তমা

আজব শহরের আজব বাহার।

ঘড়ি ধরে সন্ধ্যা ছ'টায় খোলে, ন'টায় বন্ধ হয়। আশেপাশে প্রায় সকাল ছ'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত যাদের দোকান খোলা, তারাও তখন এদিকপানে চেয়ে থাকে আর বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়ে। প্রাসাদোপম এই অট্টালিকায় অনেক ব্যবসায়ী অনেক রকমের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। কিন্তু বিউটি হাউসের তিন ঘণ্টা ওদের তিরিশ ঘণ্টা।

'সব রাস্তা রোমের দিকে।' এখানে সব আগন্তুক বিউটি হাউসের দিকে।— সসঙ্গিনী তিনঘণ্টা সিনেমায় কাটানো যায়, লাভার্স পার্কের আবছা আলোয় নিরিবিলিতে বসে তিন মিনিটে তিন ঘণ্টার অবসান হতে পারে, হাত-ধরাধরি করে শিথিল চরণে মার্কেট প্লেসের শো-কেইস দেখেও ঘণ্টাতিনেক উতরে দেওয়া যায়। কিন্তু এখানকার এই তিন ঘণ্টার স্রোত একেবারে অন্য খাতে বইছে। এই তিন ঘণ্টায় মনো-বৈচিত্র্যের নিখুঁত নক্সা আঁকতে পারে, এমন লিপি-বণিক জন্মায়নি বোধ হয়।

রূপচর্যার জীবন্ত মিছিল। —বিধাতার মার হার মেনেছে বিউটি হাউসের মার-প্যাঁচের কাছে। খোদার ওপর খোদকারীর নমুনা দেখাচ্ছে বিউটি হাউস। বিউটি হাউস মুশকিল-আসান।

নারীপুরুষের বিচ্ছিন্ন সমাগম। সঙ্গী বা সঙ্গিনী নিয়ে বড় কেউ আসে না এখানে। অন্যের চোখে নিজেকে অভিরাম করে তোলার তাগিদে কোঅপারেশন অচল।

প্রকাণ্ড হল। শাদা আলোয় মেঝেতে পুরু কার্পেটের বোঁয়া পর্যন্ত দেখা যায়। একদিকে সারি সারি শো-কেইসএ রঙ-বেরঙের প্রসাধনসামগ্রী সাজানো। সেসবের উপযোগিতা আর ব্যবহার বুঝিয়ে দেবার জন্য আছে এক্সপার্ট সেলসম্যান। অন্যদিকে ছোট ছোট চেম্বার। হাতে-কলমে কলাকৌশল শেখানোর মহড়া চলেছে সেখানে।

বয়সের ভারে কোঁচকানো চামড়ায় যৌবনের জলুস আনা যেতে পারে।...কালোর চেকনাই ছোটানো যেতে পারে শাদা চুলে।...তোবড়ানো গাল ভরাট দেখাবার উপকরণ পেতে হলে এখানে আসতে হবে। ...এখানে আসতে হবে প্লাস্টার-পালিশে বাঁকাচোরা বিকৃত দাঁতে কুন্দ-দন্তের শোভা আনার কৌশলটি জানতে হলে। পটলচেরা চোখ বা কোঁকড়ানো চুল চাই তো এসো বিউটি হাউসে।—শুধু এখানকার উপকরণ আর পনের দিনের ট্রেনিং—এর পরে মুখের ওপর সার্চ-লাইট ফেললে প্রসাধন যদিও বা ধরা পড়ে, আসল রঙটি ধরা যাবে না। শোনা যায়, এ বিদ্যে শেখানোর জন্য প্যারিস থেকে ট্রেইনার ধরে এনেছে দোকানের মালিক ভাটনগর। নিরুৎসুক-জনের খটকা লাগতে পারে, যে-দেশে কালো রঙের সমস্যা নেই, সে-দেশে অমন এক্সপার্ট গজায় কি করে? কিন্তু নিরুৎসুক-জনকে নিয়ে কারবার নয় বিউটি হাউসের।

চটপটে ছটফটে মানুষ ভাটনগর। হাসছে গল্প করছে তদবির-তদারক করছে। নতুন খদ্দের দেখলেই বিলিতি কায়দায় মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানায়, সাদরে নিয়ে গিয়ে বসায় নিজের নিরিবিলি বসবার জায়গাটিতে। গভীর সহানুভূতিতে সমস্যা শোনে, মাথা নাড়ে। সম্ভাব্য সমাধান বাতলে দিয়ে আশ্বস্ত করে তারপর। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের গায়ে লাগানো বোতাম টেপে। প্যাঁক করে শব্দ হয় একটা। বেয়ারা দৌড়ে আসে।

—সাবকো (অথবা মেমসাবকো) ...নম্বর কামরা দেখাও।

পুরানো বা চেনা-জানা খদ্দেরের সঙ্গে তার হাসি-খুশি-ভরা অন্তরঙ্গতায় ব্যবসায়ীর দূরত্ব নেই এতটুকু। কোনো ভদ্রলোকের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সোচ্ছ্বাসে বলছে, গ্রেইং ওয়ানডারফুলি ইয়ং স্যার। উত্তরতিরিশ কোনো মহিলাকে সবিনয় অভিবাদনে স্তুতি জানাচ্ছে, ইউ লুক হার্ডলি টুয়েন্টি মাদাম—।

যার রূপ আছে সেও আসে। যতটুকু আছে তার থেকে বেশি একটু থাকতে আপত্তি কি। আর যার নেই তার তো কথাই নেই। কিন্তু সবাই যে এখানে এসে একেবারে রূপচযনে বসে যায় বা তেমনি কোন সমস্যা নিয়ে হাজির হয় এমন নয়। সাধারণ প্রসাধনসম্ভারও হরদম বিক্রি হচ্ছে এখানে, যা আজকাল ঘরে ঘরে লাগে। সেসব কেনার ছুতোয় কৌতূহল মেটাতে আসে অনেকে।

কিন্তু আরো একটা আকর্ষণ আছে বিউটি হাউসের।

স্বপ্না বোস।

দীপশিখা যেমন পতঙ্গ টানে, তেমনি ওরও অমোঘ একটা আকর্ষণ আছে। পিছনের দরজা দিয়ে গটগট করে ঢোকে যখন, মনে হয় এত বড় হলটা ঝলমলিয়ে হেসে উঠল।

বিউটি হাউসের প্রধানা আপ্যায়িকা স্বপ্না বোস।

কিন্তু অন্তরঙ্গ সকলেরই বিশ্বাস, শুধু কর্মচারিণী নয়, ব্যবসায়ের কলকাঠিও এই মহিলাই আগলে বসে আছে। আর ধারণা, স্বপ্না বোস ছাড়া ভাটনগরের জীবন-জোয়ারেও চড়চড় করে ভাটা নেমে আসবে। অনেকের ইঙ্গিত আরো স্পষ্ট। বোস পদবীটা এখনো রেখেছে ব্যবসায়ের আবহাওয়ায় রোমান্স ছড়াবার জন্য, নইলে, ইত্যাদি।

আশ্চর্য, মেয়েদের সঙ্গে পর্যন্ত ভারি সহজ একটা হৃদ্যতা ওর— যা হবার কথা নয়। তারা আসে রূপচয়ন করতে। এ নারী রূপেরই জীবন্ত উৎস। ঈর্ষা হবার কথা, কিন্তু হয় না। বরং সলা-পরামর্শ নির্দেশ-উপদেশের জন্য ওরই কাছে মন খুলে দেয় তারা। ওকে দেখে আপন অভিলাষ ব্যক্ত করতে নবাগতদের হয়ত একটু সঙ্কোচ হয়, হয়ত বা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে চাপা নিঃশ্বাসও পড়ে দুই-একটা। কিন্তু যাদু জানে স্বপ্না বোস। হেসে, জড়িয়ে ধরে, কানে কানে কথা বলে, নিরিবিলি চেম্বারে টেনে নিয়ে গিয়ে মনের কথা শুনে আর মনের মত কথা শুনিয়ে বৈষম্যের অনুভূতিটুকু পর্যন্ত ধুয়ে-মুছে দেয়।

পুরুষদের সঙ্গে অবশ্য স্বপ্না বোসের রীতিনীতি ভিন্ন। এদের মধ্যে সমস্যা নিয়ে যারা আসে, তারা আর যাই হোক ওর কাছে আসে না। তারা সোজা যায় ভাটনগরের কাছে, নয়ত তার অন্য কোনো পুরুষ সহকারীর কাছে। কিন্তু স্বপ্না বোসের সঙ্গ-অভিলাষী আগন্তুকের সংখ্যাও কম নয়। বারো মাস তিরিশ দিনের প্রসাধনসামগ্রীই হয়ত কিনতে আসে তারা। একের জায়গায় তিন গছিয়ে দেয় স্বপ্না বোস। কৃত্রিম বিপন্ন ভাবটি ফুটিয়ে তুলে তারা হয়ত বলে, বাঃ রে, এত কি হবে?

—নিয়ে যান, বউ খুশি হবে।

বউ খুশি হোক না হোক, আর কেউ যে খুশি হবে সেটা জেনেই ওরা খুশি।

কাউকে বা স্বপ্না বোস ছদ্মকোপে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, আপনারা না নিলে আমাদের দোকান চলে কি করে?

ওদের দোকান সচল রাখতে গিয়ে নিজে অচল হচ্ছে কিনা, সেটা তখনকার মত অন্তত অনেকেরই মনে থাকে না।

বাড়িগাড়িঅলা সুপরিচিতদের ছদ্ম-ত্রাস-জড়িত অন্তরঙ্গতার সুরও বৈচিত্র্যহীন নয়। —বাঃ রে, এলেই এককাঁড়ি জিনিস নিতে হবে তার কি মানে আছে? গরীব মানুষ, অত টাকা কোথায় পাব?

স্বপ্না বোস কখনো একঝলক হেসে ফস করে জবাব দেয়, তবে দোকানে আসেন কেন? কখনো বা তেমনি ছদ্ম-গাম্ভীর্যে বলে, সত্যি কথাই তো, টাকার এত টানাটানি আপনার—আচ্ছা নিয়ে যান, জিনিসগুলো আমার নামে লিখিয়ে রাখছি'খন।

সানন্দে হার মেনে জিনিস নেয় তারা।

হল্-এর এক প্রান্তে ভিজিটারদের জন্য দামী সোফা সেটি কৌচ পাতা।

অন্তরঙ্গজনদের নিয়ে সেখানে দিব্বি আড্ডা জমে যায়। প্রায়ই চা আসে, সিগারেট আসে। ভাটনগরের সেদিকে একটুও কার্পণ্য নেই। সপ্রগলভ আড্ডার মাঝেই স্বপ্না বোস এক এক সময়ে সকলকে সচেতন করে দেয়।— বেচারী ভাটনগর ড্যাব-ড্যাব করে দেখছে দেখুন, আপনাদের ব্যাপার দেখে হার্টফেল না করে বসে।

জোড়া জোড়া চোখ ছোটে অদূরে মালিকের দিকে। দু'হাত তুলে ভাটনগর একটা হতাশার ভাব দেখায়। কখনো বা স্বপ্না বোসের দিকে চেয়ে হাসে মৃদু-মৃদু। আবেশ জড়ানো হাসি। আর এদিক থেকে সে হাসির নীরব প্রত্যুত্তরও বোধ করি সবারই চোখে পড়ে। বুকের ভেতরটা খচখচ করে ওঠে অনেকেরই। কিন্তু ভাটনগরের কাছ থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব নয় কোনমতে, এও এতদিনে সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। অবাঙ্গালী ভাটনগরের ভাগ্য দেখে তারা ঈর্ষা করাও ছেড়ে দিয়েছে। এখন সেটা সরস হাস্য-কৌতুকের ব্যাপার।

স্বপ্না বোস শত্রুমুখে রসালাপের ছোট্ট বড়েটা এগিয়ে দেয় যেন।—চাকরিটা আমার আপনারাই খাবেন দেখছি।

হা-হাঁ করে ওঠে তারা।—নিশ্চয় খাবো, আলবৎ খাবো, কবে খাবো বলুন— ভাটনগর চাকরি খেতে দেরি করছে বলেই তো আমাদের অমন খাওয়াটা মাটি।

বলে বটে। কিন্তু ভাটনগর সত্যিই যদি তার চাকরি খেয়ে এদের খাওয়ারার ব্যবস্থা করে, বিউটি হাউস দু'দিনেই তাহলে মরুভূমি হয়ে যাবে এও বোঝে। খাওয়া তাদের একদিন জুটবেই, তবে ভাটনগরের গৃহস্বামিনী হলেও শুধুই ঘরের বউ হয়ে থেকে স্বপ্না বোস ব্যবসা মাটি করবে না, এটুকুই ভরসা।

অবকাশকালে ভাটনগরও সহাস্য বদনে এদের হালকা ফূর্তিতে যোগ দেয়। বিভিন্ন পেশার লোক আছে স্তাবকদলের গুঞ্জন-সভায়। ভাটনগর ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বলে, একবার স্টেথসকোপটা লাগান দেখি বুকে, ঠিক চলছে কিনা দেখি। কখনো বা নব্য ব্যারিস্টারের উদ্দেশে বলে, আপনি রেডি থাকুন সার, ওর এগেইনস্ট-এ হয়ত শীগগিরই কেইস ঠুকতে হবে। ওর মানে স্বপ্না বোসের। কখনো বা অসহায় মুখে প্রোফেসার নামখ্যাত লোকটির স্মরণ নেয়। কিসের প্রোফেসার, কোথাকার প্রোফেসার জানে না (জানে না বোধ হয় কেউ-ই), তবু বলে, আপনার কাছে আমি দর্শন পড়ব প্রোফেসার—এ জীবনে আর কি সুখ।

হাসাহাসি পড়ে যায়। স্বপ্না বোসের পাশের জায়গাটা আপনিই খালি হয়ে যায়। জায়গাটা কে ছেড়ে দিলে ভালো করে খেয়াল না করেই ওর গা-ঘেঁষে বসে পড়ে ভাটনগর। স্বপ্না বোস তাকায় আড়চোখে। সে কটাক্ষ-বাণে ভাটনগর কতটা বিদ্ধ হয় বলা শক্ত। কিন্তু আর যারা বসে, তাদের দৃষ্টিপথে সে কটাক্ষ একেবারে মর্মে গিয়ে কাটা-ছেড়া করতে থাকে। হাসি-বিদ্যুৎ-প্রেম—এ তিনের একখানি ঝকঝকে ছুরি যেন। চোখের দু'কোণে একটু লালিমা, চোখের তারার তড়িত-ঝলক আর চোখের গভীরে কাজল-দীঘির নিবিড়তা। আঁখি-কোণের ওই লালিমা অবশ্য তারা যখন-তখন দেখে দেখে পাগল হয়। কিন্তু এই তিনের ট্রায়ো সব সময়ে বড় চোখে পড়ে না।

আব, এই দৃষ্টি-মাধুর্য দর্শন থেকেই হযত সকলে এবা মনে মনে উপলব্ধি কবেছিল, ভাটনগবেব কাছ থেকে স্বপ্না বোসকে ছাড়িযে আনাব চেষ্টা স্বপ্নেব মতই ব্যর্থ হবে। কাবণ মানুষটা তাব এই বিচিত্র আত্মসমর্পণেব ভেতব দিযেই এই নাবীব প্রসন্নতাব শতকবা সবটুকুই দখল কবে বসে আছে।

তবু কিন্তু চেষ্টাব কসুব হযনি।

চাযেব নেমন্তন্ন, সিনেমাব আমন্ত্রণ, পিকনিক পার্টিব আহ্বান—এমনি অনেক কিছুব সাদব এবং সাগ্রহ আকৃতি সলজ্জ বিব্রত মুখে একেব পব এক প্রত্যাখ্যাত কবেছে স্বপ্না বোস। খুব যে একটা জোবালো কাবণ দেখাতে পেবেছে এমন নয়। পাবেননি বলে বিব্রত হযেছে, লজ্জিত হযেছে আবো বেশি। নিরুপায হযে রূপ-বসিকেব দল যুগ্ম আহ্বান জানিযেছে ওদেব। ভাটনগব খুশিতে ডগমগ। পাবলে তক্ষুনি আমন্ত্রণ বক্ষা কবতে ছোটে। হাক-ডাক কবে স্বপ্না বোসকে ডেকে সুসংবাদ শোনায।

জবাবে আবাব সেই কটাক্ষ-বাণ। ভ্রূকুটি কবে স্বপ্না বোস শেষে এমন একটা কিছুব ওজব দেখায, যাতে কবে আমন্ত্রণকাবীদেব সামনেই ভাটনগবেব সকল উৎসাহে যেন ঠাণ্ডা জল পড়ে একপ্রস্থ। বলে, অমুক জাযগাব অ্যাপযেণ্টমেণ্ট ভুলে বসে আছ এবই মধ্যে?

বলে, মিস্টাব আব মিসেস অ্যাডভানিকে কি কথা দিলে যে সেদিন?

বলে, সেদিন আমাকে নিযে কোথায যাবে বলে নাকে খত দিযেছিলে?

অথবা কিছু না বলে একেবাবে হতাশাব দৃষ্টিতে শুধু চেযেই থাকে, যাব অর্থ —এমন লোককে নিযে তো আব পাবিনে।

ভাটনগবেব তাতেই পূর্ব কোন প্রতিশ্রুতি বা তেমনি কিছু একটা মনে পড়ে যায। মাথা চুলকে বিব্রত মুখে মাপ চায আমন্ত্রণকাবীদেব কাছে।

এই ক'বছবে সকলেই সখেদে উপলব্ধি কবেছে, বিউটি হাউসেব এই তিন ঘণ্টা ছাড়া স্বপ্না বোসেব মনেব অঙ্গিনায আব পলকেব ঠাঁই হবে না কাবো। কিন্তু স্বপ্না বোস যাদু জানে। এই তিন ঘণ্টাব সপ্রগলভ সান্নিধ্য-প্রাচুর্যেব মোহও ভক্তজনেবা কাটিযে উঠতে পাবে না শেষ পর্যন্ত। পাবতে চাযও না। কিন্তু এব পবে কোথায থাকে স্বপ্না বোস, কোন জগতে তাব গতিবিধি, তাব অবকাশকালেব কতটা দখল কবে আছে ভাটনগব—এসব প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসাব জবাব মেলেনি কিছু। মিলেছে এক টুকবো হাসি, এক লাইন কাব্য বা একটু কিছু হেযালি। শেষ পর্যন্ত ভাটনগবেব ভাগ্যেব ওপব ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছেড়ে কৌতূহলে ক্ষান্ত দিযেছে সকলেই।

বিউটি হাউসেব আব এক বিপবীত আকর্ষণ ভূতনাথবাবু।

ভূতেব যিনি নাথ তিনি আব যাই হোন, নিজে ভূত নন। কিন্তু এ ভূতনাথেব নামেব সার্থকতা ষোলকলায পূর্ণ। হলএব একটা কোণেব দিকে ছোট টেবিল পেতে বসে একমনে একেব পব এক ক্যাশমেমো কাটে। টাকা লেনদেনেব জন্য আলাদা ক্যাশ-কাউণ্টাব আছে। যে যাই কিনুক, সেলসম্যান অথবা সেলসগার্লকে মাল নিযে আগে ওব টেবিলে ফেলতে হবে। এই তিন ঘণ্টায মুখ তোলাব অবকাশ থাকে না বেচাবীব। তবু এবই মধ্যে ওকে নিযে প্রাযই একটু-আধটু হাস্য-কৌতুকেব প্রহসন ঘটে যায।

মানুষটাব চেহাবার মধ্যে যেন বেপবোয়া কারুকার্য চালিয়ে গেছেন বিধাতা। গাযেব রঙ আবলুস কাঠকে হার মানায। ছোট ছোট চোখ দু'টোয এতটুকু জীবনের সাড়া নেই— একেবাবে নিবাসক্ত, নিষ্প্রাণ। নাকটা হঠাৎ যেন সামনের দিকে তুবড়ে গেছে। পুরু ঠোঁট, প্রকাণ্ড মাথা আর মাথাবোঝাই অবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল। গাযের রঙে চুলের বঙে মিশে গেছে। চোখধাঁধানো বিউটি হাউসেব ঝকমকানি একাই যেন ব্যালান্স কবেছে ভূতনাথ। ভাটনগরের বসজ্ঞানেব তাবিফ কবে খদ্দেব বন্ধুবা। সেলসম্যান, সেলসগার্লরা একতবফাই হাসি-তামাসা করে ভূতনাথেব সঙ্গে। একতরফা কাবণ, ভূতনাথ কোন কথার জবাব দেয না, মুখ তুলে মড়া-চোখে তাকায একবাব, মাথা নিচু কবে মেমো কাটায মন দেয আবার।

ওব সঙ্গে স্বপ্না বোসেব অন্তবঙ্গতাটুকু সব থেকে বেশি উপভোগ্য। এ অন্তরঙ্গতাও একতবফাই। অর্থাৎ স্বপ্না বোসেব তবফ থেকে। ভূতনাথকে নিযে কেউ কিছু বললেই সে প্রতিবাদ জানায তৎক্ষণাৎ। বলে, বাহু ছাড়া চাঁদ মানায় না, ভূতনাথ ছাড়া বিউটি হাউস মানায না। মেমো লেখাতে গিযে হালকা চাপল্যে তার মাথাব ওই ঝাঁকড়া চুলেব মুঠি ধবে দুই-একবাব ঝাঁকুনি দেওযাটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িযে গেছে ওব।

কোন বসিক ভক্ত ঠাট্টা কবে।—এও যেন বাহুব সঙ্গে চাঁদেব মিতালি।

মুচকি হেসে স্বপ্না বোস জবাব দেয, একমাত্র বাহু ছাড়া চাঁদেব কাছে আব ঠাঁই কাব?

মাঝে মাঝে আবো বেশ খানিকটা গড়ায। এখানকাব সর্বজনজ্ঞাত একটা বড তামাসাব কথা হল যে, ভূতনাথবাবু নাকি স্বপ্না বোসেব প্রেমে পড়েছে। কাব মাথায় যে প্রথম এই বসিকতাটুকু এসেছিল, সে আব কাবো মনে নেই। কিন্তু কথাটা থেকে গেছে। কালোব সঙ্গে আলো মেশে না বলেই হযত এ ধবণেব বসিকতা জমে ভালো। ভাটনগবও সানন্দে যোগ দেয এসব হাসি-ঠাট্টায।

স্বপ্না বোস হযত বলে, মিথ্যে ওকে দোষ দেওযা কেন, আমিই ববং ওর প্রেমে পড়ে গেছি।

শোনামাত্র ভাটনগবকে সচেতন কবে দিতে চায কেউ, বলে, সাবধান ভাটনগবজী, ওই ভূত বাবাজীই কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন আপনাব ঘাড় থেকে—

মনোমত কথাটা আব হাতড়ে পায না।

স্বপ্না বোস আলতো কবে জুড়ে দেয, পেত্নী ছাড়াবে!

সমস্ববে হেসে ওঠে সকলে। ভাটনগব একবাব সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ কবে দূবে কর্মবত মূর্তিটিব দিকে। বলে, ভূতনাথ ইজ এ জ্যুযেল—এ ব্ল্যাক জ্যুযেল—বত্নেব প্রতি আব লোভ না থাকে কোন মেযের।

তবু মুখে যে যত হাসি-তামাশাই করুক, একমাত্র ভাটনগব ছাড়া স্বপ্না বোসকে যখন-তখন তবল হাস্যে ওই ভূতনাথেব গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে দেখে বা ঝাঁকড়া চুলের গোছায় বেপরোয়া চাঁপাকলি আঙুল চালাতে দেখে বুকের ভেতরটা চড়চড করে ওঠে অনেকেবই।

রাত ন'টা বেজে গেছে।

বিউটি হাউসের গেট বন্ধ। কর্মচারী-কর্মচরিণীরা বিদায় নিয়েছে। কোমর-উঁচু ঝকঝকে কাঠঘেরা গণ্ডীর মধ্যে মালিকের নির্দিষ্ট গদি-আঁটা-আসনে বসে গভীর মনোযোগে হিসেব দেখছে ভাটনগর।

হলএর অন্য প্রান্তে নিজের জায়গায় বসে সেদিনের বিক্রির মেমো ওলটাচ্ছে ভূতনাথ। মাঝে এক-আধবার চোখ যাচ্ছে তার বিপরীত কোণের দিকে, যেখানে ক্রেতা-অভ্যাগতদের জন্য সৌখীন সোফা-সেটি পাতা। কৌচের ওপর দেহ এলিয়ে দিয়েছে স্বপ্না বোস। শুধু এখন নয়, কাজের মধ্যেও আজ একাধিকবার নিবিষ্ট-চিত্ততায় ছেদ পড়েছে ভূতনাথবাবুর। ওই নারীমুখের হাস্যলাস্যের মাত্রাটা আজ বেড়েছিল, একটু একটু করে বেড়েই যাচ্ছে যেন। ছোট ছোট ঘরে নিবিবিলি সান্নিধ্যে আজ দু'বার দু'টো লোকের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছে বেশ খানিকক্ষণ ধরে, তাও লক্ষ্য করেছে। মেমো লেখা ছেড়ে ভূতনাথ মুখ তোলে না বড়। কিন্তু চোখ এড়ায় না কিছু, ভূতনাথবাবু সব দেখে।

কৌচের ওপর স্থাণুর মত পড়ে আছে স্বপ্না বোস। শ্রান্ত, ক্লান্ত। প্রায় নির্জীব যেন। ভালো লাগছে না— কিছুই ভালো লাগছে না। কান্নার মত একটা বিষাদের তরল স্রোত বইছে সর্বাঙ্গে। ভাবছে, কিছু ভাববে না, ভাবলেই তো ভাবনার বিভীষিকা বাড়ে। ভাবছেও না কিছু, তবু দুর্বোধ্য বোঝার মত কি যেন বুকে চেপে আছে।

অদ্ভুত নীরবতা বিউটি হাউসে। সবগুলো আলো জ্বলছে তেমনি। তেমনি ঝকঝক করছে শো-কেইসের দ্রব্যসম্ভার। কোথাও টু-শব্দটি নেই। শুধু তিন কোণে তিনটি প্রাণী। সামনের দরজা বন্ধ। পিছনের পথ দিয়ে বেরোয় তারা। প্রাসাদ-সৌধের পিছনদিকেও একাধিক নির্গমনের ব্যবস্থা আছে। সেদিক দিয়ে বেরুলে বাড়ির মধ্যেই দশ দিকে দশ পথ।

ঠং করে ঘড়িতে শব্দ হল একটা। সাড়ে ন'টা বাজল। কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্বপ্না বোস। অলস মন্থর গতিতে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো ভূতনাথবাবুর কাছে।

মুখ না তুলেই ভূতনাথ বলল, বোসো।

—হয়নি তোমার?

—হয়েছে। মেমো-বইয়ের ওপর পেপারওয়েট চাপা দিয়ে চোখে চোখ রাখল তার। তেমনি মড়া-চোখ, ভাবলেশহীন, নির্বিকার। সে চোখে এতটুকু আগ্রহ নেই।

সামনের চেয়ারে বসে পড়ল স্বপ্না বোস। বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ?

—কিছু না,—খুব ক্লান্ত?

—নাঃ, ভালো লাগছে না কিছু।

—লাগবে না তো!

—কেন? কণ্ঠস্বরে তিক্ততা প্রকাশ পায় আবার।

ভূতনাথ শান্ত কণ্ঠে বলল, এখন শুধু ভালো লাগছে না, আর কিছুদিন বাদে তিলে তিলে জ্বলতে হবে। জেনে-শুনে নিজে দুঃখ সৃষ্টি করলে দুঃখের শেষ কোথায়?

—থামো, থামো—! অস্ফুটকণ্ঠে প্রায় গর্জে ওঠে স্বপ্না বোস। চাপা কর্কশ স্বরে

বলে ওঠে, খুব সাহস দেখি যে?

—হ্যা-ল-লো। ডোণ্ট ফাইট মাই ডিযাব।

শশব্যস্তে চেযাব ছেড়ে দাঁড়িযে উঠল দু'জনেই। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, পাযেব শব্দ শোনা যায না। ভাটনগব কখন এসেছে দু'জনেব কেউ খেযাল কবেনি।

—সিট ডাউন, সিট ডাউন প্লীজ—।

বসল দু'জনেই।

এক মুহূর্ত ভেবে নিযে ভাটনগব একটা শূন্য চেযাবে এক পা তুলে দিযে ঝুঁকে দাঁড়িযে ডাকল, স্বপ্না?

—ইযেস স্যাব।

—তোমাকে কিছু বলবাব আছে।

—ইযেস স্যাব .

ভাটনগব তীক্ষ্ণ চোখে তাকে নিবীক্ষণ কবল আবাব একটু।—ইউ সিম টু ফবগেট ইওবসেলফ অপবকে ভোলানো আব নিজে ভোলা এক কথা নয. ডোণ্ট বিসিভ ইনডিভিজ্যুযাল অ্যাটেনশান অ্যাণ্ড ইনভাইট ট্রাবলস আণ্ডাবস্ট্যাণ্ড?

শুষ্ককণ্ঠে স্বপ্না বোস জবাব দিল, ইযেস স্যাব ।

—গুড নাইট।

পিছনেব দবজা দিযে বেবিযে যাচ্ছে ভাটনগব। আব হিংস্র শ্বাপদেব মত জ্বলে উঠেছে স্বপ্না বোসেব দুই চোখ। সে অদৃশ্য হবাব পবেও সেই দিকে চেযে নিঃশব্দে আগুন ছড়ালো আবো খানিকক্ষণ।

পবে মাথা বাখল ভূতনাথেব টেবিলেব ওপবেই।

চেযাব ছেড়ে ভূতনাথ উঠে দাডাল। এক দিকেব কাঁচেব আলমাবি খুলে একটা আবকেব শিশি বাব কবল। ড্রপাবে কবে সাদা জলেব মত আবক তুলে নিল কযেক ফোঁটা। কাছে এসে বলল, ওঠো বাত হযেছে, এব পবে তো আবো কতক্ষণ লাগবে ঠিক নেই।

স্বপ্না বোস মাথা তুলল। কিছুটা সংযত, কিছুটা শান্ত। নিজেই দু'হাতেব আঙুলে কবে একটা চোখেব ওপব নিচ টেনে ধবে আলোব দিকে মুখ ফেবালো। ভূতনাথ ড্রপ ফেলল চোখে। একে একে দুই চোখেই।

নীববে উঠে গেল স্বপ্না বোস। এক কোণেব আডাল থেকে একটা পেটমোটা ভাবী চামডাব হ্যাতব্যাগ তুলে নিযে পাশেব দবজা দিযে নিষ্ক্রান্ত হযে গেল।

ভূতনাথ বসে আছে।— নীবব, নিস্পন্দ। যেন ঘুমিযে আছে। কোন তাড়া নেই। কোন চাঞ্চল্য নেই। সময কেটে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে ওই ব্যাগ হাতে নিযেই আবাব দেখা দিল যে নাবী, তাকে চিনবে না বিউটি হাউসেব অতি পবিচিত কোন খদ্দেবও।

ঘডিব দিকে তাকালো ভূতনাথ। এক ঘণ্টা পাব হযে গেছে। হবাব কথা। বোজ ঘণ্টাতিনেক লাগে যে প্রসাধন সম্পূর্ণ হতে, সেটা তুলতে কম কবে এক ঘণ্টা তো লাগবেই। এমনিতে ওঠে না, ওই হাতব্যাগে আছে নানা বকম বাসাযনিক নির্যাস— সেটা যথাস্থানে বেখে ভূতনাথেব মুখোমুখি বসল আবাব।

সদ্যস্নাতা। আটপৌরে বেশবাস। সর্বাঙ্গের চাঁপাহলুদ পেলবতা ধুয়ে-মুছে গেছে। শ্যামাঙ্গী। কুৎসিত। চোখের ড্রপে নেত্র-কোণের সেই মন-মাতানো লালিমার আভা কেটে গেছে। দাঁতের নিখুঁত প্লাস্টার-পালিশ উঠেছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে অধর-কোণের কামনা জাগানো তিলটাও।

অবসন্ন, বিষাদক্লিষ্ট দুই চোখ মেলে স্বপ্না বোস তাকালো ভূতনাথের দিকে।

ভূতনাথও তাকেই দেখছিল।

তার সেই মড়া-চোখের দৃষ্টি যেন বদলে যাচ্ছে একটু একটু করে। নিস্পৃহতার আবরণটুকুও সরে যাচ্ছে। কোমলতার আভাস আসছে যেন। চেয়েই আছে ভূতনাথ।

ভাবী সহজ লাগছে তার বিধাতার গড়া ওই নারীমূর্তি।

কুৎসিতের মধ্যেও কোথায় যেন সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে সে।

বিবেচনা সাপেক্ষ

পড়া শেষ হতে সকলেই ওরা চুপচাপ বসে রইল খানিক। শ্রোতাদের মধ্যে দুজন বেশ নামী সাহিত্যিক। বাদবাকি সকলে মোটামুটি নামী। গল্পটা নিয়ে মনে মনে সকলেরই একটু বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে ভেবে আমি মনে মনে খুশি।

বেশ খানিকটা সময় নিয়ে নামী দুজনের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, তা তোমার ইচ্ছেটা কি, নতুন লেখকের এই গল্প ছাপতে চাও?

আমি মাথা নাড়লাম, সেই রকমই ইচ্ছে বটে।

একটু ভেবে তিনি মন্তব্যসহ আবার প্রশ্ন করলেন, মাথা খাটিয়ে মোটামুটি মন্দ দাড় করায়নি, কিন্তু তোমার অতবড় কাগজে ছাপার মত স্পার্ক কিছু দেখছ কি?

আমি সায় দিলুম, খুব অবাক করার বা মুগ্ধ করার মত কিছু দেখছি না বটে। নতুন লেখকের গল্প নিয়ে সঠিক আলোচনা এরপর গড়গড়িয়ে বিস্তৃত হতে থাকল।

মোটামুটি নামীদের একজন বলল, লেখকের ভাষা বেশ সহজ তর-তরে সেটা ঠিক, এ-জন্যেই আপনার ভালো লেগেছে বোধহয়। কিন্তু গল্পটাতে ভাবের চাপা বাঁধুনি কম, তাছাড়া ঠিক ছোট গল্পের ছকে এটাকে ফেলা যায় না—অনেকটা রিপোর্টিংয়ের মত লাগছে।

প্রতিবাদের সুরে আর একজন সমর্থনই করল তাকে। বলল, নতুন লেখকের কাছে তুমি তার বেশি আশা করো কি করে?

হাসিমুখে তৃতীয় তরুণ শ্রোতা গল্পটার বুকে অনায়াসে একটা ধারালো ছুরি চালিয়ে দেবার মত করে মন্তব্য করল, কিন্তু আগাগোড়াই উদ্দেশ্যমূলক প্রোপাগ্যাণ্ডা ধরনের না? গল্পের রসের উপর দিয়ে উদ্দেশ্যটা এ রকম সাদাসাপটাভাবে উঁচিয়ে উঠবে কেন?

আসরের দু'নম্বর নামী সাহিত্যিক মুখ খুললেন এবারে, মাথা নেড়ে বললেন, সেদিক থেকে গল্পটা তো মার খেয়েইছে, তা ছাড়াও অনেক জায়গায় একটু আনরিয়েল

হয়েছে। কোর্টে দাঁড়িয়ে প্রৌঢ়া বিভাবতীর জবাব আর বিচারকের চাপা উচ্ছ্বাসের দিকটাই ভাবো না—অবাস্তব মনে হয় না?

আমি দ্বিধান্বিত মুখে জবাব দিলাম, কিন্তু লেখক তো বলছে গল্পটা সত্যি ঘটনার ছায়া নিয়ে লেখা।

মোটামুটি নামীদের একজন সপ্রতিভ মুখে বলে উঠল, সত্যের থেকে ছায়াটা যে একটু বেশিই বড় হয়ে গেছে।

সকলে হাসল একপ্রস্থ।

একনম্বর নামী লেখক এবারে দু'নম্বর নামী লেখকের সমালোচনার ওপর মন্তব্য চাপালেন।—আনবিয়েলই যদি বলো তো সব থেকে বেশি অস্বাভাবিক ব্যাপার মেয়ে-বিয়ের বাতে মহিলাটির তাঁর স্বামীকে ও-ভাবে মোটরে চাপিয়ে ব্যাঙ্গেলে চালান করা। ওরকম ভ্যাবলাকান্ত স্বামী গল্প-উপন্যাসেই যা দু'চারটে দেখা যায়।

মোটামুটিদের একজন সোৎসাহে ঘাড় নাড়ল বারকয়েক—আমি ঠিক এই পয়েন্টটাই বলতে যাচ্ছিলাম দাদা. বিভাবতীকে সধবা রাখার দরকার কি? বিধবা করে দিলেই তো ওদিকের প্রবলেম মিটে যায়।

গল্পের সধবাকে কলমের খোঁচায় অনায়াসে বিধবা করে দেওয়া যেতে পারে, আর তাতে মেয়ে-বিয়ের বাতে ভ্যাবলাকান্ত স্বামীকে হারানোর সমস্যাও মেটে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। গল্পের মুখ রক্ষার খাতিরে এটুকু সংস্কার গর্হিত কেউ বলবে না। গল্প লিখতে বসে নিজেই কত সময় কুমারী মেয়েকেই বিধবা করেছি আর বিধবাকে শেষ পর্যন্ত কুমারী করে দিয়েছি ঠিক নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে চুপ করেই রইলাম।

নতুন লেখকের গল্পের প্রৌঢ়া নায়িকা বিভাবতীর নাটকীয় আচরণ, জাঁদরেলপনা, কথাবার্তা, অন্ধ বিশ্বাস ইত্যাদির অবাস্তবতা নিয়ে অনেকভাবে খুঁত-খুঁত করার পরে সাহিত্যিকরা আসর ভঙ্গ করল এক সময়। নামী সাহিত্যিক দুজন পরামর্শ দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকের ওপর সুনজর যখন পড়েছে, তোমার কলম চালিয়ে ঠিকঠাক করে নাও—এ-রকম তো কতই করেছ।

আমি বললাম, দেখা যাক, ছাপতেই হবে এমন কথা নেই—তবে তোমরাও আর একটু ভেবো তো।

তাঁরা চলে যাবার পর নিজেই আবার কেন যে নতুন করে ভাবতে বসলাম, জানি না।

সাদাসিধেভাবে বললে গল্পটা এই রকম দাঁড়ায়ঃ

বিভাবতী একজন জাঁদরেল মহিলা। বয়স পঞ্চাশের কিছু ওপরে। বয়সকালে চেহারা বেশ ভালো ছিল বোঝা যায়। এখনো দিব্বি শক্ত-সমর্থ, মজবুত স্বাস্থ্য। বে-সরকারী স্কুলের হেডমাস্টারের বউ। হেডমাস্টার বলতে নব্যযুগের হেডমাস্টার নন শৈলেশ চাটুজ্জে, নব্যযুগে পা দিয়ে টাকার মুখ দেখতে না দেখতে চাকরির মেয়াদ ফুরিয়েছে। মাস পাঁচেক হলো চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। অন্য মাস্টাররা পাঁচ জায়গায় ছেলে পড়িয়ে তাঁর থেকে বেশি রোজগার করত, কিন্তু হেডমাস্টারের পদমর্যাদা

লাভ করে তিনি তাও পাবতেন না। এখন অবশ্য সে বাধা নেই, কিন্তু স্বাস্থ্যটাই বাধা। হার্টের ব্যারাম, একটু পরিশ্রম করলেই বুক ধড়ফড় করে। বিভাবতী তা করতে দেন না। ধরা-করা করলে চাকরির মেয়াদ আরো একটা বছর বাড়ানো যেত হয়ত, কিন্তু স্ত্রীর আপত্তির দরুন সে-চেষ্টা করেন নি।

এ-বাড়িতে এই স্ত্রীটির আপত্তি আর মতামত একটা বিশেষ ব্যাপার। ছেলে মেয়েরা আড়ালে মন্তব্য করে, হেডমাস্টারি আসলে চিরকাল তাদের মা-ই করে আসছে।

অতিশয়োক্তি নয়। বাড়ির কর্তা থেকে শুরু করে সকলেই কর্ত্রীর দাপটে তটস্থ। সংসারের কোনো ব্যাপারে অপোজিশন বলে কিছু নেই—সেখানে বিভাবতীই সব।

তিন মেয়ে এক ছেলে। মেয়েরা বড়, ছেলে এ বছরই হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে বি. এ-তে ভর্তি হয়েছে। বড় মেয়ে দুটো স্কুল ফাইন্যাল পাস করে বসে ছিল। চেহারা তাদের মোটামুটি সুশ্রী। নাম রমা আর শ্যামা। গত দেড় বছরের মধ্যে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। খুব সামান্য ভাবেই হয়েছে। তবু ঘরে সোনাদানা যা একটু ছিল, আর সামান্য সঞ্চয় যা ছিল, সব নিঃশেষে বেরিয়ে গেছে। তাতেও কুলোয় নি, প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফণ্ডের তহবিল কিছুটা হালকা করতে হয়েছে। তবু স্ত্রী-টি কড়া-ক্রান্তি হিসেব করে চলেন বলেই দেড় বছরের মধ্যে দুটো মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, শৈলেশ চাটুজ্জে সেটা একবাক্যে স্বীকার করেন। দ্বিতীয় মেয়ের বিয়েতে খরচের কথা ভেবে গায়ে জ্বর এসেছিল তাঁর, কিন্তু স্ত্রীর ধমক খেয়ে সে জ্বর ছেড়েছে আর বিয়েও নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে।

বড় মেয়ে রমার বিয়ে দিয়েছেন ব্যাণ্ডেলে এক স্কুল মাস্টারের কাছে। ওই মেয়ের সংসারে আরো কয়েকটি পোষ্য আছে। তাই সদা অনটন। সে তুলনায় বর্ধমানে মেজ মেয়ে শ্যামার একটু ভালো বিয়ে হয়েছে। নিজেদের পৈতৃক ঘর-বাড়ি ওই জামাইয়ের, তার ওপর ছেলেটা মোক্তারি করে মন্দ পয়সা পায় না। বড় মেয়ে অনটনের মধ্যে আছে বলে মনে মনে বিভাবতীর তার ওপরেই টান বেশি একটু। যে কোন ছল-ছুতোয় তাকে একটু সাহায্য করতে পারলে খুশি হন।

তৃতীয় মেয়ে শম্পা আগামী বছরে বি. এ. পরীক্ষা দেবে। এই মেয়েটার ভালোয় ভালোয় একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে দায় চোকে ভাবেন বিভাবতী। ছেলে করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, করে বিয়ে করবে, সে ভাবনা ভাবেন না তিনি। ভিতরে ভিতরে চিন্তা তাঁর এই মেয়েটাকে নিয়েই— শম্পাকে নিয়ে।

তার প্রথম কারণ, তিন মেয়ের মধ্যে শম্পাই রীতিমত সুন্দরী। যেমন ফর্সা, তেমনি লম্বা-টম্বা—স্বাস্থ্যও সব বোনের থেকে ওরই ভালো। এই মেয়ে কলেজে যায় সেটাই তাঁর মনঃপূত নয় খুব। কিন্তু ঘরে বসিয়ে রেখেই বা কি করবেন। হায়ার সেকেণ্ডারি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করার ফলে আর সেই সঙ্গে মেয়ের ক'দিন কান্নাকাটির ফলে কলেজে পড়ার অনুমতি দিতে হয়েছে। পার্ট ওয়ানও ভালোই পাস করেছে, সামনের বার পার্ট টু দেবে। বিভাবতীর ধারণা— তাঁদের যা সঙ্গতি, মেয়ে বি. এ. পাস করলে তার বিয়ে দেওয়া আরো শক্ত হবে।

দুশ্চিন্তার দ্বিতীয় কারণ, মেয়েটার স্বভাব। অন্য দু'বোনের মত একটুও নয়। হেসেখেলে ধিঙ্গিপনা করে বেড়াতে ভালো লাগে, পরিপাটি করে সাজতে-গুজতে ভালবাসে, মুখে কথার খই ফোটে, সিনেমা দেখার নামে জিভে জল আসে। বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে মায়ের কাছে শম্পা যত দাবড়ানি খায় তেমন আর কেউ নয়। একটু বে-চাল দেখলে ওর চুলের গোছা টেনে ধরার জন্য এখনো মায়ের হাত নিশপিশ করে। আর ওর দিকে তাকালেই যেন বে-চাল দেখেন তিনি। মাকে যমের মত ভয় করে অবশ্য, কিন্তু চুপিচুপি মায়ের অমতের কাজও দুই-একটা শুধু ও-ই করে বসে। এত সাহস আর কারো নেই। এই সেদিনও ফিরতে দেরী হবে বলে কলেজ থেকে কোন দুই বান্ধবীর সঙ্গে চুপি চুপি সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরেছিল। ছটা বেজে যেতেই মায়ের মনে ঠিক খটকা লেগেছে, ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ধরেছেন,—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ঘাবড়ে গিয়ে মেয়ে অবশ্য সত্য কথাই বলেছিল। মুখের দিকে চেয়ে সরাসরি মিথ্যে বলবে এত সাহস নেই। অতবড় মেয়েকে বিভাবতী পাখার বাঁট দিয়ে শুধু ঠেঙাতে বাকি রেখেছিল। মেয়ে কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে ধরে তবে রেহাই পেয়েছে। তবু না বলে সিনেমা যাবার সাহস হল কি করে তাই ভেবেই তাজ্জব বিভাবতী।

এই মেয়েটার জন্য এমনি নানা কারণে সব থেকে বেশি দুশ্চিন্তা তাঁর। মায়ের মেজাজ ভালো থাকলে শম্পা নিজেই কত সময় শোনায়, মায়ের সদাই সৎমায়ের মত ব্যবহার তার সঙ্গে। সে যেন নিজের মেয়ে নয়। খুব মিথ্যে বলে না। বাড়ির খাটাখাটনি সব থেকে বেশি তাকেই করতে হবে—দিদিদের বিয়ের আগেও এই পক্ষপাতিত্ব ছিল। পুজোর সময় এখনো সব মেয়েদের শাড়ি দেওয়া হয়। সব থেকে ভালো শাড়ি আর জামা বড় দুই মেয়ের কাছে যাবে—ছোট মেয়ের একটা হলেই হল।

আর সেই সাদামাটা শাড়ি পরে শম্পা যখন বেরোয় আর কলেজে যায়, সে দিকে চেয়ে বিভাবতীর বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে কেমন—ওর শাড়ি জামা সব থেকে সুন্দর ঠেকে তার চোখে। ভাবেন আরো সাদাসিধে কিছু আনলেই যেন ভালো হত।

তিন মেয়ে এক ছেলে, কিন্তু ছেলের দলে আর একজনকেও ফেলা যায়। তিনি বাড়ির কর্তা শৈলেশ চাটুজ্জে। বিয়ে করে বিভাবতীকে ঘরে এনেছেন পঁচিশ বছর বয়সে। বড় জোর গোড়ায় পাঁচটা বছর বাদ দিলে তিরিশ থেকে আটান্ন—এই আটাশ বছর একটানা স্ত্রীর শাসনে প্রতিপালিত হয়েছেন তিনি। সেই শাসনও প্রয়োজনে কঠিন আর প্রয়োজনে কোমল। বয়স যত বেড়েছে ভদ্রলোক ততো বেশি স্ত্রীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। ফলে স্ত্রীটিও তাঁকে বয়স্ক ছেলের মতই নেড়েচেড়ে লালনপালন করে এই বয়স পর্যন্ত টেনে তুলেছেন। স্বামীর হার্টের রোগ আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে তো স্ত্রীর নির্দেশে তাঁর জোরে কথা বলাও বন্ধ। তাঁর খাওয়া-দাওয়া ওঠা-বসা চলাফেরা সবই বিভাবতীর হিসেবমত সম্পন্ন হয়ে থাকে।

পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে ছিলেন বিভাবতী। তাঁর বাপের সংসার সেদিনে অসচ্ছল ছিল না। আর পড়েছিলেনও সচ্ছল ঘরেই। স্বামী বিদ্বান, বাড়িতে বিদ্বান শ্বশুর বিদ্যমান।

সদাগরী অফিসে ভালো চাকরি করতেন বউ তাঁর চোখের মণি ছিল। কি যে আনন্দে কেটেছে সেই দিন, ভাবলেও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে বিভাবতীর। সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। পান্তা খেতেও নুনে কুলোয় না এখন এমন অবস্থা। সামাজিকতা নেই, আদর আপ্যায়ন নেই, বাড়িতে দুটো অতিথি এলে চক্ষু স্থির হয় সকলের। শ্বশুর খেতে ভালবাসতেন, খাওয়াতে ভালবাসতেন। আর কোন বিলাসিতা ছিল না তাঁর। কেবল আনো আর পরিতৃপ্তি করে খাও সকলে। সেই সস্তাগণ্ডার বাজারে বাড়িতে যেন নিত্য নেমন্তন্ন লেগেছিল।

আর তাঁরই দু'দুটো নাতনীর কি ভাবে বিয়ে হল। মনে পড়লে রাগে দুঃখে চোখে জলই আসে বিভাবতীর। দু'বারই সরকারী বিধিনিষেধের দোহাই দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছেন। বরযাত্রীদের শুধু আদরযত্ন করে খাওয়ানো হয়েছে, অন্য সকলের বরাতে জলযোগ। অথচ আশীর্বাদী হাতে করে জ্ঞাতি কুটুম্বরা সব এসেছে, মনের কথা চেপে মুখে বলেছে, বেশ ব্যবস্থা হয়েছে—যে দিনকাল পড়েছে। সকলের হাতে হাতে উপহারের বাক্স বা প্যাকেট দেখে লজ্জায় বিয়েবাড়ি ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করেছে বিভাবতীর। মনে হয়েছে নেমন্তন্ন করে এনে খেতে না দিয়ে তিনি যেন ভিক্ষে নেবার ব্যবস্থা করেছেন। শ্যামার বিয়ের সময় এক ঠোঁট-কাটা আত্মীয় তো বলেই বসল, আইনও রয়েছে আবার যার ইচ্ছে সে এরই মধ্যে দিব্যি খাইয়েও যাচ্ছে।

লজ্জায় মাথাই কাটা গিয়েছিল বিভাবতীর। আর চোখ ঠেলে বার বার জল আসছিল। কার নাতনীর বিয়েতে কি কথা শুনতে হল। অথচ রাগই বা করেন কি করে, মিথ্যে তো বলেনি। গত এক বছরের মধ্যে বিভাবতী কম করে দু'তিনটে নেমন্তন্নে গেছেন, না খেয়ে তো ফিরতে হয় নি। কিন্তু কি করবেন, যেমন বরাত। শ্বশুর বেঁচে নেই রক্ষে। থাকলে হয়ত এই অপমানে প্রাণান্ত হত।

দিনকয়েকের জন্য বিভাবতী গেছলেন বড় মেয়ের বাড়ি—ব্যাঙ্গেলে। যাবার জন্য মেয়েটা কতবার যে লিখেছে ঠিক নেই। প্রথম ছেলে হবার পর থেকেই অসুখে ভুগছে —দিনে দিনে হাড়সার হচ্ছে। মাস ছয় হল নাতির বয়স, ওটারও বিকেট না কি হয়েছে। যেমন বরাত।— অবস্থা না হয় খারাপই হল, স্বাস্থ্যটাস্থ্যগুলোও তো একটু ভালো থাকতে পারে।

বিভাবতীকে বড় মেয়ের কাছে যেতে হয়েছে দিনকয়েকের জন্য। যাবার আগে শম্পাকে বাড়ির ব্যবস্থা শুধু বুঝিয়ে দেন নি—তাকে সকাল থেকে রাতের যাবতীয় কর্তব্য একের পর এক লিখে নিতে হয়েছে। আর যাওয়ার আগে পর্যন্ত বাড়ির কর্তাটিকেও ওষুধ-পথ্যের ব্যাপারে পাখী-পড়া করে বুঝিয়েছেন। তারপর ছেলেকে নিয়ে দুর্গা দুর্গা করে রওনা হয়েছেন। ছেলের কলেজ, সে সেদিনেই বিকেলে আবার ফিরে এসেছে।

কিন্তু বিভাবতী চার দিনের বেশি ব্যাঙ্গেলে থাকতে পারলেন না। মেয়ের শরীর একটুও ভালো না, তার ওপর ছ'মাসের রোগে নাতিটা সারাক্ষণ কাঁদে—তাঁর থাকা দরকার ঠিকই, কিন্তু চার দিনেই হাঁফ ধরে গেল বিভাবতীর, মনে হল যেন চার সপ্তাহ

কেটে গেছে। মেয়ে-নাতি অসুস্থ, কিন্তু ঘর-সংসার ফেলে কতদিন তিনি মেয়ের বাড়িতে বসে থাকতে পারেন? ওদিকে কি হচ্ছে ভেবে সারাক্ষণই ভিতরটা উতলা তাঁর। ওখানেও তো হার্টের রোগী ফেলে এসেছেন একজন, সময়মত ওষুধ খাচ্ছে কিনা, পথ্য ঠিকমত পাচ্ছে কিনা কে জানে। যে দায়িত্বজ্ঞান আর এক মেয়ের। তাছাড়া সকাল সাড়ে নটা না বাজতে ওর কলেজে ছোটা আছে, শ্যামলেরও কলেজ আছে, খেলা আছে। কে কাকে দেখে।

চার দিনের দিন মেয়ের চেনা-জানা কলকাতার সঙ্গী পেয়ে তিনিও ঘোষণা করলেন, আর না, এবারে যাবেন। ছুটি হলেই শ্যামলকে পাঠিয়ে দেবেন, নিজেও ফুরসত পেলে আবার আসবেন—এখান থেকে এখানে, অসুবিধে কিছু নেই। একটানা আর থাকা সম্ভব নয়, ওখানে হয়ত সব অচল হয়ে আছে।

চলনদারকেও অসুবিধেয় ফেললেন না তিনি। হাওড়া স্টেশনে নেমে নির্দিষ্ট বাসে উঠে বসে তাকে বিদায় দিলেন। এ তো আর ব্যাণ্ডেল নয় যে পথ-ঘাটের হদিস পাবেন না তিনি। কোথায় নামতে হবে জানাই আছে। আর কলকাতার রাস্তায় চলাফেরা করেও অভ্যেস আছে, এক মাছ-তরকারির বাজার ছাড়া সব কেনা-কাটাই তো নিজের হাতে করেন।

শম্পা বাড়ি ছিল না। কলেজ থেকে ফিরেই বেরিয়েছিল কোথায়। ফিরল সন্ধ্যার একটু আগে। বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের সঙ্গে অর্থাৎ শ্যামলের সঙ্গে দেখা। ছোড়দির সাড়া পেয়েই ও হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে গলা খাটো করে বলল, এতক্ষণ ছিলি কোথায়? মা চলে এসেছে—আর এসে পর্যন্ত কি কাণ্ড, কাছে যেতে ভয় করছে। প্রথমেই বাবাকে খামোকা যাচ্ছেতাই বকাবকি করে নিল খানিকক্ষণ, তারপর আমাকে, আর একটু আগে ঝি-টাকে—

শোনামাত্র শম্পার খুশি মুখ থেকে প্রাণটুকুও যেন উড়ে গেল। সত্রাসে ভাইয়ের দিকে চেয়ে রইল খানিক, বলল, এত তাড়াতাড়ি তো ফেরার কথা ছিল না..

শ্যামল বলল, সেই জন্যেই তো আমিও হাঁ, তোকে বলে চুপি চুপি আজ একটা ছুটার শো মারব ভেবেছিলাম—ভাগ্যিস যাই নি।

ভয়ে ভয়ে শম্পা জিজ্ঞেস করল, আমার কথা কিছু বলেছে?

না, তুই বাড়ি নেই—রাগের মাথায় এখনো খেয়ালই করে নি হয়তো। ব্যাণ্ডেলেই কিছু একটা হয়েছে বোধ হয়, বড়দির অসুখটাই বেড়ে গেল কিনা বুঝছি না।

শম্পা বলল, অসুখ বেড়ে থাকলে মা চলে আসবে কেন?

শ্যামল বলল, তাই তো—তবু সেখানেই নির্ঘাৎ কিছু হয়েছে, নইলে ফিরেই এই মূর্তি কেন? মা এখন বাবার ঘরে, তুই চুপি চুপি ঘরে গিয়ে ওই স্টাইলের শাড়ি পরা বদলে ঠিকঠাক হয়ে নে তো যা—

পাংশু মুখে পা টিপে শম্পা বাবা-দা ধরে এগলো। এক সারিতে ছোট বড় তিনখানা ঘর। প্রথম খুপরি ঘরটা শ্যামলের, বোনেদের বিয়ে হবার পর দ্বিতীয় ঘরটাতে এখন শম্পা একাই থাকে। ঘরের আলো নেবানো। তার পরের ঘরটা বাবা-মায়ের—সে ঘরে আলো জ্বলছে।

নিজেব ঘবেব দোবগোডায এসে শম্পা দাঁডাল একটু, তাবপব সামনেব দিকে ঝুঁকে শুনতে চেষ্টা কবল, বাপ-মাযেব ঘবেব কোন কথা কানে আসে কিনা।

পবেব মুহূর্তে যা ঘটে গেল, অস্ফুট আর্তনাদ কবে উঠল শম্পা। আচমকা চুলেব মুঠি ধবে হ্যাঁচকা টানে কে তাকে তাব অন্ধকাব ঘবেব মধ্যে এনে ফেলল। হুমডি খেযে পডেই যাচ্ছিল, কোন বকমে টাল সামলে আবাব আর্তনাদ কবে ওঠাব উপক্রম।

চুপ!

মাযেব চাপা গর্জন। সঙ্গে সঙ্গে দবজা বন্ধ কবাব শব্দ। তাবপব ঘবেব আলো জ্বলে উঠল।

সামনে মা দাঁডিযে। দু'চোখ ধকধক কবে জ্বলছে। বি, এ, পডা মেযেকে চুলেব মুঠি ধবে এভাবে ধবে টেনে আনা কিছুই নয, মাযেব এ-মূর্তি দেখে শম্পা থবথব কবে কেঁপে উঠল।

বিভাবতী দেখছেন মেযেকে, ওব পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখেব আগুনে ঝলসে দিচ্ছেন। সমস্ত মুখ লাল, ক্রুদ্ধ উত্তেজনায হাপাচ্ছেন অল্প অল্প।

ওই ছেলেটা কে?

হিসহিস শব্দটা যেন এক ঝলক গলানো শিসেব মতো কানে ঢুকল শম্পাব। মাথাটা ঘুবে গেছে, চোখে লাল নীল সবুজ হলদে দেখছে।

তোকে আজ খুন কবে ফেলব! বেস্টুবেস্টে বসে কাব সঙ্গে ঢলাঢলি কবছিলি আব গিলছিলি?

মা! ত্রাসে মাযেব হাত কিংবা পা ধবাব জন্য এগিযে আসছিল শম্পা।

আবাব এক ধাক্কা খেযে তিন হাত দূবে ছিটকে মাটিতে বসে পডল। বিভাবতী সঙ্গে সঙ্গে এগিযে এসে চুলেব মুঠি ধবেই তাকে হিডহিড কবে টেনে তুলে ধাক্কা দিযে চৌকিতে বসিযে দিলেন—তোকে আমি মেবেই ফেলব আজ, বঁটি দিযে কাটব, শিক পুঁডিযে তোব পিঠে ছ্যাঁকা দেব—বল শিগগীব ছেলেটা কে?

মা! বলছি মা, তুমি একটু স্থিব হযে বোসো, তোমাব পাযে পডি মা—

খববদাব! তুই আমাকে মা ডাকবি না। তিন দিনেব জন্য গেছি, তাব মধ্যে এই চবিত্র তোব? গলায দডি জোটে না—কাল আমিই তোকে দডি এনে দেব—ভালো চাস তো কে ছেলেটা আগে বল শিগগীব।

ফুপিযে কাঁদতে কাঁদতে শম্পা বলল, ওই তিনতলা লাল বাডিব—

জনালা দিযে বাইবেব দিকে তাকিযে বুঝতে চেষ্টা কবলেন কোন তিনতলা লাল বাডিব!—ওই সামনেব বাস্তাব মুখেব লাল বাডিব?

শম্পা কাঁপতে কাঁপতে মাথা নাডল—তাই।

ঠিক এই জাযগায বাইবে শৈলেশ চাটুজ্জেব কোমল ডাক ভেসে এলো।

এ ঘবেব দবজা বন্ধ কেন? শম্পা, তোব মা কোথায বে, আমাকে ওষুধ দেবে না?

যাচ্ছি! জানালাব দিকে চেযে তপ্ত একটা ঝাপটা মাবলেন বিভাবতী, তাবপব মেযেব দিকে ফিবে দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, বসে থাক, এখান থেকে নডবি তো আস্ত বাখব না।

দবজা খুলে বেবিয়ে গেলেন।

আতঙ্কিত শম্পা ধবেই নিয়েছে বাবাকে ওষুধ খাইয়েই মা এক্ষুনি ফিববে। কিন্তু তিনি ফিবলেন না। বাতে খাবাব সময হলো, তখন পর্যন্ত না। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে তাঁকে, থমথমে মুখ। একবাব দবজায দাঁড়িযে ডাকলেন, খেতে আয।

ভযে ত্রাসে মুখ-হাত পর্যন্ত ধোযা হয নি তখনো। বসেছিল আব প্রমাদ গুনছিল। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি কাপড বদলে এসে খেতে বসল। যে যাব নিঃশব্দে খেযে উঠল। ছোডদিব মুখ দেখে শ্যামল বুঝে নিয়েছে সঙ্কটজনকই কিছু ঘটেছে। মা মাঝে মাঝে ছোডদিব দিকে যেভাবে চোখ বুলোচ্ছে তাতে তাবই ভয ধবে গেছে। আব ছোডদিটা যেন বেঁচে নেই, কলেব পুতুলেব মতো হাত নডছে আব এক-একবাব মুখে উঠছে।

খাওযাব পাট চুকল।

সব গোছগাছ কবে নিজেব ভাত বেডে ঢাকা দিযে বেখে বিভাবতী হাত ধুযে বান্নাঘব থেকে বেবিযে এলেন। কি জন্যে যে ঠাকুব তাঁকে এই দৃশ্য দেখালেন কে জানে। নইলে আজ তো তাব ব্যাণ্ডেল থেকে আসাবই কথা না।...মোডেব মাথায যেখানে বিভাবতীব বাস থেকে নামাব কথা, তাব খানিক আগেই নেমে পডতে হযেছিল। সামনে একগাদা গাডি আটকে গেছে, তাই নেমে পডেছিলেন। গবমে সেদ্ধ হওযাব থেকে এই দু'মিনিট হাঁটা ভালো।

নেমে ওধাবেব ফুটপাথ ঘেষে আসছিলেন তিনি। ওখানে একটাই হালফ্যাশনেব নামী বেস্তবাঁ আছে। ঘাড ফেবাতেই হতভম্ব কযেক মুহূর্ত। কোণেব দিকে দুটো চেযাবে মুখোমুখি বসে খাচ্ছে শম্পা আব কে একটা ছেলে। দু'জনে দু'জনেব দিকে ঝুঁকে কথা কইছে, এত নিবিষ্ট যে কোনদিকে চোখ নেই কাবো।

ছেলেটাব চেহাবাপত্র ভালো, আব জামাকাপডও ফিটফাট। বিভাবতীব মাথায তখন দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠেছে—কলকাতাব পথেঘাটে অমন ভালো চেহাবা ফিটফাট হাড-পাজী ছোকবা তিনি অনেক দেখেছেন।

কিন্তু স্বামীকে ওষুধ খাইযেই তক্ষুনি আবাব ফিবে এসে মেযেব ওপব চডাও হন নি তাব প্রথম কাবণ, মেযেটা আবো ভয পাবাব অবকাশ পাক, দ্বিতীয কাবণ, তিনি কিছু ভাবছেন আব কিছু মনে কবতে চেষ্টা কবছেন।

নিঃশব্দে মেযেব ঘবে ঢুকে আবাব দবজা বন্ধ কবলেন তিনি। মেযেব ফর্সা মুখ কাগজপানা হযে আছে দেখলেন। কাছে আসতেই শম্পা কাপতে কাঁপতে উঠে দাঁডাতে চেষ্টা কবল।

বোস।

দাবডানি খেযে বসে পডল আবাব। তিনি দাঁডিযে বইলেন।—ওই লাল বাডিব ছেলে মানে গাঙ্গুলি জজেব বাডিব ছেলে?

গাঙ্গুলি জজ বিশ বছব আগে পেনশন নিযেছেন। পাডায তাঁদেব নামডাক প্রতিপত্তি মন্দ নয।

শম্পা ঘাড গোঁজ কবে সামান্য মাথা নাডল।

গাঙ্গুলি জজেব কে হয?

ছেলে। শম্পাব গলা দিযে শব্দ বেবোয না প্রায।

কোন ছেলে?

ছোট।

পডাশুনা কতদূব কবেছে?

এক বছব আগে এম. এ. পাশ কবেছে।

বিভাবতী তীক্ষ্ণ গভীব দৃষ্টিতে মেযেকে দেখে নিলেন একটু। মেযে সত্যি বলছে কিনা সেটাই বোঝাব চেষ্টা হযতো!—এখন কি কবে?

কলেজেব প্রোফেসাবি। শম্পাব গলায কি একটু আশাব সুব বাজল? সাহস কবে সে কি মুখ তুলে মাযেব মুখেব দিকে একবাব তাকাবে? পাবল না।

বিভাবতী জিজ্ঞাসা কবলেন, তোব সঙ্গে ক'দিন ধবে আলাপ?

শম্পা নিরুত্তব।

কদিন? বিভাবতী ঝাঁঝিযে উঠলেন আবাব।

দু বছব।

বিভাবতী হতভম্ব খানিক। তাবপবেই দাঁত কডমড কবে বলে উঠলেন, দু বছব ধবে আমাব চোখে ধুলো দিযে তুই এই কবে বেডাচ্ছিস? তোব দিদিদেব বিযেব আগে থেকে?

শম্পাব মুখ বিমর্ষ আবাব। কেঁদে ফেলে বলে উঠল, তুমি বিশ্বাস কবো মা, ও খুব ভালো ছেলে।

বিভাবতী দাঁডিযে দাঁডিযে দেখলেন খানিক। তাবপব বললেন, কাল থেকে আমি না বলা পর্যন্ত তুই কলেজে যাবি না, আব বাডি থেকে এক পা বেরুবি না।

একে একে দুটো স্তব্ধ দিন কেটে গেল।

তৃতীয দিনে লাল বাড়িব ছেলে কলে পডল। বাডিব সামনে ঘুবঘুব কবছিল, বিভাবতী কাজেব অছিলায বেরুলেন, তাবপবেই খপ কবে ছেলেটাব হাত ধবে বললেন, তোমাব বাডিই যাচ্ছিলাম, ভিতবে এসো আমাব সঙ্গে।

বিমূঢ় তটস্থ লাল বাডিব ছেলেকে সোজা বাডিতে টেনে নিযে এলেন তিনি। এনে তাকে নিযে সোজা শম্পাব ঘবেই ঢুকলেন।

শম্পা আঁতকে উঠে দাঁডাল।

তুই ও ঘবে যা।

হুকুম অমান্য কবাব মত বুকেব পাটা নেই। করুণ চোখে একবাব লাল বাডিব ছেলেব দিকে তাকিযে শম্পা দুরু-দুরু বক্ষে ঘব ছেডে চলে গেল।

বোসো।

চৌকিব এক কোণে কাঠ হযে গেল ছেলেটা।

কি নাম?

সুনীল গাঙ্গুলী।

কি কবো?

কলেজে পডাই।

কোন কলেজে?

নাম বলল।

বিভাবতী এব পব বাড়িতে কে আছে না আছে, দাদাবা কি কবে না কবে ইত্যাদি খবব নিলেন। বোনেদেব কোথায় বিয়ে হযেছে তাও শুনলেন। সবই মোটামুটি বড ব্যাপাব।

আমাদেব অবস্থা কি জানো?

লাল বাড়িব ছেলে সুনীল মাথা নাড়ল—জানে।

আমাদেব কিছু নেই জেনেও তোমাব বাবা-মা এখানে তোমাব বিযে দিতে বাজি হবেন?

তাবা বাজি হযেছেন।

তুমি তাঁদেব বলেছ?

হ্যাঁ। বাবা-মা শম্পাকে বাড়িতে ডেকে নিযে দেখেছেন, আলাপ কবেছেন। এখন আপনাদেব দিক থেকে প্রস্তাবেব আশা কবছেন তাঁবা। কিন্তু শম্পা ভযে আপনাকেও কিছু বলছিল না, আমাকেও দেখা কবে কিছু বলতে দিচ্ছিল না। কেবলই বলে বি. এ. পাস কবাব আগে কিছু হবে না।

বিভাবতী খানিক হাঁ কবে চেযে বইলেন ছেলেটাব দিকে। প্রথমে ঘাবড়ে গেছল, নইলে মুখে বোল আছে।

শম্পা! হঠাৎ দবজাব দিকে চেযে হাঁক দিলেন তিনি।

শুকনো নতমুখে শম্পা দোবগোড়ায় দেখা দিল।

ঘবে কি আছে দেখ, সুনীলকে খেতে দে। আব শোন, আমি এক্ষুনি ওব সঙ্গে ওদেব বাড়ি যাচ্ছি।

সুনীল তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল, খাওযা পবে হবে, আপনি চলুন না—

তুমি বোসো।

এই হুকুমেব ধবণই আলাদা। সুনীল তাড়াতাড়ি বসে বাঁচল। আব ব্যস্তসমস্ত শম্পা ছুটল বান্নাঘবেব দিকে। আশায আনন্দে থবথব কবে কাঁপছে সে।

বিভাবতী লাল বাড়ি থেকে ফিবলেন যখন, সন্ধ্যা হযে গেছে। সুনীলই পৌঁছে দিযে গেল। শম্পা উদগ্রীব হযেই ছিল সাবাক্ষণ। কিন্তু মাযেব মুখ দেখে বোঝাব উপায নেই, ভালো খবব কি খাবাপ খবব। খাবাপ খবব হবাব তো কোন কাবণ নেই, তবু ত্রাস যায না। মেজাজ ঠাণ্ডা বেখে মা কিছু কবে আসতে পাবে বলেই ধাবণা নেই তাব।

তোব বাবাকে ঠিকমত ওষুধ খাইযেছিস?

মাথা নাড়ল— খাইযেছে।

তিনি সটান নিজেব ঘবে চলে গেলেন।

বেবিযে মেযেব ঘবে এলেন প্রায ঘণ্টাখানেক বাদে। শম্পা শয্যায বসেছিল। সচকিত।

চুপচাপ তিনি মেযেকে দেখলেন একটু। বললেন, সামনেব এই দশ দিনেব মধ্যে

বিয়ে দিতে চায় ওরা—তা না হলে ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক এই তিন মাস আর হবে না।

বুকের ভিতর থেকে শম্পার একটা বোঝা নেমে গেল। আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকাল সে। কিন্তু মায়ের মুখখানা যেন অদ্ভুত শান্ত মনে হলো তার। আর তারপর যা ঘটল শম্পা কল্পনাও করতে পারে না। মা হঠাৎ পাশে বসে পড়ে দুহাতে বুকে টেনে নিল তাকে। তারপর আরো আশ্চর্য, মায়ের চোখে জল— বুক চেপে ধরে মা তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

আনন্দের আবেগে শম্পা দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কোলে মুখ গুঁজে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বিভাবতী নিঃশব্দে তার পিঠে হাত বুলোচ্ছেন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন বিভাবতী। সমস্ত গা কাপছে। ঘামছেন দরদর করে। ঘন অন্ধকার।

এ কি দেখলেন তিনি? এ কি দেখে উঠলেন?

তিনি দেখলেন, ঘুমের মধ্যে একেবারে স্পষ্ট দেখলেন, বিগত শ্বশুর খাচ্ছেন আর হাসছেন— হাসছেন আর খাচ্ছেন। মাছ মাংস পোলাউ রসগোল্লা সন্দেশ সব পরিপাটি করে খাচ্ছেন। খাচ্ছেন আর বলছেন, বেটি সেয়ানা বটে, বেশ করেছে, নিজেরটা নিজেই যোগাড় করে নিয়েছে। খেয়ে বড় তৃপ্তি হল গো বউমা।

এ রকম স্বপ্নও দেখে কেউ? বিয়ের আর মাত্র দুদিন বাকি, দিবারাত্র নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই বিভাবতীর। এই কদিনে তিন ঘণ্টা করেও ঘুমিয়েছেন কিনা সন্দেহ। বেশি রাতে শুয়েছিলেন আজও। বিছানায় গা ঠেকানো মাত্র ঘুমিয়েছেন।—তার মধ্যে এই স্বপ্ন।

সকালে উঠেও অনেকক্ষণ বিমনা তিনি। কদিন ধরে ভিতরটা তার খুঁতখুঁত করছিল ঠিকই। আবার সেই জলযোগের ব্যবস্থার নামে গায়ে জ্বর আসছিল। কেবলই ভাবছিলেন কি করা যায়। স্বপ্ন দেখা আশ্চর্য নয়, কিন্তু শ্বশুর এভাবে খাচ্ছেন আনন্দ করছেন এই স্বপ্নই কল্পনাতীত।

ছেলের পক্ষ ধরেই নিয়েছে, শুধু মেয়েটি ঘরে আসবে, তার সঙ্গে আর বেশি কিছু নয়। তবু যতটা পারা যায় করবেন ঠিক করেছিলেন বিভাবতী। মেয়ের বরাতে বড় ঘর জুটেছে, অতিরিক্ত ভালো জামাই জুটেছে। মেয়ের বড় ভাগ্যটা তিনি একেবারে ছোট করে শুরু করাবেন না। যথাসাধ্য করবেন। এই যথাসাধ্য করার হিসেব দাড়িয়েছে আট হাজার টাকা। বিভাবতীর কল্পনার বাইরের অঙ্ক প্রায়। স্বামী প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড গ্রাচুইটি ইত্যাদির ইত্যাদির সব টাকা কুড়িয়েবাড়িয়ে সর্বসাকুল্যে উনিশ হাজার টাকা তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। ওই যথাসর্বস্ব। ছেলে না দাঁড়ানো পর্যন্ত আর কপর্দক ঘরে আসারও সম্ভাবনা নেই। তবু তাই থেকে আট হাজার টাকা খরচ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন বিভাবতী।

স্বপ্ন দেখার ফলে বিকেলের মধ্যে প্ল্যান আরো অনেকটা প্রশস্ত রাস্তায় এগিয়ে চলল। কাউকে কিছু না বলে বাসে চেপে ভাগ্নের বাড়ি চলে গেলেন তিনি। ভাগ্নেটা

কবিতকর্মা লোক। তাব সঙ্গে বসে নতুন কবে আব একটা হিসেব কবে ফেলা হল। দু'শ সোযা দু'শ লোককে পেটপুবে খাওযাতে কম কবে আবো দু' হাজাব টাকা লাগবে। যা তিনি খাওযাতে চান, এব কমে হবেই না।

বিভাবতী বললেন, ঠিক আছে, তুমি সব ব্যবস্থা কবে দাও। সব যোগাডযন্ত্র কবতেও তো প্রাণান্ত ব্যাপাব।

সেদিক থেকে ভাগ্নে তাকে নিশ্চিন্ত কবল।

খুশিমনে বিভাবতী বাডি ফিবলেন। তাব মস্ত একটা দুর্ভাবনা গেল। কেবলই মনে হল, মেযেব কল্যাণেব জন্য শ্বশুবই এভাবে তাঁব দ্বিধা ঘুচিযে দিলেন। পবে যা হবাব হবেই। আব এতে মেযেব মঙ্গলও হবেই। ইতিমধ্যে সকালেই তিনি পাডাব বিযেবাডিব একতলা ভাডা কবে এসেছেন। নিজেদেব আডাই ঘবে কিছুই হবে না। বাডি থেকে মিনিট তিনেকেব পথ ওই বিযেবাডি। দোতলায বাডিব মালিক থাকে, একতলা বিযেব দরুন ভাডা দেওযা হয। তা সেও শ্বশুবেব আশীর্বাদে আব মেযেব ভাগ্যে একটু সুবিধেতেই পেযেছেন তিনি। বিযেব দিন সকাল থেকে চব্বিশ ঘণ্টাব জন্য ভাডা একশ টাকায বফা হযেছে।

খবচ আট হাজাব থেকে এক লাফে দশ হাজাবে উঠে গেল। কিন্তু ভবিষ্যতেব ভাবনায একটুও উতলা নন তিনি। মেযেব কল্যাণ হবে মেযে সুখী হবে এটাই যেন বড কথা।

বাডিব কর্তা অর্থাৎ শৈলেশ চাটুজ্জে খোঁজ নিতে চেষ্টা কবেন, কি হচ্ছে বা কি হবে। বিভাবতী ধমকেই ঠাণ্ডা কবেছেন তাঁকে, যা হবে তা হবে, তোমাকে কে মাথা ঘামাতে বলেছে? ভাবনা-চিন্তা কবে আবাব হার্ট ধবে বসে পডো।

আমতা আমতা কবে ভদ্রলোক বলেন, ইযে, আমি তো বেশ ভালই আছি এখন।

বিভাবতী বেগে যান, ভালো আছ সেটা আব সহ্য হচ্ছে না, কেমন? তাহলে তুমিই সব ব্যবস্থা কবো, আমি গিযে শুই।

স্বামীটি সুডসুড কবে ঘবে পালিযে বাচেন।

কিন্তু ভদ্রলোক আকাশ থেকে পডলেন বিযেব বাতে। গোধূলি লগ্নে বিযে। বিযে হযে গেছে। বিযেবাডিব এলাহি ব্যাপাব দেখে কি বকম যেন অস্বস্তি বোধ কবেছেন তিনি। এক-একবাব এক-একদিকে ঘুবে দেখছেন, আবাব চুপচাপ এক জাযগায বসে থাকছেন।

অনেক ব্যস্ততাব মধ্যেও তাব দিকে চোখ পডল বিভাবতীব। তক্ষুনি ছেলেকে দিযে বাডি পাঠিযে ছাডলেন তাকে। বললেন, বিযে তো হযে গেছে, এখন ঘবে গিযে খানিক চুপচাপ শুযে থাকোগে যাও—একটু বাদে আমি দুধ পাঠিযে দিচ্ছি।

কেন, আমি তো ভালই আছি।

আঃ, যাবে তুমি?

তৎক্ষণাৎ প্রস্থান। স্ত্রীব মন ভালো না, জানেন। বড মেযেব শবীব খাবাপ, বাচ্চাটাব আবো খাবাপ—তাকে আনতে পাবেনি। স্ত্রীব চোখে কতবাব যে জল এসেছে আব শুভদিনেব অমঙ্গলেব আশঙ্কায সেই জল ঠেকিযে বেখেছে—সে শুধু তিনিই জানেন। বড মেযে আসতে না পাবাব দরুন স্ত্রীব এত মন খাবাপ দেখেই তাঁবও মনটা বিষণ্ন।

ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন তিনি, জামা-কাপড় ছাড়লেন না— একটু বিশ্রাম করে স্ত্রীর মন বুঝে আর একবার ওদিকে যেতে চেষ্টা করবেন। যে দুধ নিয়ে আসবে তারই মারফৎ স্ত্রীর অনুমতি চেয়ে পাঠাবেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দুধের গেলাস হাতে স্ত্রীই হাজির। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন শৈলেশ চাটুজ্জে, আবার তুমি কেন?

ঘামে জবজব করছে বিভাবতীর মুখ, আর পরিশ্রমে বড় বেশি লাল হয়েছে। এক চুমুকে দুধের গেলাস খালি করে জল খেলেন শৈলেশ চাটুজ্জে, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, সব খেতে বসে গেছে?

এক ব্যাচ হয়ে এলো। তোমার কেমন লাগছে এখন?

খুব ভালো, একবার ঘুরে আসব?

না, তোমাকে এক্ষুনি ব্যাণ্ডেলে যেতে হবে, বিশু ঠাকুরপোর নতুন গাড়িটা পেয়েছি, তোমার কিছু কষ্ট হবে না—পাকা ড্রাইভার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

শৈলেশ চাটুজ্জে হতভম্ব হঠাৎ। কি শুনছেন ঠিক যেন বুঝছেন না। বিশু ঠাকুরপো মানে তাঁর বড়লোক বাল্যবন্ধু বিশ্বেশ্বর ঘোষ? বললেন, আমি—মানে এখন ব্যাণ্ডেলে যাব?

হ্যাঁ, সবে তো রাত আটটা এখন, দেড় ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে। কেবলই মনে হচ্ছে মেয়েটা ছটফট করছে আর কাঁদছে—জামা-কাপড় তো পরাই আছে দেখছি, এই টাকা কটা রাখো, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আর দেরি কোরো না, এক্ষুনি চলে যাও। গাড়িতে টিফিন ক্যারিয়ারে রমা আর ওদের সকলের জন্য খাবার দিয়েছি—খায় যেন। আর তুমি গিয়েই যেন কাল-পরশুর মধ্যে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ো না, এই গণ্ডগোলের মধ্যে থাকলে তোমার হার্ট আরো খারাপ হয়ে যাবে। তিন চার দিনের মধ্যে এদিকের সব চুকলে আমিও যাচ্ছি—একসঙ্গে ফিরব। এই নাও, পকেটে তোমার ওষুধ ক'টা নিয়ে নাও।

কথা বলারও ফুরসত পাচ্ছিলেন না শৈলেশ চাটুজ্জে। এবারে বললেন, কিন্তু আজই কেন...কাল না হয় যাব...তাছাড়া আমি তো এখন বেশ...

গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তুমি উঠবে? তুমি না গেলে এক্ষুনি আমি যাব।

যাচ্ছি, যাচ্ছি, কিন্তু—

আর কিন্তু না, শিগগীর ওঠো। লক্ষ্মীটি, তুমি মেয়েটার কাছে না গেলে আমার একটুও ভালো লাগছে না। এদিকে আমি সব সামলে নিতে পারব—

শৈলেশ চাটুজ্জে নীরবে তাকালেন একবার। তাঁর মনে হল, স্ত্রীর চোখে জল বুঝি ভেঙেই পড়বে। আর একটি কথাও না বলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তারপর নিঃশব্দেই গাড়িতে এসে উঠলেন। গাড়িটা চলে গেল।

বিভাবতী স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বিয়েবাড়ির দিকে চললেন। শুকনো দু'চোখ খরখর করছে এখন।

হ্যাঁ, দশ মিনিট সময় নিয়েছিলেন, তার মধ্যেই ফিরেছেন তিনি।

বিযেবাডিব এদিকটায চাপা উত্তেজনা একটা। বিভাবতী জানেন কিসেব উত্তেজনা, কেন উত্তেজনা?

স্থিব পাযে এগিযে এসে পাশেব একটা ছোট ঘবে ঢুকলেন তিনি। সেই ঘবে তিনজন পুলিশ এবং দুজন তাদেব ওপবঅলা ভদ্রলোক।

তাদেব সামনে এসে দাডালেন বিভাবতী, কি বলবেন বলুন?

প্রধান অফিসাবটি বললেন, যাঁব মেযেব বিযে তিনি কোথায?

আমাবই মেযেব বিযে।

সিঁথিব সিঁদুবেব দিকে চোখ গেল অফিসাবেব।

আপনাব স্বামী কোথায?

তিনি অসুস্থ, কলকাতায নেই। আমাব বড মেযেও অসুস্থ, আসতে পাবেনি, তাঁকে পাঠিযে দিযেছি।

অফিসাবেব চোখে অবিশ্বাসেব দৃষ্টি, মেযেব বিযে হচ্ছে, তিনি এখানে নেই?

না। বললাম তো তিনি অসুস্থ, হার্টেব বোগী, বাডিতে ডাক্তাবেব প্রেসক্রপশন আছে একগাদা, দেখতে পাবেন।

নেমন্তন্ন চিঠি কাব নামে ছাপা হযেছে?

নেমন্তন্ন চিঠি ছাপানো হযনি, ওসব বাজে খবচ কবাব পযসা নেই।

একজন কেউ তো দাডিযে থেকে ব্যবস্থা কবিযেছেন, তাকে ডাকুন।

আমিই দাডিযে থেকে সব ব্যবস্থা কবেছি, আব কেউ কবেনি।

ও..। অফিসাবেব তির্যক দৃষ্টি, লোক তো অনেক দেখছি, কত লোক খাওযাচ্ছেন?

দু'শ।

লিখে নিলেন। কি খাওযাচ্ছেন একবাব দেখতে চাই।

দেখলে খেযে যেতে হবে। আসুন—

অফিসাব কেন যেন এগোতে পাবলেন না। বললেন, অপবাধ নেবেন না, আমবা কর্তব্যেব দাযে এসেছি খেতে পাবব না।

আমি কর্তব্যে বাধা দেব না, খেযে গেলে আমাব মেযেব কল্যাণ হবে। এখানেই আনিযে দিচ্ছি—

না না না। অফিসাব ব্যস্ত হযে উঠলেন। মহিলাব দিকে চেযে অস্বস্তিও বোধ কবছেন কেমন। আচ্ছা আপনি বলুন, কি খাওযাচ্ছেন?

লুচি মাছ মাংস পোলাও দই বসগোল্লা সন্দেশ—

অফিসাব লিখে নিলেন।— সক্কলেব জন্য এই ব্যবস্থা?

সক্কলেব জন্য।

আবাব লিখলেন। তাবপব আমতা আমতা কবে বললেন, কিন্তু এসব তো আইনে নিষেধ কবা আছে...একটু মুশকিল হলো।

আমাকে এখুনি থানায যেতে হবে?

অফিসাব মুখ তুলে তাকালেন, কিন্তু চোখে চোখ বাখতে পাবলেন না। একটু ভেবে বললেন, না, আপনি যা বললেন...এতে একটা সই কবে দিলেই হবে।

খাতাটা বাড়িয়ে দিলেন, কলম এগিয়ে দিলেন।

আঁকা-বাঁকা অক্ষরে বিভাবতী নাম সই করলেন। নির্দেশমত বসতবাড়ির ঠিকানাও লিখে দিলেন।

সদলবলে অফিসার চলে গেলেন। ঘরের বাইরের চাপা উত্তেজনা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল আবার। এদিকের একটা ঘরে কি ঘটে গেল, বিয়েবাড়ির অন্দরমহলের কেউ কিছু জানতেও পারল না।

আসামী বিভাবতী চট্টোপাধ্যায়ের কথাবার্তা শুনে তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট কৌতূহল বোধ করছেন বেশ। ঘরের অনেকে হাসছেও মুখ টিপে। একধারে শুধু নতুন মেয়ে জামাই, বর্ধমানের মেয়ে জামাই আর ছেলের মুখ শুকনো।

বিভাবতী উকীল দেননি। বর্ধমানের মেজ জামাই সে চেষ্টা করতে গিয়ে ধমক খেয়ে বিরত হয়েছে। শাশুড়ী বলেছেন, নিজের ওকালতি নিজেই তিনি করতে পারবেন, এর জন্যে লোক ভাড়া করার দরকার নেই।

করেছেনও। তাঁর বক্তব্য, স্বামীর উনিশ হাজার টাকা সম্বলের মধ্যে দশ হাজারের ওপর খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, ভবিষ্যত ভাবতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখার কথা—এই খরচ তিনি সখ করে করেননি, ফূর্তি করার জন্যও না। করার দরকার হয়েছিল তাই করেছেন।

তিনি স্বীকার করেছেন, দু'শ লোক নেমন্তন্ন করা হয়েছিল, আর যা-যা খাওয়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ, তাও সবই স্বীকার করেছেন, শুধু তিনি দোষী এটুকুই অস্বীকার করেছেন।

তরুণ বিচারক প্রশ্ন করলেন, পঞ্চাশজনের বেশি লোককে এসব খাওয়ানো নিষেধ, আপনি জানতেন না?

জানতাম। এরকম বাজ্যি-ছাঁড়া নিষেধ আমাদের ভিতরে পৌঁছয় না।

কেন?

কেবল নিষেধ, আর কেবল নেই। সত্যিই নেই বুঝতে পারলে কারো নিষেধ করার দরকার হত না।

সম্ভব হলে বিচারক এই আসামীটিকে মুক্তিই দিতেন বোধ করি। একেবারে ন্যূনতম লোক-দেখানো শাস্তিই ঘোষণা করলেন তিনি। বিভাবতীর পঁচিশ টাকা জরিমানা হল, অন্যথায় তিন দিন জেল।

তিন দিন জেলের উক্তি নিয়ম-রক্ষার্থে, পঁচিশ টাকা জরিমানাতেই এই বিচার-পর্ব শেষ হবে জানা কথা। কিন্তু আসামীর প্রশ্ন শুনে ভিতরে ভিতরে হয়ত অস্বস্তিই বোধ করলেন বিচারকটি। বিভাবতী তাঁর দিকে স্থির তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পঁচিশ টাকা জরিমানা না দিলে তিন দিন জেলে থাকতে হবে?

তরুণ বিচারক মাথা নাড়লেন।

আপনাদের জেলে ভদ্রঘরের মেয়েদের রাখার ঠিক ঠিক ব্যবস্থা সব আছে তো?

বিব্রত মুখে আবারও মাথা নাড়তে হল বিচারককে। তারপর তেমনি বিড়ম্বিত মুখে তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের দিকে তাকালেন তিনি।

বিভাবতী বললেন, পঁচিশ টাকা দেবার আমার ক্ষমতা নেই, তিন দিন জেলেই থাকব। ছেলে আর মেয়েদের দিকে ফিরলেন তিনি, তোরা বাড়ি যা-তিনটে দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আর সাবধান ব্যাপ্তেলে যেন কেউ কিছু না জানায়।

নিরুপায় জামাই দুটি শাশুড়ীর অলক্ষ্যে বিচারকের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে কি বোঝাতে চেষ্টা করল তারাই জানে। তিনি উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও অদৃশ্য। একটু বাদেই হন্তদন্ত হয়ে ফিরল তারা। বিভাবতী অবাক হয়ে দেখলেন তাঁকে কেউ জেলখানায় নিয়ে যেতে এলো না। শুধু মেয়েরাই খুশিমুখে এগিয়ে এলো। শম্পা বলল, চলো মা, এবারে বাড়ি চলো— তুমি দেখালে বটে, হাকিম তোমার জরিমানা মকুব করে দিয়েছেন।

জরিমানা সত্যিই যে এভাবে মকুব করা যায় না, বিভাবতীর তা জানার কথা নয়। তবু সন্দিগ্ধ। জামাইদের দিকে তাকালেন, সত্যি না তোমরা জরিমানা গুনে দিয়ে এলে?

প্রাণের দায়ে মেজ জামাই আর নতুন জামাই ঘন ঘন মাথা নাড়ল। আর মেয়েরা বলে উঠল, তোমার কাছে মিথ্যে বলার সাহস আছে নাকি আমাদের, চলো শিগগীর।

আশ্বস্ত হয়ে সকলকে নিয়ে বিভাবতী বাইরের বারান্দায় এসেই তপ্ত মুখে গজ গজ করে উঠলেন, আমাদের সময় মা-বাবা শ্বশুর-শাশুড়ীরা বলত, কখনো নেই বলতে নেই— আর এদেশের লোক হয়ে আইন করে হাকডাক করে নেই-নেই রব তুলে দিয়েছে একেবারে—লজ্জাও করে না।

পরক্ষণে কি মনে পড়তে থমকালেন একটু, পা-ও থেমে গেল। ছেলের দিকে তাকালেন তিনি, বললেন, এখনো তো বেলা পড়েনি, তুই এক কাজ কর তো, এক্ষুনি ব্যাপ্তেলে চলে যা, তোর বাবাকে নিয়ে আয়—কি ভাবে আছে কে জানে, সঙ্গে টাকা আছে?— আছে? যা তাহলে—যাবি আর আসবি, আর সাবধানে নিয়ে আসবি—

গল্পটা এই।

তখনো ভাবছিলাম আমি। ভাবছিলাম অর্থাৎ নামী আর মোটামুটি নামী লেখকদের মত আর মন্তব্য বিশ্লেষণ করছিলাম।

দীর্ঘদিন ধরে নিজে সাহিত্য করছি, কঠিন বাস্তবের পটভূমিতে অনেক গল্প লিখেছি, আর সেই সঙ্গে কড়া সম্পাদক হিসেবে কিছু সুনাম আর দুর্নাম কুড়িয়েছি। তবু সতীর্থদের মতামত আর মন্তব্যের সঙ্গে নিভৃতের অনুভূতির তেমন যোগ হচ্ছে না কেন?

প্রথম, নতুন লেখক যে বলেছে, গল্পটা সত্যের ছায়া নিয়ে লেখা—সেটা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না কেন?

দ্বিতীয়, বিভাবতীর যে কথাবার্তা আচার-আচরণ লেখক বন্ধুদের অবাস্তব মনে হয়েছে, তার একবর্ণও বদলালে গল্পটা বর্ণশূন্য হয়ে যাবে মনে হচ্ছে কেন?

তৃতীয়, গল্পটা নিছক উদ্দেশ্যমূলকই যদি হয তো, ও-বকম একটি মহিলাকে সচক্ষে দেখাব লোভ হচ্ছে কেন?

চতুর্থ, শ্রোতা-লেখকদেব মন্তব্য অনুযায়ী গল্প থেকে হাটেব বোগী ভদ্রলোকটিকে উডিযে দিযে, অর্থাৎ মহিলাব সিঁথিব সিঁদুব মুছে দিযে এই গল্পটা জটিলতা-মুক্ত কবে তোলাব কথা ভাবতেও বুকেব ভিতবে বাতাসেব অভাব বোধ কবছি কেন?

আব সব শেষে, যে মেযেব মঙ্গল আব কল্যাণেব আকাঙ্ক্ষায মহিলাব উনিশ হাজাব টাকা সম্বলেব থেকে দশ হাজাব খবচ কবাব প্রেবণা আব অনাযাসে আইন ভঙ্গ কবাব তাডনা— কল্পনায সেই মেযেব মাথায হাত বেখে কেন বলতে ইচ্ছে কবছে, মঙ্গল হোক, সুখী হও।

গল্পটা ছাপব কিনা এখনো ঠিক কবে উঠতে পাবিনি।

আকাঙ্ক্ষা

এক অন্তবঙ্গ বন্ধুব সঙ্গে দেখা গৌবকিশোব অধিকাবীব। বন্ধু ট্রামেব অপেক্ষায দাঁডিযেছিলেন আব গৌবকিশোব মস্ত ঝকঝকে গাডি হাঁকিযে যাচ্ছিলেন। ট্রাফিকেব লাল আলো জ্বলতে গাডিটা একটা বাসেব পিছনে দাঁডিযে গেছল। বন্ধুই তাঁকে প্রথম দেখেছেন, তাবপব না চেনাব মত কবে অন্যদিকে মুখ ফিবিযে নিযেছেন। কিন্তু গৌবকিশোব তাঁকে দেখামাত্র উৎফুল্ল। ড্রাইভাব তাঁব ইঙ্গিতে গাডি পিছিযে নিযে বাযেব ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড কবিযেছে। গাডি থেকে নেমে হন্তদন্ত হযে তিনি বন্ধুকে ধবেছেন। তাঁকে জাপটে ধবে টেনে এনে গাডিতে তুলেছেন। তাবপব সানন্দে বলে উঠেছেন, ভাগ্যিস দেখেছিলাম, তুই তো অন্যদিকে মুখ ফিবিযেছিলি।

বন্ধু জবাব দিযেছেন, তোমাকে আব তোমাব গাডি দেখে মুখ ফিবিযেছিলাম—

—কেন, কেন? গৌবকিশোববাবু ঈষৎ অপ্রস্তুত।

—সংকোচে আব হিংসেয।

গৌবকিশোববাবু হা-হা শব্দে হেসে উঠেছেন। তকমা আব টুপা পবা ড্রাইভাব সচকিত হযে সামনেব আযনা দিযে তাঁব মুখ দেখতে চেষ্টা কবেছে। গাডি সামনেব বাস্তা ধবে চলেছে।

বন্ধুব জবাব শুনে বেশ মজাব খোবাক পেযেছেন গৌবকিশোববাবু। জিজ্ঞাসা কবলেন, সংকোচ কিসেব আব হিংসেই বা কেন?

ড্রাইভাবকে বাঙালী মনে হযনি বন্ধুব। তাই গলাব স্বব স্বাভাবিক বেখেই জবাব দিলেন, সংকোচ তোমাব অবস্থান্তব দেখে আব হিংসে তোমাব স্ত্রী-ভাগ্য দেখে।

গৌবকিশোববাবুব মুখে হাসি ধবে না।—এই দুটো ব্যাপাবই যে অবশ্যম্ভাবী সে তো তুই হাত দেখে আব কুষ্টি দেখে অনেক আগেই বলে দিযেছিলি।

—তা বলেছিলাম হযত, কিন্তু গণনা কবা আব স্বচক্ষে তাব সফল রূপ দেখাব মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। আব অভাজনদেব কিছু কিছু উক্তি কানে এসেছে, যাব

ফলে তোমাকে দেখামাত্র ওই তফাৎটা চোখ ধাঁধিয়েছে।

হাসিমুখে গৌরকিশোরবাবু বন্ধুর গন্তব্যস্থল জেনে নিলেন। বাড়ি যাচ্ছেন শুনে খুশিমনে তাকে পৌঁছে দিতে চললেন। আপাতত তিন-কোয়ার্টার ফ্রী তিনি, অতএব বন্ধুর বাড়িতে দশ বিশ মিনিট বসে একটু আড্ডা দেবারও সময় হবে। তারপর সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, অভাজনদের আবার কি উক্তি কানে এলো তোমার?

—সবিনয় দাশগুপ্ত বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেছল, তুমি ব্যস্ত ছিলে বলে তাকে বসতেও বলোনি, এগিয়ে এসে দুই এক কথা বলে সিঁড়ি থেকেই তাকে বিদায় করেছ।

—ও হ্যাঁ, সেদিন স্ত্রীর কয়েকজন বন্ধু আর বান্ধবী এসেছিলেন, কি একটা প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা চলছিল।

—আর মাস ছয় আগে এক বৃষ্টির দিনে তোমার গাড়ি ট্রামের পাশ কাটাতে গিয়ে ফুটপাতে অমল ঘোষের জামাকাপড় রাস্তার জলে ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেছল। তুমি তাকে দেখেছিলে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলে।

গৌরকিশোরবাবু একটুও চিন্তা না করেই মাথা নাড়লেন।—জলের ধারে ফুটপাথ ঘেঁষে দাড়ায় কেউ? বেচারার কোমর পর্যন্ত ভিজে সারা। গাড়িতে সেদিন স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ী শালা সবাই ছিলেন, সেদিনও এক বড় ইনডাসট্রিয়াল ম্যাগনেটের বাড়িতে পার্টি ছিল। তারপর, আর কিছু?

বন্ধু মাথা নাড়লেন, আর কিছু না।

গৌরকিশোর অধিকারী হৃষ্টমুখে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, অবশাম্ভাবী অবস্থান্তর আর স্ত্রী-ভাগ্যের পরে আমার যে এরকম পরিবর্তন হবে হাত আর কুষ্ঠি দেখে সেটা বুঝি আঁচ করতে পারিসনি?

বন্ধু মাথা নাড়লেন, পারেননি।

গৌরকিশোরবাবু ড্রাইভারকে দ্বিতীয় দফা সচকিত করে হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন।

বন্ধুর বাড়িতে এসে চা হল, গল্পগুজব হল খানিক। কথা বেশি গৌরকিশোরই বললেন। সামাজিকতা লৌকিকতার ঝামেলায় সময়ের অভাব কত কম, সরস হাসি মুখে সেই গল্প করলেন। শালার সঙ্গে নতুন স্টীল অ্যাণ্ড নেট অ্যারাবিং-এর ব্যবসা কি রকম চলছে গম্ভীরমুখে সেই বিবিস্তি দিলেন।

বন্ধুর শ্রোতার ভূমিকা।

শেষে হঠাৎ এক সময় হাত বাড়িয়ে দিলেন গৌরকিশোর অধিকারী, বললেন, আমার কুষ্ঠি তো তোর মুখস্থই ছিল—হাতের সঙ্গে মিলিয়ে আর একবার দ্যাখ দেখি—কলেজের মাস্টারি ছেড়ে এই ব্যবসায় নামলে তুই সত্যিই লাল হয়ে যেতিস।

হাতের ওপর হাত-দেখা কাচ ফেলে বন্ধু গম্ভীর মুখে খানিক রেখা পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি জানতে চাও, বলো—।

—আমি বলব কি, তুই বল।

—তোমার সদ্য বর্তমানের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ আমার জানা নেই, বলো কি জানতে চাও?

মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন গৌরকিশোর। হাসিটা কমে আসতে লাগল। চোখে চোখ রেখে চেয়েই রইলেন খানিক। তারপর সাদাসিধে স্পষ্ট গলাতেই জিজ্ঞাসা করলেন, আমার স্ত্রীর চোখে কোনদিন জল দেখতে পাব?

এবার বন্ধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

গৌরকিশোরের মুখে হাসির ভাঁজ পড়তে লাগল আবার।—কি বলে তোমার গণনা, পাব?

বন্ধু মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, আমার জ্যোতিষী বিদ্যায় এটা বলা সম্ভব নয়।

গৌরকিশোর জোরেই হেসে উঠলেন এবারে। পরমুহূর্তে ঘড়ি দেখেই আঁতকে উঠলেন প্রায়, দেখেছ কাণ্ড! চলি ভাই—

হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে চললেন তিনি।

গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে তাড়া দিলেন, তুরন্ত চলো—

গাড়ি ছুটল। অসহিষ্ণু অস্বস্তি নিয়ে হাত-ঘড়িটা দেখলেন আবার। স্ত্রীকে যেসময় দিয়েছিলেন তার থেকে সাত আট মিনিট দেরি হবেই পৌঁছুতে। গৌরকিশোরবাবুর চাপা অস্বস্তি সাত আট বছর দেরিতে পৌঁছুনোর মত। সময়ের হিসের না থাকাটা কালচারের একটা বড় খুঁত।

সাত আট মিনিট নয়, দু'মিনিট দেরি হয়েছে ফিরতে। স্ত্রী ঘড়ি ধরে ঠিক পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করেছিলেন শুনলেন। তারপর একাই ডান্স-ড্রামা দেখতে চলে গেছেন। ...ঠিক এক মিনিট আগে।

তাঁর একত্রিশ, লতার ছাব্বিশ।

গৌরকিশোর বিয়ে করেছেন পাঁচ বছর আগে। করেছেন বলা ঠিক হল না, তাঁর বিয়ে হয়েছিল। বিয়েটা তাঁর জীবনে এক অভাবিত ঘটনা। তিনি বাস্তববাদী মানুষ, জীবনে কোনদিন আকাশকুসুম কল্পনায় বিভোর হননি। কিন্তু বাস্তবের আকাশ থেকে তাঁর জীবনে ভাগ্যের এক দুর্লভ কুসুম খসে পড়েছে। বিয়ের পর নয়, বিয়ের প্রস্তাব শুনেই তিনি বিহ্বল হয়েছিলেন।

তাঁর বাবা ছিলেন বনেদী লোহার কারবারী চ্যাটার্জী মেটালস-এর পাঁচজন অ্যাকাউনটেন্ট-এর একজন। দু'দুটো যুদ্ধের কল্যাণে চ্যাটার্জী মেটালস–এর ভাগ্য আর খ্যাতির তুঙ্গস্থানে বৃহস্পতির অনড় অবস্থান। কিন্তু গৌরকিশোরের বাবা আনন্দকিশোর সচ্ছলতার মুখ দেখেছিলেন মাত্র মাসকতকের জন্যে। গৌরকিশোর বি. এ. পাশ করার পরে।

বিধাতার খেয়ালের কূল মেলা ভার। নইলে বলা নেই কওয়া নেই, গৌরকিশোরের অ্যাকাউনটেন্ট বাবা ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের খাস বেয়ারার মুখে 'বড়া সাব সেলাম দিয়া' শুনে তো ঘামতে ঘামতেই ছুটেছিলেন তাঁর এয়ার কনডিশনড চেম্বারের দিকে। মাঝে এক ঝুড়ি ছোট বড় হোমরাচোমরা অফিসারের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ তাঁকে তলব

কেন ভেবে না পেয়ে গলদ-ঘর্ম অবস্থা। ন'মাসে ছ'মাসে ডাক যদি কখনো পড়ে তো আর পাঁচজন অফিসারের নির্দেশে তাঁদের সঙ্গ ধরে ঘরে ঢোকেন, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথাবার্তা শোনেন, তারপর আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে অফিসারদের ইঙ্গিত বুঝেই আবার বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। শুধু অফিসাররা কেন, ওই ঘর থেকে ডাক এলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বড় দুই ছেলে পর্যন্ত সভয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছোটেন—বাপের পরেই যাঁরা এত বড় কোম্পানীর হর্তাকর্তা।

সেই ঘর থেকে একা অ্যাকাউনটেন্টের ডাক আসাটা মেঘশূন্য আকাশ থেকে একটা বাজ পড়ার মতই।

ঘরে ঢুকে দেখেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সামনে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট দত্ত সাহেব বসে। কোম্পানীর যাৎসরিক আয়-ব্যয় লাভ-লোকসানের হিসেব-নিকেশ তিনিই করে থাকেন। ওই হিসেবপত্রের সুতো ধরেই তাঁর সঙ্গে আনন্দকিশোরের অনেক দিনের যোগাযোগ। ভদ্রলোক স্নেহ করতেন তাকে। দু'জনের কারো মুখই বিপজ্জনক রকমের গম্ভীর নয় দেখে মনে মনে স্বস্তিবোধ করেছিলেন একটু।

—বোসো। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সহজ আপ্যায়নে হকচকিয়ে গেছলেন তিনি। আদেশ পালন করার মত করে দত্ত সাহেবের পাশের চেয়ারে বসেছিলেন। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জীর বয়েস প্রায় পঁয়ষট্টি, আর আনন্দকিশোরের ছে-চল্লিশ —কিন্তু এই তুমি বলার মধ্যে খুব প্রচ্ছন্ন একটু অন্তরঙ্গ স্পর্শও পেলেন যেন।

—তোমার ছেলে স্কুল ফাইনালে সেকেণ্ড হয়েছিল?

প্রশ্নটা এত অপ্রত্যাশিত যে প্রায় দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ...

—আই, এসসি-তে ফার্স্ট হয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এবারে বি, এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোন সাবজেক্ট?

—আজ্ঞে অঙ্ক।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী কৃতী ছেলের বাপের মুখখানা পর্যবেক্ষণ করলেন একটু।—তুমি কত মাইনে পাও এখন?

—আজ্ঞে তিনশ সত্তর।

—ছেলেকে বাড়িতে পড়াতো কে, তুমি না মাস্টার?

—আজ্ঞে ও নিজেই পড়ত।

—এখন এম, এ পড়বে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ছেলেটিকে একবার নিয়ে এসো তো, দেখব। আই অ্যাম সো গ্ল্যাড টু হিয়ার ইট।

বড সাহেবেব ঘব থেকে বেবিযে আনন্দে ঘেমে ওঠাব দাখিল। প্রতিবাবেব সুখববেব মত ছেলেব সুখববটা সেই সকালেই দত্ত সাহেবকে জানিযেছিলেন তিনি।

যতটা সম্ভব ভব্যসভ্য কবে ছেলেকে পবদিনই বড সাহেবেব ঘবে নিযে এসেছিলেন। বাবাব সেই চাপা উত্তেজনা আব ব্যস্ততা দেখে গৌবকিশোব হকচকিযে গেছলেন। ঘাবডে গিযে প্রণাম কবাব তাডায চেযাবেব আডালে ম্যানেজিং ডাইবেক্টবেব দ্বিতীয পা খুঁজে না পেযে এক পাযেব জুতোব উপবে দু'বাব হাত বুলিযে মাথায ঠেকিযেছেন। কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী ঈষৎ কৌতুকে পর্যবেক্ষণ কবেছেন তাঁকে।

কিন্তু তাঁব মন্তব্য শুনে বাপেব মুখে কাষ্ঠ হাসি আব ছেলেব মুখে বিডম্বনাব ধকল। বড সাহেব হেসে বলেছেন, লেখাপডায তুমি এত ভালো...বাট ইউ ডোন্ট লুক দ্যাট স্মার্ট।

বাবা বাব বাব কবে বলে দিযেছিলেন, হাবাগোবাব মত চুপ কবে থাকিস না, একটু আধটু কথা বলবি। অতএব চুপ কবে না থেকে গৌবকিশোব কথাই বলেছেন। —চেষ্টা কবিনি স্যাব...

কৌতুকে নডেচডে বসেছেন কৃষ্ণকমল চাটার্জী।—কি চেষ্টা কবোনি, স্মার্ট হতে?

এবাবে আব জবাব জোগালো না, মাথাই নাডলেন শুধু— অর্থাৎ তাই।

—কি চেষ্টা কবেছ?

গৌবকিশোব ফাঁপবে পডেছিলেন, জবাব দিযেছেন, একবাব সেকেণ্ড হবাব পব থেকে ফার্স্ট হতে চেষ্টা কবেছি।

আব একটু ভালো কবে পর্যবেক্ষণ কবতে গিযে বড সাহেবেব ঠোঁটেব ডগাব হাসি আবো স্পষ্ট হযেছিল।—চেষ্টা কবলে স্মার্ট হতেও পাবো বলছ?

নিরুপায গোছেব মাথা নেডেছিলেন গৌবকিশোব— পাবেন।

হাসি মুখে ম্যানেজিং ডাইবেক্টব উপদেশ দিযেছেন, আচ্ছা এম. এ-তে ফার্স্ট হবাব পব সে চেষ্টা কোবো। ভেবি গ্ল্যাড টু মিট ইউ—

ছেলেটাকে একেবাবে হাবাই ভাবলেন কিনা বড সাহেব, বাবা দিনকতক সেই অস্বস্তি ভোগ কবেছেন। তাবপব একদিন দোকান থেকে মিষ্টি কিনে নিযে হাসিমুখে বাডি ঢুকেছেন। কোম্পানীব চিফ অ্যাকাউনটেন্ট বলে কোনো পোস্ট ছিল না এতদিন —এখন হল। জনাকতক জুনিযব আব সিনিযব অ্যাকাউনটেন্ট কোম্পানীব কাজ চালাতেন। চ্যাটার্জী মেটালস-এব তিনিই প্রথম চীফ অ্যাকাউনটেন্ট—মাইনে তিনশ সত্তব থেকে এক লাফে পাঁচশ সত্তব।

ম্যানেজিং ডাইবেক্টব কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জীব সঙ্গে গৌবকিশোবেব আবাব দেখা হযেছে মাস নযেক বাদে। শোকেব আব দুশ্চিন্তাব তাপ নিযে গেছলেন বাবাব শ্রাদ্ধেব নিমন্ত্রণ পত্র নিযে, আব কিছু না হোক, দুটো সহানুভূতিব কথা শুনবেন আশা ছিল। কিন্তু শোকেব তাপেব সঙ্গে অবজ্ঞাব তাপ নিযে ফিবেছেন।

বেযাবাব মুখে খবব পেযে কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী তাঁকে ঘবে ডেকেছিলেন অবশ্য। বসতে বলেননি। তাব পবনে কাঁচা-কোঁচা, হাতে আসন, একগাল খোঁচা-খোঁচা দাডি। মুখ তুলে একবাব শুধু দেখেছিলেন তাঁকে, তাবপব আবাব ফাইলে মন দিযেছিলেন।

বাবাব আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞাসা কবেননি। সন্তর্পণে শ্রাদ্ধ-পত্র তাঁব সামনে টেবিলে বাখতে মুখ না তুলেই মাথা নেড়ে শুধু বলেছেন, ঠিক আছে—

বাইবে এসে গৌবকিশোবেব কান্না পাচ্ছিল। পাঁচটি ভাই বোন তাঁবা, তিনিই বড। বাবা চোখ বোজাব সঙ্গে সঙ্গে শোকেব থেকেও তিনি চোখে অন্ধকাব দেখেছেন বেশি। ম্যানেজিং ডাইবেক্টবেব ঘব থেকে বেরুতে সেই অন্ধকাব আবো গাঢ হযে উঠেছিল।

অবাক একটু হযেছিলেন ঠিক দু'দিন বাদে। নতুন চিফ অ্যাকাউনটেন্ট নিজে এসেছিলেন বাবাব সমস্ত পাওনাগণ্ডা বুঝিযে মিটিযে দিতে। তাছাডা বাডতি এক হাজাব টাকা দিযেছেন বড সাহেবেব নাম কবে—বাবাব শ্রাদ্ধেব কাজেব বাবদ। হাতে টাকা নিযেও গৌবকিশোব ঠিক যেন বিশ্বাস কবে উঠতে পাবছিলেন না।

আব হতচকিত হযেছেন বাবাব কাজেব দিনে। ভাঙা বাডিব দবজায মস্ত ঝকঝকে গাডিটা থামতেও ঠাওব কবে উঠতে পাবেননি কে এলেন। বিমূঢ মুখে ছুটে এসে তাবপব গাডিব সামনে হাতজোড কবে দাঁডিযেছেন গৌবকিশোব।

শ্রাদ্ধবাসবে কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী মিনিট পাঁচেক বসেছিলেন। যাবাব আগে বলে গেছেন, কাজকর্ম চুকে গেলে অফিসে একবাব দেখা কোবো।

দেখা কবেছেন। এই দিন বড সাহেব তাঁকে বসতে বলেছেন। আলাপ কবেছেন। বাডিতে কে আছে না আছে খোঁজ নিযেছেন। চিন্তা কবেছেন একটু। তাবপব বলেছেন, মন দিযে পডাশুনা কবে যাও—তোমাব বাবা খুব বিশ্বস্ত কাজেব লোক ছিলেন, তুমি এম, এ পাশ না কবা পর্যন্ত কোম্পানী তাই তোমাব মাযেব নামে মাসে দু'শ টাকা কবে দেবে ঠিক কবেছে।

গৌবকিশোবেব চোখে জল আসাব উপক্রম। অল্প হেসে বড সাহেব বলেছেন, আব একটা কথা, এখন থেকেই একটু স্মার্ট হতে চেষ্টা কবো—এত সহজে ভেঙে পডলে চলবে না। আচ্ছা এসো, উইশ ইউ ভেবি ভেবি গুড লাক।

গোবকিশোব আবাব দেখা কবতে এসেছেন এক বছব পাঁচ মাস বাদে। এম, এ পবীক্ষাব ফল বেরুবাব পব।

তাঁকে দেখামাত্র উৎফুল্ল মুখে বড সাহেব হাত ধবে ঝাকিযে দিযেছেন। অর্থাৎ এবাবেব সুখববটা সেদিনেব সকালেব কাগজে দেখেছেন তিনি। বাবকযেক খুশি জ্ঞাপন কবে টেবিলেব বোতাম টিপে বেযাবাব তলব কবেছেন। দুই ছেলে, অর্থাৎ বড আব মেজ 'চ্যাটার্জী সাব'কে একসঙ্গে সেলাম দিতে বলেছেন।

ছেলেবা আসতে হাসিমুখে গৌবকিশোবেব সঙ্গে পবিচয কবিযে দিযেছেন তিনি। —আনন্দকিশোবেব ছেলে গৌবকিশোব, স্কুল-ফাইনালে শুধু পবীক্ষা খাবাপ কবে সেকেণ্ড হযে বসেছিল—তাবপব আই, এসসি-তে ফার্স্ট, বি, এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, আব এবাব এম, এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

পবিচয-পর্বে শুধু বড সাহেব নয, গৌবকিশোবেব সৌজন্যসূচক স্মার্টনেসেব অভাব ছেলেবাও লক্ষ্য কবলেন। কোম্পানীতে বিলেত-ফেবত এনজিনিযাব আছেন

চাবজন, সেখানে এম, এ-ব এই কৃতিত্ব বাবাব কাছে এমন বড ব্যাপাব হল কি কবে ছেলেবা বুঝলেন না।

বড সাহেব বললেন, তোমবা দুজনেই ওকে ভালো কবে কাজ-কর্ম শেখাবে। ...ওব ডেসিগনেশন কি হবে? বড ছেলেব দিকে ফিবলেন, এখন অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটাবী বলে অ্যাপযেন্টমেন্ট দাও, পবে দেখা যাবে।

সেক্রেটাবী বড ছেলে।

হাসিমুখে বড সাহেব গৌবকিশোবেব দিকে ফিবলেন, এঁদেব সঙ্গে যাও, খুব বুঝে-শুনে ভালো কবে কাজ-কর্ম কববে।

একটানা তিন বছব চ্যাটার্জী মেটালস-এব অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটাবী হযেই ছিলেন গৌবকিশোব। কাজে সুনাম কিছু হযেছে, কিন্তু সেটা চটকদাব সুনাম নয। দাযিত্বেব কাজ দিলে সেটা তাঁব দ্বাবা সুসম্পন্ন হবে কিনা বোঝা ভাব, অথচ শেষ পর্যন্ত হয ঠিকই। ফলে কাজ যাঁবা দেন তাঁবা নিশ্চিন্ত থাকতে পাবেন না সর্বদা। বড সাহেব ছেলেদেব জিজ্ঞাসা কবেন, কেমন?

তাঁবা বলেন, ভালই, তবে আনস্মার্ট।

কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী মাথা নাডেন, আনস্মার্ট ঠিক নয, ডিফবেন্ট টাইপ।

তাঁব মতলব বোঝা গেছে তিন বছব বাদে—বছব দুযেকেব চেষ্টায ছোট মেযে লোটি অন্যথায লতা চ্যাটার্জী যখন টেনেটুনে বি, এ পাশ কবে উঠলেন।

কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জীব তিন ছেলে, ছোট ছেলে গৌবকিশোবেব থেকে বছব দুযেকেব ছোট, আব লতাব থেকে বছব তিনেকেব বড। ছোট ছেলে সক্রিযভাবে চ্যাটার্জী মেটালস-এ ঢোকেননি তখনো। ওদিকে বড দুই ছেলেব পবে দুটি মেযে ছিল, আব ছোট ছেলেব পব লোটি—সর্বকনিষ্ঠা। বাপেব বেশি বযসেব মেযে, তাই তাঁব আদবও বেশি। বেশি আদবেব আবো একটু কাবণ আছে।

কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জীব এখন সর্বসাকুল্যে দুই মেযে। বড মেযে বিযেব দেড বছবেব মধ্যে আত্মহত্যা কবেছেন।

বড দুই মেযেব বিযে দিযে প্রচণ্ড ঘা খেযেছেন কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী। বড মেযেব বিযে দিলেন মস্ত বনেদী ঘব দেখে। মানুষ দেখেননি তেমন কবে। বড মেযেব আত্মহত্যাব পব একটানা বছবখানেক কেস চালিযেছিলেন তিনি মেযেব শ্বশুব-শাশুডী আব জামাইযেব বিরুদ্ধে। ফল হযনি।

মেজ মেযেবও ঘটা কবে বিযে দিযেছিলেন এক মস্ত ব্যবসাযীব ঘবে। বিশেষ অবস্থাপন্ন তাঁবাও। তাদেব আবাব চালচলন জাঁকজমক এত বেশি যে তাই থেকেই বিবোধেব সূত্রপাত। তাব ওপব মেজ জামাইযেব নাক তাঁদেব পবিবাবেব মধ্যে সব থেকে বেশি উঁচু। তুচ্ছ বেষাবিষি বড বিবোধে দাঁডিযেছে—মেজ জামাইটি নিজেও দূবে সবেছেন, মেযেকেও দূবে সবিযেছেন।

বড ঘবে মেযে দেবাব সাধ মিটেছে ভদ্রলোকেব। ছোট মেযেব বযস তখন ষোলও নয়, কিন্তু তখনই সঙ্কল্প কবেছেন আব বড ঘব নয। মেযেকে কাবো হাতে দেবেন না, ববং মেযেব হাতেব মুঠোয কাউকে এনে দেবেন।

তাই দিয়েছেন।

বিয়েটা যখন হয়েই গেল, অর্থাৎ কল্পনার আকাশকুসুম যখন সত্যিই বাস্তব জীবনে খসে পড়ল, গৌরকিশোরের বয়স তখন ছাব্বিশ—লতার একুশ। কিন্তু বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই তাঁদের বয়সটা বিপরীত খাতে বইতে লাগল। গৌরকিশোর বুঝি সবে না-বালকত্বের গণ্ডী ছাড়িয়েছেন, আর লতার পাকাপোক্ত সাবালিকার ভূমিকা।

ছোট মেয়ে, বাপের আদরের মেয়ে—বাবাকে পছন্দ করতেন, আর বাবার মুখে শুনেছিলেন চমৎকার ছেলে গৌরকিশোর—তাই চমৎকার যে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বিয়ের আগে তাঁকে দেখে ততটা চমৎকার লাগল না। বাবার কৃষ্ণকমল নাম ভারী ভালো লাগে তাঁর, গৌরকিশোর নামও সেই গোছের ভালো লেগেছিল। বেশ ধারালো অথচ একখানা মিষ্টি মুখ তিনি কল্পনা করেছিলেন। প্রথম দর্শনেই হোঁচট খেল। তারপর দিনে দিনে হোঁচট খেতে লাগল। ধারের চিহ্নও নেই কোথাও, আর মিষ্টি অর্থে যদি আনুগত্য হয়, তাহলে মিষ্টিই বটে।

ভিতরে বাইরে এমন এক বর্ণশূন্য লোকের সঙ্গে বাপ তাঁর বিয়ে দিলেন কি করে তিনি ভেবে পাননি। চেনা-জানা যে ক'টি লোক বিয়ের আশায় ঝুঁকেছিল বা ঝুঁকতে চেয়েছিল, তাঁদের যে-কেউ এর থেকে অনেক ভালো ছিল। লতার কেবলই মনে হত, অনুগত জামাই আনার তাড়নায় বাবা সব থেকে বেশি অবিচার করেছেন তাঁরই ওপর।

বিয়ের মাসতিনেকের মধ্যে শ্বশুরবাড়িতে বারকয়েক আনুষ্ঠানিক যাতায়াত করেছেন তিনি। জামাইকে ডেকে বাবা নিজেই তারপরে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিধবা মা বা ভাই-বোনদের প্রতি কর্তব্যের ব্যাপারে তাঁর সহানুভূতির অভাব নেই, কিন্তু মেয়ে সেখানে থাকতে পারবে না। তার বড় বাড়ির পাশে ছোট বাড়িটা মেয়ের কথা ভেবেই তিন বছর ধরে খালি রেখেছেন তিনি—মেয়েকে নিয়ে আপাতত সেখানেই থাকতে হবে। মেয়ের নামে অভিজাত এলাকায় বেশ খানিকটা জমি কেনা আছে —ধীরেসুস্থে সেখানে বাড়ি করা হলে তারপর অন্য ব্যবস্থা।

শ্বশুরের ব্যবস্থা জামাইয়ের মনঃপূত কিনা সে-প্রশ্ন অবান্তর। গৌরকিশোরের পৈতৃক বাড়ির সচ্ছলতায় সত্যিই টান ধরেনি, কিন্তু বিনিময়ে বড় কাছের একজনকে খোয়াতে হয়েছে তাদের। মাঝেসাঝে মাকে দেখতে আসেন গৌরকিশোর। এই আসাটাও কমে আসছে। এ নিয়ে বাড়ির কারো অভিযোগ নেই। থাকলেও মুখে অন্তত কেউ কিছু বলে না। কিন্তু দেখা হলে একজন বলেন।

সুমিতা।

গৌরকিশোরের এক মামীর বোনের মেয়ে। সুরসিকা আর ঠোঁট-কাটা। কাছাকাছি বাড়ি, তাই আত্মীয়তার থেকে ঘনিষ্ঠতা বেশি। এম, এ, পড়ার সময়ে মনের তলায় সুমিতাকে ঘিরে কিছু মিষ্টি সম্ভাবনাও উঁকিঝুঁকি দিত। খুব সংগোপনে। বছর আড়াই মোটা মাইনেয় চ্যাটার্জী মেটালস-এ চাকরি করার পর সেই সম্ভাবনা নিজের মধ্যেই দানা পাকিয়ে উঠেছিল। সুমিতার এম, এ, পরীক্ষার পরই একটা প্রস্তাব উত্থাপনের বাসনা ছিল গৌরকিশোরের। তার আগেই সব ওলট-পালট হয়ে গেল। অবশ্য সে-

জন্য চক্ষুলজ্জাব কাবণ নেই। সেই সাময়িক দুর্বলতাব খবব সুমিতাব জানাব কথা নয়। খেদও নেই। বিত্ত বা বৈভব ছেড়ে বড ঘবেব মেযেব রূপেব টানও অন্য বকম।

দেখা-টেখা হলে এই সুমিতাই ঠাট্টাব ছলে ঠাসঠোস কথা শুনিযে দেন। স্কুল মাস্টাবি কবে মুখ আবো টিলে হযেছে। এক মুখ হেসে সেদিন মাযেব সামনেই বলেছিলেন, বাবাবে বাবা, গৌবদা তুমি দেখালে বটে, বাধিকাব জন্যে স্বযং ব্রজকিশোবও এভাবে বজন ছেড়েছিল বলে শুনিনি।

মা বলেছিলেন, তুই থাম তো—

আবো বেশি হেসে সুমিতা প্রতিবাদ কবেছিলেন, আমি থামতে যাব কেন? আপনাদেব ঘবেব ছেলে, আপনাবা মুখ বুজে থাকুন।

বিযেব পব শ্বশুব স্টিল অ্যাণ্ড নেট অ্যাবিং-এব নতুন শাখা খুলেছেন। তাব সর্বময কর্তৃত্ব দিযেছেন ছোট ছেলে আব জামাইকে। আব পুবনো অফিস থেকে কিছু সুযোগ্য কর্মচাবীও দিযেছেন।

কিন্তু লতাব তবু দুশ্চিন্তা হযেছিল। ছোডদা আছেন সঙ্গে তাতে যেটুকু স্বস্তি। নইলে ওই মানুষেব আলাদাভাবে ব্যবসা দাঁড কবানোব ক্ষমতা আছে এ বিশ্বাস তাঁব আদৌ নেই।...আগাগোডা পবীক্ষায প্রথম হল কি কবে, তাব ওপব অঙ্কে, সেটাই তাঁব কাছে বিস্ময। সার্টিফিকেটগুলো না দেখলে বিশ্বাস হত না।

পাঁচ বছবে শাখা-প্রতিষ্ঠান ভালোই দাঁডিযেছে। লতাব বদ্ধ ধাবণা, বাবা চোখ বেখেছিলেন, ছোডদা আছেন, দবকাবমত বডদা-মেজদাও পবামর্শ দেন, তাব ওপব বিশ্বস্ত কর্মচাবীবা আছে—তাই দাঁডিযেছে। আব কাবো কোনো কৃতিত্বেব ছিটেফোঁটাও নেই।

বিযেব সাত বছবেব মধ্যে নতুন কোম্পানীব লাভেব টাকা দিযে লতাব জমিতে মস্ত বাডি উঠেছে। গৃহপ্রবেশে ঘটা কবে উৎসব কবা হযেছে।

তাবপব কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী চোখ বুজেছেন। স্টিল অ্যাণ্ড নেট অ্যাবিং-এব শিকড তখন পবিপুষ্ট। উইল-এ দেখা গেল, এই কোম্পানীব মালিকানাব সবটাই তিনি ছোট মেযে জামাইকে দিযে বেখেছেন। অন্যান্য বিষয-আশয এবং চ্যাটার্জী মেটালস তিন ভাইযেব।

অতএব ছোট ছেলে ভগ্নিপতিব ব্যবসাযেব সংস্রব ছেডে চ্যাটার্জী মেটালস-এ চলে এসেছেন। লতা বিমর্ষ এবং চিন্তিত হযেছিলেন। দাদাদেব বলেছিলেন, তোমবা চলে এলে ওব দ্বাবা ব্যবসা চলবে?

দাদাবা আশ্বাস দিযেছেন—তাবা চোখ ঠিকই বাখবেন, তাছাডা বিশ্বস্ত কর্মচাবীবা তো থাকলেনই।

লতাব ছাব্বিশ, গৌবকিশোবেব একত্রিশ।

যাব বীজ ভালো তাব ফসলও ভালই। দুর্ভাবনা সত্ত্বেও কোম্পানী যে বীতিমত জাঁকিযে উঠেছে, তাব পিছনে এটাই কাবণ ভাবেন মিসেস অধিকাবী। গৌবকিশোবই এ ব্যবসাব হর্তা-কর্তা বিধাতা বটে, কিন্তু ভাগ্য চাবদিক থেকে নিবাপদ প্রহবায একজন অতি সাধাবণ মানুষকে ওইখানে এনে তুলেছে, এই ধাবণা তাঁব একটুও বদলাযনি।

ছেলেপুলে এখনো হযনি। তাব কাবণ মিসেস অধিকাবী এখনো তা চাননি। একতিবিশেও একুশেব থেকে বেশি মন দিযে সাজ-সজ্জা কবেন। সেটা ববং দিন-কে-দিন সূক্ষ্মতব হচ্ছে। গাযেব জামা আব শাডিব মাঝে আডাই আঙ্গুলেব জাযগায এখন চাব আঙ্গুল কোমব দেখা যায। কাঁধখোলা মিহি ব্লাউসেব টেপ ক্রমে গলাব দিকে ঘেঁষছে। পোশাক-আশাকেব ম্যাচিংএ অভিনবত্ব আসছে। বক্ষদেশেব সম্ভাবে বিভ্রম ছডানোব ললিত প্রযাস স্পষ্টতব হযে উঠছে। প্রসাধনেব পাবিপাট্য বেডেছে। অভিজাত এলাকায হাই সোসাইটিব চটকদাব পুরুষ-বমণীব আনাগোনা বেডেছে।

গৌবকিশোবেব অবকাশ কম। প্রচুব খাটেন। আবো খাটলেও আপত্তি নেই লতা অধিকাবীব। তাঁব এ-দিকটা নিজস্ব দিক, সংস্কৃতিব দিক, মনেব পুষ্টিব দিক। অতএব গৌবকিশোব মুখ বুজে কাজ কবেন আব লতা বা লোটি অধিকাবী ঘণ্টা দেডেক কেশ-বিন্যাস কবে ক্লাবে যান, ফাংশানে যান, পার্টিতে যান। কিন্তু হাই সোসাইটিব বীতি অনুযাযী যুগল উপস্থিতিবও প্রযোজন হয অনেক সময। স্ত্রীব কাছে তখনই শুধু তাডা খেতে হয গৌবকিশোবেব। বলেন, তোমাকে নিযে বেরুতে হলেই আমাব ভাবনা হয, ঠিক-ঠাক হযে নাও। নিজেব ঠিক-ঠাক হওযাব দিকে এই একজনেব অবাধ্য দৃষ্টি বাব কযেক ঘুবতে দেখলেও ধমকে ওঠেন, হ্যাংলাব মত চেযে থেকো না, আব পার্টিতে গিযে আমাব পিছনে ঘুবো না—নাও চলো।

অথচ অনুষ্ঠানেব কোনো সুপুরুষ যখন উচ্ছ্বসিত হযে ওঠেন,—ইউ লুক এক্সকুইজিট ম্যাডাম—তাব হাতে হাত বেখে স্ত্রীটিকে বিগলিত হতে দেখেন গৌবকিশোব। বলতে শোনেন, থ্যাঙ্ক ইউ—।

বোকা-বোকা মুখ কবে আবো কিছু লক্ষ্য কবেন গৌবকিশোব। কাবো সঙ্গে শুধু অন্তবঙ্গতা, কাবো সঙ্গে বা বেশি। এবই মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিবিবিলিতে স্ত্রীব সেই বেশি অন্তবঙ্গতাব রূপটাও গৌবকিশোবেব নির্বাক চোখে বসে গেছে। একা বেরুলে স্ত্রীব অনেকদিনই ফিবতে বাত হয—এতেও প্রায অভ্যস্তই হযে উঠেছেন তিনি।

মিসেস লোটি অধিকাবীব স্বাভাবিক দিনযাপনেব সামান্য একটু অস্বস্তিব ছাযা পডল সেদিন হঠাৎ।

নিজেব চেকবই দুটো যে কোথায বেখেছেন খুঁজে পাচ্ছেন না। গৌবকিশোব দাডি কামাচ্ছিলেন। স্ত্রী কিছু দবকাবী জিনিস পাচ্ছেন না মনে হতে জিজ্ঞাসা কবলেন, কি খুঁজছ?

—চেকবই দুটোব একটাও পাচ্ছি না, এক্ষুনি দবকাব।

গৌবকিশোব বললেন, সেদিন তোমাব টেবিলেব ওপব পডেছিল দেখে কোথায বাখলাম ..ওই আলমাবিতে দেখো তো।

দেখলেন নেই।

—তা'হলে ও-ঘবে আমাব সুটকেসে বেখেছি বোধ হয...দেখছি।

অপেক্ষা কবাব সময নেই মিসেস অধিকাবীব। বিবক্ত।—তোমাব সবেতে গোলমেলে কাণ্ড, টেবিলেব ওপবে ছিল—ড্রযাবে বেখে দিলেই তো হত।

ও-ঘরে গিয়ে নিজেই সুটকেস খুললেন। চেকবই পেলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যে দুটো জিনিস চোখে পড়ল, তাতেই অবাক তিনি। একটা ফোটো আর নামকরা দোকান থেকে কেনা একটা শৌখিন শাড়ির প্যাকেট।

ফটো একটি মেয়ের। হাসিমুখ, চেহারাও মন্দ নয়। বেশ স্মার্ট। আর প্যাকেটে কম করে তিনশ সাড়ে তিনশ টাকা দামের শাড়ি একটা।

লতা অধিকারী প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন একটু। এ দুটো বস্তু এখানে কেন বোধগম্য হল না। চেকবই পাওয়ার তাড়া ভুলেছেন আপাতত। ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সুটকেসে এক মেয়ের ফটো দেখলাম, কার?

সাবান মাখানো মুখখানায় একটু ব্যস্ততাও লক্ষ্য করলেন যেন।

গৌরকিশোর জবাব দিলেন, আ...আমার ভাইয়ের জন্য, মানে সত্যর জন্য এক জায়গায় মেয়ে দেখতে গেছলাম...ভদ্রলোক ধরেছিলেন, তাঁরাই দিয়ে দিলেন।

স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যে-ভাবে বললেন স্ত্রীর সেটাই বিরক্তির কারণ। দশ বছরেও যদি কথাবার্তা সপ্রতিভ হত একটু!—আর, শাড়ির প্যাকেট দেখলাম, সেটা কার?

—ইয়ে, এক বন্ধুর বিয়ে, দেব বলে কিনেছি।

এই জবাবটা কেন যেন খুব সরল ঠেকল না কানে। দোকানে গিয়ে নিজে পছন্দ করে এরকম শাড়ি কিনে নিয়ে আসতে পারে ধারণা ছিল না।—দামী শাড়ি মনে হচ্ছে কে বন্ধু? কবে বিয়ে?

নাম করে দিলেন একজনের। বললেন, খুব পুরনো বন্ধু। আজই বিয়ে—মানে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ।

—তোমার একার নেমন্তন্ন?

—হ্যাঁ, তুমি যেতে পারবে না বলে দিয়েছিলাম।

—পারি বা না পারি তোমার বলার কি দরকার ছিল? আর শাড়ি কিনেছ, আমাকে দেখাওনি কেন?

বিপদগ্রস্তের মত শেভিংএ মন দিলেন গৌরকিশোর।

ব্যাপার কিছুই নয়, তবু ভিতরটা একটু খুঁত-খুঁত করতে লাগল লতা অধিকারীর। তাকে না জানিয়ে বন্ধুর ভাবী বউয়ের জন্য আড়াইশ তিনশ টাকা দিয়ে শাড়ি কেনা হয়েছে, হলে হতেও পারে।

গৌরকিশোর তাঁর অলক্ষ্যে শাড়ি আর ফটো বার করে নিয়ে অফিসে চলে গেলেন।

বেলা চারটে নাগাদ অফিস থেকে বেরুলেন। আজও মা আর বোন তাঁকে দেখে খুশি। ভাইয়েরা বাড়ি নেই। কিছুদিন ধরে একটা পরিবর্তন চোখে পড়ছে সকলেরই। বিশেষ করে মায়ের। ছেলে প্রায়ই আসছে, তাদের সকলকে নিয়ে সেদিন গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বর থেকে বেড়িয়ে এনেছে—সুমিতা এসেছিল, তাকেও জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। আনন্দে মায়ের চোখে জল এসেছিল। হৈ-চৈ আনন্দের মধ্যে কেটেছে—ছেলে সকলের একসঙ্গে আর আলদা আলাদা সকলের ফটো তুলেছে।

সেদিনও গৌরকিশোর হাসি-খুশি। শাড়ির প্যাকেট বোনের হাতে দিলেন, নে, এটা তুই পরিস।

শাড়ি দেখে বোনের আর সেই সঙ্গে মায়েরও চোখ ঠিকরোবার উপক্রম। এ রকম দামী বেনারসী পরা দূরে থাক, বোন হাতে নিয়েও দেখেনি।—এ তুমি আমার জন্যে কিনে আনলে নাকি দাদা।

নির্লিপ্ত মুখে গৌরকিশোর বললেন, কিনে না তো কি আমি বেনারসী বানাচ্ছি।

মা বলেছেন, যত্ন করে তুলে রেখে দে, পরে কাজে লাগবে।

বোন মুখ লাল করে উঠে গেছে। পরে গৌরকিশোর তার মুখেই শুনেছেন, সুমিতাদি আগামী পরশু দিল্লী চলল, সেখানে কি একটা ভালো চাকরি পেয়েছে।

গৌরকিশোরকে অন্যমনস্ক দেখা গেল একটু। ঠিক এরকম খবর আশা করেননি। খানিক বাদে আবার গাড়িতে উঠলেন। তখনো চিন্তামগ্ন।

গাড়ি সুমিতাদের বাড়ির দরজায় থামল। সুমিতা তাঁকে দেখে অবাক প্রথম, পরে খুশি। আদরযত্ন করে বসালেন, পরে ঠাট্টাও করলেন, এই বাড়িতে ওই গাড়িসুদ্ধ তার মালিক হাজির—কি ব্যাপার?

গৌরকিশোর বললেন, দিল্লীবাসিনী হচ্ছ শুনলাম, তাই এলাম দেখা করতে।

সুমিতা হাসলেন, আমার দিল্লী যাত্রার ভাগ্য বটে।

—কবে যাচ্ছ?

—এই তো পরশু, প্রথমে পাটনায় দিদির কাছে যাব, সেখানে দুদিন থেকে দিল্লী।

—পাটনার গাড়ি কটায়?

—বিকেল পাঁচটা পঁয়ত্রিশে শুনলাম, কেন, সী অফ করতে যাবে?

গৌরকিশোর হাসলেন। কিন্তু তিনি দ্রুততালে চিন্তাও করেছেন কিছু। বললেন, যেতে পারি, বলো তো স্টেশনে পৌঁছেও দিতে পারি।

—কি ভাগ্যি! বিশ্বাস করতে বলছ? দিলে তো বেঁচে যাই, আমার সঙ্গে আবার একগাদা মালপত্র।

—ঠিক আছে আমার গাড়িও ছোট নয়। সাড়ে তিনটেয় গাড়ি তোমার দরজায় হাজির হবে, সোয়া চারটের মধ্যে তুমি আমার অফিসে পৌঁছচ্ছ—পনের মিনিটের মধ্যে তুমি আমার অফিস দেখবে আর এক পেয়ালা চা খাবে—ঠিক সাড়ে চারটেয় আমরা বেরিয়ে পড়ব।

—আবার তোমার অফিসে নামব।

—নিজের হাতে গড়লাম, একদিন দেখবেও না?

অতএব সুমিতা সানন্দে রাজি হয়েছেন।

এখানেও এক দফা চা খেয়ে গৌরকিশোর ওঠার আগে ব্যাগ খুলে ফটো বার করে তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন।—নাও, তোমার ফটো যখন, এক কপি তোমারও প্রাপ্য।

ফটো পেয়ে সুমিতা আরো খুশি। জিজ্ঞাসা করলেন, অনেক তো তোলা হয়েছিল সেদিন, আর সকলের কই?

—ডেভেলপ করা হয়নি এখনো, পরে পাঠাব'খন।

গাড়িতে বসে আবার চিন্তাচ্ছন্ন গৌরকিশোর। বাড়ি ফিরলেন। স্ত্রী বাড়িতে নেই। ভাবনার অনুকূল অবকাশ পেলেন। কিন্তু যা ভাবছেন, তার সুরাহা ঠিক হল না যেন।

পরদিন অফিসেও চিন্তামগ্ন। আগামী কাল ঠিক পাঁচটায় স্ত্রীর সঙ্গে একটা জরুরী সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন সৃষ্টি করা দরকার। ঠিক সেই সময়ে একসঙ্গে দু'জনের কোথাও এক পার্টির নেমন্তন্ন থাকলেও বেঁচে যেতেন।

নেই। ফাইল সব টেবিলে পড়ে থাকল, গভীর ভাবনায় গৌরকিশোর তন্ময়।

হঠাৎ সচকিত তিনি। মনে পড়েছে কিছু। ভিতরে চাপা উত্তেজনা। ঠাণ্ডা হয়ে বড় শালাকে টেলিফোন করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, সকলে মিলে কেনার জন্য সেদিন একটা জমি দেখার কথা বলছিলেন, সেটা কোথায়?

ওধার থেকে জবাব এলো, তোমার বাড়ি থেকে গাড়িতে মিনিট পনেরর পথ।

—ঠিক আছে, কাল চলুন তাহলে—এর মধ্যে কালই তবু বিকেলের দিকে একটু ফ্রী আছি।

পরদিন বিকেলেই জমি দেখতে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা হল। বিকেল পাঁচটা থেকে পাঁচটা দশ মিনিটের মধ্যে দুই শালা তাঁর বাড়িতে আসবেন। গৌরকিশোরও অফিস থেকে তার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছুবেন। তারপর লতাকে নিয়ে সকলে মিলে জমি দেখতে যাবেন।

পরদিন দাদাদের সঙ্গে জমি দেখতে যাওয়ার প্রোগ্রাম লতা রাত্রিতে শুনলেন। দাদারা যাতে আছেন তাতে তাঁরও আগ্রহ স্বতঃস্ফূর্ত। অতএব তিনি সানন্দে রাজি।

পরদিন অফিস যাবার আগে তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন, পাঁচটার একটু আগেই চলে এসো, দেরি কোরো না—তোমার তো আবার যা সময়ের জ্ঞান—

অফিসে এসে সেদিন আর ফাইল স্পর্শও করলেন না গৌরকিশোর।

সময়মত সুমিতার বাড়িতে গাড়ি গেল, আর সময় ধরেই সুমিতা এলেন।

সকলে ধরে নিলেন তেমন বিশিষ্ট মহিলাই কেউ এসেছেন, নইলে বড় সাহেব নিজে বেরিয়ে এসে আদর করে তাঁকে নিয়ে যেতেন না।

ঘড়ি ধরে ঠিক সাড়ে চারটেতেই সুমিতাকে নিয়ে হাসিমুখে ঘর থেকে বেরুলেন গৌরকিশোর। দু'পা এগিয়েই কি বুঝি মনে পড়ল তাঁর। বললেন, এক মিনিট—

আবার ঘরে ঢুকলেন। টেলিফোন তুলে মৃদু গলায় অফিসের অপারেটর গার্লকে নির্দেশ দিলেন কিছু। তারপর বিসিভার রেখে বেরিয়ে এলেন।

ঠিক পাঁচটা বাজতে লতা অধিকারীর মুখ গম্ভীর। দাদারা মিনিট তিনেক আগে এসে গেছেন, কিন্তু এই লোকের দেখা নেই। পাঁচটা বেজে পাঁচ হতেই বিরক্তির তাপ বাড়ল। পাঁচ মিনিট পর্যন্তই তিনি সময়ের হেরফের সহ্য করে থাকেন। গমগমে মুখে দাদাদের কাছ থেকে উঠে এসে শোবার ঘরে ঢুকে টেলিফোন তুলে নিলেন। অফিসের নম্বর ডায়েল করতে অপারেটর মেয়ের সাড়া পেলেন।

—মিঃ অধিকারী প্লীজ।

নির্দেশমতই অপারেটর সবিনয়ে জানালো, তিনি তো নেই, মিসেস অধিকারী এসেছিলেন—একটা জরুরী কাজে তাঁর সঙ্গে তাঁকে বেরুতে হয়েছে।

স্পষ্ট শুনেও লতা অধিকারী ঠিক বুঝলেন না। বিস্মিত এবং দ্বিগুণ বিরক্ত। —কে এসেছিলেন?

—মিসেস অধিকারী।

লতা বিমূঢ়।—মিসেস অধিকারী কোথায় এসেছিলেন?

—আজ্ঞে, অফিসে।

—মিঃ অধিকারী তাঁর সঙ্গে বেরিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কে কল করছেন বলুন, মিঃ অধিকারী কাল এলে জানাব—

—মিসেস অধিকারী।

রিসিভার আছড়ে রাখলেন তিনি। ওদিক থেকে টেলিফোনের মেয়েটা হতভম্ব।

সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ লতা অধিকারীর। মাথার মধ্যে কি যেন ওলট-পালট হতে শুরু করেছে। বুদ্ধিও ঘুলিয়ে যাচ্ছে কেমন। ঘর থেকে বেরুলেন প্রায় দশ মিনিট বাদে। দাদারা জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, কি হল?

তিনি বললেন, হঠাৎ কি জরুরী কাজে বেরিয়ে যেতে হয়েছে শুনলাম। আজ আর হবে না দাদা, কতক্ষণ অপেক্ষা করবে—

তাঁরাও বিরক্তি চেপেই উঠে গেলেন।

একলা বাড়িতে লতা অধিকারী জ্বলতে থাকলেন। ঠাণ্ডা মাথায় যত বেশি ভাবতে চেষ্টা করছেন, ততো বেশি জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কানে মাথায় বারকয়েক জল দিয়েছেন। ভাবতে চেষ্টা করেছেন, হতেও পারে আর কোনো মিসেস অধিকারী।...হয়ই যদি আর কেউ, সে এমন কে যার জন্যে বাড়ির অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাও মনে থাকল না...মনে থাকলে টেলিফোনে জানিয়ে দিল না কেন?

বিকেল গেল, সন্ধ্যা পার হল—এখনো দেখা নেই। হিজিবিজি চিন্তায় ভিতরটা তেতেই উঠছে ক্রমশ।. .অত দামের শাড়ি কিনে এনে চুপচাপ বাক্সে রাখা হয়েছিল কার জন্যে?...ওই ফটোই বা কার? যে-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সেখানকার ভাইয়ের জন্যে মেয়ে দেখতে গেছল...ঠিক বিশ্বাস করা যাচ্ছে না কেন এখন? মিসেস অধিকারী এসে মিঃ অধিকারীকে ডেকে নিয়ে গেল...সকলে কোন মিসেস অধিকারী ভেবেছে?

লতা অধিকারী কেবল বসছেন উঠছেন ঘরে বারান্দায় ঘুরপাক খাচ্ছেন। ভাবতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু অসহ্য রাগে ভাবতে কিছুই পারছেন না।

গৌরকিশোর ফিরলেন রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টায়। সুমিতার গাড়ি ছাড়ার পর স্টেশন থেকে বেরিয়ে কি ভেবে দমদম চলে গেছলেন তিনি। এরোড্রামে একটানা দু'ঘণ্টার ওপর বসে থেকে তারপর উঠে চলে এসেছেন।...ড্রাইভারকে জেরা করবে না হয়ত, সেখানে কালচারের প্রশ্ন। আর করেই যদি, ধরা পড়তে আপত্তি নেই। ধরা পড়ার আশাতেই তো এত কিছু।

অন্য দিন লতা চোখ তুলে তাকান না, আজ শুধু তাকিযেই বইলেন। স্ত্রীব মেজাজ-পত্র সুবিধেব নয, জামাকাপড বদলাবাব ফাঁকে গৌবকিশোব শুধু এটুকুই লক্ষ্য কবলেন যেন।

মিনিট পাঁচ সাত দু'চোখ দিযে ওই মুখ ফালা-ফালা কবে ভিতবে দেখতে চেষ্টা কবলেন লতা অধিকাবী। লোকটাব ওই বিডম্বনা অভিব্যক্তি কেন যে মেকী মনে হ'ল জানেন না।—এতক্ষণ কোথায ছিলে?

—একটু কাজে আটকে পডেছিলাম।

—দাদাদেব সঙ্গে অ্যাপযেণ্টমেণ্ট কবে কাজে আটকে পডলে কেন?

গৌবকিশোববাবু যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কাই খেলেন হঠাৎ। কিছু মনে পডেছে —সমস্ত মুখে সেই চকিতবিমূঢ় অভিব্যক্তি। ঢোক গিললেন, তাবপব আমতা আমতা কবে বললেন, হঠাৎ বেবিযে পডতে হল...ইযে, ঠিক খেযাল ছিল না। আবাব ঢোক গিললেন।—তু-তুমি অফিসে আমাব খোঁজ কবেছিলে নাকি?

বমণীব দুই চোখ তাঁব মুখেব ওপব আবো যেন কেটে কেটে বসছে। তিনি চোব ধবেননি, গোবেচাবা-মুখ একটা ডাকাত ধবেছেন যেন। জবাব দিলেন না, শুধু প্রশ্নই কবলেন।—তুমি কোন কাজে আটকে গেছলে?

মিথ্যে বললে ধবা পডাব সম্ভাবনা, এই ভযেই যেন সত্যি জবাব দিলেন।—এই...একজনকে তুলে দিতে গেছলাম—

—কাকে তুলে দিতে গেছলে?

—একটি মে-মানে—মহিলাকে।

—কোথায তুলে দিতে গেছলে?

—দমদম এবোড্রামে।

—তাঁব নাম কি?

ঢোঁক গেলাটা এবাবে বড বেশি স্পষ্ট হযে ধবা পডল লতাব চোখে।

—বমা।

—বমা কি?

—ব্যানার্জী...

দুই চোখে নিঃশব্দে ওই মুখ আব এক প্রস্থ দগ্ধে দিলেন লতা অধিকাবী। মিসেস অধিকাবী তাহলে কে, জিজ্ঞাসা কবতে গিযেও কবলেন না। যা বোঝবাব ঠিকই বুঝেছেন, আবো কিছু বোঝা দবকাব।

—তিনি কোথায গেলেন?

—লণ্ডন।

—একা?

—হ্যাঁ, আগেও একবাব গেছল, অক্সফোর্ডেব এম, এ। সেখানকাব ইকনমিক বিসার্চ অর্গ্যানিজেশনে বড চাকবি নিযে গেল, এখানেও এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টেব বড অফিসাব ছিল।

—তুমি তাঁকে চিনলে কি কবে?

—বি, এ-তে অঙ্ক ছিল, আমার কাছ থেকে অঙ্ক বুঝে নিত।

লতা অধিকারী দেখছেন। দেখছেন দেখছেন দেখছেন।—প্লেন কটায় ছেড়েছে?

—রাত সাড়ে আটটায়।

—তুমি সাড়ে চারটেয় বেরিয়েছিলে কেন?

—কিছু, মানে—কেনাকাটা ছিল—

আর কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই। শেষরাত্রের মত ওই মুখ ঝলসে দিয়ে লতা অধিকারী বেরিয়ে এলেন। তারপর রাতের মধ্যে আর ওই ঘর-মুখো হলেন না। পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রায় সমস্ত রাত ধরে জ্বললেন আর ছটফট করলেন। ওই শাড়ি কার জন্যে কেনা হয়েছিল, আর ওই ফটোই বা কার—খুব ভালো করেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। জীবনে এরকম স্তম্ভিত আর তিনি হননি। গোরেচারার মুখোশপরা এত শয়তানী তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। পাছে অফিসের কেউ কিছু মনে করে এজন্যে মিসেস অধিকারী বলে চালানো হয়েছে ওই মেয়েটাকে—এতখানি ধূর্ত। অফিসে প্রায়ই যাতায়াত ছিল নিশ্চয়, একদিন দু'দিন হলে লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার দরকার হত না। জীবনের মতই শিক্ষা দেবেন তিনি, কিন্তু কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না বলেই একটুও শান্ত হতে পারছেন না।

একদিন দু'দিন বা একবছর দু'বছর নয়—ওই লোক একটানা দশ বছর ধরেই চোখে ধুলো দিয়ে এসেছে তার। নিজের বোকামিটাই থেকে থেকে বড় হয়ে উঠছে। সত্যি সত্যি গোরেচারা হলে আই, এস-সি থেকে এম, এ, পর্যন্ত একটানা ফার্স্ট হয় কি করে, এটা তার ভাবা উচিত ছিল।.. সেও আবার অঙ্কে। নির্বোধ হলে তার অত বুদ্ধিমান বাবা তাকে জামাই করতেন না, এ সত্য আজ নতুন করে চিন্তা করতে হল। আর মগজের সে-রকম জোর না থাকলে দেখতে দেখতে ব্যবসা এত বড় হয়ে উঠত না, তাও এই রাতেই প্রথম উপলব্ধি করলেন। শুধু তাই নয়, অক্সফোর্ডের এম, এ, পাস মেয়ের অত খাতির পেতে হলে মাথায় যে বেশ কিছু থাকা দরকার, তাও হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন তিনি।

মাথার মধ্যে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। এই বাড়ি তাঁর, ওই ব্যবসায়ও তাঁরই বাবার টাকায়। অনেক কিছুই করতে পারেন তিনি। কিন্তু সেভাবে হেস্তনেস্ত করার মত আর আক্রোশ মেটার মত কিছুই ভেবে উঠতে পারছেন না।

দিন কাটতে লাগল। একটা দুটো করে মাসও।

লতা অধিকারীর ক্লাবে যাওয়া কমে এলো, ফাংশনে যাওয়া কমে এলো, পার্টিতে যাওয়া কমে এলো, কমতে কমতে বন্ধই হয়ে এলো একসময়। উষ্ণ আপ্যায়নের অভাবে চটকদার পুরুষ-রমণীদের আনাগোনায় ভাটা পড়ল। প্রসাধনের একাগ্রতায় ছেদ পড়ল, ম্যাচিংএ অভিনবত্ব রচনার ঝোক গেল, টেপ ব্লাউস গলা থেকে সরতে সরতে ক্রমে কাধ ঢেকে দিতে লাগল, গায়ের জামা আর শাড়ির মাঝের ফারাক সঙ্কীর্ণতর হতে থাকল।

সমস্ত অবকাশ শুধু একজনের প্রতি সজাগ লক্ষ্য আর প্রহরায় নিবিষ্ট হল।

লতা অধিকারী প্রথম সন্তানের জননী হলেন বত্রিশ বছর বয়সে—ছেলে। দ্বিতীয় সন্তান এলো সাড়ে তেত্রিশে—ছেলে। তৃতীয় সন্তান এলো ছত্রিশে—ছেলে।

লতা অধিকারী অসহিষ্ণু বিবতি ঘোষণা কবলেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতে আব একজনেব অভিলাষ টেব পেযে তপ্ত হযে উঠলেন—একটি মেযেব বাসনা। সবোষে একটানা বছব দুই বাসনা নাকচ কবে চললেন।

তাবপব চতুর্থবাব এবং শেষবাব নার্সিংহোমে এলেন ঊনচল্লিশ বছব বযসে। এবাবও ছেলে।

পবদিন গৌবকিশোব নার্সিংহোমেব ঘবে এসে দাঁডালেন মাত্র, তাঁব মুখেব ওপব এক পলক আগুন ছডিযে লতা অধিকাবী ঝাঁঝিযে উঠলেন, হযেছে? ফেব কাছে ঘেঁষবে তো তোমাকে আমি—

কি কববেন সেটা আব সম্পূর্ণ কবে উঠতে পাবলেন না। সেই চিবাচবিত গোবেচাবা-মূর্তি দেখে গা জ্বলল তাঁব। সবোষে পাশ ফিবলেন।

লতা অধিকাবীব আটান্ন আব গৌবকিশোবেব তেষট্টি।

এ পর্যন্ত সমান দাপটে স্বামী শাসন কবে এসেছেন লতা অধিকাবী, ওই মুখেব সদা গোবেচাবা ভাব আজও তাঁব চক্ষুশূল। শাসন দেখে মনে মনে ছেলেবাও মাযেব থেকে বাপেব প্রতি বেশি সদয।

বাইবে তাঁবা আদর্শ অভিজাত দম্পতি। কোনো সভা বা অনুষ্ঠানে একজনকে ছেডে আব একজনকে দেখেনি কেউ। অল্পবযসী ছেলেবা বলে কাযাযুক্ত ছাযা যথা—

সেদিনও কি এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব কবতে গেছলেন গৌবকিশোব। লতা অধিকাবী যথাবীতি তাঁব পাশে প্রধানা মহিলাব আসন গ্রহণ কবেছেন। সভাপতিব চিবাচবিত সংক্ষিপ্ততম ভাষণেব ভূমিকা শুনে লতা অধিকাবীব গা জ্বলেছে। গৌবকিশোব বলেছেন, বক্তৃতা কবাব মত অত চালাকচতুব বা চৌকস নন তিনি, অতএব কি আব বলবেন...।

বাডি ফিবেই বিব্রত মুখ কবে স্ত্রীকে জানালেন, শবীবটা কেমন যেন কবছে, ভালো লাগছে না।

বক্তৃতায টিকা-টিপ্পনী কেটে এসে এখন একটু সদয দৃষ্টি আকর্ষণেব ছল কিনা, মুখেব দিকে চেযে সেটাই আগে বুঝতে চেষ্টা কবলেন লতা অধিকাবী। কিন্তু খটকা লাগল কেমন।

গৌবকিশোব ঠাণ্ডা জল চেযে খেলেন এক গেলাস। শুযে পডলেন। শবীবেব সমস্ত বক্তকণাগুলো যেন জ্বলছে আব গাযে আলপিন ফোটাচ্ছে। বুকেব একদিকে যন্ত্রণাও বোধ কবছেন। মাথাব উপব পুবোদমে পাখা ঘুবছে কিন্তু তিনি ঘামছেন। চোখে ঝাপসা দেখছেন। স্ত্রীকে তাডাতাডি ঘব ছেডে চলে যেতে দেখলেন। একটু বাদে ফিবে এসে মুখেব ওপব ঝুঁকে পডেছেন তাও টেব পেলেন। ছেলেবা ঘবে ঢুকেছে, দু'জন আবাব ছুটে বেবিযেও গেল মনে হল। চোখ টান কবে স্ত্রীব মুখখানাই দেখতে চেষ্টা কবলেন তিনি। মাথাব ভিতবে সবকিছু গণ্ডগোল হযে যাচ্ছে, বক্তেব জ্বালা বাডছে, আব ফাঁকে ফাঁকে কি যেন মনে কবতে চেষ্টা কবছেন তিনি। ভবিষ্যৎ গণনায পটু এক বন্ধুকে কবে যেন কি দেখতে পাবেন কিনা জিজ্ঞাসা কবেছিলেন...

গৌবকিশোব চোখ বুঝলেন। আব তাকালেন না।
লতাব চোখে জল দেখতে চেযেছিলেন গৌবকিশোব।
লতা অধিকাবী অঝোবে কাঁদছেন।
গৌবকিশোব দেখছেন কি?

দুজনার ঘর

তৃতীয মানুষ এলে দু'জনাব ঘব টেঁকে না।
অনেক, অনেক মূল্য দিযে তবে এই সাব জেনেছে কাজললতা।

বিস্ময়েব তাড়নায তাব ভয় উবে যাবাব দাখিল। অনেকক্ষণ সঙ্গোপনে দূবে দাঁড়িযে দেখেছে। জমজমাট মনে হযেছে দোকানটা। জলুস বেড়েছে, লোকজন বেড়েছে, খদ্দেব বেড়েছে। দেখছিল আব বুকেব তলায কাটা-ছেঁড়াব ওপব যেন এক ধবনেব খুশিব প্রলেপ পড়ছিল।

কিন্তু নিভৃতেব বোমাঞ্চ মিলিযে আসতে চোখেব নজব বাড়ছিল। কাজললতাব খটকা লাগছে কেমন। অত দূব থেকে ভালো ঠাওব কবতে পাবছে না। যদিও ওখানকাব ভিতবেব আলো দিনেব আলোব মত সাদা। তবু কি যেন এক ব্যতিক্রম উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। একটাও চেনা মুখ চোখে পড়ছে না। পাযে পাযে এগোলো আবো একটু। জনা দুই অল্প বযসেব ছেলে কাজ কবছে, আব তিনটি মেযে। আঠেবো থেকে বাইশ চব্বিশেব মধ্যে হবে মেযেগুলোব বযেস। কাজললতা আবো একটু এগিযে তাদেব দেখছে ভালো কবে। চোখেব দৃষ্টিটা খবখবে হযে উঠছে। এ আবাব কি? এ কি দেখছে কাজললতা?

নিজেব জীবন যাত্রা যেমনই হোক, সকল সংশযেব উর্ধ্বেব কোনো উগ্র শুচিসুদ্ধ মানুষকে জীবনেব জটিল বাস্তায চলতে দেখলে মন হঠাৎ যেমন ধাক্কা খায, ওই মেযেগুলোকে দেখে প্রায তেমনিই একটা ধাক্কা খেযে উঠল কাজললতা।

নিজেব অগোচবে পাযে পাযে আবো একটু এগলো সে।

সুন্দব দূবে থাক, তেমন সুশ্রীও নয একটা মেযেও। তবে সাজগোজে শ্রী বাড়াবাব চটক আছে। যে চটকে শ্রী আসলে নিষ্প্রভ হয, কিন্তু চোখ টানে। পবনে উগ্র বঙেব শাড়ি, গাযে গলা ঘেঁষা টেপ ব্লাউস, হাতে এক এক বোঝা বঙবেবঙেব কাচেব চুড়ি, গালে ঠোঁটে বঙ।

এই বৈচিত্রোব বৃদ্ধি একদিন কাজললতাই দিযেছিল। জীবিকার্জনেব সেই যুগ্ম আসবে সে-ই প্রথম এবং একমাত্র নাযিকা ছিল। কিন্তু এ আবাব কি? লোকটা কি এতদিনে তাহলে এই জটিল যুগে তাল ঠুকে চলাব সহজ বাস্তাটা চিনে ফেলেছে? কাজললতা যখন ওই আসবেব নাযিকা ছিল, তখুনো হযত লক্ষ্যেব তফাৎ ছিল না খুব। কিন্তু এ যেন বাতেব নিভৃতে প্রত্যাশাব তাগিদে ঘবেব স্ত্রীব কাছে আসা আব

গণিকালযে যাওযাব মধ্যে যেটুকু তফাৎ, অনেকটা সেই বকম। রুচিব তফাৎ, শালীনতাব তফাৎ।

নিজেব অজ্ঞাতে আবো কাছে এসে দাঁড়িযেছে কাজললতা। প্রায দোকানেব সামনেই।

তাবপব দ্বিতীয ধাক্কা। ব্যস্ততাব ফাঁকে ফাঁকে ওধাবেব ক্যাশবাক্সেব সামনে মালিকেব নির্দিষ্ট আসনটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে জাঁকিযে বসে আছে সম্পূর্ণ একজন অচেনা লোক।...বছব পঁযত্রিশ ছত্রিশ হবে বযস, বোগা, ঢ্যাঙা, পবিপাটি সাজ। উঠছে, তদাবক কবছে, আবাব গিযে বসছে, চোখ ঘুবিযে ঘুবিযে চাবদিকে নজব বাখছে, ক্যাশবাক্সে টাকা তুলছে।

দোকানেব প্রায দবজায দাঁড়িযেই নির্বাক বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকে দেখছে কাজললতা। মাথাব মধ্যে সব যেন তালগোল পাকিযে যাচ্ছে কেমন। সচকিত হযে খানিকটা পিছনে সবে এলো। মাথা উঁচিযে দুচোখ টান কবে সাইনবোর্ডটা দেখল আবাব।

.. দু'জনাব ঘব। সেই সাইনবোর্ড। লাল বক্তেব অক্ষবে সেই লেখা। দু'দিকে সেই দুটি নাবী-পুরুষেব মূর্তি। সেই ঘব।

কিন্তু এ কি দেখছে কাজললতা? আবাব এগিযে একেবাবে দবজাব মুখে এসে দাঁড়াল। আবাব ফ্যালফ্যাল কবে চেযে দেখতে লাগল। বিশেষ কবে মালিকেব আসনেব সেই লোকটাকে।

দু'জনাব ঘব জমজমাট বটে। যেমন তাবা আশা কবেছিল একদিন, প্রায তেমনি। সে আব বাধাকান্ত। কাজললতা আব বাধাকান্ত দু'জনাব ঘবেব ওই বাইবেব দিকটা বহুলোকেব সমাবেশেব প্রত্যাশাতেই খোলা ছিল। না, দু'জনাব ঘব বলতে সত্যিই দু'জনেব বাসেব ঘব এটা নয। কোনো কাব্যেব ব্যাপাবও নয। এটা একটা সাইনবোর্ড। ওই সাইনবোর্ডে বড বড জ্বলজ্বলে বক্তেব হবপে ওই কথাক'টি লেখা। লেখাব দু'পাশে নিপুণ বঙেব প্রলেপে একটি পুরুষমূর্তি আব একটি বমণীমূর্তি, আকা। দু'জনে দু'জনেব দিকে চেযে আছে। এই চাওনিটুকু বড জীবন্ত।

দু'জনাব ঘব বলতে দু'জনাব ঘব গডাব উপকবণ যোগানোব দোকান এটা। বিজ্ঞাপনেব চটকে বস্তুজগতে ভাগ্য বদলেব অনেক বিস্ময়কব নজিব আছে। কখন কোনটা যে জনতাব মনে দাগ কেটে বসবে বা চোখে ঘোব লাগাবে, তাব স্থিবতা কিছু নেই। দাগ পডল কি ঘোব লাগল, অমনি কপাল ফিবল।

দু'জনাব ঘবেব এখন অন্তত সেই কপাল। দলে দলে মেযে পুরুষ আসছে, জিনিস কিনছে, বেবিযে যাচ্ছে। যে-কোনো বযসেব স্বামী-স্ত্রী অথবা যুগ্ম দযিতা এই পথে চললে ওই সাইনবোর্ডটা তাদেব চোখ টানবে। পবস্পবেব দিকে চেযে তাবা মুখ টিপে হাসবে। কিছু কেনাব থাকলে তাবা এই দোকানেই ঢুকে পডবে।

দূবে দাঁডিযে দাঁডিযে, তাবপব নিজেব অগোচবে একটু একটু কবে কাছে এসে এসেও এই দৃশ্যই দেখছিল কাজললতা ঘণ্টাব পব ঘণ্টা।

কিন্তু সত্যিই এ কি দেখছে সে? মালিকেব আসনে ওই লোকটা কেন? চোখে পলক পডে না কাজললতাব। দোকান-ঘেঁষা ফুটপাথে যাতাযাতেব পথে দাঁডিযে আছে,

কত লোক যে তাকেই লক্ষ্য করে যাচ্ছে হুঁশ নেই। লক্ষ্য দোকানের মালিকও কবল এক সময়। ভিতরের ভিড় কমেছে, তাই দেখছে। তারপর অনেকবারই চোখ গেল সেদিকে। উঠে এলো এক সময়। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিছু নেবেন? ভিতরে আসুন না—

কাজললতা থতমত খেল একপ্রস্থ। তারপর লোকটাকে আবার দেখল একটু। ভিতরে এসে দাঁড়াল সে। মহিলাটির হাবভাব দেখে দোকানের মালিক নন্দ ঘোষ বিস্মিত। উৎসাহিত হবার মত খদ্দের নয় কিছু, আটপৌরে বেশবাস, মোটসোটা গড়ন, কপালে নয়া পয়সার থেকে বড় জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ। দেখলেই বোঝা যায় তেমন অবস্থাপন্ন নয়, তেমন আধুনিকা তো নয়ই। তবু তার ঈষৎ-বিমূঢ় চাউনির মধ্যে কি যেন ছিল যা নন্দ ঘোষের খুব স্বাভাবিক মনে হয়নি।

জিজ্ঞাসা করল, কি চাই বলুন?

কাজললতা আত্মস্থ হল এবার। কিছু বলতে হবে। অস্ফুটস্বরে বলল, মালিককে...

নন্দ ঘোষ এ রকম চাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না খুব।—আমিই মালিক, বলুন কি বলবেন?

তার মুখের ওপর কাজললতার চাউনিটা বদলাতে লাগল আবার। শূন্য দৃষ্টি লোকটার মুখের ওপর ঘুরল বারকয়েক। কি বলবে বা কিছু না বলে দোকান থেকে বেরিয়ে আসবে কিনা ভেবে পেল না।

আর নন্দ ঘোষের মনে হল, যা বলতে চায় এই অপরিচিতা, তা বোধহয় এত লোকজনের সামনে বলতে পারছে না। এখন ভিড় আরো পাতলা হওয়ায় ওই ছোঁড়া-ছুঁড়িগুলো এদিকেই ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। এই অজ্ঞাত রমণীর প্রতি তার একটু কৌতূহল হল কেন কে জানে?...কিছু বলতে চায় নিশ্চয়, নইলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ও-ভাবে অতক্ষণ ধরে দোকানের দিকে চেয়ে ছিল কেন? আর ভিতরে এসেই বা মালিকের খোঁজ করল কেন?

আচ্ছা, এদিকে আসুন—

মালিকের আসনের পিছনে ছোট একটা খুপরি ঘর। এটা নিজস্ব বিশ্রামের ঘর নন্দ ঘোষের। সেখানেই নিয়ে এলো কাজললতাকে। তাকে বসতে বলল, তারপর আবার জিজ্ঞাসা করল, কি চাই?

কি বলবে কাজললতা? এ পর্যন্ত আসবে তা তো ভেবে আসেনি। একবারে ভিতরে ঢুকবে তা তো কল্পনাও করেনি। এই আসা, এই বসা, সব নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘটেছে। কিন্তু জবাব কিছু দিতে হবে। লোকটা চেয়ে আছে। সে-ই নাকি মালিক এই দু'জনার ঘরের। তার ব্যবহারেই হয়ত লোকটার চাউনি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে কেমন।

জবাব মাথায় এলো চকিতে। উদ্ভট কিছু নয়, নিতান্ত প্রয়োজনের জবাব। বাস্তব জবাব। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা উদ্গত অনুভূতি দমন করে নিতে হল আগে। এই পরিবেশ, এখানকার বাতাসই হঠাৎ যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে চাইল তাকে। ...এই চেষ্টাই আগে করবে বই কি কাজললতা। দরকারও তো। ...যদি হয়, তারপর সবই জানতে পারবে।

নন্দ ঘোষের মুখের ওপর তার ডাগর দুই চোখ আটকালো আবার। বলল, একটা চাকরিব জন্য এসেছিলাম।...খুব দরকার। দেবেন?

না, এবারে আর নন্দ ঘোষ খুব বিস্মিত হয়নি। এই বকমই কিছু যেন মনে হযেছিল তার। শোনামাত্র তাব ঘাড় নাড়ার কথা। এযাবৎ আগে দু'পাঁচটা মেয়ে তার কাছে চাকরিব জন্য এসেছে। তাদের হাবভাব অবশ্য এরকম ছিল না। তাবা এসেছে, সবিনযে চেষ্টা কবেছে, তাবপব চলে গেছে।

কিন্তু এর বেলায নন্দ ঘোষ কেন যে মাথা নাডতে পাবল না তক্ষুণি জানে না। বমণীটিব প্রতি গোডাতেই তাব চোখ পডেছিল কেন, মুখেব দিকে চেযে সেটাই আগে বুঝে নিতে চেষ্টা কবল। সামনেব চেযারটায বসল এতক্ষণে। পকেট থেকে সস্তাদামেব সিগাবেট বাব কবে ধবালো। ব্যবসায়ীব তির্যক দৃষ্টি।

কাজললতা প্রতীক্ষা কববে। ব্যগ্র প্রত্যাশা। লোকটার একটা হাঁ বা না'ব ওপব যেন জীবনমবণ নির্ভর। এই ব্যাকুলতাই যে তাব স্বপক্ষে কাজ কবছে জানে না। শোনাব অপেক্ষায় ফর্সা মুখ ঘেমে উঠেছে তার।

নন্দ ঘোষ ভাবছে যেন। ভাবছে ঠিকই, আব আডে আডে তাকিযে বুঝতে চেষ্টা কবছে কেন চোখে পডেছিল তাব। ...ওই অতবড জ্বলজ্বলে সিঁদুবেব টিপটাব জন্যই বোধহয। মুখখানা বড়সড, চওডা, আব বেশ ফর্সা—তাই বোধহয় মানিযেছে ভালো। তাকালেই দু' চোখ আগে ওই সিঁদুবেব ধাক্কা খায।

—থাকা হয কোথায? আপনি তুমি বর্জন কবে একটা নির্লিপ্ত প্রশ্ন নিক্ষেপ কবল নন্দ ঘোষ।

এই কাছেই। ...বস্তিবাড়ির একখানা ঘবে।

আব কে আছে?

কাজললতাকে চেষ্টা কবতে হযনি, মুখ দিযে আপনিই নির্গত হযেছে।

—মা।

খুব মিথ্যে বলেনি কাজললতা, সাত দিনেব চেনা ওই বুডী যদি মা না হয় তো মা আব কে?

স্বামী কোথায? কি কবে?

প্রশ্নেব ফাঁকে ফাঁকে ভেবে নিচ্ছে নন্দ ঘোষ। সম্মুখবর্তিনীব সচকিত বিবর্ণ মূর্তিটা তাই ভালো করে চোখে পড়েও পড়ল না। নিলে কেমন হয তাই ভাবছে সে। বৈচিত্র্যেব দিকটা ভাবছে।...যে মেযেগুলো আছে দোকানে, তাবা অতি আধুনিকা। ওই কেমন হাওয়া আজকাল, নইলে তাকালে তো গা রি-রি করে নন্দ ঘোষের। কিন্তু খদ্দেব তো কত বকমেবই আছে, অনেকেব হয়ত তাবই মত গা রি-রি কবে। সে-স্থলে এই বৈচিত্র্য দেখলে হযত চোখ জুডোবে। মুখশ্রী বেশ কমনীয়, মিষ্টি, তাব ওপর ওই জ্বলজ্বলে সিঁদুরেব টিপ চোখ টানেই। তাব যখন টেনেছে, কত খদ্দেরের টানবে ঠিক কি। গেরস্থঘরের মেয়ে-পুরুষদের ভালো যে লাগবে তাতে সন্দেহ নেই। আসল কথা, অতি আধুনিকা আর সিঁদুবপবা গেবস্থঘরের বউ—দু'-রকমই কাজ করছে দোকানে—এই বৈচিত্র্যটাই বড় বলে মনে হতে লাগল নন্দ ঘোষের।

তার প্রশ্নের জবাবে বিড়বিড় করে কি বলল, নন্দ ঘোষের ঠিক যেন কানে ঢুকল না। মুখভাব একটু অন্যরকম দেখছে কেন, তাও বুঝল না। আবার জিজ্ঞাসা করল, স্বামী এখানে থাকে না?

কাজললতার মুখে ঘাম দেখা দিয়েছে আবার। মাথা নাড়ল— থাকে না।

নন্দ ঘোষের খটকা লাগল কেমন। স্বামীর কথায় মুখখানা অমন হয়ে গেল কেন? জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি বরাবরই এখানে থাকেন?

এবারও মাথা নাড়ল কাজললতা—অর্থাৎ এখানে থাকত না। কিন্তু মুখ বুজে থাকলে হবে না জানে। ঢোঁক গিলে মৃদু জবাব দিল, পাকিস্তানে থাকতুম, অল্পদিন হল এসেছি

অস্বস্তি...মিথ্যে বলার অস্বস্তি। কিন্তু খুব মিথ্যে নয় বোধহয়। পাকিস্তান বর্ডারেই তো নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাকে। আর ক'দিন থাকলে কি হত কে জানে!...অল্পদিন হল এসেছে, তাও সত্যি।

নন্দ ঘোষ যেটুকু বুঝবার নিজের মত করে বুঝে নিল। যে জায়গা থেকে আসছে বলল তাতেই যেন সব বোঝা হয়ে গেছে। সর্বস্ব খুইয়ে এ-রকম তো কতই আসছে। বুক বেঁধে যত বড় করেই সিঁদুরের টিপ পরুক, সত্যিকারের আশাভরসা যে কতটুকু তা এই মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

নাম কি?

কাজল...

মুখের ওপর লোকটার যাচাইয়ের দৃষ্টি এই যেন প্রথম অনুভব করল কাজললতা। সম্পূর্ণ নাম আর বলা হল না।

সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ এখানে, রবিবারে শুধু ছুটি—সুবিধে হবে?

কাজললতা তক্ষুনি মাথা নাড়ল, হবে। আরো বেশি সময় থাকতে হলেও আপত্তি ছিল না। থাকতে না পারাটাই যেন যাতনা।

মাইনে কত চাই?

যা দেবেন।

আশায় আনন্দে দু'চোখ চকচক করছে কাজললতার। মাইনের কথা সে একবারও ভাবেনি। দু'জনার ঘরে তার জায়গা হবে কি হবে না, সেটাই একমাত্র ভাবনা।

হবে মনে হয়...।

হল। পরদিন থেকেই তাকে আসতে বলে দিল নন্দ ঘোষ। তারও মনে মনে হিসের কষা শেষ হয়েছে। চার-চারটে মেয়ে সে দোকানে রাখতে পারবে না। আগামী সপ্তাহে মাস শেষ হলে ওই কেতকী মেয়েটাকে বিদায় করবে। যেমন চেহারা তেমনি মুখের ওপর কট-কট করে কথা বলে। কালই ছাড়িয়ে দেবে তাকে।

কাজললতা বাইরে এসে দাঁড়াল। কিন্তু পা নড়তে চায় না। বিকেলে যখন আসে, ভাগ্যের এই যোগাযোগ কল্পনাও করেনি। দূর থেকে খুব সঙ্গোপনে একবার চোখের দেখা দেখে যাবে বলে এসেছিল। কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে গেল কেমন। কাজললতা

যেন এখনো নিঃসংশয় নয়, একটু আগের ওই অধ্যায়টা সত্যি কিনা। যা দেখেছে আর দেখে এলো, তাই ঠিক কিনা।

এ কার বদলে কাকে দেখল সে? দু'জনার ঘরের আসল মালিক গেল কোথায়?

দু'টি জিনিসের সুনাম আর দুর্নাম ছিল রাধাকান্তর। তার মগজে বুদ্ধি ছিল আর স্নায়ুতে রাগ ছিল।

কিন্তু এ দুটি জিনিসের সহঅবস্থান রীতি নয়। একের প্রকোপে অন্যটিকে নিষ্প্রভ মনে হত। মাথা যখন খেলত, উৎসাহ আর উদ্দীপনায় তখন কারো বড় দোষও চোখে পড়ত না। আবার স্নায়ু যখন চড়ত তখন মনগড়া ত্রুটি আবিষ্কার করে ত্রাসের কারণ হয়ে উঠতেও দেরি হত না।

কিন্তু অবস্থার ফেরে স্নায়ুর উপর যত হাত পড়েছে মগজের উপর ততো নয়। স্টুডিওতে চাকরি করত। সিনসিনারি আঁকার কাজ। সে আর বটুক একসঙ্গেই কাজে ঢুকেছিল। ঠিক একসঙ্গে নয়— বটুক ক'দিন আগে ঢুকে তাকে ঢুকিয়েছিল। বটুকের মুখ ভালো চলে। গুছিয়ে কর্তাদের মনের মত ব্যবস্থা-পত্র করা, সাজ-সরঞ্জাম জোগানো —এসব ব্যাপারে তার মাথা ভালো খেলত। কিছুকাল চাকরি করার পর কাচা টাকা রোজগারের পথটাও ভালই চিনেছিল। গণ্ডায় গণ্ডায় দশ টাকা বেটের এক্সট্রা আর্টিস্ট জুগিয়ে মাথা পিছু দু'তিন টাকা বখরা আদায় করাটা আদৌ গর্হিত কাজ ভাবত না বটুক। তাছাড়া পার্টির বিশ্বাসভাজন হয়ে খুচরো কেনা-কাটার ফাক দিয়েও মন্দ রোজগার হত না তার। রোজগার যেমন করত, ওড়াতও তেমনি।

মনে মনে ওই লোকটাকেই রাধাকান্তর থেকে অনেক বেশি চৌকস ভাবত কাজললতা। বহু ব্যাপারে যোগ্য ভাবত। কিন্তু মনে মনে সে ভয়ই করত রাধাকান্তকে। এমন চণ্ডাল রাগ আর বুঝি দেখেনি। কত জায়গায় চাকরি করেছে ঠিক নেই। ওই মেজাজ নিয়ে কোথাও টিকে থাকে নি। স্টুডিওর চাকরিও কতবার যায়-যায় হয়েছিল, ঠিক নেই, প্রতিবারই ওই বটুকই বাচিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দোষটা পুরাপুরি রাধাকান্তরই ধরে নিয়েছিল কাজললতা। পয়সাওলা মালিকের যদি স্বভাবচরিত্রের বালাই না থাকে তো তার কি? আর ঈষৎ মত্ত অবস্থায় রাধাকান্তর আকা সিন অপছন্দ হওয়ার ফলে ঘরের বউকে টেনে একটা নিম্নস্তরের রসিকতা করে ফেলেই থাকে যদি তো সেইজন্য গায়ে ওরকম ফোস্কা পড়তে গেল কেন? আর রাগ হয়েছে বলে কি একেবারে মালিকের গলা টিপে ধরতে হবে?

কি হয়েছিল না হয়েছিল, বটুকের মুখে সবই শুনেছিল কাজললতা।

রাগ তো বলতে গেলে বিয়ের পর থেকে তারও।

কোন সাধ-আহ্লাদ মিটেছে তার? ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারার গোসাই। অথচ কতরকম স্বপ্নই না ছিল বিয়ের আগে। যে ঘরের মেয়ে কাজললতা, বিয়ের আগে তার রীতিমত প্রতিপত্তি ছিল বলা চলে পাঁচজনের কাছে। ওর মত সুন্দরী গোটা ব্যারাকের মধ্যে আর একজনও ছিল কিনা সন্দেহ। তার বাবা ছিল পুলিশ ব্যারাকের বাজার-সরকার। তাই স্বামীর থেকেও বটুকের কাজটা অনেক বেশি পছন্দ

হত তার। তাছাড়া বটুক তার শিক্ষাদীক্ষার কদরও করতে জানত। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল কাজললতা। সেটা ওদের পরিবারে কম কথা নয়। এই লেখাপড়া আর এই চেহারা দেখেই পড়ন্ত মানীবংশের ছেলে হয়েও তাকে মনের আনন্দে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল রাধাকান্ত। কিন্তু দু'দিন না যেতে রূপের কদর, শিক্ষার কদর সব যেন ঘষা পয়সা।

তার উপর উঠতে বসতে শাসন। কাজললতার একটু সাজতেগুজতে ভাল লাগে, বিকেলে একটু রাস্তায় এসে দাঁড়াতে ভালো লাগে, আর সিনেমা দেখতে আর সিনেমার গল্প শুনতে কত যে ভালো লাগে তার ঠিক নেই। এই জন্যেই কি লোকটা কম গঞ্জনা দিয়েছে তাকে?

এঁটে-উঠতে পারে না শুধু বটুকের সঙ্গে। দু'জনার ঝগড়া হয়, রাগারাগি হয়। কিন্তু বটুকের স্বভাব উল্টো বলে আবার ভাবও হয়। তাছাড়া উপকার তো কম করে না, ভাব না করে যাবে কোথায়? বটুক যখন সিনেমার গল্প করে বা কখনো জোর করে সিনেমায় নিয়ে যেতে চায়, অনেক সময় ইচ্ছে না থাকলেও লোকটা বাধা দিতে পারে না।

চাকরি যাবার পর দিনে দিনে মেজাজের উন্নতি হতে লাগল রাধাকান্তর। মুখের দিকে তাকাতে ভয় করত কাজললতার। এদিকে দিন চলে না এমন অবস্থা। সেই দুঃসময়ে বটুক একটা মস্ত লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছিল কাজললতাকে। দিন পিছু দশটাকা হারে ছবিতে মুখ দেখাতে আপত্তি কি কাজললতার? কোথাও একটু কাঁদতে হবে, কোথাও একটু হাসতে হবে—কোথাও বা কিছুই করতে হবে না। সপ্রতিভভাবে একটু কাজ করতে পারলে উন্নতিও অবধারিত। দশটাকাটা বিশ পঁচিশ পঞ্চাশেও গিয়ে ঠেকতে পারে একদিন বটুকেরই হাত, সে অনায়াসেই ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

রাধাকান্ত বাড়ি ছিল না। কাজললতা তার জন্য অপেক্ষা করছিল আর রাতাসে সাতার কাটছিল। তারপর রাধাকান্ত বাড়ি আসতেই বটুকের প্রস্তাবটা আরো পল্লবিত করে তার চোখের সামনে তুলে ধরেছিল।

রাধাকান্তর বুঝতে সময় লেগেছিল একটু। শেষ পর্যন্ত বুঝেছিল ঠিকই। সেই মুখের দিকে আর সেই চোখের দিকে চেয়ে কাজললতা সভয়ে পায়ে পায়ে সরে দাঁড়িয়েছিল। ভয়ে কাঠ সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বটুকের একদিনের গল্প মনে পড়ে গেল তার। কবে নাকি এক পরিচিত জ্যোতিষ দুই বন্ধুর হাত দেখে রাধাকান্তকে বলেছিল, রাগ-টাগগুলো সামলাও একটু, কবে না খুন করে ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হয়।

..হঠাৎ মনে হল, সেই বীভৎস খুন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে লোকটার চোখে-মুখে। সেই কটা ত্রাসের মুহূর্ত কাজললতা ভুলবে না বোধহয়।

এর পরেই দিন ফেরার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল রাধাকান্ত। দেশে কিছু জমিজমা ছিল, চেষ্টাচরিত্র করে তাই বিক্রি করে এলো। হাসিমুখ—তার হাতে সাড়ে তিন হাজার টাকা। কাজললতার কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকা।

রাধাকান্তর মন স্থির। চাকরি আর নয়, গোলামী আর নয়। বরাতজোরে ভালো ঘর পেল একটা। অবশ্য তার জন্য সেলামী গুনতে হল হাজার টাকার ওপর। তারপর

দিনকতক নাওযা-খাওযা ভুলে নিজেব হাতে সাইনবোর্ড নক্সা কবতে বসল। দোকানেব নাম শুনে তখন হেসে বাঁচেনি কাজললতা, দু'জনাব ঘব—মাথায আসেও।

সেই সাইনবোর্ড শেষ হতে চোখে পলক পড়ে না কাজললতাব। মাঝখানে বড বড লাল আগুনেব হবপে দোকানেব নাম—আব দু'মাথায দাঁড়িযে পবস্পবেব দিকে চেযে আছে একজন মেযে আব একজন পুরুষ। মুচকি হেসে বাধাকান্ত মেযেটাকে দেখিযে বলেছিল, তোমাব মুখেব আদল এনে দিলাম।

শোনাব পব কাজললতাব মনে হচ্ছিল সেই বকমই যেন। খুশিতে আনন্দে তাগিদ দিযেছিল, ওই লোকটাব মুখও বদলাও। বাধাকান্ত বলেছে, দোকানে কেউ ঢুকবে না তাহলে।

দোকান হযেছে। স্টেশনাবি আব ছোটখাট হোসিযাবী মিলিযে একসঙ্গে দোকান। এই সঙ্গে নৈমিত্তিক ঘব-কন্নাব সামগ্রীও কিছু বেখেছে। দোকান কবতে বসে বাধাকান্তব নেশা চেপে গেল যেন। কম কবে আবো হাজাব দেডেক টাকা চাই— চাই-ই। এবাব স্ত্রীকেই পবামর্শ দিল, টাকাটা বটুকেব কাছ থেকে ধাব পাবাব চেষ্টা কবতে। নিজে চাইলে দেবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু কাজললতা চাইলে নিবাশ কববে না হযত। যেমন কবে হোক যোগাড কবে দেবে।

দিল। ধাব কবেই এনে দিন নাকি। বলা মাত্র এত টাকা ধাব পায যে, তাব ওপব কাজললতাব একটু শ্রদ্ধা বাডাও স্বাভাবিক। দোকান চলতে লাগল। কাজললতাও যখন দোকানে কাজ কবাব প্রস্তাব দিল, বাধাকান্তব খুশি ধবে না। লোক তাহলে আব একজনেব বেশি বাখতেই হবে না—আব স্বামী-স্ত্রী দু'জনে দোকান চালাচ্ছে, এই বৈচিত্র্য যে লোক টানবে তাতে তাব একটুও সন্দেহ ছিল না।

ছ'টা মাস এই এক নেশাব মধ্যেই কেটে গেল। কিন্তু টাকায টান পডছেই। দোকানেব টাকা ভেঙেই খেতে হচ্ছে। দোকান বড কবতে হলে আবো টাকা চাই। ওদিকে বটুকেব কাছ থেকে আব টাকাপযসা দূবেব কথা, আভাসে ইঙ্গিতে আগেব টাকাই ফেবত চাইছে সে। যাব কাছ থেকে টাকা এনে দিযেছিল সে তাগিদ দিচ্ছে।

ইদানীং বটুককে একটু খাতিব কবেই চলছে বাধাকান্ত। কাজললতাও। লোকটা উপকাব তো কম কবে না। ফাঁক পেলে দোকানে এসে দাঁডায, সাহায্য কবে। সেই লোক টাকাব কথা বলতে বাধাকান্ত বিপদ গনল। আবাবও স্ত্রীকেই পবামর্শ দিল, ওকে একটু বুঝিযে সুজিযে ঠাণ্ডা বাখতে।

বোঝাতে গিযে তাকে চোখই বাঙাল কাজললতা, এখন টাকা চাইছেন মানে। টাকা দেব কোত্থেকে? উল্টে আবো টাকাব যোগাড দেখুন। বটুক হেসেছে একগাল। বলেছে, তুমি বললে তাও পাবি না এমন নয।

এদিকে দোকান কবাব নেশা কাজললতাব অন্তত কমে আসছিল একটু একটু কবে। আব সেটা যে ঠাট্টা-ঠিসাবায কমিযে আনছিল বটুকই, সেটা তখন অন্তত মনে হযনি। এই দোকান কবাব ফাঁকে লোকটা আপন মনেব মত আবো অনেক কাছে এসে গেছে। বাধাকান্ত মাল সংগ্রহেব কাজে বেবোয, দোকান চালায তখন বটুক আব কাজললতা। বটুক নিজেব কাজ কামাই কবে প্রাযই। তাব সঙ্গে দাঁডিযে হাসি-আনন্দেব মধ্যে দোকান

চালাতে ভালই লাগে কাজললতাব। ফাঁক পেলে বটুক সিনেমাব মজাব মজাব গল্প শোনায় তাকে। বিশেষ কবে আর্টিস্টদেব গল্প। কাঁচা নোট কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে সেখানে, সেই গল্প। একস্ট্রা আর্টিস্টকে ইচ্ছে কবলেই সে নাকি এখন দিন পিছু দশ টাকাব জাযগায় কুড়ি টাকাও পাইয়ে দিতে পাবে।

শুনে কাজললতাব বুকেব ভিতবে দোলা লাগে। তাবপব দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

এদিকে বাধাকান্তব ওপব টাকাব চাপটা শিথিল কবল না সে। অপব দিকে সময় বুঝে কাজললতাকে জানিয়ে বাখল, অবুঝ লোকটাকে বশে আনাব জন্যেই তাব এই কাবসাজি। চাপে পড়ে কাজললতাকে একটু স্বাধীন হতে দিলে সে-ই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এনে দিতে পাবে। স্বাধীন হতে দিলে। কথাটা কোথায় গিয়ে যে স্পর্শ কবেছিল, কাজললতা জানে না। তাব মনে হতে লাগল, বিযেব পব থেকেই আষ্টেপৃষ্ঠে সে এক অবুঝ শাসনেব শিকলে বাধা।

সেই থেকে মন্ত্রণা শুরু। বটুক আবো বেশি কবে ধাব শোধেব চাপ দিলেও তাব আপত্তি নেই। তাকে স্বাধীন হতে দিলে টাকা বোজগাব কবে সে তো এই দোকানেই ঢালবে—দোকান ফাঁপিযে তুলবে। তাছাড়া যে স্বাধীনতাব স্বপ্ন সে দেখছে, তাব কাছে এই দোকানও একটা পিঞ্জবেব মত।

তাব এই স্বপ্নেব ঘোবে কতখানি এগিযে এসেছিল বটুক, কাজললতা দেখেও দেখতে চাযনি। তাব হাতে কাধে হাত বাখলে কাজললতাব মুখ লাল হযেছে। বটুক অমনি টিপ্পনী কেটেছে, থাক, আব ছবিতে নেমে কাজ নেই।

তাবপব সেই একদিন ।

শনিবাব। দোকান তাড়াতাড়ি বন্ধ হবে। বাধাকান্ত দেশে গিযেছিল যদি আব কিছু টাকা সংগ্রহ কবতে পাবে। দেশে তখনো তাব দখলে মজা পুকুব ছিল একটা। সেদিন ফিবতেও পাবে, না-ও পাবে। ফেবে যদি অনেক বাতে ফিববে।

কিন্তু আসলে বাধাকান্ত যে কোথাও যাযনি, সেটা এবা কেউ জানত না। যথাসময়ে দোকানেব লোহাব দবজা টেনে দেওযা হযেছে। কালো ভাবী ক্যানভাসেব পবদাটাও। দু'জনে ঘেষাঘেঁষি দুটো টুলে মুখোমুখি বসে তন্ময় হযে জল্পনা-কল্পনা কবছে। কেমন কবে ঘবেব অবুঝ লোকটাকে বোঝানো যায? কি কৌশলে কাজললতা এটুকু স্বাধীনতা আদায় কবতে পাবে? তাব একটা হাত বটুকেব হাতেব মুঠোয। সন্ধ্যা কখন পেবিয়ে গেছে খেযাল নেই।

কখন লোহাব গেট সবেছে, কখন পুরু ভাবী পবদাটা নড়েছে তাবা টেবও পাযনি। পাবে কি কবে, উঁচু কাউন্টাবেব ওধাবে ওদিক ফিবে দুটো নিচু টুলে বসে দু'জনে।

.তবু ষষ্ঠ চেতনা বলে আছে কিছু বোধহয।

কাজললতা মুখ ফিবিযে তাকিযেছে একসময।

পবক্ষণে ভযে বিবর্ণ পাণ্ডুব একেবাবে। দুজনেই। কাউন্টাবেব ওধাবে বাধাকান্ত দাঁড়িযে।

কিন্তু কাজললতা কি দেখেছিল সেই চোখে? আব সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়েছিল তাব?

মৃত্যুর আঘাতে স্তব্ধ পশুর শেষ অব্যক্ত যাতনা আর অব্যক্ত হিংসা যেন গলে গলে পড়তে দেখেছে ওই দুটো চোখে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে সেই জ্যোতিষীর কথা—খুন করে ফাঁসীকাঠে ঝোলার কথা।

কেমন করে দোকান থেকে তার সামনে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল কাজললতা জানে না। আর কি করবে এখন, তাও জানে না।

চমকে ফিরল।...বটুক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছে।

তারপর...

হ্যাঁ, তারপর দূরে অনেক দূরে পালিয়ে আসার পর, পরপুরুষের লোলুপ হিংস্র বীভৎসতা, আর নির্দয় নগ্ন অত্যাচারই দেখেছে সে। গা-ঢাকা দিয়ে থাকা দরকার বুঝিয়ে বটুক পাকিস্তান বর্ডারে এনে ফেলেছিল তাকে। সময় আর সুযোগ বুঝে তাদের ফেরার কথা।

কিন্তু ফিরেছিল কাজললতা একাই। খুব সঙ্গোপনে। বটুকের চোখে ধুলো দিয়ে। ..বটুকের নেশা কেটেছে। কুৎসিতদর্শন লুঙ্গিপরা লোকের সঙ্গে গোপনে সলাপরামর্শ করতে দেখেছিল তাকে কাজললতা। তার মতলব বুঝেছিল। সেই দিনই পালিয়েছিল।

সাত দিন হয় কলকাতায় ফিরেছে। তাকে আশ্রয় দিয়েছে প্রায় অন্ধ এক বুড়ী। ট্রেনে যোগাযোগ তার সঙ্গে। সে তাকে আশ্বাস দিয়েছিল, কলকাতায় কোনো বাড়িতে কাজ জুটিয়ে দেবে একটা। বুড়ীর কোথাও কেউ নেই তেমন—বোনপোর কাছে এসেছিল। কলকাতায় দু'তিনটে বস্তি-ঘর ভাড়া খাটায় সে।

কলকাতায় এসে কাজললতা জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ কপালে পরতে শুরু করেছে। শুধু পুরুষের কবল থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে, তাদের কৌতূহলের তাড়না থেকে নিজেকে বাঁচানোর দায়ে। কপালের এই জ্বলজ্বলে সিঁদুর একটা জোরালো নিষেধের কাজ করছে শুধু। সত্যমিথ্যের বুড়ীমাকে কি বুঝিয়েছে সে ভালো মনে নেই। কপালে অমন টকটকে সিঁদুর দেখে সে বলেছিল, আহা, দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল, বেঁচে থাক মা। এই সিঁদুরের টানেই মরদটা একদিন ফিরে আসবে দেখিস।

দিনে দিনে খুশি উপচে উঠছে নন্দ ঘোষের। সে যে এমন একজনকে দোকানে লাগিয়েছে, ভাবতেও পারেনি। দোকানটাকে নিজের বলে ভাবতে পারে বটে মেয়েটা। সকালে সকলের আগে এসে নিজের হাতে ঝাটপাট দেয়, তারপর খুঁটিনাটি যাবতীয় কিছু ঝেড়ে মুছে তকতকে করে তোলে।

অন্য মেয়েদের কারো গাফিলতি দেখলে সত্যি সত্যি রেগে যায়, বকাঝকিও করে। কাউকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখলেও যেন তার চোখ টাটায়।

চারটে মাস না যেতে দোকানের আসল মালিক যে কে, এই ভুল হিসাব দাখিল অন্য কর্মচারী আর কর্মচারীণীদের। তা'ছাড়া নন্দ ঘোষকে সে পরামর্শও দেয়, এই করুন, এইসব জিনিস দোকানে এনে রাখুন। নন্দ ঘোষ তার প্ল্যানমত কাজ করে দেখেছে, লাভ বই লোকসান হচ্ছে না। দোকানের এতটুকু ভালোর জন্যে এত উদবেগ আর এমন উদ্দীপনা দেখে নন্দ ঘোষ যথার্থ অবাক হয়েছে এক এক সময়। পরীক্ষা করার

জন্য ক্যাশের ভারও ছেড়ে দিয়ে দেখেছে এক-একদিন। দিয়েছে বটে, কিন্তু চোখ ঠিকই রয়েছে। একটা নয়াপয়সাও গরমিল হয়নি। নিজের জিনিস নিজের চুরি করার যেমন কথা ওঠে না, এ যেন তেমনি। ওদিকে খদ্দেরও বাড়ছেই।

তিন মাসের মধ্যেই নন্দ ঘোষের ভালো লাগতে শুরু করেছে। এই ভালো লাগাটা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। কাজললতা তা ভালো করেই টের পেল। কিন্তু কিছু যায় আসে না যেন। কাজললতা শুধু এই দোকানটাকেই বড় করে তুলতে চায় —আর সব কিছু ভুলতে চায়। দিনকে-দিন এই শুধু এক নেশার মত পেয়ে বসছে তাকে। লোকটা দুর্বল হলে যদি তার কর্তৃত্ব বাড়ে, আর আরো বেশি নিজের বলে ভাবতে পারে দোকানাটাকে—তার একটুও আপত্তি নেই। দোকান বড় করে তুলে কাজললতা যেন অদৃশ্য কারো ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে আর প্রায়শ্চিত্ত করছে।...আর পরপুরুষকে প্রশ্রয় দেওয়া? এখনো কপালের সিঁদুর তেমন করে লোকটাকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি বটে, কিন্তু পর বলে সত্যিই কিছু আছে নাকি এখনো?

কাজললতা শুধু দোকানটাকে আকাশছোঁয়া বড় করে তুলতে চায়, আর কিছুই চায় না। একটু প্রশ্রয় না পেলে লোকটা সে সুযোগ দেবেই বা কেন তাকে? এক একসময় চমকে ওঠে কাজললতা, তার কি মাথাখারাপ হল? নইলে মালিকের আসনের ওই লোকটাকেসুদ্ধু সময় সময় বাধাকান্ত বলে ভাবতে চেষ্টা করে কেন? কেন ভাবতে ইচ্ছে করে, যা ঘটে গেছে তার সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়?

ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে নন্দ ঘোষ। দোকানের উন্নতি প্রসঙ্গে আলোচনার ছলে, দোকানের নানা সমস্যা নিয়ে আলাপের ছলে। এই আলাপ চলে দোকানে যখন আর তৃতীয় কেউ থাকে না, তখন। দোকান বন্ধ হবার পরেও দোকান নিয়ে মাথা ঘামায় দু'জনে বসে।

নন্দ ঘোষের মাথা গরম হতে থাকে, হৃৎপিণ্ড লাফালাফি করতে থাকে, চোখের দৃষ্টি বদলাতে থাকে।

সেদিন শুক্রবার। একটা মেয়ের চাকরি চলে গেল। ঠারেঠোরে মেয়েগুলো প্রায়ই হাসাহাসি করত। সেই মেয়েটা সেদিন মুখে মুখে তর্কই করল কাজললতার সঙ্গে। বলল, তুমি দোকানের কে যে কথায় কথায় চোখ রাঙাও?

কে সেটা তক্ষুনি তাকে বুঝিয়ে দিল নন্দ ঘোষ। পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে পত্রপাঠ বিদায় করল তাকে।

পরদিন শনিবার।

তিনটেয় দোকান বন্ধ। বন্ধ হল। কাজললতা আর নন্দ ঘোষ ছাড়া আর সকলে চলে গেল। লোহার গেট প্রায় সবটাই টেনে দেওয়া হল, ভারী কালো পর্দা পড়ল।

একটু বাদে নন্দ ঘোষ বেরিয়ে খাবার নিয়ে এলো দু'জনের জন্য। প্রতি শনিবারে দোকান বন্ধ হলে কম করে ঘণ্টা দুই ধরে দোকানের জিনিসপত্র নতুন করে সাজায়

কাজললতা, গোছগাছ করে। নন্দ ঘোষ ততক্ষণ অপেক্ষা কবে আর দেখে চেয়ে চেয়ে। তারপব একসঙ্গে খায় দু'জনে বসে।

খাওয়া শেষ হল। কাউন্টারের ওধাবে ছোট টুলে মুখোমুখি বসে একসঙ্গে গোটাপাঁচেক সমস্যার ফিরিস্তি দিল কাজললতা। নিজেই আবাব সমাধানের রাস্তা খুঁজতে লাগল। কাবণ নন্দ ঘোষ বেশির ভাগই চুপ। চেয়ে আছে। দৃষ্টিটা ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

কাজললতার হঠাৎ খেয়াল হল, তাব একখানা হাত লোকটাব হাতের মুঠোয় চলে গেছে কখন। ওদিকে সন্ধ্যাও কখন পার হযে গেছে।

কাজললতার দু'চোখ তার মুখের ওপব থমকালো।

তুমি অত বড সিঁদুরেব টিপ পবো কেন? অস্বস্তি বোধ কবে বলেই বোধহয কথা কটা বেরুল নন্দ ঘোষের মুখ দিয়ে।

কাজললতা জিজ্ঞাসা করল, ছোট কবতে হবে?

নন্দ ঘোষেব মুখের দিকে চেযে আছে শুধু। জবাব দিযে উঠতে পাবল না। কবলে খদ্দেবদেব কাছে দোকানের বৈচিত্র্য নষ্ট হবে কিনা ভেবে পেল না।

চেযে আছে কাজললতাও।

সচকিত হযে হঠাৎ বিষম চমকে উঠল দু'জনেই। কাউন্টাবেব ওধাবে দাঁড়িযে আছে কে।

কে— কাজললতা চিনল না। একটি বউ...কপালে সিঁথিতে সিঁদুব, কোলে একটি ফুটফুটে ছেলে। কিন্তু এ কি দেখছে কাজললতা? এবকম আব কবে দেখেছিল?

...মৃত্যুব আঘাতে স্তব্ধ পশুব সেই শেষ অব্যক্ত যাতনা আব সেই অব্যক্ত ক্রুব হিংসা যেন গলে গলে পড়ছে এই দুই চোখেও। ঠিক যেমন দেখেছিল বাধাকান্তব চোখে।

বিমূঢ় মুখে নন্দ ঘোষেব দিকে ফিরতেই কাজললতা বুঝতে পেবেছে ছেলে কোলে বউটি কে। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাক পাথব যেন কাজললতা।

সামলে নিযে নন্দ ঘোষ রূঢ় কর্কশ গলায চিৎকাব কবে উঠল প্রায, তুমি এখানে কেন? যাও—যাও বলছি, এখুনি যাও এখান থেকে।

কোলেব ছেলেটা ভয পেযে কেঁদে উঠল। বউটিব দুই চোখেব গলিত ঘৃণা একটা ঝাপটা মাবল নন্দ ঘোষের মুখের ওপব। তাবপব সেই অব্যক্ত যাতনায কাজললতার সর্বাঙ্গ আব একবাব ঝলসে দিয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি চলে গেল সে।

নন্দ ঘোষ শুকনো গলায় জোব এনে আস্ফালন কবল, বাড়ি গিয়ে আমি দেখাচ্ছি ওকে মজা! নিশ্চয চাকরি গেছে বলে দোকানেব ওই নচ্ছাব মেযেটা পিযে লাগিয়েছে।

কাজললতা কাঠ।

পরদিন থেকে কেউ আর তাকে দেখেনি। আবারও সার জেনেছে কাজললতা, তৃতীয মানুষ এলে দু'জনার ঘর টেঁকে না।

ফেরারী অতীত

তখনো ভালো করে ফর্সা হয়নি, বিশ হাত দূরে চোখ চলে না। কামরার মধ্যে বেশ একটা গুঞ্জন উঠতে রামকৃষ্ণবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। সামনে পাশে পিছনে ফটাফট জানলা খোলার শব্দ।

পামবান ব্রিজ আসছে। গাড়ির গতি কমেছে। ওই ব্রিজ পার হলে খানিকক্ষণের মধ্যে রামেশ্বরম—সাদা বাংলায় রামেশ্বর। যাত্রীদের এই ব্রিজ সম্পর্কে একটু বাড়তি আগ্রহের কারণ আছে। এই সেতু পেরুলে মহামোক্ষ ক্ষেত্র। সেতুর এধারে বন্ধন ওধারে মুক্তি। ওই সেতু উত্তরণের আগে পার্থিব জগতের যা-কিছু সব ওধারেই ফেলে এসো।

ক'জন সত্যিই তাই আসে রামকৃষ্ণবাবু জানেন না। তবু নির্লিপ্ত মুখে তিনিও সামনের জানলাটা খুললেন। ট্রেন ব্রিজে উঠলেই অন্যরকম শব্দ। এদিকের সবই ছোট লাইনের ছোট ট্রেন। তা সত্ত্বেও ব্রিজে ওঠার আগে থেকেই গাড়িটার শম্বুকগতি একেবারে। এটা কোনো নিরাপত্তার কারণে কি যাত্রীদের সুবিধার্থে রামকৃষ্ণবাবু জানেন না।

আরছা অন্ধকার ভেদ করা একটা একাগ্রতা নিয়ে দেখতে লাগলেন তিনিও। শতসহস্র সেতুর মতোই একটা। তবে নীচে নদীর বদলে সমুদ্র—সমুদ্রের ফালিও বলা যেতে পারে সেতুটা বিশাল বটে, অনেকক্ষণ লাগল পার হতে। কামরার মধ্যে মেয়ে-পুরুষদের সমুদ্রে পয়সা ফেলার হিড়িক পড়ে আছে। লোভ কাম মোহ মাৎসর্যের প্রতীক দু'নয়া তিননয়া পাঁচনয়া দশনয়া সিকি আধুলি বিসর্জন দিয়ে মুক্ত মন নিয়ে মহাধামে পদার্পণের প্রেরণা কিনা এটা রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী জানেন না। একটি মহিলার তার দেড় বছরের শিশুকে দিয়েও সমুদ্রে পয়সা ফেলার উদ্দীপনা লক্ষ্য করে নিজের মনেই হেসেছেন।

রামেশ্বরে গাড়ি থামল যখন, চারদিক বেশ পরিষ্কার। যাত্রীদের নামার তাড়ায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে রামকৃষ্ণবাবু অপেক্ষা করলেন খানিক। তার কোন তাড়া নেই। তিনি তীর্থ করতে আসেননি। কোনো মানত নিয়েও আসেননি। এখানে এক দিন থাকবেন কি তিন দিন নিজেও জানেন না। ভালো লাগলে দু'তিন দিন কাটাবেন, না লাগলে আবার বেরিয়ে পড়বেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালই লাগছে তাঁর। জীবনের এই প্রৌঢ় প্রহরে থার্ড ক্লাস কামরার সর্বসাধারণের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পেরে বেশ একটা বৈচিত্র্যের স্বাদ উপভোগ করছেন। এদের কেউ তাকে চেনে না, কেউ জানে না, কেউ ঈর্ষা করে না, কেউ তোষামোদ করতেও আসে না। নামের মোহ, নামের যশখ্যাতি, প্রতিপত্তির শেকল থেকে একটা মুক্তির স্বাদ যে এভাবে অনুভব করা যায় —রামকৃষ্ণবাবু দীর্ঘদিনের আরাম-ঘরে বন্দী থেকে সেটা যেন ভুলতেই বসেছিলেন। ...বাড়ির গাড়িতে মেয়ে আর ছোট ছেলে সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে এসে মাদ্রাজ মেলের ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ কামরায় তুলে দিয়ে গেছল। বড় আর সেজ ছেলে খুঁতখুঁত করছিল —এযার কনডিশনে গেলেই ভালো হত। তিন বউমা বেশাবেশি করে যাত্রার সুব্যবস্থায় উঠে-পড়ে লেগেছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণবাবু শেষ পর্যন্ত একটা হোলড অল আর ছোট সুটকেস ভিন্ন আর কিছুই নিতে রাজি হলেন না দেখে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছে।

শ্বশুরের একটু বিরাগী মনোভাব লক্ষ্য করে ভিতরে ভিতরে যেন উতলা হয়েছে তারা। ফার্স্ট ক্লাস থেকে বেরিয়ে থার্ড ক্লাস কামরায় এ-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি, জানলে তাদের চোখগুলো কপালে উঠত। মেয়ে বার-বার করে বলে দিয়েছে, দুদিন পরে পরে একখানা করে চিঠি দেবে বাবা, নইলে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় থাকব। বড় বউমা বলেছিল, ঠিকঠিক খবর না পেলে কিন্তু আপনার ছেলে কাজকর্ম ফেলে মাদ্রাজ ছুটবে। তখন অন্য বউমাদের দিকে চেয়ে রামকৃষ্ণবাবুর মনে হয়েছে— এ-রকম কথা ওদেরও বলার ইচ্ছে ছিল।

...মাদ্রাজে পৌঁছে তিনি টেলিগ্রামে পৌঁছানো-সংবাদ এবং কুশল সংবাদ দিয়েছেন। তারপর সাতদিনের মধ্যে অনির্দিষ্ট পর্যটনে বেরিয়ে পড়ার আগে তাদের চিঠি লিখে জানিয়েছেন, এত ভালো আছি যে এক জায়গায় আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না। বেরিয়ে পড়ছি, কখন কোথায় থাকব এরপর ঠিক নেই, নিয়মিত চিঠিপত্র না পেলে একটুও চিন্তা কোরো না।

...দেখলে কেউ বলবে না রামকৃষ্ণবাবুর বয়েস এখন সাতান্ন। শরীর শক্ত মজবুত এখনো। চুলের তলায় তলায় কিছুটা পাক ধরেছে, একটা দাঁত নড়েনি বা পড়েনি। এখন তার পোশাক ঢোলা পাজামা আর ঢোলা রঙিন পাঞ্জাবি। এই পোশাকে বয়েস আরো কম দেখায়। এ-ভাবে বেরিয়ে পড়ার পর রামকৃষ্ণবাবু যেন একটা ভারী মহার্ঘ্য জিনিস ফিরে পেয়েছেন। সেটা তাঁর যৌবন আর যৌবনস্মৃতি। শক্তসমর্থ লোকের মতোই ঘোরাফেরা করছেন—কারো মুখাপেক্ষী নন, সম্পূর্ণ নিজের ওপর নির্ভরশীল। ..দীর্ঘদিন ধরে এই আত্মপ্রত্যয়টুকুই তিনি খুইয়ে চলেছিলেন। ছেলেমেয়ে বউমা নাতি নাতনী পরিবৃত হয়ে তিনি যেন অকালে বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন। বেশ একটা খোশ-মেজাজের জরা নেমে আসছিল তাঁর ভিতরে বাইরে।

...প্রত্যয়ের এই নতুন স্বাদে ভরপুর হয়ে স্ত্রীর কথাও চিন্তা করেছেন বইকি। আজ পাশে সে— শুধু সে থাকলে বেশ হত। স্ত্রীর বেড়াবার ঝোঁকও ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণবাবু তখন সাফল্যের ভরা জোয়ারে ভাসছেন, এই জোয়ার থেকে কেউ তটে এসে বিরাম চায় না।

গাড়ি ফাঁকা। যাত্রীরা সব নেমে গেছে।

রামকৃষ্ণবাবু উঠলেন। কুলীর মাথায় হোলড-অল আর ছোট সুটকেস তুলে দিয়ে প্রথমে রেলওয়ের রিটায়ারিং রুমের সন্ধানে এলেন।

সিঙ্গল রুম ভাড়া হয়ে গেছে, ডাবল রুমের ভাড়া বেশি—সেটা খালি আছে। রামকৃষ্ণবাবু সেটা বুক করে মালপত্র রেখে নিশ্চিন্ত।

রামেশ্বরে এসে সমুদ্রস্নান না করলে আসাটাই অসমাপ্ত। পুণ্যের লোভ না থাকলেও সমুদ্রস্নানের ইচ্ছে আছে রামকৃষ্ণবাবুর। মুখ-হাত ধোওয়া চা-খাওয়া ইত্যাদির পর গামছা আর নতুন একপ্রস্থ পাজামা পাঞ্জাবি কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এলেন। রামেশ্বরের মন্দির এবং স্নানের জায়গা কাছাকাছি। স্নান সেরে মন্দিরে পূজো দেওয়ার বিধি।

টমটমে করে স্নানের বাঁধানো চাতালের সামনে নামলেন। স্টেশন থেকে তিন কোয়ার্টার মাইল পথ হবে—রোদ চড়া তখন।

এ-সময় সমস্ত মানুষেরই গন্তব্যস্থান ওই একটি। টমটম থেকে নামতেই দু'জন পাণ্ডার চেলা দু'দিক থেকে এগিয়ে এলো। এদিকের পাণ্ডার সঙ্গে তাদের তফাৎ হল তারা বিনীত বেশ। রামকৃষ্ণবাবু মাথা নাড়লেন, পাণ্ডার দরকার নেই। একটু চেষ্টা করে একজন সরে গেল, আর একজন ছোকরা কিন্তু লেগেই থাকল। সে আবার জামা জুতো রাখার ভার নেবে, পুজোর সব ব্যবস্থা এবং দর্শনাদি করিয়ে দেবে, এমন কি আজকের বিশেষ পুণ্যদিনে ওই যে মাতাজী এসেছেন রামঝরকা থেকে, তাঁরও দর্শনলাভের এবং আশীর্বাদলাভের ব্যবস্থা করে দেবে।

সমুদ্রের ডানদিক ঘেঁষা উঁচু বিশাল বাঁধানো চাতালের একদিকে হাতত্তুলে দেখালো সে। সেখানে দস্তুরমতো মেয়ে-পুরুষের ভিড়। অর্থাৎ মাতাজীর দর্শন এবং আশীর্বাদ লাভ করছে তারা।

রামকৃষ্ণবাবু মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ কিছুরই দরকার নেই। কিন্তু লোকটা নাছোড়। সবিনয়ে বলতে লাগল, দেবস্থানম-এ এসেও ছেলেমেয়ের কল্যাণের জন্য পুজো দেবে না এ কেমন কথা বাবুজী— ভগবানের কাছে ডালি দাও, ছেলেপুলের ভালো হবে।

এইবার রামকৃষ্ণবাবু থমকালেন। ছেলেমেয়ের কল্যাণ তিনি চান, মঙ্গল চান। পুজো দিলে কতটুকু কল্যাণ বা মঙ্গল হবে জানেন না, কিন্তু না দিলে ক্ষতি হবে কিনা কে জানে। আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি, কোথায় কি আছে, কোন জায়গার কি স্থানমাহাত্ম্য কে জানে? কাতারে কাতারে লোক সমুদ্রে স্নান করছে, সকলেই তারপর পুজো দেবে। কিছুই যখন জানেন না কি হয়, আত্মাভিমান নিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকার দরকার কি? তাছাড়া এখানে কে চিনছে, কে জানছে তাঁকে? পরে ছেলেমেয়েদেরও জানার দরকার নেই এই আত্মপ্রসাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার দরকার কি?

চেলার হাতে জামাকাপড় জিম্মা করে কোমরে গামছা জড়িয়ে তিনি সমুদ্রে নামলেন। তার আগে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলেন, পাণ্ডার চেলা তরতর করে ওই বাধানো উঁচু চাতালে উঠে গেল। মন্ত্র-মোক্ষদাতারা সব ওখানেই বসে।

অনেকক্ষণ ধরে চান সেরে উঠে এলেন। নুন-জলে গা চটচট করছে। ঘরে ফিরে আবার একদফা চান করতে হবে। কিন্তু খুব তাজা লাগছে এখন, আর বয়েসটা যেন আরো কম ঠেকছে নিজেরই।

ডালি হাতে পাণ্ডা চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে। ভিজে জামাকাপড় বদলানোর নামে সে ঘনঘন মাথা নাড়লে। সিক্তবস্ত্রে পুজো দেওয়ার বিধি। বলল, চাতালের ওই পুরোহিতের কাছে মন্ত্রপাঠ শেষ করে মন্দিরে যেতে হবে। তারপর দ্বাদশ কুণ্ডর মিঠে জলে স্নান করে দর্শন ও পুজো শেষ করতে হবে।

মিঠে জলের স্নান ছাড়াও নিজের সহিষ্ণুতা যাচাইয়ের ইচ্ছেও হল। নেমে গেছেন যখন রামকৃষ্ণবাবু—সব ঠিক আছে।

একারোটি টাকা আগে গুনে দিয়ে পুরোহিতের সামনে আসনে বসলেন। পুরোহিত জিজ্ঞাসা করলেন, কার কল্যাণে পুজো?

একটু ভেবে রামকৃষ্ণবাবু তিন ছেলে আর মেয়ের নাম করলেন। মনে মনে তাদের সুমতি প্রার্থনা করলেন। পুরোহিতের সঙ্গে মন্ত্র আওড়ে যেতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যেই বিমনা হয়ে পড়লেন। ছেলেদের, মেয়ের, বউমাদের একে একে সকলের মুখগুলো চোখে ভাসল রামকৃষ্ণবাবুর—আর কিছু না চেয়ে শুধু সুমতি চাইলেন কেন?

না, বাইরের আচরণে কোনদিন কারো ওপর বিরূপ হননি রামকৃষ্ণবাবু। কিন্তু চাপা খেদ বা ক্ষোভ একটু ছিল বইকি। নিজের স্ত্রীর মেজাজপত্র খুব ভালো ছিল না। হয়তো একটু অল্পেতেই রেগে যেতেন। কিন্তু রামকৃষ্ণবাবু ঠিকই অনুভব করতেন ছেলেরা বা বউমারা তাদের মা বা শাশুড়ীর ওপর তুষ্ট ছিল না খুব। ওদের আচরণে আঘাত পেয়ে স্ত্রীকে অনেক সময় স্তব্ধ দেখেছেন। ছেলেদের অথবা ছেলের বউদের কিছু বলতেন না, স্ত্রীকেই বোঝাতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু মনের ব্যথা মনেই চাপা থাকত।

শাশুড়ীর পরে কর্তৃত্বের হাত-বদল হয়েছে। ছেলেরা চোখ রাখে তাঁর ওপর, বউমারা যথাসাধ্য সেবা-যত্ন করে, মেয়ে একদিন অন্তর একদিন এসে বাপের খবর নেয়। তবু সে-সবের কোনো তাপ যেন বুকের তলায় স্পর্শ করে না। উল্টে টুকরো টুকরো এক-একটা ব্যাপার মনে পড়লে হাসি পায়। কিন্তু সে-হাসি খুব সুখের নয়। .. বাড়িটা তিন ছেলের নামে লেখাপড়া করে দেবার পর মেয়ে-জামাইয়ের মুখ শুকনো-শুকনো মনে হয়েছে। বাড়িটার দাম ধরে তার তিন ভাগের এক ভাগ নগদ টাকা মেয়ে-জামাইয়ের নামে চালান করার সময় আবার ছেলেদের বা বউমাদের মুখে তেমন উৎসাহ চোখে পড়েনি।

...গল্প উপন্যাস মিলে কম করে দেড়শ বই আছে রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর , এই সাতান্ন বছর বয়সেও সম্পাদক আর প্রকাশকদের তাগিদের জ্বালায় অস্থির হতে হয়। সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকরা এখনো বাড়িতে হানা দেয়। তাঁর লেখা বহু উপন্যাস গল্প এযাবত ছবি হয়ে গেছে—আরো অনেক হতে পারে। এ ছাড়াও ওই দেড়শ গল্প উপন্যাসের বইগুলো বেশির ভাগই সচল এখনো। মাস গেলে মোটা রয়েলটি আসে। এই সব বই কিভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে ছেলেদের আর মেয়ের মনে সেজন্যে একটু প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ আছে মনে হয়। ছেলেরা একবার হালকা কথাবার্তার ফাঁকে এই প্রসঙ্গ উত্থাপনও করেছিল।

হঠাৎ সচকিত রামকৃষ্ণবাবু, পুরোহিতের মন্ত্র পড়ানো কখন শেষ হয়েছে কে জানে—বাবুকে ভাব-তন্ময় মনে করে পুরোহিত আর তার চেলা নির্বাক।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। চাতাল অনেকটা ফাকা এখন। কোণের দিকের মাতাজীর সামনে মাত্র পাঁচ-সাতটি মেয়ে পুরুষ দাঁড়িয়ে এখন। বাতাসে তাঁর লালপাড় শাড়ির আঁচল উড়ছে। একটু উঁকি দিলেই রামকৃষ্ণবাবু মাতাজীর মুখ দেখতে পেতেন, কিন্তু সে-রকম কোন আগ্রহ হলো না।

চেলা মন্দিরের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। দক্ষিণভারতে বহু মন্দির কল্পনাতীত স্থপতিমাহাত্ম্য নিয়ে দাঁড়িয়ে। রামেশ্বরের মন্দিরও তার ব্যতিক্রম নয়। এর করিডরটিই শুনেছি চার হাজার ফুট।

পুরী বারাণসী গয়াধাম ইত্যাদি দ্বাদশ কূপের চব্বিশ বালতি মিঠে জল তার মাথায় ঢাললো পাণ্ডার চেলা। স্বচ্ছ জল, ভালো লাগল। তারপর সেই ভিজে জামা-কাপড়ে চল্লিশ মিনিট লাইনে দাঁড়ানোর পর দর্শন এবং পূজো শেষ।

গায়ে ভিজে জামা-পাজামা, খালি পা, বাইরে মাটি তেতে আছে, মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে। এবারে একটু ক্লান্ত বোধ করছেন রামকৃষ্ণবাবু। চেলার সঙ্গে চাতালে এসে উঠলেন আবার—সেখানেই শুকনো জামা-কাপড়। কোণের মাতাজীর সামনে জনাতিনেক লোক তখন। রমণী এদিকেই চেয়ে আছেন—সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে রামকৃষ্ণবাবু আড়চোখে তাকালেন একবার—কালোকুলো মুখের একপাশ দেখতে পেলেন। রমণী তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন মনে হল, কিন্তু রামকৃষ্ণবাবুর তখন ঘরে ফেরার তাড়া। সোজা চাতালের আড়ালে চলে গেলেন। জামা-পাজামা বদলে ভিজেগুলো হাতে তুলে নেবার আগে একজন স্থানীয় লোক এসে চেলাটির কানে কানে কি বলতেই সে ব্যস্তসমস্ত মুখে চলে গেল।

রামকৃষ্ণবাবু সোজা চাতাল থেকে নেমে এলেন। চেলার প্রাপ্য সে আগেই পেয়েছে। মাতাজীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে সে কথা বলছে। মাথায় কাপড় তোলা মাতাজীর কালো মুখের একটু আভাস মাত্র পেয়েছেন। তা দক্ষিণভারতে রূপসী রমণীর দর্শনলাভ একটা বিরল ব্যাপার।

বিকেলে আবার বেড়াবার জন্য বাস্তায় নামলেন। পায়ে পায়ে টাঙ্গা আর টমটম ছেঁকে ধরছে—এখানকার যাত্রীদের পাঁচ পা হাঁটতে দেখলেও ওরা রফাদফা করতে চায় না। সমুদ্র বা মন্দিরের দিকে এগোতে মালা-জলা আর শাঁক-জলারাও সঙ্গ নিতে ছাড়ে না।

—রামঝরুক্কা—বাবুজী রামঝরুক্কা চলিয়ে।

কম করে দশটা টাঙ্গাজলার মুখে এই একই হাকডাক শুনলেন রামকৃষ্ণবাবু। রামঝরুক্কা কি ব্যাপার বোধগম্য হল না।

এক ছোকরা টাঙ্গাজলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রামঝরুক্কা কেয়া হ্যায়?

সাগ্রহে টাঙ্গা থেকে নেমে এসে ও বলল, রামজীকো চরণ দর্শন হোগা, নসিব হো তো মাতাজী কো গানা ভি শুনিয়েগা—আই-এ সাব, বৈঠিয়ে।

উঠে বসেই পড়লেন।

দু'দিকের তেঁতুল সারির মাঝখান দিয়ে সুন্দর পাকা রাস্তা। মাইল তিনেক বাদে রাস্তাটা একেবারে সমুদ্রের সামনে এসে থেমেছে। সামনে একতলা সমান প্রশস্ত বাধানো চাতাল, তার ও-পাশে একতলার মতো সিঁড়ি ভাঙলে মন্দির।

চাতালের সামনে সাইনবোর্ড টাঙানো। সেটা পড়ে হাসিই পেয়ে গেল। জায়গা বা মন্দিরের নাম হল রামজী কুক্কা। অর্থাৎ সীতা অন্বেষণের পথে রামজী এখানে থেমেছিলেন। এখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের অপর প্রান্তে স্বর্ণলঙ্কার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন।

মন্দিরে উঠলেন। চারদিকে রেলিং-ঘেরা বাঁধানো চাতালের মাঝখানে ছোট মন্দির। সেখানে রামজীর পাষাণ-চরণচিহ্ন। সেই দর্শন সারতে এক মিনিটও লাগে না। চাতালের চারদিকে ঘুরে সমুদ্র দেখাটা সত্যিই লোভনীয়। সেই উদ্দেশ্যে সরে দরজা দিয়ে বেরিয়েছেন—সেখানকার একজন লোক তাঁর কাছে এসে সবিনয়ে জানালো, মাতাজী বোলাতেঁ।

এ আবার কি বিড়ম্বনা রে বাবা। মাতাজী তাঁকে ডাকেন কেন? গানের সমজদার

ভেবেছেন নাকি? চারদিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁহা মাতাজী?

মন্দিরের পিছনটা দেখিয়ে লোকটা তাঁকে বেলিংঘেরা চাতাল ধরে পিছনদিকে নিয়ে চলল।

লালপেড়ে শাড়িপরা সকালের সেই রমণী বসে। সোজা সামনের দিকে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে মুখ। পিছন থেকে কালো দেহের আঁট-বাধুনী দেখে খুব বেশি বয়েস মনে হল না মাতাজীটির। ইনি ওখানে বসে রামকৃষ্ণবাবুর এইস্থানে আগমন টের পেয়ে লোকমারফৎ ডেকে পাঠালেন কি করে? হয়তো আসার সময় দেখে থাকবেন।

—নমস্তে।

—নমস্কার। বোসো। বলতে বলতে তাঁর দিকে ঘুরে তাকালেন মাতাজী।

সেই মুহূর্তে মাথার মধ্যে এই পৃথিবীটাই বুঝি উল্টেপাল্টে যেতে লাগল রামকৃষ্ণবাবুর। কিন্তু বাইরে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেলেন। বিস্ফারিত চোখে দেখছেন। দেখার পরেও বিশ্বাস করবেন কি করবেন না জানেন না।. তেইশ বছরের একটা মেয়ের মুখে চোখে সর্ব অঙ্গে তিরিশটা বছর জুড়ে দিলে কি দাড়ায়? কেমন দাঁড়ায়? অথচ আশ্চর্য, এঁর সামনে এসে দাঁড়ালে, ভালো করে একটু তাকালে, তিরিশ বছর আগের সেই তেইশ বছরের মেয়েকে চিনতে একটুও সময় লাগে না। রামকৃষ্ণবাবুরও সময় লাগল না। তিনি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

মাতাজী এবারে খানিকটা ঘুরেই বসলেন তাঁর দিকে। হাসিমাখা স্নিগ্ধ মুখ। তিরিশ বছর আগে ওই মুখে সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটা ছিল না, আজও নেই। কিন্তু সেদিনও মুখের হাসিটুকু ভালো লাগত, আজ সেটা স্নিগ্ধ কমনীয় লাগছে।

—চিনতে পারছ না?

দাঁড়িয়ে থাকার দরুন মাথার চুল আরো বেশি উড়ছে রামকৃষ্ণবাবুর। মাথা নাড়লেন।— পারছেন।

সামনের ঝকঝকে মেঝে দেখিয়ে মাতাজী বললেন, তাহলে বোসো —সকালে রামেশ্বরের ঘাটে দেখার পর থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

বাহ্যজ্ঞানরহিতের মতো রামকৃষ্ণবাবু বসলেন। চেয়েই আছেন মুখের দিকে। এভাবে সামনে বসতে, মুখের দিকে চেয়ে থাকতে এ-বয়সে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ থাকার কথা নয়। তার ওপর ইনি মাতাজী এখনকার। শ্রীরামচন্দ্রের চরণদর্শনে যারা আসছে, অলিন্দ ঘুরে তারা একবার মাতাজীকেও দর্শন করছে—তফাতে দাঁড়িয়ে দুহাত জুড়ে প্রণাম করে চলে যাচ্ছে। হয়তো তাঁর নির্দেশেই মন্দিরের ভক্ত দুটি আপাতত কাউকে কাছে আসতে দিচ্ছে না।

মুখের ওই হাসি এখন আরো অদ্ভুত লাগছে রামকৃষ্ণবাবুর।.. তার থেকে চার বছরের ছোট, অর্থাৎ তিপ্পান্ন হবে বয়েস এখন। তেতাল্লিশও দেখায় না। কালো মুখের চামড়ায় যেটুকু ভাঁজ পড়েছে তাও জরার দাগ মনে হয় না। দুই ঠোঁটের নিঃশব্দ হাসি দুই গালের দিকে ছড়িয়ে ওই ভাঁজের মধ্যে পড়ে যেন অদ্ভুত চিকচিক করছে —তারপর উপচে উঠে চোখের কালো তারার দিকে ধাওয়া করছে। বাতাসে বিশৃঙ্খল হয় বলেই হয়তো চুলের বোঝা টান করে পিছনে এসে গোড়ায় শক্ত করে বেঁধে

বাখা হযেছে। বন্ধনীব নীচে একপিঠ চুল কোমবেব নীচ পর্যন্ত তাণ্ডব জুড়ে দিযেছে। কান দুটো চুলে ঢাকা পড়েনি, ওই হাসি যেন শেষে কানেব ডগা পর্যন্ত ছড়িযেছে।

খুব হালকা সুবে বললেন, এ জাযগাটাব মাহাত্ম্য আছে, একদিন বামচন্দ্র রুকেছিলেন এখানে, আজ বামকৃষ্ণ রুকলেন।

বামকৃষ্ণবাবু বলতে পাবতেন, বামচন্দ্র সীতা-সন্ধানে এসেছিলেন, বামকৃষ্ণেব কোনো হাবানো-প্রাপ্তিব প্রত্যাশা নেই।

কিছুই বললেন না। চেযে আছেন। দেখছেন।

—বামেশ্বেব ঘাটে দেখলাম বেশ ধর্মেকর্মে মতি হযেছে।..একবাব ফিবেও তাকালে না।

বামকৃষ্ণবাবু আত্মস্থ কবলেন নিজেকে। এ-বকম বিড়ম্বনা ভোগ কবাব তাঁব অন্তত কোনো কাবণ নেই। জবাব দিলেন, কলকাতাব শুভা গাঙ্গুলী এখানে মাতাজী হযে বসে থাকতে পাবেন, এটা কোনো কল্পনাব মধ্যে ছিল না—

বমণীব মুখে সেই অদ্ভুত সুন্দব নিঃশব্দ হাসিটা আবো যেন বেশি উপচে পড়ছে। —তাছাড়া চেহাবাটাও ফিবে তাকানোব মতো নয।

কেন যে হঠাৎ আবাব বিব্রত বোধ কবছেন বামকৃষ্ণবাবু, জানেন না। কোনো একদিন দেখা হলে কৈফিযত তো তাঁবই নেবাব কথা। ঘবে আব একজনকে আনাব পবেও এই এক বমণীকে দীর্ঘদিন ভুলতে পাবেন নি। ভুলবেন কি কবে, নিরুদ্দেশ হবাব পবেও কম কবে তিন চাব বছব বেডিওতে আব বেকর্ডে তাব গান বাজাব কামাই নেই। তাবপব অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই বিস্মৃত হযেছেন।

যে লোকটি তাঁকে মাতাজীব কথা বলে এদিকে নিযে এসেছিল, সে অদূবে এসে দাঁড়াল। তাদেব মাতাজী সপ্রশ্ন চোখে তাকাতে সে জানান দিল, টাঙ্গাঅলা বাবুজীকে ডাকছে।

স্পষ্ট হিন্দীতে মাতাজী নির্দেশ দিল, আমাব নাম কবে তাকে বলে দাও অনেকক্ষণ বসতে হবে—বাবু ডবল ভাডা দেবেন। ঠোঁটেব ফাঁকে হাসি ঝুলিযে তাব চোখে চোখ বেখে দেখলেন একটু।—তোমাব তাহলে তিন ছেলে আব এক মেযে এখন?

ঈষৎ বিস্ময়ে মাথা নাডলেন বামকৃষ্ণবাবু— তাই।

—না, মন্ত্রতন্ত্র কিছু জানি না, যে পাণ্ডাব মাবফত ওদেব কল্যাণে পুজো দিলে তাব কাছে শুনলাম।...তা একা তীর্থে এলে, স্ত্রীকে নিযে এলে না কেন?

—তিনি অনেক বড তীর্থে চলে গেছেন।

মহিলা থমকালেন একটু।—কতদিন আগে?

—বছব দেডেক।

শুভা গাঙ্গুলী ছোট নিঃশ্বাস ফেললেন একটা।—ভাগ্যবতী বলতে হবে। ...ছেলেমেযেদেব সব বিযে-থা হযে গেছে?

মাথা নাডলেন— হযেছে।

—তাবা কেমন?

—ভালো।

—এ বয়সে একলা তোমাকে তীর্থ করতে ছেড়ে দিলে?

—তীর্থে বেরোইনি আমি—মাদ্রাজ থেকে হঠাৎ ঘোরাঘুরির নেশায় পেয়ে বসেছে।

ভিতরটা ভয়ানক উসখুস করে উঠছে রামকৃষ্ণবাবুর। কৈফিয়ত চাইবার সময় আর প্রয়োজন বহুকাল আগে ফুরিয়েছে। এখন শুধু কৌতূহল একটু।. প্রতিশ্রুতি ভুলে, ভবিষ্যৎ ভুলে, গান ফেলে তিরিশটা বছর আগে শুভা গাঙ্গুলী হঠাৎ কার সঙ্গে ওভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছল, আর এখন সেই মানুষের খবর কি— ঠোঁটের ডগায় বার বার এই প্রশ্নটাই আসছে শুধু।

তিরিশটা বছর অনায়াসে চোখের সামনে থেকে সরে গেছে রামকৃষ্ণবাবুর। তিরিশটা কেন, তারও ঢের বেশি।

ন'দশ বছর বয়েস থেকেই নিজের কালো কুৎসিত বয়েস সম্পর্কে সজাগ ছিল একটা মেয়ে। তার নাম শুভা—শুভা গাঙ্গুলী। রামকৃষ্ণবাবুর দিদির ভাসুরের মেয়ে। মধ্যবিত্ত অবস্থার মানুষ। সেই কুৎসিত মেয়েটা এমন কিছু গুণের অধিকারিণী হতে চেয়েছিল, যার আলোয় রূপের খেদ ঢাকা পড়ে যেতে পারে।

সেরকম গুণের অধিকারিণী হতে পেরেছিল। গান— চৌদ্দ বছর বয়সে তার গানের প্রথম রেকর্ড হয়। তেইশ বছরের মধ্যে তার রেকর্ডের ছড়াছড়ি। বড় বড় সব জলসা থেকে ডাক আসে, সিনেমায় প্লে-ব্যাকের ডাক আসে। শেষের দুটো বছর রেকর্ড আর প্লে-ব্যাকের দরুন অবিশ্বাস্য টাকা এসেছিল সেই মেয়ের হাতে।

আর যে ছেলেটার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে তার হৃদ্যতা, তার নাম রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। শুভার মা নেই, ভাসুর-ভাসুরঝির বাস দিদির কাছেই। ওই মেয়ে তার লেখক জীবনের প্রথম প্রেরণা। তার সঙ্গে প্রতিটা লেখা নিয়ে কত আলোচনা, কত মতভেদ।

নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে ওই মেয়েকেই বিয়ে করবেন স্থির করে ফেলেছিলেন রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

বাইরেটা কুৎসিত কিন্তু ভেতর তো সুন্দর। চোখ বুজে গান শোনে যখন, স্থান কাল ভুল হয়ে যায়। তা ছাড়া বয়সেরও একটা রূপ আছে, সেই রূপই চোখে ধরে রাখতে চেষ্টা করে। শুভার গানের কদর চারদিকে যতো বাড়ছে—রূপের প্রশ্নটা ততো গৌণ ভাবতে চেষ্টা করেছেন রামকৃষ্ণ।

কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গে মেয়েটা হাসে শুধু। হাঁ-না কিছুই বলে না। কালো মুখে রঙের ছোপ লাগে সেটা অবশ্য রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর চোখ এড়ায় না। ওদিকে গানের টাকা আসছে—ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে— রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী অন্তত চারজনকে জানেন, যাদের যে-কোনো একজন শুভার একটু চোখের ইশারা পেলে বিয়ে করে তাকে সাদরে ঘরে তুলে নিয়ে যাবে। রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী ঠাট্টা করেন ওদের নিয়ে। শুভা গাঙ্গুলী হাসে খুব। বলে, স্টুডিওতেও জনাতিনেক আছে যারা পাগল করে ছাড়লে।

মনস্থির করে ফেলার পরেও ওই মেয়ের সাড়া না পেয়ে ভিতরে ভিতরে রামকৃষ্ণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। অথচ মেয়েটা যে তাঁর আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে সেই আভাসও পেয়েছেন। গানের জন্যে যে মেয়েকে সাধ্যসাধনা করতে হয়, সেই মেয়ে নিরিবিলিতে তাঁকে দশখানা গান শোনাতেও আপত্তি করে না।

...ছেলেটাব সাতাশ আব মেযেটাব তেইশে এক বিপর্যয ঘটে গেল। ওই মেযে প্রশ্রয না দিলেও প্রেমিকেব সংখ্যা বাডছে দেখে ছেলেটাব ইদানীং মেজাজ চডা প্রাযই।

বৃষ্টিতে কলকাতা ভেসে যাচ্ছিল সেই বাতে। দিদি-জামাইবাবু কোথাও বেবিযে আটকে গেছেন বোধহয। তিনতলাব ঘবে চোখ বুজে একেব পব এক গান শুনে যাচ্ছিলেন বামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। এক-একটা গান শেষ হলে শুভাব চোখে চোখ মেলছিলেন। হঠাৎ উঠে ঘবেব দবজাটা বন্ধ কবে দিল ছেলেটা। শুভাব মুখে শংকা, চোখে বিস্ময।—কি ?

বামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এগিযে এলেন। খুব কাছে। তানপুবা সবিযে দিলেন। তাবপব শক্ত দুই হাতে একেবাবে বুকেব ওপব টেনে আনলেন ওকে। —আমাদেব বিযে হবে কি হবে না ?

—ছাডো, আঃ।

বাধা পডল। দুটো পুরু ঠোঁটেব মধ্যে শব্দটা হাবিযে গেল। অসহিষ্ণু তাডনায মেযেটাকে বুঝি গ্রাসই কবে ফেলবেন।—বিযে হবে কি হবে না ?

সমস্ত মুখে বেগুনে বং শুভাব। কাপছে। নিজেকে ছাডিযে নিতে চেষ্টা কবছে। —কি কবছ ! ছাডো, কেউ এসে গেলে—

আবাব আসুবিক বাধা পডল। তাবপব আবাব সেই প্রশ্ন।— আমাদেব বিযে হবে কি হবে না ?

হাল ছেডে ওই মেযে কালো টানা-টানা দুই অসহায চোখ তাঁব মুখেব ওপব বাখল। —হবে। ছাডো।

এই ঘটনাব ঠিক পাঁচদিনেব মাথায ওই মেযে নিখোঁজ। যে চাবটে ছেলে তাব প্রত্যাশায বাডিতে আসত, তাদেব দেখা মিলেছে। বামকৃষ্ণ চক্রবর্তী আব তাদেবও ধাবণা, স্টুডিওবই কোনো একান্ত গুণগ্রাহীকে নিযে শুভা গাঙ্গুলী উধাও হযেছে। দিদিব মুখে শুনেছে, যাবাব আগে ওই পাচদিনেব মধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে নিজেব নামেব সব টাকাও তুলে নিযে গেছে।

..তিবিশ বছব বাদে এই দেখা।

বামকৃষ্ণবাবু জিজ্ঞাসা কবলেন, কি দেখছ ?

তেমনি হাসিমুখে মহিলা জবাব দিলেন, তোমাকেই দেখছি।. তিবিশটা বছব কেটে গেল, এ যেন বিশ্বাস হয না—, মনে হয সব সেদিনেব কথা। চোখ বুজে তোমাব সেই গান শোনা আজও যেন চোখেব সামনে দেখছি।

বামকৃষ্ণবাবু অস্বস্তি বোধ কবতে লাগলেন। পুবনো দিনেব স্মৃতিব শুধু এটুকুই চোখে ভাসাব কথা নয।

বমণীব কালো মুখে খুশিভবা কৌতুক।—আচ্ছা, তোমাব বউ রূপসী ছিলেন নিশ্চয ?

—রূপসী না হোক, মোটামুটি ভালোই ছিলেন দেখতে। জবাবটা দিতে পেবে মনে মনে খুশী হলেন বামকৃষ্ণবাবু।

মুখ টিপে হাসছেন মহিলা। আবাব কি মনে পডল হঠাৎ। মুখে সেই বকমই

কৌতুকের মিষ্টি ছটা।—আর তোমার পরের সব বইয়ের নায়িকারাও কি প্রায় সুন্দরী নাকি?

এবারে আর রামকৃষ্ণবাবু জবাব দিলেন না। ভিতরে ভিতরে কেন যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন জানেন না। পুরনো স্মৃতি সবই মুছে গেছল, তিরিশ বছর বাদে আবার সেটা তাজা করে তোলার ব্যাপারে কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। ভিতরে তাঁর একটাই কৌতূহল। শুভা গাঙ্গুলীকে আজ তিনি এখানে এই বিজনে এ অবস্থায় দেখছেন কেন? অথচ কালো মুখের ওই হাসির সঙ্গে যেন সত্তার যোগ—পিছনে যা ফেলে এসেছেন তার জন্যে যেন এতটুকু খেদ নেই, ক্ষোভ নেই।

প্রশ্নের সুযোগ মহিলাই দিলেন। বললেন, এতকাল পরে দেখা, আমার কোনো খবর জিজ্ঞাসা করলে না তো?

—জিজ্ঞাসা করলে বলবে?

—ওমা, না বলার কি আছে!

—এই জীবনে অভ্যস্ত হতে তোমার কতদিন লেগেছে?

—বেশি দিন না। গানের কল্যাণে ভারী সহজেই সব সয়ে গেল।

—অর্থাৎ যার জন্যে তোমার এতখানি আত্মত্যাগ, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই তোমাকে ছেড়ে গেছেন?

জবাব দিলেন না। রামকৃষ্ণবাবুর আবার মনে হল, কালো মুখের তলায় তলায় আবার সেই বিচিত্র হাসির উৎসমুখ যেন খুলে গেছে। কালো ত্বকের ভিতর দিয়ে সেই হাসির তরঙ্গও বুঝি দুচোখ মেলে দেখার মতো।

—জবাব দিলে না! রামকৃষ্ণবাবু বললেন, তবু আরো একটু কৌতূহল আমার —আমাদের সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে যে মানুষটিকে সেদিন অনুগ্রহ করেছিলে তাকে কি আমি চিনি?

সমস্ত মুখেই হাসি চিকচিক করছে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে রামকৃষ্ণবাবুর। এবারে মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়লেন মহিলা— অর্থাৎ চেনেন।

—নাম বলবে না বোধ হয়?

—বললে কি করবে, তিরিশ বছর বাদে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ছুটবে?

—না, শুধু জানার ইচ্ছে। আর সত্যিই তুমি সুখী কিনা।

কালো মুখে সেই হাসির নিঃশব্দ তরঙ্গের ছেদ নেই। হাসিমাখা দুই চোখ তার চোখের ওপর অপলক কৌতুকে স্থির হয়ে আছে। তেমনি মিষ্টি স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর মহিলার। বললেন, তার নাম রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী—যে ভদ্রলোক চোখ বুজে আমার গান শুনত আর কল্পনার জোয়ারে ভাসত, যার গল্পের নায়িকারা সকলেই সুন্দরী, আর যে ভদ্রলোক আমাকে ছেড়ে আমার গানকে বিয়ে করার জন্য একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল। আমি সরে এসে তাকে রক্ষা করতে পেরেছি, নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছি —আমার মতো সুখী কে আছে!

মুহূর্তের মধ্যেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা তোলপাড় কাণ্ড ঘটে গেল বুঝি রামকৃষ্ণবাবুর ভিতরে ভিতরে। তারপর নির্বাক, নিস্পন্দ, বিমূঢ়, একেবারে।

কালো মুখের হাসির আলো মিলায়নি একটুও। ঈষদুচ্চ স্নিগ্ধ গলায় ডাকলেন, লছমন।

স্থানীয় সেই লোকটি এগিয়ে এলো।

মহিলা সুন্দর হিন্দীতে বললেন, বাবুজী যাবেন এখন, অন্ধকার হয়ে আসছে, সঙ্গে গিয়ে টাঙ্গায় তুলে দিয়ে এসো।

কথার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, হাসির তরঙ্গ কমেছে, কিন্তু সমস্ত মুখে তার কমনীয় রেশ ছড়িয়ে আছে। বললেন, ভজনের সময় হল, আমার আর বসার জো নেই—

যন্ত্রচালিতের মতো উঠলেন রামকৃষ্ণবাবুও। বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে আছেন তেমনি। চোখে পলক পড়ে না।

শুভা গাঙ্গুলী তিরিশ বছর আগে মুছেই গেছে।

সামনে যাকে দেখছেন তিনি মাতাজী।

বাঘিনীর নিঃশব্দ গর্জন

আজও গ্রামই দেখবেন লোকনাথবাবু ভাবেননি।

তেত্রিশ বছর আগে বরং এই বর্ধিষ্ণু গ্রামে শহরের কিছু ছাঁদছিরি এসেছিল। এখানকার কাঠের ব্যবসা ফলাও হয়ে উঠেছিল। দূরের মানুষদের আনাগোনা বেড়েই চলেছিল। ফলে তখনই এর থেকে ঢের বেশি চেকনাই দেখা গেছল। তেত্রিশ বছর বাদে এখানে পা দিয়ে লোকনাথবাবুর কেবলই মনে হতে লাগল—সমস্ত গ্রামটা যেন ভয়ানক বুড়িয়ে গেছে আর আফিমখোরের মতো ঝিমুচ্ছে। শুধু তাই নয়, এখানে দিনকতক কাটালে এখানকার জরা বুঝি তাঁকেও ছেকে ধরবে।

অথচ দিনকয়েক এখানে থাকার বাসনা নিয়েই এসেছেন লোকনাথবাবু। জীবনের প্রথম বিশটা বছর এই জায়গার সঙ্গে নিবিড় যোগ তাঁর। যদিও বছরের বেশির ভাগ সময়েই দূরের শহরে কাটাতে হত তাঁকে। এই দশা হলেও এখানে নাকি হাই স্কুল আছে একটা। তখন প্রাইমারী স্কুল ছিল। সেখান থেকে বৃত্তি পাওয়ার ফলে কাকা উদার হয়ে কাকীমার অমতে শহরের হাই স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে। কাকীমার ইচ্ছে ছিল, নিজের ছেলেকেই শুধু শহরের স্কুলে পড়তে পাঠান, একসঙ্গে দুজনকে বোর্ডিং-এ রেখে পড়ানোর সংগতি কোথায়? ভাসুরপো বরং বাবুদের কাঠের গুদামে বা জঙ্গলের কাজে লেগে যাক।

কাকা অনেক কারণে চক্ষুলজ্জায় পড়েছিলেন। প্রথম কারণ, মরার আগে লোকনাথবাবুর বাবা কাকার হাতে কিছু টাকাকড়ি তুলে দিয়ে গেছলেন। আর মাতৃহীন ছেলেটাকে মানুষ করার আকূতি জানিয়ে গেছলেন। দ্বিতীয় কারণ, কাকার আগে লোকনাথবাবুর বাবাই কর্তাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। বাবা অকালে মারা যেতে তাঁর জায়গায় কাকা জাঁকিয়ে বসেছেন। এই কাকাকে বুড়ো কর্তামশাই খুব একটা

সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু অতিবৃদ্ধ তিনি তখন, আর তাঁর তিন ছেলের মধ্যে মেজ আর ছোটই সর্বব্যাপারে মাতব্বর তখন। বড় ছেলেই বাপের এত বড় কাঠের ব্যবসা আর জঙ্গল তত্ত্বাবধানের প্রধান সহায় ছিলেন। সেই ছেলে শিকারে বেরিয়ে বাঘের থাবার ঘা নিয়ে ফিরলেন। তারপর একটু একটু করে দেহ বিষিয়ে চোখ বুজলেন। সেই শোক তাঁর বৃদ্ধ বাপ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি। লোকনাথবাবুর কাকা ওই ছোট দুই ছেলের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন একসময়। তাদের অনেক রকমের হুকুম তামিলের মানুষ ছিলেন। তাই লোকনাথবাবুর বাবা চোখ বুজতে কাকাকেই তার বাবার জায়গায় বসিয়ে দিলেন। সেই জায়গার গালভরা নাম হল ম্যানেজার। কিন্তু আসলে গোমস্তা। লোকনাথবাবুর বাবা বড়ো কর্তার স্নেহের ভাগীদার ছিলেন, কিন্তু কাকা শুধুই গোমস্তা। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। তেত্রিশ বছর আগে সেটা একেবারে কম কিছু নয়। কিন্তু বুঝে-শুনে চলতে পারলে আরো অনেক দিকে আয়ের পথ খোলা ছিল। সে-রকম বুঝেশুনে চলার বুদ্ধিও কাকার ছিল। তবু ভাইপোর বাবার জায়গায় তিনি বসেছেন, এটা বোধহয় ভুলতে পারেন নি।

তৃতীয় কারণ, চক্ষুলজ্জা। নিজের ছেলেটা কোনরকমে প্রাইমারী পাশ করেছে তাকে শহরের স্কুলে পড়তে পাঠাবেন আর জলপানি পাওয়া ভাইপো এখানে বসে থাকবে, শুনলে কর্তাবাবুরাই বা বলবেন কি? বাইরের পাঁচজনের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল।

আর ভাইপোকে শহরের স্কুলে পড়তে পাঠানোর শেষ কারণ সম্ভবত ভবিষ্যতের আশা। নিজের ছেলেকে দিয়ে সেরকম আশা করেননি। ভাইপো যদি লেখাপড়া শিখে একটা পাশ দিয়ে বিদ্বান হয়ে আসতে পারে, তাহলে কর্তাবাবুদের এতবড় বিষয়-আশয়ের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব ঢের বাড়বে। ওর ভাইপো কোনদিন তার অবাধ্য হতে পারে সেটা কল্পনার বাইরে। অতএব ভাইপোকে বিদ্বান করে সুখে কাল কাটানোর একটা স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন হয়তো।

বয়সে বছর পাঁচেকের বড় এক দিদি আছেন লোকনাথবাবুর। বাবা সেই দিদির ভালো বিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। লোকনাথবাবু আর কাকার ছেলে মন্মথ সমবয়েসী। দুই এক মাসের তফাত। দু'জনেই তারা শহরের স্কুলে পড়তে চলে গেছলেন। পুজো আর গ্রীষ্মের বড় ছুটিতে তো বটেই—একসঙ্গে পাঁচটা দিনের ছুটি পেলেও মন্মথকে পাঠিয়ে দেশের বাড়িতে চলে আসার জন্য ছটফট করতেন লোকনাথবাবু। গাঁয়ের পয়সা ভেঙে একা আসাটা কাকা-কাকীমা বরদাস্ত করবেন না, তাই মন্মথকে চাই। মন্মথর কিন্তু শহর ছেড়ে আসার ঝোক পরের দিকে,তেমন ছিল না। লোকনাথ বরাবরই ছুটে চলে আসার জন্য পাগল। এখানকার আকাশ বাতাস নদী জঙ্গল পাহাড় সব ভালো লাগত তার। এরা যেন হাতছানি দিয়ে সর্বদা ডাকত তাঁকে।

...আজ তেত্রিশ বছর বাদে সেইখানেই এসেছেন। এসে যেন পায়ে পায়ে ঠোক্কর খাচ্ছেন।

কাকা তো অনেককাল বিগত। মন্মথও নেই। তার ছেলেরা এখানে ছোটখাট

কাঠের কল দিয়ে বসেছে একটা। শহরের সঙ্গে যোগাযোগও এত বছরে আগের থেকে ঢের সহজ হয়েছে। লরি আর বাস চলার পাকা সড়ক হয়েছে। উঠতি মানুষেরা শহরের দিকেই ছুটেছে। সেখান থেকে আরো দূরে দূরে গেছে। ফলে যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বেড়েছে অথচ শহর গ্রামের দিকে এগিয়ে আসেনি, গ্রামের প্রাণ শহরের দিকে ধাওয়া করেছে।

লোকনাথবাবুর বাস এখন কলকাতায়। কম করে সাড়ে তিনশ' মাইল দূর এখান থেকে। কর্মজীবনে ভারত সরকারের চাকরি নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরেছেন। এখন কলকাতায় বহাল আছেন। বয়েস এখন তিপ্পান্ন তাঁর। চাকরির মেয়াদ আরো পাঁচ বছর। পদস্থ ব্যক্তি তিনি। কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি। মন্মথর বড় দুই ছেলে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল। বিশ বছর বয়সে দেশছাড়া লোকনাথবাবু আর ও-মুখো হননি, মন্মথ বিয়ে করেছে কি করেনি এ খবরও তার জানা ছিল না। ছেলেদের চেনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কোথা থেকে কেমন করে তার আপিসের ঠিকানা সংগ্রহ করে তারা এক দুপুরে সেখানে এসে হাজির। ওদের পরিচয় পেয়ে লোকনাথবাবু আদর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। একটা সস্তার হোটেলে উঠেছিল, সেখান থেকে ওদের তুলে এনে নিজের কাছে রেখেছিলেন ক'টা দিন। এত বড় মানী জ্যাঠার (মন্মথর থেকে লোকনাথবাবুই মাস দেড় দুইয়ের বড় ছিলেন) আন্তরিক আদরযত্নে ছেলে দুটো মুগ্ধ। ওদের মুখেই লোকনাথবাবু খবর পেলেন মন্মথ আর নেই। মা আছেন। বাবার কাঠের কল এখন ছেলেরা চালাচ্ছে। মন্মথর তিন ছেলে। ছেলেরা নাকি তাদের বাবার মুখে এই জ্যাঠার গল্প অনেক শুনেছে। লোকনাথবাবুর বড় চাকুরে হবার কথা মন্মথর জানা অস্বাভাবিক নয়। দেড় বছর আগেও লোকনাথবাবুর দিদির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল।

যাবার আগে ওই দুই ছেলে বার বার তাঁকে অনুরোধ করেছিলো একবারটি তিনি যেন দেশে আসেন। লোকনাথবাবু কথা দিয়েছিলেন যাবেন।..এখনকার এই আকাশ বাতাস নদী পাহাড় জঙ্গল প্রায় তিন যুগ বাদে আবার তাঁকে ডেকেছে, হাতছানি দিয়েছে। এর কারণ ওই ছেলেদের জানার কথা নয়। প্রথম সুযোগে তিনি চলে এসেছেন।

মন্মথর বউ আর ছেলেরা তাকে পেয়ে মহা ব্যস্তসমস্ত। তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সকলের বিশেষ নজর। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তিন ছেলের একজন না একজন ছায়ার মতো তার সঙ্গে লেগে আছে। শেষে নিরুপায় হয়ে লোকনাথবাবু বলেছেন, এ জায়গার সবকিছু আমার বড় চেনা, আমি নিজের মনে দু'-চারদিন বেশ বেড়াব--আমার জন্যে তোমরা নিজেদের কাজের ক্ষতি কোরো না।

মানী জ্যাঠার মন বুঝে ছেলেরা কিছুটা অব্যাহতি দিয়েছে তাঁকে।

...তেত্রিশ বছর আগে তাঁরা যেখানে থাকতেন মন্মথর ছেলেরা এখন আর সেখানে থাকে না। ওদের বাবাই নাকি এখানে এই কাঠের বাড়ি করে রেখে গেছে।

এখানে এসে এক ঘণ্টার মধ্যে লোকনাথবাবু তাঁদের আদি বাসস্থান দেখতে গেছলেন মন্মথর বড় ছেলেকে নিয়ে। দেখে হতভম্ব তিনি।... তাঁদের সেই কাঠের

দালান প্রায় নিশ্চিহ্ন। চারদিক জঙ্গলে ছেয়ে আছে। অদূরে কর্তাদের সেই চকমিলানো দালানেরও প্রায় সেই অবস্থা। সমস্ত গাঁয়ের মধ্যে ওটাই ছিল একমাত্র তিন-মহলা দালান। ভাঙা জীর্ণ একটা কংকাল শুধু দাড়িয়ে আছে। সেটার নানা দিক খসে ধসে পড়ছে। সর্বাঙ্গে পুরু শ্যাওলা জমে আছে। বাড়িটার পিছনের দিকে ছিল মস্ত একটা দীঘি। দীঘিটাও কর্তাদেরই ছিল, কিন্তু ওই বাড়ির আঙিনার বাইরে ছিল ওই দীঘি। বাড়ির মুখোমুখি ঘাটটা বাবুদের নিজস্ব—অন্য দিকের ঘাট দুটো কর্তাদের পোষ্য এবং অনুগ্রহভাজনেরা ব্যবহার করতে পারত। ঘাটের তিনদিকেই বেশ সাজানো গাছের সারি ছিল। বাবুদের ঘাট—তাই বাবুঘাট ছিল ওটার নাম।

পায়ে পায়ে ঘাটের দিকে এলেন লোকনাথবাবু। চোখে কাটা বিঁধল যেন। চারদিক জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল ছিল, এখন সেই জল একেবারে তলায় এসে ঠেকেছে—তার ওপর যেন সবুজ সর পড়ে আছে একটা। দেখলেই বোঝা যায় কেউ আর এখন এই জল ছোয় না। বাধানো সিঁড়িগুলোও ভেঙে ফেটে চৌচির হয়ে আছে।

লোকনাথবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার, দেববাবুদের কোনো বংশধরও আর এখানে থাকে না?

মন্মথর বড় ছেলের নাম সুবল। সে বলল, না, মাত্র বছর পাঁচেক আগে বাড়ি-ঘর, বিষয়আশয় সব বেচে দিয়ে তারা এখান থেকে চলে গেছেন। এই বাড়ি আর জায়গা-জমি কি সব কাজে লাগানো হবে বলে সরকার কিনে নিয়েছিল, কিন্তু কিছুই হয় নি, তেমনি পড়ে আছে।

—মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এই দশা?

সুবল বলল, খারাপ দশা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল—ভাগের মা গঙ্গা পায় না, বাড়ি-ঘরদোর কে দেখে! কর্তাদের দু'ভাইয়ের মিল ছিল খুব, দু'জনে একসঙ্গেই নেশা-টেশা করত, কিন্তু তাদের ছেলেদের মধ্যে বনিবনা ছিল না একটুও—বউদের মধ্যেও না। তবু কর্তারা বেচে ছিলেন বলে তখনো খাওয়া-খাওয়ি শুরু হয়নি, আর ব্যবসাপত্রও চালু ছিল। ছেলেপুলেসুদ্ধ সেই ডাকাতের হাতে পড়ার পর বাতারাতি অতবড় ব্যবসা অর্ধেক হয়ে গেল, তারপর কিছুদিনের মধ্যে—

লোকনাথবাবু অবাক।—ছেলেদেরসুদ্ধ কর্তারা ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন নাকি? কোথায়?

সুবল সোৎসাহে বলল, ও, আপনি তো কিছুই জানেন না—সে এক তাজ্জব কাণ্ড! সেও বছর ছয় আগের কথা, মাসে তখন বুড়ো কর্তারা একবার করে জঙ্গলে যেতেন আদায়পত্র দেখাশুনা করতে। নেশার কল্যাণে তখন ইজারার একটা জঙ্গলই হাতে ছিল, কর্তাদের সঙ্গে তাঁদের ছেলেরা থাকতেন।

একবার ওমনি জঙ্গলে গিয়ে তিন দিন বাদে ছেলেদের কোথায় রেখে শুধু কর্তারা দুই ভাই ফিরে এলেন। তাঁদের সে মুখের দিকে তাকানো যায় না, যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে। দু'জনের দুই-দুই চার ছেলেকে কোথায় রেখে এলেন কেউ জানে না। ফিরে এসেই অত বড় ব্যবসার অর্ধেকই বেচে দিলেন তাঁরা—আর

কাউকে সঙ্গে না নিয়েই আবার জঙ্গলে ছুটলেন। তার পরদিনই অবশ্য কর্তাদের সঙ্গে তাদের চার ছেলেও ফিরলেন—কিন্তু ছ' মাসের মধ্যে কি ব্যাপার কেউ একটি কথাও জানল না।

ছ' মাস বাদে সরকারের কাছে এই সব বেচে এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে ব্যাপারটা জানাজানি হল। যাবার আগে পুলিসের কাছে একটা রিপোর্টও করে গেলেন না তাঁরা এটাই আশ্চর্য। জঙ্গল থেকে ফেরার সময় ওই চার ছেলেসহ দুই কর্তা ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। জঙ্গলের ধারেকাছে ডাকাত আছে এমন খবর কেউ কখনো শোনেনি। সেই ডাকাতের দল নাকি তাদের ধরে বহু দূরে তাদের গোপন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলেছিল—যাবার সময় মোষের গাড়িতে সরুলের চোখ বেঁধে নিয়ে গেছে। তারপর বহু হাজার টাকা ছেলেদের মাথার বিনিময়ে মুক্তিপণ হেঁকে চোখ বেধে শুধু বুড়ো কর্তা দুজনকে জঙ্গলের বাইরে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে। টাকা দেবার জন্য পাঁচটি দিন সময় দেওয়া হয়েছিল তাদের—তার মধ্যে জঙ্গলে টাকা না নিয়ে এলে বা কোনরকম চালাকি খেলতে গেলে চার ছেলেরই মৃতদেহ সোনালীর জলে ভাসবে বলে শাসিয়ে দিয়েছে। টাকা নিয়ে ঠিক দিনে তারা জঙ্গলে গেলেই বাদবাকি ব্যবস্থা তারা করবে।

টানা প্রায় ছ'মাস কর্তাদের ছেলেরা ভয়ে সিটিয়ে ছিল। তাছাড়া বাপেরাই হয়তো ছেলেদের কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করে থাকবেন। কিন্তু সব ছেড়েছুড়ে চলে যাবার আগে তাদের ভয় ভেঙে গেছল। ছেলেরাও মদের নেশায় পোক্ত হয়ে উঠেছিল, সেই মদের ঝোকেই তারা সব ফাস করে দেয়। তারা নাকি খুব ভালো করেই জানে, ওই ডাকাত দলের সর্দারণী একজন মেয়েছেলে। তারা তাকে দেখেনি, কিন্তু টের পেয়েছে।

ঘটনাটা শুনে বেশ অদ্ভুতই লাগল লোকনাথবাবুর। পাহাড়ে জঙ্গলে ডাকাতের উৎপাত হতে পারে, যদিও আগে এ-রকম ঘটনার কথা কখনো শোনা যায়নি। আর আগে থাকতে খবর নিয়ে আটঘাট বেধে যদি ডাকাতেরা কাজে নেমে থাকে—তাহলে মুক্তিপণ হাঁকাটাও অসম্ভব কথা কিছু নয়। কিন্তু ভয়ের চোটে ঘটনার ছ'মাস বাদেও এরা কাউকে কিছুই বলেননি সেটাই আশ্চর্য। হয়তো বা ডাকাতরা শাসিয়ে রেখেছিল, পরেও কাউকে কিছু বললে আর এ নিয়ে পুলিশের তত্ত্ব-তল্লাসী চললেও তাঁদের গর্দান যাবে।

লোকালয় ছাড়িয়ে মাইল দুই হাঁটলে সোনালী নদী। বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ পায়ে পায়ে সেই দিকে চললেন লোকনাথবাবু। এই এলাকাটাই একসময় সব থেকে প্রিয় ছিল তার। স্কুল-কলেজের বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত এখানে এলে এদিকটাই সব থেকে বেশি চষে বেড়িয়েছেন তিনি।

শীতের অপরাহ্নের মিঠে রোদ, হাঁটতে ভালো লাগছে। এদিকে পা বাড়ানোর পর আরো ভালো লাগছে। তৃষ্ণার্ত দুই চোখ মেলে সোনালীর দিকে এগিয়ে চলেছেন। নদীর দুদিকে সোনার মতো ঝকঝকে বালুর চর—এই জন্যেই নদীর নাম সোনালী বোধ হয়।

দূর থেকে লোকনাথবাবু হতাশ হলেন একটু। সব-কিছুর মতো সোনালীও বুড়িয়ে গেছে মনে হল। নদীর দু'দিকে চরের পরিধি দ্বিগুণ বেড়ে গেছে মনে হল। কাছে এসে দেখলেন সোনালী অর্ধেক সরু হয়ে তিরতির করে বইছে এখনো, সেই জলে পায়ের পাতা ডোবে কিনা সন্দেহ।

শীতের সময় আগেও অবশ্য হাঁটুজলের বেশি গভীর ছিল না সোনালী। তবে চওড়া এর তিনগুণ ছিল। আর বর্ষায় তো এই সোনালীরই দুকূল ছাপানো সংহার মূর্তি। সুবল ওদের মুখে শুনেছেন, দূরের কোথায় বাঁধ হবার ফলে এখন নাকি বর্ষায়ও সোনালী আর তেমন ভরে ওঠে না।

এখানে এসে বয়েস ভুলে গেলেন লোকনাথবাবু। সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে দিতে দুই চোখে সেই আগের দিনের তৃষ্ণা উপচে উঠল। তিরতিরে জলের ওধারে প্রায় দেড় মাইল পর্যন্ত ধু-ধু বালুর চর। তার ওধারে ঘন জঙ্গলের রেখা। তারও ওধারে সারি সারি বিচ্ছিন্ন পাহাড়।

...আগে হামেশাই লোকনাথবাবু শুকনো চর পার হয়ে ওই জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতেন। দু'পাশের জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে আগে পায়ে-হাঁটা-রাস্তা ছিল। এখন কি হয়েছে জানেন না। জঙ্গলের ধারে ধারে আদিবাসী গরীবদের বসতি ছিল। সেগুলো গাছের আড়ালেই ছিল বলে আগেও এত দূর থেকে দেখা যেত না। কর্তাদের ইজারার জঙ্গল এদিকে নয়—সেটা পশ্চিমে। দেবরায়দের সেই চকমিলানো বাড়ির এক-আধ মাইলের মধ্যেই জঙ্গল শুরু হয়েছে। তাঁদের জঙ্গলও সেইদিকেই ছিল, তবে বহু দূরে। দেবরায়দের ওই বাড়ির ছাদে উঠে লোকনাথবাবু একমনে দাড়িয়ে সেদিকের জঙ্গলও দেখতেন। কিন্তু তার সব থেকে ভালো লাগত এ-দিকটা—এই সোনালীর দিকটা।

জুতোজোড়া হাতে নিয়ে লোকনাথবাবু সাগ্রহে সোনালী পেরিয়ে ওদিকের চরে গিয়ে উঠলেন। তারপর ওই জঙ্গল আর পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে চলতে লাগলেন। তেত্রিশ বছর বাদে আবার সেই ছেলেবেলায় ফিরে এসেছেন যেন তিনি। মনের আনন্দে এগিয়ে চললেন।

চর শেষ হল। এদিকটায় জলের রেখাও নেই আর। লোকনাথবাবু ওপারের ডাঙায় গিয়ে উঠলেন। দূর থেকে বনের লাইন যেমন নিশ্ছিদ্র মনে হয় তা নয়। তেত্রিশ বছর আগে যেমন দেখেছিলেন, এ-দিকটায় তার থেকে অন্তত ঢের উন্নতি হয়েছে। বনের মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে। গাছ-গাছড়ার আড়ালে বেশ সুন্দর কাঠের বাড়িও দেখা গেল গোটাকতক।

ঘন বন একপাশে রেখে আপনমনেই হাটতে লাগলেন। জঙ্গলে হিংস্র জন্তু জানোয়ার আছে, লোকালয়ের দিকটায় তাদের পদার্পণ ঘটার কথা নয়।

একটা জীপ পাশ কাটিয়ে গেল। ড্রাইভারের পাশে একজন বয়স্কা রমণী বসে। পরনে ছাপাশাড়ি, মাথায় ঘোমটা। এক নজর তাকিয়ে বাঙালী মনে হল না লোকনাথবাবুর। কারণ নাকে বড়সড় একটা সোনার নথ। কিন্তু অবাক কাণ্ড, জীপের গতি শিথিল হল, আর সেই রমণী তার আসন থেকে ঝুঁকে পিছনের দিকে তাকিয়ে তাঁকে দেখতে লাগল।

তিনি খানিকটা এগিয়ে আসতে প্রায়-থামা জীপটা হঠাৎ স্পীড বাড়িয়ে চলে গেল। নথ-পরা রমণীর ফর্সা গোলগাল মুখ, কিন্তু মুখের আদল লক্ষ্য করার সুযোগ হয়নি লোকনাথবাবুর। ভাবলেন, হয়তো কোনো চেনা লোক ভেবেছিল রমণী, চেনা নয় দেখে চলে গেল।

নিজের মনে আরো অনেকখানি এগিয়ে গেলেন লোকনাথবাবু। পাশের বন ক্রমে গভীর হয়ে উঠছে, অন্যদিকে লোক-বসতির আভাস আর চোখে পড়ছে না। আদিবাসীদের কুঁড়েঘরের বসতি দেখেছেন। এখন আর তাও চোখে পড়ছে না।

এত পথ এভাবে হেঁটে এসে ভালো করেন নি, লোকনাথবাবু ফিরলেন। একটু তাড়াতাড়িই পা চালালেন। যতটা এসেছেন, সোনালীর চরে পৌঁছুতে কম করে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে।

কাছাকাছি এসে গেছেন, আর শতখানেক গজ পথ শেষ হলেই সোনালীর চরের সামনে পৌঁছবেন। চকিত হয়ে পিছন ফিরে তাকালেন। একটা জীপ তীরের মতো এদিকেই ছুটে আসছে— তারই শব্দ। সেই জীপটাই কিনা বুঝলেন না। বাধানো হলেও সরু রাস্তা। অত স্পীডে আসতে দেখে লোকনাথবাবু বিরক্ত হয়েই পাশ দেবার জন্য একধারে সরে দাড়ালেন।

কিন্তু আশ্চর্য, একটু বাদে জীপটা তাঁর পাশেই ঘ্যাঁচ করে দাড়িয়ে গেল। হ্যাঁ, আগের সেই জীপই। কিন্তু এতে ড্রাইভারের পাশে রমণীর বদলে অন্য একটি অল্প-বয়সী লোক। আর জীপের পিছনে আরো দুটি ছেলে।

চারজনই জীপ থেকে নেমে এলো। তাদের পরনে পরিষ্কার ট্রাউজার আর গায়ে টেরিকটের হাফ-শার্ট। চারজনেরই মুখের আদল একরকম। দেখলেই মনে হবে চার ভাই। কালোর ওপর বেশ মিষ্টি চেহারা। টানা চোখ। সব থেকে আগে চোখে পড়ে স্বাস্থ্যসম্পদ। ওই দুটো করে বাহু যেন দুনিয়ার অনেক শক্তি কেড়ে নিতে পারে।

চারজনই এগিয়ে এসে হাত কপালে ঠেকিয়ে সবিনয়ে নমস্কার করল তাকে। লোকনাথবাবুও বিমূঢ় মুখে প্রতি-নমস্কার জানালেন। এদের মধ্যে সকলের বড়টির বছর বত্রিশ বয়েস হবে, আর সকলের ছোটর বছর পঁচিশ। ওই বড়জনই জীপ চালাচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার নাম লোকনাথ মিত্র?

বিমূঢ় মুখে লোকনাথবাবু মাথা নাড়লেন— নামটা তারই বটে।

—আপনাকে একবারটি আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।

লোকনাথবাবু আকাশ থেকে পড়লেন।—কোথায়?

—জীপে গেলে খুব বেশি দূর নয়, আপনি কিছু ভাববেন না, আপনাকে আবার আমরা পৌঁছে দেব।

লোকনাথবাবু ভেবাচাকা খেয়ে গেলেন।—আমি তো আপনাদের চিনি না, কোথায় যেতে হবে? কেন যেতে হবে?

—আমাদের মা একবারটি আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

—আপনাদের মা। আপনাদের মা কে?

ছেলেটা হাসল। হাসিটা মিষ্টি। জবাব দিল, মা মা-ই, আসুন।

লোকনাথবাবু ফাঁপরে পড়লেন। বললেন, আমি তো এখানে কাউকেই চিনি না —বহুকাল বাদে এদিকে এসেছি, কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে, আমাকে কেউ এখানে ডাকতে পাবেন না।

ছেলেটা গম্ভীর হঠাৎ। অন্য সকলেও।

বলল, মায়ের ভুল হয় না।—ঘণ্টাখানেক আগে এই জীপে করে যাবার সময় মা আপনাকে দেখেছেন, তাছাড়া আপনার নাম করেই তো আপনাকে নিয়ে যেতে হুকুম করেছেন?

তাও তো বটে।—নথ-পরা সেই রমণীই এদের মা তাহলে। আপনি ছেড়ে এবারে তুমি করে বললেন লোকনাথবাবু।—তোমাদের মায়ের নাম কি?

এই জেরার মধ্যে পড়ে ছেলেগুলো বিরক্ত যেন। ওই বড় ছেলেই জবাব দিল, মা-কে আমরা মা বলেই জানি, নাম-টাম জানি না।

অবাক ব্যাপার। এত বড় বড় ছেলেরা মায়ের নাম জানে না, এও কি বিশ্বাস্য।

'তুমি' ছেড়ে আবার আপনি করে বললেন লোকনাথবাবু। ব্যাপার-গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না তাঁর।—আপনাদের বাবার নাম কি?

এবারে বড় ছেলেটা স্পষ্টই বিরক্ত।—দেখুন, কোনো কথা না বলে মা আপনাকে শুধু নিয়ে যেতে বলেছেন— আপনি নির্ভয়ে গাড়িতে এসে উঠুন, আবার আপনাকে আমরা পৌঁছে দিয়ে যাব।

মনের ভাব চেপে জিজ্ঞাসা করলেন, গিয়ে আবার ফিরতে কতক্ষণ লাগবে?

—যেতে-আসতে বড়জোর সোয়া-ঘণ্টা, তারপর মা যতক্ষণ আটকে রাখেন আপনাকে।

তার মানে কম করে দু' ঘণ্টা। এখনই পাঁচটা বাজে, শীতের আলোয় টান ধরেছে। মাথা নেড়ে বললেন, আমি এখন যেতে পারছি না, এখানে নতুন মানুষ আমি, আপনার মা-কে বলবেন—

—দেখুন, আপনিই মিছিমিছি দেরি করছেন। মায়ের হুকুমে আমরা আপনাকে নিতে এসেছি। তিনি নিয়ে যেতে বলেছেন, আমরা নিয়ে যাব। আপনি দয়া করে গাড়িতে উঠুন।

বিনীত কথাগুলোর মধ্যে এমনই একটা দৃঢ়তার সুর যে ভিতরে ভিতরে বিষম অস্বস্তিবোধ করলেন লোকনাথবাবু। এই নির্জনে জোর করে জীপে টেনে তুললেই বা কি করতে পারেন তিনি। সকলের মুখের দিকেই তাকালেন একবার। এই অযথা বিলম্ব ওরা কেউ পছন্দ করছে না।

দুর্গা নাম নিয়ে জীপের দিকে এগোলেন। তা ছাড়া তার ক্ষতিই বা কি হতে পারে? তেত্রিশ বছর বাদে এখানে এসেছেন, ক্ষতি করতে খামোখা কেউ চেষ্টাই বা করবে কেন? নথ-পরা একজন রমণী যে ঝুঁকে দেখছিল তাঁকে, আর এরা এসে নামটাও তো ঠিকই বলেছে।

ওই বড় ছেলে এবারে নির্বাক অথচ সাদর আপ্যায়নে তাঁকে এনে ড্রাইভারের পাশে বসালো। নিজে চালকের আসনে বসল। পরের তিন ছেলে পিছনে।

জীপ ছুটল।

যে গতিতে ছুটল তাতেই ভয় ধরে গেল লোকনাথবাবুর। মাইলের কাঁটা পঞ্চাশের দাগ ছুঁয়েছে। এই স্পীডে যেতে-আসতে সোয়া-ঘন্টা লাগলে কম করে পঁচিশ-তিরিশ মাইল যেতে হবে এখন।

আবার ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন তিনি।

আধ ঘন্টা বাদে একটা পাহাড়ের কাছাকাছি ফাঁকা জায়গায় সুন্দর একটা কাঠের বাংলোর সামনে জীপ এসে দাঁড়াল। পাশেই কাঠের স্তূপ আর একটা কাঠ-কাটা-কলের শেড চোখে পড়ল। বাংলোর বারান্দার রেলিং-এ দুটি অল্পবয়সের বউ দাড়িয়ে, আর দুটো ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছোটাছুটি করছে।

এইখানেই জীপ দাড়াল যখন, অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন লোকনাথবাবু। যাক, কোনো একটা সংসারের মধ্যেই এসে পড়েছেন তাহলে তিনি।

ছেলেরা তাকে আপ্যায়ন করে বাংলোয় এনে তুলল। সেখানেই বসার সুন্দর চেয়ার-টেবিল পাতা। দু'দিকে চমৎকার বাগান। অনেক রকমের ফুল ফুটে আছে। এই গৃহস্বামী-গৃহস্বামিনীদের রুচি আছে।

বড় ছেলে হাঁক দিল, মা কোথায়? উনি এসেছেন—

অল্পবয়সী বউ দুটি ভিতরে ঢুকে গেছে। ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে আর মেয়েটা অবাকবিস্ময়ে আগন্তুককে দেখছে।

ভিতরের দরজার কাছ থেকেই বড় ছেলের হাসি আর কথা শোনা গেল।—আরে না না—আমরা কোনরকম জোর-জবরদস্তি করিনি—বাইরের দিকে মুখ বাড়ালো সে-—আচ্ছা মশাই, আমরা আপনার সঙ্গে কোনরকম অভদ্র আচরণ করেছি?

ঘুরে তাকিয়ে লোকনাথবাবু মাথা নাড়লেন। ছাপাশাড়ির আভাস পেলেন, কিন্তু মুখ দেখতে পেলেন না। ছেলেটি তাকেই বলছে কথাগুলো।

রমণীটি এগিয়ে এলো। মাথায় ঘোমটা, নাকে বড় নথ, বয়সের দরুন সামান্য মোটার দিক ঘেষা, মুখের দিকে ভালো করে তাকান নি—কিন্তু অবয়ব দেখেই বোঝা গেল খুব ফর্সা রং।

একেবারে চেয়ারের কাছেই এগিয়ে এলো সে, মাথার ঘোমটা অনেকখানি সরে গেছে তখন। তার একপাশে ওই অল্পবয়সী বউদের একটি। ছেলেরা চারজনই সামনে দাড়িয়েছিল।

কিন্তু রমণীর মুখে একটিও কথা না শুনে সংকোচ কাটিয়ে মুখ তুলে তাকালেন লোকনাথবাবু। আর তারপরেই মাথাটা ঘুরে গেল কেমন। এই বাংলোটাই যেন প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছেন—স্বপ্ন দেখছেন কি সত্যি, ভেবে পাচ্ছেন না।

তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছে একটি রমণী। সেই হাসি তার সমস্ত মুখে, এমন কি কানের ডগা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। হাসলে গালের এক দিকে বড় একটা টোল পড়ে, তাই পড়েছে। সেই টোলের ভিতর দিয়েও যেন হাসি ঠিকরোচ্ছে। নিঃশব্দে এরকম হাসি একজনই হাসতে পারত, একজনেরই ওরকম হাসি সমস্ত মুখের রেখায় রেখায় ছড়াতো, কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে যেত, মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠত।

নিজেব অগোচবে চেযাব ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন লোকনাথবাবু। অস্ফুট বিস্ময়ে বলে উঠলেন, হাসিবানী।

নিঃশব্দ হাসিটা যত বাড়ছে ততো যেন বক্তবর্ণ হযে উঠছে মুখ। গালেব টোলে ততো বেশি খাঁজ পড়ছে। সেই হাসিব একটু ছোঁযা যেন ছেলেদেব মুখেও লেগেছে। তাবা অল্প অল্প হাসছে আব দুজনকেই নিবীক্ষণ কবছে। বউটিও তাই।

—হাসিবানী তুমি। তুমি এখানে।

চোখেব দিকেই চেযে আছে, তেমনি হাসছে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল—সে-ই বটে। পদ্মহাতেব মতো একখানা হাত তুলে তাঁকে বসতে বলল।

নিজেও স'মনাসামনি চেযাবেব একটাতে বসল। তখনো মুখ লাল। হাসি মিলাযনি। হাসি চুঁযে পড়ছে।

বউটি তাব চেযাবেব হাতলেব কাছে দাঁড়াল। একটা চেযাব টেনে বড ছেলে একেবাবে মাযেব গা ঘেঁষে বসল। বমণী তাব দিকে ফিবে একটুও শব্দ না কবে ঠোঁট নাড়ল। হাসছে তখনো।

বক্তব্য বুঝে নিযে ছেলে লোকনাথবাবুকে বলল, মা বলছেন-- আপনাকে হঠাৎ এভাবে ধবে নিযে খুব কষ্ট দেওযা হল।

লোকনাথবাবু সম্বিত ফিবে পেলেন যেন এতক্ষণে। বললেন, না, কষ্ট কিছু না। তোমাব মা-কে আজ তেত্রিশ বছব বাদে দেখলাম কোনদিন দেখব ভাবিনি, তাই অবাক হযেছি।

ছেলে হাসিমুখে বলল, আপনি তো আসতেই চাননি, ভাবলেন ডাকাতেব পাল্লায পড়েছেন। মাযেব দিকে চোখ পড়তেই সে আবাব তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না মা, সত্যিই একটুও খাবাপ ব্যবহাব কবিনি—তুমি জিজ্ঞাসা কবে দেখো না—

সমর্থনেব আশাতেই যেন হাসিবানী লোকনাথবাবুব দিকে তাকালো। অদ্ভুত লাগছে লোকনাথবাবুব। এখনো যেন সবকিছু বাস্তব ভাবতে পাবছেন না তিনি। হাসিবানীব বযেস বড়জোব বিযাল্লিশ-তেতাল্লিশ মনে হচ্ছে। কিন্তু লোকনাথবাবু জানেন, হাসিবানীব বযেস এখন একান্ন—ঠিক দু' বছবেব ছোট তাব থেকে।

বললেন, না, ওবা খাবাপ ব্যবহাব কবেনি, তোমাকে দেখব কল্পনা কবিনি তো, তাই আসতে ইতস্তত কবছিলাম।

হাসিবানীব মুখে আবাব সেই হাসি। ছেলেব দিকে ফিবে একবাব ঠোঁট নাড়লেন শুধু। সে তক্ষুনি উঠে লোকনাথবাবুব পাযে হাত বেখে প্রণাম কবল। সঙ্গে সঙ্গে বাকি তিন ছেলেও।

হাসিবানী তাদেব দিকে চেযে আবাব ঠোঁট নাড়তে পবেব ছেলে জানান দিল, মা বলছেন আমবা মাযেব এই চাব ছেলে।

লোকনাথবাবু বলে উঠলেন, বেঁচে থাকো বাবাবা, সুখে থাকো।

হাসিবানী ববাববই রূপসী, কিন্তু এই হাসিমুখ অদ্ভুত কমনীয দেখালো। আবাব তাব ইশাবা পেযে বড ছেলে হাঁক দিল, আব বউবা সব কোথায, এদিকে এসো, মা ডাকছেন—

ইত্যবসরে যে বউটি সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সেও প্রণাম সেরে উঠল। সেই বোধহয় বড় বউ। সুশ্রী। আরো তিনটি সুশ্রী বউ ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রণাম করল।

বড় ছেলে হাসছে। —মা বলছেন, এই তার চার বউ।

আশ্চর্য, মায়ের ঠোঁট নড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে তার কথা এমন পরিষ্কার বুঝে নেয় কি করে লোকনাথবাবু ভেবে পেলেন না। হাসিমুখে হাসিরানী আদুরের বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটোকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে এলো। বড় ছেলে বলল, প্রণাম করো, দাদু—

লোকনাথবাবু তাদের ধরে ফেললেন।

বড় ছেলে বলল, এই মায়ের দুই নাতি-নাতনী— এটি আমার ছেলে, এটি ভাইয়ের মেয়ে—

সুন্দর ঝলমলে সংসার। কি মনে হতে লোকনাথবাবু হাসিরানীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আর কেউ নেই?

ফর্সা মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল। ম্লান স্নিগ্ধ দুটো চোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির হল একটু। তারপর সামান্য মাথা নাড়ল— নেই।

বড় ছেলে বলল, দশ বছর আগে বাবা ব্ল্যাক ফিভারে মারা গেছেন।...এদিকটায় তখন ওই রোগ খুব হত। তারপর হেসেই বলল, মাকে কিন্তু আমরাই কক্ষনো সাদা শাড়ি পরতে দিই না।

লোকনাথবাবু মাথা নেড়ে সায় দিলেন শুধু। প্রতিমার আর যাই হোক ধ্যান মানায় না। উন্মুখ হয়ে এবার ওই ছেলেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন তিনি। কথাটা ঠোঁটের ডগায় এসে গেছল, এবারে তোমার বাবার নাম বলো, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না। দরকারও নেই, সবই বুঝতে পারছেন।

হাসিরানী বউদের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে কি ইশারা করতে তারা চলে গেল। এই ইশারাটা লোকনাথবাবুও বুঝলেন। চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বলা হল।

বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, আমি এখন কিছু খাব না—

হাসিমুখে একটু দুলিয়ে দুলিয়ে মাথা নাড়ল হাসিরানী। আঠেরো বছর বয়সেও মাথা নাড়তে হলে ঠিক যেমনটি করত। অর্থাৎ বলতে চাইল, তা হয় না।

...কর্তাদের চকমিলানো দালান থেকে আঠারো বছরের বোবা মেয়ে হাসিরানী হারিয়ে গেছল একদিন। হারিয়ে যায়নি, সকলেই ধরে নিয়েছিল প্রকারান্তরে সে আত্মঘাতিনীই হয়েছিল। নিখোঁজ হবার আগের দিনও বিপদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারী এসেছিল। আর সেটা উপেক্ষা করেই সে মরণ বরণ করেছিল।

...আর বিশ বছরের বি-এ পরীক্ষা দেওয়া এক ছেলে ভেবেছিল, দুঃখে অপমানে তার জন্যই মেয়েটা প্রাণ খোয়ালে। তার আত্মহত্যার সামিল কাজ করার জন্য সে-ই দায়ী। তেত্রিশ বছর আগে সেই ছেলেটা অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছল।

সেই ছেলে লোকনাথ মিত্র।

সে-সময়ে বুড়োকর্তার তিন ছেলের মধ্যে বড় ছেলের একমাত্র মেয়ে হাসিরানী। বাঘের থাবায় পচন ধরে যে ছেলে প্রাণ খুইয়েছিলেন তাঁর।

মেয়েটাব হাসি দেখেই বুড়োকর্তা তাব নাম হাসিবানী বেখেছিলেন বোধহয। লোকনাথ, খুড়তুতো ভাই মন্মথ, আব বুড়োকর্তাব নাতিবা আব এই নাতনী একসঙ্গে পাশাপাশি বড় হযেছে। দু' বছব বযসে হাসিবানীব টাইফযেড না কি মবণাপন্ন ব্যাধি হযেছিল। তখন ও বোগেব চিকিৎসা নেই। বাচাব কোনো আশাই ছিল না। কিন্তু বাঁচল শেষ পর্যন্ত। কথা বলাব মধ্যে সেই দু' বছব বযসেই কেমন একটু জড়তা ছিল মেয়েটাব। সেই কথা একেবাবে বন্ধ হযে গেল। কথা বলতে চেষ্টা কবলে মুখ দিযে কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ বেরুতো শুধু।

ওব পাঁচ বছব বযসে তাব বাবা সেই বাঘেব ক্ষত নিযে ফিবে এলেন। সঙ্গে ছিল বিশ্বাসী আব দুবন্ত সাহসী চাকব কিষণচাদ। চাকব বলা ঠিক হবে না, আসলে সে ছিল বড়বাবু অর্থাৎ বড় ছেলেব শিকাবেব অন্তবঙ্গ সঙ্গী। কিষণচাদ হুবহু বাঘেব ডাক ডেকে বাঘকে ভুলিযে কাছে নিযে আসতে পাবত। আবো অনেক বকম ডাক ডেকে জন্তু-জানোযাবকে ঘাবড়েও দিতে পাবত। বড়বাবুব প্রাণ বাচাতে গিযে সেই কিষণচাঁদ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হাবিযেছিল। তাব একটা মাত্র ছেলে, বছব চৌদ্দ বযেস, বাপেব মতোই ষণ্ডামার্কা হবে বড় হলে বোঝা যেত। তাব নাম মগন, সে বাবুদেব বাড়ীব ফাই-ফবমাস খাটত। কিষণ মবে যেতে মগনকেও বুড়োকর্তা সস্নেহে কাছে টেনে নিযেছিলেন। একই অঘটনে বড়বাবুও চোখ বুঝতে বুড়োকর্তাব হুকুমে মগনেব কাজ হল তাব বোবা মেযেটাব দেখাশুনা কবা, তাকে খেলা দেওযা।

হাসিবানীব বযস তখন পাঁচ, লোকনাথ আব মন্মথেব সাত, আব ওই মগনেব চৌদ্দ। লোকনাথ বা মন্মথ মগনকে তেমন পছন্দ কবত না, কুচকুচে কালো ছোঁড়াটা হাড়পাজী—আব গাযে জোবও তেমনই, যখন-তখন ধবে বামঝাঁকানি-টাকানি দিত। মেযেটাকেও এক-একসময দু' হাতে একেবাবে মাথাব উপব তুলে ফেলত। কিন্তু হাসিবানী একটুও ভয পেত না, নীবব হাসিতে ওব সমস্ত মুখ বক্তবর্ণ হযে যেত।

পাঁচ বছবে হাসিবানীব বাবা মাবা গেছলেন, সাত বছব না হতে তাব মা-ও চোখ বুজলেন। স্বামী অঘটনে মাবা যাবাব পব থেকেই মহিলা জীবন্মৃত হযে ছিলেন। সকলেই বলাবলি কবতে লাগল মেযেটা অভাগা, বিশেষ কবে হাসিবানীব কাকা কাকীমাবা, আব লোকনাথেব কাকীমাও।

মগনেব তখন ওকে আগলাবাব দাযিত্ব আবও বেড়ে গেল। সে-ই যেন গার্জেন ওব। কর্তাবাবুদেব চোখেব আড়ালে মেযেটাব ওপব মগন দস্তুবমতো হম্বিতম্বি কবত, একটু-আধটু শাসনও কবত। কিন্তু লোকনাথ বা মন্মথ এমন কি হাসিবানীব খুড়তুতো ভাইবাও ওব সঙ্গে লাগতে এলে মগন মাবমুখী একেবাবে। সে-বেলায কাবোও ক্ষমা নেই।

বুড়োকর্তা সময়ে চোখ বুজলেন। হাসিবানীব বযস তখন নয। মগনেব আঠেবো। পেল্লায জোযান হযে উঠেছে। পাথুবে কালো গাযেব বং-এ যেন জেল্লা ছোটে। ওই ফুটফুটে মেযেটাব হাত ধবে পুকুবেব পশ্চিম দিকেব ঝোপঝাড় বনে-জঙ্গলে যখন ঘুবে বেড়াতো—তখন অদ্ভুত দেখতে লাগত। তপ্তকাঞ্চন আব নিকষ কালোব দুই সচল মূর্তি। পশ্চিমেব ওই জঙ্গলই বড় জঙ্গলে গিযে মিশেছে। মেযেটাকে ওদিকে

নিয়ে যেত বলে গিন্নিদের কাছে বকাঝকা খেত মগন। কিন্তু ও তাঁদের কথা কানেই তুলত না। ফলে তাঁরাও মগনের ওপর ক্রুদ্ধ।

এই সময়ে মগনের চাকরিটা গেল। বাবুদের চোখ দিয়ে দেখতে গেলে অপরাধ গুরুতরই বটে। প্রথম অপরাধ, নিষেধ সত্ত্বেও পুকুরের পশ্চিম দিকে নিয়ে গেছে মেয়েটাকে। তার সঙ্গে মেজকর্তার এক ছেলেও ছিল। কি কারণে বেগে গিয়ে মগন হাসিরানীর এত জোরে হাতটা ধরেছে যে বোবা মেয়েটা বীভৎস আর্তনাদ করে উঠেছে একটা। গালে রক্তের চাপ ধরে গেছে। মেজকর্তার ছেলে কি বলে উঠতে তার গালেও একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছে।

গিন্নিরা কর্তাদের কাছে নালিশ করেছেন। মেয়েটার গালের দাগ দেখিয়েছেন। ছেলের গায়ে হাত তোলার কথাও বলেছেন শুনে মেজকর্তা পায়ের চটি খুলে মগনকে বেশ করে প্রহার করে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন। এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় আর তাকে দেখা গেলে গায়ের ছাল থাকবে না, তাও বলে দিয়েছেন।

মগনের চাকরি যেতে সকলেই খুশি, এমন কি লোকনাথও।

কেবল ওই মেয়েটা ছাড়া। মগন ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী।

মগনকে কিন্তু প্রায়ই পশ্চিমের পুকুরঘাটের জঙ্গলের দিকে ঘুর-ঘুর করতে দেখা যেত। বিশেষ করে দুপুরে, কর্তারা যখন বাড়ি থাকেন না— আর গিন্নিরা যখন দিবানিদ্রায় মগ্ন। হাসিরানীকে চুপি চুপি ওর কাছে যেতে দেখা গেছে। আবার অন্য ভাইদের নালিশের ফলে ধরাও পড়ত হাসিরানী। বেগে গিয়ে কাকীমারা তখন ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতেন। মেয়েটা কিন্তু কাঁদত না বড়-একটা।

মেয়েটা অপয়া, মেয়েটা বোবা। কাকীমাদের অত্যাচার বাড়তেই থাকল ওর ওপর। আর মেয়েটাও একগুয়ে তেমনি। মারুক ধরুক, জঙ্গলের দিকে যাবেই—ফাঁক পেলে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াবেই। কাকীরা ছেড়ে কাকারাও কতদিন মারধর করেছেন ঠিক নেই।

হাসিরানীর চোখে জল গড়ায়, কিন্তু গলা দিয়ে কান্নার শব্দ বেরোয় না। কিন্তু এই মেয়ের হাসি যেন এক অদ্ভুত জিনিস। হাসিটা যেন ছোঁয়াচে রোগের মত ওর। কারণে-অকারণে হাসতে হাসতে রক্তবর্ণ হয়ে যায় একেবারে। তখনো গলা দিয়ে শব্দ বার করে না বিশেষ। হাসলে গালে টোল খায়— আর হাসিটা যেন তার মধ্যেও লুটোপুটি খায়।

ওকে হাসাতে বড় ভাল লাগত লোকনাথের। একটু চেষ্টা করলেই হাসাতে পারত। ও মেয়ে সর্বদাই যেন হাসার জন্য তৈরি হয়ে আছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে যখন, তখনো মনে হয় হাসি-হাসি মুখ।

চৌদ্দ ছেড়ে পনেরয় পা দিয়ে এই মেয়েই বাড়ির অশান্তির কারণ হয়ে উঠল। এত রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না। তেমনি স্বাস্থ্য। কিন্তু বুদ্ধি যেন হয়ইনি। এখনো সেই হাসি মুখে লেগে আছে—আর পশ্চিমের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো আছে। কাকীমাদের চোখের বিষ ও এখন। এখনো গুম-গুম কিল বসিয়ে দেন তাঁরা, চুলের ঝুঁটি ধরে মাটিতে শুইয়ে ফেলেন। বাড়ির আঙিনার বাইরে সেদিন ওকে মগনের সঙ্গে ঠোঁট

নাড়তে দেখে আর হাসতে দেখে তো কাকীমারা রেগে এমন আগুন যে, কাকারা পর্যন্ত সেই নালিশ শুনে রীতিমতো মেরেছেন ওকে। আর দু'দিন দরজায় শিকল তুলে দিয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছিলেন।

সেই সময় মন্মথ প্রায়ই বলত, হাসিরানীকে দেখলেই আমার বুকের ভিতরটা কেমন করে। লোকনাথ ঠিক বুঝতে পারেননি তখনো, কেমন করে ওর বুকের ভেতরটা। মেয়েটাকে দেখলে লোকনাথের আগের থেকে ঢের বেশি ভালো লাগে এই পর্যন্ত কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করে-টরে না।

বছর দুই বাদে বুঝতে পারল, মন্মথর বুকের ভিতরটা কেমন করে। হাসিরানীর তখন সতের, ওদের উনিশ। নীল ডুরে শাড়ি পরে যখন ঘুরে বেড়ায়, চোখ ফেরানো যায় না। মন্মথ ততদিনে আরো সেয়ানা হয়েছে। একদিন চুপি চুপি বলল, হাসিকে দেখলাম পশ্চিমের ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রায়ই যায় ওদিকে, মেয়েটা তো কথা বলতে পারে না—একদিন ধরব চেপেচুপে।

মন্মথর সঙ্গে লোকনাথের সেদিন দস্তুরমতো রাগারাগিই হয়ে গেছল।

পরের বছর। হাসিরানীর আঠেরো আর ওদের কুড়ি।

মন্মথ ম্যাট্রিকের বেড়া ডিঙোতে না পেরে এখানেই থাকে, তার বাপের সঙ্গে বাবুদের কাজকর্ম দেখে। কিন্তু আসলে কিছুই করে না। লোকনাথ ততদিনে খুব ভালোভাবে আই-এ পাস করে সেরারে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ক'মাসের জন্য ঘরে ফিরেছে।

বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কাকা-কাকীমার খুব হাসিমুখ দেখল। এতটা সচরাচর দেখে না।

মন্মথ ফাঁক পেয়েই তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর তাজ্জব কথা শোনালো। তিন মাস আগে হাসিরানীর কাকারা এক বউ-মরা আধবয়সী লোকের সঙ্গে হাসিরানীর বিয়ের ঠিক করেছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেই লোকটার মাথা কে দু'ফাঁক করে দিয়েছে—প্রাণে বেঁচে সে আর বিয়ের নামও করছে না।

হাসিরানীর কাকারা তখন মন্মথর বাবাকে ধরেছে। লোকনাথের সঙ্গে হাসিরানীর বিয়ে দিতে হবে। তার জন্যে কাকারা অনেক টাকাও খরচ করবেন। ওর বাবা নাকি তাতে রাজি হয়েছেন। লোকনাথ এসেছে, এবারই বিয়েটা হয়ে যাবে।

লোকনাথের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তার তখন ভবিষ্যৎ-চিন্তা অন্যরকম। কমপিটিটিভ পরীক্ষা দেবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তার মধ্যে কিনা বিয়ে। আর যতো রূপসীই হোক, একটা বোবা মেয়েকে বিয়ে করবে ও। কক্ষনো না, কক্ষনো না।

এরপর কাকা-কাকীমা ওকে খবরটা জানালেন। লোকনাথ মাকে বলল, সে এখন বিয়ে করবে না।

কাকা ততোধিক গম্ভীর। ধমকে বললেন, এটা ফাজলামোর ব্যাপার নয়, কর্তারা নিজের মুখে এ প্রস্তাব দিয়েছেন তার ভাগ্য ভালো। তাঁদের কথা দেওয়া হয়ে গেছে, এর আর নড়চড় হবে না।

লোকনাথ ঠিক কবে ফেলল, বিযেব আগেই সে পালাবে। জীবনে সে আব এ-মুখো হবে না। কিন্তু মেযেটাকে দেখে বড কষ্ট হল তাব। রূপ যেন ফেটে পডছে। ওব সঙ্গে দেখা হতেই ফিক কবে হাসল, গালে টোল পডল— সেই হাসি সমস্ত মুখে ছডালো। চটপট সবে পডল সে।

লোকনাথ বুঝল মেযেটাও শুনেছে সব। দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু বিযে সে এখানে কবতে পাববে না— পালাবেই।

পবদিন দুপুবে মেঘলা দিন দেখে পশ্চিমেব জঙ্গলেব দিকে পাযে পাযে এগিযে চলেছিল লোকনাথ। জঙ্গলেব পবিবেশ তাব ভালো লাগে।

হঠাৎ বিষম চমকে উঠল। সামনে হাসিবানী। ওকে দেখে সেও ভযানক চমকে উঠেছে। ঘাটেব থেকে বেশি দূবে নয অবশ্য জাযগাটা। লোকনাথ জিজ্ঞাসা কবল, হাসিবানী, তুমি এখানে একলা কি কবছ?

হাসিবানীব মুখে লালেব ছোপ লাগল। কিন্তু মুখ শুকনো। লোকনাথ ভাবল, পাছে বাডিতে বলে দেয, সেই ভয।

লোকনাথ বলল, আমি কাউকে কিছু বলব না। শোনো...বাডিব সব কি কাণ্ড কবতে যাচ্ছে শুনেছ?

হাসিবানী মাথা নাডল— শুনেছে।

—ইযে...তুমি কি বলো?

মুখেব দিকে সোজা তাকালো। ঠোঁটেব ফাঁকে হাসি। বিপবীত মাথা নেডে আপত্তি জানালো কিছু।

—বিযে কবতে চাও না?

আবাব মাথা নাডল— চায না।

—আমি কি কবব? আপত্তি কবব?

মাথা নেডে সায দিল।

ঘাম দিযে যেন জ্বব ছাডল লোকনাথেব। বলল, আমি ভাবছি এখান থেকে পালিযে যাব।

এবাবে একগাল হেসেই সায দিল। অর্থাৎ সেই ভালো।

লোকনাথ চলে এলো। কিন্তু মেযেটাব কথা ভেবে অবাকই লাগছে তাব। শেষে ভাবল, বিযে কাকে বলে ও বোধহয তাই-ই জানে না।

এমন দিনে সমস্ত এলাকায যেন হঠাৎ নাডাচাডা পডে গেল একটা। ভযে সন্ধলেব মুখ শুকালো। পশ্চিমেব জঙ্গলে সেদিন সন্ধ্যায বাঘেব ডাক শোনা গেল। দূবে অবশ্য, কিন্তু বাঘেব কাছে কত আব দূবে? বাবোশিঙা হবিণেবও বিদঘুটে ডাক শোনা যেতে লাগল। বাঘেব পদার্পণ ঘটলে তাবা অমনি ডেকে নিজেবা হুঁশিযাব হয, আব অন্য জীব-জন্তুকেও হুঁশিযাব কবে।

পব পব দু-তিন দিন দূবে দূবে বাঘেব ডাক শোনা যেতে লাগল। তাব পবেব দিন দিনেব বেলাযও শোনা গেল। কর্তাদেব বন্দুক আছে দু'দুটো। কিন্তু সে বন্দুক হাতে নেবাব মতো আব মানুষ নেই। পাহাবাদাব আছে একটা। তাব কাঁধে একটা

বন্দুক উঠল। কিন্তু ভয়ে তারও মুখ আমসি। কর্তারা শহরে খবর পাঠালেন। কিন্তু সেখান থেকেও কোনো সাড়া আসছে না।

...দূরে পশ্চিমের জঙ্গলে আগে বাঘের উপদ্রব খুবই ছিল। কিন্তু দশ বছরের মধ্যে সে ভয় নির্মূল হয়ে গেছে। কত বাঘ যে মারা পড়েছে ঠিক নেই। অন্য কোনো জঙ্গল থেকে ছিটকে-ছটকে এসে গেছে একটা। অত দূর থেকেও এমন গুরুগম্ভীর ডাক শোনা যায় যখন, বড় বাঘ সন্দেহ নেই। যতো দূরেই হোক, বাবুঘাটের ত্রিসীমানায় লোক মাড়ায় না। ঝোপঝাড় গাছপালার পরেই তো ঘন জঙ্গল শুরু। বড়-জোর এক-দেড় মাইল। ঘাটের দিকের কর্তাদের বাড়ির জানলা-দরজা পর্যন্ত অষ্টপ্রহর বন্ধ। ত্রাসে দিশেহারা সকলেই। লাঠিসোঁটা টিন কানেস্তারা নিয়ে লোকজন সন্ধ্যার পর থেকে সমস্ত রাত কর্তাদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

সেদিন সকালের দিকেই বাড়ির সকলের রক্ত জল। পুকুরের ওপারে ঝোপ-ঝাড়ের কাছাকাছি বাঘের গরগর গলার শব্দ পাওয়া গেছে—আর দিনমানেই বারো-শিঙারা ডাকাডাকি ছোটাছুটি করেছে। লোকনাথরাও কর্তাদের বাড়ির সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে পুকুরের ওপারের দিকে চেয়ে ছিল— আরার দরকারমতো ছোটার জন্যও প্রস্তুত ছিল সকলে।

কিন্তু বাঘের আওয়াজ আর শোনা গেল না। কেউ কেউ মন্তব্য করল, বাঘ ওদিকের ধারেকাছেই খেয়েদেয়ে ঘুম লাগিয়েছে।

...সেই দুপুরেই অঘটন ঘটে গেল। সকলে তখন ঘুমে। বাড়ির একটা ঝিয়ের হঠাৎ চোখ গেল পুকুরের ওপারে ঝোপের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে বড় কর্তার মেয়ে হাসিরানী। বাড়ি কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল ঝিটা। তারপর পড়ি-মরি করে ছুটল তাকে ধরে আনতে। এতদূর থেকে চিৎকার চেঁচামিচি শুনতে পাওয়ার কথা নয়, শোনা গেলও না। হাসিরানী তখন আপনমনে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে অনেকটা চলে গেছে, আর তাকেও দেখা যাচ্ছে না। ঝিটা একাই তারস্বরে চিৎকার করতে করতে পুকুরের ধার ধরে ছুটল। আর কেউ এগোতে সাহস করছে না— হাসিরানীর কাকীমারা দোতলায় দাঁড়িয়েই কাঁপছেন ঠকঠক করে।

ঝিটা চিৎকার করতে করতে সবে পুকুরের ওপারে পৌঁছেছে—হঠাৎ একেবারে কাছেই বাঘের প্রলয়ংকর গর্জন—চতুর্দিক কাঁপিয়ে দিয়ে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে-রকম গর্জন করে ওঠে তেমনি। গর্জন আর থামে না। ঝোপঝাড়ের ওধারেই ওটা যেন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করছে একটা। ঝি-টা আরার আর্তনাদ করতে করতে তীরের মতো এপারে ছুটে এসে মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কর্তাদের বাড়ির সামনে তখন অনেক লোক কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। লোকনাথ আর মন্মথও ছিল।

খানিক বাদে বাঘের গর্জন থেমেছে।

সকলে যা বোঝবার বুঝে নিয়েছে। বড়কর্তার রূপসী বোবা মেয়েটাকে বাঘে টেনে নিয়ে গেল। সকলেই বলাবলি করল, মেয়েটা যেন আত্মঘাতিনী হল। ইচ্ছে করেই বাঘের মুখে গিয়ে পড়ল।

লোকনাথেরও সেটাই স্থিরবিশ্বাস। আত্মাহুতি দিয়ে সে তাকে এবং অন্য সকলকে অব্যাহতি দিয়ে গেল। তারপর আর কোনদিন বাঘের ডাক শোনা যায় নি। দু'দিন বাদে জঙ্গল তল্লাস করা হয়েছিল অনেক লোকজন নিয়ে, কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে এর মধ্যে— বাঘের বা রক্তের কোনো চিহ্নও মেলেনি।

সমস্ত মুখ দিয়ে হাসি চুয়ে চুয়ে পড়ছে হাসিরানীর। পাশ থেকে বড় ছেলের সহাস্য উক্তি, কাকা, আমরাও বাবা আর দাদুর মতো ভয়ংকর বাঘের ডাক ডাকতে পারি—আপনাকে শোনাতে বলছেন।

লোকনাথবাবু হাসিরানীর দিকেই চেয়ে আছেন আর হাসছেনও। চা-জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছে—অন্য ছেলেরা আর বউরাও হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

লোকনাথবাবু বড় ছেলেকে বললেন, তার থেকে তোমার বাবার একখানা ফটো থাকে তো আমার বড় দেখার ইচ্ছে।

মায়ের ইশারায় বড় ছেলে তাঁকে নিয়ে সামনের ঘরে ঢুকল। সামনের টেবিলেই টাটকা মালা পরানো মস্ত একখানা ফটো। ফটোর মধ্যে দাঁড়িয়ে মগন যেন হাসছে তার দিকে চেয়ে। হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা। পাথরে খোদাই করা দেহ।

ফিরে এসে লোকনাথবাবু বসলেন আবার। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে। কিন্তু লোকনাথবাবুর উঠতে ইচ্ছে করছে না। মায়ের ঠোঁট-নাড়ার দিকে খানিক মনোযোগ দিয়ে চেয়ে থেকে বড় ছেলে তার দিকে ফিরল।—মা আপনাকে যে জন্য ডেকে এনেছেন, এতক্ষণ সেটাই আপনাকে বলা হয়নি— শুনে আপনিও মতামত দেবেন।

এরপরে যে কথাগুলো বলে গেল সে, শুনে লোকনাথবাবু স্তব্ধ খানিকক্ষণ।

—চার ছেলেকে মা তার মনের মতো করে মানুষ করেছে, মায়ের হুকুমে তাদের লাঠি চালানো, ছোরা খেলা আর বন্দুক ছোঁড়া শিখতে হয়েছে। শিকারে পটু হতে হয়েছে। মা সর্বদাই বলতেন তার একটা কাজ ছেলেদের করে দিতে হবে—আর সেই কাজের জন্য বড় হয়ে তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এই প্রস্তুত হবার ব্যাপারে বাবাই ওদের সাহায্য করেছেন। মারা যাবার আগেও তিনি বলে গেছেন, মা যা বলে তাই করবি, তাতে জান যায় যাক।

সেই কাজের সময় এসেছিল ছ' বছর আগে। মায়ের হুকুমে আচমকা ছেঁকে ধরে ঠিক ডাকাতের মতোই মায়ের বাপের বাড়ির কর্তাদের দু' ভাইকে আর তাদের চার ছেলেকে আটক করে আনা হয়েছিল। তাদের গায়ে কেউ হাত তোলেনি, কিন্তু ভয়ে তারা তখন আধমরা। তার তিন ভাই বন্দুক হাতে ওই চার ছেলেকে পাহারা দিয়েছে—আর বড় ভাই আলাদা ঘরে মায়ের দুই কাকাকে। মা শুধু তার কাকাদের ঘরে এসেছেন, প্রণাম করেছেন, তারপর তার মারফৎ কাকাদের জানিয়েছেন—পৈতৃক সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মায়ের পাওনা—তার বিনিময়ে নগদ মূল্য না পেলে ছেলেদের হাত থেকে ওদের ছেলেদের রক্ষা করা যাবে না। মায়ের কাকারা অনেক মিনতি করেছেন ছেড়ে দেওয়ার জন্য, ছেড়ে দিলে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করবেন।

মা অবিচল কঠিন। তাঁর হুকুম, কাকার ছেলেরা তাঁর জিম্মায় থাকবে, কাকারা টাকা আনার জন্য যেতে পারেন—পাঁচ দিন সময়, তার মধ্যে তাঁদের ছেলেদের কেউ কেশ স্পর্শ করবে না—কিন্তু পাঁচদিনেব মধ্যে টাকা না নিয়ে এলে আর তাদেব বক্ষা কবাব কোনো দাযিত্ব তাঁর থাকবে না।

...কাকাবা নিজেদেব মধ্যে কথা বলে পঞ্চাশ হাজাব টাকা দিতে চেযেছিলেন মাকে, মা রাজি হননি। শেষে সত্তর হাজাব টাকায বফা হযেছে।

পাঁচদিনেব মধ্যে সেই টাকা তাঁরা মাযেব হাতে তুলে দিযে ছেলেদের মুক্ত কবে নিযে গেছেন।

হাসিবানী চেযে আছে লোকনাথবাবুব দিকে। একাগ্রভাবে যেন সে জানতে চায কিছু। লালচে মুখ গম্ভীব এখন।

বড ছেলে বলল, এখন মাযেব জিজ্ঞাস্য, এ-ভাবে দাবি আদায কবে মা পাপ কবেছেন কিনা, অন্যায কবেছেন কিনা।

লোকনাথবাবু মুগ্ধ বিস্ময়ে চেযে ছিলেন তাব দিকে। এবকম রমণী তিনি এ জীবনে আব দেখেন নি। বললেন, কোনো পাপ কবোনি, কোনো অন্যায কবোনি— তুমি যা কবেছ তোমাব ছেলেবা তা সোনাব অক্ষবে লিখে বাখে যেন, বংশ বংশ ধবে সকলে যেন জানতে পাবে।

আবাব ওই মুখে হাসি ভবাট হতে লাগল, গালে টোল পডল, ঠোঁট দিযে গাল দিযে নাক-চোখ-কান দিযে হাসি চুঁযে চুঁযে পডতে লাগল যেন।

আত্মবিস্মৃতেব মতো চেযেই আছেন লোকনাথবাবু।

তাঁব মনে হতে লাগল, তেত্রিশ বছব আগে বাবুদীঘিব নিবাপদ ব্যবধানে দাঁড়িযে বাঘেব ডাক শুনেছে সকলে ক'দিন ধবে। বাঘিনীব নিঃশব্দ গর্জন কেউ শোনেনি।

মধুরঙ্গ

মধু বঙ্গনাথনেব সঙ্গে আমাব প্রথম আলাপ ছাব্বিশ-সাতাস বছব আগে। তাব বযস তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ, আমাবও তাই। ট্রেনে কলকাতা থেকে বম্বে যাচ্ছিলাম। আমার একটা গল্প ছবি কবাব ব্যাপাবে সেখানে গবম তোডজোড় চলছিল। বাংলা গল্পেব হিন্দি ছবি হবে। হামেশাই হয। কিন্তু সেই উঠতি বয়সে অমন ভাগ্য দুর্লভ মনে হযেছিল। তাই মনে আনন্দ ছিল। ভিতবে বেশ একটু উত্তেজনাও ছিল। গল্পেব কাঠামো একটু-আধটু অদল-বদল কবাব ব্যাপাবে খোদ পবিচালকেব টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটেছি। পবেব পযসায় ফার্স্ট ক্লাসে তোফা আবামে যাচ্ছিলাম।

সেই সময সামনেব বার্থের একটি সমবযসী অবাঙালী ছেলে আমার চোখ টেনেছিল। ছিপছিপে বেঁটে-খাট গড়ন, গাযের বঙ কালোই বলা যায়। সে-ও আমাব মতোই নিঃসঙ্গ যাত্রী, কিন্তু যতবাব চোখাচোখি হযেছে, দেখি অস্বাভাবিক গম্ভীব। অথচ ওই মুখেব আদল কেমন যেন চেনা-চেনা ঠেকছিল আমাব।

আলাপের চেষ্টায় এগিয়েছিলাম, কিন্তু লোকটা ভয়ানক নির্লিপ্ত আর নিরুত্তাপ। সে-ও বম্বে যাচ্ছে শুনে আমি একটু উৎসাহ বোধ করেছিলাম, কিন্তু তার ঠাণ্ডা হাবভাব দেখে সেটা বেশিক্ষণ থাকল না। ভাবলাম আমি পরের পয়সায় কায়দা করে ফার্স্ট ক্লাসে চলেছি, এ হয়তো পয়সাঅলা কোন বড়লোকের ছেলে হবে, সেই দেমাকে এত গম্ভীর। অতএব আমিও বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত নিস্পৃহ থাকতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু যতবার তার দিকে চোখ গেছে ততবার মনে হয়েছে এই মুখ আমি কোথাও দেখেছি।

একবার ও নিজের ছোট সুটকেসটা টেনে এনে খোলার মুখে ডালার ওপর লেবেল আঁটা নাম চোখে পড়ল—মধুরঙ্গ। এই নাম দেখে কোন দেশের বা কোন জাতের মানুষ ঠাওর করা গেল না। কিন্তু সুটকেস থেকে যে বস্তুটা বার করল, দেখে আমার চক্ষুস্থির। লম্বাটে ধরনের এক বাণ্ডিল বিড়ি। কোন ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জারের মুখে বিড়ি দেখব এটা তখন কল্পনার বাইরে। একটা বিড়ি নিজের ঠোঁটে ঝোলাল। আমাকে চেয়ে থাকতে দেখে ড্যাবড্যাব করে সেও খানিক চেয়ে রইল। তারপর ইংরেজিতে মন্তব্য করল—ফাইন স্টাফ, চলবে?

আমি হকচকিয়ে গিয়ে হাত বাড়ালাম। অতি সাধারণ একটা লাইটার জ্বালিয়ে সে আমার বিড়ি ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা ধরাল। তারপর মস্ত একটা তৃপ্তির টান।

আমাদের কাণ্ড দেখে কামরার অপর দুই প্রায়-বৃদ্ধ দম্পতি অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

সাধারণ বিড়ি, আকারে একটু বড়, এমন কিছু ফাইন স্টাফ বলে আমার মনে হল না। কিন্তু ঐ লোকটা খুব মৌজ করে টানছে। আধাআধি শেষ করে আমার দিকে ফিরল আবার। তেমনি নির্লিপ্ত মন্তব্য করল, খুব সস্তা বলে এ জিনিসটা আরো ভালো লাগে, একগাদা কিনে নিয়েছি।

ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীর মুখে এ-কথা শুনে একটু যেন ধাক্কাই খেলাম। বলে ফেললাম, শুধু সস্তা বলে বিড়ি খান, না কড়া জিনিসের লোভে?

জবাব দিল, চুরুট আরো কড়া, আরো বেশি ভালও লাগে, কিন্তু বেশি দাম—

হেসেই জিজ্ঞাসা করলাম, এত দূরের পথ ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছেন অথচ বেশি দামের জন্য চুরুট কিনে খান না?

বিড়িতে শেষ টান দিয়ে সাদাসাপটা জবাব দিল, আমিও আপনার মতই ফোকটে ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছি—নিজের পয়সায় থার্ড ক্লাসে যেতে হলে চোখে সর্ষেফুল দেখতে হয়।

আমি হতভম্ব। ও ফোকটে মানে পরের পয়সায় যাচ্ছে সেটা নিজে বলল, কিন্তু আমি কার ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছি সে তো আমার গায়ে লেখা নেই —জানল কি করে।

আমার বিস্ময় ওর নিস্পৃহ বিশ্লেষণের বস্তু যেন। নিজে থেকেই বলল, আপনি তো অমুক প্রযোজকের অমুক ছবির স্ক্রীপট্-এর কাজে সাহায্য করতে যাচ্ছেন?

বিমূঢ় মুখে মাথা নাড়লাম।

কড়ে আঙ্গুলের ডগটা নিজের কানের গহ্বরে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘন-ঘন নাড়ল একপ্রস্থ। আয়েসে চোখ দুটো ছোট হয়ে এলো। তারপর বয়েসসে বলল, আমি বাংলা কথা-বার্তা মোটামুটি বুঝি, আপনাকে যারা তুলে দিতে এসেছিল তাদের আর আপনার কথা থেকেই জেনেছি কেন বম্বে যাচ্ছেন—আপনার ওই ছবিতে আমিও একটা রোল পাবার চেষ্টা করেছিলাম—হল না।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ফিল্ম আর্টিস্ট?

মাথা নাড়ল।—আর্টিস্ট ঠিক না, ফিল্ম-ভাঁড় বলতে পারেন।

সুটকেসের লেবেলে নাম দেখেছি মধুরঙ্গ। এই নামের কোন কমিক অ্যাকটর স্মরণে আসছে না। অথচ মুখখানা চেনা-চেনা লাগছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি শেষ কোন ছবিতে কাজ করেছেন?

বলল— আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আমার। হ্যাঁ, হাঁড়ি-মুখো এক কিশোর জবর হাসিয়েছিল বটে ওই ছবিটাতে। আর্টিস্ট-এর নামটাও মনে পড়ে গেল তখুনি।

শুধোলাম, আপনার নাম কি?

—মধু রঙ্গনাথন। ছেঁটে সেটাকে মধুরঙ্গ করেছি। ফিল্মের নাম ভিন্ন।

সেই ভিন্ন নাম আজ সুপরিচিত। আর সেই কারণেই নামটা অনুক্ত থাক।

ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে সেই দুদিনের যাত্রাপথে মধু রঙ্গনাথন আমার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সেই বন্ধুত্ব দিনে দিনে বেড়েছে। বম্বেতে সেই প্রথমবারে পৌঁছেও বড়লোকের আতিথ্য ছেড়ে ওর একখানা ঘরেরই ভাগীদার হয়েছিলাম। আর আমার সক্রিয় চেষ্টার ফলে পরিচিত ডিরেক্টার ভদ্রলোক প্রযোজককে বলে ওর একটা রোলের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।

ট্রেনের দু'দিনের সান্নিধ্যেই আমার মনে হয়েছিল, মধু রঙ্গনাথন একদিন বড় আর্টিস্ট হবে। কারণ দু'দিনের মধ্যে দু'বারও ওকে আমি হাসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অথচ ওর কথা শুনে আমি এক-একবার অট্টহাস্য করে উঠেছি। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ওর গাম্ভীর্যটা এতটুকু কৃত্রিম মনে হয়নি কখনো। যেন সত্যি ভাবলেশশূন্য পটের মূর্তি একখানা।

ওকে জিজ্ঞাসা করেছি, ছবিতে না হয় না-ই হাসলে, বাইরেও অত গাম্ভীর্য কেন?

মধু জবাব দিয়েছেঃ কোনটা হাসির ব্যাপার আর কোনটা নয় সেটা যাচাই করার ফাঁকেই হাসির সময়টা উৎরে যায়। তাছাড়া এক-এক সময় হাসি, যখন কেউ হাসে না তখন জোরে হেসে উঠি।

—কেন?

—তাতে অন্য লোকের আমাকে বোকা ভাবতে সুবিধে হয়। তারা হাসে।

ট্রেনের সেই দীর্ঘ দু'দিনের অবকাশে অনেক মনের কথা আর মজার কথা বলেছে মধু রঙ্গনাথন। যত শুনেছি তত আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি।

...বিয়ে করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে ও বলেছিল, এবারে কলকাতায় আসার আগেও বাবা তার একজন গেলাসের বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল।

বাবা তার সঙ্গে থাকে না, অন্যত্র থাকে, আর সন্ধ্যা ডুবলেই মদ নিয়ে বসে। নেশার ঘোরে সেদিন ওর ঘরে এসে গর্জন করে বলল, তোর বউ দরকার, একটা বউ এনে দিচ্ছি।

ছেলে সায় দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, তা তো দরকার...কিন্তু কার বউ আনবে? শুনে ওর বাবাও নাকি চিন্তায় পড়ে গেছে, বলেছে, তাই তো, কার বউয়ের দিকে আবার হাত বাড়াতে যাব!

..কলেজে পড়তে সমবয়সী একটা মেয়েকে বিয়ে করার জন্য নাকি পাগল হয়ে উঠেছিল মধু। শেষ পর্যন্ত সেই মেয়ের ওপর চড়াও হয়ে একদিন আবেদন জানাল, কি বললে তুমি বিশ্বাস করবে আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে বিয়ে করতে চাই?

মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে সেই মেয়ে নাকি জবাব দিয়েছে, মোটে তিনটে কথা বললে।

—কি কথা? কি তিনটে কথা? মধু আশান্বিত।

—এক লক্ষ টাকা।

মধু লম্বা লাফ মেরে পালিয়েছে।

..হয়তো বানানো গল্প সব। শুনে আমি হেসে অস্থির। কিন্তু ওর মুখে হাসি দেখিনি।

বর্তমানের মনের কথাও বলেছে। একটা মেয়েকে ভয়ানক ভালবাসে। ওখানকারই মেয়ে। তার বাপ যুনিভার্সিটির প্রোফেসার —মেয়ের নাম দুর্গা। সে ও যুনিভার্সিটিতে পড়ছে। ভালো ছাত্রী। কিন্তু মধুর থেকেও গম্ভীর নাকি। বিয়ের কথা একবার বলতে এমন তাকিয়েছিল যে মধুর জমে যাওয়ার দাখিল। অনেক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তা ওদের, সেই সুবাদে ছেলেবেলা থেকে জানাশুনা। মধুর সাফ সিদ্ধান্ত, দুর্গাকে হয় বিয়ে করবে নয়তো খুন করবে। ওর মতে দুর্গা ভয়ানক অবুঝ মেয়ে, ওর জন্যই বেশি টাকা রোজগারের আশায় মধু ফিল্মে নেমেছে, মেয়ে কোথায় খুশি হবে তা না, উল্টে রাগে ফুটছে!

এ গল্পও খুব যে বিশ্বাস করেছিলাম এমন নয়। কিন্তু বেড়াতে বেড়াতে একদিন ও আমাকে দুর্গার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির। তখনো ওর মতলব বুঝিনি। দুর্গাকে ডেকে বাংলা দেশের মস্ত লেখক বলে পরিচয় দিল আমার। আমার পরিচয় বড় করে তুলে নিজের কদর বাড়াতে চায় বোধহয়। কিন্তু বাংলা দেশের মস্ত লেখকের প্রতি দুর্গার তেমন আগ্রহ আছে মনে হল না। তবে মার্জিত রুচির মেয়ে, অভদ্রতাও করল না। সুন্দরী কিছু নয়, বেশ স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী মেয়ে।

পরের চার-পাঁচ বছরের মধ্যে আরো বারতিনেক বম্বেতে এসেছি। মধুও আর একবার কলকাতায় আমার অতিথি হয়ে এসেছিল। কমিক আক্টর হিসেবে তখন মোটামুটি নাম হয়েছে ওর। আর আমার সঙ্গে বন্ধুত্বও গাঢ় হয়েছে। কিন্তু মধু বঙ্গনাথনের হাবভাব কথাবার্তা সেই একরকমই আছে। দুর্গার জন্য ওর হা-হুতাশ বেড়েছে। দুর্গা এখন কলেজের মাস্টার, ওর দিকে ভালো করে ফিরেও তাকাতে চায় না— ফেরাবার চেষ্টা করলেও রেগে আগুন হয়। মধু বঙ্গনাথনের সুখশান্তি সব গেল। দুর্গাকে খুন করার সময় এগিয়ে আসছে কিনা এখন সেই চিন্তা করছে।

এর দু'মাসের মধ্যে বম্বে থেকে মধুর উচ্ছ্বাসভরা চিঠি পেলাম, দুর্গাকে খুন করতে পেরেছে, অর্থাৎ বিয়ে করে ঘরে আনতে পেরেছে। সেই প্রহসন শুনলে বন্ধু (অর্থাৎ আমি) নিশ্চয় চমৎকৃত হবে। কিন্তু বিয়ে করার পর দুর্গাবই উল্টে খুনী মেজাজ এখন। সকাল বিকেল দুপুব বাত্তিবে মুখ দিয়ে নযতো চোখ দিয়ে ঝাঁটাপেটা কবে ছাড়ছে। কেবল মধুব একটু-আধটু শবীর-টরীর খারাপ হলে ঘাবড়ে গিযে তাড়াতাড়ি বড ডাক্তাব ডাকে, অতএব মধু প্রাণপণে শরীব খারাপ কবতেই চেষ্টা কবছে।

এবপব বম্বেতে এসে ওদের অতিথি হযেছি। সত্যিই ভালো লেগেছে। মধু বঙ্গনাথন সেইবকমই গম্ভীর প্রায়, কিন্তু ভিতবে ভিতরে ও যে আনন্দে ভাসছে তাও বোঝা যায।

কি করে শেষ পর্যন্ত দুর্গাকে ঘবে আনা গেল, মধু একদিন চুপি চুপি তাও বলল আমাকে। শুনে আমি হাঁ। বিশ্বাস করব কি কবব না ভেবে পেলাম না।

বললাম, সত্যি বলছ কি বানিযে বলছ, দুর্গাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবব।

মধু আঁতকে উঠল।—আমাব পেশাব দিব্বি কেটে বলছি, এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি —কিন্তু দুর্গাকে জিজ্ঞেস কবতে গেলে ও ঠিক ডিভোর্স করবে আমাকে।

বিশ্বাস কবেছি। কিন্তু যতবার মনে পড়েছে প্রহসনটা, নিজেব মনেই হেসে বাঁচি না। মধুর মাথা বটে একখানা—এমন কাণ্ড কবেও কাউকে বিয়ে কবে ঘবে টেনে আনা যায!

...দুর্গাকে বিযে করতে পাবাব এই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা আব একটু বাদে ব্যক্ত কবব। কাবণ ওই একই ব্যাপার থেকে মধু বঙ্গনাথন-এব জীবনেব দুটো দিক দেখা গেছে। ...একটা জীবনের দিক, অন্যটা জীবন-মৃত্যুব দিক।

বম্বে গেলে ওদের অতিথি হতাম। দুর্গা আমাকে আদবযত্ন কবত। এই দীর্ঘকালেব মধ্যে ওরাও যুগলে এসে কলকাতায অনেকবাব আমাব বাড়িতে থেকে গেছে। সেই শুরু থেকে দেখে এসেছি, মধু বঙ্গনাথনকে দুর্গা কড়া শাসনে বাখে।

বেশি বাচালতা করলে অন্য লোকেব সামনেই ধমকে ওঠে। দুর্গা কলেজের মাস্টারি ছাড়েনি, স্বামীটিব ওপব সর্বদাই ওব মাস্টাবি মেজাজ। আমার কেমন ধারণা, দুর্গার ওই কড়া শাসন মধুব ভালো লাগে, আর সেই কারণে ওব গম্ভীব বাচালতা বাড়ছে বই কমেনি।

কমিক অ্যাক্টব হিসেবে তাব দস্তুবমতো নামডাক তখন। কিন্তু তাব ছবিব ভাঁড়ামোও দুর্গাব চক্ষুশূল যেন। ও ব্যাপাবেবও মাত্রা ছাড়ালে সে দস্তুবমতো রাগাবাগি করে। একবাবেব ঘটনায় বম্বেতেই উপস্থিত ছিলাম আমি। মধুব একটা ছবি তখন হৈ-চৈ করে চলছে। আমিও দেখে এলাম। ওর বোল আব অভিনয় দেখে পেটে খিল ধরাব দাখিল। এক বড়লোকের বাড়ির ড্রাইভারেব ভূমিকা ওর। নির্লিপ্ত বোকা-মুখ কবে বড়লোকেব বাড়িব কেচ্ছা দেখে অভ্যস্ত। ঘরে তার বিষম রাগী আর ঝগড়াটে স্ত্রী এবং একটি বযস্থা মেযে। মেযে রূপসী নয আদৌ। অতএব মেযেব মা পছন্দ-মতো পাত্র পায় না। মাথা খাটিয়ে মেয়ের মা একটা রাস্তা বার করল। মেয়েকে বলল,

বক্স নম্বর দিয়ে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দে—তাতে লেখা থাকবে বড়লোকের ছাব্বিশ বছরের একটিমাত্র মেয়ের জন্য শিক্ষিত সুশ্রী এবং দিলদরিয়া মেজাজের পুরুষ সঙ্গী চাই। মেয়ের বিবাহ কাম্য নয়, অন্তরঙ্গ মেলামেশাটুকুই কাম্য।

মেয়ের মায়ের আশা, এই টোপে বড়লোকের যোগ্য ছেলেরা ছুটে আসবে, আর অন্তরঙ্গ মেলামেশার পরেও মেয়ে মায়ের সাহায্যে একজনকে গেঁথে তুলতে পারবেই।

বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। কিছুদিন বাদে মা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার, বক্স নম্বরের বিজ্ঞাপনের জবাব আসছে না?

মেয়ে আমতা-আমতা করে জবাব দিল, একটা মাত্র এসেছে।

—কার কাছ থেকে? মা উদগ্রীব।

—সেটা একটু গোপনীয়, বলব না।

—হতচ্ছাড়ী মেয়ে, শীগগীর বল—কার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিস?

কাতর মুখ করে মেয়ে জবাব দিল, বাবার কাছ থেকে।

এরপর ওই দজ্জাল মায়ের হাতে বাবার হেনস্থা দেখে হাসতে হাসতে দম বন্ধ হবার উপক্রম।

এই ছবি দেখে দুর্গা নাকি মধুর সঙ্গে কুরুক্ষেত্র করে ছেড়েছে। দুর্গা নিজেই আমাকে বলেছে, ছবিতে নিজের ওই প্রহসন মধু নাকি নিজেই বানিয়ে নিয়েছে —আসল গলায় ওর কোনো ভূমিকা ছিল না।

কিন্তু যতই কড়া মেজাজ হোক, স্বামীর প্রতি দুর্গার প্রচ্ছন্ন যত্নটুকুও আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ও কম খেলে বা শরীর একটু খারাপ হলে বকা-ঝকার ভিতর দিয়েও ওর আসল দরদের মূর্তিটা আমার চোখ এড়ায় নি।

গত বছর অর্থাৎ ওদের বিয়ের প্রায় বিশ বছর বাদে হঠাৎ একদিন খবর পেলাম মধু দুর্গাকে খুইয়েছে। মাত্র তিনদিনের জ্বরে দুর্গা মারা গেছে।

শুনে মনটা কি যে খারাপ হয়েছিল নিজেই জানি। মধুকে দু'তিনখানা চিঠি লিখেও জবাব পাইনি। মাস ছয় বাদে বম্বেতে কাজের সুযোগ মিলল। এসেই ওর বাড়ি ছুটলাম। কিন্তু বাড়ি তালাবন্ধ, মধু নেই। কোথায় গেছে তাও কেউ বলতে পারল না। আজ চারমাস ধরে সে নাকি নি-পাত্তা। একসঙ্গে চার-পাঁচটি প্রযোজক ছবির মাঝখানে ওর জন্যে আটকে গিয়ে নাকি মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।

আমার পরিচিত পরিচালক এবং আরো জনাকয়েকের মুখে ওর কথা শুনলাম। সকলেই বীতশ্রদ্ধ মধুর ওপর। কথায় কথায় পরিচালক বলল, ভাঁড়ের ভাঁড়ামীরও একটা সীমা আছে। বউ মরে যেতে সকলের সামনে শ্মশানে দাঁড়িয়ে পর্যন্ত মধু কি করল জানেন? দুর্গাকে চিতায় শোয়ানো হয়েছে, আর মধু দুই চোখের জল ছেড়ে দিয়ে নিজের একটা হাতের উল্টোদিক মুখে ঠেকিয়ে চট-চট শব্দ করে চুমু খেতে লাগল—যেন দুর্গাকেই ক্রমাগত চুমু খেয়ে চলেছে—তার চোখমুখের সে কি হাব-ভাব তখন। যারা ছিল তারা শোক করবে কি, হেসে সারা।

...হাতের উল্টোপিঠ মুখে ঠেকিয়ে শব্দ করে চুমু খাওয়ার একটা রহস্য আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই সকলে একটা ভাঁড়ামী ভেবেছে।

...দুর্গাকে বিয়ে করতে পারার সেই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা এবারে ব্যক্ত করা যেতে পারে।

...মধুকে দুর্গা আমল দেবেই না। আর মধুও না-ছোড়। সেদিনের ঘটনা, সেই সকালেও নাকি দুর্গা দারুণ দিয়ে মধুকে বাতিল করতে চেয়েছে, বলেছে, পুরুষকার থাকলে কোনো ছেলে ছবিতে ভাঁড়ামী করে না—সে একটি দুর্বল-চিত্ত অমানুষতাকে আবার বিয়ে!

সেই দুপুরেই একজন বান্ধবীর সঙ্গে দুর্গার দেড়শ-দু'শ মাইল দূরে কোথায় যাবার কথা। মধুর হাতে কোনো কাজ নেই শুনে দুর্গার বাবা মধুকেই ওদের চলনদার ঠিক করে দিয়েছে। দুর্গার আপত্তি ছিল, কিন্তু এ-ব্যাপারে সোরগোল করে আপত্তি করতেও ওর রুচিতে বাধে। কিন্তু মধু সঙ্গে যাচ্ছে শুনে দুর্গার বান্ধবী মহাখুশি। সে আবার মধুর খুব ভক্ত।

ট্রেনের একটা খুপরিতে ওরা দু'জন পাশাপাশি বসেছে, ওদের উল্টোদিকে মধু রঙ্গনাথন। দুর্গার বান্ধবী সেই থেকে ভারী খুশিমেজাজে মধুর সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করছে—আর অনর্গল তার প্রশংসা করে চলেছে। দুর্গা বেশির ভাগ সময়ই গম্ভীর।

একসময় একটা মস্ত টানেলের মধ্যে গাড়িটা ঢুকে পড়ল। মধু জানে লম্বা টানেল। গাড়ীর ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে নিজের হাতের উল্টো-পিঠ মুখে ঠেকিয়ে বেশ রসিয়ে এবং অল্প অল্প শব্দ করে দীর্ঘ একটা চুমু খেয়ে বসল।

গাড়ি অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে বেরুবার আগেই তার আবার হাবাগোবা মুখ।

গাড়ি আবার আলোয় আসার সঙ্গে সঙ্গে দুই মহিলা দু'জনের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো। দুজনারই খরখরে মুখ, করকরে চাউনি। সারাক্ষণ আর কেউ কারো সঙ্গে কথা বলল না।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছে মধুকে আড়ালে টেনে এনে দুর্গা মুখে যা আসে তাই বলে গালাগালি করল— শয়তান বলল, চরিত্রহীন বলল, তাড়িয়ে দিতে চাইল।

মধু জবাবদিহি করল, আমাকে দুর্বল পুরুষকারশূন্য বলো, তাই ভাবলাম—

দুর্গা আরো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। আরো বেশি গর্জন করে ওকে তাড়িয়ে দিতে চাইল।

ফলে মধুরও একটু রাগ হয়ে গেল। বলে ফেলল, এতই যদি খারাপ লাগল তো ধরলাম যখন, আমাকে ঠেলে ফেলে দিলে না কেন—অতক্ষণ ধরে চুমু খাওয়া সত্ত্বেও একটু বাধা দিলে না কেন, তোমার ভালো লাগছে ভেবেই আমার আনন্দ হল, আর তাইতেই একটু শব্দ বেরিয়ে গেল। আসলে বান্ধবী পাশে ছিল বলেই তোমার অত রাগ এখন, তখন তো দিব্বি গলা জড়িয়ে ধরলে—

—কি? কি বলছ তুমি? রাগে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল দুর্গা।— তুমি আমাকে ধরেছিলে, আর আমি বাধা দিলাম না। আমি তোমাকে ঠেলে ফেলে দিলাম না, আমি তোমার গলা জড়িয়ে ধরলাম। পাজী শয়তান মিথ্যেবাদী কোথাকার!

—যাঃ কলা। মধুব বিমূঢ় মূর্তি।—অন্ধকাবে আমি তাহলে নার্ভাস হযে গিযে কাকে ধবতে কাকে ধবেছিলাম? ছি ছি ছি ছি—আমাকে সত্যি তুমি গুলী কবে মাবো, তুমি না মাবলে আমি ফিবে গিযে নিজেই আত্মহত্যা কবব।

সঙ্গে সঙ্গে গালেব ওপব ঠাস কবে একটা চড। চড মেবে দুর্গা জ্বলতে জ্বলতে ঘব ছেড়ে চলে গেল।

...বাড়ি ফিবে বিযেতে বাজী হযেছে। কিন্তু দুর্গা কোনদিন বিশ্বাস কবেনি, মধু সত্যিই ভুল কবে ওই কাণ্ড কবেছে। তাব বদ্ধ বিশ্বাস, তাকে জব্দ কবা আব আক্কেল দেবাব জন্যেই বেপবোযাব মতো বান্ধবীব ওপব ওই হামলা কবেছে। বিযেব পবেও নাকি এই নিযে ওকে অনেক গঞ্জনা দিযেছে দুর্গা।

ওদেব মুখে শোনা শেষেব দৃশ্যটা আমি চোখেব সামনে দেখতে পাচ্ছি। দুর্গা চিতাশয্যায শযান। আব চোখেব জলে ভেসে মধু পাগলেব মতো নিজেব হাতেব উল্টোপিঠ মুখে ঠেকিযে সশব্দে চুমু খেযে চলেছে।

এই বেপবোযা কাণ্ড কবে মধু বঙ্গনাথন দুর্গাকে একদিন নিজেব জীবনে টেনে আনতে পেবেছিল। আব ঠিক এমনি কবেই নিজেকে জাহান্নামে পাঠাবাব ভয দেখিযে দুর্গাকে সে চিতা-শয্যা থেকে তুলে আনতে চেষ্টা কবেছে।

ক্ষুধা

ট্রেনে সাধাবণত থার্ড ক্লাসেব যদ্দেব আমি। শ্রীপাব কোচে সাড়ে চাব টাকাব বাড়তি মাশুল গুনে বাতে ঘুমোবাব জন্যে একখানা বেঞ্চ পেলেই খুশি। ফলে অভ্যেসখানা এমন হযেছে যে, ববাতজোবে সদ্য বর্তমানে ফার্স্ট ক্লাস বিজার্ভ কোচেব চাবজনেব বিচ্ছিন্ন কম্পার্টমেন্টে এত আবামেব জাযগা পেযেও ট্রেন ছাড়াব কিছুক্ষণ বাদেই ভেতবটা ওই থার্ড ক্লাসেব জন্যেই আনচান কবে উঠেছিল। অথচ একটু আগে এই অভিজাত খুপবিতে পদার্পণ কবে এবং আসন নিযে ভেতবটা প্রসন্ন হযে উঠেছিল। পবিষ্কাব চকচকে কামবা, দু'দিকে দুটো পুরু গদিআঁটা বার্থ, আব ওপবে তেমনি গদিআঁটা আবো দুটো বার্থ। বেশ চওড়া। শুলে পিঠেব সিকিভাগ বেবিযে থাকাব সম্ভাবনা নেই। মাথাব ওপব চাবজনেব জন্যে চাবটে পাখা, দুটো বড় সাদা লাইট, একটা সবুজ লাইট, শিযবেব দিকেব ওপবে নীচে চাব কোণে চাবটে শেড-দেওযা ছোট পড়াব লাইট—স্বাচ্ছন্দ্যেব আবো কিছু আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা। সামনেব দবজাটা টেনে দিলেই চাবটি যাত্রী ট্রেনেব মধ্যে থেকেও বিচ্ছিন্ন।

মোট কথা, এই শ্রেণীব যাত্রীদেব মান এবং মর্যাদা সম্পর্কে বেল কর্তৃপক্ষ কিছুটা সচেতন। তা যত গুড় তত মিষ্টি। এযাব-কনডিশন আবো আবামেব, এবোপ্লেনে ততোধিক, আব এই গুড় যদি নিজেব পকেট থেকে ঢালতে না হয তাহলে যাকে বলে মিষ্টি মধুব। এই যাত্রায আমি চলেছি সম্মানিত অতিথি হিসেবে একজন সহযাত্রীব

কাঁধে ভর করে যিনি পকেটের পরোয়া করেন না। ফলে আমার দিক থেকে এটি নির্ভেজাল আনন্দ-যাত্রা। আনন্দের আরো কিছু ফিরিস্তি দেওয়া যেতে পারে। কোন ভবঘুরের উক্তি, আপনার বেড়াবার আনন্দ অনেকখানি নির্ভর করছে আপনার সহযাত্রীর ওপরে। সহযাত্রী বা যাত্রীরা যদি স্বল্পভাষী অথচ রসিক হন তাহলে আপনি ভাগ্যবান, তিনি বা তাঁরা যদি আপনার থেকে বাকপটু হন তাহলে আপনার ভাগ্যটা মাঝারি, আর যদি পলকা বাক্যবাগীশ হন তো আপনার দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একটি মাত্র যদি সুদর্শনা রমণী থাকেন আর তিনি যদি সহযাত্রীর ওপর হাবভাবেও সামান্য একটু সহৃদয়া হন আর অল্পসল্প মিষ্টি হাসেন আর একটু-আধটু কথা বলেন তো আপনার ভাগ্যের তুলনা নেই—পথ যত দীর্ঘ বা ক্লান্তিকর হোক, আপনার ভিতরটা বংদার তাজা ফড়িংয়ের মত আনন্দের ডালে ডালে ঘুরেফিরে বেড়াবে।

তা আমি এ-যাত্রায় প্রায় সব দিক থেকেই তুলনারহিত ভাগ্যবান। চার বার্থের এই অভিজাত কম্পার্টমেণ্টে আমাকে বাদ দিলে আর দু'জন সহযাত্রী এবং একজন সহযাত্রিনী। ভদ্রলোক দু'জনের একজনের বয়েস পঁয়তাল্লিশ একজনের বড়জোর পঁয়ত্রিশ। তাঁরা মামাতো-পিসতুতো ভাই। এ-যাত্রায় ওই পঁয়তাল্লিশ, ভদ্রলোকটির গৌরী সেনের ভূমিকা। নাম তাঁর যাই হোক, সকলে মজুমদার মশাই বা বড়বাবু বলে ডেকে থাকে। বাংলা ছায়াছবির মোটামুটি নামী প্রযোজক অর্থাৎ প্রোডিউসার তিনি। এতদিন নিতান্ত মাঝারি প্রোডিউসার ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি পর পর তার দু'খানা ছবি ঊর্ধ্ব মার্গের বক্স অফিস হীট। সেই বিত্তের হিড়িকে বাতাবাতি বৃত্ত বদল হয়ে গেছে তার। প্রযোজনার সামনের সারিতে এসে হাজির হয়েছেন। সেই দু'খানা ছবিই রিলিজের পর পর আমি দেখে নিয়েছিলাম এবং আশাহত হয়েছিলাম। খরচের টাকা উশুল হবে কিনা সংশয় ছিল। কিন্তু সব সংশয় ব্যর্থ করে ভদ্রলোক প্রমাণ করেছেন বাংলা ছবির দর্শক-মনের কত নির্ভুল বিচারক তিনি। দু'বছরে পর পর দু'খানা ছবি তাক-লাগানো ভাবে লাগিয়ে দিয়ে এখন সাদা আর কালো টাকার হিসেব-নিকেশে মশগুল হয়ে আছেন। এবারে তার, যাকে বলে একখানা প্রেস্টিজ ছবি করার বাসনা। কিন্তু প্রযোজকের শুধু প্রেস্টিজ ধুয়ে জল খেলে চলে না। কাগজওয়ালারা গত দুটো হীট ছবির একটিরও সদয় মন্তব্য করেনি। অতএব এবার নাম চাই আর সেই সঙ্গে টাকাও চাই।

অনেক খেটে অনেক জল্পনা-কল্পনা করে এই প্রেস্টিজ ছবির যে গল্প বাছাই করা হয়েছে, ভাগ্যক্রমে সেটা আমারই লেখা। সত্য কথা বলতে কি, আমি নিজেই একটু অবাক হয়ে গেছলাম। আগের ওই সুপারহীট পিকচার যারা করেছেন তাদের কেউ এ গল্পের ছায়া মাড়াতে পারেন, ভাবিনি। কিন্তু আমার ভাবনা নিয়ে তো আর জগৎ চলছে না, আর বলা বাহুল্য, এই ব্যতিক্রমের ফলে অন্তত ভদ্রলোকের সম্পর্কে ধারণা অনেকখানি বদলেছে। এখন আমার ধারণা, টাকা কি করে করতে হয় ভদ্রলোক জানেন, সেই সঙ্গে ভালো-মন্দের বিচার-বোধও আছে। ব্যবসায়ী হিসাবে গল্পের দাম নিয়ে প্রথম দফায় কিছু ঝকাঝকি করেছেন আমার সঙ্গে, ফয়সলা হয়ে যাবার পর তিনি ভিন্ন মানুষ।

দিলদরিয়া অতিথি-বৎসল। গল্পের আলোচনার জন্য বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে অনেক খাইয়েছেন। এই ছবিতে নিযুক্ত নামী পরিচালকটির কাছে নিজের বক্তব্য শেষ করার জন্য আমাকে ঠেলে দিয়েছেন। লক্ষ্ণৌতে আউটডোর শুটিং-এ চলেছেন এঁরা। ইউনিট নিয়ে পরিচালক দু'দিন আগেই যাত্রা করেছেন। মজুমদার মশাই, অন্যথায় বড়বাবু, ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে আটকে পড়েছিলেন বলে দু'দিন পরে যাচ্ছেন। বড়বাবুর সর্বকাজের প্রধান দোসর তাঁর এই পিসতুতো ভাই হিরন্ময় বা হিরু গুপ্ত। বড়বাবু না নড়লে তারও নড়ার উপায় নেই। অতএব ম্যানেজারির ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে সে-ও দুদিনের জন্য পিছিয়ে গেছে। আমার সঙ্গী হবার বাসনাটা সে-ই বড়বাবুকে জানিয়েছিল, শোনামাত্র ভদ্রলোক আমাকে দরাজ আমন্ত্রণ জানিয়ে-ছিলেন।

এ হেন সহযাত্রী আর যাই হোক অবাঞ্ছিত নন। তাছাড়া ভদ্রলোক কথা বেশি বলেন না, তার থেকে ঢের বেশি মিটিমিটি হাসেন। তখন তাঁর খুশি-খুশি ফোলা গাল দটোকে টসটসে রসালো মনে হয়। লক্ষ্য করেছি তাঁর কথায় সোজা সায় দিলে তিনি সেটা চাটুকারিতা ভাবেন, কিন্তু প্রতিবাদ করে শেষে যুক্তি খুঁজে না পেয়ে হার মানলে তুষ্ট হন। হিরু গুপ্তের আচরণে এই বৈশিষ্ট্যটুকুই লক্ষ্য করেছি। প্রতি কথায় প্রথমে বাধা দিয়ে পরে স্বীকার করবে, তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমি আগে বুঝিনি, বা এদিকটা খেয়াল করিনি, ইত্যাদি।

পাঠানকোট সকালে ছাড়ে, পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় লক্ষ্ণৌ পৌঁছায়। অতএব আমাদের গোছগাছ নিয়ে তাড়ার কিচ্ছু ছিল না। কিন্তু গাড়িটা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মজুমদার মশাই উঠে দাড়িয়ে বার্থগুলো একনজর দেখে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ওপরে না নীচে?

আমি জবাব দেবার আগেই হিরু গুপ্ত মন্তব্য করেছে, ওনার নীচের বার্থ হলেই সুবিধে হয় বোধহয়, কিন্তু

কিন্তুর দিকে না গিয়ে তাড়াতাড়ি বলেছি, না না, ওপরের বার্থে আমার একটুও অসুবিধে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে সামনের মহিলার দিকে চোখ গেছে। তার নির্লিপ্ত মুখভাব। নীচের আর একখানা বার্থ তার দখলে থাকবে জানা কথাই।

মৃদু হেসে মজুমদার মশাই নিজের হাতে আমার বেডিং খুলতে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বোঝার আগেই হিরু গুপ্ত হাঁ-হাঁ করে উঠল, আহা, ওঁর বিছানা পরে করে দেওয়া যাবে— সর্বব্যাপারে তোমার ব্যস্ততা—

পরে নয় এখনই করে দে তাহলে। আর ওই বার্থে তোরটাও পেতে ফেল —সবকিছু পরিপাটি ছিমছাম না হলে আমার অস্বস্তি।

আমি কিছু বলার ফুরসুত পেলাম না। হিরু গুপ্ত অপ্রসন্ন মুখে আমার হোলড অলটা টান মেরে খুলে ফেলল। অতএব ব্যস্ত হয়ে আমিও তার সঙ্গে হাত লাগালাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমার ফিটফাট শয্যা রচনা হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় বাংকে সে নিজের তকতকে শয্যা বিছালো, তারপর নেমে এসে বলল, এবার তোমাদেরটাও শেষ করে যে যার শুয়ে পড়া যাক।

অল্প হেসে মজুমদার মশাই বললেন, আমাদেরটা এখন কি, বসতে হবে, খাওয়া-দাওয়া সারতে হবে—

বলতে বলতে ঝুঁকে বড় ট্রাংকটা খুলে দুটো ঝকমকে গালচে বার করলেন। —নীচে আপাতত এই দুটো বিছিয়ে দে।

নীচের গদি-আঁটা বেঞ্চদুটোয় শৌখিন গালচে বিছানো হল। এ ব্যাপারে দেওরের সঙ্গে মহিলা নিজেও হাত লাগালো। তারপর জিনিসপত্রগুলোও জায়গামত গোছগাছ করে রাখল। এই সামান্য কাজটুকু দেখেই আমার কেমন মনে হল, মহিলার রুচিবোধ আছে। তাছাড়া ওপরে বিছানাপত্র সুবিন্যস্ত করা আর নীচে গালচে দুটো পেতে অন্য জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখার পরে ছোট কামরাটার শ্রীই বদলে গেল। ধপ করে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে হিরু গুপ্ত মন্তব্য করল, সত্যিই এখন ভালই তো লাগছে দেখি।

তোষামোদটুকু যাঁর উদ্দেশ্যে তিনি অর্থাৎ মজুমদার মশাই সেটা স্মিতহাস্যে গ্রহণ করে আমার দিকে ফিরলেন।—বসুন, এখন কি খাবেন বলুন?

এরারও হিরু গুপ্ত আগেই তড়বড় করে উঠল, এই তো খেয়ে বেরুনো হল সবে, এখনই আবার খাওয়া কি।

আমিও সায় দিলাম, যাক খানিকক্ষণ।

মজুমদার মশাই স্ত্রীর উল্টোদিকের আসনে গা ছেড়ে দিয়ে বসলেন। ঠোঁটের ফাঁকের হাসির অর্থ—দেখা যাক কতক্ষণ কাটে।

এরারে দ্বিতীয় সহযাত্রী হিরু গুপ্তর প্রসঙ্গ। আধময়লা লম্বাটে চেহারা। নাকের ডগা একটু থ্যাবড়া, চোখ দুটো মন্দ নয়, কিন্তু চাউনিটা বেশ প্রখর। এ চোখের দিকে তাকালে মনে হয় ওর মাথার মধ্যে সর্বদাই কিছু একটা জল্পনা-কল্পনা চলছে, সেই কারণে ওর মনটা যথার্থ স্থানে যেন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নয়। ফলে চাউনির মধ্যে এক ধরনের ধারালো সংশয়ের ছায়া।

সহযাত্রী হিসেরেও একে কোন শ্রেণীতে ফেলব বলা শক্ত। কারণ কথা যখন বলে অনর্গল বলে যেতে পারে। আবার যখন চুপ করে থাকল একেবারে চুপ। হারভাব ছটফটে গোছের। আজ নয়, আগেও মনে হয়েছে ওর ভিতরে কিছু একটা অসহিষ্ণুতা দানা বেঁধে আছে। সেই ঝোঁকে চলে, সেই ঝোকে কথা বলে। বড়বাবুর সে ডান হাত, ইউনিটে স্বভাবতই তার অখণ্ড প্রতাপ।

আমার সঙ্গে এর প্রথম আলাপ ছবির এই গল্প নিয়েই। এ গল্প নির্বাচনের ব্যাপারে সে-ই যে প্রথম উদ্যোক্তা এটা সে গোড়াতেই আমার কাছে জোর গলায় জাহির করেছে, দাদা কি সহজে বুঝতে চায় মশাই, নাকি এসব হাই জিনিস সহজে তার মগজে ঢোকে। ঠেসে ঢোকাতে হয়েছে মশাই, বুঝলেন? এ-জন্য ডিরেক্টরকে পর্যন্ত আগেভাগে হাত করতে হয়েছে। গল্প পড়ে তিনি টলতে দাদা ঢলল। গল্পটা ভাল করে মাথায় ঢোকার পরে অবশ্য দাদার উৎসাহ সকলকে ছাড়িয়েছে। আমার অবিশ্যিসের কারণ নেই, কারণ কি ছবি উনি আগে করেছেন দেখেছি। ভিতরে ভিতরে হিরু গুপ্তর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। দিনকয়েক বাড়িতে আসার ফলে বেশ খাতির হয়ে গেছল। সেই খাতির জমাট বেঁধে

গেল কিছুদিন আগেব এক সন্ধ্যায। সেই সন্ধ্যায বাড়িতে এব জন্যে আমি প্রস্তুত হযেই অপেক্ষা কবছিলাম। কাবণ সেই দিন আমাব এই ছবিব গল্পেব পুবো দাম অর্থাৎ বেশ কযেক হাজাব টাকা প্রাপ্তিযোগ আছে।

নির্দিষ্ট সমযেব প্রায ঘণ্টাখানেক বাদে হিরু গুপ্ত এলো। আশা কবেছিলাম ফাইনাল লেনদেনেব ব্যাপাবে তাব দাদাও আসবেন। কিন্তু গাড়ি থেকে হিরু গুপ্ত একাই নামল।

তাব দিকে চেযে আমি অবাক একটু। শুকনো ক্লান্ত মুখ, উসকো-খুসকো চুল। এসেই টাকাব বাণ্ডিল সামনে ফেলে দিযে বিস্টি বাব কবে বলল, দেখে নিযে সই কবে দিন—

দেখে নেওযা অর্থাৎ টাকা গুনে নেওযা দবকাব বোধ কবলাম না। যাবা দিচ্ছে দেখেশুনে গুনেই দিচ্ছে। বিস্টিটা নাড়াচাড়া কবতে কবতে জিজ্ঞাসা কবলাম, আপনাকে ভালো দেখাচ্ছে না, অসুস্থ নাকি?

—না মশাই, এই লোহা-মার্কা শবীবে অসুখ-বিসুখ নেই—সেই সকাল থেকে আপনাব এই ছবিব ব্যাপাবে ছোটাছুটি, তাবপব তিনটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত ইনকাম ট্যাক্স, সেখান থেকে ডিবেক্টবেব সঙ্গে অ্যাপযেণ্টমেণ্ট সেবে আপনাব এখানে আসছি —সকাল থেকে চান দূবে থাক পেটে একটা দানা পড়েনি।

আমি ব্যস্ত হযে উঠলাম।—সে কি! নিজে না এসে দাদাকে পাঠালেই তো পাবতেন!

হাসল। হাসিটা কেমন তিক্ত মনে হল আমাব। জবাব দিল, তিনি আজ ব্যস্ত বড়, তাব ব্যস্ততাব সবটুকুই আনন্দেব। নিন সই করুন চটপট—

বিস্টি বেখে টাকাব বাণ্ডিল হাতে কবে আমি উঠে দাড়ালাম।— সই পবে হবে, আপনি ঠাণ্ডা হযে বসুন বিশ মিনিটেব মধ্যেই আমি আপনাব খাওযাব ব্যবস্থা কবছি।

এই আন্তবিকতাব ফলে উল্টে কেউ যে বিবক্ত হতে পাবে ধাবণা ছিল না। হিরু গুপ্ত যথার্থই বিবক্ত। উঠে দাড়াল একেবাবে।— দেখুন মশাই, আমাব মেজাজপত্র এখন ভাল নয, সই কববেন তো করুন, নইলে আমি চললাম, পবে সই কবে পাঠিযে দেবেন।

মেজাজ দেখে সত্যিই বিব্রত বোধ কবলাম একটু। বসে বিস্টি সই কবে দিলাম। সেটা দেবাব ছলে তাব হাত ধবে সকাতবে বললাম, দেখুন সমস্ত দিন উপোস কবে আপনি টাকা দিতে এসে শুধু-মুখে ফিবে গেলে খুব খাবাপ লাগবে, আপনি দশটা মিনিট বসুন, আমি যা হোক কিছু ব্যবস্থা কবছি।

বিবক্তি চাপতে চেষ্টা কবে সোজা মুখেব দিকে তাকালো। তাবপব কি ভেবে থমকালো একটু।—খাওযাতে চান?

—যা হোক একটু কিছু—

—একটু কিছু কি খাওযাবেন?

—একটু সময দিলে যা খেতে চাইবেন তাই খাওযাব।

হাতঘড়িটা দেখে নিল। সাড়ে সাতটা। আবার চোখে চোখ রেখে দুই এক পলক ভেবে নিল। তারপর কষ্ট করে হেসে বলল, সমস্ত দিন বাদে একটু কিছু খেয়ে আর কি হবে, আজ আপনার সুদিন, খাওয়াতে চান তো ভালো করেই খাওয়াবেন চলুন, আমি গাড়িতে বসছি, চটপট বেড়ি হয়ে আসুন।

আমি হতভম্ব একটু। হিরু গুপ্ত ততক্ষণে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে। অগত্যা তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে জামাকাপড় বদলে নিলাম। কি খেতে চায় ভগবানই জানেন। নোটের বাণ্ডিল থেকে দুটো একশো টাকার নোট পকেটে ফেলে বেরিয়ে এলাম। স্ত্রী ততক্ষণে খুশিচিত্তে নোটের তাড়া নিয়ে গুনতে বসেছেন।

যা মনে হয়েছিল তাই। গাড়িতে পাঁচটা কথাও হল না, অভিজাত এলাকায় এসে যে ভোজনশালাটি বেছে নিল সেটি পানশালাও বটে। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। হিরু গুপ্ত ড্রিংক-এর অর্ডার পেশ করল। আমার চলে না শুনে একটু যেন বিরক্ত। বেয়ারা চলে যেতে মন্তব্য করল, আপনি একেবারে জলো লেখক দেখি—

নিঃশব্দে দু'দফা গেলাস খালি করল। ইশারায় বয়কে আবার ঢেলে দিতে বলল। ইতিমধ্যে খাবার অর্ডারও সে-ই দিয়েছে। এতক্ষণে একটু একটু করে মেজাজ আসছে মনে হল। মুখে সস্তা কড়া সিগারেট লেগেই আছে। ঘন ঘন সিগারেট খাওয়াটাও রোগ হিরু গুপ্তর। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, মদ কেন খাই বলুন তো?

—অভ্যেস করে ফেলেছেন।

—কেন অভ্যাস করতে গেলাম? ভালো জিনিস তো কিছু নয়। এই যে আমি একাই গিলে চলেছি, সামনে বসে আপনি খাচ্ছেন না—আপনার ওপর আমার রাগই হচ্ছে।

জবাব এড়াতে চেষ্টা করে বোকার মত একটু হাসলাম শুধু। চোঁ করে হিরু গুপ্ত গ্লাসের অর্ধেক সাবাড় করল। সিগারেটের ডগায় নতুন সিগারেট ধরিয়ে বলল, আসলে যন্ত্রণা ডোবারবার এ একটা মোক্ষম দাওয়াই। আমিও খেতাম না, এখন এন্তার খাই। শালারা খারাপ দিতে এত দেরি করেছ কেন? কি বলছিলাম, যন্ত্রণা। আপনি আমার সঙ্গে পনেরো দিন এসব জায়গায় ঘুরুন, তারপর বাড়ি ফিরে একদিন দেখুন অন্য কোন লোকের সঙ্গে আপনার বউ পালিয়েছে বা সেই গোছের কিছু একটা হয়েছে —তখন দেখবেন মদ আপনার একমাত্র বন্ধু। হেসে উঠল, এটা একটা কথার কথা, মানে উপমা—

হিরু গুপ্ত এখন কথার মুডে আছে। আর এক চুমুকে গেলাস খালি করে হাঁক দিল, বোয়।

হন্তদন্ত হয়ে এসে বয় গেলাস বদলে সোডার বোতল খুলে সামনে রাখল। তার দিকে চেয়ে হিরু গুপ্ত নৃশংস অথচ ঠাণ্ডা গলায় বলল, পাঁচ মিনিটমে টেবিল পর খানা নহী আয়ে তো—

বাকিটুকু শেষ না করে পাঁচ আঙুলে খোলা সোডার বোতলটা চেপে ধরল সে। এখানকার বয় সম্ভবত খদ্দেরের এই গোছের মেজাজ দেখে অভ্যস্ত। গলা দিয়ে 'জি সাব' নির্গত করে চকিতে উধাও সে। হিরু গুপ্ত গেলাসে সোডা মেশালো। এইবার আমি আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়লাম। বললাম, আপনার যন্ত্রণাও মেয়েঘটিত নিশ্চয়ই।

গেলাস মুখে তুলতে গিয়েও তোলা হল না। হিরু গুপ্ত আকাশ থেকে পড়ল যেন একেবারে।—আমার যন্ত্রণার কথা আপনি জানলেন কি করে? আমি কিছু বলেছি?

নেশার ঘোরে আলোচনার প্রসঙ্গ এরই মধ্যে ভুলেছে মনে হল। আমার সুবিধেই হল, বললাম, আপনাকে দেখে কেন যেন আমার সেই রকমই মনে হয়।

—কি মনে হয়? উদগ্রীব।

—কোন মেয়ের কাছ থেকে আপনি বড় রকমের আঘাত পেয়েছেন।

থমথমে চোখে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর বড় করে এক ঢোঁক গিলে নিয়ে বলল, এই জন্যেই আপনারা লেখক, আপনারা জীবনশিল্পী—আপনার সম্পর্কে আমার ধারণাই বদলে গেল।

অমায়িক একটু হেসে খাবারের প্রত্যাশায় আমি ঘাড় ফেরালাম। খাবার না আসা পর্যন্ত গেলাসের চাহিদা থামবে বলে মনে হয় না। খাওয়ার ফাঁকে হিরু গুপ্তর যন্ত্রণা প্রসঙ্গে পাড়ি দেবার ইচ্ছে।

গেলাস আধা-আধি খালি। সামনের দিকে ঝুঁকে সাগ্রহে সে এক ধরনের দার্শনিকতার মধ্যে ঢুকে পড়ল।—আপনি আজ টাকা পেলেন আপনার সুদিন, আর সমস্ত দিন উপোস আর ধকলের পর আপনাকে সেই টাকা দেবার জন্য ছুটতে হল বলে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছল। ওদিকে দেখুন, দাদার আজ সব থেকে আনন্দের দিন আর ওই এক কারণে আজই আমার সব থেকে খারাপ দিন। একই কারণে একজনের ভালো তো একজনের খারাপ—একজনের খারাপ তো একজনের ভালো। আশ্চর্য না?

সদয় মুখ করে মাথা নেড়ে সায় দিলাম।—আজকের দিনেই বোধহয় আপনি কাউকে খুইয়েছিলেন?

বেদনায় আর বিস্ময়ে হিরু গুপ্তর ভারী চোখ দুটো বিস্ফারিত।— আপনি তো অদ্ভুত মানুষ দেখি, অ্যাঁ। এমনিতে তো মনে হয়, ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানেন না। সাগ্রহে আরও সামনে ঝুঁকল, গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা।—কিন্তু এ যন্ত্রণার শেষ কোথায়? শেষ আছে?

—কি জানি।

—জানেন, জানেন—আপনি অনেক জানেন—বলুন।

ভেবে নিলাম একটু।—শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনার যন্ত্রণা যদি সত্যি হয়, তার একটা ভাগ তিনিও পাচ্ছেন।

নেশা ছোটার উপক্রম। লাফিয়ে উঠল যেন।—পাচ্ছেন? পাচ্ছেন? আপনি ঠিক জানেন?

ভারী গলায় জবাব দিলাম, তা নাহলে যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা থাকে না—বিস্বাদ হয়ে যায়।

কি বুঝল হিরু গুপ্ত সে-ই জানে। দুচোখ টান করে চেয়ে রইল।

খাবার এলো।

সেই খাবারের পরিমাণ দেখে আমার চক্ষুস্থির। এত অর্ডার দেওয়া হয়েছে কল্পনাও করিনি। প্রমাণ সাইজের টেবিলটায় হিরু গুপ্তর সোডার বোতল আর গেলাস রাখারও জায়গা নেই। এক চুমুকে সে গেলাসটা খালি করে দিল। টেবিল পরিষ্কার করে দুটো বয় আটটা বড় ডিসে একরাশ খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল।

হিরু গুপ্ত নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। ঘোর-লাগা দুই চোখ টান করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভোজ্যসামগ্রী একদফা নিরীক্ষণ করে নিল। তারপর কাঁটা-চামচে সব একধারে সরিয়ে রেখে হাত লাগালো। আমার উদ্দেশে অস্ফুট স্বরে বলল, শুরু করুন।

আমি শুরু করলাম কি করলাম না দেখার ফুরসত নেই। হিরু গুপ্ত ক্ষিপ্র মেজাজে খেতে লাগল। খাওয়ার ব্যাপারে এই গোছের তৎপর একাগ্রতা কমই দেখেছি। যেন অনেক দিন খেতে পায়নি— তার মধ্যে একরাশ খাবার হাতের কাছে পেয়ে হামহুম করে খেয়ে চলেছে। এই খাওয়ার ঝোঁক দেখে এতক্ষণ সে কোন রাজ্যে ছিল কল্পনাও করা যাবে না। মুখে কথা নেই, অবিরাম মুখ নড়ছে আর হাত নড়ছে। দু'চোখ খাবারের ডিশগুলোর ওপরেই চক্কর খাচ্ছে। বলা বাহুল্য, মোট খাবারের চার ভাগের তিন ভাগই সে অক্লেশে উদরস্থ করল। এই খাওয়ার ফাঁকে দুই-একবার আমি পূর্ব প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু তার খাওয়ার তন্ময়তায় চিড় ধরানো গেল না।

একেবারে খাওয়া শেষ করে তবে মুখ তুলল। বড় একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, বেশ খেলাম, আপনার হয়েছে?

—অনেকক্ষণ।

—চলুন তাহলে ওঠা যাক।

বিল মিটিয়ে আবার তার গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। এখনো আশা করছিলাম হিরু গুপ্ত তার যন্ত্রণার প্রসঙ্গ তুলবে। কিন্তু সেটা ওই একরাশ খাবারের তলায় চাপা পড়ল কি আর কিছুর, ভেবে পেলাম না। কিন্তু যা-ই হোক, এই এক সন্ধ্যার পর থেকে হিরু গুপ্ত আমাকে একেবারে তার বুকের কাছের মানুষ ভাবে।

তৃতীয়, সহযাত্রিনী প্রসঙ্গ।

ভবঘুরের উক্তির সঙ্গে অনেকটা মেলে। রমণী শুধু সুদর্শনা নয়, সুলক্ষণাও। সুন্দর মুখে একধরনের চাপা মিষ্টি অভিব্যক্তি ছড়িয়ে আছে। মুখ তুলে সোজা মুখের দিকে তাকাতে পারে, কিন্তু চাউনিটা নরম আর ঠাণ্ডা গোছের। বয়েস বড়জোর তিরিশ, লম্বা গড়ন, স্বাস্থ্যও পরিমিত। নড়াচড়ার ফাঁকে নিজেকে একটু ঢেকেঢুকে রাখার সহজাত প্রবৃত্তিটুকুও মিষ্টি লাগল। পঁয়তাল্লিশ বছরের স্থূলবপু মজুমদার মশাইয়ের পাশে একটুও মানায় না। কিন্তু সংসারের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ-রকম বেমানান জুটিই দেখা যায়। নাম শুনলাম মিলু। মজুমদার মশাই এর মধ্যে বারকয়েক তাকে ওই নামেই ডেকেছেন। সম্ভবত সংক্ষিপ্ত আদরের ডাক এটা।

এক্ষুণি খাওয়ার প্রসঙ্গ বাতিল করে হিরু গুপ্ত তার সস্তা কড়া ব্র্যাণ্ডের সিগারেট বার করে ঠোঁটে ঝোলালো। তার পরেই একটু থমকে রমণীর দিকে তাকালো। রমণীর ঈষৎ অপ্রসন্ন ঠাণ্ডা চাউনি লক্ষ্য করলাম আমিও। এটুকুও সুচারু মনে হল।

ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে হিরু গুপ্ত বলে উঠল, যাচ্ছি বাবা, বাইরে যাচ্ছি— এই জন্যেই নিজের জন্য আলাদা কম্পার্টমেন্ট করতে চেয়েছিলাম, এখন পনেরো মিনিট অন্তর উঠে বাইরে গিয়ে সিগারেট খেয়ে আসতে হবে—

গজগজ করতে করতে উঠে দাঁড়াল সে। মজুমদার মশাইয়ের হাসিতে স্নেহ ঝরল—তোরই তো দোষ, এতদিনে সিগারেটের গন্ধটাও সহ্য করাতে পারলি না—

প্রোডিউসার দাদার মুখের ওপর বেশ জুতসই সরস জবাব দিতে পারে দেখলাম হিরু গুপ্ত। বলল, দখলদার তুমি, আর সহ্য করানোর দায় আমার?—চেষ্টা করলে তোমার খুব ভালো লাগবে?

আমি বাইরের মানুষ সামনে বসে বলেই হয়তো রমণীর আরক্ত মুখ। মজুমদার মশাই জোরেই হেসে উঠলেন। মিলুর মুখের ওপর একটা বিরক্তিসূচক কটাক্ষ নিক্ষেপ করে সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে হিরু গুপ্ত দরজা টেনে করিডোরে চলে গেল।

স্টেশনে আসা এবং ট্রেনে ওঠার পর থেকে এইটুকু সময়ের মধ্যেই আমার ভিতরে ভিতরে একটা নিঃশব্দ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্ত্রীটির সঙ্গে মজুমদার মশাই স্টেশনেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে এই অবকাশটুকুর মধ্যে আমার কেবলই মনে হয়েছে, সেই সন্ধ্যায় পানাসক্ত হিরু গুপ্ত যে যন্ত্রণার কথা বলেছিল সেটা এই রমণীর কারণে। হিরু গুপ্ত সেটা আভাসেও আমার কাছে ব্যক্ত করেনি, শুধু সেই সন্ধ্যার কিছু কথা মনে পড়েছে। এই যোগাযোগে তার বিরক্তি, গাম্ভীর্য আর পরোক্ষ মনোযোগ এই রমণীর প্রতি যেন বিশেষভাবে নিবিষ্ট দেখেছি। ট্রেন আসতে ব্যস্তসমস্তভাবে হাত ধরে মিলুকে গাড়িতে তুলতে দেখেছি। অথচ এই ব্যস্ততার কোন হেতু নেই। ওদের পিছনে আমি। কুলির মাল তোলা হলে মজুমদার মশাই ধীরেসুস্থে আসবেন বোধ হয়। সরু করিডোর ধরেও রমণীটিকে পিছন থেকে প্রায় আগলে নিয়ে এসেছে হিরু গুপ্ত। চোখের ভ্রম কিনা জানি না, এমনও মনে হয়েছে—কনুইয়ের মৃদু ধাক্কায় রমণী তাকে একটু ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছে আর তখন অস্ফুট স্বরে হিরু গুপ্ত গলা দিয়ে একটু ক্রুদ্ধ আওয়াজ বার করেছে। চলতি ট্রেনে জিনিসগুলো টুকটাক গুছিয়ে রাখার সময় ঝাঁকুনিতে রমণী দুই-একবার বেসামাল হয়েছিল, কিন্তু তাকে রক্ষা করার জন্য পিছনে হিরু গুপ্ত মজুত। সে তক্ষুণি তার দুই বাহুর ওপর দখল নিয়েছে। আর তারপর হিরু গুপ্তর বিরক্তিমাখা গম্ভীর চোখ কতবার যে ওই রমণীর মুখে এবং দেহে বিদ্ধ হতে দেখেছি ঠিক নেই। আমার ধারণা, পুরুষের এই চাউনি আমি চিনি। কিন্তু মজুমদার মশাই এ-সব সংশয়ের ধার-কাছ দিয়েও হাঁটেন মনে হয় না।

সিগারেট শেষ করে তেমনি অপ্রসন্ন মুখে তার জায়গায় এসে বসল। আপাতত তার জায়গা বলতে মিলুর পাশে। এদিকের বার্থে আমি আর মজুমদার মশাই। কথায় কথায় ছবির প্রসঙ্গ উঠল—অর্থাৎ যে ছবিতে মজুমদার মশাই হাত দিয়েছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন হবে বলুন?

—আমি কি বলব।

—বাঃ আপনার গল্প, আপনি বলবেন না তো কে বলবে?

মহিলাব দিকে ফিবে ঈষৎ আগ্রহে জিজ্ঞাসা কবলাম, বইটা আপনি পডেছেন?

মৃদু হেসে মিলু সামান্য মাথা নাডল। মজুমদাব মশাই বলে উঠলেন, বা বে, এই গল্প সিলেকশনেব পিছনে আসল ব্যাপাবটাই তো আপনি জানেন না দেখছি। বই পডে ও-ই তো প্রথমে আমাব পিছনে লাগে—এবাবে এই গল্পটা কবো। আপনাব বই তো আমি আজও পডিনি মশাই, তিনবাব কবে ওব মুখে গল্প শুনেছি।

লেখক মাত্রেবই ভালো লাগাব কথা। ভালো লাগল। মিলুবও হাসি-হাসি মুখ। চকিতে হিরু গুপ্তব দিকে তাকালাম। তাব অসহিষ্ণু বিবস বদন। কাবণ আমাব কাছে গল্প সিলেকশনেব যে ফিবিস্তি সে দিযেছে তাব সঙ্গে এটা মিলছে না। চোখাচোখি হতে মর্যাদা বক্ষাব তাগিদে ঠোঁটেব ফাঁকে হঠাৎ একটু হাসি ঝুলিযে উঠে একেবাবে আমাব কানেব সঙ্গে মুখ ঠেকিযে ফিসফিস কবে বলল, ঠাকবোণকে দিযে কলকাঠিটি কে নেডেছে দাদা সেটা জানলেও বলবে না। নিজেব জাযগায ফিবে গেল আবাব। মিলুব চকিত চাউনি। মজুমদাব মশাই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা কবলেন, কি বললি শুনি?

হিরু গুপ্ত সাদাসাপটা জবাব দিল, বললাম, দাদা কাব ক্রেডিট কাকে দিচ্ছে দেখুন। বউদিব তোযাজ কবাব সুযোগ পেলে তুমি ছাডো না।

মজুমদাব মশাই সহাস্যে বললেন, তুই তো তোব বউদিব কিছুই ভালো দেখিস না—এ গল্প কে আমাব মাথায ঢুকিযেছে জেনেও লাগতে ছাডবি না।

হিরু গুপ্তব হাসিটা তখনো ঠোঁটে ধবা আছে কিন্তু গলাব স্বব একটু যেন অসহিষ্ণু। —তাহলে নাও গো, গল্পেব ছবি কেমন হবে তুমিই লেখককে বলো।

নির্বাক মহিলাব দুই চোখ অব্যাহতি চাইছে। হৃষ্টবদন মজুমদাব মশাই বললেন, ও কি বলবে ছবি কেমন হবে না হবে। সে তো তোব ওপব নির্ভব কবছে। আমাব দিকে ফিবলেন—হিরু না থাকলে আমাব ব্যবসা অচল আমিও অচল—সেটা জানে বলেই ওব এত দেমাক, বুঝলেন?

বাব বাব শাডিব আঁচল টেনেটুনে বসাটা মহিলাব একটা মিষ্টি অভ্যাস ভেবেছিলাম। এখন কেমন মনে হল, সেটা হিরু গুপ্তব ঘন-কটাক্ষ প্রতিহত কবাব দরুনও হতে পাবে। মালিকেব প্রশস্তি শুনে তাব প্রসন্ন গম্ভীব তির্যক চাউনিটা বমণীব মখেব ওপব বিঁধে থাকল খানিক। আমাব মনে হল, মিলু মজুমদাবেব ধডফডানি দেখলাম একটু।

হিরু গুপ্ত উঠে দাঁডাল। মালিকেব মন বক্ষাব সুবে বলল, মুখ না চললে সত্যিই আব ভালো লাগছে না।

মজুমদাব মশাই হাসলেন। ভাবখানা—আমি তো আগেই বলেছিলাম।

দুটো ছোট ডিশ আব একটা বড ডিশে দুভাগ কবে হিরু গুপ্ত শুকনো খাবাব সাজালো। লোভনীয সন্দেহ নেই। পেল্লাই সাইজেব একটা কবে চপ আব চিকেন কাটলেট, সঙ্গে মুখবোচক স্যালাড। ছোট ডিসেব একটা আমাব দিকে বাডিযে দিল, একটা মজুমদাব মশাইযেব দিকে। তাবপব বড থালাব মত ডিশটা নিজেদেব বেঞ্চেব মাঝখানে বেখে বমণীব উদ্দেশে গম্ভীব বসিকতা কবল, এসো—আমাবটা নিযে টানাটানি কোবো না আবাব।

সকলের চোখের ওপর বড় ডিশে দু'জনের খাবারটা একসঙ্গে নেওয়া এমন কিছু দৃষ্টিকটু নয়, অথচ আমার ভালো লাগল না। ওদিকে রসিকতার জবাবে মিলু মজুমদার বলে ফেলল, আমি এখন খাবই না কিছু।

গলার স্বরটুকুও নিটোল মিষ্টি। কিন্তু এতেই হিরু গুপ্তের মেজাজ চড়ল, খাবে না মানে?

বিব্রত মুখে মিলু হাসতে চেষ্টা করল একটু।—খাব না মানে আবার কি—

—খাবে না তো আগে বললে না কেন?

তেমন মৃদু হাসি।—আগে তুমি জিজ্ঞাসা করেছ?

—আমাকে খাবার বার করতে দেখেও বললে না কেন?

-আচ্ছা আমারটা আমি রেখে আসছি।

—রেখে আসতে হবে না, তুমি খাবে কি খাবে না আমি জানতে চাই।

মিলু তার চোখে চোখ রেখেই আবার ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল— অর্থাৎ না। মজুমদার মশাই এতক্ষণ দেওর-ভাজের কথা-কাটাকাটি উপভোগ করছিলেন যেন। এবারে বললেন, আহা মিলু, ওকে রাগাচ্ছ কেন, যা হোক একটা তুলে নাও না।

বিরক্তি চাপতে চেষ্টা করে মিলু বলল, আমার এখন খাওয়ার ইচ্ছে নেই তবু জোর করছ কেন?

স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি হিরু গুপ্ত অপমান বোধ করছে। শেষবারের মতই জিজ্ঞাসা করল, তুমি খাবে না তাহলে?

তাকে জবাব দেবার বেলায় আবার হাসি-হাসি মুখ মিলুর। জবাব দিল না, মাথা নাড়ল— খাবে না।

সবোষে বড় ডিশটা নিজের দিকে টেনে নিল হিরু গুপ্ত। আমি ভাবলাম ওটা বুঝি এবার জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। না, তার বদলে নিজে খাওয়া শুরু করল। ওর খাওয়ার এই একাগ্র ধরনটা আমি আগেও দেখেছি। আমাদের আগেই নিজের ভাগটা শেষ করল। পরে দ্বিতীয় ভাগটাও। আমি আর মজুমদার মশাই হাসছি। অল্প অল্প হাসছে মিলু। হাসি নেই শুধু হিরু গুপ্তের মুখে।

খাওয়া শেষ করে তিনটে ডিশই একসঙ্গে করে কোণের দিকে সরিয়ে রাখল। অ্যাটেনডিং কারে চাকর আছে, স্টেশনে গাড়ি থামলে সে এসে ওগুলো পরিষ্কার করে রেখে যাবে। আমরা আগেই জল খেয়ে নিয়েছিলাম। হিরু গুপ্ত ঢক ঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার করতে করতে দরজা খুলে করিডোরে চলে গেল। অর্থাৎ রাগ তার একটুও পড়েনি।

আমার দিকে ফিরে মজুমদার মশাই প্রসন্ন মন্তব্য করলেন, রেজায় চটেছে, ভয়ানক ভালবাসে তো—আর ও-ও ফাঁক পেলেই রাগাবে।

আড়চোখে রমণীর মুখখানা দেখে নিলাম। দু'চোখ জানলা দিয়ে দূরের দিকে প্রসারিত।

সিগারেট একটু আধটু আমিও খাই। সেই অছিলায় বাইরে চলে এলাম। করিডোরে এসে দরজাটা আবার টেনে দিয়েছি।

বাইবেব দিকে চেযে হিরু গুপ্ত সিগাবেট টানছে। আমাব সিগাবেট ধবাবাব শব্দে একবাব ফিবে তাকালো। গম্ভীব বাগ-বাগ মুখ।

বলে ফেললাম, আপনাব হঠাৎ এত বাগেব কি হল, ভদ্রমহিলাব খিদে পাযনি তাই খেতে আপত্তি কবেছেন।

ঠোঁটেব সিগাবেট হলদে দুই আঙুলেব ফাঁকে উঠে এলো হিরু গুপ্তব। গোল দুটো চোখ আমাব মুখেব ওপব স্থিব একটু। ক্রুদ্ধ চাপা স্ববে বলল, খিদেব আসল চেহাবাটা আপনি জানেন? দেখেছেন কখনো?

মনে হল ইন্ধন যোগাতে পাবলে হিরু গুপ্ত কিছু কথা বলতে পাবে। কলকাতাব সেই হোটেলেব পানভোজনেব বাত থেকেই আমাব মনে হযেছে শোনানোব মত কিছু কথা হিরু গুপ্তব ঝুলিতে আছে। বোকা মুখ কবে বললাম, সে আবাব কি?

—আমি দেখেছি, বুঝলেন? তিন দিনে একদিন খাওযা জোটে না, এই দুটো হাত ধবে বিধবা মা আব মেযেব সে কি আকৃতি—আমি গিযে না পডলে খিদেব জ্বালায ওই মেযেকেই ক'টা হাযনাব মুখে গিযে পডতে হত খুব ভালো কবে জানি—বুঝলেন?

সিগাবেটে লম্বা অসহিষ্ণু দুটো টান দিযে ছুঁডে ফেলে মন্তব্য কবলে, আব এখন তাব এত অঢেল যে খিদে পায না, যতসব ঢং—ওতে দাদা ভোলে, আমি ভুলি না।

একটু চেষ্টা কবে মনে কবতে হল।—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—সেদিন আপনাব মেজাজ-পত্র ভালো ছিল না। খেতে খেতে কি একটা যন্ত্রণাব কথা বলছিলেন—আব বলছিলেন আপনাব দাদাব সেটা সব থেকে আনন্দেব দিন আব সেই কাবণেই ওটা আপনাব সব থেকে খাবাপ দিন।

গোল দুটো চোখ আমাব মুখেব উপব চক্কব খেল একপ্রস্থ। গাম্ভীয সত্ত্বেও অন্তবঙ্গ সুবেই বলল, আপনি খুব চতুব লোক, সেদিন বেমক্কা পেযে কথা বাব কবে নিযেছেন। —সত্যি এক এক সময এত যন্ত্রণা হয।

বললাম, আত্মত্যাগেব একটু-আধটু যন্ত্রণা আছেই।

শেষেবটুকু কানে গেলই না বোধ হয, সাগ্রহে কাছে সবে এসে জিজ্ঞাসা কবল, আমাব আত্মত্যাগেব কথাও আপনাকে বলেছিলাম নাকি?

—না, অনুমান কবেছিলাম।

—ঠিকই কবেছিলেন। বড একটা নিশ্বাস ফেলে সিগাবেটেব খোঁজে পকেটে হাত ঢোকালো।

যন্ত্রণাব জাযগায মোচড পডতে এবপব হিরু গুপ্ত যা জানালো তাব সাবমর্ম, বিধবা মা আব তাব মেযে মিলুকে সে আগেই জানত। হুগলীব দিকে থাকত তাবা। মেযেটা দেখতে শুনতে ভালো আব খুব চালাক-চতুব। ববাববই হিরু গুপ্তব ভালো লাগত। অনেক দিনেব ছাডাছাডিব পব আবাব যখন দেখা, ওই মা-মেযেব অচল অবস্থা তখন, খাওয়া জোটে না, পবনেব কাপড জোটে না। সময়ে সে গিযে না পডলে আব পাঁচজনে ছিঁডে খেত ওই মেযেকে, ওদেব ঘব আঁস্তাকুড হযে উঠত। হিরু গুপ্ত মিলুকে ছবিতে নামাবে ঠিক কবে কলকাতায নিযে এসেছিল। মিলু সানন্দে বাজী হযেছিল। কালে দিনে এই মেযে নামী নাযিকা হতে পাবত। আব তাবপব বিযেটাও

সে-ই করত। কিন্তু সব ভণ্ডুল করল দাদা অর্থাৎ মজুমদার মশাই। মিলুকে একটা ভালো জায়গায় রাখা হয়েছিল আর তার সবে তখন ট্রেনিং চলছিল। দরাজ হাতে দাদাই খরচ যোগাচ্ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তার এমন মনে ধরে গেল যে মেয়েটাকে আর ছবিতে নামতেই দিল না। বিয়ের প্রস্তাব করল। হিরু গুপ্ত কত বড় আঘাত পেল সে-ই জানে—দাদার জন্যেই সব, দাদার জন্যেই যা-কিছু। নিজে ওদের বিয়ে দিল। মিলু প্রথমে রাজী হয়নি, শেষে অনেক বোঝাতে তবে রাজী।...

এখন সেই মেয়েরই নাকি খিদে হয় না, সিগারেটের গন্ধ সহ্য হয় না।

দু'জনেই চুপচাপ খানিক। চাপা আগ্রহে হঠাৎ হিরু গুপ্ত আবার বলল, কলকাতার সেই হোটেলে আপনিও যেন কি বলেছিলেন—আমার যন্ত্রণার একটা ভাগ আর একজনও পাচ্ছে নাকি—সত্যি যন্ত্রণা পাচ্ছে? বলুন না?

মহিলার সপ্রতিভ মিষ্টি মুখখানা চোখে লেগে আছে। আজ আর হিরু গুপ্তর কথায় সায় দিতে পারা গেল না। বললাম, সেদিন কি বলেছিলাম মনে পড়ছে না—তবে সে রকম যন্ত্রণা কিছু পুষছেন বলেও তো মনে হয় না।

মিলু মজুমদার পরস্ত্রী হিরু গুপ্ত এই ভবিতব্যটা মেনে নিক এটুকু আমার কাম্য। তাই বলা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মুখ থমথমে আরার। সিগারেটে দুটো অসহিষ্ণু টান দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, আপনার মতে তাহলে উনি সুখের সাগরে ভাসছেন এখন, কেমন? কিন্তু ও নির্বোধ না হলে এতদিনে এও ওর বোঝা উচিত, সব সুখ আমি ঝাঝরা করে দিতে পারি—এই দুনিয়ায় দাদা আমাকেই সব থেকে বেশি বিশ্বাস করে, আমার ওপরই সব থেকে বেশি নির্ভর করে। ওকে ছাড়া দাদার চলতে পারে কিন্তু আমাকে ছাড়া চলে না সেটা ও জানে।

বিরক্তি গোপন করে জবাব দিলাম, ভালই যদি বাসেন তো এতবড় ক্ষতি আপনি করবেন কেন?

যন্ত্রণাপ্রসঙ্গে আমার সেই মন্তব্যের ফলেই মিলু মজুমদারের সঙ্গে তার পরের আচরণ আরো রুক্ষ হয়ে উঠল কিনা জানি না। কেবিনে ঢুকেও তার সঙ্গে আর কথাবার্তা কইতে দেখলাম না। তার রাগ মহিলা ঠিকই আচ করেছে মনে হল। তার তোয়াজের মুখ একটু। কিন্তু হিরু গুপ্ত নির্লিপ্ত, কঠিন।

ভোজের ব্যাপারে রসিক দেখলাম বটে আমার সহযাত্রী দুজন। চব্বিশ ঘণ্টার রাস্তার জন্য এত খাবারও কেউ আনে কল্পনা করা যায় না। বড় বড় অনেকগুলো ডিশে হিরু গুপ্তই একরাশ করে দুপুরের খাবার সাজালো। তারপর কতকগুলো ডিশ আমার আর তার দাদার দিকে ঠেলে দিল আর বাকি ক'টা নিজের দিকে টেনে নিল। মহিলা খাবে কি খাবে না তা নিয়ে যেন তার কোন মাথাব্যথা নেই।

মজুমদার মশাই ভাইয়ের রাগ দেখে মুখ টিপে হাসছেন। আমার চোখে চোখ পড়তে মিলু বিড়ম্বনার ভাবটা কাটিয়ে সহজ হাসিমুখেই দেওরের দিকে তাকাল—আমাকে দিলে না?

মুখ ঈষৎ বিকৃত করে হিরু গুপ্ত তিক্ত প্রশ্ন ছুঁড়ল, আমার ছোঁয়া তোমার চলবে?

হাসি-হাসি মুখেই মিলু মাথা নাড়ল—অর্থাৎ চলবে।

এই তোষামোদেও হিরু গুপ্তর মেজাজ নরম হল না। সে নির্বিষ্ট রুক্ষ মুখে খাবার চালান করতে লাগল। হাসিমুখে মজুমদার মশাই চাপা গলায় আমাকে বললেন, বেজায় ক্ষেপেছে দেখছি আজ... আবার ভাব হতেও খুব বেশি সময় লাগবে না, আপনি খান।

তবু মহিলার দিকে চেয়ে বললাম, আমি দেব আপনাকে?

হিরু গুপ্তর ক্রুদ্ধ দু'চোখ আমার মুখের ওপর চড়াও হল—আপনার দরদ দেখাতে হবে না, সকলেরই দুটো হাত আছে সেটা ও সকালেই বুঝিয়ে দিয়েছে।

কথা-কাটাকাটির ভয়েই যেন মিলু মজুমদার তাড়াতাড়ি উঠল। একটি মাত্র বড় ডিশ নিয়ে খাবার তুলে নিল। আমাদের তুলনায় অতি সামান্যই নিল বলতে হবে। এত সামান্য যে চোখে পড়ে। আমি বললাম, ও কি, নিজে নেবার ফলে যে কিছুই নিলেন না।

অল্প হেসে জবাব দিল, আমি এর বেশি পারি না।

খেতে খেতে হিরু গুপ্ত তপ্ত ব্যঙ্গ ছুঁড়ল, অঢেল থাকলে তখন বেশি পারা যায় না, না থাকলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খেতে পেলেও বেশি হয় না।

মিলু হাসছে বটে। কিন্তু হাসিটা কেমন নিষ্প্রভ মনে হল আমার। —হিরু গুপ্ত বলেছিল সমস্ত সুখ ঝাঁঝরা করে দিতে পারে, সেটা সত্যি মহিলা জানে মনে হল। তোয়াজের অভিব্যক্তিটুকু হয়তো সেই কারণে।

বিকেলের ভারী জলযোগ-পর্বেও হিরু গুপ্তর মেজাজ একটুও নরম দেখলাম না। কি হল ভেবে না পেয়ে মিলুও যেন বিস্মিত একটু। তবে রাতের আহার-পর্বের সময় হিরু গুপ্তর রুক্ষ মুখ কিছু ঠাণ্ডা মনে হল। তেরছা সুরে সে জিজ্ঞাসা করল, আমার পরিবেশন চলবে, না অশুদ্ধ হবে?

হাসিমুখেই মিলুকে তাড়াতাড়ি মাথা নাড়তে দেখলাম। অর্থাৎ চলবে। হিরু গুপ্তর মেজাজের পরিবর্তন অন্য কারণেও হতে পারে। সে খাবার সাজাবার তোড়জোড় করার সঙ্গে সঙ্গে মজুমদার মশাই আস্ত মদের বোতল বার করেছেন একটা। ঈষৎ সঙ্কুচিত চোখে মিলু আমার দিকে তাকিয়েছে। আমার সহজ হবার চেষ্টা—এ যেন অস্বাভাবিক কিছুই না।

আমার চলে না শুনে মজুমদার মশাই দুই-একটা হালকা রসিকতা করলেন। তার পর নিজের গেলাসে বেশ খানিকটা মদ ঢেলে নিলেন। দ্বিতীয় গেলাসে ঢালার আগেই হিরু গুপ্ত বাধা দিল, আমি এখন না, শরীরটা ভালো লাগছে না।

—সে কি রে। ভালো লাগছে না বলেই তো এটা বার করলাম। সেই সকাল থেকে তোর যে রকম মেজাজ চলছে, খেলেই হালকা হয়ে যাবে, নে—

হিরু গুপ্ত বলল, তুমি খাও তো, আমার এখন ইচ্ছে করছে না, পরে দেখা যাবে। মজুমদার মশাই গোড়াতে একটু ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন বোধহয়, কিন্তু গেলাসের তরল পদার্থ প্রথম দফায় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হৃষ্টচিত্ত। আর বিপুল আহার সহযোগে আধখানা বোতল খালি হয়ে যাবার পর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে দুলছেন তিনি, অর্থাৎ সোজা হয়ে বসতেও পারছেন না।

বাতেও মিলুব সেই পবিচ্ছন্ন স্বল্পাহাব লক্ষ্য কবলাম। ঠিক দেখছি কিনা জানি না, তাব মুখে একটু শংকাব ছাযা। আডচোখে এক এক বাব দেওবকে দেখে নিচ্ছে। হিরু গুপ্ত গভীব মনোযোগে খেযে চলেছে।

শবীবটা আসলে আমাবই খুব খাবাপ লাগছিল। মাথাটা সেই থেকে ধবে আছে, আব এখন বেজায টন টন কবছে। এই এক বোগ আমাব। তখন কডা ঘুমেব বডি খেযে পডে থাকতে নয, নইলে সমস্ত বাত ধবে যন্ত্রণা চলবে। সেই ট্যাবলেট সঙ্গেই থাকে। খাওযা শেষ কবে স্যুটকেস থেকে ট্যাবলেটেব শিশিটা বাব কবতে দেখে মজুমদাব মশাই টেনে টেনে জিজ্ঞেস কবলেন, কি ওটা?

—ঘুমেব ওষুধ, মাথায বড যন্ত্রণা হচ্ছে সেই থেকে।

মজুমদাব মশাই হেসে উঠলেন, বললেন, একেই বলে কপাল, যন্ত্রণাব আব ঘুমেব এমন মহৌষধ হাতেব কাছে থাকতে আপনি ট্যাবলেট গিলছেন।

মিলুব খাওযা আগেই হযে গেছল। এদেবও শেষ। ডিশ আব পাত্রগুলো সব একত্র কবে হিরু গুপ্ত বাইবেব কবিডোবে বেখে এলো। নীচে খববেব কাগজ পাতা হযেছিল, সেগুলো জডো কবে জানালা দিযে ফেলে দিল। তাবপব মুখ হাত ধুযে মুছে সে বাইবে সিগাবেট খেতে যাওযাব উদ্যোগ কবতে মজুমদাব মশাই আবেদনেব সুবে বললেন, আমাব বিছানাটা আগে ঠিক কবে দিযে যা—

অর্থাৎ তিনি আব বসতেও পাবছেন না। কোনবকম উঠে ধপ কবে মিলুব পাশে বসলেন। হিরু গুপ্ত তৎপব হাতে তাঁব শয্যাবচনা কবে দিতে তিনি সেটি গ্রহণ কবে বাঁচলেন যেন।

মিলুব শয্যাও একই সঙ্গে বিছানো হযে গেল। আমাব কেমন মনে হল, ও যেন একটু বেশি চুপচাপ এখন। আমি ততক্ষণে আমাব বার্থে উঠে গা এলিযে দিযেছি। মিলু তাব জানালাব পাশে বসল। চডা বাতিগুলো নিভিযে দিযে হিরু গুপ্ত সবুজ আলোটা জ্বালতে মজুমদাব মশাই বিড বিড কবে উঠলেন, নিভিযে দে, নিভিযে দে—কি দবকাব!

অতএব সেটাও নিভিযে ঘব অন্ধকাব কবে হিরু গুপ্ত বাইবে সিগাবেট খেতে গেল। আব তাব দু'মিনিটেব মধ্যে মজুমদাব মশাযেব পবিতৃপ্ত নাসিকা-গর্জন শোনা যেতে লাগল।

আমি হঠাৎ অস্বস্তি বোধ কবছি কেন একটু, জানি না। মিনিট পনেবো বাদে হিরু গুপ্ত নিঃশব্দে দবজা ঠেলে ঘবে ঢুকল টেব পেলাম। ঘুমে তখন দু'চোখ বুজে আসছে আমাব। ভিতব থেকে দবজা লক কবে ঘুবে দাডাল। অন্ধকাবে চুপচাপ দাঁডিযেই বইল একটু। জানলা খোলা থাকায নীচেব দিকটা সামান্য আবছা দেখা যাচ্ছে। ওপবটা একেবাবে অন্ধকাব।

হিরু গুপ্ত পাযে পাযে এগিযে এসে মিলুব বেঞ্চিব অন্য ধাব ঘেষে বসল। এক্ষুণি আপাব বার্থে উঠে শোবাব ইচ্ছে নেই বোধহয। মজুমদাব মশাইযেব নাকেব গর্জন বেডেছে। মিলু জানলাব দিকে মুখ কবে বসে আছে।

ঘুমে চোখ তাকাতে পাবছি না, কিন্তু ভিতবেব অস্বস্তি বাডছেই। মিলুব মুখে শঙ্কাব ছাযা দেখেছিলাম কেন—হিরু গুপ্ত মদ খাচ্ছে না বলে?

অস্বস্তি নিয়েই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলাম হয়তো। কতক্ষণ কেটেছে জানি না। চোখ টান করে দেখি মিলু তেমনি জানলার কাছে বসে আছে, আর হিরু গুপ্ত ওখানে বসেই সিগারেট টানছে—সস্তা কড়া সিগারেটের উগ্র গন্ধ নাকে আসছে।

হঠাৎ বাগই হচ্ছে আমার। কিন্তু বেশিক্ষণ চোখ তাকিয়ে থাকা গেল না। এবারে ঘুমিয়েই পড়লাম।

কিন্তু ভিতরের অস্বস্তিটাই আবার আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে কিনা জানি না। যে দৃশ্য দেখলাম, ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। মিলু জানলার কাছ থেকে সরে এসেছে আর হিরু গুপ্ত খানিকটা ওধারে সরেছে। দু'জনের মাঝে বড়জোড় হাত খানেক ফারাক। সেটুকুও কমিয়ে আনার জন্য হিরু গুপ্ত মিলুর একখানা বাহু ধরে টানাটানি করছে, আর মিলু একবার তার হাত ঠেলে সরাচ্ছে আর দু'হাতে এক-একবার ধাক্কা দিয়ে তাকে বেঞ্চির ওধারে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। ফলে হিরু গুপ্তর উপদ্রবের চেষ্টাটা এক-একবার আরো অশালীন হয়ে উঠছে।

দু'জনের কারো মুখে ফিস ফিস শব্দটিও নেই। শুধু মজুমদার মশাইয়ের নাকের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

মাথায় রক্ত উঠছে আমার। চিৎকার করে ধমকে উঠতে ইচ্ছে করছিল। এদের এই নিঃশব্দ লীলা কতদূর গড়ায় আরো?

গাড়ির গতি হঠাৎ শ্লথ হয়ে আসতে নীচের ওই দু'জন সচেতন একটু। হয়তো স্টেশন আসছে। গতি কমছেই। শেষে বিচ্ছিরি রকমের একটা ঘটাং-ঘটাং শব্দ করে গাড়িটা থেমেই গেল। সেই শব্দে যেন ঘুম ভাঙল আমার। গলা-খাঁকারি দিয়ে আড়মোড়া ভাঙলাম। তারপর উঠে বসলাম।

হিরু গুপ্ত ততক্ষণে বেঞ্চির ওধারে সরে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, স্টেশন নাকি?

—না, এমনি থেমেছে।

—আপনি শোননি এখনো? কটা বাজল?

অন্ধকারেই ঘড়ি দেখে জবাব দিল, একটা। আমার অত চট করে ঘুম আসে না। একটু বাদেই গাড়ি চলতে শুরু করল আবার। আর আমিই বা শুয়ে না পড়ে কি করব। বেশ খানিকক্ষণ জেগেই ছিলাম, ওরা তফাতেই বসে আছে। শেষে ঘুমের জ্বালায় অস্থির হয়ে ওদের দু'জনকেই মনে মনে জাহান্নমে পাঠিয়ে ও-পাশ ফিরলাম।

আবার যখন ঘুম ভাঙল, সকাল।

হিরু গুপ্ত আপার বার্থে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নীচে মজুমদার মশাইয়ের ঘুম ভাঙেনি তখনো। মিলু জানলার পাশে বসে আছে। একটু আগে মুখে-চোখে জল দিয়ে এসেছে বোধহয়। ভেজা-ভেজা মুখখানা মিষ্টি। কিন্তু আমার কুৎসিত লাগছে। রাতের লীলা কোন পর্যন্ত গড়িয়েছে আমি জানি না।

আটটায় পৌঁছবার কথা। সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ সকলে উঠে পড়েছে।

মনে হল মিলু আর হিরু গুপ্ত এক-একবার আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি ওদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছি না বলেই হয়তো।

গাড়িটা একটা গণ্ডগ্রামের মত জায়গায় থেমে আছে কেন বুঝছি না। ধারে-কাছে লোকালয় নেই। দু'দিকে খাঁ-খাঁ মাঠে আধা-শুকনো একটা বিল—দূরে জঙ্গলের রেখা।

খানিক বাদে কনডাক্টর-গার্ডের মুখে শুনলাম, সামনে কি গণ্ডগোল হয়েছে তাই গাড়ি লেট। পরের বড় স্টেশন ফয়েজাবাদ, কিন্তু সেও সাতাশ মাইল দূরে এখান থেকে। ওখানে পৌঁছাবার আগে চা বা কোনরকম খাবার মেলার আশা নেই।

মজুমদার মশাই আর হিরু গুপ্তর মুখ দেখার মত। সকালে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ এ যেন এক বজ্রাঘাত। বেলা দশটা না বাজতে অন্য কেবিনের যাত্রীদেরও ছটফটানি দেখা গেল। গাড়ির বহু যাত্রী নীচের প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেলা দেড়টা নাগাদ হিরু গুপ্ত খবর নিয়ে এলো ফয়েজাবাদের আগে কোথায় এঞ্জিন উল্টে আছে। লাইনও গেছে। আমাদের গাড়ির এঞ্জিন সাহায্যার্থে সেখানে চলে গেছে। অতএব এ গাড়ি কখন নড়বে তার কিছুই ঠিক নেই।

শুনে মজুমদার মশাই হাল ছেড়ে শুয়েই পড়লেন। এদের দু'জনকে দেখে মনে হল বেলা দেড়টার মধ্যেই যেন দেড় দিন ধরে উপোসী।

ক্লান্তিকর ভাবে ঘড়ির কাঁটা বিকেল সাড়ে চারটের কাছাকাছি পৌঁছল। একগাড়ি লোকের একটা ক্ষুধার অসহিষ্ণু চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গাড়ির পাঁচ ভাগের চার ভাগ লোক তখন নীচে। শুনলাম অনেকে খাওয়ার সন্ধানে চার মাইল দূরের গাঁয়ের দিকে চলে গেছে। যারা জানে এ এলাকা তারা বলছে, ওই গণ্ডগ্রামে চিঁড়ে-মুড়ি জুটবে কিনা সন্দেহ। অদূরের প্রায়-শুকনো বিলে কয়েকজন গাঁয়ের লোক ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। সেখানেও ভিড় করে ট্রেনের যাত্রী দাঁড়িয়ে গেছে। দুই-একটা পাঁকাল মাছ উঠতে দেখলে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠছে আর চোখ দিয়ে গিলছে।

বেলা বাড়ছে। সূর্যের তেজ কমছে। যাত্রীদের ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ড ক্লাসের বিভেদ ঘুচে গেছে। তাদের মিলিত জটলায় শুধু ক্ষুধার চিত্রটাই উদগ্র হয়ে উঠছে। মজুমদার মশাই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছেন। আমার মনে হল খিদের জ্বালায় ধুঁকছেন তিনি। ধুঁকছে হিরু গুপ্তও। কিন্তু তার ক্ষিপ্ত অসহিষ্ণু আচরণ। একবার নেমে যাচ্ছে, খানিক বাদে উঠে আসছে, আবার নামছে। আর কার উদ্দেশে অনবরত গালি-গালাজ ছুঁড়ছে সে-ই জানে। মিলু জানলার ধারে বসে আছে সেই থেকে। তারও মুখখানা শুকনো। তবু গতরাতের কথা ভুলতে পারি না, ভিতরটা তার ওপরে বিতৃষ্ণ হয়েই আছে।

সূর্য পাটে নামল। দিনের আলোও দ্রুত কমে আসতে লাগল। একটু বাদেই ওই খোলা আকাশের নীচের অন্ধকারে আমরা ডুবে যাব। প্রায় ছ'টা, এখন বিকেল। ক্ষুধার অসহিষ্ণু চিত্র জমজমাট। শোনা গেল বেশি রাতের আগে এখান থেকে গাড়ি নড়ার আশা নেই।

—রাম নাম সত হ্যায়! রাম নাম সত হ্যায়!

আমরা সচকিত হয়ে সামনের দিকে তাকালাম। এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে চাদরে ঢাকা শব নিয়ে আসছে মাত্র চারজন গ্রামের লোক। মজুমদার মশাই চমকে উঠে বসেছেন। আমরা ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখছি। নীচের বহু যাত্রীরও দৃষ্টি

ওই শবের দিকে। লোকালয় ছাড়িয়ে এই নির্জন প্রান্তরে কোথায় শ্মশান ধারণা নেই। লোকগুলো শব নিয়ে ট্রেনটার একেবারে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে দেখলাম।

একটু বাদেই নীচের যাত্রীদের কারো কারো মধ্যে একটু যেন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। দ্রুত পায়ে তারা ট্রেনটার পিছন দিকে চলেছে। পরক্ষণে হতচকিত আমরা। হিরু গুপ্ত বাইরে ছিল, ছুটে এসে কেবিনে ঢুকল, তার পরেই ঝোলানো জামার পকেট থেকে মানিব্যাগটা তুলে নিয়ে সা করে ছুটে বেরিয়ে গেল। কি ব্যাপার আমরা ভেবে পেলাম না। ঝুঁকে দেখলাম দ্রুতপায়ে আরো অনেকে যেন ট্রেনটার পিছনের দিকে চলেছে। কিন্তু তখন অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, কিছুই ঠাওর হল না।

প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে মস্ত একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে ঘর্মাক্ত হিরু গুপ্ত কেবিনে ঢুকল। মুখে দিগ্বিজয়ের হাসি।

আমাকে বলল, কেবিনের দরজাটা বন্ধ করুন শিগগীর!

করলাম।

মস্ত শালপাতার ঠোঙায় খাদ্যসামগ্রী দেখে আমরা বিস্মিত এবং পুলকিত। ওতে আছে অনেকগুলো বড় বড় আলু-সেদ্ধ, তার ওপরে একগাদা কাবলিছোলাসেদ্ধ আর শশা, এবং তার ওপর একরাশ ফুচকা। অন্য ছোট ঠোঙায় নুন, লঙ্কাগুড়ো আর পেঁয়াজ।

মজুমদার মশাই উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন।—এত কোত্থেকে পেলি?

হিরু গুপ্ত হাসিমুখে যে সমাচার শোনাল, আমরা হতভম্ব। গাঁয়ের ওই চারটে লোক লুঠপাটের ভয়ে এই খাবারগুলো দিয়েই একটা শব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল। এ-রকম ওরা নাকি আগেও করেছে। ভিড়ের মধ্যে মাল আনলেই লুঠ হয়ে যায়। ট্রেনের শেষ মাথায় বেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে শবের ঢাকা খুলে বিক্রি শুরু করেছে। বরাতজোরে হিরু গুপ্ত ওদিকেই ছিল তখন। একটু দেরি হলেই কিছুই আর জুটত না। ব্যাটারা এরই দাম নিয়েছে ন'টাকা।

সোল্লাসে চারটে ডিশে ওই আলু-সেদ্ধ কাবলিছোলা শশা আর ফুচকা সাজাল হিরু গুপ্ত। এখনো দেখলাম মিলু তার ডিশে বেশি দিতে দিল না।

এই খিদের মুখে এই খাদ্যও অমৃত মনে হতে লাগল আমাদের। খুশি মেজাজে গোগ্রাসে গিলছে হিরু গুপ্ত আর মজুমদার মশাই। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, মিলু তার ডিশ সরিয়ে রেখেছে, খাচ্ছে না।

লক্ষ্য মজুমদার মশাইও করলেন।—কি হল, খাচ্ছ না যে?

মিলু মৃদু জবাব দিল, সন্ধ্যাটা পার হোক, তোমরা খাও।

এই মেয়েলিপনা দেখে ওরা বিরক্ত। হিরু গুপ্ত শাসালো, দেরি করলে আমিই মেরে দেব কিন্তু, এখন রেজাষ খিদে।

মিলু হেসেই জবাব দিল, নাও না—দেব?

—থাক, অত আত্মত্যাগে কাজ নেই।

আমাদের আহার সমাধা হল। মজুমদার মশাই আর হিরু গুপ্ত ঢকঢক করে জল খেয়ে পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। এখন একটু জোর পাওয়ার ফলে হিরু গুপ্তর সঙ্গে এবারে মজুমদার মশাইও কেবিনের বাইরে গেলেন।

আমি মজুমদার মশাইয়ের সচিত্র ফিল্ম ম্যাগাজিনটা ওলটাতে লাগলাম।

একটু বাদেই মিলু মজুমদারকে একটু যেন সচকিত দেখলাম। মুখ না তুলেও মনে হল বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে। কিছু বলবে কিনা ভেবে পেলাম না। কৃত্রিম মনোযোগে চোখ দুটো জার্নালের দিকে আটকে রেখেছি।

নিঃশব্দে একবার উঠে কেবিনের দরজা দিয়ে দু'দিকের করিডোর দেখে নিল মিলু। তারপর আবার এসে বসল। আমার পড়ার মনোযোগ লক্ষ্য করল। তারপর নিজের খাবারের ডিশটা আঁচলের আড়ালে নিয়ে তেমনি নিঃশব্দে কেবিন ছেড়ে বেরুল।

জার্নাল ফেলে আমি কেবিনের দরজার সামনে দাঁড়ালাম।

দেখলাম ডিশ হাতে মিলু দ্রুত ডানদিকের খোলা দরজার সামনে গেল। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছি। মিনিট দুই-তিনের মধ্যেই নীচের দু'তিনটে অল্পবয়সী গ্রাম্য ছেলে এসে দাঁড়াতে ওদের ডেকে ডিশের সব খাবার ঢেলে দিয়েই মিলু তাড়াতাড়ি ফিরতে গেল।—

—আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

চকিতে বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে আমার পাশ ঘেঁষে দ্রুতপায়ে কেবিনে ঢুকে গেল সে। আমিও এলাম।

অপ্রতিভ মুখখানা আবার লালছে দেখাচ্ছে একটু।

জিজ্ঞাসা করলাম, খাবার সব এভাবে দিয়ে দিলেন যে?

বিব্রত সুরে জবাব দিল, রাম নাম করে যেভাবে শব সাজিয়ে ওগুলো নিয়ে এসেছে .. মনে হচ্ছিল ওতে শবের ছোয়া লেগে গেছে.. ইয়ে আমার বড় খারাপ অভ্যেস—তারপরেই অনুনয়ের সুরে বলল, ওই শয়তানটাকে আপনি যেন কিছু বলবেন না, আমাকে তাহলে খেয়ে ফেলবে—

শয়তান অর্থাৎ হিরু গুপ্ত। চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে আছি। সংযমের এক অনির্বচনীয় কমনীয় মূর্তি দেখছি যেন। গতরাতের বিতৃষ্ণ অনুভূতিটা দ্রুত নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মাথা নাড়লাম— বলব না।

নিঃসংশয়ে অনুভব করছি, এই মেয়েকে শুচিতার গণ্ডি থেকে কার সাধ্য হিরু গুপ্তর নেই।

রূপ

বড় দুটোকে নিয়ে গোড়া থেকেই বাপ-মা যেমন নিশ্চিন্ত, ছোটটাকে নিয়ে তেমনি তাঁদের ভাবনা। তাদের স্বস্তি আর ভাবনার খবর তিন মেয়েও রাখে। তিন মেয়ের মধ্যে বয়সের ফারাক দেড়-দু'বছর করে। বড় মেয়ে কমলা সুন্দরী, মেজ মেয়ে শ্যামলী রূপসী, ছোট মেয়ে কাজল ওদের থেকে রেখাপ্পা রকমের বিপরীত। ছোট মেয়ে কালো, ঢ্যাঙা—নাক মুখ চোখের শ্রীও তেমন নয়, চাল-চলনেও তেমনি কমনীয়তার অভাব।

বমলা আব শ্যামলীব বিশ্বাস, ভগবান ওকে ছেলে কবে পাঠাতে গিযে ভুল কবে মেযে কবে পাঠিযে বসেছে।

মাকে ছোটব উদ্দেশ্যে কত সময দুঃখ কবতে শুনেছে, এই মেযেটা যে কোত্থেকে এলো। আব তাব ভাবনাতেই বাপেব অনেক তপ্ত নিশ্বাস পডতে দেখেছে। নতুন পবিচিতেবা এই তিন মেযেকে একসঙ্গে দেখে আব সম্পর্কেব কথা শুনে সংশয কাটানোব জন্য মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাই কবে বসেছে—ও নিজেব বোন তোমাদেব?

এ-বকম প্রশ্ন শুনলে বড দুই বোন লজ্জা পায আব যাব সম্পর্কে কথা সে আডালে গিযে কুৎসিত ভেঙচি কাটে।

ফলে ছেলেবেলা থেকেই ছোট মেযে কাজল বড দুই বোনেব ওপব হাডে চটা। পিঠোপিঠি তিন বোন, ঝগডা-ঝাঁটি ছেডে মাবামাবিও একটু-আধটু লেগে যেত। কিন্তু বড দুই বোন একত্র হযেও ছোটব সঙ্গে পেবে উঠত না। ফলে কালী পেত্নী বলে গাল দিযে ভ্যাঁ কবে কেঁদে ফেলত দু'জনেই। মা এসে ওই ছোটকেই সব থেকে বেশি শাসন কবতেন, চুলেব ঝুঁটি টেনে ছিঁডে ফেলতে চাইতেন। আব একটু বড হবাব পব মা গাযে অত হাত তুলতেন না, মুখে গালাগাল দিতেন, তোব বাইবেটা যেমন ভেতবটাও তেমনি—কোনদিকে যদি তাকানো যেত।

ছোটকে নিযে বাবা-মাযেব দুশ্চিন্তা দিনে দিনে বাডতেই থাকল। পাডাব বখাটে ছেলেদেব সঙ্গে কথা বলে, লজ্জাসবমেব মাথা খেযে হাসাহাসি কবে কোমব বেঁধে ঝগডাও কবে। চৌদ্দ ছাডিযে পনেবোয পা দিল, মাবধবেব শাসন আব কতদিন চলে? তাছাডা চেহাবা যেমন হোক, ওই বযসেব সঙ্গে সঙ্গে গাযে একটু মাংস লেগেছে, এক ধবনেব ছাঁদছিবি এসেছে। ফ্রক ছেডে মা আগেই শাডি ধবিযেছেন ওকে। দেখলে আঠেবোব কম মনে হয না বযেস। মেযেব নিজেবই একটু সমঝে চলা উচিত—তা না ধিঙ্গিপনা।

বাবাব টাকাব জোব কম। বে-সবকাবী আপিসেব সুপাবিনটেনডেণ্ট হযেছেন —তাও বেশি বযসে। ভবিষ্যৎ ভেবেই মেযেদেব ভালো কবে লেখাপডা শেখানোব ইচ্ছে ছিল। বমলা আব শ্যামলীব বিযে হযে গেল বি, এ, পাশ কবাব আগেই। কিন্তু বাবা মাযেব সে জন্য একটুও খেদ নেই। কুডি না পেকতে বমলাব অবিশ্বাস্য ভালো বিযে হযেছে। শিক্ষিত সুপুরুষ ছেলে, বাপ আব কাকাব হার্ড-অ্যাযাবেব ব্যবসা—নিজেদেব বাডি, গাডি। ছেলেব বাপ আব কাকা সেধে সম্বন্ধ নিযে এলেন একদিন। দাবি-দাওযাব প্রশ্ন নেই। আগে থাকতে খবব দিযে মেযে দেখতে এলেন, দেখে দিন তাবিখ ঠিক কবাব তাগিদ দিযে গেলেন।

ব্যাপাব দেখে মেযেদেব বাবা-মা ভেবাচাকা। তাই দেখে আডাল থেকে শ্যামলী আব কাজল মিটিমিটি হাসে। বমলা ওদেব চোখ পাকিযে ঠাণ্ডা বাখতে চেষ্টা কবে। অর্থাৎ খববদাব, বাবা-মাকে কিছু বলবি না।

কিছু না বললেও তাঁবা আঁচ কবে নিলেন। শ্যামলী আব কাজল ছ'মাস আগে থেকেই বাবা-মাযেব মুখে এই হাসি দেখাব প্রত্যাশায ছিল। একই প্রতিষ্ঠানেব নিযন্ত্রণে আব একই বিল্ডিংযেব দুই শাখাব একদিকে কলেজ, একদিকে স্কুল। বাডি এসে এই

দুই মেয়েকে দিদি কেন ফিবল না সে-সাফাই অনেক দিন গাইতে হযেছে বাবা-মায়ের কাছে। বি, এ, পবীক্ষা আসছে, পডার চাপ বাডছে, দিদি বিনেপযসায় ছুটিব পব প্রোফেসাবদের বাডি পডতে যায, কখনো বা স্পেশাল টিউটোরিযালেব জন্য কলেজেই আটকে যায়, ইত্যাদি। মেযে কলেজ, মেযে প্রফেসাব, অতএব বাবা-মায়েব দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। বড মেযেব হঠাৎ পড়াশুনাব একাগ্রতা দেখে মনে মনে বরং খুশিই তাঁবা। সেই মেযে বিয়েব পরেই কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁটে দিল সেটাই বিস্ময়। মা বলেছিলেন এত পড়াশুনা কবলি, এত কষ্ট কবলি, পবীক্ষাটা দিয়েই ফেল না।

রমলা বলেছে, ভালো লাগে না।

বড মেযের ভালো লাগা-না-লাগাটা বাবা-মা এখন আব ছোট কবে দেখেন না। মা বলেন থাক তা হলে।

কাজল একটু ঝামটা মেবে বলে বসেছিল, কষ্টেব ফল তো পেযেই গেছে, আবার কেন।

শ্যামলী সশঙ্ক দৃষ্টিতে ডেঁপো বোনেব দিকে তাকিযেছে। সে ইদানীং দিদিকে বেশ একটু তোযাজ তোষামোদ করে। বমলা ছোটব কাছেও তা-ই আশা কবে। আডালে টেনে এনে কাজলকে শাসিয়েছে, তোর বড বাড বেডেছে, না?

কাজলেবও তেমনি জবাব, যা যা, ওই ছোড়দি তোকে পটে বসিযে হাতজোড কবে থাকবে'খন, আমাকে চোখ দেখাতে আসিস না।

চাব মাস না যেতে কাজল মাযেব কাছে আব একটা বেফাঁস উক্তি কবে ফেলেছিল। বলেছিল, ছোডদিবও শিগগিরই খুব ভালো বিযে হয়ে যাবে দেখো।

মাযেব মনে সংশয, চোখে ভয়।—তুই কি কবে জানলি?

—দেখে নিও। কাজল আব বিস্তাবেব ধার ধারে না।

সেই বিকেলেই শ্যামলী একেবাবে আগুন ওব ওপব।—মাকে বলতে গেলি, তোব লজ্জা কবে না, হিংসুটে কোথাকাব। ভিতবটাও হিংসেয একেবারে কালি হযে আছে, কেমন?

কাজল পাল্টা কষে উঠেছে, আছেই তো। বেশ কবেছি বলেছি—আমি বাইবে কালো, ভিতবে কালো, আমাব সব কালো। তুই তোব ভদ্রলোককে রূপ ধুয়ে জল খাওযাগে যা।

আবো মাসকযেক যেতেই ছোট মেযেব উক্তিব সাব বুঝতে কষ্ট হযনি মাযেব। বমলা প্রায়ই শ্যামলীকে নিজেব বাডিতে ধবে নিযে যায়। ছুটি থাকলে দুই-এক দিন আটকেও বাখে। ছোট বোনের চেহারা যেমনই হোক, তাকে অবজ্ঞা করতে দেখে মায়ের মনে লাগত। কিন্তু বড মেয়েব আসল উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল যখন মাঝে মাঝে ওর খুড়শ্বশুবেব ছেলেব এ-বাডিতে পদার্পণ ঘটতে লাগল। শ্বশুব আর খুড-শ্বশুবেব যুক্ত ব্যবসা, তবে একান্নবর্তী পবিবার নয। জামাই বিমানের মতো, রঞ্জনও ওই ব্যবসাব পদস্থ লোক একজন। সেও সুশ্রী, শিক্ষিত—বিমানেব থেকে আট-ন'মাসেব ছোট।

রমলাব কাছে সৌভাগ্যেব আভাস পেয়ে আশায় আনন্দে মুখে কথা সবে না মায়ের। মনে মনে বড মেয়েব বুদ্ধিব কত যে প্রশংসা করেছেন তারপব ঠিক নেই।

না, আশা এবং আনন্দ ব্যর্থ হয়নি মায়ের। রঞ্জনের সঙ্গে শ্যামলীরও নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেছে। আনন্দের হাট একেবারে।

তিন মাস না যেতে মা এবার দুই কৃতী জামাইকেই মুরুব্বি ধরেছেন। ছোটর জন্য এবারে একটা ভালো ছেলে দেখে দাও বাবারা—চেহারা যেমনই হোক, তোমরা থাকতে ওর বিয়ে হবে না?

কাজল মায়ের ওপর রাগে জ্বলছে। বিমান আর রঞ্জন দু'জনেই শাশুড়ীকে আশ্বাস দিয়েছে—বিয়ে হবে না কেন, সবে তো হায়ার সেকেণ্ডারি দিল—এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

শাশুড়ী আড়াল হতেই প্রায় সমবয়সী খুড়তুতো-জাঠতুতো দুই ভাই কাজলের পিছনে লেগেছে। বিমান বলে, হ্যাঁরে বমা, আর তো হাতের মুঠোয় ভাই-টাই নেই আমাদের—এটাকে আমরাই ভাগাভাগি করে নিয়ে নিই, কি বলিস?

রঞ্জন সায় দেয়, আপত্তি কি, মা যে কেন ওর চেহারার খোঁটা দেন বুঝি না—আমার তো বেশ লাগে।

কাজল ভেঙচি কেটে চেঁচিয়ে জবাব দেয়, নিজের নিজের বউকে শো-কেস-এ সাজিয়ে রেখে দেখে দেখে চোখ জুড়োও গে যাও না—আমার পিছনে কেন।

এমন গলা ছেড়ে এই গোছের কথা বলে যে দু' ভাই-ই চুপ করে যায়। দু'বোন ভ্রূকুটি করে তাকায় ছোট বোনের দিকে। ওকে আড়ালে ডেকে ধমকায়, তোকে পছন্দ করে বলেই ও-রকম ঠাট্টা করে, তা বলে তুই যা মুখে আসে তাই বলবি। বাড়িতে সকলে কত সমীহ করে ওদের, জানিস?

—তোরা যে যার পাদোদক ধুয়ে জল খা গে যা, আমার পিছনে লাগতে আসে কেন?

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে কাজল অনেক সময় অবাক হয়েছে। বিয়ের আগে পর্যন্ত যে দু'ভাই হ্যাংলার মতো দিদিদের পিছনে ঘুরেছে, কলেজে এসে হাজির হয়েছে বেহায়ার মতো, চোরের মত লুকিয়ে সিনেমায় নিয়ে গেছে—বিয়ের কিছুদিন না যেতে সেই মানুষদের ভিন্ন মূর্তি—বাশভারী হোমরা-চোমরা মানুষের মতো হাব-ভাব। দিদির না হয় দেড় বছর হতে চলল বিয়ে হয়েছে, বিমানদার মনমেজাজ বুঝে চলে, কিন্তু ছোড়দির তো বিয়ে পাঁচ মাসও হয়নি, এরই মধ্যে রঞ্জনদার কথায় ওঠে বসে, তোয়াজ করে চলে তাকে—আর সর্বদাই ভয়, এই বুঝি বকুনি খেতে হল।

যাক, কাজলকে নিয়েই এ বাড়ির যা-কিছু অশান্তির সূত্রপাত। দু'দুটো মেয়ের অত ভালো বিয়ে হওয়ায় বাবা-মায়ের ওর জন্য আরো বেশি দুশ্চিন্তা। কিন্তু আচার-আচরণে মেয়ে যেন আক্রোশবশতই তাঁদের দুশ্চিন্তা আরো বাড়িয়ে চলেছে।

...একদিন দুপুরে বাপেরবাড়ি আসার সময় বমলা দেখে মোড়ের ও-ধারে একটা বাবরি-চুল লোকের সঙ্গে কাজল হেসে হেসে কথা কইছে। লোকটাকে এরা সকলেই চেনে। নাম সনৎ ঘোষ, সকলে সোনা ঘোষ বলে ডাকে। কোন এক অ্যামেচার ক্লাবের হয়ে থিয়েটার করে বেড়ায়। সেই থিয়েটারও বমলারা দুই-একটা দেখেছে।

টাইপ বোল-এ মন্দ করে না অবশ্য, কিন্তু বমলাবা দু'চক্ষে দেখতে পাবে না ওকে। বাস্তা দিযে হেঁটে গেলে ড্যাবড্যাব কবে চেযে থাকত—আব হবদম বিড়ি টানত।

সিনেমা থিযেটাব দেখাব ব্যাপাবে তিন বোনেব মধ্যে কাজলেবই নেশা বেশি। তা বলে এবকম একটা লোকেব সঙ্গে তাব বোন বাস্তায দাঁড়িযে কথা বলবে, হাসাহাসি কববে!

পিত্তি জ্বলে গেল বমলাব। এসেই মাকে নিযে পড়ল। ড্রাইভাবও নাকি দেখেছে আব তাইতে লজ্জায আবো বেশি মাথা কাটা গেছে বমলাব।

মাযেব বুকে ত্রাস। বললেন, ও আমাদেব মুখ পুড়িযে ছাড়বে, তোবা কিছু বল—

কাজল বাড়িতে পা দেবাব সঙ্গে সঙ্গে মাযেব চিৎকাব চেঁচামেচি, বকাবকি। কাজল ব্যাপাবখানা বুঝে নিল। সবোষে একবাব দিদিব দিকে তাকিযে নিজেব ঘবে চলে গেল। কিন্তু বমলা ছাড়বাব পাত্র নয। ঘবে ধাওযা কবল। বি, এ, পড়ছিস আব এই রুচি তোব, অ্যাঁ? এ-বকম একটা থার্ডক্লাস লোকেব সঙ্গে বাস্তায দাঁড়িযে কথা বলিস, হাসাহাসি কবিস?

কাজল গম্ভীব শ্লেষে জবাব দিল, তোদেব মতো ফার্স্টক্লাস লোক আব কোথায পাব বল—আমাব জুটলে থার্ডক্লাসই জুটবে।

বমলা ঝলসে উঠল, লজ্জাও কবে না মুখ নেড়ে কথা বলতে। তোব জামাইবাবু যদি কোন দিন এই কাণ্ড দেখে, কক্ষণো কোথাও তোব জন্যে চেষ্টা কবতে বাজি হবে?

সঙ্গে সঙ্গে কাজলেব ধৈর্য গেল। পাল্টা ঝাঁজে বলে উঠল, তুই আব তোব ববও এই কাণ্ড কবে উতবে গেছিস—তোদেব বেলায দোষ নেই কেন? গাযেব চামড়া সাদা বলে আব বিমানদাব টাকা আছে বলে?

বমলা চিৎকাব কবে উঠেছে, মা—কাজল আমাকে অপমান কবছে, আমি আব এ বাড়িতে আসব না বলে দিলাম কিন্তু!

মা হাঁ-হাঁ কবে ছুটে এলেন, আব তাবপব যা মুখে আসে তাই বলে কাজলকে আব একপ্রস্থ গালাগালি।

মাসখানেকেব মধ্যে এব থেকে দ্বিগুণ হুলুস্থুল বাড়িতে। ছুটিব দিনে ফার্স্ট ক্লাসেব টিকিট কেটে বিমান আব বঞ্জন সস্ত্রীক সিনেমা দেখতে গেছল। হাফটাইমেব আলো জ্বলতে বঞ্জনেব চোখে পড়ল, সামনেব সস্তাব টিকিটেব সাবিতে একটা লোকেব পাশে বসে আছে কাজল। দুজনে হাসছে, গল্প কবছে। গাযে খোঁচা মেবে শ্যামলীকে দেখালো বঞ্জন, শ্যামলী দিদিব গা-টিপে সামনেব দিকে তাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবল। ফলে বিমানেবও দেখতে বাকি থাকল না।

চাবজনেই সাবাক্ষণ গম্ভীব তাবপব। বমলা আব শ্যামলীব ছবি দেখা মাথায উঠল। সোনা ঘোষকে ওবা দুজনেই চেনে। কিন্তু বিমান আব বঞ্জন জিজ্ঞাসা কবতে দুজনেই মাথা নেড়েছে—চেনে না।

শো ভাঙার পব বিমান আব বঞ্জনেব ছোট শালীব জন্য অপেক্ষা কবাব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বমলা আর শ্যামলীব এত মাথা ধবেছে যে তাবা আব এক মুহূর্তও দাঁড়াতে

পাবছে না। ব্যাপাব বুঝেই দু'ভাই আব গাডি নিযে অপেক্ষা কবল না। বাডি ফিবে ছোট শালীকে নিযে গম্ভীব টিকাটিপ্পনী শুরু কবল।

বাত্রিতে একসঙ্গে দু'বোনই বাপেববাডি এসে হাজিব। বাবাও বাডিতে তখন। সমাচাব শুনে বাবা-মাযেব মাথায বজ্রাঘাত। তাব ওপব বমলা শ্যামলী স্পষ্ট জানিযে দিল, এ বকম বিচ্ছিবি ব্যাপাব হতে থাকলে তাদেব আব বাপেববাডি আসতেই দেবে না।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হযে পাযেব থেকে চটি খুলে ছোট মেয়েকে মাবতে গেছলেন বাবা। মেযেবাই অবশ্য আটকেছে। আব মা আঁশবটি দিযে কুটতে চেযেছেন তাকে। ঘেন্নায ওই আঁস্তাকুড-মার্কা মুখে থুথু ছিটোতে চেযেছেন।

বিমান আব বঞ্জন বাডি এলে কাজল এবপব নিজেব ঘবেব দবজা বন্ধ কবেছে। তাবা ডাকা সত্ত্বেও আসেনি। দিদিবা তাব ফলেও ভযানক অপমান বোধ কবেছে।

বাপেববাডিব এই অশান্তিব সংসাবে দুদিন ঘনালো হঠাৎ। বলা নেই, কওযা নেই, হার্ট-অ্যাটাকে মা হঠাৎ চোখ বুজলেন। বোনেবা তাবস্ববে আক্ষেপ কবল, কাজলই মা-কে মেবে ফেলল।

পাঁচ মাস না যেতে বাবাও গাডিচাপা পডে মাযেব পথ ধবলেন। বড দুই বোন এবাবেও আছাডি-বিছাডি কবে কাঁদল। সেই একই আক্ষেপ। ছোট বোনেব চিন্তাতেই বাবা অহবহ অন্যমনস্ক থাকতেন। অতএব এই মৃত্যুব জন্যেও সে-ই দাযী।

শোকেব ব্যাপাব চুকেবুকে যেতে ওই দিদিদেব আশ্রযেই আসতে হল কাজলকে। কর্তব্যবোধে দিদিবাই টেনে নিযে এল অবশ্য। কিছুদিন বডদি বাখল তাকে, কিছুদিন ছোটদি। ওব অবস্থানেব ফলে দুই দিদিই স্বামীদেব কাছে সংকুচিত। সর্বদাই চাল-চলন সম্পর্কে উপদেশ দেয বোনকে। আব মেজাজ বুঝে বোনেব বিযেব চেষ্টাব অনুবোধ জানায।

তাবা কখনো চুপ কবে থাকে, কখনো বিবক্ত হয। বলে, সবুব কবো, চেষ্টা হচ্ছে, বললেই তো আব বিযে হয না—বোনেব রূপ তো জানো।

পাশেব ঘব থেকে বিমানদাব এই কথা নিজেব কানে শুনেছে কাজল। তাব ধাবণা, বঞ্জনদাও ছোডদিকে এই কথাই বলে।

দিদিব ততদিনে একটি ছেলে হযেছে, আব ছোটদিবও হব-হব কবছে। স্বামীদেব তাবা আবো অনুগত হযে পডেছে। নির্বাক কাজল বাডিতে দু'জনেবই গুরুগম্ভীব ব্যক্তিত্ব অনুভব কবে। কাজলেব সঙ্গে তাবা যে একেবাবে কথা বলে না তা নয। দু'ভাই একসঙ্গে হলে ঠাট্টাও কবে, আমাদেব দুজনেব মধ্যে সেই ভাগাভাগিই হল দেখছি—

বিমানদা জিজ্ঞাসা কবে, পডাশুনাব ইচ্ছে থাকে তো বলো, আবার ব্যবস্থা কবে দিই।

দিদি উষ্ণ ঝাঁজ দেখায, আব পডাশুনায কাজ নেই, বিযেব চেষ্টা দেখো।

বঞ্জন সকলেব সামনেই ভ্রূ-ভঙ্গি কবে খুঁটিযে দেখে কাজলকে।—তোমবা যা-ই বলো, কাজল দেবীব মধ্যে একটা বলিষ্ঠ ভাব আছে যা তোমাদেব নেই—ছেলেগুলোব চোখে পডে না কেন বুঝি না।

শ্যামলী হেসে বলে, তোমাকে আব চাটুকাবিতা কবতে হবে না।

দুই ভাইযেব খুব ভাব। তাবা একত্র হলেই শুধু এই গোছেব একটু-আধটু হাসি-ঠাট্টা হয।

এবই মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল একদিন। কাজল তখন বমলাব কাছে। বাড়িব ঝি এসে জানালো, একটা লোক মাসিমণিব খোঁজ কবছে।

মাসিমণি অর্থাৎ কাজল। বিমান কাজে বেবোযনি তখনো। সেও শুনল খববটা। বমলা আব বিমান দুজনেই দবজাব বাইবে এসে দেখল কে লোক। দেখামাত্র বমলা চাপা ঝাঁজে বলে উঠল, তাড়িযে দাও! ঘাড়ধাক্কা দিযে বাব কবে দাও।

অদূবে দাঁড়িযে আছে সেই বাববি-চুল সোনা ঘোষ।

কিন্তু তাড়ানো বা ঘাড়ধাক্কা দেওযাব ফুবসত মিলল না। ওদিকেব ঘব থেকে তাকে দেখেই কাজল পাযে পাযে এগিযে গেছে। সামনে এসে দাঁড়াল। পাঁচ সাত মিনিট দাঁড়িযে দাঁড়িযেই দু'জনেব কি কথা হল এদিকেব কেউ জানল না। বমলা আব বিমান লোকটাকে বিমর্ষ মুখে চলে যেতে দেখল।

বিমান জিজ্ঞাসা কবল, কে?

বমলা শুকনো গলায জবাব দিল, সোনা ঘোষ বাজে লোক একটা।

—কি কবে?

—থিযেটাব।

লোকটা চোখেব আড়াল হতেই বাগে গজবাতে গজবাতে বোনেব কাছে এলো বমলা।—ও এখানে এসেছে কোন সাহসে? কোন আক্কেলে?

কাজল মুখ তুলে তাব দিকে তাকালো শুধু। দিদিব পিছনে বিমানদা দাঁড়িযে।

দিদি আবো অসহিষ্ণু।—আমি জানতে চাই, ও কেন এসেছে এখানে?

কাজল ঠাণ্ডা জবাব দিল, আমাকে দেখতে।

এবকম জবাব পাবে বমলা আশা কবেনি। বাগে সমস্ত মুখ বক্তবর্ণ। কিন্তু সে ফেটে পড়াব আগেই বিমান জিজ্ঞাসা কবল, তোমাকে দেখতে ও কি আবো এখানে এসেছে, না এই প্রথম?

কাজল নিরুত্তবে তাকাল শুধু। জবাব দিল না।

—দেখো কাজল দেবী, বিমানেব গলাব স্বব আদৌ উঁচু পর্দায উঠল না, অথচ কঠিন শোনালো, এ বাড়িব ডিসিপ্লিন আব বীতিনীতি একটু অন্যবকম, সেটা এতদিনে তোমাব বোঝাব কথা—এটা মনে বেখো।

বিকেলেই ফোন কবে শ্যামলীকে আনিযেছে বমলা। ওদিকে বিমানেব মুখে বঞ্জনও খবব শুনছে। আপিসেব পব সেও সোজা এখানেই এসেছে। আব তাবপব সকলে মিলে কঠিন উপদেশই দিযেছে কাজলকে।

কাজল নির্বাক। সে-ও তাব একটা বাড়তি অপবাধ যেন। আসলে সে যে সোনা ঘোষকে এখানে আসতে সাফ নিষেধ কবে দিযেছে, সেটা জানাব কেউ দবকাব বোধ কবল না।

পবদিন দিবানিদ্রা সম্পন্ন কবে বমলা কাজলকে দেখতে পেল না। কোথাও না। শ্যামলীকে ফোন কবল। সেও আকাশ থেকে পড়ল, অর্থাৎ তাব ওখানেও যায নি।

দুই-এক দিন নয়, দুই-এক মাস নয়—টানা তিন বছর কেউ আর তার হদিস পেল না।

কোনো এক অ্যামেচার ক্লাবের অভিনেত্রী কাজল মিত্রর নাম ছড়াতে লাগল একটু একটু করে। তারপর সে-নাম আর দিদিদের ভগ্নীপতিদের কানেও এলো। তারা সাগ্রহে দুই একটা থিয়েটার দেখে এলো। অভিনয় সকলেরই ভালো লেগেছে, কিন্তু সকলেই গম্ভীর।

বোনেরা খবর সংগ্রহে সচেষ্ট হল। অ্যামেচার ক্লাবের অভিনেত্রী হলেও ভালো রোজগার করে কাজল মিত্র। কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে থেকেও ডাক পড়ে তার।

আরো এক বছরের মধ্যে ওই নামের চটক চারগুণ বেড়ে গেল। সিনেমা থিয়েটারের পত্র-পত্রিকায় তার ছবি আর খবর বেরুতে লাগল। বড় কাগজের কলা বিভাগগুলোতেও। শহরে সব থেকে বড় পেশাদার নাট-মঞ্চ মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দু-বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করেছে তাকে।

সেই দু' বছরে তার তিনটে নাটকের সফল অভিনয় দেখল দিদি ভগ্নীপতিরা। মুগ্ধ হবার মতোই অভিনয় বটে। পেন্টিংয়ের ফলে স্টেজে দস্তুরমতো রূপসী দেখায় তাকে। মাঝের ঐতিহাসিক এক নাটকে তো রাজেন্দ্রাণীর ভূমিকায় তারই জয়জয়কার। সেই অভিনয় দেখেও দিদিরা হতবাক। হাবভাব চাউনি চলন বলন সবই মিষ্টি অথচ দৃপ্ত রাজেন্দ্রাণীর মতোই।

তৃতীয় বছরের শেষেই পত্র-পত্রিকার বিমর্ষ খবর, প্রতিভাসম্পন্না অভিনেত্রী কাজল মিত্রকে পেশাদার নাটমঞ্চ আর চুক্তিবদ্ধ রাখতে সক্ষম হলেন না। অচিরে নিজেই তিনি একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান চালু করবেন। ইতিমধ্যে চিত্রজগতের দু'জন খ্যাতিমান পরিচালক তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দুটি বড় ছবিতে তাঁকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে। তবে আশার কথা, কাগজের প্রতিনিধিদের তিনি বলেছেন, রঙ্গমঞ্চই তার প্রাণ, এটি তিনি ছাড়বেন না, ছায়াচিত্রের কাজটাই বরং সাময়িক।

ছোট বড় সব কাগজেই চিত্র এবং নাটমঞ্চের পাতায় কাজল মিত্রর ছবির ছড়াছড়ি। কাজল মিত্র গাড়ি ড্রাইভ করছেন। নীল চশমা পরে—কাগজে এমন ছবিও বেরিয়েছে। আর কাজল মিত্রর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান চালু হবার সংবাদও।

আর নিস্পৃহ থাকা সম্ভব হল না দুই বোনের। পরামর্শ করে এক দুপুরে বাড়ির গাড়ি না নিয়ে ট্যাকসিতে চেপে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল। সিনেমার কাগজে বাড়ির ঠিকানার হদিস মিলেছে—কিন্তু গাইড হাতড়ে ফোননম্বর পায়নি। অতএব কপাল ঠুকে রওনা হয়েছে।

শহর থেকে অনেক দূরে ছোট একটা ছিমছাম একতলা বাড়ি। সামনে ছোট একটু বাগান।

কড়া নাড়তে কাজলই দরজা খুলে দিল। তারপর দুই চক্ষু বিস্ফারিত। মুখে কথা সরে না খানিক।—কি ভাগ্যি কি ভাগ্যি—তোরা! অ্যাঁ, আমি জেগে আছি না ঘুমুচ্ছি? আয় আয় আয়—

খুশিতে আটখানা একেবারে। আদর করে তাদের টেনে এনে বসালো। তারপর লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিল একেবারে।

গোড়ায় খানিক দুই বোনেরই বিব্রত মুখ। তারপর রমলা বলল, আর বেশি খাতির দেখাস না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনটে বছর সোজা ভাবিয়েছিস?

কাজল হাসল একচোট। তারপর বলল, তিন বছর পরে তো আরো তিনটে বছর কেটে গেল, তার মধ্যে তো একটা-বার খবর নিতে এলি না।

শ্যামলী বলল, আমাদের আসা কি সহজ কথা নাকি, কোন রাজ্যের পারে এসে আছিস—তাছাড়া সেদিন মাত্র তো তোর ঠিকানা জানলাম।

কাজল হাসছে তাদের দিকে চেয়ে। ঝকঝকে দাতের একটু একটু দেখা যাচ্ছে। এমনিই নিঃশব্দ অথচ জীবন্ত হাসি রাজেন্দ্রাণীর ভূমিকায় নাটকেও দেখেছিল দুই বোনের মনে পড়ল। আর মনে হল মেয়েটার সেই চেহারা সেই রং সেই নাক মুখ চোখই আছে—কিন্তু তার মধ্যেই কেমন একটু শ্রী এসেছে বেশ যা চোখে পড়েই।

ফূর্তিতে কাজল নিজের হাতে চা বানালো, খাবার এনে সামনে রাখল, আর গল্প করতে লাগল। কিন্তু দিদিরা অন্য গল্প ছেড়ে শুধু সিনেমা আর থিয়েটার রাজ্যের গল্প শুনতে চায়। কাজলের ওই গল্পে আবার উৎসাহ কম, জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয়।

অনেকক্ষণ বাদে ওর সিঁথির দিকে চোখ গেল রমলার। বলল, বিয়ে-থা করলি না এখনো, আর কবে করবি। বয়েস তো সাতাশ গড়ালো।

কাজল হাসিমুখে সোজা উত্তর দিল, বিয়ে করেছি বলতে পারিস, আবার করিওনি বলতে পারিস। তবে পাকা অনুষ্ঠান এবারে একটা শিগগিরই সেরে ফেলব ভাবছি নেমন্তন্ন করলে আসবি?

আগেরটুকু শুনে রমলা আর শ্যামলীর মুখ লাল। কিন্তু জবাব দেবার আগেই বাইরে থেকে আর একজনের পদার্পণ ঘটল। সেই বাবরি-চুল সোনা ঘোষ, পরনে সেই রকমই পাজামা আর টুইলের শার্ট তবে একটু মোটার দিকে ঘেঁষেছে। ওকে দেখে বোনেরা সচকিত।

সোনা ঘোষ থমকালো একটু। তারপর একগাল হেসে বলল, দিদিরা যে! খবর ভালো?

রমলা আর শ্যামলী চুপ।

সোনা ঘোষ কাজলের দিকে ফিরল।—জলপাইগুড়ির সেই পার্টি ঠায় আপিসে বসে আছে, কন্ট্রাকট সই না করে নড়বেই না।

কাজল ভুরু কুঁচকে ভাবল একটু।—কবে নিতে চায়?

—এই মাসে হলেই সুবিধে হতো বলছে।

—উঁহু, এ মাসে হবে না, শুটিং আছে—সামনের মাসে গোড়ার দিকে হতে পারে। সব খরচখরচা বাদ দিয়ে চার হাজার টাকা দিতে রাজি থাকে তো কন্ট্রাকট সই করে দাও।

দিদিদের দিকে আর একবার কৌতুক-মাখা চোখ বুলিয়ে সোনা ঘোষ চলে গেল।

কাজল আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, ভগ্নীপতি পছন্দ হল তোদের?

ওরা দুজনেই আঁতকে উঠল একেবারে। বমলা বলেই ফেলল, ওই লোফারটাকেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবি তুই।

কাজল হাসছে। বলল, লোফারই বটে... গোড়ায় গোড়ায় অভিনয় বপ্ত করতে না পারলে চড়চাপড় পর্যন্ত বসিয়ে দিত, বুঝলি?

বাগত মুখে শ্যামলী বলল, তোর রুচি আর বদলালো না।

কাজল হাসছে।—যা বলেছিস, আর এত টাকাপয়সা নাড়াচাড়া করছে তবু রুচি ওই লোফারেরও বদলালো না।...অথচ কতই তো দেখছি, কত রকমের প্রস্তাব নিয়ে কত লোক আসছে—আর কত উদার সব। ভালো কথা, নিজস্ব প্রতিষ্ঠান করব খবরটা কাগজে বেরুবার পর চেকরই পকেটে করে বিমানদা আর রঞ্জনদাও ছোটাছুটি করে এসেছিল। কাজল হাসছে।—আলাদা আলাদা অবশ্য—টাকার দরকার নেই বোঝার পরেও আসার কামাই নেই—হাজার হোক, শালী তো—টান যাবে কোথায়। শেষে এত বেশি আসতে লাগল যে তোদের কথা ভেবে আমিই একদিন নিষেধ করে দিলাম—তোরা ফিরে গিয়ে বেচারাদের ওপর আবার রাগারাগি করিস না।

কাজল হাসছে। সেই সামান্য দাঁত-চিকানো নিঃশব্দ হাসি। এখন মেক-আপ নেই, পেন্ট নেই, তবু ওই মুখ ওই চাউনি আর ওই হাসি রাজেন্দ্রাণীর মতোই লাগছে।

রক্তশূন্য পাংশু বিবর্ণ মুখে বমলা ও শ্যামলী যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েও সেইটুকু দেখে নিচ্ছে।

চলো জঙ্গলে যাই

সকালে খানিকক্ষণ রেডিও শোনা অভ্যাস। তাই শুনছিলাম। চোখ অন্য-কাজে ব্যস্ত থাকলেও কান সজাগ ছিল। এই দিনে চোখ-কান-হাত-পা সব একই সঙ্গে যে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করতে পারে না তার অগ্রগতি ব্যাহত হ'তে বাধ্য। আমার হাতে সিগারেট ছিল, চোখ দুটো সামনের বইয়ের দিকে ছিল, মনের একভাগ বইয়ের লেখকের দিকে আরেক ভাগ রেডিওর দিকে ছিল, আর মগজের কোষে-কোষে সিগারেট, বই, লেখক, রেডিও থেকে শুরু ক'রে সমস্ত দিনের প্ল্যান-প্রোগ্রাম সবই আসা-যাওয়া করছিল। এই সব গুণ করায়ত্ত ব'লেই সিদ্ধির পথে আমার সহজ স্বচ্ছন্দ গতি। গেলবারে আমার সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক বন্ধুরা, সরকারী বে-সরকারী বহু পদস্থ শুভার্থীরা আমাকে যখন মানপত্র দেন, তখন আমার বহু গুণের কথা উল্লেখ ক'রে অনেকেই তাঁরা সশ্রদ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সেই বিস্ময়ের উত্তরে আমি বিনীত জবাব দিয়েছিলাম, সবেতে সহিষ্ণু, সংযম, উদার দৃষ্টিভঙ্গি আর অতি মন্দের মধ্যেও ভালো দেখার চেষ্টা ছাড়া আমার আর কোনো গুণ নেই। শুধু এই ক'টি মিলিয়ে আমি যা—তাই।

মিথ্যে বলিনি বা অতিশয়োক্তি করিনি। মনেপ্রাণে এই তিন মন্ত্রের ওপরে নির্ভর করেই আমি দিনযাপন ক'রে চলেছি।

সকালে বেডিও খুলি, কাবণ প্রথম দিকে ভালো ভালো ঠাকুব-দেবতাব গান থাকে কযেকটা, যাঁ শুনলে চিত্ত প্রসন্ন হয, একটা শুচিশুদ্ধ ভাব জাগে মনে। তাবপব বেডিওব খববও খববেব কাগজেব খববেব থেকে আমাব ভালো লাগে। খববেব কাগজগুলো সর্বদা দু-নৌকায পা দিযেই আছে, মানুষেব চিন্তা বিভ্রান্ত কবাই যেন তাদেব কাজ। একই সঙ্গে প্রশংসা আব নিন্দা, স্তুতি আব কটূক্তি, আস্থা আব অনাস্থা—সব পাশাপাশি বিবাজ কবছে। কিন্তু বেতাবেব খববে উন্নতিব প্রযাস, অগ্রগতিব চেষ্টা, সততা, নিষ্ঠা আব আশা-আশ্বাসেব, একটা স্পষ্ট চিত্র মেলে। উজ্জ্বল সম্ভবনায মন প্রসন্ন হয।

বাড়িতে অবশ্য উঠতি বযসেব ছেলেছোকবা আছে আবো, নিজেদেব তাবা বেশ দিগগজই ভাবে। ভালো ভালো খবব শুনলেও তাদেব মন ভবে না, তাদেব চোখে অবিশ্বাস উকিঝুঁকি দেয, ঠোঁটে অনেক সময বাঁকা হাসি ফোটে, আব মনে মনে হযত বক্র শ্লেষও কবে। কিন্তু ওদেব এই বিরূপতা একটু রূঢ় শাসনেই আমি কাটিযে তুলতে চেষ্টা কবছি। কিছুটা সফলও হযেছি। এখন আব আমাব সামনে অন্তত মুখ ফুটে কেউ কিছু বলে না।

আমি ওদেব বলি, এত ধৈর্যশূন্য হবাব কী আছে, এই তো সেদিন মাত্র স্বাধীন হলাম, শিশু দেশ আমাদেব, এবই মধ্যে যা হযেছে অনেক হযেছে—ভোজবাজীব ব্যাপাব তো নয যে বাতাবাতি একেবাবে প্রাচুর্যেব বন্যা এসে যাবে।

জবাবে সব থেকে মূর্খেব মত আমাব স্ত্রীই একদিন মুখ-মচকে প্রতিবাদ ক'বে বসেছিলেন, বলেছিলেন, তাও তো আঠেব বছব হ'যে গেল দেশ স্বাধীন হযেছে, শিশু আব কতকাল থাকবে?

সত্যিই আমাব মনটা সেদিন খাবাপ হযে গিযেছিল—ঘবেব স্ত্রী পর্যন্ত যদি মনে মনে অবিবেচক হন তাহলে কেমন লাগে? বাগ না ক'বে জিজ্ঞাসা কবলাম, তোমাব ছেলেব বযেস কত?

আমতা আমতা ক'বে জবাব দিলেন, উনিশ

বললাম, তাকে তুমি কোন চোখে দেখো? মস্ত যোগ্য হযেছে ব'লে তাকে তুমি ঠেলে বাস্তায বাব ক'বে দিতে পাবো? সেদিন পযসা চুবি ক'বেছিল বলছিলে, মস্ত নীতিবতী হযে, তাকে তুমি জেলে পাঠাওনি কেন? ও-বাড়িব ওই দুর্বল ছেলেটাকে, অমন ঠেঙিযে আধমবা ক'বে আসাব পবেও ওব তুমি একখানা হাতও ভেঙে দাওনি কেন? আপদে-বিপদে এত সন্তর্পণে তাকে তুমি আগলে বাখো কেন? এই সবেবই একমাত্র কাবণ, আসলে ওকে তুমি শিশু ভাবো, এবং ঠিকই ভাবো। দেশটাকেও ঠিক এই চোখেই দেখা উচিত।

সেই মোক্ষম জবাবেব পব স্ত্রীব মুখ বন্ধ হযেছে।

যাক এসব কথা, আজ থেকেই আমাব মেজাজ কিছুটা বিগড়ে দিযেছে যে বস্তুটা, সেটা আমাব হাতেব এই বই। না পাবছি ভালো কবে বেডিওব খববে মন দিতে, না পাবছি বই হাতে নিযে আব কিছু ভাবতে। জুতোব ভিতব থেকে পাযেব তলায ক্রমাগত যদি কিছু খচখচ ক'বে বিঁধতে থাকে, আঘাত সামান্য হলেও কতক্ষণ আব সেটা ববদাস্ত ক'বে নির্লিপ্ত থাকা যায?

বইটাব নাম 'চলো, জঙ্গলে যাই'—জীবন-যন্ত্রণাব প্রতীক এক আধুনিক কবিব কাব্যসংকলন। চোখা-চোখা বাক্যবাণ সাহিত্যেব আওতায আনাব ফলে কবিব একটু সস্তা নাম হযেছিল। আমি নামই শুধু শুনেছিলাম, আগে তাঁব লেখা কিছু পডিনি। পণ্ডশ্রম কবাব মত অত সময়ও নেই। কবিব এই নবতম সংকলনটিব প্রসঙ্গে পাঠকেব একটু বেশি উচ্ছ্বাস প্রকট হবাব ফলেই বইটা আমাব হাতে এসেছে। আবাব সুস্থ-বুদ্ধি দু-চাবজনেব অনুরোধও এসেছে আমাব কাছে, কবিতাব বইটা প'ডে কাগজে আচ্ছা কবে একটু সমালোচনা কবুন তো—এ সব আলপিন-সাহিত্য আব তো সহ্য হয না।

সমালোচনাব উদ্দেশ্য নিযেই বইটা হাতে নিযেছি, আব এ সপ্তাহে সমালোচনা প্রকাশ কবতে হ'লে আজই এটা উল্টে-পাল্টে দেখে যা লেখাব লিখে দিতে হবে। কিন্তু বইটা পডতে পডতে গাযে যেন জল-বিছুটি লাগছে এক-একবাব, ইচ্ছে হযেছে ছুঁডে ফেলে দিই। কিন্তু ছুঁডে ফেলে দিলে সমালোচনা লেখা হয না—আব সমালোচনা না কবা মানেই এই সব অসংযমী বেপবোযা লেখককে প্রশ্রয দেওযা।

অতএব পডছি আব জ্বলছি।

সবকটা কবিতাব মধ্যেই কবি তাঁব পাঠকবর্গসহ জঙ্গেলে যেতে চাইছেন। তাব মতে দেশটা এখন আব বাসযোগ্য নয, এই সভ্যতাব মশাল জ্বালিযে পুডিযে খাক কবে দিলে সব, এই সভ্যতাব মোলাযেম হিংসা বনেব হিংস্র শ্বাপদকেও হাব মানিযেছে, মানুষেব মধ্যে এখন আব লোভ-লালসা দুর্নীতি-বিদ্বেষ ছাডা আব কিছু দেখছেনই না কবি, দযা-মাযা-ভালবাসা-মানবতাব শুধু মুখোশই দেখা যাচ্ছে সর্বত্র, শাসকেব বেশে শোষক ঘুবছে, ধার্মিকেব বেশে অত্যাচাবী ছুবি হানছে, ন্যাযেব নামাবলী পবে অন্যাযেব বিজযযাত্রা চলেছে—অতএব এই পাপ যাদেব সত্যিই অসহ্য, কবিব সঙ্গে তাবা যদি জঙ্গলে যাত্রা কবে, তাহলে এখান থেকে অন্তত অনেক সুখে থাকবে। নমুনা দিই

তুমি শান্তি চাও?
বুকেব তলায ডুব দিযে দেখো বন্ধু,
দেখো সত্যি কি চাও তুমি।
শান্তি যদি চাও,
তবে অন্য পথ নাও।
এখানে শান্তি বড চডা দবে বিকোয,
এখানে প্রাচুর্যেব পাপে নাবাযণ শুকোয,
তোমাব মূলধন তো কানাকডি।
নীতিব খাপে পোবা তীক্ষ্ণ অস্ত্র নেই তোমাব ঝুলিতে,
লোভেব আগুন ছাই-চাপা নেই তোমাব
অহিংস উদাব বুলিতে,
কথাব প্রলেপে তুমি, দিন কে পাবো কি বাত কবতে?
আব প্রসন্ন ঢেকুব চেপে, চোখ দিযে পাবো
সমব্যথাব অশ্রু ঝবাতে?

হায় রে হায়, তোমার মূলধন যে কানাকড়ি!
তবু যদি বলো শান্তি চাই—
তাহলে আমি যা বলি শোনো ভাই,
চলো বন্ধু,
চলো জঙ্গলে চাই।

এর পর স্নায়ু ঠাণ্ডা করার জন্যেও খানিকক্ষণ অন্যদিকে মন ফেরানো দরকার। বই রেখে খবরের কাগজ টেনে নিলাম। কিন্তু এইসব অপরিণামদর্শী লেখকদের কথা ভেবে গা জ্বলছে। সরকারের ওপর এই প্রথম হয়ত একটা ব্যাপারে রাগ হল আমার—তাদের মুদ্রণ পর্যবেক্ষণ দপ্তর তো আছে একটা, এই সব বই বাজেয়াপ্ত করে না কেন তারা? কেনই বা শান্তিপ্রিয় লোকগুলোকে এভাবে তাতিয়ে তুলতে দেয়?

খবরের কাগজে কতকগুলো ভালো ভালো খবরের ওপর চোখ বুলিয়ে মনটা একটু প্রসন্ন হল। নতুন কয়েকটা পরিকল্পনা প্রায় সমাপ্তির পথে, খাদ্য-দপ্তর খাদ্যের অনটন দূর করার দৃঢ় উদ্দীপনায় কতকগুলো ভালো ভালো ব্যবস্থায় অগ্রসর হতে চলেছেন, অন্যদিকে শাসকরা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন—মুনাফাখোর, মজুতদার বা ভেজাল-ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি আর তাঁরা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না—তাদের শুভবুদ্ধির উদ্রেক করার এবং তেমন প্রয়োজনে শাস্তি পর্যন্ত দেওয়ার রাস্তাও বার করতে বদ্ধপরিকর তাঁরা।

চাকর এসে খবর দিলে, নিচে একটি মেয়ে এসেছে, দেখা করতে চায়।

কে আবার মেয়ে এলো এসময়ে দেখা করতে, বুঝলাম না।

সিঁড়ির মুখে বাধা পড়ল, স্ত্রী উঠে আসছেন। আমাকে দেখে বললেন, যে লোকটা চুপি চুপি বেশি দরে, বাড়িতে মাছ দিয়ে যায় তারও আজ দেখা নেই—কী হবে?

এসব কথা কোনো দিনই ভালো লাগে না, অথচ আমারই কানে বেশি আসবে। বললাম, মাছ ছাড়াও লোকে দু' দশ দিন প্রাণধারণ করতে পারে—বেশি মাংস আনিয়ে নাও, মাংস তো পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু এই ফয়সালার পরেও পাশ কাটানো গেল না। তিনি আবার বললেন, কিন্তু রাঁধবে কী দিয়ে মাথামুণ্ডু—দিচ্ছি দিচ্ছি ক'রে তিন দিন ধরে তেলঅলারও তো পাত্তা নেই।

এবারে সত্যই রাগ হল, বললাম, নেই তার জন্যে মাথা খারাপ করার কী আছে? এক কালের মানুষ সব কিছু পুড়িয়ে খেত, তাদের স্বাস্থ্য, তোমার-আমার থেকে খারাপ ছিল না।

বলে ফেলেই এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করলাম। জঙ্গলের কবির, জঙ্গলের মানুষদের সমর্থনই যেন ক'রে ফেলা হল। নামতে নামতে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে শুধরে নিলাম।—"সেদ্ধ করেও বেশ খাওয়া চলে সব কিছু, তাতে স্বাস্থ্য বরং আরো ভালো থাকে।"

নিচে অপেক্ষা করছে বছর বাইশ-চব্বিশের একটি মেয়ে। মোটামুটি সুশ্রী, ভালো স্বাস্থ্য, একটু গম্ভীর গোছের। যে ধরনের মেয়ে দেখলে চোখে স্বভাবতই প্রীতি হয় একটু। চেনা-চেনা লাগল মুখখানা, অনেকদিন আগে কোথাও যেন দেখেছি।

মেয়েটি উঠে এসে আমাকে প্রণাম করল, কাকাবাবু ডাকল, বলল, আমাকে চিনতে পারলেন না তো কাকাবাবু?

ওর বাবার নাম বলতেই চিনলাম, আমাদের বিনয়ের মেয়ে। স্কুল-কলেজে বিনয় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। কোথায় একটা কেরানীগিরি করে এখন, সংসার নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, বিশেষ দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। কিছুদিন আগে তার এই মেয়ের সম্পর্কেই কী যেন শুনেছিলাম...ঠিক মনে পড়ছে না, কী একটা কারণে মেয়েটা চাকরি ছাড়তে চায়—ওই গোছের কিছু।

মেয়েটির কথাবার্তা বেশ স্পষ্ট, সপ্রতিভ, আলগা লজ্জা-সঙ্কোচ নেই। আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল, কোনো ভালো ভদ্র প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে চায়, আমাদের কাগজে কোনো চাকরির ব্যবস্থা হতে পারে কিনা...।

আমি অবাক একটু, কেন, তুমি তো একটা ভালো চাকরি করছিলে কোথায় শুনেছি!

জবাবে প্রায় অসঙ্কোচেই সে জানালো, ভাল চাকরিই করছিল এবং এখনো করছে। শর্টহ্যাণ্ড-জানা-গ্র্যাজুয়েট বলে চাকরি পাওয়াও সহজ হয়েছিল। তারপর স্টেনোটাইপিস্ট থেকে দেড় বছরের মধ্যেই স্টেনোগ্রাফার হয়েছে, থাকতে পারলে শিগগীরই হয়ত পি. এ-ও হয়ে যাবে। কিন্তু থাকাটাই আর সম্ভব হচ্ছে না, আত্মসম্মান বজায় রেখে সেখানে চাকরি করা কঠিন হয়ে উঠেছে। তার ঘন ঘন প্রমোশন পাওয়াটাও সকলে সুচক্ষে দেখছে না...দেখার কথাও নয়।

এইবার মনে পড়ল, ওর বাপের মুখে কী শুনেছিলাম। বাপ দুঃখ ক'রে বলছিল, মেয়েটা যা-ও একটা ভালো চাকরি পেয়েছিল, টিকতে পারছে না। ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কী যে মতিগতি হয়েছে আজকাল, ছেলে-ছোকরা ছেড়ে বাপের বয়সী অফিসারদের পর্যন্ত সোজা বাস্তায় চলে না।

যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। বিরক্তিকর না তো কী! এই বয়সের মেয়ে পর্যন্ত একটু উদার হতে পারে না! ফ্রয়েড বা হ্যাভলক এলিস পড়া থাকলে এই সব সামান্য সহজাত বিকৃতিগুলোকে বরং একটু দরদের চোখে দেখতে পারত। দুর্নীতির মধ্যে পা না বাড়িয়েও সহজ একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলার বলিষ্ঠ চিন্তা এদের মাথায়ই আসে না। নীতি-নীতি করেই গেল সব, এই সামান্য কারণে একেবারে চাকরিই ছাড়তে হবে!

বিরক্তি চেপে ওকে বললাম, আমাদের কাগজের অফিসে মেয়েদের কোনো স্কোপ নেই। এও বললাম, এতেই যদি চাকরি ছাড়তে হয়, তাহলে তার উচিত কোনো মেয়ে-স্কুলে চাকরি নেওয়া।

ওপরে এসে আবার ওই জঙ্গল-ভক্ত কবির বইটাই খুলে বসলাম। প্রথমেই যে জায়গাটায় চোখ পড়ল, মনে হল চোখে যেন পট-পট করে ইনজেকশন ফোটাচ্ছে কেউ:

...তাই বলি বন্ধু, যদি সঙ্গী পাই
তবে খাঁটি সবুজ জঙ্গলে যাই।

যেখানে হিংসা খাঁটি,
আর সরলতাও।
যেখানে বাঘ ভালুক হায়না—
আপন মুখ মুখোশে ঢাকে না।
যেখানে হিংস্র চকিত হুঙ্কারে
ভক্ষ্য হবিণের ঘাড়ে লাফায,
রক্ষা কববে বলে তাকে—
বৃথা আশ্বাসে ভোলায না।
যেখানে শ্বাপদ-হিংসা খাঁটি
আব শশকেব সরলতাও।
অবণ্যে আবো ক্ষুধা নেই একথা বলি না বন্ধু,
বিপু যেখানে আদিম আব অবিকৃত
সেখানেও বনিতাব খোঁজ পড়ে অবিবত।
তবু আপন-নির্ভয়ে সেথায় বনিতাবে রক্ষা কবা বীতি,
আব অকপট শৌর্যে তাবে জয কবা নীতি।
সেখানে ক্ষুধা খাঁটি
আব বনিতাব সবলতাও।
দুইই সকলে চেনে।
যেখানে অচেনা কেউ নয, যেমন এই সভ্যতার অরণ্যে।
তাই, আমরা যাবা চেনা মুখ খুঁজে বেড়াই
তাবা এসো বন্ধু,
চলো, নির্ভেজাল জঙ্গলে যাই।

জঙ্গলেব বই ফেলে, সহজ দম নিতে ফেলতে সময লাগল একটু। ভেবে আর মাথা গরম কবব না, লেখাব যা লিখব। পাবলে জঙ্গলেই পাঠাব কবিকে। খাওযা-দাওযাব পব অল্প একটু ঘুমনোব অভ্যাস, তাবপবে অফিস।

বাসে বসেও বইটা শেষবাবেব মত উল্টেপাল্টে দেখছি। আব ওতে ভালো করে মন না দিযে মনটাকেও ঠাণ্ডা বাখতে চেষ্টা কবছি। বাসে কয়েকটি ছেলেছোকবাব তবল কলবব কানে আসতে মুখ তুলতে হল। বই-খাতা নিয়ে গুটিসাতেক ছেলে কলেজে চলেছে। একজনেব সামনের লেডিস সীটের একটা পাশ খালি, অন্য পাশে বছর পঁযতিবিশেকেব এক মহিলা বসে। মহিলার শৌখিন বেশবাস, চোখে পুরু কালো গগলস। বসিকতা কবে ছেলেরা সকলকে শুনিযেই নিজেদেব মধ্যে আলোচনা কবছে, মহিলাব পাশেব ওই খালি সীটটাতে কেউ বসবে কিনা।

শেষে একটি ছেলে জিজ্ঞাসাই করে বসল, ও দিদি, বসব একটু?

না। মহিলা ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন, তোমরা আব একটু ভদ্র হলে বলতে হত না, আমিই বসতে বলতাম।

আব যায কোথায, ভীমরুলেব চাকে ঢিল পডল যেন। ছেলেবা তর্জন-গর্জন কবে উঠল, এতবড কথা! আমবা অভদ্র! মেযেছেলে বলে যা মুখে আসে বলে পাব পেযে যাবেন ভেবেছেন? ফর্সা জামাকাপড পবে আব স্টাইল কবে চোখে গগলস চডালেই মেযেবা ভদ্র হযে যায, কেমন?

বাসেব দুই-একজন থামাতে চেষ্টা কবল তাদেব, কিন্তু তাব ফল বিপবীত হল। অল্পবযসী ছেলে সব, সত্যিই চটেছে। মাবমূর্তি হযে তাবা বলতে লাগল, কেন, কেন এই কথা বলবে আমাদেব, এই সব মেযেছেলেব এত সাহস কেন? মহিলাকেই চডাও কবল আবাব, আপনাব মত ফ্যাশানেবল মেযেদেব খুব চিনি আমবা, বুঝলেন? আপনাব মত কালো চশমা পবা মেযেদেব জানতে বাকি আছে আমাদেব ভাবেন?

ক্রোধে ক্ষোভে মহিলাবও আব এক মূর্তি। বলে উঠলেন, না বাবাবা, এবই মধ্যে তোমবা সবই জেনে ফেলেছ, কিছুই আব জানতে বাকি নেই তোমাদেব। তবে নীল চশমা কেন পবি? এই দেখো, দেখো—

বলেই একটানে চশমাটা খুলে ফেললেন তিনি। তাঁব মুখেব দিকে চেযে বাসেব সকলেই ধাক্কা খেল একটু—ছেলেবাও চুপ কযেক মুহূর্ত। তাঁব এক চোখ পাথবেব, এবং পাতা পডে না—দেখলেই অস্বস্তি হয।

তিনি চশমাটা ফিবে পবতেই ছেলেবা আবাব ক্ষেপল, আমবা এবই মধ্যে সবই জেনে ফেলেছি, কিছুই জানতে বাকি নেই—এ-কথাব মানে কি? একবাব অভদ্র বলেছেন, আবাব আমাদেব ক্যাবেক্টাব ধবে টানাটানি। আমবা কৈফিযৎ চাই, ওই চোখ দেখিযেই আপনি আমাদেব ভোলাবেন ভেবেছেন?

দাঁতে কবে ঠোঁট কামডে বসে আছেন মহিলা। চেঁচামেচি আবো বাডাব আগেই ছেলেদেব গন্তব্যস্থান এসে গেল। আমাবও। ছেলেবা শাসিযে গেল, তাবা ছাডবে না, এই পথে আবাব দেখা হলে ভালো হাতেই মহিলাকে জবাবদিহি কবতে হবে, কলেজেব ছাত্রকে অপমান কবে অর্ত সহজে পাব পাওযা যায না, ইত্যাদি।

মনে মনে আমিও ওই মহিলাব ওপবেই বিরূপ হযেছিলাম। অল্পবযসেব হাসি-খুশি ছেলে-ছোকবাব দল, দেশেব ভবিষ্যৎ বলতে গেলে ওবাই—কী দবকাব ছিল মহিলাব এভাবে ওদেব বিগডে দেওযা না হয। কবছিলই একটু বসিকতা, এলিস তো বলেছেন, এ-সব হ'ল এক ধবনেব 'সেফটি ভালভ' —না সবেতেই অধৈর্য, গাযে যেন ফোস্কা পডেছিল।

অফিসে বসে লেখাব আগে আব একবাব সেই জঙ্গলেব কাব্য খুলেছি। পডবি তো-পড এমন জাযগাই চোখে পডল যে হাতেব কলম আছডে মাবতে ইচ্ছে কবে

তবু আশা বন্ধু? এখনো আশা?
এখনো কিছু দেখতে বাকি।
এখনো ভাবো, আবো একটু থাকি।
এখনো আশা, নতুন কণ্ঠে শুনবে ভাষা?
শোনো বন্ধু, অবণ্যে দাউদাউ দাবাগ্নি জ্বলে
সেই আগুনে বস্তু পোডে, অবণ্যেব প্রাণ পোডে না।

তোমাদেব এই সভ্যতাব আলোব তলায মশাল জ্বলে,
এই আগুনে মানবতা পোড়ে, বস্তু পোড়ে না।
নতুন অবণ্য জাগে
ঋতুস্নাতা ধবণীব অনুবাগে।
কিন্তু তোমাব নগবে নতুন মানুষ কাবা?
মানবতা-পোড়া বস্তুব, সন্তান যাবা?
অনেক তো দেখেছ বন্ধু,
অনেক জেনেছ,
শক্তিব দম্ভ আব লোভীব হীনতা
পণ্ডিতেব দর্প আব জ্ঞানীব মূঢ়তা
প্রাচীনেব গর্ব আব নবীনেব ক্লীবতা—
এবা কি শোনাবে বলো নতুন দিনেব বাবতা?
অনেক দেখেছ বন্ধু, অনেক জেনেছ।
তবু আমিও তোমাবই মত কিছু আশা চাই,
তাই ডাকি বন্ধু, চলো,
এবাবে অকৃপণ উদাত্ত গম্ভীব জঙ্গলে যাই।

বই ফেলে দিযে কলম হাতে নিযে অনেকক্ষণ ধবে ভাবলাম, কি লেখা যায, কেমন কবে উপযুক্ত ঘা দেওযা যায। ভাবতে ভাবতে শুভবুদ্ধিই মনে জাগল। সব থেকে ভালো অবজ্ঞা কবে যাওযা, এব অস্তিত্বই অস্বীকাব কবা। এ ধবনেব অবাঞ্ছিত বইযেব বিরুদ্ধে জোবালো বকমেব হাঁকডাক কবলেও অপবিণত বযসেব ছেলেমেযেদেব কৌতূহল বাডবে। একবাব পড়ে দেখাব জন্যও বইখানা হযত বা তাদেব কেনাব আগ্রহ হবে। তাদেব প্রতি গুরুদাযিত্বেব কথা ভেবেই কলম বন্ধ কবলাম।

না, সমালোচনা লিখব না।

রমা মিত্র এবং মালবী মিত্র

..প্রশান্তকে তিনদিন বাদে আসতে বলেছিল মালবী মিত্র। বলেছিল তিনটে দিন সে ভযানক ব্যস্ত থাকবে, দু-দুটো ছবি শেষেব মাথায—সকালে বাত্রিতে দু'দফা কবে শুটিং, এব মধ্যে দু'দণ্ড মাথা ঠাণ্ডা কবে কিছু ভাবাব সময নেই। বলেছিল, দিনতিনেক পবে যেন সে আসে। তখন শুনবে। তখন ভাববে। তখন যা বলাব বলবে। নিরুপায ভ্রূভঙ্গি কবে হেসেই বলেছিল, এই দেখো না, এতকাল বাদে তোমাকে দেখে কী যে কবব ভেবে পাচ্ছি না, অথচ দুটো ঘণ্টা তোমাকে বসিযে আদব-যত্ন কবতে পাবলুম না...কী যে জীবন আমাদেব যদি জানতে।

প্রশান্ত জবাব না দিযে চুপচাপ মুখেব দিকে চেযেছিল। সেই পুরু দুটো কাঁচ, তাব ওধাবে সেই ডাগব দুটো চোখ, সেই রকমই এক-মাথা ঝাঁকডা চুল। কে বলবে

এই মানুষ একটানা সাত বছর বিদেশের মাটি চষে, মস্ত মস্ত চাকরি করে কিছুদিন আগে দেশে ফিরেছে। মালবী এই মুখ আর এই চাউনি দেখে ভাবতে পারো বড় জোর সাত মাস দেখেনি মানুষটাকে।

চুপচাপ ওই রকম খানিক চেয়ে থেকে প্রশান্ত বলেছিল, আচ্ছা, তিন দিন পরেই আসব তাহলে। তক্ষুণি উঠে দাঁড়িয়েছিল।

হ্যাঁ, এসো, বাগ করলে না তো? ঠিক এসো কিন্তু—

ট্রেনের রিজার্ভ কামরার পুরু গদীতে ঠেস দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে মালবী। বাইরের গাঢ় অন্ধকারের পাতাল ফুঁড়ে ট্রেন ছুটেছে। ওটা আলোয় পৌঁছুবে। কিন্তু মালবী কোথায় ছুটেছে? সে অন্ধকার খুঁজছে। কোনো অস্তিত্বগ্রাসী অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবার তাড়না তার। কিন্তু এমন জায়গা আছে কি...।

সামনের বার্থে অঘোরে ঘুমচ্ছে সারদা। ঝি ঠিক নয়, তার থেকে বয়সে বছর বারো বড় সহচরী বলা যেতে পারে, যে তার ঘর সামলায়। মনিবানীকে হঠাৎ এ-ভাবে পড়ি-মরি করে বেরিয়ে পড়তে দেখে সে ততো অবাক হয়নি যত অবাক হয়েছে টানা দুটো দিনের থমথমে মুখ দেখে। এত হাসি-খুশি যেন কোথায় উবে গেল। তারপর আজই হঠাৎ হুকুম, বেরুতে হবে। কোথায় যেতে হবে, কতদিনের মধ্যে যেতে হবে না জেনেই তড়িঘড়ি সব গোছগাছ করে নিতে হয়েছে। তা সহৃদয়া মনিবের এই গোছের খেয়ালের ধকল তাকে অনেক সামলাতে হয়। তাই আর থমথমে মুখের কারণ নিয়ে সে বিশেষ মাথা না গামিয়ে তোফা আরামে নিদ্রা দিয়েছে।

একবার তাকে দেখে নিয়ে অবসন্নের মত আবার বাইরের দিকে ফিরল মালবী মিত্র।

...সাত বছর বাদে প্রশান্ত এসেছিল কোনো একদিনের এক সাধারণ মেয়ে রমা মিত্রের কাছে। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলেছে এক অসাধারণ মেয়ে মাধবী মিত্র। যার তুলনা নেই। যার দর্শন পেলে বহু রসিকজন ভাগ্য মানে। খ্যাতির বিড়ম্বনায় যে মালবী মিত্র সর্বসাধারণের নাগাল থেকে বিচ্ছিন্ন—মিনিট চল্লিশ সে মাধবী মিত্র কথা বলেছিল প্রশান্তর সঙ্গে। রমা মিত্র নয়...প্রশান্ত কি তা বুঝেছে? বুঝে গেছে? বোঝার কথা, কিন্তু মালবী সেই মুখের দিকে চেয়ে নিঃসংশয় হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, কথা-বার্তায়, বিস্ময় আর হাসি-খুশির ফাঁকে মালবী তাকে প্রকারান্তরে এও বোঝাতে চেষ্টা করেছে, সাত বছর বাদে লোকটা এসে যে-কথা বলছে তার মধ্যে অবিশ্বাস অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। কিন্তু লোকটা এও বুঝেছে কিনা সন্দেহ...রমা মিত্র নয়, আপন মহিমায় বিকশিত এক মালবী মিত্র তাকে বলেছে আপাতত দিন-তিনেক তার মরবার ফুরসত নেই, তিন দিন পরে যেন আসে। প্রশান্ত বলেছে তাই আসবে।

...এই রাতটা পোহালে তিনটে দিনের অবসান। কালই বিকেলের দিকে প্রশান্ত আবার আসবে। ঢোকবার সময় বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ দেখে একটু অবাক হবে। তারপর দরজায় তালা ঝুলছে দেখে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকবে।...

মালবীর ঠোঁটের ডগায় কৌতুকের মত রেখা পড়ল একটু। কিন্তু চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচক করছে। বিগত এই কটা বছর শিল্পের তাগিদে ঠোঁটে তার অজস্র

কৌতুক ঝরেছে, আর চোখ তার অজস্রবার চকচকিয়ে উঠে দু'গাল বেয়ে ধারা নামিয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে সে-সবের মিল নেই।

রমা মিত্র এখনো ভস্মস্তূপে পরিণত হয়নি। আর সেই ভস্মস্তূপ থেকে তখন কোনো মালবী মিত্রর আবির্ভাব ঘটেনি।

এম. এ. পড়া একটি অতি সাধারণ মেয়ে রমা মিত্র। মামুলি প্রেমে পড়েছিল একটি বনেদী ঘরের সাধারণ ছেলের সঙ্গেই যার নাম প্রশান্ত ঘোষ। কিন্তু রমা মিত্র প্রায় অসাধারণই ভাবত তাকে। ভাবতে ভালো লাগত।

রমা রূপসী কিছু নয় যে নিজের সম্পর্কে বাড়তি গর্ব পুষবে। গায়ের রং বলতে গেলে কালোই। স্বাস্থ্যটা ভালো এই যা। আর যাদের দরদ আছে তারা নাক মুখ চোখও ভালো দেখে। তবে ফটো ওর খুব সুন্দর ওঠে, সত্যিকারের চেহারা থেকে ঢের বেশি সুন্দর মনে হয়। ফটোতে তো আর গায়ের রঙ ধরা পড়ে না। বি.এ. পাস করার পরেই তার বাবা এক বড় ঘরে মেয়ে দেবার আশায় ওর একখানা ছবি পাঠিয়েছিল পাত্রপক্ষের কাছে। ছবি দেখেই পাত্রপক্ষ সাগ্রহে এগিয়ে এসেছিল মেয়ে দেখতে। কিন্তু রঙ দেখে ফিরে গেছে। মোটামুটি ফর্সা হলেও হয়ত আটকাতো না, কিন্তু রমাকে ঠিক মোটামুটি ফর্সাও কেউ বলবে না।

কিন্তু গর্ব করার কত রমার গুণও একটু ছিল। খুব সুন্দর থিয়েটার করত স্কুল আর কলেজে পড়তে। মেয়ে-কলেজের সেই থিয়েটার দেখে অনেক ছেলে অনেক রূপসী মেয়ের থেকেও তার দিকে বেশি ঝুঁকত। ওর বাবা কোন ফার্মের বাঁধা মাইনের কমার্সিয়াল আর্টিস্ট হলেও আর্টিস্ট তো বটেন। উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। মেয়ের এই সখে বাধা দেননি কখনো। এম.এ পড়ার সময়ও কি এক ব্যাপারে পাড়ার মেয়েরা মিলে থিয়েটার করেছিল। রমা মিত্র তার নায়িকা এবং সর্বাধিনায়িকা। সেই যশের দু'দুটো অ্যামেচার থিয়েটার দলের ভদ্রলোকেরা ওর বাবাকে পর্যন্ত ধরে পড়েছিল, মেয়েকে থিয়েটার করতে দিতে হবে। নিরুপায় ভালমানুস বাবা মেয়ের কাছেই পাঠিয়ে-ছিলেন তাদের। রমা তাদের তাড়িয়েছে।

যাক, ওটা জীবনের ক্ষেত্র নয়—অন্য সব ক্ষেত্রেই রমা মিত্র নিজেকে অতি সাধারণের ঊর্ধ্বে ভাবত না কখনো। আর তার এই মাধুর্যটুকুই কারো কারো চোখে পড়ত, মনেও বোধহয় ধরত। বিশেষ করে চোখে পড়েছিল আর মনে ধরেছিল প্রশান্তর।

এই প্রেমে পড়া এমন কি তার পরিণতিও অনেকটা ছকে বাঁধা মামুলি ব্যাপার। হাজারগণ্ডা ছেলে-মেয়ে হামেশাই এ-রকম প্রেমে পড়ে থাকে। মিলন অথবা বিচ্ছেদের পরিণামে সচরাচর সে-রকম কিছু বৈচিত্র্যও চোখে পড়ে না। কিন্তু যে ছেলেটা আর যে মেয়েটা সেই মামুলি প্রেমে পড়ে, তাদের চোখে এখন দুনিয়ার রঙ আলাদা।

রমা যখন বিয়ে পড়ে তখন পরিচয়। পরিচয়ের রাস্তাটাও চিরাচরিত এবং সাজানো। রমার সহপাঠিনী সুমিতার মাসতুতো দাদা প্রশান্ত। সেখানেই দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ। প্রশান্ত তখন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। অবকাশ কম। কিন্তু ছুটিছাঁটায় বাড়ি এলে প্রায়ই তাকে সুমিতার ওখানে দেখা যায়। একদিন সুমিতাই প্রশান্তর মার কাছে বাড়ি আসার

টানের কারণটা বমার কাছে ফাঁস করে দিল। বলল, প্রশান্তদা কলকাতায় এলেই ঘন ঘন আমাদের বাড়ি আসে কেন জানিস? তোর জন্য। তোকে ভালো লাগে।

সেই প্রথম বমা দু'চোখ বড় বড় করে শুনল একটা ছেলের তাকে ভালো লাগে, আর সেই জন্যে সে তার মাসির বাড়ি আসে। ভালো লাগার কারণটাই খুব বিচিত্র লাগল তার। মেয়ে কলেজের চিত্রাঙ্গদা নাটক দেখার পর থেকেই নাকি এই ভালো লাগার সূত্রপাত। বমা যখন চিত্রাঙ্গদা করেছিল তখন ফার্স্ট ইয়ার ছাড়িয়ে সবে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে। তখন নাচতেও পারত ভালো। চিত্রাঙ্গদা করে দুই একটা মেডেল-টেডেল পেয়েছিল বটে, কিন্তু কোন ছেলের মনে এই গোছের ছাপ ফেলতে পেরেছে সেটা কল্পনাও করেনি।

এর পর থেকে বলা বাহুল্য সুমিতার প্রশান্তদাকে সে একটু বিশেষ দৃষ্টিতেই দেখতে লাগল। পড়াশুনায় বমা সাদামাটা ছাত্রী, কিন্তু সুমিতার প্রশান্তদা শুনল স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে। এনজিনিয়ারিং-এও প্রতি বছর ফার্স্ট হচ্ছে। বমার মনে তাইতে সঙ্কোচ একটু। কিন্তু পরু কাঁচের ওধারে প্রশান্তর চোখ দুটো যখন ঘুরে ফিরে তার দিকেই আটকে থাকত আর ঠোঁটের ফাঁকে একটু দুষ্টু-দুষ্টু হাসি লেগে থাকত—বমার তখন ছেলেমানুষই লাগত তাকে।

বমা যেবার বি.এ. পাস করল, প্রশান্ত সেবার এনজিনিয়ারিং পাস করে বেরুল। পাস করার সঙ্গে সঙ্গে ভালো মাইনের চাকরি। একে কৃতী ছেলে, তায় মুরুব্বির জোর আছে। তার বড়দাও আধা-প্রবীণ এনজিনিয়ার—বম্বের এক নামজাদা ডিজাইন অ্যাণ্ড কনস্ট্রাকশন ফার্মে মস্ত চাকরি করে। তার সুপারিশে তাদের কলকাতার শাখায় বহাল হয়ে গেল সে। প্রশান্ত খুঁতখুঁত করেও বাপের হুকুম অমান্য করতে পারল না। তার ভয়ানক ইচ্ছে ছিল বিলেতে গিয়ে আরো কিছু ডিগ্রি-টিগ্রি পকেটস্থ হবার পর কর্ম-জীবন শুরু করে। কিন্তু বাপের ইচ্ছেটাই তাদের পরিবারে সব। তার বাবা জবরদস্ত পুলিস-অফিসার ছিলেন। অনেককাল রিটায়ার করেছেন। কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের পুলিসী মেজাজ এখনো অক্ষুণ্ন আছে। সেই বাপ হুকুম করল—দাদা যা ব্যবস্থা করেছে তাই করো, চাকরিতে ঢোকো।

ছেলে মুখ সেলাই করে চাকরিতে ঢুকেছে।

প্রেমে হাবুডুবু অবস্থা নয় তাদের তখনো। আলাপ বেশ ঘনীভূত হয়েছে এই পর্যন্ত। আর তার ফলে প্রশান্তকে ভালো লাগতে শুরু করেছে এই পর্যন্ত। কিন্তু সুমিতার মুখে তাদের বনেদী বাড়ির কর্তাটির দাপটের কথা যা শোনে তাতে বমার ভয়ই করে। তবু সেই ভদ্রলোক ছেলের বিলেত যাওয়া বন্ধ করল বলে মনে মনে খুশিই হল। নিজের মনেই বলেছে, বেশ হয়েছে, বিলেত গিয়ে ছেলে একেবারে লাটসাহেব বনে আসবে।

প্রেমে হাবুডুবু অবস্থাটা দাড়াল বমার এম-এ পড়ার দুটি বছরে। প্রায়ই আপিস পালিয়ে প্রশান্ত ছেলেমানুষের মতই য়ুনিভার্সিটির দোরগোড়ায় ওর ছুটির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। গোড়ায় গোড়ায় বমা লজ্জা পেত। ক্লাসসুদ্ধ ছেলে-মেয়ে জেনে ফেলেছে। কিন্তু শেষে এটা সহজ হয়ে গেল। গল্প করতে করতে দু'জনে এসপ্লানেড

পর্যন্ত হাঁটে। রেস্টুরেন্টে খায়। তারপর ট্রামে পাশাপাশি বসে সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফেরে। প্রশান্তর বাড়িতে জানে ছেলের কাজের চাপ, রমার বাড়িতে জানে মেয়ের লাইব্রেরিতে পড়ার চাপ। য়ুনিভার্সিটি আর আপিস পালিয়ে দু'জনে সিনেমাও দেখে মাঝে মাঝে।

রমা বলে, তোমার জন্যে আমি ঠিক ফেল করব, তখন লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারব না।

প্রশান্ত জবাব দেয়, হুঁ, ভারী তো বাংলা পড়া তার আবার ফেল।

রাগ দেখাতে গিয়েও কী মনে পড়তে রমা হেসে ফেলে, কী বললে, ভারী তো বাংলা—বলতে লজ্জা করে না, বাংলায় একটা চিঠি লিখতে সাতটা বানান ভুল হয়, বই পড়ার সঙ্গে শাড়ি পরার বানানের তফাৎ জানে না।

সেদিন সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম করে প্রশান্ত রমাকে চিঠি লিখেছিল, ওমুক-রঙা শাড়িখানা পরে যেন আসে। তাইতেই বানানের বিভ্রাট।

কিন্তু প্রেম-প্রীতির ব্যাপারটা জানাজানি হতে আর বেশি দেরি হল না। প্রশান্তর বাবা সঠিক হদিস পেলেন সুমিতাকে জেরা করে। কার মেয়ে কেমন মেয়ে জানার পর ছেলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তিনি। ওদিকে প্রশান্তর এক দাদার বিয়ে তখনো বাকি, সে সাধারণ চাকরি করে। তার বিয়েটা দিয়ে ফেলে কৃতী এনজিনিয়ার ছেলের জন্য অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা আনার সঙ্কল্প। বড় বড় ঘর থেকে প্রস্তাব আসছেও। তার মধ্যে এ-রকম ছেলেমানুষি ঝরঝরে করার মত নরম মন নয় তার। তাই ছেলেকে ডেকে বেশ কড়া সুরেই হুমকি দিলেন, বাপু হে, তোমার ছোড়দার বিয়েটা হয়ে গেলে তোমার বিয়ে আমিই দেব। ততদিন ঠাণ্ডা মাথায় কাজের উন্নতি যাতে হয় সেই চেষ্টা করো।

বাবার হুমকির খবরটা সেদিনই রমাকে দিল সে। এই গুণটা আছে। নিজের সমস্যাটা দুজনের সমস্যা ভাবে। তাই সব কথাই রমাকে বলে। শোনামাত্র দু'চোখ কপালে—সর্বনাশ! তাহলে?

ঠোঁট উল্টে প্রশান্ত জবাব দিল, সর্বনাশ আবার কি, ও-সব পুলিশী দাপটে দেশের স্বাধীনতা ঠেকানো গেছে?

রমা বলল, দুটো এক হল। তাতেও তো কত লোকে জীবন দিয়েছে।

আমিও তো একজনকে আমার জীবন দিয়েছি।

কী ভালো যে লেগেছিল শুনতে রমাই জানে। সেদিন সন্ধ্যার আড়ালে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কোণের চত্বরে বসে দু'জনে যত কাছাকাছি হয়েছিল এর আগে ততটা আর কখনো হয়নি। সেদিন রাতে ভালো ঘুমুতে পারেনি রমা। দুটো ঠোঁটের সেই ঘন আবেগের স্পর্শ সমস্ত রাত ধরে তার সর্বাঙ্গে আবেশ ছড়িয়েছে আর বিহ্বল করেছে।

এমন অদ্ভুত ছেলেমানুষি প্রস্তাবও করে মানুষটা যে রমা হেসে বাঁচে না। সেদিন ওর বাবার হুমকির প্রসঙ্গেই রমা বলেছিল, কিন্তু আমার বাপু সত্যি কেমন ভয় করছে।

প্রশান্ত তক্ষুনি বলেছিল, আমারও করছে।

তাহলে?

তাহলে চলো পালাই দু'জনে। কিন্তু বাবা যা লোক, ঠিক আবাব ধবে আনবে।

তাহলে?

তাহলে আব এক কাজ কবা যাক। চলো কোন সাধু-সন্ন্যাসীব কাছে যাই, মন্ত্রেব জোবে তাবা বাবাব মন বদলে দিক।

বমা হেসে উঠেছিল। তাবপব বলেছিল, বিযেটা হযে গেলে মন আমিই বদলে দিতে পাবি বোধহয।

প্রশান্ত সাগ্রহে বলে উঠেছিল, তাহলে তাই কবে ফেলি এসো। বেজিস্ট্রি বিযে কবে সোজা বাবাব সামনে গিযে দাঁডাই।

ও বাবা! বমা আঁতকেই উঠেছিল, তোমাব বাবাব সামনে?

এবকম উদ্ভট উদ্ভট অনেক প্রস্তাব কবে সে। কখনো বলে বাডি গিযে মাকে শাসাবে, এ বিযে না দিলে ছাদ থেকে লাফিযে পডবে। কখনো ভাবে মাকে শেখাবে, এ বিযেব জন্য ইষ্টদেবাতব স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছে সেই গোছেব কিছু ভাঁওতা দিযে বাবাকে বশ কবতে।...সেদিন তো এমন মোক্ষম প্ল্যান মাথায গজালো তাব যে আপিস ফেলে বমাদেব বাডিতে এসে হাজিব। বমাব যুনিভার্সিটি ছুটি সেদিন। চুপি চুপি তাকে বাইবে টেনে আনল। সাগ্রহে বলল, তোমাব সাহসে কুলোলে এবাব আব কেউ আটকাতে পাববে না—পাববে?

সত্যি তেমন কিছু আশা কবেছিল বমা। কী কবতে হবে?

দু' তিনদিনেব মধ্যেই দুজনে পালাব আমবা।

এ তো পুবনো প্ল্যান!

আঃ! আগে শুনোই না, তাব কযেকদিনেব মধ্যে কাগজে চিঠি পাঠাব আমবা—মানে ওমুক মেযে আব ছেলে একসঙ্গে আত্মহত্যা কবেছে, ব্যস!

বমাব দু'চোখ বিস্ফারিত। কী বাস, কাগজে খবব পাঠিযে আমবা আত্মহত্যা কবব?

দূব পাগল, আমবা বিযে কবব—সকলে জানবে আমবা আত্মহত্যা কবেছি!

আস্ত পাগল তুমি! আচ্ছা স্কলাবশিপ পেলে কী কবে? অত ভালো এনজিনিযাবিং পাসই বা কবলে কী কবে?

কেন?

উডো খবব কাগজে ছাপবে কেন?

দুজনে একসঙ্গে ছবি তুলে কাগজে পাঠিযে দেব বাইবে থেকে—এই দুজন আত্মহত্যা কবেছে—অন্য লোক খবব পাঠিযেছে।

আত্মহত্যা কবলে আমাদেব বডি যাবে কোথায? পুলিস চুপ কবে বসে থাকবে? আমাদেব টেনে বাব কববে না? তখন আত্মহত্যাই কবতে হবে!

এমন প্ল্যানটাও বাতিল হযে যেতে প্রশান্ত রিমর্ষ। বমা না থাকলে সে যে এতদিন একটা কিছু চমকপ্রদ বিভ্রাট বাঁধিযে বসত তাতে সন্দেহ নেই।

বমা এম.এ. পাশ কবাব পব দুজনেই অনেকখানি বেপবোযা হযে উঠল। ওদিকে প্রশান্তব ছোডদাব বিযে হযে গেছে। তাব বাবা তখন কৃতী ছেলেব বিযেব তোডজোড কবছেন। প্রশান্ত স্পষ্টই তাব মাকে জানিযে দিযেছে বিযে কোথায কববে। তাব ফলে

বাপ আগুন, মাও অসন্তুষ্ট। বাড়িতে অশান্তি। বাবাও ঘোষণা করেছেন, অবাধ্য হলে ছেলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না।

বমা এম.এ. পাস করার পর প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, এবার?

বমা জবাব দিল, এবারে চাকরি।

কী চাকরি? কোথায় চাকরি?

স্কুলে স্কুলে—মাস্টারি ছাড়া আমি কী আর পেতে পারি?

খবরদার।

বা রে, তাহলে কি করব? বাবা আর কতকাল টানবেন?

খপ করে তাকে বাহুতে টেনে প্রশান্ত বলেছে, বাবা কেন, আমি টানব।

বমা হেসে ফেলেও ভ্রূকুটি করেছে—বিয়ের আগেই?

প্রশান্ত ভেবে-চিন্তে বলেছে, না, চোখ-কান বুজে এবারে বিয়েটাই আগে করে ফেলা যাক। কী আর হবে, বাপ মেরে ফেলতে তো আর পারবে না, বড়জোর আলাদা করে দেবে।

কিন্তু বমার মনে সায় দেয় না। কারণ অভিশাপ দিয়ে ঘর বাঁধবো কেমন করে?

ছুটির দিনে বেশ সকাল সকাল এক এক দিকে বেরিয়ে পড়ে দুজনে। কখনো ব্যাণ্ডেল, কখনো কাঁচড়াপাড়া, কখনো বা গঙ্গার বুকে ডিঙি নৌকায়। আর সমস্যার সমাধান কেমন করে হবে তাই ভাবে দুজনে। বিশেষ করে নির্জন বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে দু'জনেরই। সেই নির্জনতার একটা ভাষা আছে। হাত ধরা-ধরি করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে এগোয় দুজনে। গাছের ছায়ায় ঘন হয়ে বসে। দুপুরে পাখির অলস ডাক কান পেতে শোনে। সমস্যা-টমস্যা সব দুজনেরই ভুল হয়ে যায় তখন।

বমা একদিন ঝগড়া টেনে আনে।—তুমি আমাকে ভালোবাস না ছাই, আসলে চিত্রাঙ্গদা পছন্দ তোমার।

তুমি তো চিত্রাঙ্গদা।

আমি বমা। তবে চিত্রাঙ্গদার মত কুৎসিত বটে—

চিত্রাঙ্গদা কুৎসিত?

না তো কি?

তাহলে তুমি একটি অন্ধ, ভেতর দেখতে জানো না।

কথাগুলো যেন কান পেতে আস্বাদন করার মত। বমার অনেকদিন মনে হয়েছে লোকটা এনজিনিয়ার বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কবি। শুধু কবি নয়, একেবারে অবুঝ কবি।

সামনের গাছটার দিকে তাকিয়ে কারাই করল প্রশান্ত। বলল, আমি যদি গাছ হতাম, আর তুমি ওই লতার মত আমার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে, বেশ হত।

বমা তক্ষুনি তার কাঁধে গা ঠেকিয়ে আর একটা হাতে তার গলা বেষ্টন করে বলল, লতা হবার দরকার কী, এই তো জড়িয়ে থাকলাম।

সেদিন ওই ঠাণ্ডা মানুষটাব বক্তে কেন যে অত দোল লাগল বমা জানে না। এবকম তো আগেও হযেছে। আগেও কাছে টেনে নিযেছে। দুই উষ্ণ ঠোঁটেব আবেগ ওব অধবেব বাধা বিচূর্ণ কবেছে। কিন্তু এই দিনেব তৃষ্ণাব মূর্তিটাই অন্যবকম। ওব দেহটা যেন ক্রমে একটা আবিষ্কাবেব বস্তু হযে উঠতে লাগল। নিবিড নিষ্পেষণে সর্বাঙ্গে কী বকম একটা যন্ত্রণাব শিহবণ, বমা যেন কোথা থেকে কোথায হাবিযে যাচ্ছে।

হঠাৎ ওকে দু'হাতে ঠেলে দিযে ধডমড কবে উঠে বসল সে। বিস্রস্ত বসন ঠিক কবতে কবতে ধমকেব সুবে বলে উঠল, এই!

একটা ভূত নামল যেন প্রশান্তব কাঁধ থেকে। আত্মস্থ, বিব্রত।—কি?

বাক্ষুসেপনা কোবো না, সময ফুবিযে গেল নাকি!

কিন্তু শিগগীবিই একটা ধাক্কা খেযে দু'জনেবই মনে হল সময ফুবিযে গেল বুঝি। প্রশান্তব সঙ্গে তাব বাবাব মুখোমুখি একটা সংঘাত হযে গেল এক বডলোকেব বাডিব মেযে দেখতে যাওযা নিযে। খুব বিনীত আব খুব স্পষ্ট ভাবে প্রশান্ত এবাব বাবাকেই জবাব দিযেছে, তাব দেখতে যাওযা সম্ভব নয, এবং কাবোবই না যাওযা ভাল।

প্রাথমিক ঝডটা প্রশান্তব উপব দিযে গেল। তাবপব ভেবেচিন্তে ভদ্রলোক বমাব বাবাকে ডেকে পাঠালেন একদিন। বমাব বাবা এলেন।

প্রশান্তব বাবা ঝাঢমুখে জানতে চাইলেন, মেযেব বিযেতে তিনি কী কবতে পাববেন?

বমাব বাপ জবাব দিলেন, আপনি চাইলে শুধু বিযেই দিতে পাবব, আব কিছু কবাব সঙ্গতি নেই।

তপ্ত বক্রস্ববে প্রশান্তব বাবা বললেন, সেটা কি বেশী আশা কবা হচ্ছে না?

বমাব বাবা জবাব দিলেন, এব মধ্যে আমাব কোন হাত নেই।

আপনাব মেযেকে বোঝাবাব হাত বা দায আমাব?

আপনাব ছেলেকে বোঝাবাব হাত বা দায আপনাব।

নিঃস্ব লোকেব এই উক্তিতে প্রশান্তব বাবা অপমানিত বোধ কবলেন। আব আসল অপমানিত মানুষটি নিঃশব্দে উঠে গেলেন।

সব শুনে বমা বাগে জ্বলতে লাগল। বাবা ওব বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নিযে ও-বাডি থেকে ফেবেননি। তবু বাবাব অপমান ওকে মর্মান্তিকভাবে বিঁধল। ঘবে মা নেই—ভাইবোনদেব কাছে বাবা অনেকখানি।

ওদিকে এ ঘটনাব বেশ কিছুদিন আগে থেকেই প্রশান্তব বাবা তৎপব হযে উঠেছিলেন। ছেলেকে কলকাতা থেকে আপাতত সবাতে না পাবলে এ মোহ কাটবে না, তাই বোম্বেতে বড ছেলেব সঙ্গে এ নিযে চিঠিপত্রেব আদানপ্রদান চলছিল। বমাব বাবাব সঙ্গে কথা হবাব পনেব দিনেব মধ্যে হেড-অফিস অর্থাৎ বম্বেতে পত্রপাঠ বদলিব অর্ডাব পেল প্রশান্ত। সেটা যে দাদাবই চেষ্টাব ফল, বুঝতে কাবো বাকি থাকল না।

এ খবরও রমা শুনল প্রশান্তর মুখ থেকেই। শোনার পর গুম সে। একটু বাদে বিবস মুখে জিজ্ঞাসা করল, বম্বে যাচ্ছ?

তুমি কী বলো, চাকরি ছেড়ে দেব?

আবার একটু চুপ করে থেকে রমা বলল, না, যাও।

প্রশান্ত অসহিষ্ণু, উতলাও।

তুমি এভাবে কথা বলছ কেন? সব তো জানো, আমার কী দোষ? তাছাড়া এই করে বাবা বা দাদা বা দুনিয়ার কেউ আমাদের আটকাতে পারবে?

পারবে না?

পাগল! এক বছরে হোক, দু বছরে হোক, পাঁচ বছরে হোক—বিয়ে আমাদের হবেই। যতদিন না হয়, আমার প্রতীক্ষায় তুমি থাকবে, তোমার প্রতীক্ষায় আমি থাকব।

সত্যি?

সত্যি।

সত্যি?

সত্যি সত্যি সত্যি। মুখের দিকে চেয়ে থেকে প্রশান্ত বিষণ্ণ মুখে হাসল একটু, কিন্তু আমাকে এখনো তুমি বিশ্বাস করলে না।

বিশ্বাস করলাম না?

প্রশান্ত মাথা নাড়ল, না।

দরদে রমার ভিতরটা ভরে গেল। দু'হাত বাড়িয়ে তার মাথাটা বুকে টেনে আনল। বলল, বিশ্বাস করেছি। তুমি আমার অপেক্ষায় থাকবে, আমিও তোমার প্রতীক্ষায় থাকব।

তিন দিনের মধ্যে প্রশান্ত বম্বে চলে গেল। আর তিন মাসের মধ্যে তার চিঠি পেল লণ্ডনগামী জাহাজ থেকে। সুযোগ পেয়ে চাকরি ছেড়ে সে সাগর পাড়ি দিচ্ছে। রমা যেন প্রতীক্ষায় থাকে।

এই সবই ঘটে গেল রমা এম. এ. পাশ করার ছ'মাসের মধ্যে।

আর আরো দু'মাস বাদে রমার মাথায় বুঝি বাজ পড়ল একটা। খবরটা দিল সুমিতা। তার অনেকদিন বিয়ে হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখা। কথায় কথায় বলল, বিলেত গিয়ে প্রশান্তদা মেম বিয়ে করেছে, শুনেছিস?

রমা চমকে উঠল। তারপর অবিশ্বাস করল। বিশ্বাস করবে কী করে—মাত্র তিন সপ্তাহ আগেও সে প্রশান্তর আবেগভরা চিঠি পেয়েছে। তার এত অবিশ্বাস দেখেই পরে সুমিতা মাসির বাড়ি গিয়ে একখানা ছবি আর মাকে লেখা প্রশান্তর নিজের হাতে লেখা চিঠি নিয়ে এলো। তাদের বাড়িতে নাকি হুলুস্থুল ব্যাপার চলেছে সেই থেকে।

অবিশ্বাসের আর কিছু নেই। এক তরুণী শ্বেতাঙ্গিনীর বাহু বেষ্টন করে প্রশান্ত দাঁড়িয়ে। দু'খানি হাস্যোজ্জ্বল মুখ। চিঠিতে লিখেছে, তোমরা আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না জানি, পারো তো আমাদের আশীর্বাদ করো।

এরপর দিনকয়েক পর্যন্ত রমার মাথায় শুধু আগুন জ্বলেছে।

এদিকে রমার বাবাও কিছু ঝামেলার মধ্যে ছিলেন, বাড়ি ছাড়ার কেস চলছিল বাড়িঅলার সঙ্গে। প্রতিপক্ষ ডিক্রি পেয়েছে, তিনমাসের মধ্যে বাড়ি ছাড়ার হুকুম

হয়েছে। তার মধ্যে মেয়ের এই আঘাত। একমাসের ছুটির দরখাস্ত করে ভদ্রলোক ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। আর তারপর ফিরে এসে অন্যত্র উঠলেন।

ভিতরে ভিতরে যাতনার মত একটা তাগিদ অনুভব করত রমা। সাধারণ মেয়ের অসামান্য হয়ে ওঠার তাগিদ। ভিতরটা যেন একটা জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে উঠছে তার, আর এই তাগিদ বাড়ছে।

আগে স্কুল-মাস্টারির চেষ্টা করছিল, এখন সে চেষ্টা ছেড়ে দিল।

এই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ এক নামজাদা চিত্র-পরিচালকের নামে বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল একটা। নায়িকার ভূমিকার জন্যে একজন শিক্ষিতা অভিনেত্রী চাই। ফোটোসহ আবেদন করতে হবে।

মাথায় একটা ঝোঁকই চাপল রমার। নতুন করে নিজের ছবি তুলিয়ে আবেদন পাঠিয়ে দিল।

অসামান্য হবার যোগ্যতা ছিল রমা মিত্রের। ডাক এসেছে। কথা বলে আর ছাত্রীজীবনের অভিনয়ের মেডেল দেখে পরিচালক খুশি একটু। ট্রায়েল দিয়ে আরো খুশি। চমৎকার ফোটোজনিক মুখ, সুন্দর বয়েস, নাক মুখ চোখ ভালো—তার ওপর অভিনয়ে বুদ্ধিদৃপ্ত সহজ দক্ষতা আছে। আশাতীত পছন্দ হল তার।

রমা মিত্র মরে গেল। ছবিতে এক মালবী মিত্রের আবির্ভাব দেখল সকলে। প্রথম ছবিতে এমন বিপুল বন্দনা কম নায়িকার ভাগ্যেই জুটেছে।

তারপর এই দ'বছরে দিনে দিনে তার আবির্ভাব স্থায়ী হয়েছে, উজ্জ্বলতর হয়েছে। আজ মালবী মিত্র একটা নাম। সে অসামান্যা। তার নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই।

ক'টা ছবির কাজ একসঙ্গে শেষ হতে মালবী একটু হাপ ফেলেছিল। নতুন কোন কোন ছবি হাতে নেওয়া যেতে পারে ভাবছিল। ধরছে তো এসে কতজনই। বম্বে থেকে ডাক এসেছে, তাতেও সাড়া দেবে কিনা চিন্তা করতে হবে।

এমন দিনে প্রশান্ত ঘোষ এসে হাজির। সাবদার হাতে চিরকুট দেখেও নির্বাক খানিক। সেই পুরনো জ্বালা আর অনুভূতিটা নতুন করে আবার মাথার দিকে উঠছে। প্রথমে ভাবল সাবদাকে বলে দেয়, দেখা হবে না বলগে যা। কিন্তু তা বলল না। বলল, এখানে নিয়ে আয়।

নিয়ে এলো। সেই মুখ, সেই পুরু কাচের চশমা, ঠোঁটের ডগায় সেই কাঁচা হাসি। দেখামাত্র রাগে সর্বাঙ্গ চিনচিন করে উঠল ভেতরটা।

প্রশান্ত দু'চোখ ভরে দেখল তাকে খানিক।—কেমন আছ রমা?'

রমা আবার কে, আমি তো মালবী। মালবী মিত্র।

প্রশান্ত হেসে উঠল, কি ফ্যাসাদেই যে ফেলেছিল এই নাম নিয়ে—যাকে সকলে চেনে তাকে কেউ চেনে না। বাইরে থেকে ফিরে এই একটা মাস হন্যে হয়ে খুঁজেছি তোমাকে। শেষে সুমিতার কাছে শুনলাম তুমি এখন উজ্জ্বলতম তারকা মালবী মিত্র। ..বিলেত থেকেও তোমাকে কত যে চিঠি লিখেছি, জবাব না পেয়ে শেষে হাল ছেড়েছি।

...বাড়ি ছেড়েছিল তাই চিঠি পায়নি।। পেলেও জবাব দিত না। চোখে চোখ রেখে মালবী চেয়ে আছে।—একা ফিরেছ না মেম-বউকেও এনেছ?

প্রশান্ত অবাক।—মেম-বউ।

ভিতরটা দাউ দাউ করে জ্বলছে এখন। এমন নির্লজ্জও মানুষ হয়! ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমাদের কাঁধে হাত রাখা যুগল ছবি আমি দেখেছি, আর তোমার মাকে লেখা তোমার সেই চিঠিও আমি পড়েছি।

প্রশান্তর দু'চোখ বিস্ফারিত প্রথম। তারপরেই হা-হা হাসি।—সে-সব তুমিও কি বিশ্বাস করেছ নাকি? কি আশ্চর্য! আমার প্রত্যেকবারের প্লান তুমি বাতিল করেছিলে--তাই বিলেতে গিয়েই বাবাকে জব্দ করার মোক্ষম প্লান ফেঁদেছিলাম। বাবার ওপর আমার তখন দুনিয়ার সব থেকে বেশি রাগ—আর কাঁধে হাত রেখে ছবি তোলার মত অন্তরঙ্গতা ও-দেশে একটু চেষ্টা করলেই হয়।

মুহূর্তের মধ্যে এ কি হল মালবীর? মাথাটা এমন প্রচণ্ডভাবে ঝিমঝিম করে উঠল কেন? তার অস্তিত্ব সুদ্ধ এভাবে নড়েচড়ে উঠল কেন? প্রাণপণে এই কথাগুলো ভণ্ডামী ভাবতে চেষ্টা করল কেন? আর ঘরে এত আলো, অথচ সামনে বাজ্যের অন্ধকার ভিড় করে আসছে কেন?

প্রশান্তও বিস্মিত চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।

প্রাণপণ চেষ্টায় মালবী সামলে নিল নিজেকে।—বিশ্বাস করতে বলছ?

কী আশ্চর্য, আমি বলছি তাও বিশ্বাস করবে না?

মালবী দেখছে তাকে। অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।—তারপর?

তারপর আবার কি, এবারে বিয়ে। বাবা তো আর নেই, আর মায়ের যা অবস্থা, তোমাকে ঘরে আনতে পারলে বাঁচেন।

বসার চেয়ারটা, মাটি, বাড়িঘর যেন দুলছে মালবীর চোখের সামনে। তবু হাসি মুখেই বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু আমি যে অভিনেত্রী হয়েছি!

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশান্ত বলল, কথা যদি রেখে থাকো, মানে আমার জন্যে প্রতীক্ষা যদি করে থাকো, তাহলে আর কোন কিছুতে যায় আসে না।

চেয়ার মাটি ঘর দুয়ার আর একবার বিষম দুলে উঠেছে। তারপর মালবী হেসেছে। নিজের জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট মনে পড়েছে। কাজের চাপে আপাতত মরবার ফুরসৎ নেই বলেছে। বলেছে, মাথায় কোনো কথা ঢুকছেই না এখন। তিন দিন বাদে তাকে আসতে বলেছে। তখন কথা হবে।

কিছু একটা ব্যতিক্রম অনুভব করেই প্রশান্ত লক্ষ্য করেছে তাকে। তারপর তিনদিন বাদে আসবে জানিয়ে উঠে চলে গেছে।

তিনদিনের মধ্যে দু'রাত এক মিনিটের জন্যেও মালবী ঘুমোয়নি। আজ তার পালাবার তাগিদ।

কারণ সে তার মন দিয়ে বুঝেছে, প্রশান্ত এক বর্ণও মিথ্যে বলেনি।

তার কারণ, মালবী তার জন্য প্রতীক্ষা করেনি।. অসামান্য হয়ে ওঠার দুর্বার তাগিদে তার যৌবন-বাস্তবে একাধিক পুরুষের অভ্যর্থনা ঘটে গেছে। মালবী এতটুকু পরোয়া করেনি।

অন্ধকার বিদীর্ণ করে ট্রেন ছুটেছে। আলোয় পৌঁছুবে। কিন্তু মালবী ছুটেছে তেমনি অন্ধকারে নিজেকে মিলিয়ে দেবার তাড়নায়।

রমা মিত্রর ভস্ম থেকে একদিন মালবী মিত্র উঠে এসেছিল। আজ মালবী মিত্র ভস্ম হয়ে গেলেও এ জীবনে আর রমা মিত্রের হদিশ মিলবে না।

যৌবন

দুনিয়াখানা যৌবনের বশ।

এক বুড়ো প্রায়ই আক্ষেপ করত, আর বলো কেন ভায়া, দুনিয়া তার যৌবন যার।

ছেলেবেলায় এই যৌবনটির জন্য ভিতরে ভিতরে একটা লোভনীয় প্রতীক্ষা ছিল। বোধহয় সকলেরই থাকে। কিন্তু সময়ের বেড়া বাঁধা এই রম্য বাগিচায় পা ফেলার পর তার অনেক চটক চোখে পড়ে না। যাই হোক, ওই দুর্লভ গণ্ডীর মধ্যে বিচরণকালে তার মহিমা সম্পর্কে আমি নিজে অন্তত খুব সচেতন ছিলাম না।

ক্রমে প্রৌঢ় ব্যবধানে সরে আসার পর আজ আবার সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, যৌবন চটকদার বস্তু বটে। শুধু তাই নয়, দি ওয়ার্লড ইজ ফর দি ইয়ং—সেই বুড়োর ভাষায়, দুনিয়া তার যৌবন যার।

এক নামজাদা দার্শনিক বলে গেছেন, যৌবন অনেক সময় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, কিন্তু কদাপি ধী-শূন্য নয়। সর্বকৃত্রিমতার ওপর তার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—সে ধোঁকা বা ফাঁকি ধরতে জানে। কিন্তু আজকের বাস্তব দুনিয়ার দার্শনিক এই বাসি প্রসঙ্গ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাবেন কিনা সন্দেহ। তিনি বরং উত্তর-যৌবন সম্পর্কে কিছু দর্শন বচন শোনাতে পারেন। কারণ এ-যুগের এটাই বড় সমস্যা।

কেন?

কারণ দি ওয়ার্লড ইজ ফর দি ইয়ং। যৌবন যার দুনিয়া তার। এতে দ্বিমত কেউ নয়।

অতএব আজকের দার্শনিক বলেন যদি কিছু, যৌবনের বদলে সম্প্রসারিত যৌবনের কথা বলবেন। অর্থাৎ কাল ফুরালেও যে যৌবনের বহিরঙ্গ অনেক কাল পর্যন্ত অটুট রাখা যায়—তার কথা। আর বলবেন বোধ হয় একেবারে উল্টো কথাই। বলবেন, টেনে বাড়ানো এ যৌবন ধী-শূন্য যদিবা, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কদাপি নয়। সর্বকৃত্রিমতা আড়াল করার প্রতি তার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—ধোঁকা আর ফাঁকি তার একমাত্র পুঁজি।

খবরের কাগজে সেদিন একটা কার্টুন দেখে আপনারা অনেকে হাসাহাসি করেছেন জানি।...এক ভিড়ের ট্রাম থেকে একজন মহিলা নেবে যাচ্ছেন, তাঁর চুলের (পরচুলের) বোঝা এক ভদ্রলোকের ছাতায় আটকে আছে, আর ভদ্রলোক তাঁকে চেঁচিয়ে ডাকছেন, ও ম্যাডাম, আপনার সব চুল যে আমার ছাতায় আটকে থাকল, নিয়ে যান, নিয়ে যান।

যাঁবা হেসেছেন তাঁবা হেসেছেন, কিন্তু আমাব ধাবণা, যদি কোনো ম্যাডামের ববাতে অমন দুর্দৈব ঘটেই, তাঁব পুঁজি খোযানোব দুঃখে আজকেব দিনে কাঁদবাব লোকেবও অভাব হবে না।

যাক, আমি কোনো গুরু-গম্ভীব তত্ত্ব বিস্তাবে বসিনি। যৌবন আগলে বাখাব প্রেবণা বা তাড়নাব বহু বিচিত্র নজিব সকলেই হামেশা দেখছেন। অবকাশ সময়ে আমিও দেখি। আমাব দেখাব বঙ্গপট একটি হাল-ফ্যাশনেব চুলছাঁটাব সেলুন। নাম প্রসাধনী। প্রসাধনীব হেড কাবিগব যে, মালিকও সেই। নাম অমল, বযেস এখন তিবিশ-বত্রিশ হবে। চৌকস চটপটে ছেলে। আমি তাকে গত বাবো বছব ধবে দেখছি। তখন বাড়িতে এসে চুল ছেঁটে দিযে যেত। নিজেব উদ্যমে দোকান কবেছে, তাবপব ক'বছবেব মধ্যে সেটাকে এমন ঝকঝকে কবে তুলেছে। আশপাশেব দুটো সেলুন কমপিটিশনে টিকতে না পেবে উঠে গেছে। তাদেব বাছাই-কবা তিনটি কাবিগব প্রসাধনীতে কাজ পেযেছে। অমলেব আশা অদূব ভবিষ্যতে সেলুনটাকে সে এযাব কণ্ডিশন কবে ফেলতে পাববে। আব তাব একটা বড খেদ, এ লাইনে একটিও দিশি মেযে-কাবিগব মেলে না। তাহলে আলাদা একটু পার্টিশন কবে মেযেদেব ব্যবস্থাও বাখত। দোকান জমজমাট হত তাহলে। এ তো আব সাহেব-পাড়াব দোকান নয যে মেযেবা এসে পুরুষ কাবিগববেব হাতে চুলেব বোঝা ছেড়ে দেবে।— মেযেবা না থাকলে কোনো ব্যাপাবই ঠিক কমপ্লিট হয না, কী বলেন সাব?

ওব হাত যেমন চলে, বসালো জিভখানাও তেমনি অবিবাম নড়ে। আমাকে দেখলে আবো বেশি নড়ে। গল্প উপন্যাস লিখি ও জানে। একটু-আধটু পড়ে। তাই দেখামাত্র অন্য খদ্দেবদেব শুনিযে সাদব অভ্যর্থনা জানায। তাবপব সোৎসাহে বলে, আপনাব অমুক লেখাটা পড়ছি স্যাব। ওমুক বইটা খুঁজছি, বা আপনাব ওমুক ছবিটা দেখলাম, হাই ক্লাস।

গোড়ায গোড়ায বিড়ম্বনা বোধ কবতাম, বিবক্তও হতাম। কিন্তু ও সেটাও খুব সহজেই বুঝত। তাই ফাঁক পেলেই গলা খাটো কবে বলত, কিছু মনে কববেন না স্যাব, এবকম বললে আপনাব তো কোনো ক্ষতি হয না, কিন্তু আমাব বড উপকাব হয—কতজন এসে আপনাব কথা জিজ্ঞেস কবে আপনি জানেন না স্যাব।

প্রসাধন-কলা ছেড়ে তোষামোদ-কলাতেও লোকটা যে কম পটু নয, এ বোধহয ওব শত্রুও স্বীকাব কববে।

ওব বচনেব জ্বালায হোক বা ভিড এড়ানোব জন্যে হোক, ইদানীং প্রতি মাসে আমি বাত্রেব নিবিবিলিতে আসি। তখনো যে খদ্দেব একেবাবে থাকে না এমন নয, তবু অপেক্ষাকৃত কমই থাকে। যাই হোক, এখান থেকে মানুষেব যৌবনপ্রীতিব অনেক সকৌতুক নজিব আমি দেখছি। আব এই দেখাটুকু লক্ষ্য কবেই অমল খদ্দেবদেব অনেক মজাদাব কাণ্ডকাবখানা আমাকে শোনায। এই নিযে আমি একবাব একটা হাসিব গল্প লিখেছিলাম। এবপব থেকে ওকে আব পায কে। বসদ যোগাবাব তবল আনন্দে ও আপনা থেকেই মুখব হযে ওঠে।

সেদিন বাত ন'টা নাগাদ গিয়ে দেখি, অমলেব দোবে ঝকঝকে একটা গাড়ি দাঁড়িযে। ভিতবে অমল অপবিমিত মনোযোগ সহকাবে এক সৌখিন ভদ্রলোকেব চুলে

কলপ লাগাচ্ছে। বলতে ভুলে গেছি, সাদা চুল পরিপাটিভাবে তকতকে কালো করাটাও প্রসাধনীর এক বড় আকর্ষণ। অমল বলে, এ কাজে ও স্পেশ্যাল ট্রেনিং নিয়েছে। চুল কালো করার মাশুল দু-টাকার থেকে পাঁচ টাকা—অর্থাৎ খদ্দের বুঝে যেমন আদায় করা যায়। ব্যাপার লক্ষ্য করেছি প্রায় একই, শুধু একটু যত্ন-আত্তি আর তোষামোদের যা তফাত।

ভদ্রলোককে দেখে আর অমলের সতৎপর তন্ময় মনোযোগ দেখে বুঝলাম, পাঁচ টাকার খদ্দের তো বটেই, বেশিও হ'তে পারে। ভদ্রলোকের বয়েস ষাটের কাছাকাছি। মোটামুটি সুপুরুষ। হাতে সোনার ঘড়ি, আঙুলে মুক্তো আর নীলার আংটি, জামায় হীরের বোতাম।

ভদ্রলোকের চুল কতটা সাদা ছিল সঠিক বোঝা গেল না। কারণ কলপ-বিন্যাসপর্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এখন অমল যা করছে সেটা বাড়তি। স্ফীত অঙ্কের কিছু প্রাপ্তির আশা তার। আমাকে দেখেই চোখের ইশারায় একটু অপেক্ষা করতে বলল, এবং অন্য কারিগর আমার দিকে এগিয়ে আসতে ইশারায় তাকেও নিষেধ করল। অর্থাৎ হাত খালি হলে সে নিজেই কাজ ধরবে বুঝলাম, আমাকে শোনানোর মতই কিছু রসদ তার কাছে জমা আছে।

আরো মিনিট দশেকের মধ্যে ওদিকের কেশবিন্যাস শেষ। অমল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পুশ-ডোর ঠেলে দাঁড়িয়ে আরো একটু বাড়তি সম্ভ্রম দেখালো। ভদ্রলোক পকেট থেকে বড়সড় মানি-ব্যাগ বার করতে করতে পুশ-ডোরের ওধারে চলে গেলেন।

দরজা ঠেলে অমল আবার ফিরে আসতে দেখি চাপা খুশিতে তার মুখখানা ডগমগ করছে। হাতের দশটাকার নোটখানা ভাজ করে কাঠের বাক্সে রাখতে রাখতে সামনের দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকালো একবার। তারপর দ্বিতীয় কর্মচারীটিকে বলল, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে, এই রাতে আর কেউ আসবে না, তুমি যাও।

আমার গলায় বুকে কাপড়ের এপ্রন জড়িয়ে চিরুনি কাঁচি হাতে পিছনে এসে দাঁড়াল।—স্যার, এই যে ভদ্রলোকটি চলে গেলেন, চিনলেন?

কাঁচি চলছে, মাথা নাড়ার উপায় নেই, বললাম, না।

—মস্ত লোক, আপনার তো চেনার কথা। জগু দত্ত...থিয়েটার কোম্পানীর মালিক।

নামটা চেনা। ওই রাজ্যের মস্ত লোকই বটে।—তোমার খদ্দের হয়েছেন?

—হ্যাঁ, দু'মাস ধরে। পাকা হাতের কলপ মাসে একবার লাগালেই চলে, কিন্তু উনি পনের দিন অন্তর অন্তর আসছেন—এই দু'মাসে চারবার এলেন।

আমি নিরীহ প্রশ্ন ছুঁড়লাম, কেন, চুল খুব বেশি সাদা?

—সাদাই বটে, তবে ভয়ে আর অশান্তিতে ভেতরটা আরো বেশি সাদা, বুঝলেন?

পরের বিশ মিনিটের মধ্যে বুঝতে আর কিছু বাকি থাকল না। অমল বেশ রসিয়ে সাদা চুলের ভয় আর অশান্তির ব্যাপারটার বিস্তার শুরু করল। তার সারমর্ম: জগু দত্তর বয়েস এখন ষাট ছুঁয়েছে। তাঁর চারটে বাড়ি তিনটে গাড়ি আর অঢেল টাকা। অবস্থাজনিত আনুষঙ্গিক গুণাবলীও আছে। তার মধ্যে একটি সত্যিকারের গুণও অস্বীকার করা যায় না। নিজের একটি ছোট ভাই আছে, নাম সুবল দত্ত—কম করে

কুড়ি বছরের ছোট তাঁর থেকে। এই ভাইটিকে বাপের মত মানুষ করেছেন তিনি, সত্যিই ভালবাসেন তাঁকে। বিষম গোল বাধল প্রিয়বালা আসার পর থেকে।

—প্রিয়বালাকে দেখেছেন নিশ্চয় স্যার। ওঃ। স্টেজে ঢোকে যখন সে তামাম হলখানার হাওয়া বদলে যায়।

দু'মাস হল প্রিয়বালা জগুবাবুর থিয়েটারে যোগ দিয়েছে। পশ্চিমের উটালো মেয়ে, আগে কেউ তাকে কলকাতার কোনো থিয়েটারে দেখেনি। সেই থেকে জগুবাবু অমলের খদ্দের।

ওই প্রিয়বালা জগুবাবুর চোখের মণি। বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিনরাত তার কাছেই পড়ে থাকতেন। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধল গ্রাদরের ছোট ভাই সুবল দত্তকে নিয়ে। সেও প্রিয়বালার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেতে লাগল। ফলে রাগে দুঃখে নিজের মাথার চুল ছেড়েন জগু দও। ষাট বছরের সঙ্গে চল্লিশ বছরের রেষারেষি। ওদিকে উদার হয়ে ভাইটিকে বেশ একটা মোটা অঙ্কের টাকা অনেক আগেই দিয়ে বসেছিলেন। তার বিষ-গাছ গজাচ্ছে এখন। শোনা যাচ্ছে, সেই টাকা দিয়ে সুবল দত্ত প্রিয়বালাকে নিয়ে আলাদা থিয়েটার খুলবে।

—জগু দত্তর বন্দুক আছে স্যার, বুঝলেন। আর তাঁর মাথায়ও রক্ত চড়েই আছে। একবার ভাবেন, ভাইকে গুলী করে মারবেন, আর একবার ভাবেন প্রিয়বালাকে।

...আমার মনে হয়, ওই বন্দুক দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক নিজের মাথারই খুলি ওড়াবেন...কি বলেন স্যার?

আমি কিছু বলিনি। কিছুদিন বাদে ভেবে-চিন্তে আর রাখা-ঢাকা করে একটা মামুলী গল্প লিখেছিলাম। সেই প্রেমের গল্পে ষাট বছরের সঙ্গে চল্লিশ বছরের রেষারেষিতে স্থূল দৃষ্টিতে চল্লিশ বছরকেই জিতিয়ে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে হৃদয়ের দিক থেকে ষাট বছরই অনেক বড় হয়ে উঠেছিল।

গল্পটা অমলের আদৌ পছন্দ হয়নি। সে বলেছে, এটা কি করলেন স্যার, ষাট বছর ওই অভিনেত্রীর জন্য তার চারটে বাড়ি আর তিনটে গাড়ির একটা করে খসালেই তো অনায়াসে তাকে হাতের মুঠোয় পুরতে পারত। আর জগু দত্ত যদি কোনদিন জানতে পারে এই গল্পের খোরাক আমি জুগিয়েছি, আমাকে একেবারে জ্যান্ত পুঁততে চাইবে।

ভাবলাম, ষাট বছর জিতলে ও বোধহয় মোটা রকশিশই পেত তাঁর কাছ থেকে।

মাস দুই পরের কথা। প্রসাধনীতে ঢুকে সেই রাতে বিপরীত গোছের দৃশ্য দেখলাম। অর্থাৎ যেমনটি সচরাচর দেখা যায় না। রাতের নিরিবিলিতে মাথার একরাশ শনের মত সাদা চুল কালো করতে বসেছে নিতান্ত ক্লিষ্ট চেহারার একটি লোক। গায়ের রং রোদে-পোড়া কালচে—কপালের দু'দিকে ফুটে ওঠা নীল শিরা দুটো দূর থেকে দেখা যায়। সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য আর মেহনতের ছাপ। পরনে তেলচিটে খাকি হাফপ্যান্ট, গায়ে বিবর্ণ একটা ফতুয়া। তবু বয়েস যাই হোক, দেহের কাঠামো তেমন শীর্ণ নয়।

এ-হেন মূর্তির মাথার সাদা চুল কালো করার তাগিদটা ভারী অদ্ভুত লাগল। অমল তার ঝাঁকড়া চুলের মাথাটা নিজের দু-হাতের দখলে টেনে এনে গজগজ করে

উঠেছে—স্থিব হযে বসুন, অত ছটফট কবলে কালোব ভেতব দিযে অনেক সাদা চুল দাঁত বাব কবে হাসবে। এই সবব-দৃশ্যে আমাব পদার্পণ।

অমল বিব্রত মুখ কবে বলল, একটু বসুন সাব, ভোলা চা খেতে গেছে, এলো বলে—

ওব হাত জোড়া থাকলে ভোলাই আমাব চুল কেটে থাকে। আমি মাথা নেড়ে অদূবে বসে সকৌতুকে অমলেব ওই খদ্দেবটিকে নিবীক্ষণ কবতে লাগলাম। অমল সেটা লক্ষ্য কবল এবং বাব দুই-তিন আমাব দিকে ফিবে তাকালো। বিবক্তি গিযে তাব চোখেও বেশ সবস কৌতুক নেচে উঠেছে। সাদা চুলেব গোছায হাত চলাতে চালাতে সামনেব আযনা দিযে লোকটাব মুখখানা ভালো কবে দেখছে আব চাপা খুশিতে দাঁতে কবে নিজেব ঠোঁটেব কোণ কামড়াচ্ছে। এবাবেও গল্প আছে কিছু, হাবভাবে অমল যেন সেটাই আমাকে বোঝাতে চাইছে।

ভোলা আসতেই গম্ভীব মুখে অমল তাকে ডাকলো, এই এদিকে আয, এঁব কাজটা ধব—খুব ভালো কবে বানিযে দিবি, চুল দিযে কালো জেল্লা বেবোয যেন—

সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে বলল, কিছু ভাবনা নেই মশায, ও আমাব থেকে অনেক ভালো কাজ কববে—জাপান থেকে চুল কালো কবাব ট্রেনিং নিযে এসেছে।

সংশয-ভবা চোখে লোকটা একবাব ভোলাব দিকে তাকালো শুধু। কোনবকম প্রতিবাদ কবল না।

অমল সোজা এগিযে গিযে লম্বা ঘবেব ওধাবেব কোণেব একেবাবে শেষ চেযাব আব আযনাব সামনে গিযে আমাকে ডাকল, ইদিকে আসুন স্যাব—

উঠে গেলাম। এই ব্যবধান বচনাব উদ্দেশ্য বুঝেও বললাম, ওকে ছেড়ে এলে কেন, ভোলাই তো কাটতে পাবত—

আমাব গলায চাদব জড়াতে জড়াতে অস্ফুট একটা শব্দ বাব কবল গলা দিযে। তাবপব চাপা ব্যঙ্গস্ববে বলল, দু'টাকা বেট, দু'দিন বাতদুপুবে এসে দবকষাকষি কবে আজ দেড় টাকায কাজ সেবে যাচ্ছে।

আমি ফিসফিস কবে বলে উঠলাম, এমন অবস্থায চুল কালো কবাব সখ।

—প্রাণেব দায যে। চুলে ক্লিপ চালিযে খাটো গলায অমল লঘু উচ্ছ্বাস ব্যক্ত কবল, যেখানে মেযেমানুষ সেখানেই গোল, বুঝলেন স্যাব! খুব মজাব ব্যাপাব...আপনাকে বলব বলেই এদিকে নিযে এলাম...কিন্তু লিখতে গেলে এবাবে আপনাব পক্ষেও খুব মুশকিল হবে—

আড়চোখে যতটুকু সম্ভব ঘাড় ফিবিযে একবাব লোকটাব ওধাবেব দিকে তাকালাম। কোনো দিকে হুঁশ নেই, তন্ময় আগ্রহে আযনায নিজেব সাদা চুলেব ওপব ভোলাব হাতেব কসবৎ দেখছে।

চুলে কাঁচি চালাতে চালাতে অমল তেমনি চাপা গলায আব চাপা আনন্দে মজাব ব্যাপাবটা বলে গেল।—লোকটা কলে কাজ কবে, আব বযেস তো দেখতেই পাচ্ছেন। ঘবে একগাদা ছেলেপুলে, নিজেব প্রথম পবিবাব অনেক আগেই খতম হযেছিল। ওব বড় জোযান ছেলেটাকেও মিলে ঢুকিযে তাব বিযে দেবাব চেষ্টায় এগিযেছিল।

কিন্তু ছেলেব জন্য মেযে দেখতে গিযে নিজেবই মুণ্ডু ঘুবে গেল—চালাকি কবে ও-ব্যাটা নিজেই তাকে বিযে কবে বসল। তাবপব থেকেই বিষম ফ্যাসাদ। বাপে-ছেলেয সাপ-বেজিব সম্পর্ক, আব ওই ছেলেব দিকেই বউটাব গোপন টান।

.হবে না তো কি, বউটাকে তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি—প্রথম দিন ওকে দূবে দাঁড কবিযে বেখে আমাব সঙ্গে চুল কালো কবাব দবদস্তুব কবতে এসেছিল। বড ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িযেও বউকে বিশ্বাস কবে না বলেই সঙ্গে এনেছিল নিশ্চয। তখন দেখেছি। কালো পাথবে কোঁদা চেহাবা—সর্বঅঙ্গে স্বাস্থ্য আব ইযে যেন চুইযে পডেছে। এই বুড়ো অমন মেযেমানুষ বশে বাখবে কী কবে।

আমি নীবব শ্রোতা। একটু চুপ কবে থেকে তেমনি খাটো গলায অমল যেন প্রায শ্লেষে কেটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মাবল।— কিন্তু এবাবে লিখলে বুড়োব বদলে আপনি ওই ছোঁড়াটাকে জেতাবেন কী কবে—মা-ছেলে সম্পর্ক যে।

জবাব দিইনি। লেখাবও বাসনা ছিল না।

কিন্তু তা হবাব নয বলেই বোধহয দেড মাস বাদে এই বঙ্গমঞ্চে আবাব এক বাতে এই বুড়োব সঙ্গে দ্বিতীয দফা দেখা। আবো ক্লিষ্ট আবো ঝড়ো মূর্তি। অমলেব হাতে তাব চুল কালো কবাব কাজ চাব ভাগেব তিন ভাগ শেষ।

অতএব ভোলা এসে আমাব মাথা দখল কবল। আব সেই দখল ছাড়াব মিনিটখানেক আগে ট্যাক থেকে সন্তর্পণে খুচবা পযসা গুনে অমলেব হাতে দিযে বুড়ো প্রস্থান কবল।

আমি বাইবে এসে দেখি অদূবেব লাইট-পোস্টেব নীচে দাঁডিযে ফতুযাব পকেট থেকে একটা ক্ষুদে আযনা বাব কবে বুড়োটা নিবিষ্টমনে তাব কালো পালিশ-কবা চকচকে চুল পর্যবেক্ষণ কবছে। ঘবেব অত আলোতে দেখেও সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পাবেনি।

পাশ কাটাতে গিযেও আমি দাঁডিযে গেলাম। গম্ভীব অথচ লঘু বিদ্রূপেব সুবে বলে ফেললাম, চমৎকাব হযেছে, কেউ বুঝতে পাববে না।

অবাক চোখে লোকটা ঘুবে দাঁডালো, তাবপবেই মুখে বোকা-বোকা হাসি।—হ্যা হুজুব তবে বড খবচ।

হুজুব শুনে হোক বা খবচেব কথায বিমর্ষ শুকনো মুখ দেখে হোক, আমি জিজ্ঞাসা কবলাম, তোমাব নাম কী?

—আজ্ঞে কার্তিক দোলুই। এত কাছ থেকে মুখখানা যেন আবো ক্লিষ্ট বিমর্ষ লাগছে। আমাব মনেব অগোচবে কোনো খটকা লেগেছিল কিনা জানি না।—এখানে থাকো কোথায?

—ফুটপাথে।

—আমি অবাক। আব কে থাকে?

—এখানে কেউ থাকে না হুজুব, বউ আব বাল-বাচ্চাবা দেশে থাকে।

সত্যিই খটকা লাগছে।—দেশ কোথায?

আমাকে সদয ভেবেই লোকটাব বিষণ্ণ মুখে কৃতজ্ঞতাব আভাস।—মেদিনীপুব।

—তা অত খবচ কবে পাকা চুল কালো কববাব দবকাব কী?

দুটো গর্তেব কৰুণ দৃষ্টিটা আমাব মুখেব ওপব থমকালো।—কী কবব, পেটেব দায—ভিক্ষে কবতে মন সবে না।

—কেন? কী কবো তুমি?

—আজ্ঞে হুজুব বিকশা টানি।...আমাব সাদা চুল দেখে কেউ আমাব বিকশায উঠেতে চায না, সব জোযানদেব বিকশায ওঠে।

কপালে হাত ঠেকিযে সেলাম কবে লম্বা শ্রান্ত দেহটা টেনে টেনে লোকটা চলে যাচ্ছে। লাইটপোস্টেব নীচে আমি হতভম্বেব মত দাঁড়িযে।

পরনে ঢাকাই শাড়ি

স্বপ্নেব গাছে বাস্তবেব ফল সত্যিই ধবে?

বিজন ঘোষ চৌবঙ্গী এলাকায এসেছিল একটা ওষুধেব খোঁজে। ক'দিন আসবে আসবে কবে সময কবে উঠতে পাবেনি। তাব কর্মক্ষেত্র সুদূব দক্ষিণে' থাকেও সেদিকেই। কিন্তু ওষুধটা আব না কিনেলই নয। সমস্ত দক্ষিণ কলকাতা চষে পায নি। আপিস থেকে একটু আগে বেবিযে এসেছে মধ্যস্থলে।

ওষুধটা পাওযা গেল। ফেবাব বাসেব অপেক্ষায দাঁড়িযে ছিল।

তখনি যোগাযোগ।

একটা কাগজেব প্যাকেট বুকে কবে ফুটপাথ ছেড়ে বাস্তা পাব হবাব তোড়জোড় কবছিল প্রমীতা গুপ্ত। পবিচিত ফ্যালফেলে চাউনিব চেনা-মুখ দেখে দাঁড়িযে গেল। বিস্ময়েব সঙ্গে সঙ্গে বিড়ম্বনাব চকিত কাৰুকার্য একটু। পলকেব দ্বিধা। তাবপব মিষ্টি আব ভাবী অবাক মুখ কবেই প্রমীতা কাছে এগিযে এলো। —তুমি! কী আশ্চর্য!

বিজন ঘোষেব মুখে লাজুক হাসি। কাছে এসে দাঁড়ানোব পব অবাধ্য চোখ দুটো প্রমীতাব মুখেব ওপব থেকে নড়তে চাইছে না। পলকেব দেখাব মধ্যে চৌদ্দ বছবেব অদেখাব একটা দুস্তব সমুদ্র পাড়ি দেবাব বাসনা।

—দেখছ কী এমন কবে, চিনতে পাবছ তো?

বিজন ঘোষেব হাসি-হাসি মুখ, কিন্তু চোখেব তাবা দুটো বড বেশি স্থিব তাব মুখেব পব। মাথা নাড়ল, অর্থাৎ চিনতে অনাযাসেই পেবেছে। বলল, তুমি বাস্তা পাব হতে চেষ্টা কবছিলে দেখছিলাম।

—বলো কি, দেখেও ডাকোনি?..নাকি ডাকতে চাওনি?

—মনে মনে ডাকছিলাম, ভবসা কবে গলাব আশ্রয নিতে পাবিনি।

প্রমীতা হঠাৎ হেসে উঠল। ফর্সা মুখখানা খুশি-খুশি দেখালো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক-নজব দেখল তাকে। পবনেব ধুতিটা পবিষ্কাব, গাযেব মুগা-বঙা পাঞ্জাবিটা আধময়লা—কিন্তু একটু মোটা হযেছে, আব মুখখানাও আগেব থেকে ঢলঢলে হযেছে। বলল, তুমি একেবাবে আগেব মতই আছ দেখছি, কত বছব পবে দেখা বলো তো!

—চৌদ্দ বছর। রামচন্দ্রের বনবাসের কাল।

—এত হিসেবও রেখেছ! উৎফুল্ল মুখে প্রমীতা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তুমি কলকাতায় কবে থেকে? আমি তো শুনেছিলাম পাকাপাকি পশ্চিমবাসী হয়ে গেছ?

—বছরখানেক হল কলকাতাবাসী হয়েছি, বিহারী আপিসের কলকাতায় শাখা-বিস্তার হয়েছে।

প্রমীতা সকৌতুকে তাকালো তার দিকে।—এক বছরের মধ্যে মনে পড়ল না, আমাদের বাড়ির রাস্তাটা ভুলে গেছ বুঝি?

বিজন হাসতে লাগল। হাসিটা মিষ্টি লাগছে প্রমীতার, কিন্তু মুখের ওপর ওই চাউনিটা অস্বস্তিকর। জবাব দিল, ভুলিনি...রবারেরই সাহসের অভাব তো। তাছাড়া ভেবেছিলাম তুমিও ঘর বদলেছ।...কিন্তু কী ব্যাপার, সীমন্তে দাগ দেখছি না যে?

নিমেষে মুখের রঙবদল হল যেন একটু, তারপর হাসি-মাখা দু'চোখ তার চোখের ওপর তুলল প্রমীতা। লোকটার কথাবার্তার ধরনও যেন আগের থেকে তাজা হয়েছে মনে হল। বলল, দাগ ফেলার মত লোক আর এলোই না, তার কী করা যাবে? মুখ আরারও রাঙালো একটু. তাড়াতাড়ি বলল. চলো কোনো ভালো জায়গায় বসে একটু চা বা কফি খাওয়া যাক, তোমার তাড়া নেই তো কিছু?

খুশিমুখে বিজন পকেটে হাত ঢোকালো, দাঁড়াও, পকেটে বরদ কী আছে দেখি—

—দেখতে হবে না, এসো।

স্মিতমুখ দু'জনেরই। পাশাপাশি কোনো বেস্তরার উদ্দেশে এগোলো তারা।

আপিসের হিসের রাখার কাজ করে বিজন ঘোষ। জীবনের হিসেরও ভোলেনি। আর দেখা না হলেও প্রমীতা গুপ্তর খবর রাখে না এমন নয়। কোন এক রে-সরকারী কলেজে প্রোফেসারি করে এই খবর রাখে, সীমন্তে এখনো দাগ পড়েনি এবং পড়ার সম্ভাবনাও বিশেষ নেই—এ-খবরও রাখে। আর চৌরঙ্গিপাড়া থেকে বিলিতি বই কিনে আর পড়ে অবসর সময় কাটায়, হাতের প্যাকেট দেখে অনুমানে সে-খবরটা আজ পেল।

...বিজনের ঊনচল্লিশ চলছে. প্রমীতার বয়েস তাহলে এখন ছত্তিরিশ হবে। দেখায়ও তার থেকে কম নয়, ফর্সা মুখ আগের থেকে আরো ফ্যাকাশে হয়েছে।

আঠারো বছর বয়সে পনের বছরের মেয়ে প্রমীতার প্রেমে পড়েছিল বিজন ঘোষ। ভীরু প্রেম। বাইরের প্রকাশ আরো ভীরু। কিন্তু ভিতরে প্রেমানলের স্রোত।

তার মামাতো বোন শেফালীর সহপাঠিনী ছিল। মামাবাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করত বিজন ঘোষ। সেই সূত্রেই বাড়িতে যাতায়াত আর পরিচয়। শেফালী খানিকটা করুণার চোখে দেখত ভালোমানুষ পিসতুতো দাদাটিকে। প্রমীতার চোখও তার থেকে ওপরে ওঠেনি। গরীর ঘরের মেয়ে শেফালীর সতেরোয় বিয়ে হয়ে গেছে। গল্পের বই যোগান দিয়ে, সিনেমার টিকেট কেটে দিয়ে, আরো অনেক-রকম সরল কৌশলে

প্রমীতাব সঙ্গে যোগাযোগটা অন্তবঙ্গ কবে তুলেছিল বিজন ঘোষ। অন্তবঙ্গতা শুধু তাব দিক থেকেই, প্রমীতাব দিক থেকে সেটা প্রীতি-দাক্ষিণ্যেব বেশি নয়।

ফেল কবাব মত ছাত্র ছিল না বিজন ঘোষ। কিন্তু বযেসযে এক বছব পব এক বছব ফেল কবে কবে এম-এ ক্লাসে উঠে প্রমীতাব সহপাঠী হবাব সৌভাগ্য অর্জন কবেছিল সে। আব খুশিমুখে কৌশলে এই ফেল কবাব উদ্দেশ্যটা প্রমীতাকে জানিযেছিল।

বিস্ময ছাপিযে প্রমীতাব ভ্রকুটি বেশি ঘন হযে উঠেছিল।— তোমাব কি মাথা খাবাপ হযেছে। কেন?

এই কেনব জবাব প্রমীতা যদি নিজেব থেকে বুঝে না নেয, বিজন ঘোষ কী বলতে পাবে।

সিক্সথ ইযাবে উঠে প্রমীতাব বিবক্তিটা প্রায স্পষ্ট হযে উঠেছিল। সর্বদা যদি একটা লোক ছাযাব মত লেগে থাকে, কাঁহাতক ভালো লাগে। বন্ধুবা মুখ টিপে হাসে, সীতা দেবীব ভক্ত হনুমান বলে ওকে নিযে আডালে ঠাট্টা-তামাশাও কবে— প্রমীতা তাকে বলেছেও সে-কথা। কিন্তু বলাব উদ্দেশ্য সফল হত বোঝাবও চেষ্টা যদি থাকত।

ওই সমযেই কোথা থেকে ভালো একটা বিযেব প্রস্তাব এসেছিল তাব, বিজন খববটা জানতে পাবাব পব এই দীর্ঘ ব্যাপাবটাব ছেদ।

আমতা-আমতা কবে শুকনো মুখে বিযেবই প্রস্তাব কবেছিল সে। তখনি নয অবশ্য, এম-এ পাশ কবাব পব, আব ভালো চাকবি জুটিযে যোগ্যতা অর্জনেব পব। সে শুধু ভবিষ্যতেব আশ্বাসটুকু চায।

মুখেব দিকে চেযে কটু কথা বলা দূবে থাক, আশ্বাসটুকু ধূলিসাৎ কবতেও কষ্ট হযেছিল প্রমীতাব। আবাব এবকম সম্ভাবনাব কথা ভাবতেও বাগ হচ্ছিল। খানিক চুপ কবে থেকে জবাব দিযেছিল, মাকে গিযে বলো, এ-সব আমি কিছু জানি না।

প্রমীতা সেদিনই মাকে একটু আভাস দিযে বেখেছিল, ভদ্রভাবে বেশ স্পষ্ট কবেই যেন প্রস্তাবটা নাকচ কবা হয।

প্রমীতাব মা ওই সাদামাটা নিষ্প্রভ ছেলেব দুঃসাহসিক অভিলাষেব কথা শুনে ক্রুদ্ধ হযেছিলেন। প্রস্তাবটা আব তাঁব কাছে ভালো কবে উত্থাপনও কবতে পাবেনি বিজন ঘোষ। তাব আগেই বেশ স্পষ্ট অনুশাসনেব সুবে আব এ-বডি আসতে বা প্রমীতাব ছাযা মাডাতেও নিষেধ কবে দিযেছিলেন তিনি।

কৃতী স্বামী আব চাব-চাবটে কৃতী ছেলেব পব ওই একটিমাত্র মেয়ে তাঁব। বাগ হবাবই কথা।

এব পবদিন থেকে প্রমীতা আব তাকে দেখেনি। যুনিভার্সিটিতেও আসে নি বিজন ঘোষ, অর্থাৎ এম-এ পডা সেখানেই খতম হযেছে। পবে কাব কাছে শুনেছে, এ দেশ ছেডেই চলে গেছে সে, বিহাবে না কোথায চাকবি নিযেছে।

লোকটা দুঃখ পেযে গেল বলে প্রমীতাব অবশ্য কষ্টই হযেছিল, কিন্তু কী আব কবতে পাবে সে।

প্রমীতাব জীবনেও অনেক জল ঘোলা হযেছে এব পব। জামাই বাছতে বাছতে হঠাৎ একদিন চোখ বুজেছেন তাব মা। তাবপব প্রমীতা নিজেও অনেক সম্ভাব্য পাত্র বাতিল কবেছে, আবাব কেউ কেউ তাকেও বাতিল কবেছে। এমনি এক বাতিলেব ব্যাপাব নিযে বীতিমত অপমানকব ব্যাপাব ঘটে যায একটা। বাবাকে আব তাব বিযে নিযে মাথা ঘামাতে নিষেধ কবে প্রমীতা কলেজে চাকবি নিযেছে। বযেস এখন ছত্তিবিশ...চাকবিই কবে যাচ্ছে। ক্লান্তিকব অবকাশ কাটানোব জন্যে মাঝে মাঝে এ-পাড়ায এসে বিলিতি বই কেনে।

জীবনেব এই সীমান্তে এসে বিজন ঘোষেব সঙ্গে দেখা।

একটা ক্যাবিনে মুখোমুখি বসেছে দু'জনে। বয এসে দাঁড়িযেছে। প্রমীতা জিজ্ঞাসা কবল, চা না কফি?

—কফি হোক। অনেকদিন ও বস্তু জিভে ঠেকাইনি।

এই সবলতা কানে বেশ ভালো লাগল প্রমীতাব। হেসে বলল, আব কি?

—আব কিছু না।

বয কফিব অর্ডাব নিযে গেল আব দিযে গেল। কফি তৈবি কবে পেযালা এগিযে দিল প্রমীতা, নিজেবটাও টেনে নিল। সহজ অন্তবঙ্গতাব সুবেই জিজ্ঞাসা কবল, তাবপব, এখানে আছ কোথায?

—সেই দক্ষিণে।

—দক্ষিণে কোথায?

—কেন, যাবে?

আবাবও মুখেব উপব চোখ দুটো বড বেশি স্থিব মনে হল প্রমীতাব। হেসেই জিজ্ঞাসা কবল, কেন, গেলে কাবো আপত্তিব কাবণ হবে?

বিজন হাসছে মৃদু মৃদু—তা হবে না অবশ্য। বাড়ি পনেবোব দুই, ভবেন হালদাব লেন, চারু মার্কেটেব কাছে।

—ঠিক যাব একদিন দেখো, ছুটিব দিনে থাকো তো?

বিজন মাথা নাড়ল, থাকে। ওষুধেব বোতলটাব দিকে চোখ পড়তে প্রমীতা জিজ্ঞাসা কবল, ওষুধ মনে হচ্ছে, কাব?

—মেজ মেযেব। ও-পাড়ায পেলাম না।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রমীতাব মুখখানা নিষ্প্রভ দেখালো-একটু, গলাব স্ববও বদলালো যেন। কিন্তু মুহূর্তেব ব্যতিক্রম মাত্র, তাবপবে হেসেই বলল, সংসাবচিত্রেব প্রথমেই মেযেব অসুখেব খবব দিলে। কী হযেছে?

—পেটে চিনচিনে ব্যথা, প্রাযই ভুগছে, আজও ওষুধটা না নিলে খণ্ড-প্রলযের সম্ভাবনা ছিল।

পবিতুষ্ট মন্তব্যেব মত শোনালো প্রমীতাব কানে। হেসেই জিজ্ঞাসা কবল, ছেলেপুলে কী তোমাব?

—দুই মেযে, এক ছেলে।

—কাব কত বযেস? সত্যিই এই লোকটাব সম্পর্কে জানাব কৌতূহল প্রমীতাব।

—বড মেযে এগাবো, মেজোটা সাডে আট, ছেলে সাবে ছয।

—বেশ। এবাব বউ কেমন শুনি?

—বিযেব পব একবছব পর্যন্ত বউ ছিল, এখন তিনি কর্ত্রী—আমাব পোজিশন ছেলে-মেযেদেব থেকে খুব বেশি ওপবে নয। নিজেও কিছু উপার্জন কবে বলে আমাকেও প্রায অকর্মণ্য পোষ্য ভাবে।

—চাকবিও কবে তাহলে। লেখা-পডা জানা বলো...কী চাকবি?

—মাস্টাবী। তবে তোমাব মত বডদবেব নয, ছোটদবেব। দিনেব বেলায স্কুলেব মেযেদেব ওপব, বাত্রিতে আমাদেব ওপব।

প্রমীতা লক্ষ্য কবছে, মুখখানা আগেব থেকে সত্যিই অনেক ঢলঢলে হযেছে, আব প্রকাবান্তবে যতই বউযেব নিন্দাব আভাস ফোটাতে চেষ্টা কবুক, কথাবার্তায আসলে বেশ একটা সহজ পবিতৃপ্তিব আমেজ বযেছে।

হেসে ছদ্ম ভ্রূকুটি কবল প্রমীতা, বিচ্ছিবি কথাবার্তা হযেছে তো তোমাব। দাঁডাও, বাডি গিযে যা-যা বলেছ, বউকে বলে দেব সব।

—বোলো। বিশ্বাস কবলে আমাকে ধোলাই কবতে নিশ্চয ছাডবে না, কিন্তু তোমাব মত এমন পবিচিত একজনও আছে আমাব, চাক্ষুষ সে-প্রমাণ পেলে মনে মনে একটু সম্মানও অন্তত নিশ্চয কববে—আমাব কপালে এ বস্তুটি দিনকে দিন দুর্লভ হযে উঠছে।

চাকমার্কেট ছডিযে, ট্রামডিপো ছাডিযে, আবো আধমাইল পথ পাযে হেঁটে অন্ধকাব গলিব ভিতব দিযে ঠাওব কবে এগিযে এসে জীর্ণ বদ্ধ দবজাব তালা খুলল বিজন ঘোষ। নিঃশব্দ হাসিটা সমস্ত মুখে ছডিযে আছে।

...বগলেব ওষুধটা নিজেবই, পেটেব চিনচিনে ব্যথাটাও নিজেবই। কিন্তু ওষুধটা না কিনলেও হত, ব্যথাটা বোধ হয সেবেই গেল। প্রমীতা কোন দিনও আব তাব ঘবে আসবে না। এলেও চাকমার্কেটেব সামনে পনেবোব দুই ভবেন হালদাব লেনেব অস্তিত্ব কোথাও আছে কিনা বিজন ঘোষ জানে না।

অন্ধকাবশূন্য ঘবে তাব নিঃশব্দ হাসিটা গাল বেযে প্রায কানেব দিকে ছডাচ্ছে এখন। কলকাতায এসে এই দেড বছব ধবে এই গোছেবই একটা স্বপ্ন দেখেছিল যেন। স্বপ্নেব গাছে বাস্তবেব ফল সত্যিই ধবে?

বিজন ঘোষও হবিপদ কেবানীদেবই একজন। এই শূন্যঘবে যে মানসীব আনাগোনা, তাবও পবনে ঢাকাই শাডি, কপালে সিঁদুব...।

বিজন ঘোষ কোনদিন তাব অস্তিত্ব টেব না পেলেও প্রমীতা গুণ্ড পাচ্ছে।

আহুতি

সোমনাথ চাটুজ্যেব কাছে আজও একে একে পাঁচ-ছ' দফা লোক এলো। প্রত্যেকেব কাঁধেব ঝোলায বিশ-পঁচিশখানা কবে বই। বইগুলো তাবা সোমনাথবাবুকে বুঝিযে

দিযে বখশিশ নিযে চলে গেল। সোমনাথবাবুব থমথমে মুখ। বাডিব চাকব সে বইগুলো তাঁব নির্দেশে ভিতবে নিযে গেল। ভিতবে মানে বান্নাঘবেব সামনে ঢিবি কবে বাখাল সেগুলো।

তিনদিন ধবে বাডিতে লোকে বড তাজ্জবকাণ্ড দেখছে কর্তাব। বাডিব লোক বলতে এখন ঠাকুব-চাকব, সোমনাথবাবুব গৃহিণী আব ছোট মেযে সুলেখা। আবো একটি জীব আছে, প্রভুব কাণ্ড দেখে সেও কম অবাক হবে না। সে কোন লোক নয, সোমনাথবাবুব অ্যালসেসিযান 'উলফ'। সব দেখেশুনে বগ-চটা এই জীবটিও হকচকিযে গেছে।

সব থেকে বেশি হতভম্ব সোমনাথবাবুব স্ত্রী শশীবানী। ডাক্তাব ডাকাব কথা কদিনই ভাবছেন। একটা ফোন কবলেই ডাক্তাব এসে পডবে, কিন্তু শশীবানী ভবসা কবে তাও ডাকতে পাবছেন না। ডাক্তাব এলে এই মানুষ আবাব কোন মূর্তি ধববে কে জানে।

সোমনাথবাবু হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু কদিনেব এই মুখ দেখলে কেউ বলবে না মানুষটা হাসতে জানে।

সোমনাথ চাটুজ্যে তেমনি গম্ভীবমুখে উঠলেন। চাকব যেখানে বইযেব ঢিবি কবেছে, পাযে পাযে সেখানে এলেন। বইগুলো দেখলেন একটু চেযে। ঝকঝকে বই, নতুনেব গন্ধ লেগে আছে।

—কটা এলো?

চাকব তাডাতাডি এগিযে এসে বলল, আজও একশ ত্রিশ—

পুবনো চৌকস চাকব। তাব হিসেবে বিশ্বাস কবা যায।

বললেন, বোস, আবো খান-বিশ-পঁচিশ আসবে।

...প্রথম দিন আনা হযেছিল পঁচাত্তবখানা। দ্বিতীয দিনে একশ দশ। তৃতীয দিনে একশ পঁচিশ। আজ আসবে কম কবে একশ পঞ্চাশ। মনে মনে একটু হিসেব কবে নিলেন সোমনাথবাবু। মোট দাঁডাল চাবশ পঞ্চাশ।...আবো দেডশ কিনলে এ-যাত্রাব কাজ শেষ।

ভিন্ন ভিন্ন বই নয। একই বইযেব কপি সব। উপন্যাস। নাম—'অনুবাগ চক্র'। এই বইযেব ঢিবিব সবগুলোই 'অনুবাগ চক্র'। আজ চাবদিন ধবে থাকে-থাকে খেপে খেপে কেবল 'অনুবাগ চক্র'ই আসছে সোমনাথবাবুব বাডিতে। আবো দেডশ এই বই-ই আসবে।

উপন্যাসখানাব দাম আট টাকা। মোট ছ'শ বই যদি কিনতে পাবেন সোমনাথবাবু, তাহলে দাম দাঁডাল চাব হাজাব আটশ টাকা। বই যাদেব দিযে কেনানো হচ্ছে তাদেব মাবফত কমিশন পাওযা যাচ্ছে পঁচিশ পাবসেণ্ট। তাব মানে বাবোশ' টাকা বাদ; তাহলে খবচা দাঁডাল তিন হাজাব ছশো। এ ছাডা ওই লোকগুলোকে—যাবা বই কিনে আনছে —তাদেব বখশিশ দিতে হচ্ছে প্রত্যেককে দশটাকা কবে।

যে দেডশ বই আবো আসবে তাব দাম বাদ বাকি সব টাকা সোমনাথবাবু দিযেই দিযেছেন।

এ বই অর্থাৎ 'অনুবাগ চক্র'ব লেখক সোমনাথ চাটুজ্যে নিজেই।

হ্যাঁ, এই চারদিন ধরে বিভিন্ন লোক মারফৎ নিজের বই-ই কিনে চলেছেন তিনি। কালকের মধ্যে নতুন-চার-পাঁচজনকে দোকানে পাঠিয়ে আরো দেড়শ অন্তত কিনবেন।

বাইরে পরিচিত গলার হাঁক শোনা গেল। কার গলা চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা বিব্রত এবং বিবক্ত। যাঁর পদার্পণ তিনি যে আসবেনই জানা কথা। ওই ভদ্রলোকের হন্তদন্ত হয়ে আসার মত একটা অস্ত্র সোমনাথ চাটুজ্যেই নিক্ষেপ করেছেন। তবু বিব্রত, তবু বিরক্ত।

বাইরের ঘরে চেনা-গলার হাঁক শুনে আড়াল থেকে মনে মনে আশান্বিত কেউ যদি হয়ে থাকেন, তিনি শশীরানী। অন্যদিন হলে খুশিমুখে তিনিই বেরিয়ে আসতেন। আজ পারলেন না। আজ সঙ্কোচ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আশা, ঘরের মানুষের এই মতির কিছু হদিশ মিলতে পারে এবার।

গাড়ি হাঁকড়ে যিনি এসে হাজির হয়েছেন তাঁর নাম বিজয় ঘোষ। বাংলা দেশের এক নামজাদা প্রকাশক। তাঁর অনুগ্রহ সরস্বতীর দপ্তরে প্রবেশের ছাড়পত্রের সামিল। অনেক মাঝারি লেখককেও প্রচারের মাধ্যমে প্রথম সারিতে এনে হাজির করেছেন তিনি, এ-দেশের লেখককুল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সোমানাথ চাটুজ্যের সম্পর্কে আজ অন্তত ঠিক একথা খাটে না। তিনি মাঝারি নন। একেবারে সামনের সারির একজন। বিজয় ঘোষের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্ব এখন অপর লেখক এবং প্রকাশকের চোখ টাটানোর মতো ফলপ্রসূ—এই শুধু বলা যেতে পারে।

সোমনাথ চাটুজ্যে বাইরের ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিজয় ঘোষ গলায় কাপড়ের খুঁটটা জড়িয়ে নিয়ে দু'হাত জোড় করল।—কী অপরাধ বলো।

মিনমিন করে সোমনাথবাবু জবাব দিলেন, অপরাধ আবার কি, বোসো..।

গম্ভীর মুখে আসন নিয়ে বিজয় ঘোষ পকেট থেকে একটা বেজেস্থি খাম বার করলেন।—আমি কি বিশ্বাস করব, এটা তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ?

সোমনাথবাবু তেমনি মিনমিন করেই জবাব দিয়েছিলেন, হ্যাঁ ভাই .পাঠাতে হ'ল। বিজয় ঘোষের গোল মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির হল একটু।

—তোমাকে কে কী বলেছে?

—কেউ কিছু বলেনি।

—আমার থেকে কেউ বেশি টাকার টোপ ফেলেছে?

—না।

—আমি বাইশশ' ছেপে দু'চার হাজার ছেপেছি, এ-রকম রিপোর্ট কেউ দিয়েছে তোমাকে?

—না।

—সেদিন যখন তুমি আমাকে টেলিফোন করেছিলে, আমি জানিয়েছিলাম দেড়মাসে দেড়হাজারের বেশি কপি বিক্রি হয়ে গেছে। হঠাৎ এই চারদিন ধরে বাকি কপিগুলো মুড়িমুড়কির মত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে—আর দেড়শ বইও নেই। তবু আমি ঠিকমত তোমার বই বিক্রি করতে পারছি না—এ-কথা কেউ বলেছে?

—না, সে-সব কিছুই না।

ঈষৎ অসহিষ্ণু অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বিজয় ঘোষ বলে উঠলেন, তাহলে আমার ওপর এই চিঠির বজ্রাঘাত কেন খুলে বলবে তো?...এই কদিনের বিক্রি দেখে বাতারাতি পরের এডিশন ছাপার জন্য আমি একসঙ্গে চারটে প্রেসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলেছি—তার মধ্যে তোমার এই হুকুমজারি, এই বই আমি ছাপতে পারব না।

—ইয়ে, পরে সব তোমাকে বলব'খন।

—এখানো পরে বলবে। তোমার এই চিঠির হুকুমই পাকা তাহলে?

—হুকুম আবার কী, বিশেষ দরকার হয়েছে. তাই।

—কিসের দরকার? টাকার?

—না।

—তাহলে আমাকে ছাড়ার?

সোমনাথ চাটুজ্জে নীরব।

—তা আমাকে ছেড়ে এ বই কাকে দিচ্ছ এখন, কে নিচ্ছে?

সোমনাথবাবু নিরুত্তর।

একটু চুপ করে থেকে বিজয় ঘোষ সখেদে বললেন, তুমি বই তুলে নিচ্ছ সে জন্যে দুঃখ নেই, কী হয়েছে বলছ না বলেই দুঃখ। তার মানে, এমন অপরাধ করেছি যার কোন ক্ষমা পর্যন্ত নেই, কি বলো?

ক্ষমার কথা শুনে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সোমনাথ চাটুজ্যে।

কেন বার বার এসব কথা বলো, অপরাধ কারো যদি হয়ে থাকে এ দুনিয়ায়, আমারই হয়েছে, বুঝলে? বলতে বলতে আরো উত্তেজিত মুখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। জানতে চাও এ বই কাকে দিচ্ছি? কে নিচ্ছে জানতে চাও? হঠাৎ এগিয়ে এসে হাত ধরে টানলেন, এসো, দেখবে এসো—

বিমূঢ় বিজয় ঘোষকে টেনে নিয়ে বারান্দা ছাড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন তিনি।

শশীরানীর আড়াল ঘুচে যেতে তিনিও তটস্থ।

রান্নাঘরে চাকর সেই বড় উনুনটা ধরিয়েছে। সে-ই বইয়ের পাঁজা এক-একটা করে নিয়ে সজোরে টেনে ছিঁড়ে উনুনে দিচ্ছে। এক-একটা করে বই গনগনে উনুনে পুড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বিষম হকচকিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি চাকরকে বাধা দিতে যাচ্ছিলেন বিজয় ঘোষ, নিজেই বাধা পেলেন। সোমনাথবাবু হাত ধরে থামালেন তাকে। বিরস কণ্ঠে বিড়বিড় করে বললেন, আমার হুকুমেই একাজ করছে। বই কাকে দিচ্ছি, কে নিচ্ছে দেখলে? চারদিন ধরে তোমার এত বই বিক্রি হচ্ছে কেন বুঝতে পারলে?

বিজয় ঘোষের দু'চোখ ঠিকরে পড়ার দাখিল। এমন কাণ্ড তিনি এতকালের ব্যবসায়ী জীবনে আর দেখেননি। এই ধ্বংস-যজ্ঞ আর তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তার ওপর বিষম ঘাবড়ে গেছেন তিনি। লেখকের মাথা হঠাৎ সাঙ্ঘাতিক খারাপ হয়ে গেছে, তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। এখন বই পোড়াতে পোড়াতে যদি বইয়ের প্রকাশকের মাথাও এমনি করে উনুনে গোঁজার বোঝ চাপে—তাহলে? মনে

হওযা মাত্র তখনকাব মত ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান কবলেন তিনি। এবপব একেবাবে ডাক্তাব-টাক্তাব নিযে তবে বাড়িতে ঢোকা যেতে পাবে।

মাথা যে সাঙ্ঘাতিক বকমেব খাবাপ হযেছে, শশীবানীবও তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সুখেব সংসাবে কেন এবকম বিপর্যয ঘটে গেল, তা তিনি কিছুটা আঁচ কবতে পাবেন। কিন্তু অনেকটাই দুর্বোধ্য এখনো।

শশীবানী প্রথমে ভেবেছিলেন, ওই হতভাগা ছেলে আব বড মেযেটা মুখে এ ভাবে চুনকালি দিল বলেই মাথাটা খাবাপ হয়ে গেল। মানী লোক, চাবদিকে কত নামডাক—মাথা খাবাপই হবাব কথা। দুঃখে ঘেন্নায আজ কদিন ধবে তাঁব নিজেবই তো বুকেব ভেতবটা হু-হু কবে জ্বলছে।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এব জন্যে ছোটও কম দাযী নয। বাপে আব ওই ছোট মেযেতে সেদিন কি কাণ্ডই ঘটে গেল। দেখেশুনে ভযে-ত্রাসে অস্থিব তিনি। অথচ বলতে গেলে ওই ছোট মেযেই বাপেব একেবাবে চোখেব মণি। তাঁব ছেলে-মেযেদেব মধ্যে বাপেব এত আদব কেউ পাযনি। দুঃখেব সংসাবই তো ছিল এক-সময। একটা মানুষ কলম চালিযে এতবড বাড়ি কববে গাড়ি কববে, এত সম্মান প্রতিপত্তি হবে, একি স্বপ্নেও কখানো ভেবেছিলেন তিনি... ওই ছোট মেযে যেদিন কোলে এলো সেদিনই এক মস্ত সুখবব—কোন সিনেমা কোম্পানী স্বামীব একখানা গল্প কিনেছে, বেশ কযেক হাজাব টাকা ঘবে এসেছে।

সেই থেকে বাপেব কাছে ছোট মেযেব কদব। তাবপব থেকে সত্যিই দিনে দিনে ভাগ্য ফিবেছে আব দেমাকী মেযেব আদব বেড়েছে। অন্য ভাইবোন দুটো এ-জন্যে ওকে হিংসেই কবে মনে মনে, শশীবানী বেশ বুঝতে পাবেন।

আব ওই ছোট মেযেও ছিল বাপ-অন্ত-প্রাণ। ওব বাপেব সম্পর্কে কেউ কখনো একটু বিরূপ কিছু বলেছে কি, বক্ষে নেই। লিখতে থাকলে সামনে ঘুবঘুব কবেছে, কতক্ষণে বাবা লেখা ছেড়ে উঠবে আব ও তখন লেখা গোছগাছ কবে বাখাব নামে ছাপাব আগেই একদফা পড়ে নেবে। সেই মেযে কিনা এত লেখা-পড়া শিখে এম.এ পাস কবে বাপেব সঙ্গে এই ব্যবহাব কবল। সেই ব্যাপাবেব পব থেকেই বাড়িতে এই পাগলেব কাণ্ড চলেছে। মেযে দিনবাত দোতলাব ঘবে বসে থাকলেও, নীচে কী ঘটছে কদিন ধবে সে কি জানে না? সব শোনাব পবেও মেযে সেই আগেব মত গুম হযে বইল তো বইলই। তাব ওপব এই কদিনেব মধ্যে একটা ডাক্তাব পর্যন্ত ডাকল না। এখনো ওব বাগই বেশি। সবক'টা স্বার্থপব, সবক'টা অমানুষ।

সোমনাথ চাটুজ্যেব এক ছেলে দুই মেযে। ছেলে সুদীপ, আব মেযেবা শ্রীলেখা আব সুলেখা। সুদীপ টেনেটুনে বি.এ পাস কবেছিল, তাবপব সেই থেকে ভালো কিছু ব্যবসা কবা যায কিনা তাই নিযে মাথা ঘামিযে চলেছে। চাকবিতে ঘেন্না তাব।

শ্রীলেখা দু'বাব বি.এ. ফেল কবে স্পষ্টই ঘোষণা কবেছে, পড়াটড়া আব তাব দ্বাবা হবে না। কিন্তু সে চৌকস মেযে নয, এমন কথা কেউ বলবে না। সপ্তাহে গোটা তিনেক ইংবেজি বাংলা সিনেমা একটা-দুটো থিযেটাব দেখে, আব কালচাবাল নাটক-টাটক কবে তাব ফুবসত নেই বললেই চলে। ছোট মেযে সুলেখা হাযাব সেকেণ্ডাবিতে

বেশ ভালো বেজাল্ট করেছিল, বি.এ-তেও খুবই ভালো, আর এম. এ-তে তো কথাই নেই—বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস একেবারে। কাগজে যখন ওর ছবি বেরিয়েছিল, তখনকার মেয়ে সে সে-কথাও লেখা ছিল। এখন রিসার্চ করছে, তার জন্যে টাকাও পাচ্ছে।

শ্রীলেখা পড়ে না, একটা বই নিয়ে শুলেই তার ঘুম পায়— যেটুকু পড়া হয়েছে সেটুকুই আবার নতুন করে পড়তে হয়, নইলে কিছুই মনে থাকে না—আর সেই করতে গিয়ে আবার ঘুম। এই কারণে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সোমনাথবাবুর মনে একটা খেদ ছিল। সেটা গেছে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠতে। তারা সকলেই বাপের লেখার ভক্ত। বিশেষ করে ছোট মেয়ের তো কথাই নেই। লাইন মুখস্থ বলে দিতে পারে অনেক বইয়ের। ওর মাকে বলে, বাবার দর্শনতত্ত্বর কত কথা যে আমি পরীক্ষার খাতায় মেরে দিই, ঠিক নেই।

অনেক আধুনিক চটকদার মাসিক আর সাপ্তাহিকপত্র ব্যক্তিগত ইন্টারভিউ নিয়ে লেখক-সমাচার ছাপায়। সেরকম লোক এলে সোমনাথবাবু সুলেখাকে পাঠিয়ে দেন। বলেন, আমার সম্পর্কে আমার থেকেও ও-ই ভালো জানে। বাপের সম্পর্কে ছোট মেয়ের বিবৃতিই ফলাও করে ছাপা হয়।

এমনি একটা ব্যাপারে প্রায় বছরখানেক আগে এই মেয়ের কাছ থেকেই প্রথম আঘাত পান সোমনাথবাবু। সুলেখা সবে এম. এ পরীক্ষা দিয়েছে, তখন নীচের ঘরে এমনি এক কাগজের সম্পাদকের কাছে সুলেখাকে পাঠিয়ে ঘন্টাখানেক বাদে দেখেন, সম্পাদকের কাছে বাপের সম্পর্কে ফলাও করে বলছে শ্রীলেখা। সুলেখা সেখানে নেই। পরে বড় মেয়ের কাছে যা শুনলেন তিনি, প্রায় অবিশ্বাস্য। সম্পাদককে নাকি সুলেখা বলে দিয়েছে, বাবার ইদানীং কালের লেখা সে পড়ে না, অতএব কিছু বলতেও পারবে না। অবাক হয়ে সম্পাদক জিজ্ঞাসা করেছে, কেন? ও জবাব দিয়েছে, ভালো লাগে না। দিদির ভালো লাগে, তাকে ডেকে দিচ্ছি।

শুনে রাগের থেকে সোমনাথবাবু অবাকই হয়েছেন বেশি। এই মেয়েটা যে এত বোকা তিনি কল্পনা করেননি। সাহিত্যে নতুন বাস্তবের বাতাস নিয়ে আসছেন তিনি। সে-বাস্তব অনেক সময় নির্মম, কুৎসিত, নগ্ন। কিন্তু উপায় কি, যে কালের যা। কালের এই রসদ যোগানোর ফল তো সকলেই দেখছে। তাঁর শেষের চার-চারটে বই বাজারে হৈ-হৈ করে বিক্রি হচ্ছে। বিশেষ গোঁড়ামি যাঁদের, তাঁরা সমালোচনার ফুল ফোটাচ্ছে বটে, কিন্তু সাহিত্যে বিপ্লব আনতে হলে সকলকে খুশি করা যায় না। মেজরিটি যে খুশি, বইয়ের বিক্রিই তার প্রমাণ।

তারপর শেষের এই বই—'অনুরাগ চক্র'। বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা বই নিয়ে এত হৈ-চৈ বাংলা দেশে বোধহয় আর কোনো বই নিয়ে হয়নি। গোঁড়ারাও অবশ্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদের কাগজে তারা গালাগাল করেছে। তার উত্তরে সোমনাথবাবু নিজের খাতিরের কাগজে লিখেছেন, জীবনে সুন্দর আছে, কুৎসিত আছে, জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না। কুৎসিতকে অস্বীকার করা মানে জীবনকেই অস্বীকার করা।

এর জবাবে সেই গোঁড়াদের কাগজ ফলাও করে একজনের প্রশ্ন ছেপেছে। প্রশ্ন, সাহিত্যে-যাত্রা বলতে জীবনের কুৎসিত থেকে সুন্দরের দিকে যাত্রা বুঝব, না সুন্দর

থেকে কুৎসিতের দিকে? জীবনের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, না আলো থেকে অন্ধকারের দিকে?

এই প্রশ্ন ফলাও করে ছাপা হয়েছে, তার কারণ ওই প্রশ্ন করেছে সুলেখা চট্টোপাধ্যায়—তাঁর ছোট মেয়ে।

ছাপার অক্ষরে ওই নাম দেখে স্তব্ধ হয়ে ছিলেন সোমনাথ চাটুজ্যে। তারপর জুৎসই একটা জবাব লিখবেন ঠিক করেছিলেন।

কিন্তু সে-অবকাশ পেলেন না। তার আগেই বাড়িতে দ্বিতীয় বিস্ফোট আর এই দ্বিতীয় বিস্ফোটে মাথাই খারাপ হবার দাখিল সোমনাথবাবুর।

প্রথম বিস্ফোট গেছে মাসতিনেক আগে। তখনো 'অনুরাগ চক্র' বেরোয়নি। বড় ছেলে সুদীপ পাড়াতে একটি বড়ঘরের কায়স্থ মেয়েকে নিয়ে ভেগে পড়ল। সেই সঙ্গে বাপের মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা সঙ্গে নিয়েছে। লিখে রেখে গেছে তার বাবাকে, তিনি উদার; অসবর্ণ বিয়ে এখানেই হতে পারত, কিন্তু মেয়ের বাড়ির লোক ভয়ানক গোঁড়া বলেই আপাতত পালাতে হচ্ছে। স্ত্রীর কাছে ছেলেকে যথেচ্ছ গালাগাল করেই ক্ষান্ত হয়েছেন সোমনাথবাবু।

কিন্তু দ্বিতীয় বিস্ফোট তার চতুর্গুণ। বলা নেই, স্ত্রী হঠাৎ এক রাত্রে তার লেখার ঘরে এসে হাউ-মাউ করে কেঁদে পড়লেন। তারপর ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত তিনি।

বড় মেয়ে শ্রীলেখা অন্তঃস্বত্ত্বা। কিছুদিন ধরেই স্ত্রীর সন্দেহ হচ্ছিল। আজ যে করে হোক স্পষ্টই টের পেয়েছেন। আর বেগতিক দেখে শ্রীলেখাও স্বীকার করেছে। বলেছে, সেই ছেলে তাকে বিয়ে করবে, তাই আর দেরী না করে ব্যবস্থা করা দরকার।

মাথার আগুন একরকম জল ঢেলেই নেবাতে হয়েছে সোমনাথবাবুকে। সেও এক কায়স্থের ছেলে। ছোটাছুটি করে আর হয়রানির একশেষ হয়ে দরকারী কাজ আগে সম্পন্ন করেছেন তিনি। সেই ছেলের সঙ্গে মেয়ের চুপিচুপি বিয়ে দিয়ে বিদায় করেছেন তাকে। বাপ তাঁর গলায় গামছা দিয়ে এককাঁড়ি টাকা আদায় করেছে।

ধকল শেষ হতে মাত্র পাঁচ দিন আগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছিলেন তিনি। বিষণ্ণ স্ত্রীকে বলেছিলেন, ছেলে আর বড় মেয়েকে ত্যাগ করলেন তিনি, আর তাদের মুখ দেখবেন না, কোন সম্পর্ক রাখবেন না—তাঁর বাড়ি ঘর টাকাকড়ি সব তাঁর ছোট মেয়ে পাবে—আর কেউ এক কপর্দকও পাবে না।

পাশের ঘর থেকে ছোট মেয়ে সুলেখা সটান তাঁর সামনে এসে হাজির।—কেন পাবে না তারা? কেন তাদের ত্যাগ করবে? তারা কী দোষ করেছে?

প্রশ্ন ছেড়ে মেয়ের এই মূর্তি দেখে সোমনাথবাবু হতভম্ব। শশীরানীও। তীক্ষ্ণ চাপা স্বরে সুলেখা আবার বলে উঠল, জীবনের এই রাস্তায় গড়িয়ে তোমার চোখে এমন কী অন্যায় কাজ করেছে তারা? তারা যা করেছে সে-রকম ঘটনা তোমার এক-একটা বইয়ে অনেকবার করে ঘটেছে—আর শেষের বইটাতে তো কথাই নেই। তোমার অবাধ্য তো কেবল আমি হয়েছি, তাড়াতে যদি হয় আমাকেই তোমার তাড়ানো উচিত।

সোমনাথবাবু নির্বাক। হঠাৎ শশীবানী বলে উঠলেন, তোব কী মাথাখাবাপ হযে গেল, মুখেব ওপব এ-সব কী বলছিস তুই?

—ঠিকই বলছি মা। বাবা না তাডালেও এ বাডিতে আব থাকাব ইচ্ছে নেই আমাব—আমি অন্য জাযগা খুঁজছি। কাব মেযে বলতে পর্যন্ত এক-এক জাযগায লজ্জায পডতে হয আমাকে। সে-কথা থাক, কিন্তু বাবা কী বলে বাগ কবে—এসব কথাই বা বলে কেন?

যেমন এসেছিল, তেমনি এক ঝটকায সুলেখা আবাব নিজেব ঘবে চলে গেল।

এ-ঘবে শশীবানী নির্বাক, বিমূঢ়। আব সোমনাথ চাটুজ্যে বিবর্ণ, চিত্রার্পিত।

তমোঘ্ন

এই পাহাডী মরুবাজ্যে হৃদযেব চাষ নেই। পাহাডগুলো সব অতিকায হাডগোড বাব-কবা পাথবেব স্তূপ। বড বড গাছগুলোব প্রায বাবো মাসই কঙ্কাল-মূর্তি। সন্ধ্যেব আগে পর্যন্ত মাথাব ওপব সূর্য জ্বলে। শুকনো হাঁ-কবা মাটিব বং বাদামী। দূবে মরুভূমি।

এখানে সব থেকে দুর্লভ মানুষেব হৃদয নামে বস্তু।

মানুষগুলো খেতে না পাক, নেশা কবে। এই বস্তুব জন্য ওবা প্রাণ দিতে পাবে, প্রাণ নিতে পাবে।

কিন্তু পুরুষদেব সব থেকে বড নেশা ভাটিখানা বা ঘবেব তৈবি বক্তে-আগুন-ধবানো পচাই নয। তাব থেকেও অনেক বড নেশা আছে।

প্রতিশোধেব নেশা।

চকচকে ছুবিব ফলা বুকে আমূল বিদ্ধ হলে ফিনকি দিযে তাজা বক্তেব ফোযাবা ছোটে যখন, ওদেব সে উল্লাস দেখলে এই সভ্য দুনিযাটাকে বহু শতাব্দী পিছনেব দিকে টেনে নিযে যাওযা চলে।

চিমনলালেব ছেলে বোশনলাল দীর্ঘ তিন বছবে এই একটি নেশাব সাধনায স্তব্ধ হযে আছে।

প্রতিশোধ।

দুটি মৃত্যু চাই তাব। এমন মৃত্যু যা কখনো কেউ কল্পনা কবতে পাবে না। একটা মৃত্যু অন্তত সেই বকম হবে। একটা একটা কবে চোখ উপডে নেবে, একটু একটু কবে গাযেব ছাল ছাডিযে নেবে—আবও অনেক পবে আসবে মৃত্যু।

আব একটা মৃত্যু কেমন হবে, বোশনলাল এখনো স্থিব কবে উঠতে পাবে নি। সেও চমকপ্রদ যে হবে সন্দেহ নেই।

প্রতিশোধেব এই লগ্নকাল উপস্থিত। বোশনলাল হদিস পেযেছে ওদেব। দলেব একজন দূবে চলে গেছল, সে ফিবে এসে হদিস দিযেছে। এখান থেকে দু'শ মাইল দূবে এক ছন্নছাডা গাঁযে বাসা বেঁধেছে ওবা।

খববটা শোনামাত্র শিবায শিবায কী কাণ্ড ঘটে গেছে তা শুধু বোশনলালই জানে। আব অনুমান কবতে পাবে তাব অতি বিশ্বস্ত প্রধান চাবজন সঙ্গী।

দু'শ মাইল আর কতদূব?

বোশনলাল বাপেব মন্ত্রে দীক্ষিত। প্রতিশোধ কী কবে নিতে হয সেটা সে বাবো বছব বযসে স্বচক্ষে দেখেছে।

অবশ্য সেও সেদিন বাপকে ঘৃণা কবত আব ভয কবত। পছন্দ ববং তখন মাকেই কবত। বেশ সুশ্রী ছিল তাব মা।

সেই বাতটা মনে আছে বোশনলালেব।

তাবা থাকত তখন পশ্চিমঘাটেব এক পাদ্রীব আশ্রযে। সেখানকাব কর্মচাবী ছিল তাব দুর্দান্ত বাবা। পাদ্রী জোসেফেব ঘবে থাকত তাব আট বছবেব একটা ফুটফুটে মেযে। হীবা—হীবা জোশেফ। সকলে বলে কুডনো মেযে, অনেকে আডালে বলে জোশেফেবই মেযে। ওই মেযেটাকে মা ভাবী ভালবাসত।

ক'দিন ধবে মাযেব মুখখানা খুব শুকনো দেখছিল বোশনলাল। নিশ্চয বাবাব ভযে। বাবাকে যমেব মত ভয কবত মা।

..সেই একটা বাত। ঘবে মা দাঁডিযেছিল। সেখানে বোশনলাল ছিল আব হীবা ছিল। দেযালে টাঙানো মস্ত একটা ছবি ছিল। ছবিতে খোলাচুল লালচে বঙেব একটা মেমসাহেব, তাব বুকে মাখমেব ডেলাব মত একটা ছেলে। মা সেই দিকে চেযে ছিল। বোশনলাল জিজ্ঞাসা কবেছিল, ওবা কাবা?

বিডবিড কবে মা কী যে জবাব দিযেছিল কিছুই বোঝেনি। বলেছিল, বিশ্বমাযেব কোলে মানবপুত্র বিশ্বশিশু।

না বুঝলেও বোশনলালেব একটা দৃশ্য ভাবতে বেশ ভালো লেগেছিল। সেও একদিন ওই ছবিব বাচ্চাটাব মতো ছোট ছিল, আব তাব মা হযত তখন অমনি তাকে বুকে কবে দাঁডিযে থাকত।

বাবা হঠাৎ ঘবে ঢুকে মা কে ডাকতে এসেছিল। মা চমকে উঠেছিল। বলেছিল, যাবে না।

সেই বাতে বাবাব হ্যাঁচকা টানে ঘুম ভেঙে গেছল। পাশে চোখ যেতেই বোশনলাল ভযে নীল হযে গেছল। মাযেব দেহ বক্তে ভাসছে।

বাবাব সেই মুখেব দিকে চেযে অস্ফুট আর্তনাদও কবতে পাবে নি বোশনলাল। বাবা তাকে তুলে নিযে যে-ঘবে ঢুকেছে সেটা পাদ্রী জোসেফেব ঘব। সেও মৃত। বক্তে ভাসছে। অদূবেব শয্যায হীবা ঘুমিযে। বাবা তাকে তুলে নিযে নিঃশব্দে বেবিযে এসেছে।

তিন-চাবটে বাতেব অন্ধকাবে অন্ধকাবে কোথায কতদূবে চলে এসেছিল জানে না।

যেখানে এসেছিল, সেখানে চেনা-মুখ দেখেছে জনা-কতক। বাবাব বন্ধু। মাঝে মাঝে পাদ্রী জোসেফেব ওখানে এসে বাবাব সঙ্গে দেখা কবত তারা।

একেবাবে অবুঝ নয বোশনলাল তখন। মা আব পাদ্রী জোসেফেব মৃত্যুব কাবণ অনুমান কবতে পাবে। আব একটু বড হবাব পবে স্পষ্টই বুঝেছে।

বোশনলাল ভেবেছিল হীবাকেও বাবা মেবেই ফেলবে। নিজেব মেযে হোক না হোক, হীবাকে খুব ভালবাসত পাদ্রী জোসেফ, আব তাব মা তো ভালবাসতই—অতএব বাবাব বাগ ওব ওপবেও পডবেই ধবে নিযেছিল।

কিন্তু কিছুকাল যেতে দেখা গেল, বাবাব টান তাব থেকেও হীবাব ওপব বেশি। হীবা ওব নামে বাবাব কাছে নালিশ কবলে বাবা ওকে তুলোধুনো কবে, কিন্তু হীরাব নামে নালিশ কবলে কিছুই বলে না।

আট বছব কেটে গেছে। বোশনলালেব বযেস কুডি, হীবাব ষোল।

বাবাব পক্ষপাতিত্বেব দরুন হীবাকে অনেকবাব খুন কবতে সাধ গেছে। কিন্তু এখন আব তা হয না। হীবাকে দেখলে বক্তে এখন অন্য বকমেব নাচন-মাতন শুরু হয। মাথায গ্রাসেব আগুন জ্বলে। হীবা সেটা বুঝতে পাবে। একলা থাকলে বেশি কাছে ঘেঁষে না।

মাথা খাটিযে কৌশলে এক বাতে ওকে পাহাডেব আডালে অন্ধকাবে টেনে নিযে গেছল। বক্তে সবে নেশা লেগেছিল। সবল দুটো বাহুব নিষ্পেষণে হীবা অস্পুট আর্তনাদ কবে উঠেছিল। আব হিংস্র অধবদংশনে বোশনলাল তাকে শাসাচ্ছিল, টু-শব্দ কবলে একেবাবে খুন কবে পাথবেব তলায পুঁতে বেখে চলে যাব।

কিন্তু পবেব মুহূর্তে নিজেবই বক্ত জল। আচমকা আঘাতে চোখেব সামনে মৃত্যুব অন্ধকাব। সেই অন্ধকাব ফুডে তাব বাবা দাঁডিযে।

বোশনলালেব ধাবণা, এই বিশ্বাসঘাতকতা কবেছে সুবযপ্রসাদ। সে-ই হীবাব পিছনে ছাযাব মতো ঘোবে সর্বদা। দুটিতে খুব ভাব, সে-ই কোথাও থেকে দেখে থাকবে। বাবাকে বলে দিযে থাকবে।

তাব খাতায সুবযপ্রসাদেব পবমাযুতে সেদিনই ঢ্যাবা পডে গেছল।

দলে অনেক ছেলেছোকবা এসেছে এখন। সকলেব থেকে অকর্মণ্য ওই চাষীব ছেলে সুবযপ্রসাদ। চিমনলাল দলেব সর্দাব, বোশনলাল তাব ডান হাত। সকলেব ধাবণা, কালে-দিনে বাপেব থেকে দ্বিগুণ দুর্ধর্ষ হবে বোশনলাল, কিন্তু এই ছেলেকেও বাপ সেদিন ক্ষমা কবেনি। তিনদিন তিনবাত ঘবে তালা দিযে ফেলে বেখেছিল। খেতেও দেযনি। খুপবি জানলা দিযে ওই হীবা চুপি চুপি কিছু খাবাব ফেলে না দিলে প্রাণে বাঁচত না।

তাবপব বাবা তাকে বলেছিল, সময হলে হীবাব সঙ্গে আমিই তোব বিযে দেব, কিন্তু তাব আগে ওব গাযে হাত দিলে কেটে দু'খানা কবে ফেলব।

গাযে আব হাত দেযনি। কিন্তু কবে যে বাবাব সময হবে তা ভেবে পাযনি।

আবো দীর্ঘ চাবটে বছব কেটেছে। বোশনলালেব চব্বিশ আব হীবাব কুডি।

চিমনলাল বলেছিল, এ বছবটা কাটলে ছেলেব বিযে দেবে। বোশনলালেব মনে হযেছিল, মাযেব মৃত্যুব বাবো বছব পাব হওযাব অপেক্ষায আছে তাব বাবা। অনেক ব্যাপাবে বাবো বছবেব সংস্কাব মানে তাদেব সমাজেব মানুষ।

কিন্তু বিযে দেওযাব সময বাবাব আব হল না। ছোটখাট বাহাজানি কবতে গেছল কোথায। পাঁজবে গুলি খেযে ফিবল। পরদিন শেষ।

বাতাবাতি চবিত্র বদলে গেল বোশনলালেব। সে দলপতি। তিনদিনেব মধ্যে বাপেব মৃত্যুব মর্মান্তিক প্রতিশোধ নিল। তাবপব দলটাকে নতুন উদ্দীপনায তাজা কবে তুলতে লাগল সে।

হীবাকে বিযে এবছবেব পবেই কববে। বাপেব ইচ্ছেব অসম্মান কববে না।

খবব পেল, সুবযপ্রসাদেব আব দলে থাকাব ইচ্ছে নেই, দেশে ভদ্র জীবনযাপনেব মতলবে আছে সে।

বোশনলালেব আপত্তি ছিল না। বাপেব আমলেও কোনো কাজে লাগেনি, এখনো ওব মত অকর্মণ্য আব কেউ নয। কিন্তু অনুমতি পেযেও কেন যে গেল না, তখন বোঝেনি।

ক'দিন ধবে একটা কানাঘুষা শুনছিল। হীবাব সঙ্গে সুবযপ্রসাদেব ইদানীং ভাব-সাব একটু বেশিই দেখছে সকলে। আত্মপ্রত্যযে ভবপুব বোশনলাল এসব তুচ্ছ ব্যাপাবে মাথা ঘামায না। আব আসলে মেযেটাই বজ্জাত, তাও জানে। যখন-তখন হীবাই ওকে ডাকে। মেযেদেব মন জুগিযে চলাব মতো মবদ ওব দলে এক সুবযপ্রসাদ ছাড়া আব কে আছে।

তবু মেজাজ বিগড়েছিল একদিন। সন্ধ্যাব আবছা অন্ধকাবে একটা নিবিবিলি জাযগায বসে ওদেব দু'জনকে হাসিমসকবা কবতে দেখে মাথা ঠিক বাখতে পাবেনি। তাব হাতেব একটা চড খেযে তিন হাত দূবে ছিটকে পড়েছিল সুবযপ্রসাদ। তাবপব উঠে খবগোশেব মত পালিযেছিল।

হীবা ফুঁসে উঠেছিল, ওকে মাবলে কেন? জবাবে চুলেব মুঠি ধবে তাব মাথাটাও পাথবে বাবকযেক ঠুকে দিযেছিল বোশনলাল।

শিকাবে বেবিযেছিল, দু'দিন বাদে ফিবে দেখে ঘবে হীবা নেই। তাবপব দেখা গেল সুবযপ্রসাদও নিখোঁজ।

এত সাহস দুনিযায কাবো হতে পাবে বোশনলাল কল্পনা কবতে পাবে না।

তাবপব থেকে বোশনলাল ক্ষিপ্ত, উন্মাদ। অনেকবাব বক্তবাঙা হযেছে তাব এই দুটো হাত।

সমস্ত অঞ্চল আঁতি-পাতি কবে খুঁজেছে। সন্দেহবশে কোথা থেকে কোথায ছুটে গেছে ঠিক নেই। সভ্য দুনিযা তাকে পেলেই ধবে ফাঁসিকাঠে ঝোলবে জানে, তবু গেছে।

কিন্তু ওবা যেন বাতাসে মিলিযে গেছে। ক'বছবেব মধ্যে সন্ধান মেলেনি। এই চাব বছবেব মাথায মিলেছে।

বাতেব অন্ধকাবে চাবজন যোগ্য সঙ্গী নিযে একদিন বোশনলাল পা ফেলেছে এই দু'শ মাইল দূবেব এলাকায। তাব চোখে সাদা আগুন, চোযাল দু'টো লোহাব মত শক্ত—

বাতেই খববাখবব নেওযা শেষ।

পবদিন সকালে পুকষেবা সব চলে যাবে চাব মাইল দূবেব হাটে। সুবযপ্রসাদও যাবেই। বোশনলালেব সঙ্গীবা যেমন কবে হোক সেখান থেকে তাকে গাযেব কববে। নিতান্ত না পাবে যদি, সেখানে নৃশংসভাবে হত্যা কববে তাকে।

...আব বোশনলাল একা যাবে হীবাব কাছে। একশ দেড়শ গজ দূবে দূবে ছাড়া ছাড়া বসতি। হীবাব ঘবেব শ'গজ ছাড়িযে কয়েকটা বুড়োবুড়িব ঘব—তাও সে-ঘবে বুড়োবা থাকবে না তখন। তাঁবা হাটে যাবে।

পটভূমি প্রস্তুত।

সমস্ত বাত ঘুম হল না বোশনলালেব। পচাযেব স্রোত জঠবে ঢেলে মাথাব আগুন ঠাণ্ডা কবা গেল না।

কী কববে সে? প্রথমেই হত্যা কববে?

না। তাব বিশ বছব বযস থেকে ভিতবেব যে পশুটা বুভুক্ষু, প্রথমে তাকে ছেড়ে দেবে। হীবাব তখন আশা হবে। তাব নাবীদেহেব লোভে ডুবিযে মানুষটাকে বশীভূত কবা গেল ভাববে। আতঙ্কে ত্রাসে বোবা হযে যাবে পবক্ষণে। চোখ বোজাবও অবকাশ পাবে না, ধাবালো ছোবাটা তাব নবম বুকেব উষ্ণ তাজা বক্তে স্নান কবে উঠবে।

পবদিন।

প্রতীক্ষিত সময এলো।

সঙ্গী চাবজন নির্দেশমত হাটেব দিকে চলে গেল।

বোশনলালও তাব পথে পা বাড়ালো।

দূবে দাঁড়িযে হীবা আব সূবযপ্রসাদেব ঘবটা ভালো কবে দেখল একবাব। তাবপব আস্তে আস্তে কাছে এগিযে এলো।

দবজা ভেতব থেকে বন্ধ। পলকা দবজা, অনাযাসে ধাক্কা দিযে ভেঙে ঢুকতে পাবে। কিন্তু তাব দবকাব হবে না বোধহয।

দবজায বাব-কযেক মৃদু আঘাত কবতে ওদিক থেকে সাড়া মিলল।

কযেক পা পিছিযে এসে বোশনলাল প্রস্তুত হযে দাঁড়াল

দবজা খুলে হীবা বেবিযে এলো।

কিন্তু নিমেষেব মধ্যে চোখেমুখে সমগ্র সত্তায এ কিসেব আচমকা ঝাপটা খেল বোশনলাল? সবকিছু ধাঁধিযে দেবাব মতো, অন্ধ কবে দেবাব মত আলোব ঝাপটা।

পাদ্রী জোসেফেব ঘবেব দেযালেব ছবিব মতো এক অনির্বচনীয বমণী-মূর্তি, কোলে তাব ফুটফুটে ছেলে একটা। মা বলছে, বিশ্বমাযেব কোলে মানবপুত্র বিশ্বশিশু। ..যা দেখে বোশনলালেব ভাবতে ভালো লাগত, সেও একদিন ওই ছবিব বাচ্চাটাব মতো ছোট ছিল, আব তাব মা হযত তখন অমনি তাকে বুকে কবে দাঁড়িযে থাকত।

না, ছবি নয। সামনে হীবা দাঁড়িযে। বুকে তাব দু'-বছবেব ফুটফুটে ছেলে একটা।

তাকে দেখে হীবা চমকে উঠেছিল কিনা, ত্রাসে বিবর্ণ হযেছিল কিনা—ওই আলোব ঝাপটা খেযে বোশনলাল কিছুই লক্ষ্য কবেনি। স্থিব দাঁড়িযে হীবা এখন তাকেই দেখছে। তাব বিভ্রম অনুভব কবছে।

জোসেফেব ঘবেব ছবিব বমণী কখনো কথা বলেনি। এই বমণী বলল।—বাইবে দাঁড়িযে কেন, ভেতবে এসো। সূবযপ্রসাদ হাটে গেছে।

স্থান-কাল ভুলে ফ্যালফ্যাল কবে চেয়েছিল বোশনলাল, দেখছিল। মিষ্টি মৃদু কথা কটা কানে যাওযা মাত্র বিষম চমকে উঠল। নিজেব মাথাব উপব উদ্যত খড়গ দেখলেও কেউ এমন চমকায না বোধহয।

চকিতে আব একবাব শুধু সামনেব জীবন্ত চিত্রটা দেখে নিল। পবক্ষণে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল হাটেব পথ ধবে।

একটু দেবি হযে গেলে চবম সর্বনাশ আব ঠেকানো যাবে না বুঝি।

স্মৃতি যদি ফেরে

কমল গুহ আমাব সহপাঠী ছিল আব প্রতিবেশী ছিল। সেই নবম বযসে দিনেব মধ্যে বেশ কযেক ঘণ্টা ওকে আটকাতে না পাবলে দিনটাই জলো ঠেকত। উঁচু-মধ্যবিত্ত ঘবেব ছেলে। পড়াশুনায আমাদেব পাঁচজনেব থেকে অন্তত ঢেব ভালো। তবু ওব জ্ঞানগম্যি সম্পর্কে আমাদেব ববাববই একটা কৌতুককব সংশয ছিল।

মিষ্টি পাগলাটে ধবণেব ছেলে। ভযানক খামখেযালী। কিন্তু গোঁ আছে—যা ধববে, তা কববে। মফঃস্বল কলেজ ছেড়ে কলকাতায পড়াব সময়ও ওব সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ও ডাক্তাবী পাশ কবাব পব একে একে গুটিপাঁচেক বড ডাক্তাবেব সাকবেদি কবল বছব-দুই পর্যন্ত। কিন্তু কাউকেই পছন্দ হল না। শেষে চোখ-কান বুজে বেশ কেতাদুবস্ত বডঘবেই একটা বিযে কবে বসল। আমবা নেমন্তন্ন খেলাম আব ঈর্ষান্বিত চোখে ওব চকচকে বউটাকে দেখলাম। তাবও মাস-তিনেক বাদে গলায মালা-টালা দিযে একদিন ওকে বোম্বাইযেব ট্রেনে তুলে দিলাম। সেখান থেকে বিলেত যাবে। ও নিজেই এক ফাঁকে বলেছিল, সেখান থেকে আবো গোটাকযেক চটকদাব ছাপ-ছোপ নিযে আসতে পাবলে একসঙ্গে তিন কাজ হবে। নিজেব হিল্লে হবে, বউযেব মান-মর্যাদা বাড়বে আব শ্বশুবেব টাকাব সদগতি হবে।

তাবপব দীর্ঘ দুটো যুগ কেটে গেছে। গঙ্গায অনেক বকমেব ঘোলা জল বযে গেছে। জীবনেব ঘাটে ঘাটে ছড়িযে আমবা এক-একটা বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বেব মহড়া দিযে চলেছি। আমাদেব ভেতব-বাব দুই-ই বদলেছে। দেহেব কাঠমোয বিদাযী মধ্যাহ্নেব ছায়া বেশ স্পষ্ট হযে উঠছে।

কমল বওনা হযে যাবাব বছব-আষ্টেক বাদে এক বন্ধুব মুখে শুনেছিলাম, বিদেশ থেকে ও মস্ত পাগলেব ডাক্তাব হযে, ফিবেছে। লণ্ডনে ছিল, জার্মানীতে ছিল, আমেবিকাযও নাকি কিছুকাল ছিল।

আমি মন্তব্য কবেছিলাম, ও ওব যোগ্য লাইনই বেছে নিযেছে, কিন্তু এবপব বউটাকে ধবে বাখতে পাবলে হয।

বন্ধু প্রতিবাদ কবেছিল, এতবড মনোবিজ্ঞানী—মন বুঝে এখন তো আবো বেশি কষে বাঁধতে পাববে হে।

যুক্তিব কথাই বটে। ফস কবে কেন ওই উক্তি মুখ দিযে বেবিযেছিল নিজেই জানি না। শুনলাম, আট বছবেব মধ্যে সেই প্রথম দেশে ফিবেছে সে। এই দীর্ঘকাল অবশ্যই স্ত্রী-বিবহিত জীবনযাপন কবেনি। বছব-তিনেকেব মধ্যেই বউ আকাশপথে উড়ে গিযে তাব সঙ্গে যুক্ত হযেছে। অসুবিধে আব কী, শ্বশুবেব টাকা ছিলই, তাব ওপব বিদেশেব কৃতী ডাক্তাব হযেছে জামাই, আব তাব বোজগাবেব ভাগ্যও খুলে গেছে। সেই ভাগ্য দিনে দিনে নাকি আবো বিস্তাবলাভ কবেছে। বিদেশে অর্থাৎ লণ্ডনে আব জার্মানীতে বছব-তিনেক ঘবকন্না কবেছে বউ। তাবপব হাঁপ ধবে যেতে পালিযে এসেছে। কমল ফিবেছে তাবও দু'বছব বাদে।

বন্ধুব কাছ থেকে একটা বড হোটেল-সুইটেব ঠিকানা পেযে আমি কমলেব সঙ্গে দেখা কবতে গেছলাম। দেখা হযনি। সে তখন বম্বে না কোথায চলে গেছে।

দেখা কবতে গেছলাম বটে, কিন্তু ভেতব থেকে খুব একটা তাগিদ ছিল না। কাবণ নিজেব তখন লেখক-জীবনেব বহু হতাশা আব অনিশ্চযতায ক্ষতবিক্ষত সংগ্রামী জীবন। এব মধ্যে পবিচিতজনেব দুর্লভ কোনো সাফল্যেব খবব কানে এলে নিজেব ব্যর্থতাব ছাযাটা যেন আবো বেশি ঘন হযে উঠতে চায।

এব বছব-দশেক বাদে হঠাৎ আব এক পুবনো বন্ধুব সঙ্গে দেখা। সে মোটামুটি সফল অ্যাডভোকেট। আমাবো তখন দুর্দিনেব মেঘ অনেকটাই কেটেছে। অতএব পবিচিত সফল মুখ দেখলে আনন্দই হয। দু-পাঁচ কথাব পবেই সে জিজ্ঞাসা কবল, আমাদেব কমল গুহব খবব জানো?

বললাম, মস্ত মেন্টাল সার্জন হযেছে, এই পর্যন্তই জানি। কেন?

—এখানেই তো ছিল কিছুদিন। আমাদেব কোর্টেই ওব বউযেব সঙ্গে মামলাব নিষ্পত্তি হযে গেল। এ ভেবি পিসফুল ডাইভোর্স।

আমি হতভম্ব।—সে কি?

—হ্যাঁ। বউ স্যুট ফাইল কবেছিল, ওব দিক থেকে কোনো বাধা আসেনি।

মস্ত পাগলেব ডাক্তাব হযেছে শুনে আব এক বন্ধুব কাছে দশ বছব আগেই সেই ঠাট্টাটা 'বউটাকে ধবে বাখতে পাবলে হয',—এমন কাকতালীয ভাবে ফলে যাবে আব আমাকেই অপ্রস্তুত কববে, স্বপ্নেও ভাবিনি।

এই ঘটনা শোনাব পব আবো ছ'বছব বাদে অর্থাৎ পাকা দু'যুগ পবে কমল গুহব সঙ্গে আমাব দেখা। আমাদেব তখন ঠিক পঞ্চাশ চল্‌ছে।

দিন-কতকেব অবকাশ পেযে বাংলাদেশেব বাইবে এই ছিমছাম পাহাড়ী জাযগায বেড়াতে এসেছিলাম। কমল গুহ এখানকাব বিবাট পাগলেব হাসপাতালেব সর্বাধিনাযক জানি—যাব যখন তাব সঙ্গেও দেখা কবাব ইচ্ছে ছিলই।

হোটেলে উঠেছিলাম। ঠিক দু'দিন বাদে বিকেলেব দিকে তাব বেসিডেনসিযাল কোযার্টার্সেব চত্ববে ঢুকে পড়লাম। বাড়িব গাযে ওব নামেব শৌখিন নেমপ্লেট, তাব পিছনে একগাদা বিলিতি ডিগ্রী-ডিপ্লোমাব মিছিল। দাঁড়িযে সেগুলো পড়ে নিলাম।

কিন্তু ওব কাছে যাবাব পথ তেমন সুগম নয। অ্যাপযেন্টমেন্ট কবা নেই শুনে দবোযান প্রথমে আমাকে দবজাব কাছেই এগোতে দেবে না। আপনাবজন বলতে

সে স্লিপ নিয়ে যেতে বাজি হল। ছাপানো স্লিপে নামের সঙ্গে ওমুক জায়গার পুরনো বন্ধু তাও লিখে দিলাম। শুধু নামে যদি চিনতে না পেরে দেখা না করে দরোয়ানের কাছে ইজ্জত যাবে।

এতটু পরেই ডাক এলো। দরোয়ান এবারে সেলাম ঠুকে ধুতি-চাদর-পরা এই খাঁটি বাঙালীকেই বলল, যাইয়ে সাব্।

ঘরে ঢুকলাম। এটা ডাক্তারের আবাসিক আপিস-ঘর। মস্ত টেবিলের একদিকের বিভলভিং চেয়ারে বসে আছে কমল গুহ। তার মুখোমুখি চার-পাঁচটা চেয়ার অন্য ভদ্রলোকদের দখলে। কোণের দিকে আলাদা ছোট টেবিলে বসে মৃদু টুকটুক শব্দে টাইপ করে চলেছে সুশ্রী একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে।

আমার দিকে এক-পলক চেয়ে থেকে একটু মাথা নাড়ল কমল গুহ। তারপর ইঙ্গিতে ভদ্রলোকদের পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। পাইপ দাঁতে চেপে অস্ফুট স্বরে বলল, বিজ-ই ফ' ফাইভ মিনিটস ওনলি, উড ইউ মাইণ্ড ?

আমি বোকার মত মাথা নাড়ালাম। কিন্তু সে সেটা দেখলও না বোধহয়। কেতাদুরস্ত কথা কটা বলেই ভদ্রলোকদের সঙ্গে বাক্যালাপে মগ্ন হল। হাসপাতাল-সংক্রান্ত কথা। এঁরা সকলেই এখানকার ডাক্তার বা অফিসার হবেন।

আমি ঠিক এ-রকম অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একটু হাসি, একটু উচ্ছ্বাস না। তাঁদের আলোচনায় পাঁচ মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট গেল, তার মধ্যে চব্বিশ বছর বাদে এককালের অন্তরঙ্গ কেউ এসেছে বলেও আর একবার আমার দিকে ফিরে তাকালো না। হয়ত ভুলেই গেছে। আলোচনা যাদের সঙ্গে হচ্ছে তাদের সকলেই হয়ত বাঙালী, কিন্তু বাংলা কথা একটাও শুনলাম না। হাব-ভাব ছেড়ে কমল গুহর কথাবার্তার আধো-আধো টানগুলোর মধ্যেও পুরোদস্তুর সাহেবিয়ানা।

হয়ত সীরিয়াস আলোচনাই কিছু, কারণ বাজেট ফাইন্যান্স ইত্যাদির বাধা অনেকবার কানে এলো। তবু আমার মনে হতে লাগল, চব্বিশ বছর যখন গেছে বাদবাকি জীবনটাও দেখা না হয়ে কেটে যেতে পারত। আবার সকৌতুকে ওকে দেখছিও আমি। জেনে-শুনে এখানে ওর সামনে এসে না পড়লে কে বলবে সেই কমল গুহ। আধা-গম্ভীর ভারী মুখ, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, দাঁতে মোটা পাইপ, মাথার ঝাঁকড়া চুলের দু-পাশে খানিকটা করে পাকা চুলের বর্ডার।

—ও কে।

সর্বাধিনায়কের ছাড়পত্র পেয়ে ভদ্রলোকদের সবিনয়ে প্রস্থান। আমার নিজের অবস্থানের মেয়াদও দশ-বিশ মিনিটের বেশি হবে আশা করছি না। পাশে যে ভদ্রলোকটি তখনো দাঁড়িয়ে সে বোধহয় সেক্রেটারি। প্রভুর ইঙ্গিতে সেও প্রস্থান করল।

—মিস জোনস।

কোণের টাইপের টেবিল থেকে সুশ্রী মেয়েটি শশব্যস্তে এদিকে ফিরল।—ইয়েস সার ?

—উড ইউ প্লীজ...

অসমাপ্ত বক্তব্য বুঝে সেও টাইপ ফেলে টক-টক দ্রুত শব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কমল গুহ ততক্ষণে উঠে টেবিল ঘুরে আমার সামনে চলে এসেছে।

—ওঠ!

সম্বোধন শুনে কান জুড়লো, তবু ঈষৎ বিস্ময়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে আচমকা দু' হাতে ও আমাকে বেশ জোরেই জাপটে ধরল, আর তারপরেই আমার দু'গালে সশব্দে দুটো চুমু।

—তুই একটা বাসকেল, তুই একটা হতভাগা, তুই একটা ওয়াণ্ডারফুল!

একটু আগে কী চিন্তা করছিলাম ভেবে নিজেই আমি অপ্রস্তুত। হেসে বললাম, তুই পাগলের ডাক্তার হয়েছিস বটে।

হা-হা শব্দে হেসে উঠে সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে দিল। আর তার ফলে ওর ওই পুষ্ট দুটো হাতের খুব কাছে থাকাও নিরাপদ মনে হল না আমার।

এরপর মিনিট পনের ধরে খুশির আলাপ চলল। কবে এসেছি, কোথায় উঠেছি জেনে নিল। হোটেলের নামটা শুনে কী ভাবল একটু।—চল, ওদিকে আমার কাজও আছে একটু।

গাড়ি ও নিজেই ড্রাইভ করে দেখলাম। পাশে বসে পুরনো গল্প করতে করতে চলেছি। একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে মিনিট আট দশের জন্য ও ভিতরে ঢুকে গেল। ফিরে এসে এবারে ড্রাইভ করে সোজা চলে এলো আমার হোটেলে।

এতবড় হোটেলের মালিক তাকে দেখামাত্র হন্তদন্ত হয়ে অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলো। তার দিকে একবার সৌজন্যসূচক মাথা ঝাঁকিয়ে কমল গুহ আমার স্যুটকেস বেডিং মালপত্র যা আছে সব লোক দিয়ে তার গাড়িতে নামিয়ে দিতে বলল। আমাকে বাধা দেবার অবকাশ না দিয়ে হোটেলের মালিক তক্ষুনি ছুটল।

আমি বললাম, এটা কী-রকম হল?

জবাবে ও চোখ পাকালো, তুই একটা হতভাগা বলেছি না?

এবারে আমি নিঃসঙ্কোচ। ওর বাইরের খোলস একেবারে বদলেছে বটে. ভিতরটা সেই চব্বিশ বছর আগের মত তাজা আর কাঁচা আছে।

সন্ধ্যের অনেক আগেই ওর বাড়িতে স্থিতি হয়ে দু'জনে মুখোমুখি চায়ের টেবিলে বসেছি। বসনা পরিতৃপ্তির অঢেল আয়োজন। প্রসন্ন মুখে কমল বলল, তোর একটু অসুবিধেই হবে হয়ত—

আমি মন্তব্য করলাম, অসুবিধের লক্ষণ তো দেখতে পাচ্ছি!

—সে অসুবিধের কথা বলছি না। রমণীবর্জিত আতিথেয়তা তো তোর ভালো না-ও লাগতে পারে।..ভালো কথা, বউয়ের সঙ্গে আমার ডাইভোর্স হয়ে গেছে, জানিস তো?

বিব্রত মুখে মাথা নাড়লাম।

বললাম, হঠাৎ এ-রকম একটা কাণ্ড...

—নাথিং নিউ, যেতে দে। বলছিলাম এখানে একটিও সুন্দর মুখ না দেখে তোর নীরস লাগাই স্বাভাবিক। ফেমিনাইন কার্ভস লুব্রিকেট মনোটনি।

মুখের আগল আগের থেকেও ঢিলে হয়েছে দেখছি। হেসেই জবাব দিলাম, বয়সও তো পঞ্চাশ গড়িয়ে গেল।

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে ও বলে উঠল, তুই কি-রকম ছাপোকা-মার্কা সাহিত্যিক রে!...তাই বা কেন, তোর দুই-একটা বইয়েতেও তো প্রেমের বেপরোয়া কাণ্ডকারখানা দেখি।

এই ব্যস্ততার মধ্যেও পৃথিবী-চষা হোমরাচোমরা ডাক্তার আমাদের বই পড়ে বা পড়ার সময় পায় ভেবে অবাকই লাগল।

দুটো দিন বেশ কেটে গেল। ও যখন ব্যস্ত, আমি তখন হাসপাতাল দেখে বেড়াই। জীবনের রসদ খুঁজি। খোদ-কর্তার অন্তরঙ্গ বন্ধু, বাধা দেবার কেউ নেই।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরে আবার লেখার কথা উঠল। কমল বলে বসল, এদেশে একালের লেখকদের মধ্যে চরিত্র খোঁজার অ্যাডভেঞ্চার নেই—দুনিয়ায় কত কাণ্ড যে ঘটে তারও খবর রাখ না তোমরা।

আমি প্রতিবাদ করলাম, যেটুকু অ্যাডভেঞ্চার করা হয়, তাইতেই তো সমালোচনা হয়—গল্পের গোরু গাছে তুলি আমরা।

ও জবাব দিল, গোরু তুললে আপত্তি কিন্তু মানুষ সত্যি সত্যি বাতাসেও ভাসে, পাতালেও ডোবে। হি অর সী হ্যাজ আ পেয়ার অভ ম্যাজিক উইংস—জাদু পাখা আছে দুটো করে, বুঝলে? দে ওয়ার্ক মিরাকল অ্যাণ্ড ডিভাসটেট ট্যু বিশেষ করে মেয়েদের পাখা—দোজ ইটারন্যাল ইভস।

হেঁয়ালীর মত লাগলেও মনে মনে ধারণা, উক্তিটা এক মেয়ের প্রসঙ্গে,—যে ওর ঘর ভেঙেছে। এ-কদিনে আভাসেও স্ত্রী-বিচ্ছেদের কোনো প্রসঙ্গ তোলেনি। নিরীহ মুখে বললাম, আরো একটু বিশদ না করলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

অন্যমনস্ক একটু। তারপরেই ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল। মুচকি হেসে জবাব দিল, এক্ষুনি হাসপাতালে যেতে হবে, তাড়া আছে—কাল বলব—দেন ওয়ার্ক ইফ ইউ ক্যান।

আমি উদগ্রীব হয়ে সেই কালের প্রতীক্ষায় ছিলাম।

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ হাসপাতালের একজন কর্মচারী এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল, সাহেব সেলাম দিয়েছে।

গেলাম। কমল বলল, চলো একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সে বেশ মেজাজে আছে মনে হল, হাসছে অল্প অল্প। লিফটে উঠে আবার বলল, মহিলা যদি তোমাকে কিছু বলে, সায় দিয়ে যেও, নয়তো একটু মুশকিলে পড়তে পারো।

ওর গতকালের প্রসঙ্গের সঙ্গে হাসপাতালের কোনো মহিলার যোগ আছে ভাবিনি। ওর স্ত্রী-বিচ্ছেদের ঘটনাই শুনব ধরে নিয়েছি। আমি লেখক, তাই কোনো বিকার-বৈচিত্র্য দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে ভাবলাম। হাসপাতালের খোদকর্তা সঙ্গে আছে যখন, আমার ঘাবড়াবার কারণ নেই।

তিনতলার ওপর পাশাপাশি গোটাকতক সুইট। একটার সঙ্গে আর একটার যোগ নেই। মাঝে মাঝে কোলাপসিবল গেটে দরোয়ান মোতায়েন। মাস গেলে যারা মোটা

টাকা ফেলে দিতে পাবে তাদেব বোগী বা বোগিণী ভিন্ন এখানে আব কাবো আশ্রয মেলা সম্ভব নয।

আমাকে সঙ্গে কবে কমল এমনি একটা সুইটে ঢুকে গেল।

ওদিক ফিবে জানালাব গবাদ ধবে আকাশ দেখছিল মহিলা। একপিঠ খোলা চুল। দু'খানা বাহু, কানেব দু'পাশ আব পাযেব পাতা দেখেই বোঝা গেল মহিলা রূপসী। কমলেব গলার্খাকাবি শুনে এদিকে ফিবল, তাবপবে হেসে অভ্যর্থনা জানাতে গিযেও আমাকে দেখে সুচারুভাবে থমকালো একটু।

আমাব অনুমান মিথ্যে নয, রূপসীই বটে। কিন্তু ফর্সা মুখেব দু'দিকে কালচে ছোপ, আব সুন্দব টানা চোখেব কোলে কালি। সুন্দব স্বাস্থ্য,—বযেস মন হল আটত্রিশ উনচল্লিশ হবে। পবে শুনেছি ছেচল্লিশ।

তডবড কবে কমল আমাব যে পবিচয দিল শুনে আমাবই দু'চোখ কপালে ওঠাব দাখিল। বলল, আমাব ছেলেবেলাব বন্ধু ওমুক—, মস্ত ইনডাসট্রিয়ালিস্ট, বাঙালীব গর্ব বলতে পাবেন। তিন চাব দিন হল এখানে বেড়াতে এসেছে। এসেই পালাই-পালাই কবছে কেন, বুঝলেন?

মহিলাব হাসি-হাসি মুখেব সুচারু অভিব্যক্তি, আমাব দিকে একবাব তাকিযে মাথা নাড়ল। কমল তেমনি তডবড কবেই আবাব বলে গেল, ওব স্ত্রী। সাচ এ লাভলি লেডি, ওব টাকাব জন্য নয, এই জন্যেই ওকে আমাব হিংসে হয—কলকাতায ওব বাড়ি গেলে ওই ভদ্রমহিলাকে দেখাব লোভেই আব চলে আসতে ইচ্ছা কবে না। ওদেব দুটো ছেলে একটা মেযে; এখনো দু'জনেব টানে দু'জন অন্ধ একেবাবে—এই যে এখানে আছে ক'দিন, বোজ একটা কবে মিসেসেব ট্রাঙ্ক-কল, কেমন আছ, কবে আসবে।

আমাবই ঘেমে ওঠাব দাখিল। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য কবলাম মহিলাব দৃটি আযত নেত্র আমাব মুখেব ওপব ঘন হযে বসতে লাগল। এই প্রথম তাব চাউনিও অস্বাভাবিক ঠেকছে।

এবাবে কমল মহিলাব পবিচয দিল। স্মৃতি গুপ্ত। ইনিও এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, জাযগাটা ভালো লেগে গেছে তাই আবও কিছুদিন থাকবেন আশা কবা যায।...এই ফাইন অ্যাকমপ্লিসড লেডি, ওঁব সঙ্গে দেখা হযে গেল তোমাব ভাগ্য ভালো।

আব এক দফা নমস্কাব বিনিময হল; লক্ষ্য কবলাম মহিলাব চোখ দুটো যেন অস্বাভাবিক চকচক কবছে। কমল চট কবে উঠে দাঁড়াল। —আচ্ছা আপনাবা আলাপ কবুন, আমি পাশেব সুইট থেকে ঘুবে আসছি।

কথা শেষ কবেই সে অদৃশ্য। সেই মুহূর্তেই একটা ভয যেন আমাকে ছেঁকে ধবতে লাগল। স্মৃতি গুপ্তব চকচকে দু'চোখ আবও ঘন হযে আমাব মুখেব ওপব বসছে। হঠাৎ একটু হাসল মহিলা, তাব পবেই উঠে এসে অন্তবঙ্গ পবিচিতাব মতই আমাব গা ঘেঁষে বসল। চোখেব মত সুন্দব দাঁতেব সাবিও ঝকঝক করে উঠল এবাবে। —চাবদিন হল এসেছেন, আব আজ এখানে আসাব কথা মনে পড়ল?

অজ্ঞাত ত্রাসে বুকের ভেতরটা টিপটিপ করছে আমার। এ কি বিড়ম্বনা রে বাবা! সন্তর্পণে ব্যবধান বচনা করতে চেষ্টা করে আর সেই সঙ্গে শুকনো ঠোঁটে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করে জবাব দিলাম, সময় পেয়ে উঠিনি...।

—বলবেনই তো, আপনারা সব এই রকমই। আছেন তো কিছুদিন এখন, না স্ত্রীর টানে পালাবেন?

—না...দিনকতক থাকব।

খুশি। সামনের চুলের গোছা সরাতে গিয়ে মহিলার বাহু আমার কাঁধে ঠেকল। তারপর আর একটু ঘুরে বসার ফলে ব্যবধান সঙ্কীর্ণতর হল। উৎফুল্ল মুখে মহিলা বলে গেল, ইনডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার আমার কত লোভ আপনি জানেন না, সত্যিকারের পুরুষকার বলতে তো তারাই। আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল একজন মানুষের মত মানুষ আমার ঘরে এলো। আমার কত ভাগ্য আজ।

নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে আমি কাঁপছি। হন্তদন্ত হয়ে তক্ষুনি কমল ঘরে ঢুকতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার। এগিয়ে এসে ও মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল আমার বন্ধুকে?

—ওয়াণ্ডারফুল!

—এই জন্যেই তো নিয়ে এলাম, চলো হে আজ আর সময় নেই। বলেই সে আবার দরজার দিকে পা বাড়ালো। আমি উঠে অনুসরণ করার জন্য ব্যস্ত।

দরজার কাছে আসার আগেই পিছন থেকে খপ একটা হাত ধরে ফেলল মহিলা। কমল ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। খুব কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, কাল আবার আসবেন, আসবেন তো? একলা আসবেন, আমি আশায় বসে থাকব —ঠিক আসবেন?

মাথা নেড়ে বাজি হয়ে ঘরের বাইরে পা দিয়ে বাঁচলাম আমি। কমল গুহ আগে আগে চলেছে। এই মুহূর্তে আমার সব থেকে রাগ হচ্ছে ওর ওপর।

ওর আপিস-ঘরে আসার পর গম্ভীর মুখে হাসি দেখলাম। জিজ্ঞাসা করল, অক্ষত আছিস?

বললাম, তোর আসতে আর দু'মিনিট দেরি হলে হার্টফেল করতাম। কী ব্যাপার?

—নট এ ওয়ার্ড টু-ডে, আবার কাল।

সত্রাসে বলে উঠলাম, কাল আবার ওই ঘরে?

ও হাসতে লাগল, তুই একটা কাপুরুষ—ইজ'ন্ট সী বিয়েলি চার্মিং?

পরদিন বিকেলে কমল আবার আমাকে ধরে নিয়ে গেল। কথা দিল, আজ আর আমাকে ফেলে ঘর ছেড়ে যাবে না। তাছাড়া আমারও কৌতূহল ছিলই।

আজ দ্বিতীয় প্রস্থ বিস্ময়। গতকালের পরিচয় মহিলার মনেও নেই। কমল বলল, আমার লেখক বন্ধু, আলাপ করাতে নিয়ে এলাম। স্মৃতি গুপ্ত স্বাভাবিক মুখেই দুটি হাত জুড়ে নমস্কার করল, কি ভাগ্য, বসুন।

গলা খাটো করে কমল যেন আমি শুনছি না এইভাবে মহিলাকে বলল, লিখে আরো কত নাম করতে পারত ঠিক নেই, বাড়িতে বড় অশান্তি, বউয়ের সঙ্গে এক

মুহূর্তেব বনিবনা নেই...হযত ছাডাছাডিই হযে যাবে। বড দুঃখেব জীবন...

গতকালেব বিপবীত দৃশ্য দেখলাম আমি। আমাব দিকে মহিলা তাকলো একবাব। আযত চোখে বিমনা ব্যথাব ছাযা। প্রায ফিসফিস কবে কমলকে বলল, আ-হা। আমাব কাছে এ-সব লোককে কেন আনেন বলুন তো, বড মন খাবাপ হযে যায।

আজকেব আলাপেব মেযাদ পাঁচ মিনিটও নয। লেখাব প্রসঙ্গেই দু-এক কথা জিজ্ঞাসা কবল স্মৃতি গুপ্ত। আসাব সময শান্ত দু'চোখে আমাব দিকে চেযে বলল, জীবনে শক্ত হযে যুদ্ধ কবতে পাবাটাও কম কথা নয, বুঝলেন...তখন দেখবেন সব বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ হযে গেছে। তাবপব কমলেব দিকে একটু চেযে থেকে বলল, মুখ শুকনো দেখছি কেন, খাওযা-দাওযা হযেছে, না সে-সময়ও হয নি?

হেসে মাথা ঝাকিযে কমল আমাকে নিযে বেবিযে এলো।

সন্ধ্যাব পব এক পেযালা কফি নিযে বসে কমলকে বললাম, এবাবে কী আমাকেই তুই পাগল কবে ছাডবি? কৌতূহল আব কত সহ্য হয?

পাইপ ধবাবাব ফাকে কমল হাসল একটু। আমি প্রসঙ্গ বিস্তাবেব আশায আবাব বললাম, মহিলাকে বেশ শিক্ষিতা মনে হলো?

—হ্যা, এম-এ পাশ।..তা বযেসকালে দেখতে কেমন ছিল মনে হয?

জবাব দিলাম, বযেসকাল তো এখনো মাযা কাটাতে পাবে নি মনে হ'ল।

খুশি মুখে কমল মাথা নাডল। তাবপব খুব চাছাছোলাভাবে একেবাবে সংক্ষেপে যে ঘটনাটা ব্যক্ত কবল, তাই শুনে আমি স্তম্ভিত।

স্মৃতি গুপ্ত ইউ-পি'তে থাকত। সেখান থেকেই এম-এ পাস কবেছিল। তাব বাবা সেখানকাব ডাক্তাব। ছেলেবেলায দুই-একবাব বাংলা দেশ, অর্থাৎ কলকাতা দেখেছে।

ভাবী এক সুপুরুষ স্মার্ট ছেলেব প্রেমে পডল সে। নাম পবাশব দত্ত। সেই ছেলেবও কলকাতায ব্যবসা—ডাক্তাবি সবঞ্জাম আব পঙ্গু মানুষদেব সবঞ্জাম সববরাহ কবে। নিজেব হেলথ ক্লিনিক আছে।

পবাশব দত্ত যখন সেখানকাব কলেজেব ছোকবা, স্মৃতি গুপ্তব দিকে তখন থেকেই চোখ ছিল তাব। কিন্তু স্মৃতি তখন ফ্রক ছেডে শাডিও ধবে নি। আলাপ ছিল, প্রেম বোঝাব বযেস তখনো সেটা নয। কিন্তু খুব চৌকস মনে হত ছেলেটাকে তখন।

ভাগ্যেব সন্ধানে পবাশব ইউ-পি ছাডল। আট বছব বাদে এই ইউ-পি'তেই ব্যবসাব কাজে এসে আবাব যোগাযোগ। স্মৃতি তখন এম এ পডছে—সামনেব বাবে পবীক্ষা দেবে। আব পবাশব দত্তও তখন উঠতি অবস্থাব মানুষ। দুজনে দুজনকে দেখে মুগ্ধ। স্মৃতিকে দেখে মুগ্ধ তখন অনেকেই। কিন্তু পবাশব আসাতে সকলে বববাদ হযে গেল। ব্যবসাব কাজে ঘন ঘন বাব-দুই-তিন ইউ-পি আসাব ফাঁকেই তাদেব প্রেম জমাট বেঁধে গেল। তাবপব বিযে।

স্মৃতিব জীবনেব সব থেকে সেবা কটা দিন কেটে গেল। পবাশব কলকাতায ফিবল। স্মৃতি ছ'মাস বাদে এম-এ পাস কবাব পর তাকে নিযে যাবে। তখন পবাশব

থাকে কলকাতাব এক নামকবা হোটেলে। সেখানকাব ঠিকানা হিসেবে একটা পোস্ট-অপিসেব নাম লিখে দিল সে। তাব চিঠিপত্র সব ওই পোস্ট-অফিসেব কেযাবে যায। ব্যবসাব তাগিদে প্রায সমস্ত ভাবতবর্ষেই ঘুবতে হয তাকে—কখন থাকে না থাকে ঠিক নেই। হোটেলেব চিঠি মাবা যায বলে এই ব্যবস্থা।

এব পবেব খানিকটা অংশ জানা গেছে পুলিশেব বিপোর্ট থেকে।...অলক বিশ্বাস নামে একটা লোক সেই পোস্ট-অফিসে এসেছিল তাদেব ব্যবসাব অথবা সুধীব ঘোষেব নামে চিঠিপত্র কী আছে সংগ্রহ কবতে। পোস্ট-অফিসেব লোক তাকে চেনে, সুধীব ঘোষেব অনুপস্থিতিতে সেই এসে চিঠিপত্র নিযে যায।

ব্যবসা এবং সুধীব ঘোষেব নামে একগোছা চিঠিই ছিল। অলক বিশ্বাস দেখল তাব সঙ্গে পবাশব দত্ত নামে একজনেব একটা খাম ভুল কবে এসে গেছে। খামেব ওপবে মেযেলি হাতেব লেখাটা বড সুন্দব মনে হল তাব। বাইবে এসে খামটা খুলল। লিখেছে স্মৃতি নামে এক মেযে। বেশ চাপা উচ্ছ্বাসেব ঝকঝকে চিঠি। বেশিদিন বিযে হয নি বোঝা যায।—নিজেব এম-এ পাশেব খবব দিযেছে। তাবপব লিখেছে, ওমুক দিন ওমুক গাডিতে কলকাতা আসা স্থিব কবেছে। ছোট ভাইযেব পবীক্ষা সামনে, তাই একলাই বওনা হতে হবে। চিঠিব শেষ, 'পত্রপাঠ প্রাপ্তিসংবাদ পেলে আমি নিশ্চিন্ত মনে বওনা হব। তুমি অবশ্যই ঠিক সময়ে স্টেশনে থেকো। জ্ঞান-বযসে তো কলকাতা দেখি নি, ট্রেন থেকে নেমেই তোমাব মুখখানা না দেখতে পেলে তালকানা হযে যাব।'

অলক বিশ্বাস তিন দিন বাদে স্মৃতি দত্তব ঠিকানায একটা টেলিগ্রাম পাঠালো। পবাশব যখন দত্ত, স্মৃতিও তখন দত্তই হবে। টেলিগ্রামেব বযান ঃ স্টার্ট—পবাশব।

ব্যবসাব বাবো আনাব অংশীদাব সুধীব ঘোষকে এ ব্যাপাবে সে ঘুণাক্ষবেও কিছু জানালো না। তাদেব ব্যবসায কৃতিত্ব ভাগাভাগি কবাটা বেওযাজ নয। তাছাডা সুধীব ঘোষেব সঙ্গে ভিতবে ভিতবে তাব একটা চাপা বিবোধ চলেছে। জানলে ফোপবদালালী কববে। তাবপব মেযেটা যদি মনে ধবাব মত না হয, তাহলে ঠাট্টা-ঠিসাবা কববে। কিন্তু কে জানে কেন, চিঠি পডেই অলক বিশ্বাসেব আশা, মনে ধবাব মতই হবে মেযেটা। তা যদি হয, তাহলে সে-বকম শিকাব ধবাব বাডতি প্রাপ্যও কম হবে না। অতএব পার্টনাবেব কাছে গোপন।

তাবপবেব ব্যাপাবটা জল-ভাতেব মত সহজে ঘটে গেল। উনিশশ' সাতচল্লিশেব শুরু সেটা। উদ্বাস্তুব চাপে শিযালদহ স্টেশন তখন নবক। কলকাতাব বহু জাযগাই নবক।

ট্রেন থেকে নেমে স্মৃতি চেনা মুখ দেখল না। উদগ্রীব মুখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। আব দূব থেকে অলক বিশ্বাসেব মনে হল—এই হবে। কিন্তু রূপ দেখে সে নিজেই হকচকিযে গেল প্রথম, ভবসা কবে তক্ষুনি সামনে এগোতে পাবল না। আবো খানিক বাদে নিঃসংশয হযে ব্যস্তসমস্তভাবে তাব কাছে এলো।—এক্সকিউজ মি, আপনি কি মিসেস স্মৃতি দত্ত?

স্টেশনেব সেই নবকেব মধ্যে চেনামুখ না দেখে স্মৃতি ভয়ানক উতলা হযে পডেছিল। সাগ্রহে মাথা নাডল।

—সবি, আমাব একটু দেবি হযে গেল আসতে। মিস্টাব দত্ত মানে পবাশব দত্ত আমাকে পাঠিযেছেন। তিনি হঠাৎ বেশ অসুস্থ হযে পডেছেন, তাই আসতে পাবলেন না...চলুন।

বেশ অসুস্থ শুনে স্মৃতি ঘাবডে গেল—কী অসুখ?

—পেটেব নিচেব দিকে খুব যন্ত্রণা, চলাফেবা কবতে পাবছেন না। আপনি ঘাবডাবেন না, আসুন।

চিন্তিত মুখে স্মৃতি তাব সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠল।

অলক বিশ্বাসেব জীবনে আজ ভাগ্যেব সূর্যোদয যেন। বাবোআনাব মালিক সুধীব ঘোষ বাত সাডে আটটাব আগে আসবে না। সাডে আটটাব পব বাবু এসে মালিকেব আসনে জাকিযে বসে টাকা গোনেন। তাব ওপব আজ কোনো টোপেব আশায চন্দননগব গেছে। আগে এসে হাজিব হবাব কোনো সম্ভাবনাই নেই। ভালোই হযেছে। এ জিনিস দেখলে কিছুদিন অন্তত আব কাউকেই সে ধাবে-কাছে ঘেঁষতে দিত না। ও নিজেই একটা বাঘব বোযাল। আব একবাব বেশ সুশ্রী এক শিকাব ধবে আনাব পব এক মাস পর্যন্ত নিজেই তাকে গিলে বসে থাকল। এভাবে ব্যবসা চলে।...জাযগায গিযেই অলক বিশ্বাস অচিন্ত্য সবখেলকে টেলিফোনে আমন্ত্রণ জানাবে। অঢেল টাকাব মালিক অচিন্ত্য সবখেল। সবকাবী-বেসবকাবী মহলে তাব প্রবল প্রতাপ। কখনো বিপদেব গন্ধ নাকে এলে সে-ই তাদেব ত্রাণকর্তা। মেযেটাকে একবাব তাব কবলে ফেলে দিতে পাবলে নিশ্চিন্তি। সুধীব ঘোষ তখন 'নো-বডি'। অচিন্ত্য সবখেলেব কাছ থেকে সে আজ মোটা কিছুই খসাতে পাববে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শৌখিন এলাকাব অনেক ফ্ল্যাটেব একটা বিশাল বাডিব দোতলায উঠে হেলথ ক্লিনিকেব সাইন বোর্ড দেখল স্মৃতি। তাকে তিনতলায নিযে এলো অলক বিশ্বাস। সুন্দব একটা সাজানো ঘবে এনে ঢোকালো। বাডিব মধ্যে এটাই সাউণ্ড-প্রুফ ঘব। বাইবে থেকে বা ভিতব থেকে গলা ফাটালেও দু'দিকেব কেউ শুনতে পাবে না।

তাকে বসতে বলে অলক বিশ্বাস বেবিযে গেল। পাঁচ মিনিট বাদেই এসে আবাব খবব দিল, মিস্টাব দত্ত গেছেন বেবিযামমিল এক্স-বে কবাতে, তাই ফিবতে দেবি হবে। মিসেস দত্ত চা-টা খেযে বেস্ট নিন, চান-টান করুন, মিস্টাব দত্ত ততক্ষণে এসে যাবেন।

বিভ্রাটেব কথা শুনে স্মৃতিব আবাব মুখ শুকালো। বলল, আমাকে সেখানে নিযে চলুন।

অলক বিশ্বাস সবিনযে বলল, কোন ডাক্তাবেব চেম্বাবে গেছেন তিনি তাদেব জানা নেই।

একটু বাদে বেযাবা চা ইত্যাদি দিযে গেল।—তাব চাউনিটা কি-বকম বিশ্রী লাগল স্মৃতিব। চা খেতে খেতে ঘবটা দেখেও অবাক লাগল একটু। সুন্দব শয্যা পাতা, বসাব শৌখিন আসবাব, ড্রেসিং টেবিল, টযলেট সেট—সবই আছে, কিন্তু ঘবে কোন বাক্স বা স্যুটকেস বা জামা-কাপডেব চিহ্নও নেই।...ভাবল, কোথায কোথায ঘোবে লোকটা, তাই এ-সব বাখাব জাযগাবও হযত ঠিক নেই।

ঘরের সঙ্গে সুন্দর বাথরুম। ক্লান্তি দূর করার জন্য বেশ করে চান করে নিল। দুপুরের দিকে সত্যিই বিচলিত সে। একলাই খেয়ে নিতে হল, বেলা তিনটে বেজে যায়—লোকটার পাত্তা নেই।

রাত হওয়া পর্যন্ত তার দুশ্চিন্তার বিবরণ বাদ দেওয়া যাক। বিকেলে বহুবার ঘর থেকে বেরুতে চেষ্টা করে দেখেছে—বাইরে থেকে বন্ধ। চিৎকার করেও সাড়া মেলে নি।

তারপর নরক। শক্তিশালী একটা জঘন্য পুরুষের সঙ্গে দিশেহারার মত ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে তাকে। লোকটা আধঘণ্টার চেষ্টায় কাবু করে ফেলেছিল তাকে, হঠাৎ দাঁতে করে তার বাহুর মাংস প্রায় ছিঁড়ে নেবার উপক্রম করে কয়েক মুহূর্তের জন্য মুক্তি পেয়েছিল সে। আর্তত্রাসে এবার ছুটে এসে হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেছল। ত্রস্ত-বসনে আলুথালু অবস্থায় পাগলের মত নিচে ছুটল।

নিচের সাজানো আপিস-ঘরে তখন সুধীর ঘোষ বসে। চার আনার পার্টনার অলক বিশ্বাস সন্ধ্যে থেকে মনের আনন্দে অঢেল মদ গিলে কোথায় নিপাত্তা হয়ে আছে জানে না। এসে অন্য লোকের মুখে শুনেছে বড় জবর শিকার ধরে এনেছে পার্টনার আজ। এবং খানিক আগে অচিন্ত্য সরখেল সে-ঘরে গেছে।

সিঁড়িতে অস্ফুট কাতর শব্দ শুনে কান খাড়া হল তার।

সামনে একটা আপিস-ঘর এবং আলো দেখে উদ্ধারের আসায় আর্তত্রাসে প্রচণ্ড বেগে দরজা ঠেলে স্মৃতি ভিতরে ঢুকল, বাঁচান!

পরমুহূর্তে তড়িৎস্পৃষ্টের মত স্তব্ধ, পঙ্গু একেবারে। মালিকের চেয়ারে বসে আছে পরাশর দত্ত, সহকর্মীরা সকলে যাকে জানে সুধীর ঘোষ বলে। তার সামনে মদের বোতল, মদের গেলাস—আর দু'পাশে বসে দুটো মেয়ে হাসাহাসি করছে।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে পরাশর দত্তও বিমূঢ়, হতচকিত। মদের নেশায় ভুল দেখছে কিনা সেই বিভ্রম। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—স্মৃতি তুমি! তুমি এখানে!

ভাবার অবকাশ পেলে স্মৃতি কী করত জানে না, কিন্তু সেই কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই বুঝি তার মাথায় সর্বনাশা কিছু ঘটে গেল। অস্ফুট আর্তনাদ করে ছুটে বেরিয়ে সোজা আবার ওপরে উঠে গেল স্মৃতি। ঠাস করে সাউণ্ড-প্রুফ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল আবার। ঘরের মধ্যে সেই আহত বাঘ বসে তখনো।

তিনতলায় উঠে পাগলের মতই পরাশর দত্ত দরজা ধাক্কাতে লাগল। দরজা খোলার জন্য চিৎকার করে ডাকাডাকি করতে লাগল। ও-ঘরে কোন শব্দ ঢুকবে না নিজেই ভুলে গেছে।

...বেশি রাতে সেই ঘর থেকে, সেই নরককুণ্ড ছেড়ে স্মৃতি অচিন্ত্য সরখেলের সঙ্গেই বেরুতে পেরেছিল। দাঁতের কামড় খেয়ে হোক বা এমন এক দুর্লভ বস্তু লাভের আনন্দে হোক, এই বারোয়ারি জায়গায় তাকে ছেড়ে যেতে অচিন্ত্য সরখেলের মন সরে নি। যাবার আগে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি যাবে আমার সঙ্গে? ...এখানে থাকলে তোমার ওপর বেশি অত্যাচার হবে, এর থেকে তোমাকে অনেক ভালো জায়গায় রাখতে পারি।

নির্জীব কলের পুতুলের মত স্মৃতি মাথা নেড়েছে, যাবে।

পরাশর দত্ত অন্যথায় সুধীর ঘোষের চোখের ওপর দিয়েই স্মৃতিকে নিজের গাড়িতে এনে তুলেছে অচিন্ত্য সরখেল। বলেছে, একটু টু-টা করলে তাকে হাজতে গিয়ে পচতে হবে।

নিস্পন্দ পরাশর দত্ত টু-টা করে নি।

হতচেতনের মত চার রাত্রি এক নামকরা হোটেলে কাটিয়েছে স্মৃতি। প্রতি সন্ধ্যায়ই অচিন্ত্য সরখেল এসেছে। যাবার আগে মোটা টাকাও গুঁজে দিয়ে গেছে। সে এত খুশি যে সর্বস্ব দিতে পারে।

তারপর মাথায় খুন চেপেছে স্মৃতির। হোটেল থেকে বেরিয়ে থানায় এসেছে। কিন্তু সুধীর ঘোষ বা পরাশর দত্ত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। ধরা পড়েছে অলক বিশ্বাস।

সেই থেকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর আক্রোশের জ্বলন্ত আগুন মাথায় নিয়ে কলকাতার রাতের অভিসারে পা বাড়িয়েছে স্মৃতি দত্ত—না দত্ত নয়, তখন আগের পদবী ব্যবহার করে সে—স্মৃতি গুপ্ত। একটিমাত্র নেশা তার, সখের ঘর ভাঙাবে। অনেক ভেঙেছে—অনেক।

কিন্তু সেই সঙ্গে মাথার গোলযোগও বেড়েই চলল। শেষের দিকে এক শাঁসালো মাড়োয়ারীর কাছে ছিল। মস্তিষ্কের বিকৃতি অসহ্য হয়ে ওঠা সত্ত্বেও লোকটার নেশা ঘোচে নি। স্মৃতি ভালো হবে এই আশায় বহু পয়সা খরচ করে সে-ই তাকে এই হাসপাতালে রেখে যায়। কিন্তু চোখের বার হলে মনের বার, কতদিন সে আর পাগলের আশায় এই হাতির খরচ টানবে। দু'বছর হয়ে গেল—সে আর খরচাপত্রও দেয় না, খবরও নেয় না।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম জানি না। এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এখন খরচ চালাচ্ছে কে?

নতুন করে পাইপ ধরাতে ধরাতে কমল গুহ জবাব দিল, আমি।

আমি অবাক।—তুমি কেন?

—কে জানে। একটু বিমনা দেখলাম ওকে, বলল, পিকিউলিয়ার কেস, কিন্তু সারার আশা আছে। আগের থেকে এখন অনেক ভালো।. .তাছাড়া, স্ত্রীর সঙ্গে আমার ডাইভোর্সের মামলা চলছে শোনার পর থেকে এক অদ্ভুত মায়া পড়ে গেছে মহিলার—একমাত্র আমি ছাড়া হাসপাতালের আর কোন লোককে সে সহ্য করতে পারে না। ডাইভোর্স হয়ে গেছে জানার পর মায়াটা আরও বেড়েছে—আমাকে একটা অসহায় শিশু ভাবে।

আমি নীরব। বার-কয়েক পাইপে টান দিয়ে কমল হঠাৎ আমার দিকে ফিরল। —কিন্তু তারপর?

আমি তারই প্রশ্নের পুনরুক্তি করলাম, তারপর কী?

উঠে ঘরের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করল বার-দুই। তারপর দেশের নামজাদা এক মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার কমল গুহ আমার চেয়ারের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল।—আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করছি, তারপর কী? হোয়াট নেক্সট?

ঘৃণা

রোজই রাত ন'টা নাগাদ টার্মিনাস থেকে বাসে উঠি। ফেরার সময় তাই সপ্তাহের বেশির ভাগ দিন ওই লোকটার বাস জোটে। দোতলা স্টেট বাসের একতলার কণ্ডাক্টর সে।

প্রায়ই তার বাসে উঠি বলে মুখ-চেনা। তার কর্কশ স্বভাবের দরুনও মুখ-চেনা। উঁচু লম্বা চেহারা, চওড়া বুকের ছাতি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। রুক্ষ চোয়াড়ে মুখ। গায়ের রং তামাটে, কালচে। পরনে ময়লা খাকি প্যান্ট, গায়ে বুকখোলা খাকি কোর্তা—ভিতরের বিবর্ণ তেল-চিটে গেঞ্জিটা চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক।

আমার মনে হত কণ্ডাক্টরি করতে হয় লোকটার সেই রাগ রাজ্যসুদ্ধ যাত্রীর ওপর। একদিন আমার সঙ্গেই লেগে গেছল একটু। টিকিট চাইতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার কাছে দশটা টাকার চেঞ্জ হবে?

—না। খুচরো না নিয়ে ওঠেন কেন?

আমিও রুক্ষ জবাব দিলাম, খুচরো নিয়েই উঠেছি। দরকার ছিল বলে আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম। একটা সিকি তার হাতে দিলাম।

প্রায় শেষ প্রান্তের যাত্রী আমি, পঁচিশ পয়সাই ভাড়া। লোকটা টিকিট দিয়ে চলে গেল। একটু বাদেই ফিরে এসে হাত বাড়ালো, দিন—।

আমি মাথা নাড়লাম।—দরকার নেই, আপনার ব্যবহারেই খুশি হয়েছি।

লোকটার অপ্রসন্ন দু'চোখ আমার মুখের ওপর থমকালো। বলল, এ চাকরি করলে আর ব্যবহার মোলায়েম রাখা যায় না, বুঝলেন? ওই দেখুন, দেখুন বাস গড়ের মাঠ আর উনি গেটে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছেন। ও মশাই, বলি ভিতরেও হাওয়া খাওয়ার জায়গা আছে, উঠে আসুন।

টেবিলিন পরা গেটে-দাঁড়ানো শৌখিন তরুণটি মুখ লাল করে উঠে এসে বলল, ভদ্র ভাষায় কথা বলতে পারেন না?

লোকটা দু'পা এগিয়ে তার ওপর দিয়ে গলা চড়ালো—অপর লোকের সুবিধে-অসুবিধের কথা না ভেবে আপনি উঠেই গেটে গ্যাঁট হয়ে দাড়ালেন—তার পরেও ভদ্র ভাষা যোগাতে পারলে তো ভাষার পণ্ডিত হয়ে বসতাম, বাসের কণ্ডাক্টরি করতে আসব কেন?

অনেকে হেসে উঠেছিল।

আর একদিন তো গোটাকতক ছোকরা যাত্রীর সঙ্গে হাতহাতি শুরু হয় আর কি। সামনের লেডিস সীট-এর দিকে গিসগিস ভিড়, পিছনের দিকটা অপেক্ষাকৃত ফাকা। লোকটা ঘেমে নেয়ে বারপাঁচেক ডেকে উঠেছে, পিছনে চলে আসুন না মশাইরা, সব ওদিকে ভিড় করছেন কেন?

কে কার কথা শোনে। শেষে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে লোকটা অল্পবয়সী কটা ছেলের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওদিকে এত কী আনন্দ মশাই আপনাদের—ভিড়ের চোটে আধমরা হবার দাখিল, তবু ওখানেই দাঁড়িয়ে আনন্দ করা চাই—এদিকে সরে আসতে পারেন না?

ব্যস, এই থেকেই হাতাহাতি লাগে আর কী। গরম বচসার ফলে কণ্ডাক্টরের মুখ দিয়ে আরো যে কথা বেরুলো, তাই শুনে ওদিকের মহিলাদের মুখ লাল হবার কথা। ভিড়ের দরুন তাদের মুখ দেখতে পাইনি।

কণ্ডাক্টরের স্ব-পক্ষেও জনাকতক যাত্রী বচসায় যোগ দেবার ফলে সে-যাত্রা সত্যিকারের হাতহাতিটা হল না। টিকিট দেখতে চাওয়া, ঘণ্টা দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে লোকটার রুক্ষ ব্যবহার আমি আরো দিন-কয়েক লক্ষ্য করেছি। আমার ধারণা, এর দরুন লোকটাকে যাত্রীদের হাতে একদিন না একদিন নিগ্রহ ভোগ করতে হবে।

সকলের সেটা ছুটির দিন। আমাদের কাগজের অফিস খোলা। ঝমঝম বৃষ্টির ফলে বেরুতে সেদিন রাত দশটা হয়ে গেল। টার্মিনাসের বাসে উঠে দেখি সেই লোকটারই বাস।

বাস ফাঁকা। মাত্র পাঁচ সাতজন লোক। কণ্ডাক্টর একেবারে পিছনের আগের সীটটাতে বসে নিবিষ্ট মনে সমবয়সী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছে। তাদের ঠিক পিছনের কোণের সীটটাতে আমি বসলাম। ফাকা বাস পেলে ওই সীটটাই আমার পছন্দ।

বসার পরেই যে কথা কানে এলো তাতে বোঝা গেল অনেক দিনের পুরনো বন্ধু তারা এবং অনেক দিন বাদে দেখা হয়েছে। আমি বসতে বসতে শুনলাম, ভদ্রলোক বলছে, তোর ভাইদের কারো কারো সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়, তোর কথা জিজ্ঞেস করলে ভালো করে জবাবই দেয় না—প্রায় চার বচ্ছর বাদে দেখা হল তোর সঙ্গে, মনে করে একবার এলেও তো পারিস।

জবাবও কানে এলো।—এ ঘণ্টার চাকরিতে জান কয়লা হয়ে গেল, সময় পাই কোথায় বল। তার ওপর ফাক পেলেই মুদি-দোকানে বসতে হয়, নইলে ভগ্নিপতিটির তো কুমীরের পেট—কড়া চোখ না রাখলে দেবে সব সাবাড়ে।

কণ্ডাক্টর আমার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। তার বন্ধুর মুখ সামনের দিকে। আমার মুখ বাইরের দিকে। বন্ধু জিজ্ঞেস করল, ভগ্নিপতির সঙ্গে শেয়ারে বিজনেস বুঝি?

—বিজনেস। কণ্ডাক্টরের গলায় একটু যেন কৌতুক ঝরল।— পাঁচ হাত বাই পাঁচ হাত চালার নীচে কিছু মশলাপাতি, তেল, নুন, আলু, কয়েক হাড়ি গুড়, কিছু দড়ি-দড়া আর কিছু আতপ চাল—প্রকাণ্ড বিজনেস। তবু সময়ে ওটুকু করেছিলাম বলে গুষ্টিসুদ্ধু উতরে গেলাম। হ্যাঁ ভগ্নিপতিই দেখছে এখন, চার আনা শেয়ার পায় আর কম করে চার আনা চুরি করে।

হুইসল বাজতে সে বসে বসেই হাত তুলে দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজালো। গাড়ি ছেড়ে দিল। একবার ঘুরে বসে আমার টিকিটটা কেটে নিল। টিকিট কাটা হয়নি এমন যাত্রী আর কেউ আছে কিনা দেখল। তারপর বন্ধুর দিকে ফিরে বসল আবার।

এরপর বাসস্টপ এলে যন্ত্রচালিতের মতই ঘণ্টা দিচ্ছে, গেট দেখছে। দুই-একজন যাত্রী নামছে, দুই-একজন উঠছে। আলাপের ফাঁকেও লোকটার সেদিকে চোখ আছে। উঠে টিকিট কেটে আবার বন্ধুর কাছে এসে বসছে।

এবাবে তাদেব অনুচ্চ মোট সংলাপটুকুব একটা চিত্র আঁকাব বসনা।

বন্ধু : "জমিটা তোব নিজেব শুনলাম?"

কণ্ডাক্টব : "হুঃ, একেবাবে জমিদাব বলতে পাবিস। কলকাতা থেকে সতেব মাইল দূব, এই তো এগাবোটাব ডিউটি শেষ হলে বাত্রি দেডটায পৌঁছুব।...তবু সেই হুজুগেব সময ধাব-ধোব কবে আডাইশ' টাকায দু'কাঠা জমি কিনে ফেলেছিলাম বলে ফুটপাথে থাকতে হচ্ছে না।"

"পাকা দালান তুলেছিস?"

"আটচালাব ইমাবৎ—ওই বক্ষা কবতে প্রাণান্ত। কবে ফিবে দেখব সব সমান হযে গেছে।"

"কেন?"

"স্বাধীন হযেছি না আমাবা এখন? কথায কথায দিনেদুপুবে বুকে পিঠে ছুবি আব মাথায ডাণ্ডা। আমাদেব শালা মবণ-দশা, বামে মাবলেও মাববে, বাবণে মাবলেও মাববে। কতজন তো হুমকি দিযে বেখেছে—দেখে নেবে।"

"কেন?"

"কাবণ দবকাব হয না, কাবণ সব্বাই নিজেবাই তৈবী কবে নেয। মদ খাবাব চাঁদা দিতে আপত্তি কবলে তোমাব পেট ফেঁসে যেতে পাবে।"

স্বল্পক্ষণেব বিবতি। উঠে দুটো টিকিট কাটা, ঘণ্টা বাজানো এবং ফিবে এসে বসা।

বন্ধু : "যাক, ছেলে-পুলে কী তোব বল দেখি?"

কণ্ডাক্টব : "একটা মেযে।"

"সেকি বে। প্রেম কবে মেযেটাকে মামাব খপ্পব থেকে বাব কবে পালিযে নিযে গিযে কত কাণ্ড কবে, বিযে—তাবপব এতদিনে মাত্র একটা মেযে।"

"ওই সামলাতে প্রাণান্ত।"

"কেন, তোব পবেব ভাই দুটো তো দাঁড়িযে গেছে।"

"দাঁড়িযে বুদ্ধিমানেব মত সবে গেছে। মেজটাকে আই-এ পবীক্ষাব পব স্টেনোগ্রাফি পাশ কবিযেছিলাম, আব সেজটাকে স্কুল ফাইন্যালেব পবে টেকনিকাল স্কুলে ঢুকিযেছিলাম। দুজনেই ভালো কবছে এখন। ওদেব মুখ চেযে আশায আশায কতদিন একবেলা খেযে কাটিযেছি আমি আব বউ। যাক গে, ভাল থাক—।"

"তাব পবেব জন?"

"চেষ্টাচবিত্র কবে বি. কম. পডাচ্ছি, সামনেব বাব পবীক্ষা দেবে।...ওটা বোকা, থাকলে থেকেও যেতে পাবে। ওব বউদিকে খুব পছন্দ।"

"ছ'ভাই তো তোবা, তাব পবেও তো দুটো আছে।...তোব কাছেই থাকে, না?"

"হ্যাঁ, যাবে আব কোন চুলোয।...ওবা ছোট, স্কুলে পডছে আব কু-সঙ্গে মিশছে। এক-একদিন ধবলে আধ-মবা কবে ছাডি, কিন্তু দিনেব হাওযা যাবে কোথায।"

"আচ্ছা, তুই ভাইদেব জন্য এত কবলি, মাযেব জন্যে যা কবেছিলি সে তো নিজেব চোখেই দেখেছি...মাঝখান থেকে শেষ বযসেও তোব বাবাকে এত কষ্ট দিলি কেন?"

"তোকে কে বলল?"

"তোর পরের ভাই দু'জনের মুখে শুনেছিলাম। খুব দুঃখ করছিল, শেষ সময়েও তুই নাকি অমানুষের মত ব্যবহার করেছিস।...কেন বল তো? শেষ পর্যন্ত তো মরেই গেল ভদ্রলোক—"

রুক্ষ জবাবটা ঠাস করে কানে লাগল আমার।—"মরে তো সকলেই যাবে, কে আর চিরদিন বেঁচে থাকবে।"

কলেজ স্ট্রীটের কাছে কিছু লোক উঠল। তাদের মধ্যে সাতজনের একটা গোটা পরিবারও আছে। স্বামী-স্ত্রী আর তেরো থেকে ছয়ের মধ্যে পাঁচটি ছেলেমেয়ে। তাদের পিছনে আরো পাঁচ-সাতজন লোক উঠেছে। ফাঁকা বাস, সকলেরই বসার জায়গা মিলেছে।

গাড়ি ছাড়ার ঘন্টি বাজিয়ে কণ্ডাক্টর টিকিট কাটতে এগলো। তারপর বচসা শুরু হল সেই পরিবারটির টিকিট সংগ্রহ করতে গিয়ে। মাঝ-বয়সী সেই ভদ্রলোকটি পাঁচখানা কালীঘাটের টিকিট কেটেছে।

—এদের টিকিট? কণ্ডাক্টর ছোট ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখালো।

ভদ্রলোক বিস্ময়ের ভান করল, ওদের আবার টিকিট কী!

—ওদের তাহলে নামিয়ে দিই?

ফলে বাসসুদ্ধ লোকের কান খাড়া হল। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, ছেলেমেয়েগুলো রোগা-রোগা, ভদ্রলোক আর বউটাও রোগা। সকলেরই বেশ-বাসে দৈন্যের ছাপ।

ভদ্রলোক বলল, ওইটুকু ছেলেমেয়ে, নামিয়ে দেবেন কি-রকম!...ওদের তো কোনসময়ে টিকিট কাটি না।

—অন্যায় করেন। কণ্ডাক্টর হাত বাড়ালো, আর দুটো টিকিটের দাম দিন।

নিরুপায় মুখ করে ভদ্রলোক পকেট থেকে আর একটা টিকিটের ভাড়া তার হাতে দিয়ে সুর পালটে বলল, আচ্ছা ওদের দু'জনের জন্য আর একটা টিকিট নিন...বুঝতেই তো পারছেন অসুবিধে হচ্ছে।

জবাবে অপ্রত্যাশিত রূঢ় ব্যবহার কণ্ডাক্টরের। বলল, অসুবিধে হলেও বাসে যখন উঠেছেন, আর একটা টিকিটের দাম দিতে হবে। দিন—

এ রূঢ়তা অনেকের কানে বিঁধল। ছেলেমেয়েগুলো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে, বউটারও বিব্রত মুখ। একজন সহানুভূতিসম্পন্ন প্যাসেঞ্জার বলে উঠল, ভদ্রলোক মুখ ফুটে বলছেন, দিন না ছেড়ে—

কণ্ডাক্টর তার দিকে ফিরল, তাহলে আপনি মুখ ফুটে বললে তো আপনার টিকিটও ছেড়ে দিতে হয়।

প্যাসেঞ্জারটির সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'জন বলে উঠল, খুব চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ঝাড়ছেন যে মশাই,—খুব ডিউটি দেখাচ্ছেন, কেমন?

—আমি দেখাচ্ছি না, আপনারাই আমার ডিউটিতে বাধা দিচ্ছেন।

এ-ধার থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, কেমন ডিউটিফুল আপনারা খুব জানা আছে মশাই!

কণ্ডাক্টরের তামাটে মুখ কঠিন। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তেমনি হাত বাড়িয়ে বলল, কী, আপনি আর একখানা টিকিটের দাম দেবেন, না আমি গাড়ি থামিয়ে দেব?

বেগতিক দেখে এবারে লোকটি বিমর্ষমুখে আর একখানা টিকিটের দামও দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এধার-ওধার থেকে নানা ধরনের টীকা-টিপ্পনী শুরু হল। কণ্ডাক্টরের কানে তুলো, থমথমে মুখে টিকিট দিয়ে সে আবার তার বন্ধুর সামনে এসে দাঁড়াল।

লোকটার এই হৃদয়হীনতা কারোরই ভালো লাগেনি। তার বন্ধুটিরও খুব খুশি মুখ নয়।

চাপা রাগে চাপা গলায় কণ্ডাক্টর গরগর করে উঠল, বাসে উঠে টিকিটের পয়সা দেবার মুরোদ নেই, তার চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে—লজ্জাও করে না।

জ্বলন্ত চোখে ওই পরিবারটির দিকে একদফা অগ্নিবর্ষণ করল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। কণ্ডাক্টরের বেশবাসের আড়ালে এই প্রথম সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মানুষকে আমি দেখতে পাচ্ছি। ...নিজের এতবড় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব বহন করেও কেন সেই লোকটা শুধু তার বাপকে কষ্ট দিয়েছে, মৃত্যুর পরেও ক্ষমা করেনি—এই রুক্ষ মুখের দিকে চেয়ে যেন সেই জবাবও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

পরিতাপ

আমার ধারণা, বিচারে লোকটার ফাঁসী হবে, নয়ত দ্বীপান্তর হবে।

দুটোর একটা যাতে হয়, পুলিস সে চেষ্টায় সুতৎপর। এই তৎপরতার দরুনই মঙ্গলের সঙ্গে দেড় বছর বাদে আমার আবার যোগাযোগ।

পুলিসের তদন্তসাপেক্ষে ওকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছে সেখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসারটির সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের আলাপ। কাগজের অফিসের চাকরির দরুন হোক বা ভদ্রলোক নাট্যরসিক এবং আমি লেখক বলে হোক, আলাপটা মোটামুটি অন্তরঙ্গমুখী। এঁর কাছে গেলে অনেক সময় লেখার মত অনেক বিচিত্র রসদ মেলে। তাঁর দখলের আবাসটিও আমার বাড়ি থেকে দূরে নয়।

সেদিন সকালে ভদ্রলোক আমার বাড়িতে হাজির। অবকাশ পেলে সাধারণত আমিই তাঁর ওখানে গিয়ে থাকি। এসেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ মশাই, মঙ্গল দাস নামে একটা লোককে আপনি চিনতেন?

চট করে ওই নাম বা নামের কোন মুখ স্মরণে এলো না। ভেবে বললাম, মনে পড়ছে না তো।

সে তো আপনার নাম খুব ফলাও করে বলল, আপনি নাকি তাঁর অনেক উপকার করেছেন...তার বদলে সে আপনার কিছু উপকার করেছে—আপনার দামী ঘড়ি, দামী পেন, জামার সোনার বোতাম আর পকেটের কিছু টাকা নিয়ে সরে পড়েছিল।

মঙলা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পডল প্রতি মাসেব গোডায পদ্মমণিকে টাকা পাঠাত যখন, প্রেবকেব নাম মঙ্গল দাসই লেখা হত বটে। মণি-অর্ডাব আমিই লিখে দিতাম। কিন্তু ওই নামে বোর্ডিংযেব কেউ তাকে চিনত না। সকলেই হাঁক দিত মঙলা বলে। নতুন বোর্ডাব এসে নাম জিজ্ঞাসা কবলে ও নিজেও এই নামই বলত। আব দুদিন না যেতেই নতুন বোর্ডাব টেব পেত, মঙলা সেখানকাব একটি বিশেষ চবিত্র—আব পাঁচটা চাকব-বাকবেব মত হেলাফেলা বা অবজ্ঞাব পাত্র নয।

আমাদেব বোর্ডিংযে বেকাব বা আধা-বেকাবেব বাস ছিল না। সবাই মোটামুটি ভালো উপার্জনশীল। একবাব এক আত্মাভিমানী প্রায-নতুন বোর্ডাবেব মুখেব ওপব ও কী একটা জবাব দিযে বসেছিল, ফলে ঠাস কবে গালেব ওপব এক চড। জবাবে স্তব্ধ চোখে মঙলা তাব দিকে চেযে ছিল শুধু। এই ঔদ্ধত্যেব জন্যেও নবীন ভদ্রলোক দ্বিতীয দফা তেডে এসেছিল। তাব আগেই অন্য বোর্ডাববা হা-হাঁ কবে ছুটে এসে তাকে ধবে ফেলেছিল। তেমনি নিষ্পলক তাব দিকে চেযে থেকে মঙলা শুধু বলেছিল, এখন থেকে নিজেব জন্য আপনি ভগবানেব কাছে প্রার্থনা কবেন।

এই কথা শুনে আব অন্য বোর্ডাবদেব বিচলিত হাবভাব দেখে চাকবি-গর্বী আধা-নতুন বোর্ডাবটি মনে মনে ঘাবডেছে। পবে সতীর্থদেব মুখে মঙলা-সমাচাব শুনে মুখ আমসি। সকলেব এক কথা, কবলেন কী মশায, এখন সামলাবেন কী কবে। ওব দলেব কানে তো পৌছুল বলে।

ওব দল বলতে এই এলাকায ওদেব শ্রেণীব ছন্নছাডাদেব গোষ্ঠী। ওদেব মধ্যে অনেকে বাডি আব হোটেলে বোর্ডিংযে চাকবি কবে, অনেকে আবাব কিছুই কবে না, উপার্জনেব আশায নানা বকমেব বাঁকা বাস্তায ঘোবা-ফেবা কবে। এ-বকম একটা দলেব ও মাতব্বব হযে বসল কী কবে সঠিক খবব বাখি না। বোজ দুপুবে সামনেব পার্কেব একটা চাতালে ওদেব জুযাব আড্ডা বসে। আমাব ধাবণা, এই থেকেই মঙলা ওদেব পাণ্ডা। গোডায ওকে দুই-একবাব সাবধান কবেছি, তোমাকে পুলিশে ধবল বলে।

ও তাচ্ছিল্যভবে জবাব দিযেছে, পুলিশ নিজেব ক্ষেতি কববে কেন, তাব ট্যাকেও দু'পযসা আসছে।

তবে ওই মঙলাই আমাকে আশ্বস্ত কবেছিল, এখন আব সে জুযা-টুযা খেলে না, আড্ডায গিযে বসে এইমাত্র, নইলে ছোঁডাগুলো নিজেদেব মধ্যে কাটাকাটি খাওযা-খাওযি কবে। একদিন সে ওদেব থেকেও অনেক বড বদমাস ছিল, এখন ভালো হতে চায বলেই চাকবি কবছে আব জুযাখেলাও বলতে গেলে ছেডেই দিযেছে।

ওব এই সুমতিব কিছু কিছু কাবণ আমাব জানা আছে। সেটা পবেব প্রসঙ্গ। যাক, ওব সমাচাব শোনাব পবেও সেই আত্মাভিমানী নব্য বোর্ডাবটি ভয গোপন কবে ঝাঁঝিযে উঠতে চেষ্টা কবেছিল, এ-বকম একটা বাফিযানকে বোর্ডিংযে বাখা হযেছে কেন—পত্রপাঠ তাডিযে দেওযা উচিত আব পুলিসেও একটা খবব দিযে বাখা উচিত।

একজন বলে উঠেছিল, উচিত কাজ নিযে মাথা ঘামানোব আগে নিজেব মাথাখানা বাঁচাবাব কথা ভাবুন মশাই। বলা নেই কওযা নেই, আপনি গাযে হাত তুলতেই বা গেলেন কেন? এখনো সেই বামবাজত্বে আছেন ভাবেন?

সন্ধ্যেনাগাদ সতীর্থবাই তাকে আমাব কাছে আসাব পবামর্শ দিযে পাঠিযেছে বোঝা গেল। তাদেব ধাবণা, এবপব আমিই বলে-কযে মঙলাব মাথা ঠাণ্ডা বাখতে পাবি, অন্যথায বিপদ অনিবার্য। ভযে ত্রাসে ভদ্রলোক মুষডে পডেছে। অগত্যা মঙ্গলাকে ঘবে ডেকে বললাম, বাবু একটা অন্যায কাজই কবে ফেলেছেন, তুমি কিছু মনে বেখো না।

ড্যাবড্যাব কবে খানিক মুখেব দিকে চেযে থেকে ও জিজ্ঞেস কবল, আপনি ওনাব মঙ্গল চান?

না চাইলে তোমাকে ডাকলাম কেন?

চাহিবেন বৈকি বাবু, আপনিও ভদ্দব লোক, আব একজন ভদ্রলোক একটা ছোটলোকেব গাযে হাত তুলেছে এ আব এমন কী কথা।

ফাঁকে পেলে ও আমাকে অনেক বকমেব নীতিকথা শোনায। কিন্তু এ কথাব ধাব অন্যবকম। মুখে বিবক্তিব ভাব এনে বললাম, তাহলে কী কবতে হবে এখন?

আডচোখে একবাব ভদ্রলোকেব দিকে চেযে ও জবাব দিল, ওব ভালো চাইলে কাল সকালেব মধ্যে ওঁকে এখেন থেকে চলে যেতে বলুন।

বাগ হচ্ছিল বটে, কিন্তু মঙলাকে যে চেনে সে নির্বোধেব মতো বাগ কববে না। পাংশুমূর্তি ভদ্রলোকেব দিকে ফিবে আমি বললাম, ঠিক আছে, কাল সকালে আমি আপনি দুজনেই চলে যাব এখান থেকে।

এবাবে মঙলা থমকালো একটু। থমথমে মুখে একবাব আমাব দিকে আব একবাব ভদ্রলোকেব দিকে তাকালো। তাবপব হনহন কবে দবজাব ওধাবে চলে গিযেও অসহিষ্ণু ক্ষোভে ফিবে এলো আবাব। শবণাপন্ন বোর্ডাবটিব দিকে চেযে গবগব কবে উঠল, দিনকাল খাবাপ, হাত নিশপিশ কবলেও হাত দুটোকে বশে বাখতে শেখেন। আমাব দিকে ফিবে অভিমানাহত ঝাঁঝে বলে গেল, গবিবেব আপনজন কেউ নেই, সবাইকেই জানা আছে আমাব—কাউকেই যেতে হবে না এখান থেকে।

এই মঙলা!

বিস্ময চেপে পুলিশ অফিসাবকে জিজ্ঞেস কবলাম, চুবিব চার্জ নাকি?

মাথা নেডে পুলিশ অফিসাব জবাব দিলেন, একেবাবে প্রাণ চুবি—মার্ডাব চার্জ।

চমকে উঠলাম। নিজেব অগোচবে আমাব মুখ দিযে বেবিযে গেল, কী সর্বনাশ, গৌবী দাসীকে?

ভদ্রলোক নডে-চডে সোজা হযে বসলেন।—আপনি জানলেন কী কবে?

আমি বিমূঢ। কী ফ্যাসাদ ঘটালাম কে জানে।

পুলিশ অফিসাবটিব দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হযে উঠল মুহূর্তেব জন্য। তাবপব মুখে হাসি ঝবল। বললেন, যা জানেন, বন্ধু হিসেবে খোলাখুলি বলুন—তাতে ববং লোকটাব কিছু উপকাব হতে পাবে... এভিডেন্স যা, তাতে ওব অব্যাহতিব আশা কম। অথচ লোকটাব হাবভাব কেমন পিকিউলিয়াব...নট লাইক এ সীজনড ক্রিমিন্যাল। কিন্তু মার্ডাব শুনেই আপনাব গৌবী দাসীব নাম মনে এলো কেন?

সত্যি জবাবই দিলাম—বোর্ডিং-এ থাকতে ও শাসাতো ওই একটা মেয়েছেলেকে ঠিক একদিন খুন করে বসবে। বলত, ভগবান যেন তার হাত থেকে ওকে রক্ষা করেন।

পুলিশ অফিসার বললেন, রক্ষা করেনি, ওই গৌরী দাসীই তার নিজের বস্তিঘরে খুন হয়েছে। ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন।— জরুরী কাজ পড়েছে, যেতে হবে...বিকেলের দিকে আমার অফিসে আসুন একবার, এ নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা করা যাবে। বোর্ডিংয়ের চাকরির আমলে কে ভালো চিনত জিজ্ঞেস করতে মঙ্গল দাস প্রথমেই আপনার নাম করল, আর আপনার কী কী চুরি করেছিল তাও কবুল করল। আপনি নাকি ইচ্ছে করলেই তাকে ধরাতে পারতেন, কিন্তু ধরান নি। ভয়ানক শ্রদ্ধা আপনার ওপর। আপনার সঙ্গে আমার খাতির আছে শুনেই একবার দেখা করিয়ে দেবার জন্য দু'হাত জুড়ে আকৃতি। নিয়ম নেই, বাট আই মে ট্রাই, আসুন তো একবার বিকেলে—

চোখের সামনে একদিনের ছবি ভেসে উঠল। বোর্ডিংয়ের বাজার সেদিন আমার হাতে। বাজার করে ফিরছিলাম—মঙলার দু'হাতে দুটো বড় বোঝা, পিছনে মুটে। মঙলা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল।

অদূরে একটা ভিখিরি গোছের লোক তার সাত-আট বছরের একটা ছেলেকে বেদম মারছে। মার খেয়ে ছেলেটা ফুটপাতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, কিন্তু তবু বাপের রাগ কমছে না।

মঙলা হঠাৎ হনহন করে এগিয়ে গেল। তারপর হাতের বোঝা মাটিতে রেখে হাড়-জিরজিরে লোকটার ঝাকড়া চুলের মুঠি ধরে ঠাস ঠাস করে দুই গালে দুটো পেল্লায় চড়। কাছাকাছি যারা ছিল সকলে হতভম্ব, এমন কি যে লোকটা মার খেল সেও। দাতে দাত ঘষে মঙলা বলে উঠল, এ-সব ছেলে জন্মায় কেন —জন্মায় কেন পাজী শুওর কোথাকার।

লোকটার হাতে চারআনা পয়সা গুজে দিয়ে আমি মঙলাকে একরকম ঠেলে নিয়ে বোর্ডিংয়ে ফিরি।

বোর্ডিংয়ের মাসিক ফিস্ট-এর দিন সেটা অতএব আনন্দের দিন কিন্তু রাত পর্যন্ত মঙলার থমথমে মুখ। একসময় ওকে ঘরে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম সকালে ওভাবে লোকটাকে কেন মারল?

ও গুম হয়ে বসে রইল খানিক। তারপর হঠাৎ কপালে হাত দিয়ে বলল, এটা দেখেছেন?

কপালে মস্ত একটা পুরানো ক্ষতচিহ্ন। মুখের দিকে তাকালে ওটাই আগে চোখে পড়ে। বলে গেল, এই দশা ওর মা করেছে, তখন ওর বয়েস আট কি নয়। ফুটপাতে থাকত। ওর পাঁচ বছর বয়সে বাবা মারা যায়। তার পরের ক'বছরের মধ্যে আরো দুটো ভাই-বোন এসেছিল। তাদের বাবা কে মঙলা জানে না। মা ওকে যখন-তখন ধরে বেদম ঠেঙাত। একদিন ও রাগ করে খাবার ফেলে দিয়েছিল বলে চুলের মুঠি ধরে মা ওকে মাটিতে ফেলে থেতলাতে লাগল। কপাল ফেটে চৌচির—রক্তে ভেসে গেল। মা ওকে সেদিন মেরেই ফেলত বোধহয়, অন্য লোকের জন্য পারেনি। মায়ের হাত

থেকে ছাড়া পেয়ে ও ছুটে পালিয়েছিল। কপালের ক্ষতের মধ্যে অনেক ময়লা ঢুকে যেতে শরীর বিষিয়ে গেছল। কদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল জানে না, জ্ঞান হতে দেখে একটা হাসপাতালে পড়ে আছে। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে আর ও মায়ের খোঁজ করেনি।

...আজ ভিখারিটা তার ছেলেকে ও-ভাবে মারছিল যখন, ওর মনে হচ্ছিল সেই মার যেন ওর গায়ে পড়ছে।

এর পর দিনে দিনে মঙলার জীবনের আরো অনেক খবর আমি জেনেছিলাম। .দশ বছর বয়সে ও একজনের কাছে আশ্রয় পেয়েছিল। পেয়েছিল কারণ ও একটু একটু গান গাইতে পারত। ভিক্ষে পেতে সুবিধে হয় বলে মায়ের কাছে মার খেতে খেতে গান শিখতে হত। আশ্রয় যে দিয়েছিল তার নাম চিন্তামণি। তার কাছে ছ বছরের একটা মেয়ে ছিল—নাম গৌরী। মোটাসোটা মেয়েটা দেখতে একেবারে মন্দ নয়। কার মেয়ে কোথাকার মেয়ে কেউ জানে না। মঙলা এসে জোটার পর চিন্তামণি ওদের হর-গৌরী সাজিয়ে পয়সা রোজগারের রাস্তা ধরল। রোজ রং মেখে সং সেজে ওদের পথে বেরুতে হত—হর-গৌরীর নাচ নাচতে হত, গাইতে হত সেই সঙ্গে, চিন্তামণি ভাঙা হারমোনিয়াম বাজাতো। রাস্তায় ছেলেমেয়েদের ভিড় জমে যেত, বাড়ির একতলায় দোতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা মজা দেখত, নাচগান শেষ হলে পয়সা ছুড়ে ছুঁড়ে দিত।

এক-একদিন চিন্তামণির বেশ ভালো রোজগার হত। পরিশ্রম খুব হত, পায়ের সুতো ছেঁড়ার দাখিল হত। কাহিল হয়ে পড়লে চিন্তামণি কষে ঠ্যাঙানি লাগত। তবু এই নেচে-গেয়ে রোজানোটা ভারী পছন্দের জিনিস ছিল মঙলার। দশ থেকে আঠেরো এই আট বছর এমনি কেটেছে। তার পরেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। গৌরীর তখন চোদ্দ বছর বয়েস, কিন্তু দেখাতো সতের-আঠেরোর মতো। তার আশেপাশে রাজে লোক জুটতে লাগল। মঙলাও তখন কুসঙ্গে মেশা শুরু করেছে, তাই সবই সে বুঝতে পারে। আরো একটা বছর টেনেটুনে কাটানো গেল। তারপর আর গেল না—গেল না মঙলার জন্যেই। পনের বছরের গৌরীর নাচ সকলে হা করে গেলে, চোখে-মুখে কুৎসিত ইঙ্গিত করে। অথচ তার মত ধাড়ী ছেলের নাচ যেন সকলের চক্ষুশূল, হেসে হেসে টিটকিরি দেয়। হর-গৌরী পালার মধ্যে দুজনে কাছাকাছি হলে সকলে হৈ-হৈ করে ওঠে।

ঘরে ফিরে মঙলা রাগ করে, আর গৌরী হি-হি করে হাসে। কখনো ফিরে ঝাঝ দেখিয়ে বলে, লোক অমন করবে না তো কি—গায়ে হাত দেবার সময় তুই আজকাল সাপটে ধরতে চাস আমাকে! কার চোখে ধুলো দিবি?

রেগতিক দেখলেই মঙলা ওকে ধরে মার লাগাতো। আর মার খেলেই গৌরী ফুঁসে উঠত। ফলে আরো বেশি মার খেত। মেয়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে বেশ। ফাঁক পেলে রাজে ছেলের সঙ্গে ফিসফিস গুজগুজ করে। ওদিকে নাচ প্রায় বন্ধ, খাওয়া জোটে না। মঙলা এখানে-সেখানে বা কারখানায় কাজের ধান্ধায় বেড়ায়।

একদিন ঘরে ফিরে দেখে ঘর খালি। গৌরীও নেই, চিন্তামণিও নেই। এরপর ছ'বছর কেটেছে। এই ছ'বছর ধরেই মঙলা ওদের খুঁজেছে। ও তখন পঁচিশ বছরের জোয়ান। ওদের পেলে দু'জনকেই খুন করত। না পাওয়ার আক্রোশে আরো বেশি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। বয়েসকালের মেয়ে দেখলেই ওর শিরায় শিরায় আগুন জ্বলত। কারখানায় চাকরি করত—মদ খেত, জুয়া খেলত আর দুরন্ত আক্রোশে ব্যাভিচারের পাতাল চষে বেড়াতো।

কারখানায় কাজ করার সময় হারানের বউ পদ্মর সঙ্গে যোগাযোগ। হারান কলে কাটা পড়ে মরেছে। তার বউটা রোজগারের আশায় আসে। বেশ সুশ্রী মেয়ে। অনেকেরই চোখ গেছে তার দিকে। কিন্তু মঙলার চোখও আটকেছে যখন, কারো ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে পদ্মর দিকে এগোবে।

কিছুদিনের ঘনিষ্ঠতার পর পদ্ম ওর জুলুমে পড়ে সেই রাতে ওকে ওর ঘরে আসতে বলল। অল্পস্বল্প নেশা করে মঙলা ওর ঘরে গেল। বেশি নেশা করলে আনন্দ মাটি। মাথায় আর এক ক্ষুধার আগুন জ্বলছে বলে সময়ের একটু আগেই গিয়ে পৌঁছুল।

ঘরে পা দিয়েই হতভম্ব সে। পদ্ম ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। সে কি কান্না! তার বুকের কাছে হারানের একটা পুরনো ফোটো। অদূরে একটা কচি ছেলে আর একটা কচি মেয়ে বসে বোবা-বিস্ময়ে মায়ের বুকফাটা কান্না দেখছে।

মুহূর্তের মধ্যে মঙলা কেমন যেন হয়ে গেল। পদ্মকে জেরা করে শুনল, হারান একদিন তাকে পথের থেকে ঘরে এনে তুলেছিল। মঙলা পাথর। মনে পড়ল, মায়ের সঙ্গে রাস্তায় রাত কাটতো যখন, তারও বোন ছিল একটা। এ সে-ই কিনা কে জানে! ঠিক সে না হোক, সেই রকমই একজন।

সেই থেকে মঙলা অন্য মানুষ। একে একে অনেক ছেড়েছে তারপর থেকে। কারখানার চাকরিও ছেড়েছে। না ছাড়লে পাতাল তাকে টানত। সেই বোর্ডিংয়ে চাকরি নিয়েছিল। পদ্মকে আর ছেলেমেয়ে দুটোকে হারানের দেশের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মাসের শেষে আমাকে দিয়ে যে মণি-অর্ডার ফর্ম লিখিয়ে টাকা পাঠাতো, সে ওই পদ্মর কাছে।

ওর দুর্ভাগ্য, তাই ওই সময় গৌরীর সঙ্গে আবার দেখা। পথে দেখা প্রথমে হঠাৎ একদিন চিন্তামণির সঙ্গে। ওই বয়সেই চিন্তামণি বুড়িয়ে গেছে। হাঁপ-রোগে ভুগছে। মাথার চুল সাদা। মঙলাকে সে-ই তার বস্তিঘরে টেনে নিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, মঙলা যা ভাবতে পারেনি তাই হয়েছে। মঙলা ভেবেছিল পুঁজি হাতছাড়া হবার ভয়ে চিন্তামণি গৌরীকে সরিয়েছিল। গৌরী ওর পুঁজি। কিন্তু তা নয়, গৌরীকে ও-ই জোর করে বিয়ে করেছে। গৌরীর থেকে চিন্তামণির বয়েস কম কারে এক-কুড়ি বেশি। কিন্তু ষোল বছরের মেয়েটাকে ও নিজেই খেয়েছে। তারপর সাত বছর কাটতে এই হাল।

গৌরীর দিকে প্রথম প্রথম মঙলা চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। যৌবনেরই আগুন যেন ওর সর্বঅঙ্গে বাসা বেঁধেছে। নড়লে-চড়লে ঝলসে ওঠে। হাসলে পরে উছলে পড়ে।

ঘরে একটা তিন বছরের রোগাটে ছেলে। গৌরীর ছেলে। বোবা-মূর্তি মঙলা তাকেই একটু আদর করছিল, চিন্তামণি তখন বাইরে চা বানাচ্ছিল—সেই ফাঁকে গৌরী বেশ কাছে এসে কোমরে দু'হাত দিয়ে ছদ্ম ভ্রূকুটি করে সকৌতুকে তাকে দেখছিল। ছেলেকে আদর করতে দেখে হেসে গুনগুন করে গেয়ে উঠেছিল, হায় গো হায়, বাই না পাই, দুধের সাধ ঘোলে মেটাই।

সেই থেকে মঙলার মাথায় আবার আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল। প্রায়ই ইচ্ছে হত চিন্তামণিকে খতম করে দিয়ে সবদিক পরিষ্কার করে ফেলে।

কিন্তু দেখা হলেই হেপো রোগী চিন্তামণি ওর কাছে দুঃখ করত। বলত, গৌরী তাকে দেখতে পারে না, এমন কি ওর ওপর রাগে রোগা ছেলেটাকে পর্যন্ত দেখতে পারে না। চিন্তামণির ধারণা, একটা পালাগানের দল ওকে না করে দিতে পারলে আর বেশিদিন ওকে ধরে রাখা যাবে না। ছেলেবেলার সেই ঝোক গৌরীর এখনও কাটেনি। এক বাড়িতে গৌরী এখন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনটে ছেলেমেয়ে রাখার কাজ করে। সেই বাবুটির বউ নেই। বাবুর মতলব ভাল নয় বুঝেও গৌরী তাকে আসকারা দেয়। কিছু বললে উল্টে শাসায়, শিগগীরই পালাগানের দল না করে দিলে ও যার সঙ্গে খুশি তার সঙ্গে চলে যাবে।

কিন্তু পালাগানের দল খোলার মত টাকা চিন্তামণি পাবে কোথায়?

রঙ্গ করে গৌরী একদিন চিন্তামণির সামনেই মঙলাকে বলেছিল, তুমি যোগাড় করে দাও না টাকা, তুমি তো আমার প্রথম পক্ষের শিরঠাকুর গো, ভাগে-সাগে না হয় দুজনেরই ঘর করা যাবে। এমন কী দোষের, দ্রৌপদী তো পাঁচজনের ঘর করত। বলেই খিলখিল হাসি। এত হেসেছিল বলেই কথাটায় তেমন দোষ ধরেনি চিন্তামণি। কিন্তু মঙলার মাথার আর বুকের জ্বলুনি বেড়েই গেছল।

একদিন সকাল থেকে মঙলার দেখা নেই। বোর্ডিংয়ে ফিরল সন্ধ্যার পর। উসকো-খুসকো মূর্তি। দেখলেই বোঝা যায় বিশেষ কিছু ঘটেছে। রাত্রিতে ওকে ঘরে ডেকে এনে ব্যাপার শুনলাম। গৌরী তার বাবুর বাক্স থেকে তিনশ টাকা চুরি করে চিন্তামণির হাতে দিয়েছে। প্ল্যান ছিল ভোরবাতে ওরা পালাবে, তারপর দূরে কোথাও গিয়ে ওই টাকা দিয়ে পালাগানের দল গড়বে। কিন্তু মঙলার মতে চিন্তামণি বুদ্ধিমান লোক, সে জানে পালাগানের দল হোক বা না হোক, গৌরী একদিন তাকে ছেড়ে চলে যাবেই। তাই কড়কড়ে তিনশ' টাকা হাতে পেয়ে মাঝরাতে উঠে সে একাই পালিয়েছে। ওদিকে বাবু পুলিশে খবর দিতে তারা এসে গৌরীকে টানাহেঁচড়া করছে। গৌরী অবশ্য স্বীকার করেনি, কিন্তু স্বীকার না করে যাবে কোথায়? বাবুর বাড়ি গিয়ে তার হাতেপায়ে ধরেছিল, বাবু শেষ পর্যন্ত বলেছে টাকা পেলে ফয়সলা করে নেবে।

তারপর?

তারপর মঙলা গৌরীর ঘরে গেছে। এলোপাথারি কিল-চড় মেরেছে তাকে। মেরে এখানে চলে এসেছে। বলল, ও আমার হাতে একদিন ঠিক খুন হবে। একথা আগেও বলেছে।

পবদিন আমাব ঘড়ি, পেন আব সোনাব বোতাম চুবি এবং মঙলা নিখোঁজ।

পুলিশ অফিসাবকে মঙলা ঠিকই বলেছে, একটু তৎপব হযে গৌবী দাসীব বস্তি-ঘবেব আশেপাশে পুলিশ মোতাযেন কবলেই আমি ওকে ধবতে পাবতুম।

বিকেলে পুলিশ অফিসাবেব ঘবে গেলাম। তিনি বললেন, আপনাব মঙ্গল দাস লোকটাব মশাই মেজাজ এখনও তিবিক্ষি। কবুল কববাব ফিকিবে ওকে জিজ্ঞেস কবেছিলাম, কৃতকর্মেব জন্য অনুশোচনা হচ্ছে কিনা। ও তাব জবাবে খানিক চুপ কবে থেকে আমাকে ফিবে জিজ্ঞেস কবল, মানুষ মবলে ফিবে আবাব জন্মায় কিনা। বুঝুন ঠেলা--অর্থাৎ আবাব জন্মালে আবাব ও গৌবী দাসীকে খুন কববে।

একটু বাদে মঙলাকে আমাব সামনে এনে হাজিব কবা হল। তাব হাতে শেকল, পাযে বেড়ি, কোমবে দড়ি। আমি আতকে উঠলাম—প্রেত-মূর্তি যেন।

অফিসাব আমাকে দেখিযে জিজ্ঞেস কবলেন, কী, চিনতে পাবো?

জবাবে যতটা সম্ভব ঝুকে শেকল-বাঁধা-হাত কপালে ঠেকিযে আমাকে প্রণাম কবল। আমাকে অবাক কবে দিযে পুলিশ অফিসাব উঠে দাঁড়িযে ওকে বললেন, বাবুব সঙ্গে কথা বল, আমি একটু কাজ সেবে আসি—কিছু ভয় নেই।

ঘব ফাকা। বাইবে অবশ্য প্রহবী মোতাযেন বলে ধাবণা আমাব। তাছাড়া এ-বকম অবস্থায ওই একটা সামনেব দবজা দিযে কাবো পালাবাব প্রশ্ন ওঠে না। তবু কেমন অস্বস্তি বোধ কবতে লাগলাম।

বাবু ভালো আছেন?

আমি সচকিত।—হ্যা। কিন্তু এ কী হলো।

জবাবে ও ওপবেব দিকে ঘাড় উঁচিযে তাকাল একবাব। তাবপব বিড়বিড় কবে বলল, সবই অদেষ্ট। একটু বাদেই ওব গর্তেব চোখ দুটোতে আগ্রহেব ছোযা লাগল। —আচ্ছা বাবু, মানুষ মবলে আবাব জন্মায?

পুলিশ অফিসাব এ প্রশ্নেব যাই তাৎপর্য বুঝুন, আমি বুঝতে পাবলাম না।—জানি না।...কেন বল তো?

জবাব দিল না। চুপ কবে খানিক ভাবল কি। তাবপব অনুনযেব সুবে বলল, বাবু, আপনাব কাছেও আমি অপবাধ কবেছি, তবু দযা কবে আপনি আমাকে ক্ষমা কবেছেন। আব একটুখানি দযা চাইব বাবু..?

আমি জিজ্ঞাস্।

মঙলা বলল, গৌবীব বোগা ছেলেটাকে ওবা অনাথ আশ্রমে বেখেছে শুনলাম...আমাব কিছু টাকা আছে, হক্কেব টাকা, সেটা যাতে ওই ছেলেটাব ভালোব জন্যে খবচ হয আপনি সে ব্যবস্থা কবে দেবেন—দেবেন?

বললাম, আচ্ছা সে হবে'খন, আগে তো কেসটেস হোক।

এবপব দু'চাব কথায ব্যাপাবটা শোনা গেল।...চুবিব দায থেকে খালাস পেযে গৌবী যেন কেনা দাসী হযে গেল মঙলাব। নিজেকে ওব কাছে বিলিযে দিযে ওব নেশা ধবিযে দিল। মঙলা দূবেব এক কলে কাজ নিযেছিল, প্রতিজ্ঞা কবেছিল, আমি

ওকে পুলিশে ধরিয়ে দিলাম না বলেই ও রোজগার করে চুরির দেনা শোধ করবে। হপ্তার ছুটির দিনে গৌরীর বস্তিতে আসত, একদিন থেকে আবার চলে যেত।

কিন্তু গৌরী আসলে ওকে ভালবাসত না, ভয় করত। ভিতরে ভিতরে যে অন্য লোক জুটিয়েছে সেটা বোঝা গেল বছর না ঘুরতে। দুই-একবার ধরা পড়ে ওর হাতে বেদম মার খেল গৌরী। মার খেয়ে কিছুদিন ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, তারপর আবার বেচাল শুরু হয়। একবার খাওয়ার দোষে ওর রোগা ছেলেটা মর-মর, ভাবনা-চিন্তায় মঙলা রাতে ফ্যাক্টরী থেকে পালিয়ে বস্তিতে এসে দেখে সেই বিপদের দিনেও রাতের আঁধারে বেড়ার গায়ে দাঁড়িয়ে বাবুগোছের একটা লোকের সঙ্গে গৌরী ফিসফিস করছে। ওর সাড়া পেয়েই লোকটা পালিয়ে গেল।

সেই রাতে হাড়ভাঙা মার খেয়েও মঙলা দেখেছে, গৌরীর দু'চোখ বাঘিনীর মতো জ্বলছে। এর ক'মাসের মধ্যে মঙলা যে করেই হোক স্থির বুঝেছিল, গৌরী ওকে ছেড়ে পালাবে। বুঝেছিল, কারো সঙ্গে পালাবার ষড়যন্ত্র পাকা করে এনেছে। এই পর্যন্ত বলে মঙলা থামল।

আমি বলে উঠলাম, ও-রকম একটা মেয়ের জন্য নিজের এতবড় বিপদ ডেকে আনলে?

আবার একটু চুপ করে থেকে মঙলা বিড়বিড় করে জবাব দিল, কোন মেয়ের জন্য নয় বাবু, গৌরীকে খুন না করলে ওর হাতে একটা শিশু খুন হত। নিজের ছেলেটাই সব থেকে বড় কাঁটা, ওকে একেবারে সরিয়ে দিয়ে পালাবার মতলব ভেজেছিল ওরা।..আগেরবারে খাবারের সঙ্গে বিষও গৌরীর ওই লোকই দিয়েছিল।...বুকে ছোরা বসাবার পর চোখের জলে ভেসে গৌরী সব স্বীকার করে গেছে।

ঘরে পুলিশ অফিসারের সামনে বোকার মতো আমি বসে। উনি বললেন, এ ঘরের আপনাদের সব কথা ওদিক থেকে শোনার ব্যবস্থা আমি আগেই করে রেখেছিলাম। ...ভেরি স্যাড ইনডিড।

অন্যমনস্কের মতো বাড়ি ফিরছি। পর পর কতগুলো দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসছে।...একটা ভিখিরি তার ছেলেকে মারছে দেখে হাতের মোট নামিয়ে ক্ষিপ্ত আক্রোশে মঙলা তাকে মেরে বসল।...আদিম রিপুর তাড়নায় পদ্মর ঘরে গিয়ে সেই কান্না দেখে, আর তার থেকেও বেশি—সেখানে দুটো অসহায় নির্বাক শিশুমূর্তি দেখে ওই উচ্ছৃঙ্খল মঙলার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল।...আর তারপর, ওই মঙলা আর একটা অসহায় শিশুর আসন্ন মৃত্যুভয়ে গৌরী দাসীকে খুনই করে বসল।... কেন, পথের ছেলে মঙ্গলা কি ওদের মধ্যে নিজেকেই দেখত?

চমকে উঠলাম। কানে যেন বিড়বিড় স্বরের একটা উৎসুক প্রশ্ন আঘাত করল।--আচ্ছা বাবু, মানুষ মরলে আবার জন্মায়?

...মঙলা আজীবন তার জন্মটাকে ঘৃণা করেছে। আবার একটা জন্মের অভিশাপ ও বহন করতে চায় না।

আশা আর বাসা

ছিল পোস্টমাস্টাবেব মেযে। নিজে কিছুকাল কবল স্কুল-মাস্টাবি। তাবপব হযে পডল কলেজেব মাস্টাবেব বউ।

জীবনেব এই কোনো ক্ষেত্রই পছন্দ নয। পোস্টমাস্টাব বা স্কুল-মাস্টাব অথবা কলেজেব মাস্টাব যে তাব চক্ষুশূল এমন নয, ববং পোস্টামাস্টাব বাবাটিকে সে ভালই বাসত, তাঁব সদা খুঁতখুঁতে মনোভাব দেখে বেশ মজা পেত। ড্রযাবে একটা কাগজ বাখলেও তিনবাব কবে খুলে দেখতেন ঠিক বেখেছেন কিনা। কাবো হাতে একটা দশ টাকাব নোট দিলে দু'তিনবাব অন্তত সেটা টেনে নিযে আঙ্গুলে ঘষে দেখতেন একটাব জাযগায দুটো বেবিযে গেল কিনা।

নিজে যতদিন স্কুল-মাস্টাবি কবেছে ততদিন খুব যে নিবানন্দে ছিল তাও নয। ববং সমবযসী সতীর্থদেব সঙ্গে হেসে-খেলে দিন কাটিযেছে। তাদেব সুখ-দুঃখেব সঙ্গে নিজেকে যুক্ত কবেছে।

আব কলেজেব মাস্টাবেব বউ হবাব জন্যেও কেউ তাকে বাধ্য কবে নি। নিজেব ইচ্ছেতেই হযেছে। ঘবে প্রায সর্বদাই পাঠ আব পঠনবত অল্পবযসী একটি সিবিযস মুখ দেখে এক-এক সময সে বেশ কৌতুকই অনুভব কবত। কোন সময বা টেনে টেনে ছডা কাটত, বাম গরুডেব ছানা হাসতে তাদেব মানা—। ফলে ইতিহাসেব তরুণ মাস্টাবেব অনেক সময়ই পাঠ-পঠনেব মনোযোগ বসাতলে যেত। তাব হাসিতে প্রমাণ মিলত হাসিব বসদ পেলে তাব হাসতে তেমন মানা নেই, আব বাতেব নিভৃতে এই টিপ্পনীব দরুণ দস্তুবমত হামলা কবে চডামাশুলও আদায় কবতে চেষ্টা কবত। তখন সমর্পণেব হাল ছাডতে খুব মন্দও লাগত না।

তবু এই তিনেব একটা ক্ষেত্রও যে পছন্দ নয তাব কাবণ ওব নিজেব চবিত্রগত উচ্ছলতা। ওই তিনেব কোন ক্ষেত্র থেকেই সেটা পবিপূর্ণ বসেব জোগান পেত না। উচ্ছল সত্তা বিকশিত বা বিস্তৃত হবাব মতো সেগুলিব একটাও তেমন প্রশস্ত নয, উর্বব নয—মানিযে নিতে পাবলে দিন এক বকম কবে কাটে, এই পর্যন্ত। কিন্তু বর্ণশূন্য দিনযাপনেব সহিষ্ণুতা তাব কম। ববং বর্ণেব অনুশীলনে সেটা কত ভাবে কত বকমে উজ্জ্বল হতে পাবে সেই কল্পনাব সঙ্গে তাব মানসিক যোগ।

এবও কাবণ আছে।

নাম বাখি। আগে গাঙ্গুলি ছিল। কলেজেব মাস্টাবেব ঘবে এসে চক্রবর্তী হযেছে। বাখি চক্রবর্তী। বর্ণবিলাসী কল্পনাব সঙ্গে তাব মানসিক যোগেব কাবণ বিশ্লেষণ এই নাম থেকেই শুরু কবা যেতে পাবে।

ওব বাবাবা পাঁচ ভাই। জলপাইগুডিতে একান্নবর্তী পবিবাব। তাঁদেব কেউ স্কুল মাস্টাব, কেউ উকিল, কেউ কেবানী। বাবা পোস্টমাস্টাব আব ছোট কাকাব স্টেশনাবি দোকান। বাখিব বাবা সেজ। বাখিব চাবটি নিজস্ব দাদা। বড জ্যাঠা আব মেজ জ্যাঠাব চাবটি কবে ছেলে। বড কাকাব ছয ছেলে। ছোট কাকাব পাঁচ ছেলে। সব মিলিযে বাডিতে ছেলেব সংখ্যা তেইশ। আব একটি মাত্র মেযে—সে বাখি। মেজ জ্যাঠাব নাকি

একটা মেয়ে হয়েছিল। সে দেড় বছরের বেশি টেকেনি। বাড়িতে মেয়ের দুর্ভিক্ষ। সাধারণত লোকে ছেলে হলে খুশি হয়, কিন্তু এ বাড়িতে ছেলের মুখ দেখতে দেখতে এমন অবস্থা যে ছেলে হলে মন-মেজাজ খারাপ হয়। ছোট কাকিমার কাছে রাখি শুনেছে, ওর ছোড়দা যখন হল, মায়ের সে কি কান্না। কে নাকি হাত দেখে মাকে বলেছিল এবারে ছেলে হবে।

এহেন পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ আগন্তুক কন্যা। স্বভাবতই তার আদর, তার কদর, তার প্রশ্রয় অন্যরকম। ও এসেছে তাই আনন্দ ধরে না, শেষ পর্যন্ত টেকে কি টেকে না ভিতরে ভিতরে সেই শঙ্কা। সেই কারণেই নাম—রাখি। তা ছেলেবেলা থেকে সকলে মাথায় করেই রেখেছে তাকে। বৃহৎ পারিবারে অনটনের ছায়া পড়েই ছিল। কিন্তু সেটা একমাত্র ওকেই স্পর্শ করে নি কোনদিন। যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। বাবা না দিলে কাকা-জ্যাঠারা দিয়েছে। বছর পনের বয়েস পর্যন্ত অন্তত চাইলে পায় না এমন কিছু আছে বলেই সে ভাবতে পারত না। তার চোখে তখন পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়াটাই বর্ণে গন্ধে আনন্দে ভরা।

স্কুল ফাইন্যাল থেকে বি.এ. পাস করার চারটে বছরের মধ্যে পর পর ক'টা বিপর্যয়ে সেই রংদার দুনিয়ার সব বর্ণ সব গন্ধ আর সব আনন্দ যেন কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেল চোখের সমুখ থেকে। আর যে বাস্তব মুখব্যাদান করে তার সামনে এগিয়ে এলো সেটা যেমন নীরস, তেমনি অকরুণ। পনের বছর পর্যন্ত যে মেয়েটা সব পেয়েছে, এ বাস্তবের সঙ্গে তার আপোস করে চলাটা সহজ নয়।

ওই চার বছরের গোড়ায় বড় কাকা চোখ বুজলেন। তারপর বড় জ্যাঠা। শেষে বি. এ. পাস করার ছ'মাস আগে তার বাবা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের তাপ্পি-মারা নৌকোটা হঠাৎ যেন খান-খান হয়ে গেল।

বি. এ. পাশ করার আগেই রাখি গাঙ্গুলি যেন অকূল পাথারে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। নিজের এবং খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো তেইশটি দাদার মধ্যে মতের মিল থেকে অমিলই বেশি। অনেকেই বিয়ে-থা করেছে, অনেকেই বাইরে চাকরি-বাকরি করছে—কিন্তু পৈতৃক বাড়ির বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে যার ভিন্ন-মতে মাথা ঘামাতেও কসুর করছে না। একান্নবর্তী পরিবারের জমিজমা কিছু ছিল।। চার বছরের মধ্যে সেসব শূন্যে মিলিয়ে গেল। পৈতৃক বাড়িতে যারা থাকে তাদের প্রতি যারা থাকে না তাদের যেন একধরণের অনুকম্পামিশ্রিত উদারতা। ইচ্ছে করলে ওই বাড়িও বেচে দেওয়ার দাবি তোলা যেতে পারে, ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে গেলে তো কারো ভাগেই কয়েকখানা করে ইঁট-কাঠের বেশি কিছু পড়বে না। অতএব বেচে দেবার দাবি না তোলাটা প্রকাশ্য উদারতা ছাড়া আর কি।

বাবা মারা যাবার কিছুদিনের মধ্যে জানা গেল ভদ্রলোক মেয়ের বিয়েবাবদ আলাদা করে কিছু টাকা রেখে গেছেন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা মা আর ছেলেরা পাবে। এ টাকাটা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত। আলাদা। বড়জোর হাজার পাঁচেক হবে—তাই নিয়েই আড়ালে-আবডালে কথা। যে জ্যাঠা আর কাকা মারা গেছেন, তাদের ছেলেদের সংশয়, এত খরচের মধ্যে বাবা মেয়ের জন্যে ওই টাকা জমালেন কী করে? শেষের কয়েকটা বছর এই একান্নবর্তী সংসার পরিচালনার ভার রাখির বাবার ওপরেই ছিল।

অপরের কথা দূরে থাক, একমাত্র ছোট বোনের প্রতি বাবার পক্ষপাতিত্ব দেখে দাদারাও কেউ কেউ গম্ভীর। তার কারণ, তারা দেখেছে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার একটা বড় অংশই বাবা ধারে কমিয়ে রেখে গেছেন। সেই কারণেই ছোট বোনের নামে পাঁচ হাজারের অঙ্কটা তাদের চোখে খুব কম ঠেকেনি।

বি. এ. পরীক্ষার মাত্র মাসতিনেক আগে বড়দার কথা শুনে তো রাখির চোখে জলই এসে গেছল। গম্ভীর মুখে বড়দা মাকে বলছিল, পরীক্ষার জন্যে আবার কতগুলো টাকা খরচ করে কী হবে, পড়াশুনায় যা মন আর যা মাথা, নির্ঘাৎ ফেল করবে আর টাকাগুলোও যাবে। তার থেকে চেষ্টা-চরিত্র করে বিয়েই দিয়ে দাও, ঝামেলা মিটে যাবে।

মা অবশ্য দাদার কথায় কান দেয়নি। আর পরীক্ষার ফীসও ছোট কাকা নিজে থেকে ডেকে দিয়েছে ওকে। কিন্তু বড়দার কথা শুনে ও যত না দুঃখ পেয়েছিল তার থেকে তাজ্জব হয়েছিল ঢের বেশি। বাড়ির একটামাত্র এত আদরের মেয়ে সে কিনা এরই মধ্যে ঝামেলার সামিল। যেমন-তেমন করে তাকে বিদায় করতে পারলে ঝামেলা মেটে।

সেই প্রথম নিজের ওপর ভয়ানক রাগ হয়েছিল রাখি গাঙ্গুলির। পড়াশুনায় তার কোনদিন খুব একটা মন ছিল না সত্যি কথা। প্রতিবার যখন পরীক্ষা-সংকট একেবারে নাকের ডগায় এগিয়ে আসে তখনি প্রতিজ্ঞা করে, ঠাকুরের দয়ায় সেবারের মতো কোনরকমে উতরে গেলে জীবনে আর পড়াশুনায় গাফিলতি করবে না। কিন্তু উতরে যাবার পর প্রতিজ্ঞার কথা আর মনে থাকে না। কিন্তু তা বলে পড়শুনা করলে পাস না করার মতো মাথাও নেই তার? বরং স্কুলে পড়তে টিচাররা উল্টো কথাই বলত। বলত, মেয়েটার মাথা ছিল, পড়াশুনা মন দিয়ে করলে ওই সোমা মিত্রর থেকেও ভালো করত। সোমা প্রতি বছর একগাদা প্রাইজ নিয়ে বাড়ি ফিরত। বি. এ.-তেও সে অনার্স পড়ছে আর আশা করছে ভালো রেজাল্ট করবে। নিজের ওপর রাখির রাগ এই জন্য, কেন এতগুলো বছর সে হেলায় হারালো, কেন সকলের জিব নাড়া বন্ধ করার মতো রেজাল্ট করল না আগাগোড়া।

যাই হোক, সাংসারিক বিপর্যয়ের পর বিশেষ করে বাবা মারা যাবার পর রাখি গাঙ্গুলি বেশ টের পাচ্ছিল সে কোন মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। খানিকটা নিজের ওপর আর সকলের ওপর রাগ করে, খানিকটা ঝোঁকের মাথায়, আর খানিকটা বা বেগতিক দেখে পরীক্ষার কটা মাস এমন পড়াই পড়ল যে শুধু পাশ নয়, ডিস্টিংশনে পাস।

পাস করার পর বাবার মৃত্যুটা যেন আরো বেশি অনুভব করল সে। বাবা বেঁচে থাকলে যেমন করে হোক কলকাতায় থেকে এম. এ. পড়ার ব্যবস্থা করা যেত। উৎসাহের আতিশয্যে মনে মনে একটা হিসেব করে ফেলল সে। যে পাঁচ হাজার টাকা বাবা ওর নামে রেখে গেছেন তার থেকে দু'বছরে হাজার আড়াই খরচা করে কলকাতার কোনো হস্টেলে থেকে এম.এ-টা পড়ে ফেললে কেমন হয়? কিন্তু মাকে এ প্রস্তাবে রাজি করানো গেল না। তার পড়াশুনার ব্যাপারে বাড়ির মধ্যে আগ্রহ ছিল একমাত্র যে মানুষটির তিনি ছোট কাকা। তিনিও এ প্রস্তাবে সায় দিলেন না।

ফলে প্রায় একটা বছর বেকার দশা। মাঝে দু'মাস একমাসের জন্য যে স্কুলে পড়ত সেই স্কুলে কাজ করেছে। কোনো টিচার ছুটিছাটায় গেলে তবে সেরকম কাজ মেলে।

ইতিমধ্যে ওর সহপাঠিনী এবং স্কুল-কলেজের ভালো মেয়ে সোমার মস্ত ঘরে বিয়ে হয়ে গেল। সোমা এমন কিছু রূপসী নয় তার থেকে। বরং স্কুল-কলেজে পড়তে করলা নদীর ধারে অথবা তিস্তার চরে ওরা দল বেঁধে হুটোপুটি করত যখন, সেদিককার ছোঁড়াগুলোও দল বেঁধে আসতই। ওর সঙ্গেই গায়ে পড়ে বেশি আলাপ করতে চেষ্টা করতে, আর পাত্তা না দেবার ফলে ওকেই বেশি জ্বালাতন করত।

কিন্তু বিয়েটা ওদের মধ্যে সোমারই সব থেকে ভালো হল। বান্ধবীদের বিয়ে আরো কারো কারো হয়েছে, কিন্তু সোমার মতো কারো নয়। সোমার বাবার টাকার জোর ছিল, অঢেল খরচ করেছেন তিনি। ছেলে আই এ এস অফিসার। আর সেই বিয়ের রাতে সোমাকে যেন রাজকন্যার মতো লাগছিল রাখির। সোমার পরে আরো দুই-একটি অন্তরঙ্গ বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে। তাতেও ঘটা মন্দ হয়নি। এ-সবের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকায় নিজের বিয়ের চিত্রটা এত অনুজ্জ্বল ঠেকেছে চোখে যে মনে হয়েছে তার থেকে বিয়ে না হওয়াই ভালো। বান্ধবীদের কাছে যে মাথাটা তার একেবারেই নীচু হয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মোট কথা পনের বছর বয়েস পর্যন্ত বহু আদর আর প্রশ্রয়ের মধ্যে চরিত্রের যে ভিত গড়ে উঠেছে রাখি গাঙ্গুলির, বিশ বছর বয়সের প্রতিকূল ধারার মধ্যে পড়ে সেটা বিপর্যস্ত হয়েছে শুধু—একটুও বদলায়নি।

এক বছর বাদে স্কুলেই চাকরি পেল। সরকারী স্কুলের চাকরি। অনেক ডিস্ট্রিক্ট স্কুলেই টিচার নেওয়া হচ্ছিল, এবারে তার ডিস্টিংশনের ছাপটাই কাজে লেগে গেল। এম. এ. বা অনার্স হলে আরো ভালো হত, মাইনে আরো কিছু বেশি পেত। যাই হোক, চেষ্টা-চরিত্র করলে কাছাকাছি থেকেই চাকরিটা করতে পারত। কিন্তু মনের আনন্দে সে দার্জিলিংয়ে চাকরি নিয়ে বসল। দার্জিলিং-এ থেকে চাকরি করবে এতে যেন নিজের কাছেই তার মর্যদা খানিকটা বেড়ে গেল। মনের আনন্দেই চাকরি করতে এলো।

কিন্তু এ আনন্দ খুব বেশিদিন থাকল না। গোড়ায় গোড়ায় হাতে যা পেত, ভাবত অনেক টাকা। কিন্তু কয়েকটা মাস না যেতে মাইনের অঙ্কটা কেমন জ্যোতিশূন্য ঠেকতে লাগল চোখে। তার প্রধান কারণ, সে হিসেব করে খরচ করতে জানে না। চোখে বা মনে কিছু ধরলে সেটার অধিকার না মেলা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। দার্জিলিংয়ের মতো জায়গায় শীতের ভব্যসভ্য বেশবাসের ব্যবস্থাতেই অনেক খরচ। এ ব্যাপারে স্কুল মিসট্রেস বলে সে মান খাটো করতে রাজি নয়। তার ওপর খাওয়া-দাওয়া আর প্রসাধনসামগ্রীর খরচ। মাস কাবার হবার আগে প্রতিবারই দস্তুরমতো ফাঁপরে পড়ে যায় রাখি গাঙ্গুলি।

এই কারণেই স্কুলের চাকরির ওপর বিরূপ সে। মাইনেটা আরো শ'দেড়েক টাকা বেশি হলেও মনের আনন্দে কাটাতে পারত। টিচাররা আর মেয়েরাও সৌখিনভাবে থাকে। আড়ালে তাকে নিয়ে কথাও হয়, এটুকু বাড়তি মর্যদার মতো। এর থেকে

নেমে আসতে মন সবে না। সেই ছেলেবেলা থেকেই দৃষ্টি উঁচুর দিকে, তার কী দোষ। দোষ ভাবে না, কিন্তু মাসের শেষে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই শৈল-শিখরেই সুবীরকান্তর সঙ্গে আলাপ এবং পরিণয় বিধিলিপি।

সুবীরকান্ত চক্রবর্তী এখানকার কলেজের নতুন মাস্টার। নতুন বলতে দার্জিলিং-এ নতুন। হুগলি না কোথাকার কোন কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসেছে।

এ-সব পরের বৃত্তান্ত।

বিকেলে ম্যাল বা বাজারের দিকে সেজেগুজে বেড়াতে বেরিয়ে রাখি গাঙ্গুলির দিনকয়েক মনে হল দূর থেকে এক অল্পবয়সী ভদ্রলোক তাকে নীরবে লক্ষ্য করে। তা লক্ষ্য অমন অনেক সময় অনেকেই করে। এখানে মৌসুমের সময় বেড়াতে যারা আসে, পাহাড় দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের যেন মেয়ে দেখে বেড়ানোর বাই চাপে। এ তো তবু তার দিকে চেয়ে থাকে, রাখি এও দেখেছে, নীচের থেকে বেড়াতে এসে এখানে খেটে আর মেহনতী করে খায় যে মেয়েগুলো, হ্যাংলার মতো লোকগুলো ওদের দিকেও তাকিয়ে থাকে।...কিন্তু এ লোকটার তাকানোটা সে-রকম মনে হয়নি রাখির। বেশ পরিষ্কার চাউনি, আর বেশ একটু উৎসুক ভাব।

একদিন লেবংয়ের পথে দেখা হল। রাখি নামছিল আর লোকটা উঠছিল। ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছল। রাখিও থামলে এগিয়ে এসে কথাই বলত হয়ত, কিন্তু রাখি দাঁড়ায়নি বা থামেনি। স্কুল-টিচারের এ-ধরণের গায়ে-পড়া আলাপ বরদাস্ত করা ঠিক নয়, এটুকু জ্ঞান তার আছে।

আর একদিন জলাপাহাড়ে দেখা। এই দিন আর আলাপ ঠেকানো গেল না। মাঝে মাঝে এসে বসে এখানে। সহকর্মিণীরাও সঙ্গে থাকে প্রায়ই। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ আসেনি, রাখি একাই বসে গুনগুন করে গান গাইছিল। এক সময়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে অদূরে লোকটা দাঁড়িয়ে। উৎসুক দৃষ্টি, ঠোঁটের ডগায় সামান্য হাসির আভাস। চোখাচোখি হতে দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানিয়ে লোকটা এগিয়ে এলো।

—কিছু মনে করবেন না, আপনার নাম রাখি গাঙ্গুলি?

সরাসরি একেবারে নামের ওপর চড়াও না হলে এই আলাপের ইচ্ছেটা রাখি বাতিলই করে দিত। কারণ এক্ষুনি সুলতাদি বা মুখরা রমলাদি ওদের কেউ এসে গেলে জেরার চোটে রাখিকে অস্থির করে মারবে। কিন্তু অচেনা লোকের মুখে নিজের নাম শুনে বিরক্তির বদলে অবাক হল। মাথা নাড়তে আবার প্রশ্ন হল, আপনি জলপাইগুড়ির মেয়ে আর ওমুকের ভাইঝি তো?

ছোট কাকার নামই করল। কিন্তু এবারের প্রশ্নটা কেন যেন খুব মার্জিত ঠেকল না রাখির কানে।

এবারেও মাথা নেড়ে মৃদু প্রশ্ন করল, আপনি?

লোকটা জবাব দেবার আগে আরো একটু কাছে এগিয়ে এলো। পাশে বসেই পড়ে কিনা সেই ভয় রাখির। হাসিমুখে জবাব দিল, আমি জলপাইগুড়িতে আমার

কাকাব বাড়িতে অনেকবাব কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি। আমাব কাকা আপনাব কাকাব খুব বন্ধু। তখন আপনাকে তিন্তাব ধাবে অনেকবাব দেখেছি।

কাকাব যে নাম কবল, সেটা বিলক্ষণ চেনাই বটে। বাখিব ছোট কাকাব অন্তবঙ্গ বন্ধু শুধু নয়, সে বাড়িতে বাখি বা বাখিব মাযেব যাতাযাতও আছে। ওদেব বাড়িব মেযেবাও তাদেব বাড়িতে আসে। কিন্তু কাকাব বন্ধুব ভাইপোব সঙ্গে আব আলাপ বাড়ানোব ইচ্ছে খুব নেই বাখিব। সুলতাদি-বমলাদিবা আসাব আগে সবে গেলেই ভালো হয। তাই নিস্পৃহ একটা উক্তি বেরুলো গলা দিযে—ও..।

কিন্তু লোকটাব কেটে পড়াব ইচ্ছে নেই বোঝা গেল। হাসিমুখে বলল, আমাব নাম সুবীবকান্ত চক্রবর্তী—এবাব এখানে আসাব আগেও জলপাইগুড়িতে কাকাব বাড়ি হযে এসেছি। কাকা আপনাব কথা বলছিলেন, আপনি এখানকাব স্কুলে কাজ কবছেন। .দেখা কবে আলাপ কবতে বলেছিলেন, আপনাব কাকাও বলেছিলেন। হাসল। কিন্তু ক'দিন আপনাকে দেখেও ঠিক ভবসা পেযে উঠিনি। আব আপনাব সঙ্গে প্রাযই অন্য মেযেবাও থাকেন. .তাই একদিন আপনাদেব বোর্ডিংযেই যাব ভাবছিলাম।

আলাপে এগোতে ভবসা পেযে ওঠেনি পর্যন্তই শুনতে খাবাপ লাগেনি। নিতান্ত সৌজন্যেব খাতিবেই বাখি গাঙ্গুলি জিজ্ঞাসা কবল, এখানে বেড়াতে এসেছেন?

এই সমান্য প্রশ্নটাই যেন একটা পাথব ছেড়ে পবেব পাথবটায বসে পড়াব পাসপোর্ট। কিন্তু জবাব যা পেল তা শোনাব জন্যে খুব প্রস্তুত ছিল না বাখি গাঙ্গুলি। বলল, বেড়াতে এলে তো কবেই পালিযে বাঁচতাম। এসেছি এখানকাব কলেজে মাস্টাবি কবতে। কী কুক্ষণেই যে বদলি হতে বাজি হলাম।

কলেজেব মাস্টাব শুনে বাখি এবাব এবং এই প্রথম কাছে থেকে ভালো কবে দেখল মানুষটাকে। ছোট কবে ছাঁটা চুল, চাকচিক্যশূন্য সাদামাটা মুখ—কেবল চাউনি ভাবি পবিষ্কাব আব উজ্জ্বল। চোখ দুটো লক্ষ্য না কবলে মানুষটাকে নিবীহ বোকা গোছেব মনে হবে।

—এখানকাব গভর্নমেন্ট কলেজে?

—হ্যাঁ, তাছাড়া আব বদলি হযে আসব কী কবে? .এসে এই দু'মাসেব মধ্যেই হাপ ধবে গেছে, এখন থেকেই কবে পালাতে পাবব ভাবছি।

কলেজেব মাস্টাব শোনাব পব আগেব মতো আব অবজ্ঞাব চোখে দেখা গেল না লোকটাকে। বাখি জিজ্ঞাসা কবল, কেন?

—প্রথম কাবণ, এখানকাব অভদ্র বকমেব শীত। একেবাব জ্বালিযে মাবলে। দ্বিতীয কাবণ, বাস্তাঘাট। হয নাক উঁচিযে উঠতে হবে, নযতো চোখ পাযে ঠেকিয়ে নামতে হবে—আব তৃতীয কাবণটাই আসল, এখানে এ মাইনেয পোষায না, এখানে চাকবি কবতে হলে মাইনে ডবল হওযা উচিত।

জবাবটা বেশ স্বচ্ছ ঠেকল কানে। অথচ এই বযসেব লোকেব শীতে কাবু হওযা বা উঁচু-নীচু পথেব দরুণ বিতৃষ্ণ হওযা তেমন বীবোচিত সমস্যা বলে ঘোষণা কবা উচিত নয। আব শেষেব উক্তিব সঙ্গে বাখিও একমত। কিন্তু এই সামান্য আলাপেব মধ্যে খবচায না পোষানোব কথাটা বাখি গাঙ্গুলি অন্তত বলে ফেলতে পাবত না।

কিন্তু একজন কলেজের মাস্টার আর একজন স্কুল মাস্টারকে এ-কথা বলছে বলেই হয়ত ঝরঝরে স্পষ্টোক্তির মতো লাগল কথাগুলো।

পিছনে বমলাদির গলা শুনে বাখি সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল। সুলতাদি আর বমলাদি দুজনেই এদিকে আসছে। বমলাদি বোধহয় পাথরে হোঁচট-টোচট খেয়েছে, তার গলা দিয়ে অস্ফুট একটা কাতর শব্দই বেরিয়ে এসেছে। সুবীরকান্তও ফিরে তাকিয়েছে। সুলতাদি হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।

কাছে এসে দজনেই গম্ভীর। বমলাদি আরো বেশি। সুবীরকান্ত তাদের উদ্দেশ্যে দু'হাত কপালে তুলল। জবাবে তারা একবার মাথা নেড়ে সপ্রশ্ন গম্ভীর দৃষ্টিতে বাখির দিকে তাকালো।

বাখি তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিল, ইনি এখানকার গভর্নমেন্ট কলেজের প্রোফেসার, সুবীরকান্ত চক্রবর্তী, দার্জিলিংএ নতুন এসেছেন—

সুবীরকান্ত সবিনয়ে বলল, প্রোফেসার হবার আশা শিগগীরই আছে বটে, তবে এখনো লেকচারার।

বমলাদি গম্ভীরমুখে সুলতাদিকে বলল, বোসো সুলতা। নিজেও একটা ছোট পাথরে বসে সদ্যপরিচিতের দিকে তাকালো।—আমরা স্কুলমাস্টার, তাই কলেজের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটরকেও প্রোফেসার বলে সম্মান দেখাই, আপনি হবু প্রোফেসার যখন আমাদের চোখে প্রায় ভাইস প্রিন্সিপাল।

মাত্রা-ছাড়ানো রসিকতার কথা শুনে সুবীরকান্ত হাসতে চেষ্টা করল একটু। সুলতাদি ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসল, বাখির সঙ্গে আগে আলাপ ছিল না, এখানে নতুন এসে আলাপ হল?

এদের এই বেশি-বেশি কথা বিচ্ছিরি লাগছিল বাখির। সুবীরকান্ত জবাব দিল আলাপ আজই তবে জলপাইগুড়িতে আগেও দেখেছি ওকে, আমার কাকা আর ওর কাকা বিশেষ বন্ধু।

—ও। বমলাদি গম্ভীরমুখেই মাথা নাড়ল।—সেই জন্যেই, নইলে কলেজের মাস্টাররা স্কুলের মাস্টারদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

সুবীরকান্ত জবাব দিল, তা কেন, অবস্থা তো দু'জনেরই সমান।

সুলতাদি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল ফোড়ন কাটল, দার্জিলিংয়ের উঁচু জায়গায় এসে আপনার দৃষ্টির অধোগতি হয়েছে দেখছি—কলেজে কী পড়ান, ফিলসফি নিশ্চয়ই?

—আজ্ঞে না, ইতিহাস।

ছদ্ম-বিস্ময়ে সুলতাদি তার সহচরীর দিকে ফিরল।—তুমিও তো ইতিহাস পড়াও বমলাদি, এ-রকম সাম্যবাদের কথা আছে নাকি কোথাও?

ঠোঁট উল্টে বমলাদি জবাব দিল, ঢের। সুলতান মামুদ নাদিরশা, তৈমুর লং মন্দির দেখলেই ধ্বংস করেছে, ছোট বড় তফাত করেনি, আর খুন করার সময়ও মেয়ে-পুরুষে তফাত রাখেনি। তারপর ইংরেজ...হিন্দু মুসলমান ফরাসী শিখ—কাউকে ছোট করে দেখেনি, সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

দুই মহিলাব দ্বারা এ-ভাবে আক্রান্ত হয়ে আর শেষে সাম্যবাদের এই বেপেরোয়া বিশ্লেষণ শুনে সুবীবকান্ত গোবেচারার মতো হাসতে লাগল। রাখি ভাবছে, লোকটা বুদ্ধিমান হলে এবাব তার উঠে পালানো উচিত।

সুলতাদি বলল, রমলাদি একটু বেশি কথা বলেন, আপনি কিছু মনে কববেন না যেন।

হাসিমুখে মাথা নেড়ে সুবীরকান্ত এবাবে উঠেই দাঁড়াল।—না, এখানে এসে পর্যন্ত একঘেয়ে লাগছিল, আলাপ হয়ে আজ সময়টা ববং ভালই কাটল। আচ্ছা, আবাব দেখা হবে নিশ্চয—

সুলতাদি সায দিল, নিশ্চয, আমবা তো প্রাযই আসি এখানে।

সকলেব উদ্দেশে নমস্কাব জানিযে সুবীবকান্ত প্রস্থান করল। সেদিকে খানিক চেযে থেকে বমলাদি ডাকল, বাখি—

এবাবে তাকে নিযে পড়বে ওরা, বাখি ভালই জানে। সদ্যপরিচিত একটা লোকেব সামনে এই গোছেব বাচালতা তাব ভালো লাগছিল না। ডাক শুনে তাকালো শুধু।

—একটা গান কব তো।

বাখি কোনদিন গান করেও নি, গান জানেও না। কিন্তু এই ফর্মাসেব তাৎপর্য বুঝেছে। এই দুজনেব মধ্যে বমলাদির মুখখানাকেই সকলে বেশি সমঝে চলে। বযেস ছত্তিবিশ, দেখতে ভালো নয, বিয়ে-থা হবাব আশা নিজেও আব বাখে না। কিন্তু এতটুকু বসেব হদিস পেলে আব বক্ষা নেই।

—তোমাব প্রাণে বাতাস লেগে থাকে তো তুমি কবো!

টেনে টেনে বমলাদি বলল, লেগেছে, ছত্তিবিশেব প্রাণে বাহাত্তুবে বাতাস, গান কব না একটা, আজ বোধহয চেষ্টা কবলে পাববি।

বাখি হেসে ফেলল।

অমনি সোজা হয়ে বসে চোখ পাকালো রমলাদি।—আবাব হাসি! বলি, এক কাকাব ভাইপো'ব সঙ্গে আব-এক কাকাব ভাইঝি'ব কিছু একটা হযে-টযে যাবার সম্ভবনা আছে?

বাখি প্রায রাগ কবেই বলল, তুমি একটি অসভ্য।

—ও! আব নিজেরা যে নিরিবিলিতে ঘেঁষাঘেঁষি হযে বসেছিলি? স্কুলের কোনো মেযে দেখে ফেললে?

বাখি প্রতিবাদ কবল, ঘেঁষাঘেঁষি মানে। ভদ্রলোক তো ওই পাথবে বসেছিল।

সুলতাদি ইন্ধন যোগালো, পাহাড কিনা, নীচে থেকে ঘেঁষাঘেঁষি মনে হয।

—হোক। পাহাডটা কী আমাব, ভদ্রলোক এসে বসলে কী করব?

বমলাদি তক্ষুনি জবাব দিল, দুটো কাজ কবতে পারতিস। আসামাত্র বলে উঠতে পারতিস, এসো নাথ, আমি উমা, শিবের তপস্যায এই শৈলশিখবে বসে মাথা খুঁড়ছি! নয়তো এসে বসামাত্র পাথর তুলে তাডা কবতে পারতিস! কিছুই যখন করলি না, বুঝতে হবে তোর মনে অনিশ্চযতাব পাপ ঢুকেছে।

নিরুপায় রাখি আবাবও হেসেই ফেলল।

এখানেই যে প্রজাপতির নির্বন্ধ সেটা বাখি দিনকতকের মধ্যেই জেনেছে। আর সেটা এমন আচমকা জানা যে সে হকচকিয়ে গেছল।

তার আগে কটা দিন সুবীরকান্তর সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হয়েছে। কোনদিন বমলাদি-সুলতাদির সামনে, কোনোদিন বা একা। এই দেখা হয়ে যাওয়াটা যে লোকটার সক্রিয় চেষ্টার ফল সেটা বুঝতে বেগ পেতে হয়নি। বমলাদি-সুলতাদির ঠাট্টা-তামাসায় নাজেহাল হয়ে লোকটার প্রতি বাখি বলতে গেলে একটু বিরক্তই তখন।...কলেজের মাস্টার, এমনিতে হাবভাব গম্ভীর, কিন্তু তার মধ্যেই তার প্রতি উৎসুক-উৎসুক ভাবটা বাখি টের পায়। বমলাদি সুলতাদি আরো বেশি টের পায়। তাকে একলা দেখলে যেন আরো বেশি খুশি হয়। গায়ে পড়ে নিজের কাকার কথা বলে, ওর কাকার কথা, বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করে, স্কুলে কী পড়ায়, উঁচু ক্লাসে পড়ায় কিনা খোঁজ নেয়—আর কিছু কথা না পেলে বমলাদি-সুলতাদির প্রশংসা করে।

বাখিও মনে মনে বলে—সুবীরকান্ত না হ্যাংলাকান্ত।

কিন্তু আচমকা সেদিন এক অভাবিত মানসিক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল বাখি গাঙ্গুলি।...বমলাদি আর সুলতাদির সঙ্গেই জলাপাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল, কিছুদূরে ওই মূর্তি। গম্ভীর মুখে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বমলাদি গলা দিয়ে একটা চাপা শব্দ বার করে বাখিকে বলল, একটু ভাঁওতাবাজী করব?

—যা খুশি করগে। ভ্রূকুটি করে বাখি জবাব দিল।

—আচ্ছা তুই রোসগে যা। বলেই সুলতাদির হাত ধরে টেনে বমলাদি ভাঁওতাবাজী করতে চলল। বাখি একাই তাদের বসার জায়গায় উঠে গেল।

কিন্তু মিনিট সাতেক না যেতেই অবাক সে। তক্ষুনি বুঝে নিল বমলাদি ভাঁওতাবাজীটা আসলে কার সঙ্গে করেছে। তার দিকেই একলা উঠে আসছে সুবীরকান্ত, ওরা দু'জন নিপাত্তা।

কাছে এসে সামনের পাথরটায় বসে পড়ল। তাড়াতাড়ি ওঠার দরুণ অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। বলল, এ-রকম শরীর খারাপ নিয়েও পাহাড়ে ওঠা-নামা করেন কী করে, আশ্চর্য। তার ওপর আজ সমস্ত দিন কিছু খাননি শুনলাম।

বাখির রাগই হচ্ছে, সেই সঙ্গে বিব্রতও কম নয়। জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ওঁরা কোথায়?

—ওঁরা বাজারের দিকে গেলেন। বললেন, শরীর খারাপ তাই আপনার জন্যে ফল কিনতে যাচ্ছেন, আর আমাকে বললেন, গল্প করার ইচ্ছে থাকলে ওপরে চলে যান। হাসল। বমলা দেবী আবার ঠাট্টা করলেন, আমার বরাতেও কিছু ফল-টল জুটতে পারে।...আমি বেশ পেটুক আছি জানেন, এবারে আসার আগে আপনার মা আমাকে একদিন খুব যত্ন করে খাইয়েছিলেন...কী চমৎকার রান্না তাঁর।

কী থেকে কী কথা। বাখি অবাক, আমার মা?

—হ্যাঁ, কাকা নিয়ে গেছলেন। খুব ভালো লেগেছিল তাঁকে।

বাখি ভেবেই পেল না তার মা হঠাৎ এই লোককে আদর-যত্ন করে খাওয়াতে গেল কেন? সুবীরকান্ত অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করল, যাক, আপনার কী হয়েছে বলুন তো?

—কিছু না।

—সমস্ত দিন কিছু খান নি শুনলাম যে?

—খেয়েছি। ঈষৎ বক্রসুরে জবাব দিল, তাছাড়া দার্জিলিংয়ের বাতাস খেলেও কিছু কাজ দেয়।

—বলেন কি! আমার তো উল্টে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। হাসছে।...ওঁরা তাহলে ঠাট্টা করেছেন, আমি কিন্তু আজ সত্যি আপনাকে খুঁজছিলাম—দেখা না হলে হয়ত আপনার বোর্ডিংয়েই চলে যেতাম।

বমলাদি আর সুলতাদির জন্যেই মেজাজ প্রসন্ন নয় রাখির। অন্তরঙ্গ উক্তিটা তাই স্পর্ধার মতো ঠেকল কানে। জিজ্ঞাসু দু'চোখ তার মুখের ওপর থমকালো।

সুবীরকান্ত বলল, সামনে চার দিন ছুটি আছে, আপনাদেরও ছুটি নিশ্চয়, ভাবছি একবার জলপাইগুড়ি ঘুরে এলে হয়।...যাবেন?

—না।

এ-রকম সাদাসাপ্টা জবাব আশা করেনি সুবীরকান্ত। মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে আবার বলল, ছুটির মধ্যে এখানে বসে থেকে কী করবেন, চলুন না একসঙ্গে ঘুরে আসি।

রাখির রাগ চড়ছে। মাসের শেষে হাত খালি, ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া হত না। কিন্তু অসহিষ্ণুতার আসল কারণ, লোকটার হ্যাংলামি দেখে। মাত্র ক'টা দিনের আলাপে এ-রকম অনুরোধ করার মতো অন্তরঙ্গতা কিছু হয়নি। কিন্তু কলেজের মাস্টারের সঙ্গে কত আর অভদ্র ব্যবহার করতে পারে। আরারও সংযত জবাবই দিল, না, আমার যাওয়া সম্ভব নয়।

একটু চুপ করে থেকে লোকটা দ্বিধান্বিত মুখে হাসল একটু। তারপর বলল, আপনি বোধহয় বিরক্ত হচ্ছেন, কিন্তু এদিকে আমি একটু মুশকিলে পড়ে গেছি...যাবেন না যখন, ঝোঝাপড়াটা এখানেই সেরে নিই...আপনার সত্যই শরীর খারাপ নয় তো?

এবারে রাখি অবাক। গোড়া থেকেই আজ কথাবার্তার সুর অন্যরকম ঠেকছিল কানে। জবাব না দিয়ে মুখের দিকে তাকালো শুধু।

সুবীরকান্ত পকেট থেকে খাম বার করল একটা। তারপর সেটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, দার্জিলিংয়ে আসার পর আমার কাকার এই তিন নম্বর চিঠি। পড়ুন—

বিস্ময়ের ওপর বিড়ম্বনা।—আমি কেন!

—আপনার আর আপনার মায়ের ব্যাপার নিয়ে লেখা। পড়ুন।

—রাখি খামটা নিল। খুলল। কিন্তু পড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দেহের রক্তকণাগুলো বুঝি মুখের দিকে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিল। একটু অনুযোগের সুরেই ভাইপোকে কাকা লিখেছেন, এর আগে দু'দুটো চিঠি লিখেও আসল প্রসঙ্গের জবাব পাননি। দার্জিলিংয়ে আসার সময় সে কথা দিয়ে গেছল রাখি গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করে এবং আলাপ করে তার মতামত জানাবে। এদিকে ভদ্রমহিলা (রাখির মা) আশায় দিন গুনছেন আর প্রায় রোজই খোঁজ নিচ্ছেন ভাইপোর মতামত কিছু জানা গেল কিনা। ভরসা পেলেই মেয়েকে তিনি চিঠি লিখতেন। কোনো খবর না পেয়ে মহিলা

ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছেন। কাকা লিখেছেন, পছন্দ যদি না-ই হয়ে থাকে তো এভাবে ঝুলিয়ে না রেখে সেটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে অসুবিধে কি? শেষের মন্তব্য, তাঁব মতে মেয়েটি ভালো এবং অপছন্দের নয়, ভাইপো এখানে বিয়ে কবলে ব্যক্তিগতভাবে তিনি খুশিই হতেন।

চিঠি শেষ করতে গিয়ে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে বসেও রাখি ঘেমে ওঠাব দাখিল। চিঠি খামেব মধ্যে পুরে রাখতে গিযেও হাত কাঁপছে যেন। ও যতক্ষণ চিঠি পডছিল, সুবীরকান্ত ওর মুখের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারেনি। বিডম্বিত রমণী-মুখের এমন মিষ্টি কারুকার্য আর বুঝি দেখেনি। হাত বাডিযে খামটা নিল।

রাখি আব এদিকে ফিরে তাকাতেও পারছে না।

একটু অপেক্ষা করে সুবীবকান্ত বলল, এখন আমাব মত আমি জানাতে পারি, কিন্তু একতবফা মতেব উপব তো কিছু নির্ভব কবছে না, কী জবাব দেব বলুন?

নিজেকে রাখি বচনপটু বলে জানত। কিন্তু এখন আর গলা দিযে শব্দ বেরুতে চায না। এমন আচমকা বিডম্বনাব মধ্যে জীবনে পডেনি। সামনেব দিকে চোখ বেখেই বলল, এ সম্পর্কে আমি কিছু ভাবিনি।

—ঠিক কথা।...আপনাব মা আপনাকেও লিখলে পাবতেন, তাহলে এ-বকম বিব্রত বোধ কবতেন না। তাঁব বোধহয় ধাবণা, আমাব মত পেলেই আটকাবে না। সে যাক, আপনার ভাবার সুবিধের জন্যে নিজেব সম্পর্কে দুই-একটা কথা বলে বাখি। জলপাইগুডিব ওই এক কাকা ছাডা আমাব তিনকূলে আব কেউ নেই। ম্যাট্রিক থেকে এম.এ. পর্যন্ত স্কলাবশিপেব টাকায পডেছি। বি.এ. আর এম. এ. দুটোতেই ফার্স্টক্লাস পেয়েছি। একেবারে প্রোফেসারি পাওযাব কথা ছিল, কিন্তু পিছনে সুপাবিশের জোব না থাকায় লেকচারাবেব পোস্ট অ্যাকসেপ্ট কবতে হযেছে, আব এক-আধ বছবেব মধ্যে প্রোফেসার হব আশা কবাটা খুব বেশি হবে না বোধহয।

এতগুলো কথা শোনাব ফাঁকে রাখি কখন এদিকে মুখ ফিবিয়েছিল জানে না। কথা শেষ হতে খেযাল হল দু'জনে দুজনাব দিকে চেযে আছে। তাডাতাডি মুখ ফেবাল আবাব।

সুবীবকান্ত উঠে দাঁডাল।—আচ্ছা আব বিবক্ত কবব না, ভেবে আমাকে জানাবেন।

চলে যাচ্ছে। বাখি সেদিকে চেযে আছে। যতক্ষণ দেখা গেল চেযেই বইল। তাবপব খেযাল হল, বমলাদি সুলতাদি এক্ষুনি ফিবে এসে তাকে নিয়ে পডবে।

উঠে হনহন কবে সেও বোর্ডিংযেব উদ্দেশে নেমে চলল। গিযে কোন বকমে ঘবেব দবজা বন্ধ কবতে পাবলে হয। ভিতবটা কেমন যেন দিশেহারা হযে পডেছে তাব। আবার সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে, পাহাডী শহবটার বঙ যেন এক মুহূর্তে বদলে গেছে।...প্রথম দিন এসে আলাপ কবা থেকে এ-পর্যন্ত লোকটার কোনো আচবণই এখন আর বিসদৃশ লাগছে না।

কটা দিনের মধ্যে রাখি আর বোর্ডিং ছেড়ে বেরুতেই পারল না। কী একটা সঙ্কোচ যেন পায়ে জড়িয়ে আছে তাব।

নিজেব বিযেব সম্পর্কে ওব নিজেবই কোনো স্পষ্ট ধাবণা ছিল না। বিয়েব কল্পনা কবেনি এমন নয়—কবেছে যখন বেশ ঘটা কবেই কবেছে। কল্পনায ঘটা কবতে দোষ কী? সেই সম্ভাব্য জীবনেব মানুষকে এক-সময সর্ব-যোগ্যতাব চূড়ায তুলেও বসিযেছে। তাব সঙ্গে আব যাই হোক, কলেজেব মাস্টাব সুবীবকান্ত চক্রবর্তীব মিল নেই। কিন্তু নিজেব এই সংগোপন কল্পনাটাকে বাখি গাঙ্গুলি বাস্তবেব মর্যাদা কখনো দেযনি। ববং আচমকা যে মানুষটা এগিযে এসেছে তাকেই এখন অন্যবকম লাগছে।. চেহাবা সাদামাটা হলেও চোখদুটো ভাবী উজ্জ্বল। কথাবার্তাগুলোও স্পষ্ট আব স্বচ্ছ। ম্যাট্রিক থেকে এম.এ. পর্যন্ত স্কলাব, এও খুব কম কথা নয়। তাব ওপব স্কুল-মাস্টাব তো নয, প্রোফেসাব। প্রোফেসাব আব লেকচাবাবে এখনো খুব তফাত দেখে না সে।

. সেদিনেব নিজেব ব্যবহাবে বাখি নিজেই লজ্জা পাচ্ছে। কী কবে জানাবে ভিতবে ভিতবে এই ব্যাপাব চলেছে। বমলাদি আব সুলতাদিব ঠাট্টাতামাসা—কলেজ-মাস্টাবেব হ্যাংলামি ছাড়া আব কিছু ভাবতে পাবেনি। চাবদিনেব ছুটি শুযে বসে কেটে যাচ্ছে, একসঙ্গে জলপাইগুড়ি গেলেও মন্দ হত না। অন্তত ওবকম ঠাস-ঠাস জবাব না দিলেও হত।

আবাব বিযেটা এখানে যে হযেই যাবে, চিন্তাব এই নিশ্চিত প্রশ্রযেও গা ভাসাতে পাবছে না।. বিযেব বাজাবে এই সব ছেলেব দামও কম নয। কতটা আশা কবে বসে আছে ঠিক কি? যদিও খুব বেশি আশা কবছে বলে তাব মনে হয না। তবু তাকে এখানে এই বডলোকী চালে থাকতে দেখে কী ভেবে বসে আছে ঠিক কী? তাদেব বাড়ি-ঘবেব ভেতবেব অবস্থা ঠিকঠিক জানে কী না তাই বা কে জানে। মাযেব তো ওই পাঁচ হাজাব টাকা সম্বল।

চিন্তা যে ভাবেই করুক, বাইবে বেরুবাব জন্যে ভেতবটা কদিন ধবে ছটফট কবছিলই। সেদিন সকালে মাযেব একটা চিঠি পেল। অন্যান্য পাঁচকথাব পব মা লিখেছে, ওমুকেব ভাইপো সুবীবকান্ত নামে একটি ছেলেব সঙ্গে তাব ইতিমধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হযেছে কিনা জানাতে। ছেলেটি এখানকাব কলেজেব প্রোফেসাব। তাকে দেখে আব তাব সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুবই ভালো লেগেছিল। আশা ছিল, নির্বন্ধ থাকলে এখানেই বাখিব বিযেটা দিযে নিশ্চিন্ত হতে পাববে। তাব কাকাও আশা দিয়েছিল। এতদিনেও কোনো খবব না পেযে মনে হচ্ছে—হবে না। ছেলেটিব হযত আবও বড ঘবে বিযে কবাব ইচ্ছে। তবু এ-বকম কোনো ছেলেব সঙ্গে কখনো দেখা হযেছে কিনা মেযেকে জানাতে লিখেছেন।

সেই বিকেলেই বাখি চুপচাপ একা না বেবিযে পাবল না। বাস্তায নেমেই বুকেব ভেতবটা কেমন টিপটিপ কবতে লাগল।

জলাপাহাড়েই উঠল।

কেউ কোথাও নেই।...নিজে থেকে এসে আন্দাজে কোথায খুঁজবে? একবাব ভাবল ম্যালেব দিকটা ঘুবে এদিকে এলে পাবত। আবাব ভাবছে সেটা যেন বেশি বেশি হবে। পবিচিত জাযগাটা ছেড়ে আবো খানিকটা পিছনদিকে পাহাড়েব আড়ালে গিযে বসল।

এরও মনস্তত্ত্বগত কারণ আছে। বমলাদি সুলতাদি এসে পড়লে দূর থেকে দেখে ভাববে কেউ নেই। কিন্তু যে কারণে এই সাবধানতা, তাবই দেখা মিলবে কিনা কে জানে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দেখা মিলল। কাছে এসে দাঁড়াল। আগেব দিনের মতো সামনে বসে পডল না। বলল, সেদিন ও-কথা বলে আপনাকে এতটা বিব্রত বা বিবক্ত করা হবে বুঝতে পারিনি। ক'টা দিন আপনার বেরুনোই বন্ধ হযে গেল। যাক, আপনার দিক থেকে কোনো সঙ্কোচের কারণ নেই, ও ব্যাপাবে স্বাধীন মতামত তো সকলেবই থাকা স্বাভাবিক। কিছু মনে কববেন না, দ্বিতীয়বার আর বিরক্ত কবব না।

বাখি ফাঁপবে পডল। ও যে বুদ্ধিব পবিচয দিযেছে—এই রকমই ভাবা স্বাভাবিক। ...এবাবে চলেই যাবে বোধহয। অতএব তাড়াতাডি জিজ্ঞেস কবল, আপনি জলপাইগুড়ি যান নি?

সুবীবকান্ত হাসল একটু। প্রশ্নটা যেন আশাপ্রদ ঠেকল কানে। বলল, যে জন্যে যাবাব চিন্তাটা মাথায় এসেছিল তাব আলোচনা তো এখানেই হয়ে গেল। এবপর কিছু না জেনে সেখানে একলা ছুটে লাভ কী?

বাখি নীবব আবাব। কী ভাবে যে প্রাসঙ্গিক আলাপটা শুরু কববে ভেবে পাচ্ছে না।

—আপনি কী ভেবেছিলেন আমি জলপাইগুডি চলে গেছি?

এবাবে বাখি একটু বুদ্ধিমতীব মতো কাজ কবল। হাঁ-না কিছুই জবাব না দিয়ে অল্প একটু হেসে বলল, বসুন।

ক'দিনেব মধ্যে দেখা না মেলাব একটাই অর্থ ধবে নিয়েছিল সুবীবকান্ত। তাকে এডাবাব চেষ্টা। কিন্তু এই সামান্য অভ্যর্থনাব ফলেই সংশয় দেখা দিল। সামনেব পাথরে বসে ঈষৎ আগ্রহ নিযেই তাকালো তার দিকে।

অন্য দিকে চোখ বেখে মৃদু গলায রাখি বলল, আজ সকালে আমিও মাযেব চিঠি পেযেছি।

আবো কিছু শোনার আশায সুবীরকান্ত অপেক্ষা কবল একটু। তাবপব জিজ্ঞাসা কবল, আমি কী ধবে নেব, আমার সেদিনেব প্রস্তাবটা বাতিল হযে যায নি?

চোখ তুলে বাখি একবাব তাব দিকে না তাকিযে পাবল না। আব তাব পবেই সঙ্কোচ কেমন কমে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, আমাদেব বাডিব সব খবব আপনাব জানা আছে?

সুবীবকান্ত অবাক একটু।—কী খবব?

আবো মৃদু সুরে বাখি জবাব দিল, আমাদেব বাড়ির অবস্থা-টবস্থা...

বলাব পব নিজেরই বিচ্ছিবি লাগল বাখিব। অনুরাগ-পর্বের যেটুকু জানা আছে তাতে কোনো মেযে নিজে মুখ ফুটে এ-কথা বলেছে বলে শোনেনি। ওদিকে বক্তব্যটা বোধগম্য হতে সুবীবকান্ত তার দিকে চেয়ে হাসছে মিটি মিটি। বলল, কাকা কিছু কিছু বলেছেন, কিন্তু ও নিয়ে আমি মাথা ঘামানো দরকার মনে করিনি।...আমি গরিবের ছেলে, রাজত্ব বা রাজকন্যাব আশা রাখি না, শুধু মনের মতো একটি কন্যা পেলেই খুশি।

কথাগুলো কান পেতে শোনার মতো। রাখির সমস্ত মুখে লালের আভা ছড়াচ্ছে। হাসছে অল্প অল্প। হাওয়া অনুকূল সেটা সুবীরকান্ত বুঝে নিয়েছে। তাই আরো কিছু বলার লোভ সংবরণ করতে পারল না। সামনের দিকে আর-একটু ঝুঁকল। হাসছে। —বললে বিশ্বাস হবে কিনা জানি না, বছর আটেক আগে একবার কাকার কাছে এসে তিস্তার চরে কতগুলো মেয়েকে হুটোপুটি করতে দেখতাম। তার মধ্যে একটি মেয়েকেই ভারী জীবন্ত মনে হত আমার। তারপর আরো অনেকবার এসেছি, অনেকবার দেখেছি, কিন্তু দার্জিলিংয়ে এসে কাকা যে সেই মেয়েকেই দেখতে বলে দিয়েছিলেন এতবার করে, কী করে জানব।

লজ্জা সত্ত্বেও রাখি আবার তার চোখ না তুলে পারল না। এই মুহূর্তে যেন একটা অদ্ভুত ভালো লাগার স্বাদ তার অস্তিত্ব ভরাট করে তুলছে।

সুবীরকান্ত সরাসরি কাজের কথায় চলে এলো এবার।—এখন তাহলে আমি আমার কাকাকে চিঠি লিখতে পারি?...হাঁ কী না বলো?

মুখে বলা গেল না। রাখি হাসিমুখে মাথা নেড়ে সায় দিল। পুরুষগুলো এত চট করে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে চলে আসে কী করে ভেবে পায় না।

ভাবতে না পারার আরও একটু বাকি ছিল। মাথার ওপর একটা চলতি মেঘ যে আরো একটু আচমকা কৌতুক বর্ষণের জন্যে এগিয়ে এসেছিল দুজনের কেউ লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ একপশলা বৃষ্টিতে সচকিত দুজনেই। রাস্তায় বেরুলে এখানে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই ছাতা একটা থাকে সঙ্গে। সুবীরকান্তর সঙ্গে ছাতা আছে, কিন্তু বেরুবার তাড়ায় রাখি ছাতা আনতে ভুলে গেছে। চট করে নিজের ছাতাটা খুলে এগিয়ে এলো, তারপর রাখির গা ঘেঁষে ওই পাথরটাতেই বসে পড়ল।

দু'জনে অনায়াসে বসার মত বড় নয় পাথরটা। রাখি আড়ষ্ট একটু। গায়ে গা ঠেকছে, কাঁধে কাঁধ লাগছে। তাছাড়া অন্তরঙ্গ না হলে পাঁচমিনিটের বৃষ্টির ঝাপটায় সর্বাঙ্গ ভিজবে। কিন্তু পাশের লোকের তাকে ভিজতে দেবার ইচ্ছে নেই। বৃষ্টির ধারা আরো জোরে নামতে একেবারে গায়ের সঙ্গে লেগেই বসল। ওদিকে আচমকা বৃষ্টির প্রথম ঝাপটাতেই রাখির মুখ আর মাথার খানিকটা ভিজে গেছে।

সুবীরকান্ত হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল, আজ ছাতা আনোনি যে?

—ভুলে গেছি।

সুবীরকান্ত বলল, ভুলের জন্যে কৃতজ্ঞ।

রাখিও হেসেই ফেলল।

পাঁচমিনিটের বৃষ্টি। মেঘটা চলে যেতেই ঝলমলে আলো। যেন রসিকতা করার জন্যই আসা। ছাতা বন্ধ করে সুবীরকান্ত পকেট থেকে রুমাল বার করে হাতমুখ মুছতে গিয়ে দেখে রাখি তার ব্যাগ খুলে রুমাল খুঁজছে। ব্যাগে রুমাল নেই, অর্থাৎ তাও ভুলেছে।

হাসিমুখে সুবীরকান্ত নিজের রুমাল এগিয়ে দিল। দ্বিধা দেখে রুমালটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, বিপাকে পড়লে লজ্জা করতে নেই।

অগত্যা তার রুমালেই মুখ মুছল রাখি। শরীরে কী এক অজানা অনুভূতি শিরশির করছে। রুমালটা তার হাতে ফেরত দিয়ে হাসিমুখে বলেই ফেলল, এটা বিপাক!

রুমালটা দিয়ে বেশ চেপে চেপে নিজের মুখ মুছল সুবীরকান্ত। একটা লোভনীয় স্পর্শ যেন ওতে লেগে আছে। জবাব দিল, দু'জনের দু'রকমের বিপাক। তোমার বিপাক জলটা এল বলে, আর আমার বিপাক ওটা এত চট করে থেমে গেল বলে।... এবারে বোধহয় ভদ্রলোকের মতো আমার ওই পাথরটাতে উঠে যাওয়া উচিত।

হাসছে রাখিও। চোখের কোণে দুষ্টুমি। অল্প মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাই উচিত।

সুবীরকান্ত তক্ষুনি আবার বলল, কলেজের মাস্টার তো, উচিত কাজ করে করে ওটার ওপর একেবারে অরুচি ধরে গেছে। যেতেই পারে—তুমি কী বলো?

মুখের দিকে চেয়ে রাখি এবারে বেশিই হেসে ফেলল। জবাব দিল, আমিও স্কুলের মাস্টার।

সুবীরকান্ত মহা উৎফুল্ল। ওইটুকু পাথরের মধ্যেই মুখোমুখি ঘুরে বসার চেষ্টা। —তার মানে তোমারও অরুচি ধরেছে? ওয়াণ্ডারফুল!

রাখির ভালো লাগছে বটে, আবার ভাবগতিক দেখে ভয়ও করছে। রুচি বদলাবার আশায় আরো কী করে বসে ঠিক কী! কলেজের ছেলে বা স্কুলের মেয়ে এসে হাজির হতে পারে, আর সুলতাদি বমলাদি কেউ এ অবস্থায় দেখলে ওকে আস্ত রাখবে কিনা সন্দেহ।

সুবীরকান্ত হাসতে হাসতে বলল, আজ এই বরাত আমার কল্পনাও করিনি, ভেবেছিলাম তোমাকে সেদিন বিব্রত করার জন্যে দুটো পোশাকী কথা বলেই চলে যেতে হবে। পরের মুহূর্তে কী মনে পড়তে আতকে উঠল যেন।—কী সর্বনাশ!

কেউ এসেই গেছে ভেবে সচকিত হয়ে রাখি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কাউকে না দেখে বিমূঢ় দৃষ্টি গা-ঘেষা-লোকটার দিকে ফেরালো।

সুবীরকান্ত বলে উঠল, এটা তো শ্রাবণ মাস এসে গেল!

দুশ্চিন্তার কারণটা সঠিক বোধগম্য হল না। রাখি চেয়েই রইল।

—ভাদ্রর বিয়ে নেই, আশ্বিনে বিয়ে নেই, কার্তিকে বিয়ে নেই! তোমাকে কাল পরশুর মধ্যেই ছুটি নিতে হচ্ছে, তারপর চলো দুজনে জলপাইগুড়ি পালিয়ে গিয়ে কাজটা সেরে আসি— আমার অত দেরি সহ্য হবে না।

তার চোখে চোখ রেখে রাখি হাসতেই লাগল।

বিয়ে হয়ে গেল। সেটা এত সহজে হল যে রাখির ভাবতেই অবাক লাগে। এই বিস্ময়ের সঙ্গে একটা রোমাঞ্চকর বিহ্বলতার মধ্যে দুটো মাস কেটে গেল।

তারপর শ্রীমতী রাখি চক্রবর্তী ধীরেসুস্থে তার শ্রীচক্রবর্তীটিকে নতুন করে আবিষ্কার করতে লাগল। তার প্রথম চোখ গেল লোকটার পড়ার নেশার দিকে। বই পড়ে লোক এত আনন্দ কী করে পায়, রাখি ভেবে পায় না। ফি-মাসে পার্শেলে কলকাতা থেকে বই আসে। তার বই যে কলেজের পাঠ্যবই-এর অন্তর্গত তা নয়, আবার ওই সব পড়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনার উৎসাহও কম নয়। ফলে রাখির ধৈর্য ফুরোতে সময় লাগে না। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শোনার ভান করেই কাছে এগোয়। লেকচার শুনতে শুনতে এক সময় চুপি চুপি বইটা সরিয়ে ফেলে। তারপর আলস্যভরে বুকের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে হাই তুলে বলে, তারপর?

ফলে তাবপব যা সেটা কোনো আলোচনাব বিষয নয।

আবাব কোনো সময বা লেকচাব শুনতে শুনতে টান মেবেই হাতেব বই ফেলে দিযে নিজেব দুই ঠোঁট দিযে খানিকক্ষণ পর্যন্ত ওই মুখ বন্ধ কবে বাখে। শেষে নিবীহ মুখে জিজ্ঞেস কবে, তাবপব?

বাখি লক্ষ্য কবেছে, এই একটি মাত্র উপায ভিন্ন লোকটাকে পড়াশুনাব জগৎ থেকে অন্য দিকে টেনে আনা খুব সহজ নয।

তাব দ্বিতীয আবিষ্কাব, লোকটা স্নেহ আব দবদেব কাঙাল। খুব অল্পবযসে বাপ-মা হাবিযেছে, আব আপনাব বলতে তেমন কেউ নেই বলেই বোধহয। ওব কাকা বা বাখিব মা চিঠিতে আদব কবে দু'কথা লিখলেই ভাবী খুশি। দু'জনেব সংসাবে কমবাইণ্ড-হ্যাণ্ড গোছেব একটা লোক বাখা হযেছে। প্রেসাব-কুকাবে বান্না সে-ই কবে ন'টা না বাজতে বাখি স্কুলে ছোটে, আসতে তো বিকেল। এবই মধ্যে ছুটিব দিনে ও যদি মানুষটাব জন্যে বাড়তি একটু খাবাব-দাবাব কবে, তাতেই আনন্দে আটখানা। মাঝে একদিন সর্দিজ্বব হযেছিল। স্কুল থেকে ফিবে বাখি সেদিন আব বেবোযনি, শিযবেব কাছে বসে মাথায হাত বুলিযে দিচ্ছিল। সেটা যে বিশেষ কিছু কবা, বাখিব মনেও হযনি। কিন্তু একটু বাদেই অবাক সে। দু'চোখ যেন ছলছল কবছে।

বাখি ব্যস্ত হযে উঠেছিল।—কষ্ট হচ্ছে খুব?

মুখেব দিকে চেযে থেকেই আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে, কষ্ট হচ্ছে না। বলেছে, কত সময অসুখে পড়ে থাকতাম, ওঠাব শক্তি নেই, হামা দিযে গিযে এক গেলাস জল গড়িযে খেতে হযেছে।...আব আজ?

বাখিবও বুকেব ভেতবটা কেমন কবে উঠেছিল, মনে আছে নিজেব গালটা তাব কপালেব ওপব ছিল।

তৃতীয ব্যাপাব লক্ষ্য কবেছে, মানুষটাব গোঁ-ভবা অভিমান। প্রত্যাশা বেশি বলেই অভিমান বেশি। বাখি আগে স্কুলে চলে যায। কিন্তু একটা দিন তাব জামা-কাপড ঠিক-ঠাক কবে না বেখে গেলে ময়লা জামা-কাপড পবেই কলেজে চলে যাবে। ভুল কবে নয, ইচ্ছে কবে। তাবপব ফিবে এসে অভিমান—অর্থাৎ বাক্যালাপ কম, চুপ।

বাখি হযত বলল, তোমাব কি নিজেব চোখ নেই? আমাব মনে ছিল না বলে এই জামা-কাপড়ে কলেজ কবে এলে?

জবাব, এলাম—এবপব যাতে তোমাব মনে থাকে সেই জন্যে।

আব একদিনও এই ভুল হযেছিল। সেদিনও একই ব্যাপাব। মিষ্টিকথায় দুই-এক কথায নিজেব ভুলেব কথা বলাব পবেও গম্ভীব দেখে বাখিবও বাগ হযে গিযেছিল। কিন্তু বাগ কবতে গিযে হেসে ফেলেই বলেছিল, আচ্ছা আমাব কী আগে আবো দু'পাঁচবাব বিযে হযেছে যে এত অভিজ্ঞতা—কোনো কিছুব ভুল হতে পাববে না?

তখন ঠাণ্ডা।

মনঃপূত নয এমন কিছু কবলেই অভিমান। নিজেব খেযালখুশিতেই বাখি এমন অনেক কিছুই কবে বসে। ঝোঁকেব মাথায স্কুল থেকে হযত দলেব সঙ্গে সিনেমায চলে গেল, নযত একেবাবে সন্ধ্যাব পব বেবিযে ফিবল কোথাও থেকে। ব্যস, মুখ

ভাব। ফলে আগেব থেকে মানুষটাকে ঠাণ্ডা বাখাব কৌশলও বপ্ত কবেছে বাখি।...সেদিন সুলতাদি বমলাদি ধবল—কাল ববিবাব, তাদেব টাইগাব হিলএ নিযে যেতে হবে। খবচ সব বাখিব। এড়ানো গেল না। ঠিক হল খুব সকালে বেকবে, বেলা দেড়টা দুটো নাগাদ ফিবে আসবে।

কথা দিযে আসাব পব বাখিব ভাবনা। মানুষটা সঙ্গে যাবে না জানা কথাই। ববিবাবে প্রথমে ছাত্র পড়তে আসবে গুটিকযেক, তাবপব মাস্টাববা আসবে কেউ কেউ। তাদেব চা-টা একদিন অবশ্য ছোকবা চাকবটাই দিতে পাববে, কিন্তু তাহলেও ছুটিব দিনে সকাল থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত বাইবে কাটানো বাবুব সহজে ববদাস্ত হবে না। তাব ওপব একটু অন্যবকম বান্নাবান্না কবা হবে না বলে বেলা দুটো আড়াইটে পর্যন্ত হযত না খেযেই বসে থাকবে।

অতএব উল্টো প্যাঁচ কষল বাখি। বাড়ি ফিবে মুখহাত ধুযে বিকেলেই মুখবোচক কিছু খাবাব তৈবী কবল। তাবপব গুনগুন কবে গান কবতে কবতে খাবাবেব ডিস সামনে এনে ধবল। সুবীবকান্ত বই-মুখে চিৎপাত হযে বিছানায শযান। বাখি তাব মুখে কিছুটা খাবাব গুঁজে দিতে সে হাসিমুখেই উঠে বসল।

জলযোগ শেষ হতে টুকিটাকি কিছু কাজ কবাব জন্য বেবিযে এলো। ও লোকটা আবাব বই নিযে শুযে পড়বে জানা কথাই। খানিক বাদে বাখি লঘুপাযে ঘবে ফিবল আবাব। পর্দটা টেনে দিযে সোজা শয্যায তাব পাশে বসে পড়ে বইটা হাত থেকে টেনে ফেলে দিল। তাবপব আধ-বসা হযেই তাব বুকেব ওপব বুক বেখে দু'হাতে মাথাটা ধবে ঝাকালো একবাব। তাবপব একেবাবে মুখেব ওপব ঝুকে বলল, মাস্টাবমশায, আমাব একটা আর্জি আছে।

এই গোছেব বিস্মৃতি পেলে তখনকাব মতো পড়াশুনাব আশায জলাঞ্জলি দিতে সুবীবকান্তব একটুও আপত্তি নেই। দু'হাতে তাকে বুকেব সঙ্গে চেপে ধবে আর্জি যেন মঞ্জুবই কবে ফেলল।—এই দিনেব বেলাতেই?

—ধ্যেৎ, অসভ্য কোথাকাব। হাত ছাড়াবাব চেষ্টা।

—আচ্ছা বলো বলো।

—না, আগে তুমি কথা দাও।

—কথা দিলে শেষে যদি তুমি ফ্যাসাদে ফেলো আমাকে?

—ও, এই টান আব এই বিশ্বাস তোমাব আমাব ওপব?

—ছাড়ো—

ছদ্ম বাগে আবাবও হাত ছাড়ানোব চেষ্টা।

—আচ্ছা, কথাই দিলাম। বলো।

—কাল সকালে তুমি ছেলে পড়াবে না, আমাব সঙ্গে এক জাযগায যাবে?

—কোথায? আঁতকে উঠল যেন।

—টাইগাব হিলএ। খুব সক্কালে উঠে যাব, বেলা একটা দুটোব মধ্যে ফিবে আসব। সুলতাদি বমলাদি এমন ধবেছে, আমি কিছুতে এড়াতে পাবলুম না। ওবা ঠাট্টা কবে, মুখে মুখ লাগিযে আব কতকাল কাটাবি, চাব সাল তো হযে গেল।

এব পব বমলাদি-সুলতাদিব সঙ্গে ওকে ছাড়াই টাইগাব হিলএ ঘুবে আসাব জন্যে পাল্টা অনুবোধ শোনাব পালা। ছেলেগুলো সমস্ত সপ্তাহ এই একটা দিনেব আশায বসে থাকে, কী কবে যায সুবীবকান্ত—আগে জানলেও না হয কথা ছিল।

বেগতিক দেখলে বাখি এই গোছেব কৌশলে ঘবেব লোকেব অভিমান ঠেকিযে বাখে।

কিন্তু ও যেমন স্বামীব মান-অভিমান সবলতা-দুর্বলতাব সন্ধান পেযেছে, স্বামীটিও যে ঠিক তেমনি কবেই তাঁব স্ত্রীব চবিত্রটি নানা খুঁটিনাটিব ভিতব দিযে সকৌতুকে পর্যবেক্ষণ কবে চলেছে—সে খবব বাখিব জানা নেই।

না, এযাবৎ নিজেব স্ত্রীব প্রতি সুবীবকান্ত বিরূপ কখনো হযনি। ববং অনেক ব্যাপাবে তাব ছেলেমানুষি দুর্বলতা দেখে বেশ মজাই লেগেছে।...সর্বব্যাপাবে আধুনিক চটকেব ওপব স্ত্রীটিব অনুবাগ। প্রথমেই তাব নাক ধবে টান দিযেছিল, বলেছিল, আচ্ছা নামেব সঙ্গে তুমি আবাব একটা কান্ত জুড়েছ কেন? সুবীব চক্রবর্তী তো বেশ নাম।

ও হেসে জবাব দিযেছে, কান্ত নাই বলে বোধহয বাপ-মা নামেব ওপব দিযে অভাবটুকু উশুল কবতে চেযেছে।

—এখন ছেঁটে দাও।

—ছাঁটতে বাজি নই, ববং নাম বদলে বাখিকান্ত হতে পাবি।

বিযেব পবেই বাপেববাড়িতে দিনকযেক বাখি ওকে সুবীব বলেই ডেকেছে। কিন্তু একদিন ওব মাযেব কানে যেতে সুবীবেব সামনেই কষে ধমক।—ও কী বিচ্ছিবি। খববদাব নাম নিযে ডাকবি না।

—বা-বে। ও যে নাম ধবে ডাকে?

—ও ডাকুক, তুই ডাকবি না।

আপত্তি সত্ত্বেও মাযেব কথা ফেলতে পাবেনি। এখন আব ডাকে না।

দার্জিলিংযে আসাব দিনকযেক বাদে হঠাৎ একদিন বলেছিল, আচ্ছা এত বড স্কলাব হযেও তুমি আই. এ. এস. পবীক্ষা দিলে না কেন?

—দিলে কী হত?

—দিলে আই. এ. এস. হতে পাবতে না? আমাব বন্ধু সোমাব আই. এ এস. বব, কী বিবাট চাকবি কবে এখন জানো?

ঠিক এই গোছেব ছেলেমানুষি ধবনেব কথা না হলে সুবীবকান্তব হযত খাবাপই লাগত। হেসেই ফিবে জিজ্ঞাসা কবেছে, কেন, কলেজেব মাস্টাব পছন্দ নয?

—মাস্টাব পছন্দ নয, তোমাকে পছন্দ।...চেষ্টা কবলে তুমি আই. এ. এস. হতে পাবতে।

—তা হযত হতে পাবতুম, কিন্তু এই বাখিকে পেতাম না।

—কেন?

—তখন আব দার্জিলিংযে আসতুম না, তোমাব সঙ্গে দেখাও হত না। তাছাড়া আই. এ. এস. হলে হযত লোভ আবো বেড যেত, বাজকন্যা আব অর্ধেক বাজত্ব খুঁজতাম।

যুক্তিটা অস্বীকার করেনি বাখি, মাথা নেড়ে বলেছে, তা সত্যি, কী খরচটাই করেছিল তোমার কাকা, আমাদের ঘর-বাড়ি বেচলেও অত হত না।

স্ত্রীর উঁচু দৃষ্টির আঘাত পরের এই ছেলেমানুষি উক্তির দরুণই একটুও লেগে থাকে না। বরং মজাই লাগে শুনতে। গম্ভীর মুখে ও-কথার পর বলেছিল, ধরো আই. এ. এস. অফিসার হয়ে, আর তোমার বদলে তোমার বন্ধু সোমার বরটি হয়ে আমি দার্জিলিংয়ে বেড়াচ্ছি—তোমার দেখতে কেমন লাগত?

ভালো যে একটুও লাগত না সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা গেছে। আর জবাবটা আরও ভালো লেগেছে।—ইস! এখানেই যখন বিয়ে লেখা, যেভাবে হোক ঠিক তোমার সঙ্গেই জুটে যেতাম আমি।

স্ত্রীর আর একটা স্বভাব লক্ষ্য করে মুখ ফুটে কিছু না বললেও মনে মনে এক-আধ সময় উতলা হয়েছে সুবীরকান্ত। সর্বদাই বাখির দৃষ্টি যেমন উঁচু দিকে, খরচের হাতও সেই রকমই খোলা। বিলেতি ধাঁচের নামী স্কুল, মাইনে ভালই। সুবীরকান্ত সে টাকা হাতেও নেয়নি কখনো, বলেছে তোমার কাছেই থাক। কিন্তু থাকছে যা এই ক'মাস সে ভালো করেই দেখছে। সব মাসের শেষেই তার চিন্তা দেখেছে—হাতের টাকা-টুকি ফুরিয়ে গেল, কী-যে করি!

জিনিস দেখলেই তার কিনতে ইচ্ছে করে। মনের মত ঘর সাজায়, সুবীরকান্তর জন্যেও এটা-সেটা কেনে। আর নিজের জামা-কাপড় কেনা তো সব মাসেই লেগে আছে। মাইনের অর্ধেক টাকা দিয়ে হয়ত একখানা শাড়ি কিনে বসল। পরে-পরে তক্ষুনি আবার তাকে দেখানো চাই।—কেমন হয়েছে?

চোখ তুষ্ট হলেও টাকার অংকটা ভিতরে ভিতরে খচখচ করতেই থাকে সুবীরকান্তর। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না। ফলে রসিকতা করতে হয়, গরিব মাস্টার —এই বাখিকে আমি রাখি কোথায়?

রাখি তাইতেই খুশি, কোনো প্যাঁচ-পোঁচের ধার ধারে না সে।

যাই হোক, আনন্দের মধ্যেই দিন কাটছিল সুবীরকান্তরও। মাসপাঁচেক বাদে তার মনের দরজায় আর এক বৈচিত্র্য এসে হানা দিল। শুকনো-মুখ-রাখি সেদিন ঘরে ঢুকেই বলল, হয়েছে কাজ, এবারে ঠিক গণ্ডগোল বেঁধেছে।

মুখ থেকে বই সরিয়ে সুবীরকান্ত জিজ্ঞাস করল, কিসের গণ্ডগোল?

—আবার কিসের, যা হয় তাই, আরো খুব আনন্দ করো—কতদিন বলেছি একটু সামলে-সুমলে চলো।

তবু বুঝতে সময় লেগেছে একটু। তারপর বোঝা গেছে যখন বই ফেলে আনন্দে একেবারে উঠে বসেছে।—সত্যি? তারপর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে সুরু করেছে।

রাখি রাগ দেখাতে গিয়েও হেসে ফেলল।—তুমি তো মজা দেখবেই এখন, আমি ওদিকে চিন্তায় মরি।

—কিসের চিন্তা?

—স্কুলে তো আর একবছর ধরে ছুটি দেবে না, কিছুদিন গেলেই মেয়েরা ঠিক টের পাবে। কী লজ্জার কথা হল বলো তো?

ছদ্ম গাম্ভীর্যে মাথা নেড়ে সায় দিল।—তহালে এক কাজ করো, স্কুলের চাকরি ছেড়ে দাও।

—বলো কী, চাকরি ছেড়ে এখন থেকে আমি ঘরে বসে থাকব?

—তাহালে চোখ-কান বুজে স্কুল করতে থাকো।...তোমাদের স্কুলের টিচারদের বুঝি কারো ছেলেপুলে নেই।

—থাকবে না কেন, মেম-টিচারগুলোর তো এক-একজনের তিনটে-চারটে করে ছেলেপুলে, ওদের অত লজ্জাসরমের বালাই নেই।

সুবীরকান্ত আরো গম্ভীর।—প্রথমবার বলেই তোমার লজ্জা, পরের বার থেকে আর তোমারও থাকবে না।

এবারে গাম্ভীর্যের আড়ালে কৌতুক লক্ষ্য করল রাখি। রাগতে গিয়ে আবার ও হেসে ফেলল।—ভালো হবে না বলছি, সখ দেখে আর বাঁচি না।

এই সমাচারের দিন-কয়েকের মধ্যে সুধীরকান্তর এই বহু প্রত্যাশিত পদোন্নতির সংবাদ এলো। এই কলেজেই লেকচারার থেকে প্রফেসার হয়ে গেল সে। সেদিন কলেজ থেকে ফিরেই আনন্দে আটখানা হয়ে রাখিকে খবরটা দিল সে। আর রাতে চুপি চুপি বলল, যে আসছে সে বিশেষ ভাগ্য নিয়েই আসছে, বুঝলে...নইলে উন্নতির আশা তো করে থেকেই করছিলাম, এতদিনেই বা হল কেন?

শুনে রাখিও খুশি বটে, কিন্তু তার মনে তখন নানা চিন্তা।

এর পরের কতগুলো মাসে যথার্থই আনন্দের মধ্য কাটল সুরীরকান্তর। নিজের মনেই জীবনের একটা নতুন স্বাদ অনুভব করে সে। আলো-বাতাসও অন্যরকম মনে হয়। রাখিকেও কেমন নতুন মনে হয় তার। ওর সর্বশরীরে যেন নতুন ছাঁদ, নতুন সুষমার ছোঁয়া লেগেছে। চেয়ে থাকে, চুরি করে দেখে। আবার ধরাও পড়ে। রাখি লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলে।—কী দেখছ?

সুরীরকান্ত হাসে শুধু।

সময় এগিয়ে আসতে স্কুল থেকে রাখি তিন মাসের ছুটি পেল। ভিতরে ভিতরে তার নানারকম ভয়-ভাবনা। তাই ও প্রস্তাব করল, এ সময়টা মায়ের কাছে গিয়ে থাকলে কেমন হয়। আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু এবারে সুরীরকান্তই দুর্ভাবনার মধ্যে পড়ে গেল।—তিন মাসের জন্য? ও বাবা, আমি থাকব কী করে?

অসহায় মুখখানা দেখে তার হাসিই পেল।...মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করছে বটে, কিন্তু সেই সময় এই লোক কাছে থাকবে না ভেবে আবার ভয়-ভয়ও করছিল। অতএব এখানেই থাকা মনস্থ করল সে। তাছাড়া এখানে ভালো ডাক্তার আর সুব্যবস্থার আশ্বাসও বেশি। তার ওপর সুরীরকান্ত যখন বলল, মাকেই বরং মাসখানেকের জন্য এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে—তখন অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

মেয়ে হল।

আর তাতেই যেন সুরীরকান্ত বেশি খুশি। মাস-দেড়েক না যেতে কাঁপা হাতে শাশুড়ীর হাত থেকে মেয়ে কোলে নিয়ে বসতে চেষ্টা করেছে। নড়তে-চড়তে

ভয়, পাছে মেয়েব লাগে। বাপকে রাগাবাব জন্যেই মেয়েটাকে কুচ্ছিত বলে বাখি। তাব কারণ মেযের রং একটু চাপা হবে বলেই মনে হয়, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। শাশুড়ীর সামনেই এই নিয়ে ঝগড়া। মেয়ের নাম নিয়েও। সুবীর প্রস্তাব কবে রাখির মেযেব নাম পাখি হোক। রাখি তক্ষুনি স-ঝঙ্কারে আপত্তি কবে, হ্যাঁ বয়েসকালে শেষে উড়ে পালাক আর কী!

সুবীর হাসে।—বয়েসকালে তো উড়ে পালাবেই। শাশুড়ীর অনুপস্থিতিতে সেদিন বলেছিল, উড়ে পালাবাব সময হলে ওকে পরামর্শ দেব দার্জিলিংযে জলাপাহাড়ে উঠে বসে থাকতে।

কিন্তু আবো মাসখানেক না যেতেই বাখি সত্যিকাবেব দুর্ভাবনাব মধ্যে পডল। মা তখন জলপাইগুড়ি ফিবে গেছে। বাখি আবাব স্কুলে যেতে শুরু কববে ভাবছে। তিন মাসেব পবে আবো দেড মাসেব আধা-মাইনেব ছুটিও ফুবিযে এসেছে। মেয়েব জন্য সবে ভালো একটা আযা বাখা হযেছে। সব সুব্যবস্থাব মধ্যে আচমকা এই খবর।

সুবীরকান্ত কলকাতায বদলিব হুকুম-পত্র পেয়েছে। শুনে বাখি বিমূঢ় একেবাবে।

—কি হবে তাহলে?

—কি আবাব হবে, যাব।

—আর আমি?

—তুমিও যাবে।

এই নির্লিপ্ততা দেখে বাখি আরো অবাক যেন।—চাকবি ছেড়ে দেব?

সুবীরকান্ত হাসতে লাগল, তুমি কী ভেবেছ চিবকাল আমি এই দার্জিলিংযেই থেকে যাব?

না, রাখি কিছুই ভাবেনি। সমূহ সমস্যাটাই তাব কাছে বড। সে জোব দিযে বলল, এখন চাকবি ছাডা কোনো কাজেব কথা নয়, তুমি বদলি ক্যানসেল কবার ব্যবস্থা কবো।

—পাগল নাকি।

এই এক কথাতেই রাখি বুঝে নিযেছে সেটা সম্ভব নয়, অথবা সম্ভব হলেও এই লোক সে-রকম তদবিরের ধাব-কাছ দিযেও যাবে না। গোড়াতে বাগই হয়ে গেছে তার। আসলে সে চাকবি কবে এটাই বোধহয তাব পছন্দ নয—ঘবেব মধ্যে মেয়ে আগলে বসে থাকুক তাই চায। এই অনুযোগেব পরেও মানুষটাব তাপ-উত্তাপ নেই, কেবল হাসে।

রাখি বলতে ছাডে না, এই তো মাইনে, চলবে কী কবে?

সুবীরকান্ত যেন আরো মজা পায।—এক-বেলা খাব, কী আব করা যাবে...এত বড চাকরিটা তোমার! শেষে হেসেই বলে, তোমাব এত ভাবনা কেন, কত লোকে বুড়ো বয়েসে প্রফেসাব হয়েও চাব-পাঁচটা ছেলেপুলে নিয়ে চালায়, আর একটা মেয়ে নিয়ে আমাদের চলবে না? তাছাড়া কলকাতায় মেয়ে-স্কুল নেই? চাকরি করতে চাইলে তোমার এত বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা চাকরি পাবে না সেখানে?

এই প্রথম একটু আশার কথা শুনল যেন। আর তারপর সুবীরকান্ত যে প্রস্তাব দিল, ভাবতে গেলে সেটা রোমাঞ্চকরই বটে। সুবীরকান্ত পরামর্শ দিল, একটা কাজ যদি করো তো দেখবে এই বদলিটা আমাদের কাছে আশীর্বাদই হয়েছে। কলকাতায় গিয়ে ঘরে বসে দুটো বছর পড়াশুনা করে এম. এ.-টা পাশ করে নাও। স্কুল ছেড়ে তখন কোন কলেজেই চাকরি পেয়ে যাবে...আর মেয়েটাও ততদিনে একটু বড় হবে।

রাখির উঁচু দিকে দৃষ্টি রাখিব, তাই শোনামাত্র উৎফুল্ল। কিন্তু পরক্ষণে নিজের ওপর অনাস্থা।—হ্যাঁ, এতকাল বাদে আবার আমি করব এম. এ. পাশ, তাহলেই হয়েছে।

মুখে বললেও এ সম্ভাবনাটা একটা বড়গোছের আশার মতই মনের কোণে লেগে থাকল। তবু যাবার আগে তার মন-খারাপ। খুঁতখুঁত করে বলল, এই মেয়েটাই অপয়া, আসতে না আসতে আমার চাকরিটা গেল।

কলকাতায় এসে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু। আড়াইখানা ছোট ঘরের ফ্ল্যাট নিয়েছে একটা। তারই ভাড়া এককাঁড়ি। গোড়ায় গোড়ায় রাখি আবার চিন্তা করেছে —চলবে কী করে?

—ঠিক চলবে, কিছু ভেবো না। সুবীরকান্তর সেই এক কথা।

চলে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু রাখির মনে মনে বাসনা, আর একটু ভালো চললে ভালো হত। ভিতরে ভিতরে সেই ভালো দিনে পদার্পণের সঙ্কল্প নিয়েই এম. এ. পড়ার জন্য প্রস্তুত হল সে।

আলাপ-আলোচনা করে ইকনমিক্স-এ এম. এ. পড়া সাব্যস্ত হল। বি. এ.-তে এই বিষয়টা ভালই লাগত তার। এ ব্যাপারে সুবীরকান্তরও উৎসাহ কম নয়। বই-পত্র সংগ্রহ করে দিল। তার কলেজের ইকনমিক্স-এর এক তরুণ লেকচারারকে বাড়িতে এনে হাজির করল। সুদর্শনা ছাত্রী-বউদিকে সে যথাসাধ্য সাহায্য করবে সানন্দে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল।

সুবীরকান্ত বলল, খুব বিদ্বান ছেলে, যতখানি পারো আদায় করে নাও।

রাখি ধরেই নিয়েছে তার এম. এ. পাশের রাস্তা সুগম। মনের আনন্দে তাই ঠাট্টা করেছে, বেশি আদায় করতে গেলে সেও যদি কিছু আদায় করতে চায়?

অরসিক স্ত্রীর কাছে সুবীরকান্তও নয়। পাল্টা ঠাট্টা করেছে, গুরু যখন, চাইলে কী আর করা যাবে...কিন্তু খুব গোপনে, আমি যেন জানতে না পারি।

রাখির ভালো পাশ করার ইচ্ছে যত, ধৈর্য তত নয়। বেশি পড়াশুনার নামে তার হাঁপ ধরে যায়। বিশাল সমুদ্র সে পার হবে কী করে, বই-পত্র খুলে এক-একসময় গালে হাত দিয়ে তাই ভাবে। ভাবতে ভাবতে অসময়ে ঘুম পেয়ে যায়। তারই ঘরের লোক বিনা উদ্দেশ্যেও অত পড়ে কী করে সেটা তার কাছে এখন এক বিস্ময়। বইগুলো বোঝার মত ঠেকে। মন হালকা করার জন্যে বিকেলের শো'য়ে দু'জনের সিনেমার টিকিট কেটে বসে। সুবীরকান্ত কখনো বিরক্ত হয়, কখনো হাসে।—এভাবে চললেই পাশ করা হয়েছে আর কী।

রাখি রেগে যায়, না হয় না হবে, আর পারিনে বাপু, কেবল মাস্টারি। কখনো বলে, আমার দ্বারা কিছু হবে-টবে না, আমার জন্যে তুমি একটা স্কুল-মাস্টারিই দেখো।

সুবীরকান্ত সে-কথা কানে তোলে না। পড়ার তাগিদ দেয়। ফাঁক পেলেই রাখি মেয়েব ঘাড়ে দোষ চাপায়, ওব জন্যে পড়াশুনা হচ্ছে না। মেযেব জন্যে ওদিকে সর্বক্ষণেব ঝি আছে একটা। আব বাপেব আদুবে মেযে, বাপকে দেখলেই তার কোলে চেপে বসে থাকে। তাই ওব জন্যে পড়া কেন হয না সুবীবকান্ত ভেবে পায় না। তা ছাড়া ঠিকে-চাকব আছে একটা, দু'বেলার বান্না আব বাড়ির কাজ সে-ই করে দিয়ে যায়। এ-সব ব্যবস্থাব ফলে প্রতি মাসেই খরচেব টানাটানি। কিন্তু পারতপক্ষে সুবীবকান্ত তা জানতে দেয না।

দ্বিতীয় বছবেব কযেকটা মাস কেটে যেতে বাখি একদিন হাত-পা ছড়িযে কাঁদতে বসল। পড়া কিছুই এগোযনি, কী কবে পবীক্ষা দেবে।

আব তখুনি ঘবেব লোকেব আবেক রূপ দেখল সে। প্রথমে বিবক্ত হযে হুকুম কবল, সব কটা পেপাবে শূন্য পেলেও গিযে পবীক্ষা দিযে আসতে হবে। তাবপব বলল, আচ্ছা তোমাব পাশ-ফেলেব দায আমাব। যা বলি তুমি শুধু তাই কবে যাও, আব কিছু ভাবতে হবে না।

এবপব থেকে দেখা গেল, ইতিহাস বই ছেড়ে তাব ইকনমিক্স বই নিযে পড়াশুনায মগ্ন হযেছে লোকটা। আব দু'বেলা নিজেই তাকে পড়াতে বসে যায। প্রথমে বাংলায জলেব মত কবে বোঝায, তাবপব ইংবেজিতে। এক-একটা দুরূহ পবিচ্ছেদ যে এত সহজে শেষ হতে পাবে তাব যেন বিশ্বাস হয না। পড়ানো হলে ঘুবিযে ফিবিযে নানাভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞেস কবে, ঠিক হলে উত্তব লিখে বাখতে বলে। আগেব কয়েক বছবেব প্রশ্ন-পত্র এনে সেগুলিব খুঁটিনাটি জবাব শেখায—লেখায। খববেব কাগজ থেকে অর্থনৈতিক প্রসঙ্গেব কাটিং বেখে তাকে পাঁচবাব কবে পড়তে বলে, লিখতে বলে। সব লেখাই আবাব ধৈর্য ধবে সংশোধন কবে দেয়। এই তন্ময গম্ভীব মানুষটাকে তখন যেন খুব কাছেব কেউ বলে মনে হয না তাব।

নিজেব অগোচবেই একটু একটু করে আস্থা ফিবছে রাখিব। তাই শঙ্কাব ভাবটা কমছে। সব থেকে বড কথা, একটু দুশ্চিন্তা দেখলেই মানুষটা ধমকায তাকে।—তোমাকে তো বলেছি, শূন্য পেলেও তোমার কোন দোষ হবে না—সব দায় আমার।

এ-কথা শুনলে মনেব জোব কাব না বাড়ে। তাই বাত্রে দুজনে মুখোমুখি আধশোযা হযে পড়াশুনা চলে যখন, বাখিব মাথায এক-এক সময দুষ্টুমি চেপে বসে। একেবাবে বুকেব কাছে এগিযে গেলেও এত তন্ময যে খেযাল কবে না। বাখি তখন আচমকা দু'হাতে জাপটে ধরে তাকে, গালে গাল চেপে বলে, তারপব?

ধ্যানভঙ্গ হয তখন। সেদিন এমনি ব্যাপাবের পব সুবীবকান্ত তাকে টেনে ধবে বেখে জবাব দিল, তাবপব পবীক্ষা হযে গেলেই আব একবাব নির্ঘাত তোমার নার্সিং হোমে যাবাব ব্যবস্থা।

ছিটকে সরে আসতে চেষ্টা কবেছে বাখি।—খবরদার, কখখনো না।

আব ছেলেপুলে হবাব ব্যাপারে বাখির বেজায় আপত্তি। বলে, একটাই বেঁচে থাক, পাখিকে ভালো কবে মানুষ করো, আর বেশিতে কাজ নেই।

মেযেব ডাক-নাম পাখিই আছে। সুবীরকান্ত হাসে। বলে দেখা যাবে।

পবদিন সকালেই আবাব সেই পঠন আব পাঠনেব তন্ময়তা।

বেশ নির্বিঘ্নে এম. এ পাশ কবাব পবেও বাখি ভোলেনি আসল কৃতিত্বটা কাব। ভালই পাশ কবেছে। মাঝামাঝিব থেকেও একটু উঁচুব দিকেব সেকেণ্ড ক্লাস। সেটুকুও আশাব অতিবিক্ত। ফল যেদিন বেরুল বাখি সেদিন গম্ভীব মুখে সুবীবকান্তকে জিজ্ঞেস কবেছিল, জীবনে বোধহয এই পবীক্ষাটাই সব থেকে খাবাপ হল, কেমন?

যেন সুবীবকান্তই পবীক্ষা দিযেছে এবং পাশ কবেছে। সে হেসে জবাব দিযেছে, হ্যাঁ।

জীবনযাত্রাব পট পবিবর্তন আসন্ন বলেই বোধহয এমন দিনে একজনেব সঙ্গে দেখা বাখিব। সেদিন কী একটা ইংবেজী সিনেমা দেখতে গেছল তাবা, তাদেব সামনেই ঝকঝকে গাড়ি থেকে নামল একজোড়া মেযে-পুরুষ। মেযেটি গোলগাল মোটাসোটা, পবনে দামী শাড়ি, গলায আব হাতে দামী গযনা। পুরুষটি ফিটফাট বাঙালী সাহেব। গাড়ি থেকে দম্পতিটিকে নামতে দেখেই সিনেমা দেখাব আকর্ষণ ভুলে বাখি হাঁ কবে তাদেব দিকে চেযে বইল। পাশ কাটিযে যাবাব মুখে মহিলাটিও তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

অস্ফুট বিস্ময়ে বাখি বলে উঠল, সোমা না?

—বাখি, তুই!

হলেব সামনে দুটি বমণীব পুলকিত জড়াজড়িব দৃশ্য দেখল অনেকে। তাদেব স্বামী দুটি পবস্পবকে দেখে নিল একবাব।

বাখিব সহপাঠিনী সেই সোমা আব তাব আই. এ. এস. স্বামী বমেন্দ্র সবকাব। বান্ধবীব হাত ঝাঁকিযে বাখি বলে উঠল, কী গোল হযে গেছিস বে তুই, আমি তো প্রথমে হকচকিযে গেছি। পবক্ষণে আই. এ এস-এব দিকে তাকিযে দু'হাত জুড়ে নমস্কাব জানালো, চিনতে পাবেন?

বিব্রত জিজ্ঞাসু নেত্রে স্ত্রীব দিকে তাকালো ভদ্রলোক।—সোমা সবকাব বলল, চিনবে কী কবে, বিযেব সময সেই তো একবাব দেখেছে। পবিচয কবিযে দিল, আমাব বন্ধু বাখি গাঙ্গুলি—ওমা, গাঙ্গুলি বলছি কেন! সুবীবকান্তব দিকে চোখ আটকালো তাব, পবক্ষণে বাখিব দিকে ফিবল।—বল না, ইনি নিশ্চয?

হাসিমুখেই মাথা নাড়ল বাখি।—প্রফেসব সুবীব চক্রবর্তী।

আব এক-দফা সৌজন্য বিনিময। ওদিকে সিনেমায দ্বিতীয বেল বেজে গেছে। খুশিব ব্যস্ততায সোমা জিজ্ঞাসা কবল, সিনেমা দেখবি তো? কোথায সীট তোদেব?

কোথায সীট বাখি জানে না, তবু বিব্রত অভিব্যক্তি একটু। সুবীবকান্ত জবাব দিল, নীচে।

সোমাদেব ওপবেব সব থেকে সেবা সীট সন্দেহ নেই বাখিব। কিন্তু সোমা কিছু খেযাল না কবেই বলল, শো শেষ হলে পালাবি না বলছি, এইখানে দাঁড়াবি—কতকাল বাদে দেখা!

এত দিন বাদে দেখা হওযাব ফলে বাখিও খুশি কম নয। কিন্তু সোমাব সঙ্গে তাব অবস্থাব তাবতম্যটা এভাবে স্পষ্ট না হযে উঠলে যেন আবো খুশি হত। এতদিন

বাদে আজ আবাব মনে হল, তাব ভদ্রলোকও যদি আই. এ. এস-টাই হতে পারত— ইতিহাসের মাস্টার হয়েও যে আনায়াসে এম. এ. ক্লাসেব ইকনমিকস পড়াতে পারে—ইচ্ছে করলে সে অনেক কিছু হতে পারত।

সীটে বসে বিস্ময় প্রকাশ করল, সোমাটা কী বিষম মোটা হযেছে, দিব্বি ছিপছিপে চেহারা ছিল!

একটা কথা ভেবে সুবীরকান্ত মনে মনে কৌতুক বোধ করছিল, পবিচয় দেবাব সময় বাখি সুবীরকান্ত বলেনি. শুধু সুবীর চক্রবর্তী বলেছে। ওব কথা শুনে মৃদু জবাব দিল, তোমার মত তো আব মাস্টাবেব বউ নয়, আই. এ. এস-এর বউ—সুখে আছেন। ...কিন্তু শো ভাঙলে মহিলা আবাব তো চড়াও করবেন মনে হচ্ছে।

চাপা হেসে বাখি জবাব দিল, তোমাব তাতে ভযটা কী, সঙ্গে আমি আছি, ওর ববও আছে।

শো ভাঙতে শুধু চডাও করা নয, কোনো ওজর-আপত্তিতে কান না দিযে সোমা সবকাব একেবারে গাড়িতে টেনে তুলল তাদের। আই. এ. এস. সামনে ড্রাইভারেব পাশে বসল, তাবা তিনজন পিছনে।

হাসিমুখে সোমা সবকাব সুবীবকান্তব উদ্দেশে বলল, আপনাব স্ত্রী-টি মশাই কি যে দুষ্টু ছিল আপনাব কোনো ধাবণা নেই, আমাদের একেবাবে নাজেহাল করে ছাডত।

সুবীবকান্ত মন্তব্য কবল, স্বভাব এখনো খুব বদলায়নি।

সোমা সবকাব হালকা সুবে চ্যালেঞ্জ কবল, আপনাকে তো বেশ ভালো মানুষ মনে হচ্ছে, না বদলালে সামলান কী করে?

—সামলাবাব চেষ্টাও কবি না, হাল ছেড়ে দিয়েছি।

সকলেই হেসে উঠল। এমন কী সামনে থেকে বমেন্দ্র সরকাবও হাসিমুখে এদিকে তাকালো।

সোমা সবকাব বলল, না সামলালেও আপনাব স্ত্রী আগের থেকে ঢেব বেশি সুন্দব হযেছে এখন. বুঝলেন?

সুবীবকান্ত জবাব দিল, আমি সামান্য মাস্টার. এতেও আমাব কিছুমাত্র হাতযশ নেই।

আবার একপ্রস্থ হাসি। বাখিব কানের কাছে মুখ এনে সোমা সোচ্ছ্বাসে বলল, বেশ লোকটি তো বে তোব। তাবপব তেমনি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা কবল, চেহারাখানা তো দিব্বি কচি রেখেছিস—ছেলেপুলে কী?

—একটা মেয়ে।

সোমা জোরেই বলে উঠল, মাত্র!

বাখি তাব হাঁটুতে একটা চিমটি কেটে মুখ বন্ধ করতে চাইল। তারপর গলা আরো খাটো করে জিজ্ঞাসা করল, তোব?

সোমা সরকার ছদ্ম-কোপে তাব আই. এ. এস. স্বামীর দিকে তাকালো একবার। তাবপর জবাব দিল, আমার এক গণ্ডা।

বলা বাহুল্য, যত নীচু স্বরেই তারা বাক্যালাপ করুক, সুবীরকান্তর কানে এসেছে সবই।

সোমার বাড়ি-ঘর দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে গেল রাখির। ছবির মত বাড়ি, চমৎকার আসবাব-পত্র, আর তেমনি পরিপাটি ব্যবস্থা সব-কিছুর। ওর ছেলেমেয়েগুলোও তেমনি ফুটফুটে সুন্দর। সুখের ঘরে রূপের বাসা। রাখির যেমন স্বভাব, নিজের অবস্থার তুলনামূলক চিত্রটা মনে আসছেই।

বাড়ি ফিরে রাত্রিতে বিছানায় গা এলিয়েও ওদের কথাই ভাবছিল। বলল, কী চমৎকার আছে সোমারা, তাই না?

কাছে এগিয়ে এসে সুবীরকান্ত সায় দিয়ে বলল, চমৎকার, কিন্তু ওদের তুলনায় আমি আর এত পিছিয়ে থাকতে রাজি নই।

রাখি উৎসুক নেত্রে তাকালো তার দিকে। ভাবল অবস্থা ফেরানোর কোনো মতলবের কথাই শুনবে।

—ওদের চারটে ছেলেপুলে, আমার মাত্র একটা থাকবে কেন?

—যাও! রাখি ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছে তাকে।—তোমার কেবল ওই চোখে পড়েছে! কার সঙ্গে কার তুলনা!

সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু সব সত্যি কথা সর্বদা ভালো লাগে না। শেষের এই তুলনার উক্তিটুকু সুবীরকান্তর কানে খুব মিষ্টি লাগল না।

এরপর সোমা সরকার একদিন তাদের ফ্ল্যাটে এলো। রাখি তাকে কোথায় বসাবে, কতভাবে আপ্যায়ন করবে ভেবে পায় না। তার গাড়ি পাঠিয়ে ওকেও দু'তিনদিন তার বাড়িতে নিয়ে গেল।

সেদিন তাদের বাড়ি থেকে রাখি রীতিমত একটা উত্তেজনা নিয়ে ফিরল। একটা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য যেন সেধে তার দোরগোড়ায় এসে হাজির হবার উপক্রম করেছে। এখন শেষ পর্যন্ত এলে হয়।

সুবীরকান্ত ব্যাপারটা শুনল। আই. এ এস. রমেন্দ্র সরকার এখন ডিরেক্টর অফ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, অর্থাৎ এই বিভাগটির সর্বময়কর্তা। এম এ পাশ করে রাখি কলেজে চাকরির চেষ্টা করছে শুনে সে একটা আশাতীত প্রস্তাব দিয়েছে। তার বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার নেওয়া হবে একজন—সোসিওলজির এম. এ চাই, ইকনমিক্সও চলতে পারে, কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ.-তে এই সাবজেক্ট নেই। অবশ্য এ চাকরি হওয়া খুব সহজ নয়, পরীক্ষা হবে, ইন্টারভিউ হবে, তারপর চাকরির প্রশ্ন। তবে রমেন্দ্র সরকার সহায় বলেই আশা। সে নিজেই বলেছে, যতটা সম্ভব চেষ্টা করবে। আর সোমা তাকে বলেছে, ওরা ওরকম হাতে রেখে বলে, শেষ পর্যন্ত চাকরি তোরই হবে জেনে রাখ।

আশ্চর্য, এমন একটা খবর শোনার পরেও লোকটা প্রায় নির্বিকার। খানিক চুপ করে থেকে মন্তব্য যা করল শুনে রাখির রাগ হবারই কথা। বলল, মেয়েদের পক্ষে এ বড় ঝামেলার চাকরি, তার থেকে কলেজই ভালো।

—বলো কী? গোড়াতেই গেজেটেড ব্যাঙ্ক, কলেজে যেখানে শেষ এখানে প্রায় সেই মাইনের শুরু। এর ওপর কত প্রমোশন আছে—ওয়েলফেয়ার অফিসার তো

হওয়া যাবেই, অ্যাসিস্টাণ্ট ডাইরেক্টার, ডেপুটি ডাইরেক্টার পর্যন্ত হওয়ার আশা আছে। তাছাড়া কলেজেব চাকরি যে পাবই তারই বা ঠিক কী?

—না পেলে স্কুলে তো পাবেই।

ঠাট্টা করছে কিনা রাখিব প্রথমে সেই সন্দেহ হল। পবে রেগেই গেল।—তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে?

সুবীরকান্ত জবাব দিল না, চুপচাপ মুখেব দিকে চেযে রইল শুধু।

এরপর দিনকতকের জন্যে আহার-নিদ্রা ঘুচে গেল বাখির।

দবখাস্ত কবা হল। বোজই একবার কবে সোমাব ওখানে ছুটতে লাগল। লিখিত পরীক্ষার জন্য কী-ভাবে তৈরি হবে, ইণ্টাবভিউতেই বা কী ধরনের প্রশ্ন কবা হয়ে থাকে, এ-সব ব্যাপাবে তাব কিছুই ধাবণা নেই। সোমাকে বলে, পবীক্ষায় চিত্তির করে এলে আব এ বাড়িতে মুখ দেখাতে আসতে পাবব না বলে দিলাম।

আর ওখানে যজ্ঞেশ্বর কাপুর নামে একজনের সঙ্গে সবকার আলাপ করিয়ে দিল। জযেণ্ট ডাইবেকটার, রমেন্দ্র সরকাবেব ঠিক নীচেব লোক। সোমা বলেছে, আপিসের সর্বকর্মে সেই নাকি বৃহস্পতি। বযেস রমেন্দ্র সরকাবের থেকে কিছু বেশি হবে। হাসি-খুশি দিলদবিযা মানুষ। এখানে অনেককাল আছে, মোটামুটি ভালই বাংলা বলতে পাবে। তুমি বলে। তুমিটা অন্তরঙ্গসূচক জানাব পর থেকে একটু খাতিব হলেই সে আব কাউকে আপনি কবে বলে না।

রমেন্দ্র সবকাবেব সামনেই সোমাব আব্দার, মিস্টাব কাপুব, আমার বন্ধুকে কিন্তু নিতে হবে, নইলে আপনাব সঙ্গে কথা বন্ধ।

কাপুর হেসেই ভয়েব কাকুকার্য ফুটিয়েছে মুখে।—কী সর্বনাশ, তাহলে তো নিতেই হবে!

পরীক্ষায কী ধরনের প্রশ্ন আশা সম্ভব সেটা কাপুবই লিখে দিযেছে তাকে। সে-সব নিয়ে বাখি আবার ঘবেব লোকের শবণাপন্ন হযছে। এত বড় একটা ব্যাপাবে তাব নির্লিপ্ততা দেখে সে মনে মনে বিরক্ত। কিন্তু এখন প্রযোজনে তোয়াজ না করে উপায কী?

বড চাকরি করার ঝোঁক এত প্রবল যে সুবীবকান্তও আব মুখ ফুটে বাধা দেয়নি। নিজে খেটে-খুটে আব বইপত্র ঘেঁটে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোর উত্তব লিখে দিয়েছে। আর গলদঘর্ম হয়ে রাখি সে-সব কণ্ঠস্থ কবেছে।

পরীক্ষা হয়ে গেল। বাখি অবাক, আসতে পারে বলে কাপুর যা লিখে দিযেছিল, হুবহু সেই সবই এসেছে। তার বাইবে একটিও নয়। এব দিনকযেক বাদে কাপুর লাফাতে লাফাতে এক বিকেলে আপিস-ফেবত বডকর্তা অর্থাৎ সোমাব বাড়ি এসে হাজিব। রমেন্দ্র সরকার তখন টুরে। পরীক্ষার ফলাফল জানাব আশায রাখি প্রায়ই সোমাব ওখানে যায়। সেদিনও গেছল। তাকে দেখামাত্র কাপুর হৈ-হৈ করে উঠল। —কনগ্র্যাচুলেশনস ম্যাডাম, কনগ্র্যাচুলেশনস্! তুমি তো একটি সাংঘাতিক মেয়ে দেখি, পরীক্ষার খাতায় কী কাণ্ড করেছ! সোমার দিকে ফিরল।—বুঝলে ম্যাডাম, তোমার

বন্ধু একটি জিনিস, পরীক্ষার খাতায় যা-সব লিখেছে আমার বাবার সাধ্যি নেই সেরকম লেখে। অফিসাররা সব কাড়াকাড়ি করে ওর খাতা পড়েছে!

চাকরি? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে এর পরেও চাকরি হবে না!

হাওয়ায় ভেসে বাড়ি ফিরেছে রাখি। এতবড় কৃতিত্বটা কার প্রাপ্য সেটা সে ভালই জানে। সুখবরটা তক্ষুনি ভাঙল না। খাওয়া-দাওয়ার পর লোকটা আবার বই নিয়ে শুয়ে পড়েছে। ইদানীং পড়াশুনা একটু বেড়েছে লক্ষ্য করেছে। বইখানা হাত থেকে টেনে নিয়ে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে রাখল, তারপর দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে যেন একটা সরল অধিকার ঘোষণা করল।

—কী ব্যাপার?

রাখি বলল, ব্যাপার গুরুতর। তোমার এবারের চাকরির পরীক্ষাটা খুব ভালো হয়েছে—একেবারে ফার্স্ট!

সুবীরকান্ত কিছুটা নির্লিপ্ত সুরে জবাব দিল, তোমাকে ফার্স্ট করার দায়ে যারা প্রায় প্রশ্নপত্র চালান করেছে, তাদের মুখ রক্ষা হয়েছে বলো!

মনে মনে একটু লজ্জা পেলেও উৎফুল্ল মুখে রাখি বেশ জোর দিয়েই বলল, বেশ যাও, সকলেই তো আর তোমার মত আদর্শ নিয়ে বসে নেই—কি যে হচ্ছে সর্বত্র তুমি খবরও রাখো না।

—বুঝলাম। তোমার চাকরি হচ্ছে তাহলে!

—হচ্ছেই তো। ছদ্ম-কোপে রাখি চোখ পাকালো।—কেন, না হলে তুমি খুশি হও?

সুবীরকান্ত হেসেই জবাব দিল, ঠিক বুঝছি না!

রাখি বলল, তুমি একটা স্বার্থপর, একটা ভালো চাকরি করবো তাও তোমার সহ্য হয় না। মেয়েদের পোস্ট, আমি না পেলে আর কোনো মেয়েই পেতো এটা —তাহলে আমি কী দোষ করলাম!

সুবীরকান্ত অন্তরঙ্গ আকর্ষণে তাকে আগলে রেখে হেসেই জবাব দিল, দোষ কিছু নয়, বিয়ের পর থেকে তোমার বড় হবার ঝোঁক দেখে আমার ভয়।

—বাবে, চাকরিই যখন করব, ছোট চাকরি করব কেন?

সুবীরকান্ত তক্ষুনি ফিরে প্রশ্ন করল, আমার চাকরিটা ছোট চাকরি, না?

এবারে রাখি লজ্জা পেল একটু।—তুমি তো তবু প্রোফেসার, তোমার মতো তো স্কলার নই আমি, প্রোফেসার হতে হতে বুড়িয়ে যাব।

—তাহলে তোমার স্কুলের চাকরিটা ছোট চাকরি ছিল বলো?

—অত সব জানি না, বিচ্ছিরি চাকরি।

এই প্রসঙ্গ বাতিল করে দিয়ে মনের আনন্দে আরো নিবিড়ভাবে বক্ষলগ্ন হল সে। কিন্তু মানুষটাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হল তার।

জীবনের একটা ছোট বৃত্ত থেকে অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষিত একটা বড় বৃত্তে পদার্পণ করল যেন রাখি। এই বৃত্তের রূপ আলাদা, রঙ আলাদা।

গোড়ায় গোড়ায় তার কাণ্ড দেখে সুবীরকান্ত হাসত। দু'ঘরের ফ্ল্যাটে আর চলছে না, তিনঘরের ফ্ল্যাট একটা সংগ্রহ করতেই হল। ঘর হলেই হল না, তার যোগ্য

সাজসজ্জা চাই। সোফা সেট এলো, তার সঙ্গে রং মিলিয়ে জানলা দরজার পর্দা এলো। টেলিফোন তো অফিস থেকেই মিলেছে। ছ'মাস না যেতে মাসিক কিস্তির ব্যবস্থায় ছোটখাটো একটা ফ্রীজও কিনে ফেলল সে।

মুখের হাসি আস্তে আস্তে কমে ব্যঙ্গোক্তি করেছিল, এবারে একটা গাড়ি চাই না?

—বোসো, আস্তে আস্তে সব চাই। তোমার কি, ভোলানাথ, কিছুই চাই না।

এ-সবের সঙ্গে তাল রেখে চাকরির মর্যাদা অনুযায়ী নিজের বেশবাসের ব্যবস্থা।

ছ'মাসের মধ্যে কম করে চারমাসের শেষের দিকেই বিব্রত মুখে রাখি এসে বললে, কিছু টাকা দিতে পারো, আমার হাতে যা ছিল ফুরিয়ে গেছে।

সুরীরকান্ত টাকা দেয়, কিন্তু টিপ্পনীও কাটে।—তুমি বড় চাকরি পাওয়াতে আমার কত সুবিধেই না হচ্ছে!

—বেশ যাও। সব যেন আমি নিজের জন্যে খরচ করছি। আর টাকাগুলোও ছাই কি-ভাবে যে খরচ হয়ে যায়—তা গোড়ায় গোড়ায় তো এরকম হবেই, একবার সব গোছানো হয়ে গেল তখন দেখো।

কিন্তু গোছানোর শেষ কোনো কালে হবে এমন ভরসা সুরীরকান্ত রাখে না।

বছর ঘুরতে পাখিকে নিয়ে তাদের মধ্যে ছোটখাট ঝগড়াই হয়ে গেল একটা। পাখি চার-এ পড়েছে, অতএব এখন ওকে কিণ্ডারগার্টেনে না দিলেই নয়। নামজাদা এক মিশনারী স্কুলে ব্যবস্থা করল রাখি।

কিন্তু এ ব্যাপারে ওর বাপের বেয়াড়া গোঁ দেখে মনে মনে রীতিমত বিরক্ত। তার সাফ কথা, ওর জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না—যখন সময় হবে, আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত ও সাধারণ স্কুলেই পড়বে।

রাখি দেখে আসছে তার অনেক ব্যাপারে মানুষটা ইচ্ছে করেই আপত্তি করে। রেগে গিয়ে বলল, তাহলে বড় স্কুলগুলো আছে কী করতে?

—বড় স্কুলের ক'টা বাপ নিজে তার মেয়ের ভার নেয় আমি খরর রাখি না, আমার মেয়ের ভার আমি নিজে যখন নিয়েছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু তার পরেই হেসে যে কথা বলেছে, রাগ হবারই কথা। বলেছে, তোমার অসুবিধেটা কোথায় আমি বুঝি, মেয়ে তোমার কোনো নাম-করা বিলিতি স্কুলে পড়ছে না, লোকের কাছে সেটা বলতে তোমার মানহানি হবারই কথা।

ঠিক এমনি করেই একটা ঠাণ্ডা বিচ্ছিন্নতা দু'জনের মধ্যে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। রাখির মনে হয় বাড়িতে পা দিলেই সে যেন একটা সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে এসে পড়ে। বাইরেটা এর থেকে অনেক উদার, অনেক প্রশস্ত।

এদিকে তার অফিসের খাটুনিরও অন্ত নেই। কিন্তু তাতে বেশ একটা আনন্দ আছে, বৈচিত্র্য আছে। এক বছরের মধ্যেই চাকরিতে রীতিমত সুনাম রাখি চক্রবর্তীর। তার জন্যে পদোন্নতি এবং পরিশ্রমও কম করেনি। চাইলড ওয়েলফেয়ার, মেটারনিটি ওয়েলফেয়ার, নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের উন্নতি এবং শিক্ষার ব্যবস্থা, তাদের কারিগরী শিক্ষার মহড়া, স্বাস্থ্য, সমস্যা, সাংস্কৃতিক উন্নতি, স্পোর্টস, কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন—ইত্যাদির

ব্যাপারে যে কত কত বই আর কত বিপোর্ট পড়তে হয়েছে তাকে ঠিক নেই। এবারে আর সে কারো সাহায্যভিক্ষা করেনি, খেটে খেটে আর চোখ-কান খোলা রেখে নিজের ভিত নিজেই তৈরি করেছে।

ঘরের লোকের মেজাজ-পত্র তখনো অবশ্য অতটা অপ্রসন্ন দেখা যায়নি। বরং বলেছে, কাজ যখন নিয়েছ, সর্বরকমে সে কাজের উপযুক্ত হওয়া ভালো।

কিন্তু অদৃশ্য বিচ্ছিন্নতাটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল তারপরে। কাজের আঁটঘাট যখন বোঝা হয়ে গেছে, আর যখন সে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে—আপিস থেকে সন্ধ্যে গড়িয়ে যায় প্রায়ই। সব-দিন যে কাজ থাকে এমন নয়। আপিসের শেষে মাঝে-মাঝেই উঁচুমহলের বৈঠক বসে, পরামর্শ হয়, আলাপ-আলোচনা হয়, কোনদিন বা নিছক আড্ডাই হয়। এগুলোও চাকরির অঙ্গ। তাছাড়া উঁচু মহলের এখানে সেখানে আনন্দ-সমাবেশ বা সাংস্কৃতিক ডাকও আছেই।

কিন্তু বাড়ি ফেরামাত্র একখানা গুরুগম্ভীর মুখ দেখতেই হবে। যেন কত অপরাধ করে বাড়ি ফিরল সে। তিনটে কথা জিজ্ঞাসা করলে একটার জবাব দেবে। গোড়ায় গোড়ায় দেরিতে ফেরার কারণ বলত। এখন আর কিছু বলে না। হয় বই, নয় মেয়ে নিয়ে আছে। আর ওর সঙ্গে আড়াআড়ি করেই যেন মেয়েটার স্বভাব অন্যরকম করে তুলছে। শুধু ওর জন্যেই এখন আয়া আছে একটা, কিন্তু বাপ বাড়ি থাকলে এক ঘণ্টাও এখন আর তার কাছে থাকতে চায় না মেয়েটা। নিজে হাতে তাকে খাওয়াবে, জামা পরাবে, অতবড় মেয়েকে সর্বক্ষণ কোলে বসিয়ে আদর দেবে, ঘুম পাড়াবে। মেয়েও তেমনি হয়ে উঠছে, পানের থেকে চুন খসলে বাবা বলে চিৎকার। মনের মতো কথা না বললে বা কখনো ধমক-ধামক করলে তাকে পর্যন্ত শাসায়, বাবাকে বলে দেব।

রাখির রাগ হয়ে যায় এক-একদিন, বলে, বল গে যা, তোর বাবা এসে মাথা কাটবে আমার। আদর দিয়ে দিয়ে মাথাখানা খাচ্ছে একেবারে।

ঝাঁঝটা সুবীরকান্তর কানে যায়। কিন্তু সে বলে না কিছু। মেয়েটা একটু-আধটু অসুখে ভোগে প্রায়ই, তাতেও ওর বাপের বাড়াবাড়ি রকমের ব্যস্ততা। সেদিন কাজের চাপই বেশি ছিল একটু, সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে দেখে মেয়েকে কোলে বসিয়ে তার বাবা দুধের গেলাস নিয়ে সাধ্য-সাধনা করছে—কিন্তু মেয়ে কিছুতে খাবে না। রাখি শাড়ি বদলে মুখহাত ধুয়ে এলো, চা খেল—দুধের গেলাস হাতে তখনো সেই সাধাসাধি চলেছে।

এই দেখে মেয়ের বাবাকেই ঝাঁঝিয়ে উঠল রাখি।—আদর দিয়ে দিয়ে কী করে তুলছ এখন দেখো! তার পরেই মেয়েকে শাসালো, এই মেয়ে, ভেবেছিস কী তুই? খাবি তো খা, নইলে বেরো এখান থেকে।

মায়ের দিকে চেয়ে মেয়ে পাল্টা চোখ পাকালো।—তুমি একটা পাজী।

সঙ্গে সঙ্গে বাপের কোল থেকে মেয়েকে টেনে তুলে একটু জোরেই ঝাঁকুনি দিল রাখি।—কী বললি?

মেয়ে ভ্যা করে কেঁদে উঠল। তাই শুনে আয়া ঘরে ঢুকতে রাখি তাকেও ধমকে উঠল, মেয়েকে দুধ-টুধ খাইয়ে দেখেশুনে রাখো না কেন? সব সময় বাবুকে কষ্ট করতে হয় কেন?

জবাবদিহি না করে আয়া কাঁদুনে মেয়েকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল। দুধের গেলাস হাতে সুবীরকান্ত যে-ভাবে চেয়ে আছে তাতে বাগ হচ্ছে বাখির। —কী, মাকে পাজী বলতে শিখেছে, শাসন করে খুব অন্যায় করেছি?

—না। তবে ওই কথাটা সে তোমার কাছ থেকেই শিখেছে। দিনের মধ্যে দুই-একবার তুমিই ওকে পাজী বলো, আর কেউ বলে না।

উঠে জানালা দিয়ে গেলাসের সবটুকু দুধ বাইরে ফেলে দিয়ে শূন্য গেলাসটা টেবিলের ওপর রাখল।—মেয়েটা কাল থেকে সর্দিতে ভুগছে, আজ একটু জ্বর-জ্বরও হয়েছে—রোজ যা খায় সকাল থেকে এ পর্যন্ত তার অর্ধেকও খায়নি, এ-খবর তুমি রাখো?

গেলাসের দুধ ফেলে দিতে দেখে অপমানে বাখির মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল। শেষের কথা শুনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া।—আমাকে তো বলোনি।

—আমি বলব, কেমন? তুমি মস্ত চাকরি করো, তাই মেয়ের অসুখের খবর তোমাকে আমার কাছ থেকে পেতে হবে? কোনা খবর যখন রাখার সময় নেই, তখন শাসন করারই বা দরকার কী? সরে খেতে শুরু করেছিল মেয়েটা—মধ্যে এসে তোমাকে এই মূর্তি দেখাতে কে বলেছিল?

ঘর ছেড়ে চলে গেল। রাখি অপ্রস্তুত হয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চাকরির খোঁটাটা বিঁধছে। পায়ে পায়ে মেয়ের কাছে এলো। পিঠে হাত দিয়ে দেখল, একটু ছ্যাক-ছ্যাক করছে বটে। আর ঢপঢপে সর্দিটাও মিথ্যে নয়। মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, খাবি?

মায়ের গম্ভীর অথচ নমনীয় মুখ দেখে মেয়ে কৌতুক বোধ করল। আয়ার কোল থেকে মাথা নাড়ল, খাবে। রাখি দুধ ঢেলে নিতে এলো আবার। বই ফেলে তক্ষনি সুবীরকান্ত উঠে এলো—দুধ কী হবে?

—ও খাবে বলছে।

—খেতে হবে না, রেখে দাও—যখন খাওয়ার দরকার হবে আমি খাওয়াব।

রাখির সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছে আবার। দুধের স্যাসপ্যান হাতে রাখি তার দিকে ফিরে চেয়ে আছে।

—দেখছ কী, তোমার কোনো ব্যবহারে ওইটুকু মেয়েকে আমি অবাক করতে চাই না। রেখে দাও, নয়তো ওই প্যানসুদ্ধ দুধ আমি রাস্তায় ঢেলে দেব।

ফিরে গিয়ে আবার বই নিয়ে বসল। রাখি স্তব্ধ খানিকক্ষণ। লোকটার গোঁ জানে, কিন্তু মেজাজ তার নিজেরও কম নয়। জীবনের যে ক্ষেত্রে এখন বিচরণ তার, তুচ্ছ কারণে এ-রকম ঝগড়াবিবাদ রুচিতে ঘা লাগার মতো। দুধের স্যাসপ্যান রেখে সোজা ওই ঘরেই এসে দাঁড়াল সে-ও।

—আমার সঙ্গে আজকাল তুমি এ-রকম ব্যবহার করছ কেন?

সুবীরকান্ত বই পড়ছে—পড়ছে। জবাব দিল না।

অনুচ্চ কিন্তু আরো কঠিন সুরে রাখি বলে উঠল, তোমার এ-রকম ব্যবহারের অর্থ কী আমি জানতে চাই।

—তাতে অশান্তি বাড়বে।
—অশান্তি আমি করছি কেমন, তুমি নিজে কিছু করছ না।
সুবীরকান্ত বই পড়ছে।

বিচ্ছিন্নতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল আরো বছরখানেক বাদে।

সহকারী ওয়েলফেয়ার অফিসার থেকে রাখি চক্রবর্তী ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে বসল। কিন্তু প্রত্যাশিত উন্নতিটা একটু অপ্রত্যাশিত ভাবেই এগিয়ে এলো তার সামনে। কথা ছিল, এক বুড়ো অ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টর বছর দেড়েক বাদে রিটায়ার করলে ওয়েলফেয়ার অফিসার মণিমালা ঘোষ অ্যাসিট্যান্ট ডাইরেক্টার হবে আর মণিমালা ঘোষের জায়গাটি তখন রাখি চক্রবর্তী দখল করবে। কিন্তু রাতারাতি অবাক ব্যাপার হল একটা, বলা নেই কওয়া নেই মণিমালা ঘোষ হঠাৎ নিজের ইচ্ছেয় একেবারে অন্য বিভাগে অন্য চাকরি নিয়ে চলে গেল।

এই নিয়ে অবশ্য কানাঘুষো হল একটু। উড়ো গুজব কানে এলো রাখি চক্রবর্তীর, মণিমালা নাকি জয়েন্ট ডাইরেক্টার যজ্ঞেশ্বর কাপুরের ওপরেই রাগ করে চলে গেল। রাখি অবশ্য এ গুজবে কান দেয়নি। কারণ দিলখোলা যজ্ঞেশ্বর কাপুরের ওপর রাগ কারো হতে পারে না। তার ওপর এ আপিসে এসে অবধি মণিমালার সঙ্গে একটু খাতিরই বরং বেশি দেখেছে। একেবারে নিম্নপর্যায়ের মানুষদের কিছু চটুল রটনাও কানে এসেছে তার, কিন্তু এ-সব উক্তিতে রাখি কখনো কান পাতে নি। কারণ কাপুরের সঙ্গে খাতির সকলেরই—সে যখন ম্যাডাম বলে সরাসরি কাধে হাত রাখত অথবা হাত ধরে ঝাঁকাতো—রাখির নিজের মুখও গোড়ায় গোড়ায় লাল হত, এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর বলতে গেলে কাপুরের খাতির এখন সব থেকে বেশি তার সঙ্গেই। রাখি জানে, এই নিয়েও আড়ালে চোখ-টেপাটেপি করে কেউ কেউ আজকাল। কিন্তু এ-সব নিম্নস্তরের ব্যাপার কখনো গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি সে।

মণিমালা ঘোষ আই এ এস ডাইরেক্টার রমেন্দ্র সরকারের নিজের খুড়তুতো বোন। নিঃসন্তান, বিধবা। বছর সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে বয়েস, রমেন্দ্র সরকারের থেকে বছর দেড়-দুইয়ের ছোট। কিন্তু রাখি বা সোমার থেকে অনেকটাই বড়। ওরা মণিদি বলে ডাকত তাকে। আর রাখির বেশ ভালো লাগত তাকে। বুদ্ধিমতী, মোটামুটি সুশ্রী মিষ্টি চেহারা।

সে এভাবে হুট করে চলে যেতে রাখি অবাক হয়েছিল সন্দেহ নেই। সোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কী ব্যাপার, মণিদি চলে গেল কেন?

সোমা ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, কে জানে, মেজাজী মেয়ে, ভালো লাগল না চলে গেল। আমাকে শুনিয়ে গেল, দাদার আণ্ডারে আর চাকরি করার ইচ্ছে নেই। তারপরেই মুচকি হেসে সোমা বলল, ও বদলি হয়ে তোর তো কপাল খুলে গেল রে।

মিথ্যে নয়, কপাল খুলেছে বটে। এখন তো ওয়েলফেয়ার অফিসার, দেড় বছর বাদে ওই আধ-বুড়ো অ্যাসিট্যান্ট ডাইরেক্টর রিটায়ার করলে সেই পোস্টও অবধারিত সে-ই পাবে। কাপুর এ আশ্বাসও তাকে দিয়েই রেখেছে। সে জয়েন্ট ডাইরেক্টর বটে,

কিন্তু এ-সব ব্যাপারে সমস্ত বিভাগটির সর্বময়কর্তা বলতে গেলে সে-ই। মিনিস্টার থেকে শুরু করে সকলের সঙ্গেই তার দহরম-মহরম। সেদিক থেকে প্রতাপ তার ডাইরেক্টারের থেকেও বেশি। কিন্তু মানুষ হিসেবে এমনি মজার যে প্রতাপের দিকটা কখনো কোনা কারণে উগ্র হয়ে ওঠে না।

ভাগ্যের এ-হেন পরিবর্তনেও নির্বিকার শুধু ঘরের একজন। এই কারণে রাখির ভেতরটা এখন বিরক্তিতে ভরপুর। তার মনে মনে ধারণা, তার বড় চাকরির দরুণ লোকটা তাকে ঈর্ষাই করে। আসলে তার নিজেরই পুরুষকারের অভাব। নইলে এত বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে কলেজের মাস্টারিতেই খুশি থাকে কী করে? একটু খাটলে ডক্টরেট অনায়াসে পেতে পারে। রাখি একবার সেকথা বলেও ছিল। জবাবে যে কথা তাকে শুনতে হয়েছিল তাও চাপা গাত্রদাহ ছাড়া আর কিছু নয়। সে বলেছিল, বড় চাকরি করার পর আজকাল আমাকে নিয়েও বোধহয় একটু লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার।

রাখির রাগই হয়েছে। জবাব না দিয়ে চলে গেছে। ঘরের লোক মস্ত লোক, সেটা যে সব স্ত্রীরই গর্বের কারণ, এটুকু বোঝার মত উদারতা পর্যন্ত যদি না থাকে, তার সঙ্গে তর্ক করে কী হবে?

এমনি করেই হালকা ব্যাপারগুলোও ঘোরালো হয়ে উঠছে। যেমন সেদিন—সন্ধ্যার পর এক বড় হোটেলে কাপুর সেদিন ওদের ডিনারে ডেকেছিল। ওদের বলতে রমেন্দ্র সরকার, সোমা সরকার আর রাখি। মনে মনে খুশি হল, কারণ ডিনারটা তারই প্রমোশনের খাতিরে। কিন্তু কাপুরের সেটা মাথায় না এলে রাখিই বা বলে কী করে?

ডিনারে হাসিখুশির ব্যাপারটা একটু বেশিই গড়ালো। এ-ধরনের নিরিবিলি সমারেশে রমেন্দ্র সরকার আর কাপুরকে ড্রিঙ্ক করতে রাখি আগেও দেখেছে। সেদিন কাপুর প্রস্তাব করল, তাদের সম্মানে মহিলাদেরও একটু ড্রিঙ্ক করতে হবে। সোমা সানন্দে রাজি। ও একেবারে অনভ্যস্ত নয়, সেটা খানিক বাদেই বোঝা গেল। কিন্তু তরল খুশির ব্যাপারটা জমে উঠল রাখিকে নিয়ে। সে কিছুতে রাজি না কাপুর খাওয়াবেই তাকে। গেলাসের রঙিন পদার্থ সে খুব হালকা করে মিশিয়ে তারপর সেই থেকে অনুরোধ করে চলেছে। শেষে সোমা বলেছে, অত করে বলছে, খা না বাপু, এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না—এই তো আমি দু'বার মেরে দিলাম।

শেষ পর্যন্ত নাচার হয়েই গেলাসের জলীয় বস্তু চোখ-কান বুজে এক নিঃশ্বাসে জঠরে চালান করে দিল রাখি। বিচ্ছিরি লাগল। তেতো-তেতো স্বাদ। গায়ে একটা ঝাঁকার দিয়ে উঠতে সকলে হেসে উঠল।

ডিনারের পর রমেন্দ্র সরকার কাপুরের গাড়িতে তার সঙ্গে কোথায় তাদের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে চলে গেল। সোমা তার গাড়িতে রাখিকে পৌঁছে দিতে এলো। রাখির ভেতরটা তখন আনন্দে ভরাট, ভারী হালকা লাগছে। কোনো দুর্যোগের ছায়া তার কল্পনাতেও নেই। অন্যথায় বাড়ির দরজায় নেমে সোমাকে হয়ত গাড়ি থেকেই বিদায় দিতে চেষ্টা করত।

দোতলার বসার ঘরে ঢুকতেই সুবীরকান্তর সঙ্গে দেখা। সোমা হেসে বলে উঠল, আজ কিন্তু আপনার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ করে দিয়েছি আমরা...কাপুর ওকে ড্রিঙ্ক করিয়ে ছেড়েছে।

শোনা-মাত্র মুখখানা যা হযে গেল, ভিতবে ভিতবে বাখি যেন কেঁপে উঠল। সোমাও বলে উঠল, ভয পেযে গেলেন নাকি। কিছু ঘাবডাবেন না মশাই, ইট ওযজ জস্ট স্পোর্ট, আমি ওব ডবল খেযেছি।

নিষ্প্রাণ ঠাণ্ডা গলায সুবীবকান্ত জবাব দিল, আপনাব যা সহ্য হবে ওব তা সহ্য হবে কি?

সোমা চোখ পাকালো, কেন, আপনাব স্ত্রীটিকে আপনি কাঝে থেকে কম ভাবেন নাকি?

—না, তবে নিজেব থেকেও খুব বেশি ভাবাব মতো মুশকিলে না পডে যাই।

তবল বস্তুব প্রতিক্রিযায সোমাব ভেতবটাও খুব হালকা। অন্যথায এই গম্ভীব আচবণ মর্যাদায লাগাব কথা। হেসেই বাখিব দিকে ফিবল, তোব ভদ্রলোক দেখি বেজায পিউবিটান, মেজাজপত্র খুব ভালো দেখছি না। আজ পালাই, আব একদিন এসে তর্ক কবব।

লজ্জায বাখিব মাথা কাটা যাচ্ছিল। তাকে বিদায দিযে ঘবে এসেই ফেটে পডল। বলে উঠলো, আমাব বন্ধু হলেও ও আমাব ডাইবেক্টবেব স্ত্রী, এটা তোমাব মনে বাখা উচিত ছিল—তুমি ওব সঙ্গে এ ব্যবহাব কবলে কী বলে।

হাতেব বই বেখে সুবীবকান্ত আস্তে আস্তে উঠে দাঁডাল।—কী বকম ব্যবহাব কবতে হবে, তোমবা স্পোর্ট কবে মদ খেযে এসেছ সেই আনন্দে আটখানা হযে উঠব?

—কী বললে? স্পোর্ট কাকে বলে তুমি জানবে কী কবে? নিজেব কাছে এক মস্ত লোক হযে বসে আছ তুমি, বাইবেব দুনিযায কেউ তোমাব আদর্শেব কানা-কডিও দাম দেয না, সেখানকাব সভ্যতা ভব্যতা সম্পর্কে তোমাব কোনো ধাবণা নেই—বুঝলে?

—ধাবণা কাব আছে, ওই কাপুবেব? তাহলে তাব কাছেই যাও।

—কী? কী বললে? দু'পা এগিযে এলো সে।

—সামনে এসো না, ওইখানে দাঁডাও। অনুচ্চ কিন্তু কঠিন এই স্বব শুনে বাখি থমকে দাঁডাল। তেমনি স্পষ্ট পুনরুক্তি সুবীবকান্তব। বললাম আমাব দুনিযাব আদর্শ আলাদা, সেটা যদি তোমাব না পোষায, তুমি অন্য ব্যবস্থা দেখতে পাবো।

ভিতবেব ঘবে ঢুকে গেল। সেখান থেকে মেযেব ঘবে। মেযে বাতে আযাব কাছে ঘুমোয—বাবা-মাযেব সঙ্গে একঘবে থাকা উচিত নয বলে মাসছযেক ধবে বাখিই এই ব্যবস্থা কবেছিল। একটু বাদে মেযেব ঘব থেকে আযাকে বেবিযে আসতে দেখল। তাবপবেই ওই লোককে শোবাব ঘব থেকে নিজেব বালিস নিযে যেতেও দেখল।

বাখিব মাথায আগুনই জ্বলছে। প্রতিদিনেব এই সঙ্কীর্ণতাব অত্যাচাব যেন মুহূর্তেব মধ্যে সহ্যেব সীমা ছাডাল। দু'ঘবেব মাঝেব দবজাব সামনে এসে দাঁডাল সে। দেখল একটু।...বাহুতে চোখ ঢেকে মেযেব পাশে শুযে আছে। অপমানে বক্তবর্ণ হযে গেল বাখিব মুখ। ঠাস কবে মাঝেব দবজা টেনে বন্ধ কবে দিল সে। এত জোবে যে ঘুমন্ত মেযেটা চমকে উঠল।

থাকুক। দেখা যাক ক'দিন পাবে থাকতে। আদর্শবান পুরুষেব আব এক দিকও খুব ভালই জানা আছে তাব। এ অপমানেব জবাব সেও দিতে জানে।

দিন কাটতে লাগল। যে চিড়টা খেল সেটা আর জোড়া লাগল না। কিন্তু কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল। বাক্যালাপটা প্রয়োজনের বাক্যালাপে এসে ঠেকল। বাখির কাজের সুনাম যেমন বাড়ছে, ব্যস্ততাও বাড়ছে। দু'দিন একদিনের জন্যে মাসে কয়েক দফা ট্যুরে বেরুতে হয়। বেশ আনন্দের মধ্যেই কাটে তখন। কখনো খোদ ডাইরেক্টর রমেন্দ্র সরকার সঙ্গে থাকে, কখনো বা জয়েন্ট ডাইরেক্টার যজ্ঞেশ্বর কাপুর।

কিন্তু ফিরে এলেই সেই নীরস গুরুগম্ভীর পরিবেশ। বাখির হাঁপ ধরে যায় এক এক সময়। কোনো সময় যদি মেয়ে বা মেয়ের বাপের শরীর খারাপ হয়, সে খবরও ঝি-চাকরের মুখে শুনতে হয়। কেউ বলে না তাকে। তাকে অপ্রস্তুত করার জন্যই যে বলে না, বাখি সেটা ভালই বুঝতে পারে। তবু যতটুকু সম্ভব নিজের কর্তব্য করে যেতে চেষ্টা করে। মেয়ের আব্দারে তার বাপের এখনো তার কাছেই শোয়া বহাল আছে।

একে একে প্রায় দু'বছর ঘুরে গেল আরো। বাখির অক্লেশে প্রত্যাশিত উন্নতি হয়েছে আরার। সে এ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টার হয়েছে। কাপুর ট্যুরে। এই উপলক্ষে সোমা আর তার বর সেদিন ওদের ফ্ল্যাটে এসেছিল। বাখি আদর অভ্যর্থনা করেছে তাদের। ইদানীংকালের মধ্যে রমেন্দ্র সরকার সস্ত্রীক আরো দিন-দুই তাদের ফ্ল্যাটে এসেছে। বলা বাহুল্য ডাইরেক্টর হিসাবে নয়, স্ত্রীর বন্ধুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ধরেই। সুরীরকান্ত সে দু'দিনের একদিনও বাড়ি ছিল না। এই দিনে ছিল, কারণ বাখি আগে থেকেই তাকে বলে রেখেছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও করেছিল।

সুরীরকান্ত হাসিমুখেই কথাবার্তা বলেছে তাদের সঙ্গে। তবু শুরুতেই বাখির মেজাজ বিগড়লো। তার মেয়েকে দেখে সোমা জিজ্ঞেস করেছিল, কোন স্কুলে পড়ো?

মেয়ে যে স্কুলের নাম করল সেটা যেন নতুন করে কানের পরদায় বিঁধল বাখির। তার ওপর সোমা বলল, একটা মাত্র মেয়ে তোর, একটা ভালো স্কুলে দিলি না কেন?

রাগ চেপে বাখি জবাব দিল, ওর বাবার আপত্তি।

সোমা হাসিমুখে সুরীরকান্তর দিকে তাকালো।—বাবা, আপনি এমন পিউরিটান যে মেয়েকে একটা ভালো স্কুলে দিতেও আপত্তি?

মেয়ের সামনে তার স্কুল সম্পর্কে এই উক্তি যে পছন্দ হবে না সেটা একমাত্র বাখিই জানে। সুরীরকান্ত ক্ষুদ্র জবাব দিল, এটাও খারাপ স্কুল নয়। মেয়েকে বলল, তুমি খেলা করো গে যাও।

সোমা হাসিমুখেই আবার বলল, কিন্তু আশা আর বাসা ছোট করতে নেই, আপনার স্ত্রীকে দিয়েই দেখলেন তো? বরাবর উঁচু আশা ছিল ওর—আপনার পাল্লায় পড়ে হতে যাচ্ছিল স্কুল-মাস্টার—হয়ে বসল এ্যাসিট্যান্ট ডাইরেক্টর...কটা বছর গেলে ডেপুটি ডাইরেক্টরও হবেই।

রমেন্দ্র সরকার মাথা নেড়ে সায় দিল, ইয়েস, সী ইজ ভেরি ডিজারভিং।

ভিতরে ভিতরে বাখি উৎফুল্ল। ঘরের লোকের মুখখানাই দেখছে সে। রমেন্দ্র সরকারের কথা শুনে কান জুড়িয়েছে, আর সোমার কথাগুলো চমৎকার লেগেছে।

—আশা আর বাসা ছোট করতে নেই।

সুবীবকান্ত মৃদু হেসে সোমাব দিকে তাকালো।—ডেপুটি ডাইবেক্টব হলেই আশা আব বাসাব শেষ?

সোমা জবাব দিযেছে, আব কত চান মশাই?

—আমি চাইনে।...আশা আব বাসাব মধ্যে খানিকটা সামঞ্জস্য না ঘটালে বিপদও হয, সেই কথা বলছিলাম।

—কী বকম? সোমা উৎসুক।

—আশাব থেকে বাসাটা বেশি বড হযে গেলে খবচ বাড়ে, ঋণগ্রস্ত হতে হয। আব, আব বাসাব থেকে আশাটা খুব বেশি ছাডিযে উঠলে অবজ্ঞায যে বাসা আছে তাও ভাঙে।

—লজিক। বমেন্দ্র সবকাব তাবিফ কবে উঠল।

—ছাই লজিক। সোমা সবকাব ছদ্ম কোপ দেখালো।—আমি লজিক পডা মেযে, সব উপমাই অমন ভাঙাচোবা কবা যায।

বাখি চক্রবর্তী আব এক ধাপ ওপবে উঠেছে বলেই হযত সহিষ্ণুতা কমেছে আবো একটু। বাইবে তাব মর্যাদা প্রতিপত্তি যত বাডছে, অন্দবেব সহজ আলো-বাতাস যেন ততো বেশি সঙ্কীর্ণ ঠেকছে। চাকবিব ব্যাপাবে মিনিস্টাবেব সঙ্গে পর্যন্ত সহজ যোগাযোগ এখন (অবশ্য কাপুব আব বমেন্দ্র সবকাবেব কল্যাণেই সেটা আবো সহজ হযেছে), ঘবেব লোকেব সেজন্য গর্ব বোধ কবা দূবে থাক, তাব কাছ অসহযোগ দিনকে দিন যেন আবো বেশি স্পষ্ট হযে উঠেছে।

কিন্তু বাখি আব অত কেযাব কবে না। কেউ যদি ইচ্ছে কবে তফাতে সবে থাকে, সে কী কবতে পাবে? মাসেব মধ্যে বাব-দুই অন্তত এক এক দফায চাব-পাঁচ দিন কবে ট্যাব-প্রোগ্রাম আজকাল। কিন্তু ফিবে এসেও সেই গোমডামুখ দেখে মেজাজ চডে যায তাবও। আবো দু-তিন দফা ট্যাব-প্রোগ্রাম ফেলতে ইচ্ছে কবে।

অনেক দিনেব পুঞ্জীভূত মেঘ ফেটে ভেঙে চৌচিব হযে পডল বুঝি সেদিন। কটা দিন বাখি বিশেষ ব্যস্ত ছিল। দুবেব এক মফঃস্বল সহবে কম কবে দশ-বাবো দিনেব ট্যাব-প্রোগ্রাম। বড ব্যাপাব। ছোট ছেলেমেযেদেব ফ্রী প্রাইমাবি স্কুলেব উদ্বোধন, তাদেব শিক্ষাব মহডা, প্রসূতিসদনেব উদ্বোধনী, জন্ম-নিযন্ত্রণ শিক্ষা সপ্তাহ পালন, ওযেলফেযাব একজিবিশন ইত্যাদি অনেক ব্যাপাব। কটা দিন হিমসিম অবস্থা বাখিব। বাডিতে ফাইল-পত্র এনে বাত জেগে কাজ কবতে হযেছে, একসঙ্গে খাওযাদাওযাব ফুবসতও মেলেনি। তাছাডা মেযেব খপ্পবে না পডলে সাবাক্ষণ তো বই মুখে কবেই আছে। বাখি চাকবকে বলে দিযেছে, বাবুকে যেন সময়মতো খেতে দেওযা হয, তাব সময়মত সে খেযে নেবে।

সেদিন ফাঁক পেযে একটু সকাল সকাল বাডি ফিবল। এসে দেখল, কলেজেব সেই অল্পবযসী ইকনমিক্স-এব প্রোফেসাবটি মেযেব সঙ্গে গল্প কবছে। এম. এ. পবীক্ষাব সময যে ভদ্রলোকটি তাকে খানিকটা সাহায্য কবেছিল। তাকে দেখে বলল,

দাদাব জন্য বসে আছি, বাড়ি নেই শুনলাম। দু'দিন কলেজ যাননি দেখে খবব নিতে এলাম, কী হল?

বাখি অবাক। দু'দিন কলেজে যাযনি—ও জানেও না। তাছাড়া কলেজ পাবতপক্ষে কখনো কামাই কবে না। বাখি চাকবকে ডেকে তাড়াতাড়ি চা দিতে বলে বিস্ময গোপন কবতে চেষ্টা কবল। ভদ্রলোকেব নাম প্রতুল সোম। এ-কথা সে-কথাব পব সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবল, আচ্ছা বউদি, দাদা বদলিব জন্য এবকম উঠে-পড়ে লেগেছেন কেন? আমবা জিজ্ঞেস কবলে বলেন, এখানে শবীব টিকছে না।...কিন্তু যে-সব জাযগায তিনি যেতে বাজি সে-সব কলকাতাব থেকে কি এমন ভাল জাযগা?...আবাব সবকাবী চাকবি ছেড়ে বাইবেব কোন কোন যুনিভার্সিটিতেও যেতে চেষ্টা কবছেন শুনলাম, অবশ্য ওঁব মতো প্রোফেসাব পেলে অনেকেই লুফে নেবে, কিন্তু ওব হঠাৎ এ-বকম ইচ্ছে হল কেন?

বাখি নির্বাক বিমূঢ় খানিকক্ষণ। এমন একটা সংবাদ সে কল্পনাও কবতে পাবে না। তাব মুখ দেখে প্রতুল সোমও প্রথমে অবাক, পবে অপ্রস্তুত। সে বলেই ফেলল, আপনি এ-সব জানেন না নাকি?

সহজ হবাব চেষ্টায প্রাণান্তকব ধকল। সমস্ত শক্তি দিযে হাসতে চেষ্টা কবল বাখি। বলল, ঠিক এতটা জানি না...।

বেফাস কিছু বলে ফেলেছে বুঝে প্রতুল সোম আব অপেক্ষা না কবে উঠে পালাল।

মথায আগুন জ্বলছে বাখিব, সে অপেক্ষা কবছে।

সন্ধ্যাব একটু পবেই মানুষটা এলো টেব পেল। সোজা তাব শোযাব ঘবে চলে গেল। ওব ঘবে আসা প্রায ছেড়েই দিযেছে।

খানিকটা সময নিযে মাঝেব দবজা দিযে বাখিই ও-ঘবে এসে দাঁড়াল। মেযে তখন বাপেব বুকেব ওপব উপুড় হযে কে এসেছিল সেই সমাচাব জানাচ্ছে। তাব বাবাব গাযে চাদব জড়ানো, শুকনো মুখ। কিন্তু আব লক্ষ্য কবাব ধৈর্য নেই বাখিব। মেযেকে বলল, ওদিকে আযাব কাছে যাও।

মেযে আজকাল একটু ভযই কবে তাব মাকে। এই মুখেব হুকুম শুনে তক্ষুনি চলে গেল। বাখি আবো একটু এগিযে এলো।—তুমি অন্য জাযগায বদলিব চেষ্টা কবছ শুনলাম?

বদলিব চেষ্টা নয, আসলে সবকাবী চাকবি ছেড়ে চলে যাবে কিনা, সম্প্রতি সেই চিন্তাই কবছিল সে। জযপুবেব এক কলেজ থেকে তাব আমন্ত্রণ যে এসেই গেছে, সেটা এ পর্যন্ত কাবো কাছে বলেনি। এখনো বলল না। গাযে চাদবটা আব একটু ভালো কবে জড়িযে উঁচু বালিসে মাথা বাখল।

—হ্যাঁ।

—তা এ সামান্য খববটা আমাকে বলোনি কেন, বাইবেব লোকেব কাছে বেশ ভালো-মতো অপমান কবাব জন্যে?

সুবীবকান্ত জবাব দিল না।

তীক্ষ্ণ কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রাখি।—আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে?

—না।

—মেয়ে নিয়ে তুমি একা যাবে?

—হ্যাঁ।

চেয়ে আছে রাখি। মর্মান্তিক দেখাই দেখে নিচ্ছে যেন।—আশা বড় করেছি সেই মস্ত অপরাধে বাসা তাহলে ভাঙাই ঠিক করেছ তুমি?

সুবীরকান্ত নিরুত্তর।

দু'চোখ ধক-ধক করে জ্বলছে রাখির। গলার স্বরেও এবার বুঝি আগুন ঝরল। —এত হিংসে তোমার ভেতরে ভেতরে! এত জ্বালা!

ধীর কিন্তু পাণ্ডুর মুখে সুবীরকান্ত আস্তে আস্তে বসল। কঠিন স্বরে বলল, রাখি! আমার শরীর সুস্থ নয়, তুমি ও-ঘরে যাবে?

শরীর-মন কিছুই তোমার সুস্থ নয় সে তো অনেক দিন ধরেই দেখছি, ভিতরে এত বিকৃতি যার সে সুস্থ থাকবে কেমন করে? ও-ভাবে দেখছ কী, আজও তুমি মুখ বন্ধ করবে ভেবেছ? তুমি নীচ! তুমি অতি নীচ, অতি ছোট, অতি হীন, বুঝলে—বুঝলে?

তার মুখখানা ঝলসে দিয়েই এক ঝটকায় সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

হাঁপাচ্ছে। বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে তখনো।

কয়েক স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল কয়েক ঘণ্টা। ও-ঘরের আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। মাঝের পর্দাটা ঝুলছে। রাখি নিজের ঘর থেকে বেরুলো একসময়। খাবার ঘরে আলো জ্বলছে। চাকরটা বসে আছে। তাকে দেখে উঠে এলো।—বাবু রাতে কী খাবেন বললেন না তো?

তার দিকে চেয়ে রাখি থমকালো একটু।—কী খাবেন মানে?

চাকর জানালো, আজ দু'দিন বাবুর শরীর খারাপ, দু'বেলাই দুধ-সাগু খাচ্ছেন —আজ কী খাবেন কিছুই বলেন নি।

কয়েক মুহূর্ত রাখি নির্বাক। তারপর চাকরকে বলল, আর অপেক্ষা না করে খেয়ে নিতে। তারও খিদে নেই বলে এলো।

পরদিন।

মেয়ে স্কুলে চলে গেছে। অফিসে বেরুবার আগে এক-রকম জোর করেই রাখি ঘরে ঢুকল।...চোখ বুজে শুয়ে আছে। টেবিলে ওষুধের শিশি একটা। তেমনি পড়ে আছে—এক দাগও খাওয়া হয়নি। কাল বিকেলে ডাক্তারের কাছে গেছল বোঝা গেল। সকালে টোস্ট পাঠিয়েছিল, তা তেমনি পড়ে আছে, শুধু চা খেয়েছে।

ফিরে তাকাতে দেখল তার দিকেই চেয়ে আছে। রাখির মানসিক যাতনা একটুও কমেনি। সমস্ত রাত বরং আরো বেশি জ্বলেছে। তবু এই মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ দার্জিলিংয়ের একবারের সামান্য অসুখের কথা মনে পড়ল। রাখি মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে কয়েকটা কথা বলেছিল।...এ মুখের সঙ্গে সেই মুখের মিল নেই একটুও।

জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী অসুখ?

জবাব পেল না।

—আজ কলেজ যাবে?

নিরুত্তর।

—দু'পুরে কী খাবে সে-কথা বলবে?

নির্বাক।

বাখি বেবিযে এলো। কাল বাদে পরশু অত বড় ট্যুর-প্রোগ্রাম, অফিসে অনেক কাজ। কিন্তু কাজ না থাকলেই বা কী কবত? ও বাড়ি থাকলেই ববং না খেযে না দেয়ে ওই ভাবে বসে থেকে তাকে আক্কেল দেবে। ক্ষোভ আব একটা অসহ্য যাতনা নিযে বেবিয়ে পড়ল।

এমনি স্তব্ধতাব মধ্যেই সেই দিনটা গেল। পরেব দিনও। সন্ধ্যা। প্রাণান্তকর বিমুখতা সত্ত্বেও পর্দা সবিয়ে ঘরে ঢুকল।...বসে আছে। পাশে মেযে।

—কেমন আছ?

জবাব পেল। মেযে সামনে আছে বলেই।—ভালো।

ট্যাবে বেবোনোব খবব আগেই জানত। পাঁচ-ছ'দিন আগে রাখি বলে রেখেছিল। ভিতবে ভিতবে মানুষটা কোন ছুবি শানাচ্ছে তখনো জানা ছিল না। জিজ্ঞসা কবল, কাল আমাব ট্যাব-প্রোগ্রাম, কী কবব?

—যাবে।

—ফিরতে আট-দশদিন দেবি হবে।

—হবে।

বাইরে এসে কাজেব চাপে সাময়িকভাবে যাতনাটা ভুলতে চেষ্টা করল বাখি। শুধু যাতনা নয, সেই সঙ্গে বিদ্বেষ, ক্ষোভ—আবাব কী একটা অজ্ঞাত ভয়ও।...মানুষটাব অভিসন্ধি জানাব পব এতবড় একটা ব্যাপাব ঘটে গেছে যখন, ভযের কিছু আছে ভাবছে না। তবুও ভয।

সমস্ত দিনে ফুবসত নেই বললেই চলে। বড ব্যাপাব। সোমাকে নিযে ডাইরেক্টর বমেন্দ্র সরকার এসেছে, জয়েন্ট ডাইরেক্টর কাপুব এসেছে, বাখি এসেছে, ওযেলফেযার অফিসাব এসেছে, আব আবো নীচেব কর্মচারীরা যে কত এসেছে ঠিক নেই।

ওপবেব দিকেব ওবা মস্ত সবকারী বাংলোয় আছে—সস্ত্রীক রমেন্দ্র সবকার, কাপুর, বাখি আর ওয়েলফেযার অফিসাব। বাতে কাপুরের ফুর্তিব আড্ডা বসে। বোতলেব রসদ সে কলকাতা থেকেই নিযে এসেছে। তাদেব চারজনেব আনন্দেব আসর বসে। আনন্দ যে নেই সেটা বুঝতে না দেবাব তাগিদেই রাখি যোগ দেয। না এলে সোমা বা কাপুর গিয়ে ঘব থেকে ধরে নিয়ে আসে।

তাদেব অনুরোধে গেলাসও হাতে তুলে নেয়। সমস্ত দিনেব এত পরিশ্রমের পরেও রাতে ঘুম হতে চায না। এই তরল জিনিস জঠরে গেলে চিন্তা-ভাবনাও কিছুটা ফিকে হয়ে যায়, ঘুমও একটু হয়। বাখি ভিতরের সমস্ত ক্ষোভ চিন্তা-ভাবনা যাতনা মুছে ফেলতেই চায।

দশটা দিন কেটে গেল। বমেন্দ্র সবকাব সোমা আব কাপুব কাল চলে যাবে। বাখিব আবও দিন-দুই থাকা দবকাব। মন না চাইলেও থেকেই যাবে।

বাতেব আসব আজ একটু বেশিই জমেছে। বাখি গেলাস তেমন মুখে তুলছে না দেখে বমেন্দ্র সবকাব নিজে পর্যন্ত দুই-একবাব সাহায্য কবতে এগিযেছে। সোমাব হাব-ভাবও অন্য দিন থেকে একটু বেশি খুশি-খুশি। বেশি খেযেছে বলেই বোধহয।

বাত মন্দ হল না। ববেব শবীব খাবাপ হবাব ভযে সোমা একবকম জোব কবেই বমেন্দ্র সবকাবকে টেনে তুলে নিযে চলে গেল।

বাখিও উঠল।

কাপুব বাধা দিল, ম্যাডাম দাঁডাও, তোমাব সঙ্গে আমাব কথা আছে।

উঠে সোজা এগিযে গিযে ঘবেব পুরু নীল পর্দাব ওধাবেব দবজা দুটো টেনে দিযে সোজা তাব কাছে ফিবে এলো। খুব কাছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো তাব দুই কাধে উঠে এলো।

—এ-ভাবে আব কত দিন চলবে? হোযাই ওযেস্ট টাইম?

—তাব মানে? বাখি হতভম্ব। তাব বোধশক্তি কযেক নিমেষেব জন্যে যেন বিলুপ্ত একেবাবে।

—ও, ইউ নো ওযেল। একটা জোবালো আকর্ষণ, পবমুহূর্তে পুরু দুই অধবেব নিষ্পেষণে ঠোঁটদুটো যেন জ্বলেপুড়ে গেল বাখিব। সর্বাঙ্গ অবশ, পাযেব নীচে মাটি দুলছে।

কযেকটা মুহূর্ত। প্রাণপণে লোকটাকে ঠেলে সবালো সে। চকিতে বসন সংববণ কবে নিযে একটা চাপা আর্তনাদ কবে উঠল প্রায়।—এ আপনি কী কবছেন?

কাপুব থমকাল একটু। তাবপব হেসেই আবাব বলল, বাখি, লেটস কাম আউট —আমাব ফ্লার্টিং ওযাইফেব সঙ্গে আমাব বনছে না, তোমাবও ওই বাফ হাজব্যাণ্ডেব সঙ্গে বনছে না—সো লেট আস মেক অ্যাবেজমেন্ট অ্যাণ্ড লেট দেম গো টু হেল।

—এসব, এসব আপনাকে কে বলেছে? আমাব কথা আপনাকে কে বলেছে? ক্রোধে আব সেই সঙ্গে এক অব্যক্ত যাতনায বাখি ঝববঝব কবে কেদে ফেলল।

আব তাই দেখেই কাপুব হকচকিযে গেল কেমন।—বোসো ম্যাডাম, আই অ্যাম স্কাউন্ড্রেল বাট নট মীন। আমাকে বুঝতে দাও। তুমি তোমাব হাজব্যাণ্ডকে ভালবাসো?

বাখি অসহিষ্ণু জোবেব সঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ।

—সে তোমাকে ভালবাসে?

—বাসে।

কাপুব ধুপ কবে সোফায বসে পডল।—দেন আই অ্যাম এ ফুল অ্যাণ্ড হ্যাভ প্লেড ইন হাব হ্যাণ্ডস এগেইন। শোনো ম্যাডাম, আমি একেবাবে ভুল ধাবণা থেকে এগিযেছি—দ্যাট লেডী, সোমা সবকাব, সী ইজ অ্যান ইনট্রিগিং গার্ল। নাও আই আণ্ডাবস্ট্যাণ্ড এভবিথিং। —ওযেলফেযাব অফিসাব মণিমালা ঘোষকে মনে আছে? ওদেব আত্মীয। সি লাইকড মি...পবিবাবেব দুর্নাম হবে সেই ভযে আমাদের মাঝখানে ওবা তোমাকে নিযে এলো। সোমা সবকাব কত যে প্রশংসা কবেছিল তোমাব ঠিক

নেই।..আব আমাবও সত্যি তোমাকে ভালো লাগতে শুরু কবেছিল, সেটা বুঝেই মণিমালা সবে গেছে।

বাখি স্তব্ধ। কাপুব উঠে লম্বা ঘবটায একবাব পাযচাবি কবে তাব হাত-কযেক দূবে এসে দাঁড়াল।—ইদানীং সোমা সবকাব তোমাব স্বামীব সম্পর্কে আমাব কাছে অজস্র নিন্দা কবত, তাকে বোগ বলত, বলত বিযেব পব থেকে কোনোদিন তুমি শান্তি পাওনি বলে তাব ধাবণা।—কেন বলত জানো? বিকজ হাব হ্যাজব্যাণ্ড হ্যাজ স্টার্টেড লাইকিং ইউ, ইযেস সী ক্যান স্মেল দ্যাট।—তাই সে এখন আমাকে দিযে তোমাকে ভালোমত আডাল কবাব জন্য উঠে-পডে লেগেছে। আজ বিকেলেও আমাকে বাব বাব বলেছে, না এগোলে হবে কি কবে, এতবড সুযোগ পেযেও এগোচ্ছ না কেন?

অদ্ভুত একটা হাসি দেখা গেল কাপুবেব মুখে। সব ঝেডে ফেলেই যেন বলল, যাক, লেট এভবিওযান অফ আস একসেপটিং ইউ গো টু হেল। ক্যান ইউ ফবগিভ মি?

বাখি চিত্রার্পিতেব মতো দাডিযে। জবাব দিতে পাবেনি।

পবদিন সন্ধ্যাতেই বাডি ফিবল বাখি। একটা দিনও আব দেবি কবতে পাবেনি। তাব কেবলই মনে হচ্ছিল, কী একটা ব্যাপাবে যেন বড দেবি হযে যাচ্ছে। থেকে থেকে একটা দুর্যোগেব ছাযা পডছে।

তাই ছুটে আসাব তাডা।

মেযে দৌডে এলো কাছে।—মা তুমি এসে গেছ! আমাব কী খাবাপ যে লাগছিল, ভাবছিলাম তোমাব সঙ্গে যাবাব আগে বুঝি দেখাই হল না!

বিষম চমকে উঠল বাখি। সত্রাসে তাকালো মেযেব দিকে।—কোথায যাবি?

—বাবে, কাল যে আমবা জযপুব চলে যাচ্ছি! বাবা বলেছে, কাল এই সময ট্রেন।

বাখি বাকশক্তিবহিত। কোনবকমে দু'পা এগিযে পাশেব ঘবেব পবদা সবালো। ঘবে কেউ নেই।

মেযে বলল, বাবা আবো কী সব কিনতে গেছে।

..নিজেব ঘবেব শয্যায এসে বসল পাখি। নিস্পন্দ, কাঠ। বাখি পাশে দাডিযে সাগ্রহে কী যেন বলছে...বলছে বাবাকে আব সেই সঙ্গে ওকেও কলেজে নিযে গিযে কত খাতিব কবেছে, বাবাকে মোটা মোটা মালা পবিযেছে, কত ভাল ভাল কথা বলেছে, তাবপব কত কী খাইযেছে তাদেব।

নিষ্প্রাণ মূর্তিব মত বাখি বসেই আছে।

সিঁডিতে পাযেব শব্দ।...ওদিকেব দবজা দিযে নিজেব ঘবে ঢুকে গেল। কিন্তু বাখিব নডাব শক্তি নেই। মেযেব গলা কানে আসছে। মাযেব ফেবাব খবব দিচ্ছে বাবাকে।

খানিক বাদে সুবীবকান্ত এ-ঘবে এলো। শবীব এখনো ভালো কবে সাবেনি বোধহয। শুকনো মুখ। নির্লিপ্ত মুখে সামনেব বিবর্ণ মূর্তিব দিকে চেযে বইল একটু। তাবপব ঠাণ্ডা গলায বলল, ভাবনাব কিছু নেই, তোমাব অনেক ক্ষমতা, দু'দিনেই ঠিক হযে যাবে। কাল যাচ্ছি আমবা, তুমি আজই আসবে ধবে নিযেছিলাম, না এলে প্রতুলেব

কাছে চাবিটাবিগুলো বেখে যেতে হত...যাক, এই তোমাব চাবি-পত্র—আব সব যেমন ছিল তেমনি আছে।

প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংববণ কবতে চেষ্টা কবছে বাখি। অস্ফুট স্বব নির্গত হল গলা দিযে—যাচ্ছ কেন?

স্থিব নেত্রে সুবীবকান্ত চেযে বইল একটু। জবাব দিল, যাচ্ছি, তোমাব জীবনে এই নীচ ছোট হীন লোকেব আব দবকাব নেই বলে।

—দবকাব আছে।

দু'চোখ ধাবালো-হযে উঠছে সুবীবকান্তব।—আছে? বড দুর্ভাগা আমাব। তাহলেও যাচ্ছি, আমাব জীবনেও তোমাব প্রযোজন ফুবিযেছে বলে।

অসহিষ্ণু হাতে পর্দা ঠেলে নিজেব ঘবে ঢুকে গেল।

পর্দাটা দুলে দুলে স্থিব হল আবাব।

বাতটা কী-ভাবে কাটল বাখি জানে না। ঘুমোযনি, আবাব জেগেও ছিল না। মাথাব মধ্যে কী সব অজস্র হিজি-বিজি ব্যাপাব চলেছিল। সকাল হতে আব কিছু মনে নেই।

এক বাতেব মধ্যে শবীবটা যেন পঙ্গু হযে গেছে। সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন অনড হযে গেছে। নডতে-চডতে কষ্ট। সকাল থেকে বসে আছে নিষ্প্রাণ মূর্তিব মতো।

সাডে ন'টা বাজতে ধডমড কবে উঠল।

অফিসে যাবে।

না খেযেই বেবিযে গেল। অফিসে এলো। নিজেব ঘবে বসে বইল চুপচাপ। একটা ফাইলও ওলটালো না। মাথাব মধ্যে কী যেন সব তালগোল পাকাচ্ছে সেই থেকে। বেলা দুটো না বাজতে ভিতবে ভিতবে ওঠাব তাডা। ঘন ঘন ঘডি দেখল। কিন্তু জোব কবে পাঁচটা পর্যন্ত বসেই থাকল। বাডি ফিবে কী কববে? কী কবতে পাবে বাখি? ...চোখেব সামনে মেযেব হাত ধবে চলে যাচ্ছে, তাই দেখবে চেযে চেযে?

অন্যদিন অফিসেব গাডিতে বাডি ফেবে। আজ ট্রামে উঠল। তাতেও বেশ কিছুটা সময চলে গেল। জাযগায নামল। ট্রাম-স্টপেব উল্টোদিকেব বাস্তা ধবে আধ মিনিট হাঁটলে বাঁ-দিকে বাডি। ট্রাম-স্টপ থেকে বাডিটা দেখা যায।

বাখি বাস্তা পাব আব হল না। ট্রাম-স্টপেই দাঁডিযে বইল। বাডিটাব দিকে নিষ্পলক চেযে বইল।

বিকেলেব ছাযা ঘন হযে আসছে।

...বাডিব দোবে একটা ট্যাক্সি দাঁডাল। ও-মুখ কবে। ওই ফাঁকা বাস্তা ধবে স্টেশনে যেতে সুবিধা। বাখিব বুকেব ওপব হাতুডিব ঘা পডল। চাকবটা নেমে ভেতবে চলে গেল।

একটু বাদে মাল-পত্র তুলতে লাগল। বেশি কিছু নয। মেযেব হাত ধবে তাব বাবা ট্যাক্সিব সামনে এসে দাঁডাল।

সমস্ত শক্তি একত্র কবে বাখি দেখছে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ।

তাবা উঠল। ট্যাক্সি চলে গেল। ওই চাকাগুলো বুঝি বাখিব বুকেব ওপব দিযেই চলে গেল।

সামনে বাজ্যেব অন্ধকাব ধেয়ে আসছে। বাখি এবাব তাব আগেই বাড়ি পৌঁছুতে চায। নইলে আব পাববে না। পাযেব নিচে মাটি দুলছে। পৃথিবী ঘুবছে।

...বাড়ি। সিঁড়ি ধবে দোতলা। দোতলায় পা দেবাব সঙ্গে সঙ্গে সামনেব দুটো শূন্য ঘব যেন হাঁ কবে গিলতে এলো তাকে। মিনিটখানেক শক্ত হযে দাঁড়িযে থেকে বাখি আত্মবক্ষা কবল।

তাবপব পাযে পাযে ঘবে ঢুকল।

মাথাব মধ্যে আবাব কী সব হিজিবিজি তালগোল পাকিযে যাচ্ছে। বাখি তাবও জট ছাড়াতে চেষ্টা কবছে।...কী এমন হযেছে? কিছু হযনি। পৃথিবী বসাতলে যাযনি। সবই ঠিক আছে। জযপুব আব কতদূব?...দার্জিলিংযে কবে যেন একটা লোক অসুখে পড়ে আনন্দ-ছলছল চোখে বলেছিল—এত দিন তাব কেউ ছিল না, এখন সব আছে। ... আব ও নিজেব হাতে খাবাব তৈবি কবলে সেই লোকটা ছোট ছেলেব মত খুশি হত। অনেকদিন কিছু কবা হযনি। কিন্তু তাতে কী, দিন কী ফুবিযে গেল নাকি...জযপুব কত আব দূব?

...কাপুব জিজ্ঞেস কবেছিল, হাজব্যাণ্ড ওকে ভালবাসে কিনা, আব জিজ্ঞেস কবেছিল, ও হাজব্যাণ্ডকে ভালবাসে কিনা। যেন এবকম সম্ভাবনাব মতো ছেলেমানুষি সম্পর্ক এটা। ঠোঁট দুটো বিষম জ্বালা কবে উঠল হঠাৎ, সুবাযুক্ত দুটো অধবেব স্পর্শ। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে বেশ কবে মুখটা ধুযে এলো।...সোমাটা হতচ্ছাড়ি একটা, দিল একটা ভালমানুষকে ক্ষেপিযে। কী না, ওব বব বাখিকে পছন্দ কবতে শুরু কবেছে। কবলেই হল, অত সস্তা আব কী। জযপুব যেন ভযানক দূব।

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বিছানায বসল।—কী যেন ভাবছিল। কী যেন ভাবা দবকাব। কিন্তু আজ আব কিছু পাবছে না। ভযানক ক্লান্ত। ঘুম পাচ্ছে। কাল ভাববে। পবশু ভাববে। ইচ্ছেমতো যে-কোন দিন ভাববে। আজ ঘুম পাচ্ছে—মোটা কথা, জযপুব এমন কিছু দূব নয।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা বাখি শয্যায এলিযে দিযে নির্জীবেব মত চোখ বুজল।—আজ আব কিছু ভাবতে পাবছেই না। কাল ভাববে। পবশু ভাববে। ইচ্ছেমতো যে কোনদিন ভাববে। আজ বাখি ঘুমুবে।

আচরণ

সুমিত্রা সিংহব বযেস এখন আটচল্লিশ। কিন্তু মেযেদেব কাছে আটষট্টিব মুখোস এঁটে থাকেন সর্বদা। শুধু মেযেদেব কাছে কেন, নানা বযসেব বিযাল্লিশজন শিক্ষযিত্রীও তাঁব প্রায মৌন অনুশাসনেব ভযে সন্ত্রস্ত। বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘবে ডাক পড়লে তাঁবাও খুব স্বস্তি বোধ কবেন না।

চাবশো মেযে, বিযাল্লিশজন শিক্ষযিত্রী, স্কুল বাস-এব জনাকযেক ড্রাইভাব আব ক্লিনাব, চাবজন ঝাড়ুদাব, তিনটে মালী আব হস্টেলেব মেট্রন আব কিছু ঝি-চাকব

নিয়ে সুমিত্রা সিংহর সাম্রাজ্য। ছোট ব্যাপার কিছু নয়। সকলের সকল স্বার্থ বজায় রেখে নিয়ম শৃঙ্খলার সঙ্গে একটা স্কুল চালানো বেশ ধকলের কাজ। আজ ছ'বছর ধরে শক্ত হাতে এই প্রতিষ্ঠানটির হাল ধরে আছেন তিনি। স্কুল কর্তৃপক্ষ নির্বিবাদে এখন তাঁর সব সুপারিশ মেনে চলেন। সব থেকে উঁচু আসনটি তার দখলে আসার পর থেকে বছরের পর বছর বোর্ডের পরীক্ষার রেজাল্ট দেখছেন তারা। শুধু এরই ফলে স্কুলে প্রতি বছর নতুন ভর্তির হিড়িক সামলানো দায়। কোন ক্লাসে সাতটা সীট খালি থাকলে তিনশো মেয়ে পরীক্ষা দিতে বসে যায়। এ ব্যাপারে হোমরা-চোমরাদের সুপারিশ অচল। তাছাড়া সুমিত্রা সিংহ আসার পর গার্জেনদের অবুঝ দাপট কমেছে, শিক্ষয়িত্রীদের দলাদলি গেছে। হরিতম্বি করতে এসে অনেক গার্জেনকে মুখ বুজে মেয়ের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হয়েছে। কয়েকজন অকেজো বা অবাধ্য টিচারকে অবসরও নিয়ে যেতে হয়েছে। সর্বাধিনায়িকাটির সুনজরে পড়তে হলে ক্লাসের মেয়েদের ভালর জন্যে প্রাণপাত করতে হবে—এ এখন সব শিক্ষয়িত্রীরাই বুঝে নিয়েছেন।

বেশি পরিশ্রম করতে হয় বলে সকলেই তুষ্ট নয়। এত দাপট দেখে ভিতরে ভিতরে কারো বা ঈর্ষা। তারা দেমাক দেখেন, দম্ভ দেখেন। রূপের দেমাক। রূপসী আদৌ নন, কিন্তু সুশ্রী বটেই। তাছাড়া স্বাস্থ্যের বাধুনি এমন যে আটচল্লিশ বছর বয়সটাকে অনায়াসে চল্লিশে টেনে নামানো যায়। আর এদের চোখে দম্ভ বলতে শিক্ষার দম্ভ। ইংরেজিতে কলকাতার এম. এ। আর এম. এড। সুযোগ সুবিধে পেলে ওরকম বিলেতি ছাপ যে কেউ নিয়ে আসতে পারে। বেড়ালের ভাগ্যে ক্বচিৎ কখনও শিকে ছেঁড়েও। স্কুলমাস্টারি করতে করতে হঠাৎ সরকারী দাক্ষিণ্যের সুযোগে সুমিত্রা সিংহও তেমনি কিছুদিন বিলেতে ঘুরে এসেছেন। আড়ালে আবডালে এই সরকারী দাক্ষিণ্য লাভের ব্যাপারেও কেউ কেউ জটিল সংশয়ের ছায়া ফেলতে ছাড়েন না। বয়েসকালের সুশ্রী মেয়ের সুপুষ্ট তোষামোদে কত কি হয়, কত কি হতে পারে। কিন্তু দেয়ালেরও কান আছে। একান্ত বিশ্বস্তজন ভিন্ন কারো মনের কথা মুখে ফোটে না।

সুমিত্রা সিংহ যেখান দিয়ে হাটেন চলেন, শিক্ষয়িত্রীরা ঠাণ্ডা, মেয়েরাও সন্ত্রস্ত। আর ঘরে ডাক পড়লে তো কথাই নেই, ভিতরে ভিতরে ঘাম হতে থাকে।

সুমিত্রা সিংহর বাড়ির চালচলনেও রকমফের নেই খুব। এখানেও একটা হালকা গাম্ভীর্য ছুঁয়ে আছে তাকে। এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে নতুন ডাক্তার, মেয়ে কলেজে পড়ে। ছেলে আর মেয়ে তাদের ডক্টরেট বাপের থেকে মাকে বেশি সমীহ করে। ডক্টরেট ভদ্রলোক ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বই পড়েন আর থেকে থেকে স্ত্রীর গম্ভীর মুখের ওপর দু'চোখের কৌতুক ছড়ান। সেটা কখনও-সখনও ধরা পড়ে না এমন নয়।

স্ত্রীটি তখন থমকে তাকান।—কি ?

কি ?

হাসছ মনে হচ্ছে ?

এটা সেটা বলে ভদ্রলোক সামলে নেন। যুনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানের প্রফেসার তিনি। আপন মনে হাসার অনেক কারণ তাঁর ঠোঁটের ডগায় মজুত। মহিলার তখনো

প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সন্দিগ্ধ চোখ। এ নিয়ে এই সেদিন আরো একটু মজার ব্যাপার ঘটে গেছল। শনিবার বিকেল চারটের মধ্যে বাড়ি ফিরেছিলেন। ডক্টর সিংহ অন্য দিনের মতোই বই হাতে ইজিচেয়ারে শয়ান। ভদ্রলোকের দু'তিন ঘণ্টার বেশি ক্লাস থাকে না বলে স্ত্রী তাঁর চাকরিটাকে ফাকিবাজী ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। এক এক সময় খোঁটাও দেন—মাস্টারবা যে রকম পরিশ্রমকাতর ছেলেরা কত আর মানুষ হবে।

সুমিত্রা সিংহর মেজাজ খুব প্রসন্ন ছিল না সেদিন। স্কুলের কোন একটা ভাবনা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সেই চিন্তা করেছেন, মাঝে মাঝে ভুরু কুচকে ঘরে আর সামনের বারান্দায় পায়চারি করেছেন।

হঠাৎই এক সময় খেয়াল হল বই কোলের ওপর ফেলে স্বামীটি সকৌতুকে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। ভুরুর ভাজ আরো একটু ঘন হল—হাসছ যে?

ভদ্রলোক সেদিন সত্যি কথাই বললেন। জবাব দিলেন, তোমাকে দেখে।

আমাকে দেখে হাসছ মানে?

বাজারে সাদা কলপ কিনতে পাওয়া যায় কিনা দেখো, তোমার এই চালচলন মানাচ্ছে না।

তার মানে?

কাছে এস, বলছি।

সত্যিই এখন শুধু সমস্যার জগৎ আর চিন্তার জগতে বাস মিসেস সুমিত্রা সিংহর। সঠিক না বুঝে কাছে এসে দাড়ালেন। হাত ধরে আচমকা আরো কাছে টেনে যে কাণ্ডটা করে বসলেন ভদ্রলোক দিশেহারার মত ছিটকে সরে দাড়ালেন মহিলা। আরক্ত মুখে আর অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে রইলেন খানিক। ভদ্রলোক কৈফিয়ৎ দিলেন, সেজন্যেই তো সাদা কলপের কথা বলছিলাম, তোমাকে দেখলে আমার এখনো এই সাধ জাগে তো কি করব।

সুমিত্রা সিংহ এরপর পনেরো মিনিট ধরে শাসালেন তাকে। শোওয়ার ঘর আলাদা করে দেবার হুমকি দিলেন, বয়েস কালের ধর্ম আর শৃঙ্খলা মেনে চলার কথা বললেন, দরজা কপাট হা করা খোলা, ছেলেমেয়েরা একজন কেউ দেখে ফেললে কি কাণ্ড হত সে কথা পাঁচবার করে শোনালেন।

ভদ্রলোক রেহাই দোষ স্বীকার করে বললেন, দরজা কপাট বন্ধ না করে এ রকম গর্হিত কাজ আর কখনো করবেন না।

ভদ্রমহিলা দ্বিগুণ আগুন হয়ে ঘর ছেড়ে প্রস্থান করলেন। এরপর ক'টা দিন মায়ের মেজাজ দেখে ছেলে মেয়ে অবাক। বাবার সামনেই কথায় কথায় আত্মসংযম সম্পর্কে ধারালো উপদেশ শুনতে হয়েছে তাদের।

সুমিত্রা সিংহ স্কুলে নিজের ঘরে বসে আছেন। কঠিন থমথমে মুখ। অসংযম আর শৃঙ্খলাভঙ্গের এক দারুণ নালিশ এসেছে তাঁর কাছে। অপরাধী একেবারে উঁচু ক্লাসের পাঁচটি মেয়ে। স্কুল হস্টেলে থাকে তারা। নিজের স্কুলে এত বড় অপরাধের কথা তিনি ভাবতে পারেন না। কিন্তু অবিশ্বাস করার কিছু নেই। অপরাধের নজির

তাঁব সামনে। স্কুল লাইব্রেবিব কতগুলো ছেঁড়া-খোঁড়া বই। অসংযত স্ফূর্তিব উল্লাসে ওই মেযেগুলো ছিঁড়েছে। বইযেব নানা জাযগায অশ্লীল মন্তব্য লেখা। সেও ওই মেযেগুলোব কাজ। এ ছাড়া তাদেব কতগুলো নোঙবা চিঠিচাপাটি হাতে নাতে ধবা পড়েছে। বেসিডেন্সিযাল টিচাব আব মেট্রন সেগুলোও হেডমিসট্রেসেব কাছে দাখিল কবেছেন।

সব দেখে শুনে সুমিত্রা সিংহব নিজেবই আত্মস্থ হতে সময লেগেছে। তাবপব ঠাণ্ডা মুখে ওই পাঁচ মেযেব সম্পর্কে বিপোর্ট নিযেছেন তিনি। পাঁচটি মেযেব মধ্যে চাবজন স্কুলেব পুবনো ছাত্রী এবং মোটামুটি ভাল ছাত্রী। কেবল একটি মেযে নতুন। নাম নন্দিতা বসু। গেল বছব অন্য স্কুল থেকে ট্রান্সফাব নিযে এই স্কুলে ভর্তি হযেছিল। কোনবকম ধব-পাকডেব জোবে নয়, পঞ্চাশ ষাটজন বাইবেব মেযেব মধ্যে এখানকাব অ্যাডমিশন টেস্টে সমস্ত পবীক্ষায ফার্স্ট হযে ভর্তি হযেছিল। তাবপব গেলবাবেব অ্যানুযাল পবীক্ষাযও ওই মেযে সমস্ত বিষযে ফার্স্ট হযে ক্লাস প্রমোশন পেযেছে। কিন্তু পডাশুনায যত ভালই হোক ওই মেযেই সমস্ত নষ্টেব গোডা। এসব অপকর্ম বেশীবভাগই তাব। কাউকে পবোযা কবে না। ওই একটা মেযেই বাকি চাবটে মেযেকে এভাবে নষ্ট কবছে। ধবা পডাব পব এই মেযেবা ঘাবডে গিযে বেসিডেন্সিযাল টিচাবেব কাছে সব কবুল কবেছে। মেট্রন আবো জানালেন ধবা পডাব পবেও ওই নন্দিতা বসুবই কেবল বেপবোযা হাবভাব।

অভাবনীয একটা শাস্তিব নজিব বাখাব সংকল্প নিযেছেন সুমিত্রা সিংহ। তাঁব নামেই সমস্ত মেযেব বক্ত জল, কোনদিন কোন মেযেব গাযে হাত তোলাব দবকাব হযনি। কিন্তু এ ঘটনা সব কিছুব ব্যতিক্রম। তিনটে বেত আনিযে টেবিলেব ওপব বাখলেন। তাঁব নির্দেশমত বেসিডেন্সিযাল টিচাব আব মেট্রন ওই পাঁচ মেযেকে ডেকে নিযে আসতে গেলেন।

শাস্তি কি দেবেন সুমিত্রা সিংহ সেটা স্থিব কবে ফেলেছেন। নতুন মেযে নন্দিতা বসু যত ভাল ছাত্রীই হোক এতখানি অধঃপতনেব পব তাকে আব স্কুলে বাখবেন না। তাই তাব গাযে হাত তোলা নিষ্প্রযোজন। কিন্তু তাকে সেটা বুঝতে দেবেন না। তাব সামনে চাব মেযেকে শাস্তি দেবাব পব ব্যাড কনডাক্ট-এব ছাপ মেবে তাকে স্কুল থেকে তাডাবেন।

পাঁচ মেযেই এল। পিছনে বেসিডেন্সিযাল টিচাব আব মেট্রন। পুবনো চাব মেযেব বিবর্ণ পাংশু মুখ। এমনিতেই থব থব কাঁপছিল, প্রধান শিক্ষযিত্রীব মূর্তি দেখে আব টেবিলেব ওপব বেত দেখে তাদেব আবো হযে গেছে। চাবজনই হাত জোড কবে নিঃশব্দে ক্ষমা চাইছে।

ক্ষমাশূন্য চোখে একে একে সবকটি মেযেকে দেখলেন সুমিত্রা সিংহ। সব শেষে নন্দিতা বসুকে। মেযেটাব তখনো উগ্র হিংস্র চাউনি। নতুন বযসেব খাঁচায পোবা এক উদ্ধত জীব যেন। সংকল্প ভুলে সকলকে ছেডে ওকেই মাটিতে শুইযে ফেলাব জন্যে হাত নিশপিশ করে উঠল সুমিত্রা সিংহব। কিন্তু নিজে তিনি সংযম খুইযে বসতে পাবেন না।

ওই নন্দিতা বসু মেয়েটার দিকে কয়েক পলক চেয়ে থাকার পরই নিজের ভিতরে কেমন যেন একটা নাড়া-চাড়া পড়ল সুমিত্রা সিংহর। এই মেয়ের মুখে কার যেন চেনা আদল একটা। ঠিক মনে করে উঠতে পারছেন না, কিন্তু এই মুখে কার একখানা মুখ যেন হুবহু বসানো।

কয়েক নিমেষের অন্যমনস্কতা ঝেড়ে ফেলে সুমিত্রা সিংহ কর্তব্যে মন দিলেন। বেতের আঘাতে আঘাতে এক একটা মেয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগল আর তাঁর পা জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল। তখনো নির্মম কঠিন তিনি। শাস্তির পর একটি করে মেয়েকে বিদায় দিয়ে পরেরটিকে ধরেন। ঘরের মধ্যে শুধুই একটা ত্রাসের হাওয়া বইছে।

কিন্তু একটা করে মেয়ের ওই আর্তনাদের মুখেই এক একবার নন্দিতা বসুর দিকে চোখ গেছে তার। উদ্ধত আক্রোশে মেয়েটা যেন ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু বন্ধ দরজার সামনে মেট্রন দাড়িয়ে, বাইরে দরোয়ান। এক একটা মেয়ের শাস্তি শেষ হলে তবে দরজা খুলে তাকে বার করে দেওয়া হচ্ছে। তখনো সুমিত্রা সিংহর মনে হয়েছে রাগ হলে কার একখানা মুখের চিবুক আর ঠোঁট ওই মেয়েটার মতই বেঁকে যেতে দেখেছেন কবে। আবারও মনে হয়েছে মেয়েটার অমন সুশ্রী মুখের সঙ্গে কার যেন আশ্চর্যরকম মিল।

চার নম্বর পুরনো মেয়েও বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সুমিত্রা সিংহ হাঁপাচ্ছেন বেশ। দু'চোখ জ্বলছে। নিজের চেয়ারে বসে সোজা একবার তাকালেন নন্দিতা বসুর দিকে। সব থেকে বেশি দাগী মেয়েটা এখন বেপরোয়া উদ্ধত চোখেই চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

সুমিত্রা সিংহ ইশারায় রেসিডেন্সিয়াল টিচার আর মেট্রনকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললেন।

তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেই প্রস্থান করল। এই মেয়ের শাস্তিটাই বিশেষ করে চোখে দেখার ইচ্ছে ছিল বোধহয়।

ঘরের মধ্যে দুজনে মুখোমুখি এবার। চোখাচোখি।

অনুচ্চ কঠিন গলায় সুমিত্রা সিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম নন্দিতা বসু?

হ্যাঁ। আপনি আমার গায়ে হাত তুলবেন না, ইচ্ছে হলে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন।

মুহূর্তের জন্যে সংযম হারালেন সুমিত্রা সিংহ। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে বেতটা তুলে নিয়ে মেয়েটার কাঁধ বেড়িয়ে একটা প্রচণ্ড আঘাত করে বসলেন। কিন্তু ওই একটাই। সুশ্রী মেয়েটার রক্তবর্ণ মুখ এখন। চেয়ে আছে। প্রহারের জবাবটা যেন চোখ দিয়ে দিচ্ছে। সুমিত্রা সিংহ বুঝে নিলেন আঘাতে আঘাতে মাটিতে শুইয়ে ফেললেও এ মেয়ের মুখ দিয়ে কান্নার শব্দ বেরুবে না।

তার দরকারও নেই। সংকল্প মতই কাজ করবেন। কিন্তু মেয়েটার এই মুখের আদল কেন যেন বড় বেশি বিমনা করে তুলছে তাঁকে।

বসলেন আবাব। তেমনি কঠিন গলায ফেব জিজ্ঞাসা কবলেন, তোমাব মাযেব নাম কি?

সুজাতা বোস।

না, সুমিত্রা সিংহ এই নামেব কাউকে চিনলেন না।

বাবাব নাম কি?

নীতিশ বোস।

নামটা শোনাব সঙ্গে সঙ্গে বুকেব তলায কি বকম একটা তোলপাড কাণ্ড হযে গেল সুমিত্রা সিংহব। একটা অস্পষ্টতাব পর্দা সবে গেল চোখেব সামনে থেকে। হ্যাঁ, অবিকল সেই নাক মুখ চোখই বটে। ঠোঁট বাঁকানোটা পর্যন্ত সেই বকম। জিজ্ঞাসা কবাব দবকাব ছিল না, তবু প্রশ্নটা যেন আপনা থেকেই গলা দিযে বেবিযে এল।—কি কবেন?

বাব অ্যাট ল। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস কবেন।

না, কোথাও ভুল নেই, বিযেব পব নীতিশ বোসেব ব্যাবিস্টাবি পডাব জন্যেই বিদেশ যাওযা স্থিব ছিল।

দীর্ঘকালেব শিক্ষযিত্রী জীবনে এ বকম আব কখনো হযনি। মেযেটাব মুখেব দিকে চেযে চেষ্টা কবেও নিজেকে আব অত কঠিন কবে তুলতে পাবছেন না সুমিত্রা সিংহ। জিজ্ঞাসা কবলেন, কলকাতাতেই বাডি, তবু তুমি বাবা মাযেব সঙ্গে থাক না কেন?

মেযেটা সাদাসাপটা জবাব দিল, মা বাবাব সঙ্গে থাকেন না, ডিভোর্স হযে গেছে। বাবা তাই আমাকে হস্টেলে বেখেছেন।

সব ভুলে সুমিত্রা সিংহ বিমূঢ় মুখে মেযেটাব দিকে চেযে বইলেন খানিক। মেযেটা পডাশুনায এত ভাল, তা সত্ত্বেও এ বকম উচ্ছৃঙ্খল হযে ওঠাব কাবণ যেন বুঝতে পাবছেন তিনি। মেযেটাব কথা-বার্তায আচবণে একটা চাপা ক্ষোভ স্পষ্ট।

তোমাব বাবাব সঙ্গে টেলিফোনে কথা হতে পাবে?

মেযেটা টেলিফোন নম্বব বলে দিল।

কখন ফ্রী থাকেন তিনি?

সন্ধ্যাব পব। সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকেন।

আচ্ছা, তুমি যেতে পাবো।

উদ্ধত মুখেই মেযেটা চলে গেল। সে কেমন কবে যেন ধবে নিযেছে অন্য ক'টা মেযেব থেকে তাব শাস্তি কঠিন হবে। অর্থাৎ বাবাকে বলে স্কুল থেকে সবিযে দেওযাব ব্যবস্থা হবে তাকে।

প্রায আধঘণ্টা স্থাণুব মত চুপচাপ বসে বইলেন সুমিত্রা সিংহ। সাডে ন'টায স্কুল, এখন সকাল সাডে দশটা। কি ভেবে ফোনেব বিসিভাব তুলে নিযে নম্বব ডাযাল কবলেন।

পেলেন।

বোস হিযাব।

আমি আপনাব মেযেব স্কুলেব হেড-মিস্ট্রেস মিসেস সিংহ।... আপনাব মেযে নন্দিতাব গ্রোস মিস কনডাক্টেব সম্পর্কে আপনাব সঙ্গে কথা হওযা দবকাব। তাকে আব এ স্কুলে বাখতে পাবা শক্ত।

ওদিকেব ভাবী গলাব স্বব থমকালো একটু।—কি মিস কনডাক্ট?

সেটা টেলিফোনে বলা সম্ভব নয।

আই সি...বাট আই অ্যাম অফুলি বিজই...একমাত্র সন্ধ্যাব পব বাড়িতে দেখা হতে পাবে, বাট দ্যাট উইল বি পাবহ্যাপস টু মাচ টু আস্ক—

এদিক থেকে আবক্ত মুখে সুমিত্রা সিংহ বললেন, ব্যাপাবটা অত্যন্ত গুরুতব এবং জরুবী—আপনাব আসা দবকাব।

বাট ইউ সি, আই কান্ট পসিবলি মেক এনই টাইম। ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বব। ইউ ডু ওযান থিং ম্যাডাম, কাইন্ডলি সেণ্ড এভবিথিং ইন বাইটিং, আই উইল সি টু ইট। থ্যাঙ্ক ইউ।

বিসিভাব নামিযে বাখাব শব্দ।

অসহিষ্ণু মুখে সুমিত্রা সিংহ ঘবেব মধ্যে পাযচাবি কবে নিলেন খানিক। এবপব সোজাসুজি ওই মেযেব বিরুদ্ধে চবম ডিসিপ্লিনাবি অ্যাকশন নেবাব কথা তাব। তিনি সদয হতে চেযেছিলেন। কিন্তু লোকটাব এত সাহস আব এত দম্ভ যে ঘুবিযে বাড়িতে দেখা কবাব কথা বলল। কিন্তু আশ্চর্য, এব পবেও তিনি যা কবণীয কবে উঠতে পাবলেন না। মেযেটাব প্রতি তাব মাযা বাড়তেই থাকল। তাঁব ধাবণা, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ নিযে বিকৃত পথে চলেছে এমন ভাল মেযেটা। হ্যাঁ, এখনো তাঁব উদাব হবাব ইচ্ছে। উদাব হতে পাবলে কোথায যেন একটু শান্তিও। ...প্রায পঁচিশ বছব আগেব একখানা মুখ চোখে ভাসছে তাব। ওই সুশ্রী মেযেটাব সঙ্গে মুখেব আদল হুবহু মেলে যাঁব সঙ্গে তাঁব। নীতিশ বোসেব।

সুমিত্রাব বযেস তখন তেইশ। তখন সিংহ হননি' ঘোষ, সবে এম-এ পাশ কবেছেন। এবাবে নীতিশ বোসেব সঙ্গে বিযেটা হযে যাবাব কথা। বাপে-বাপে বন্ধুত্ব। অনেক দিন আগে থেকেই কথা পাকা। বোসেবা বনেদী বড়লোক। সুমিত্রাব বাবা-মা নিশ্চিন্ত। বিযেব পবেই ছেলে বিলেত চলে যাবেন ব্যাবিস্টাবি পড়তে অতএব তাঁব পক্ষে ঘন ঘন এ বাড়িতে আসাব লোভটা স্বাভাবিক। নীতিশ বোস সপ্তাহে কম কবে চাব পাঁচদিন আসতেন আব সে বকম ফাঁক পেলে ভাবী স্ত্রীব ওপব একটু আধটু মিষ্টি হামলাও কবে বসতেন। সুমিত্রাকে নিযে বেরুনোব তাগিদ দিতেন। কিন্তু সুমিত্রাব দিক থেকে তেমন সাড়া পেতেন না বলে কখনো বাগ হত কখনো বা অভিমান।

সুমিত্রাব জীবনে যথার্থই সংকটেব কাল সেটা। বাশভাবী বাবাকে কিছু বলা যাচ্ছে না। বলা যাচ্ছে না, কাবণ ওখানে বিযে অনেক দিন ধবেই ঠিক। অথচ তিন বছব হল পিছনেব বাড়িব এক ছেলেব কাছে মন সঁপে বসে আছেন তিনি। গবীব ঘবেব ছেলে। স্কলাবশিপ পেযে নিজেব পড়াশুনা চালাচ্ছেন। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে সেই ছেলেও সুমিত্রাব আশ্বাস পেযে ভবিষ্যতেব রঙিন স্বপ্নে বিভোব হযে আছেন।

বড়লোকের হবু ব্যারিস্টার ছেলের মনের মত অনেক মেয়ে জুটবে, কিন্তু কথার খেলাপ করলে এই ছেলের বুক ভেঙেই যাবে একেবারে।

সেই সংকটের ফলে জীবনে একটাই মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাঁকে। মাকে স্পষ্ট করে বলেছেন, বাবাকে জানিয়ে দাও এ বিয়েতে আমার আপত্তি আছে।

মা আকাশ থেকে পড়েছিলেন একেবারে।—সে কি রে। কেন?

কেন আবার কি। সুমিত্রা মরিয়া একেবারে।—বড়লোকের ছেলে, এখনই মদের নেশা, পরে আরো কত গুণ দেখা যাবে কে জানে। আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, আমার আপত্তি আছে।

ওই একটা জিনিস বাবা আন্তরিক ঘৃণা করেন সুমিত্রার সেটা খুব ভাল জানা ছিল। এই এক কারণে বাবার সঙ্গে কাকার মুখ দেখাদেখি বন্ধ। অতএব আর কোন উপায় না দেখে সুমিত্রা এই পথ ধরেই সংকট কাটিয়ে উঠতে চেয়েছেন। হবু ব্যারিস্টারের বাড়িতে এ কথা তো কোনদিন প্রকাশ হবে না, তাঁদের আর এমন কি ক্ষতি। বিয়েটা নাকচ হবে শুধু।

নাকচ হয়েছে। সুমিত্রার ধারণা বাবা শুধু তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন মেয়ের আপত্তির কারণে এ বিয়ে হল না। এ ছাড়া আর বলার কি আছে?

তারপর কথা যাঁকে দেওয়া হয়েছে সময়ে তাকেই বিয়ে করেছেন তিনি। সুমিত্রা সিংহ হয়েছেন।

নিজের ভিতরে কোন সুপ্ত অপরাধবোধ ছিল কিনা সুমিত্রা সিংহ জানেন না। নইলে পঁচিশ বছর বাদে এক মেয়ের মুখের আদল দেখে অবচেতন মনে হঠাৎ ওই রকম নাড়া পড়েছিল কেন।

না, স্কুল থেকে তাড়িয়ে ওই সুশ্রী মেয়েটাকে জাহান্নমের পথে ঠেলে দেবেন না সুমিত্রা সিংহ। বরং এই মানসিক আবর্ত থেকে ওকে টেনে তুলতে পারাটাই যেন ভাল কাজ হবে, উদারতার কাজ হবে।

স্কুলের একজন ড্রাইভারকে বলে রেখেছিলেন। সন্ধ্যার পর সে তাঁকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় নিয়ে এল।

সুমিত্রা সিংহ কার্ড পাঠালেন।

কিন্তু তারপরেও কম করে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হল। ভাবলেন, কোন কেস নিয়ে ব্যস্ত বোধহয়।

কিন্তু নীতিশ বোস ঘরে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভুল ভাঙল। ঝাঁ করে একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল। লোকটার থলথলে লালচে মুখ। টানা দু' চোখ ঈষৎ আরক্ত। নেশার মধ্যপথে উঠে আসতে হয়েছে বলেই হয়তো ভুরুর মাঝে ভাঁজ। সীট ডাউন প্লীজ।

সুমিত্রা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বসলেন আবার। ভিতরটা মুহূর্তের মধ্যে বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেছে। আশ্চর্য, সেই সঙ্গে স্বস্তিবোধও। কোন এক দিনের মিথ্যাচারের সুপ্ত অপরাধটুকু আজ অন্তত ধুয়ে মুছে গেছে।

নীতিশ বোসের এবারে হঠাৎ খেয়াল হল সামনে কাকে দেখছেন। পঁচিশ বছরের ফারাকেও সুমিত্রার চেহারা খুব বদলায় নি। বিশ্বাস করবেন কি করবেন না ভেবে পাচ্ছেন না। চোখ টান করে দেখছেন। হাতের কার্ডটা একবার চোখের সামনে ধরলেন। তারপর ভারী গলায় টেনে টেনে বললেন, তুমি সুমিত্রা সিংহ...ওই স্কুলের হেডমিসট্রেস।

ঈষৎ রূঢ় গলায় সুমিত্রা বাধা দিলেন, আপনি কবে বলুন। আপনার মেয়ের কনডাক্ট সম্পর্কে একটু সীরিয়াস আলোচনার দরকার ছিল, কিন্তু আপনার পক্ষে এখন সেটা সম্ভব নয় মনে হচ্ছে।

মেয়েকে ওই স্কুলে রাখতে হলে স্কুল টাইমে গিয়ে দেখা করার কথা বলতে যাচ্ছিলেন। বলা হল না। নীতিশ বোসের নেশা-ছোঁয়া দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর আটকে আছে। সঙ্গে সঙ্গে টানা ভারী গলাও শোনা গেল।—ওয়েট। আই ডোন্ট থিংক দ্যাট উইল বি নেসেসারি। আলোচনার দরকার নেই। দু' আঙুলে সুমিত্রা সিংহর নাম লেখা কার্ডটা তুলে সামনে ধরলেন।—এই মহিলা যে স্কুলের প্রধান সেখানে আমার মেয়েকে রাখা আমি উচিত মনে করি না। আই উইল সেণ্ড হার ডিউস টুমরো মর্নিং অ্যাণ্ড গেট হার টি. সি. গুড নাইট।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন তারপর সৌখিন পার্টিশনের ওধারে চলে গেলেন।

স্কুল বাসে বাড়ি ফিরছেন সুমিত্রা সিংহ। দুর্বার রাগে নিশ্চল স্তব্ধ তিনি। এত বড় স্পর্ধার কথা জীবনে কেউ শোনায়নি তাঁকে। ...কিন্তু বুকের ভিতরে কোথায় চিনচিন করে জ্বলছে।

মা

বাবা মা ভাই বোন ভাইয়ের স্ত্রী ভগ্নিপতি—সব মিলিয়ে একঘর লোকের সামনে স্ত্রীর এই বে-খাপ্পা আচরণ দেখে গৌরীনাথবাবু আধা বিস্মিত আধা ক্রুদ্ধ। তার দুশ্চিন্তা আর দ্বিধার জবাবে স্ত্রী সুপ্রীতি উঠে দাঁড়িয়ে বিছানার তলা থেকে চাবির গোছা বার করে দেয়াল-ঘেঁষা গডরেজের আলমারিটা খুলে ফেললেন। তারপর অন্য চাবি দিয়ে ভিতরের লকারটা। লকার থেকে বড় বড় দুটো গয়নার বাক্স বার করে গৌরীনাথবাবুর সামনে রাখলেন। ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, হাতে টাকা না থাকে তো এগুলো দিয়ে ব্যবস্থা করো—ছেলে ফিরে না পেলে কিসের টাকা কিসের গয়না—

ঘরে আর যারা ছিল তারা চুপ। গৌরীনাথবাবুর চোখেমুখে ভর্ৎসনা মেশানো বিস্ময়। সুপ্রীতি দেবীর আত্মস্থ হবার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট। আবেগের মুখে কাজটা যে ভালো করা হল না সেটা তক্ষুনি মনে ডাক দিল। কারণ সর্ব ব্যাপারে স্বামীর মুখাপেক্ষী তিনি। নিজের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর নির্ভর করে কোনো গুরু দায়িত্বের কাজই ঠিক মতো করে উঠতে পারেন না। গলার সুর নরম করে তক্ষুনি ভুলটা শুধরে নিতে চেষ্টা করে বললেন, সর্বদা অত টাকা কারই বা হাতে থাকে, কাজ চালিয়ে নাও পরে না-হয় এর ডবল বানিয়ে দেবে।

কথাটা উঠেছিল ছেলের বিশেষ একটা দৈব আনুকূল্য লাভের প্রবল সম্ভাবনার প্রসঙ্গে। বারো বছরের একমাত্র ছেলে দুরারোগ্য ব্যাধি-কবলিত। এখন একেবারে উত্থানশক্তিরহিত পঙ্গু। ভবিষ্যতের অবধারিত চিত্র আরো ভয়াবহ অন্ধকার। পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসাই ব্যর্থ। তারপর ভারতেব বহু তীর্থে বহু দৈব-প্রচেষ্টা, যাগযজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপ আর দামী-দামী স্টোন ধাবণেব ফাঁক দিয়েও কত হাজাব টাকা জলের মতো বেবিযে গেছে, হিসেব নেই। এখন শুধু হতাশা আব হতাশা।

এই সময় এক মহাসাধকের নাম প্রাযই কানে আসতে লাগল তাঁদের। কলকাতাব দোকানে দোকানে তাঁর ছবি দেখা যেতে লাগল। আর বহু নাম-কবা কাগজেও ভগবান-সদৃশ ওই মহাযোগীর এমন সব করুণা-লীলাব কাহিনী প্রচাব লাভ কবল যে পড়লে শুচিশুভ্র আবেগে চোখে জল আসে।

গৌবীনাথবাবু খুব একটা বিশ্বাস কবেননি। কিন্তু মন দুর্বল। স্ত্রীব মন ততোধিক দুর্বল। ফলে ওই করুণাময সম্পর্কে দিশি আর বিদেশী লেখকেব বই সংগ্রহ কবে দুজনেই পড়তে লাগলেন। সেইসব বাস্তব অভিজ্ঞতাব কাহিনী এবং তত্ত্ববিশ্লেষণ অভিভূত হবাব মতোই বটে। এ ছাড়া বহু শুভার্থীজনও তাঁদেব পবামর্শ দিলেন, একবাব কপাল ঠুকে চলে যান ছেলেকে নিয়ে, যদি দর্শন মেলে আব দয়া মেলে তাহলে অলৌকিক কিছু হতেও পাবে, এমনিতে তো আব কোন আশা নেই।

কিন্তু চলে যান বললেই এই ছেলে নিযে বেবিযে পড়া যায না। অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন ওই মহাতপা যেখানে থাকেন ছেলেব বর্তমান অবস্থায সেদিকে পা বাড়ানোটা দুর্গমযাত্রাব সামিল। বইযে সে-পথেব বিববণ শুনে সুপ্রীতি দেবী পর্যন্ত দমে যান। ফলে, মনে মনে প্রায অলৌকিক গোছেব একটা আশা নিয়ে বসে ছিলেন তিনি। খোঁজ-খবব কবে এই কলকাতাযও ওই দেব-মানবেব অনেক গণ্যমান্য ভক্তেব সন্ধান পেযেছেন। তাঁদেব সঙ্গে যোগাযোগ কবেছেন। শুনেছেন 'বাবা'কে একবাব তাঁরা এই কলকাতায নিযে আসতে চেষ্টা কবছেন। তবে এও শুনেছেন, 'বাবা'ব ইচ্ছে না হলে শত চেষ্টাতেও তা হবে না।

গৌবীনাথবাবু স্ত্রীকে আশ্বাস দিযেছেন, ইচ্ছে হবেই একদিন। ভক্ত টানলে ভগবানেবও টনক নড়ে। স্বামীব ওপব আর তাঁব কথাব ওপব স্ত্রীটিব অগাধ আস্থা। কিন্তু আবো প্রায দেড়টা বছব কেটে যেতে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। ছেলেব অবস্থা ধীব কিন্তু অবধাবিত গতিতেই সঙ্কটেব দিকে গড়াচ্ছে।

এমন দিনে একটা সংবাদ শুনে সুপ্রীতি দেবী আশায় আনন্দে কণ্টকিত। ঐশ্বরিক ক্ষমতাব ওই মহাযোগী দিল্লীতে আসছেন। সেখানকার ভক্তরা তাঁব সম্মতি পেযে বিপুল আযোজন কবেছেন। পাকা খবব। দিন তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট। কলকাতার বহু ভক্ত দিল্লীর দিকে ছুটেছেন।

দিল্লী! সুপ্রীতি দেবীব মনে হল দিল্লী একেবারে হাতেব মুঠোয়। এরোপ্লেনে দু'ঘণ্টার পথ। পা ফেলাব পব আব কোনো ঝামেলা নেই, সেখানে দেওরের বাড়ি দেওরেব গাড়ি। ঠাকুব মুখ তুলে না চাইলে এমন সুযোগ আসে।

শোনাব পব মন দুর্বল গৌবীনাথবাবুবও। কিন্তু তাঁকে সাত-পাঁচ ভেবে দেখতে হবে। অন্ধ অবাস্তব আশাব পিছনে ছুটে এযাবত বহু হাজাব টাকা খবচ হযে গেছে। কম কবে পঞ্চাশ ষাট হাজাব তাব ওপব এক-একটা চেষ্টা বিফল হবাব পব সে-কি হতাশা—বিশেষ কবে স্ত্রীব। ভেঙে পডাব দাখিল একেবাবে।

অতএব সব-দিক ভেবে দেখাবই আলোচনায বসা হযেছিল সকলে মিলে। কিন্তু দ্বিধাব প্রথম পর্যাযেই সোজা মুখেব দিকে তাকিযে স্ত্রী জিজ্ঞাসা কবে বসলেন, আসল কথা, 'বাবা'ব সঙ্গে দেখা হলে আব তাব কৰুণা পেলে ছেলে ভালো হযে যাবে, এ তুমি বিশ্বাস কবো কি কবো না?

গৌবীনাথবাবুব বিব্রত মুখ। বইপত্র যা পডেছেন, মনে প্রাণে বিশ্বাস কবতেই মন চায। দ্বিধান্বিত জবাব দিলেন, কৰুণা পাবই এমন ভবসা কোথায?

স্ত্রী স্থিব প্রত্যযে জবাব দিলেন, দেখা পেলে কৰুণাও পাব।

—সে-ভাবে দেখা মিলবে তাবও কোনো নিশ্চযতা নেই।

সুপ্রীতি আধা বিস্মিত আধা বিবক্ত।—কি যে বলো ঠিক নেই, দিল্লীব মতো জাযগায তুমি নিজে চেষ্টা কবলে দেখা হবে না এ আবাব একটা কথা নাকি। তাছাডা এখান থেকে চেনা-জানা ভক্ত যাবা যাচ্ছেন তাবাও সাহায্য কববেন। তাবও দবকাব হবে না, তুমি চেষ্টা কবলেই হবে—

মনে মনে বিবক্ত একটু গৌবীনাথবাবুও। স্ত্রীব ধাবণা, তাব স্বামী নামী লেখক আব কাগজেব বড চাকুবে অতএব দুনিযাব সমস্ত দবজাই তাঁব কাছে খোলা। বললেন, হ্যা, আমি দিল্লীব লাটসাহেব একেবাবে। যাক, এবপব খবচেব দিকটাও চিন্তা কবাব আছে, ওই ছেলেকে নিযে যেতে হলে তুমি আমি ছাডাও আব একজন লোক অন্তত দবকাব—এবোপ্লেনে চাবজনেব যাতাযাত ছাডাও অন্য খবচা আছে, কম কবে চাব হাজাব টাকা লাগবে।

জবাবে চিবসহিষ্ণু আব চিবমুখাপেক্ষী স্ত্রীব ওই কাণ্ড। সকলেব সামনে আলমাবি থেকে গযনাব বাক্স বাব কবে ওই উক্তি।

বিস্ময কাটতে দু'চোখেব নীবব ভর্ৎসনাটুকুই আবো স্পষ্ট হযে উঠল। পবে স্ত্রীব নবম সুবেব জবাবদিহিতেও কাজ হল না তেমন। কিন্তু বাইবেব আচবণে ববাবব সংযত মানুষ গৌবীনাথবাবু। মৃদু গম্ভীব স্ববে আদেশ দিলেন, ও-দুটো জাযগা-মত বাখো—

উঠলেন। খোলা আলমাবি থেকে চেক-বই বাব কবলেন। পকেট থেকে কলম টেনে নিযে সামনেব ছোট টেবিলটায বসলেন। খসখস কবে চাব হাজাব টাকাব চেক লিখে নাম সই কবে চেকটা ছিঁডে ছোট ভাইযেব হাতে দিলেন।—কাল ফার্স্ট আওযাবে চাব হাজাব টাকা তুলে এযাবে চাব জনেব সীট বুক কববি, টিকিট থাক বা না থাক আমাব সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসাব বন্ধুব কাছে গেলেই সে ব্যবস্থা কবে দেবে। টিকিট হাতে পেলেই দিল্লীতে দীপুকে একটা আবজেন্ট টেলিগ্রাম কবে দিবি। তাবপব ছেলে আব তোব বউদিকে নিযে সন্ধ্যাব ফ্লাইটে তুই আব দিবা দিল্লী যাবি—সাধ যখন হযেছে টাকাব জন্যে আটকাবে না।

সুপ্রীতি দেবীব শুকনো মুখ, বা বে, তুমি না গেলে কি কবে হবে।

—আমাব কথা-বার্তা যখন পছন্দ হচ্ছে না, নিজেই চেষ্টা কবে দেখো।

গম্ভীব মুখে ঘব ছেড়ে ছেলেব কাছে চলে গেলেন গৌবীনাথবাবু। ছেলে বাবান্দায় হুইল-চেযাবে বসে।

বাতে মানভঞ্জনেব পালা। বাগত মুখেই সুপ্রীতি দেবী বললেন, নিজেব ওপব ভবসা কবে কবে আমি কোন কাজ কবি বা কোন কথা বলি তুমি জানো না?

বলতে না বলতে চোখে জল। একমাত্র এই বস্তুটিকেই গৌবীনাথবাবু মনে মনে ভয কবেন। ফলে পাঁচ মিনিটেব মধ্যেই আপোস।

না, স্ত্রী আদৌ আতশযোক্তি কবেননি। সর্ব ব্যাপাবে সর্ব কাজে উনি স্বভাবগত কাবণেই স্বামীব ওপব একান্ত নির্ভবশীলা। ঠিক এই জন্যে গৌবীনাথবাবুব কখনো খেদ কখনো অন্তর্তুষ্টি। স্বামীব মতামত না পেলে কোনো একটা জরুবী ব্যাপাবও স্ত্রীটি ফযসালা কবে উঠতে পাবেন না। ভদ্রলোকেব একবাব শক্ত অসুখ হযে পডতে একটা দুশ্চিন্তায তাঁব দু'চোখে জল দেখা দিত। ...তাঁব অবর্তমানে হাজাব টাকা পযসা থাকলেও ওই স্ত্রীব অসহায অবস্থাটা তিনি যেন দেখতে পেতেন। পবে কত সময ধমকেছেন, একে একে নিজে সব দেখে শুনে বুঝে নাও,কখন কি দবকাব হয ঠিক আছে। কিন্তু তাঁব তাগিদে দেখে-শুনে বুঝে নিতে গিযে স্ত্রীব হিমসিম অবস্থা। শেষে গৌবীনাথবাবু নিজেই হাল ছেড়ে তাঁকে অব্যাহতি দিযেছেন।

ছেলে স্ত্রী আব একটি ভাই নিযে গৌবীনাথবাবু দিল্লী উডে এসেছেন। কিন্তু তাবপবেই যেন হাবুডুবু অবস্থা সকলেব।

মহাযোগী বাবাকে নিযে দিল্লীতে এক এলাহি ব্যাপাব। বিবাট পার্ক-এ তাঁবু ফেলে সাজিযে গুছিযে পঞ্চাশ হাজাবেব মতো জন-সমাবেশেব ব্যবস্থা। কিন্তু আবো বিশ তিবিশ হাজাবেব বেশি ব্যবস্থা হলেও যথেষ্ট নয। লোকে লোকাবণ্য। সমস্ত দিল্লীবাসী ঝেধহয ওই একপথে ভেঙে পডেছে। দেশ-বিদেশ থেকে কত বোগী এসেছে ঠিক নেই। বাবাব অবস্থানেব দু'মাইলেব মধ্যে মোটব গাডি পার্ক কবাব পর্যন্ত জাযগা মেলে না। প্যাণ্ডেলে সকাল-সন্ধ্যাব কীর্তনেব আসবে 'বাবা' একঘণ্টা দেড ঘণ্টাব জন্যে আসেন, ঘুবে ঘুবে সকলেব উদ্দেশে আশীর্বাদ কবেন হাত তুলে, ওই বিভোব তন্ময মূর্তি দেখলেই মনে হয এ-জগতেব কেউ নন। বোগীদেব মধ্যেও ঘোবাঘুবি কবেন, হঠাৎ হঠাৎ কাউকে বিভূতিও দেন, কাবো মাথায হাত বেখে আশীর্বাদ কবেন। কিন্তু গড হিসেবে সে-বকম ভাগ্য দু'শ'ব মধ্যে একজনেবও হয কিনা সন্দেহ। বহু ক্লেশে গৌবীনাথবাবু দু'বেলাই সপবিবাবে বাবাব দর্শন পাচ্ছেন—কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে তাঁব সঙ্গে যোগাযোগ কবা বা কৃপা লাভ কবা দুবাশাই বোধহয। অথচ এই মুহূর্তে গৌবীনাথবাবুবও বদ্ধ বিশ্বাস, কৃপা পেলে উদ্দেশ্য সফল হবেই, অলৌকিক উপাযে ছেলে ভালো হবেই।

কিন্তু সেই একান্ত সন্নিধানে কি কবে যাবেন? পার্কসংলগ্ন যে বিশাল প্রাসাদে তিনি অবস্থান কবছেন, তাব চতুর্দিকেও জনসমুদ্র। দুর্ভেদ্য পুলিস প্রহবায আব ভলান্টিযাবদেব তৎপবতায বাডিব গেটেব বিশ গজেব মধ্যেও কাবো যাবাব উপায

নেই। অবশ্য বিশেষ ব্যবস্থা করে অনেকেই ভিতরে যাচ্ছেন, বাবার অনুগ্রহ পাচ্ছেন, কিন্তু সেই বিশেষ ব্যবস্থা গৌরীনাথবাবুর অন্তত করায়ত্ত নয়। কলকাতার ভক্তদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে, কিন্তু অবস্থা এমন যে তাঁরা নিজেরাই বাবার ধারে কাছে যেতে পারছেন না। এখানে কে কাকে চেনে?

নিরুপায় সুপ্রীতি দেবী রাতে চোখের জলে বালিশ ভেজান আর প্রার্থনা করেন, বাবা, তুমিই ব্যবস্থা করো, পথ দেখাও।

'বাবা' দিল্লীতে অবস্থান করবেন সাতদিন। তার মধ্যে চার-চারটে দিন চলে গেছে। গৌরীনাথবাবু মরীয়া হয়ে উঠেছেন। তাদের কাগজের এখানকার শাখা-অফিসের মারফৎ সকল চেষ্টাও ব্যর্থ হতে চলেছে।

এরই মধ্যে হঠাৎ আশার আলো এক টুকরো। অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ একজনের সঙ্গে। অবাঙালী। প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রী ছিলেন একসময় রাজধানীর। অধ্যাত্মবিদ হিসেবে সুপরিচিত তিনি। বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং সাধু-সন্তদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ তাঁর। তিনি রাজধানীতেই আছেন এবং গৌরীনাথবাবুর কাছে তিনি একেবারে দুর্লভ নন।

ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর কাছেই ধরনা দিয়ে পড়লেন গৌরীনাথবাবু। খবর পেয়েছেন, বাবার সঙ্গে ভদ্রলোকের এই দিনই বিকেলে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়ে আছে।

ছেলেকে দেখে সহৃদয় ভদ্রলোকটির মন বিচলিত হল। বললেন, আচ্ছা বিকেল ঠিক চারটের সময় ছেলেকে সঙ্গে করে আমার সঙ্গেই চলো, আমি বাবাকে ধরে পড়ব, আশাকরি ব্যবস্থা হবে।

কৃতজ্ঞতায় গৌরীনাথবাবু নির্বাক খানিক। এমন আশ্বাসের কথা দিল্লীতে এসে এই প্রথম শুনলেন। ফেরার পথে স্ত্রীর দুই চোখও ছলছল। মাঝে মাঝে স্বামীর দিকে তাকাচ্ছেন। নীরব উচ্ছ্বাসের একটাই অর্থ যেন, তুমি চেষ্টা করলে হবে না এমন কিছু আছে নাকি!

ঘড়ি-ধরা সময়ে প্রাক্তন মন্ত্রীর সঙ্গে সেই ঈপ্সিত প্রাসাদের কাছাকাছি উপস্থিত হলেন সকলে। ভিড় তখন অপেক্ষাকৃত কম হলেও গাড়ি এগোবার উপায় নেই। খানিকটা তফাতেই নামতে হল। পিছনের ক্যারিয়ার থেকে তাড়াতাড়ি ফোলডিং হুইল-চেয়ার বার করে ছেলেকে বসালেন। স্ত্রীও তৎপর হাতে সাহায্য করলেন তাকে। তারপর এগিয়ে চললেন।

সামনে দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী। পিছনে হুইল-চেয়ার ঠেলে নিয়ে চলেছেন গৌরীনাথবাবু, পাশে স্ত্রী। ওঁদের দু'জনেরই দুরু দুরু বক্ষ।

সামনের ভিড়ের অবরোধ সহজেই দু'ভাগ হয়ে গেল। এ সময়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে কে আসছেন ব্যবস্থাপকরা সকলেই জানে।

এবারে সামনে গেট। গেটের ওধারে সারি সারি ভলান্টিয়ার মোতায়েন। ছাড়পত্র না পেলে তারা একজনকেও ঢুকতে দেবে না। গেটের ও-ধারে লম্বা রাস্তার শেষে বাড়ি। সেখানেও বেশ জনাকতক ভাগ্যবান আর ভাগ্যবতীর সমাবেশ। ছাড়পত্র পেয়ে তারা কেউ বাড়ির মধ্যে ঢুকছে, কেউ বা ঢোকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

একজন ব্যবস্থাপক ভলান্টিযাবদেব কানে কানে কি বলতে বদ্ধ গেট একটুখানি খুলে প্রাক্তন মন্ত্রীকে ভিতবে ঢুকিযে নেওযা হল। গৌবীনাথবাবু বা স্ত্রী বা হুইল-চেযাবে আসীন ছেলেব ছাডপত্র নেই। গেট আবাব বন্ধ হযে গেল।

গেটেব ওদিক থেকে সদাশয প্রাক্তন মন্ত্রীটি গলা খাটো কবে গৌবীনাথবাবুকে বললেন, এখানেই অপেক্ষা কবো, আমি দেখি কি কবতে পাবি।

আবাব অধীব প্রতীক্ষা। ভলান্টিযাববা নিছক দযা কবেই বোধহয তাঁদেব তফাতে হটিযে দিল না। কিংবা হযতো বুঝে নিল এবাও ফেলনা লোক নয।

মিনিট দশেকেব মধ্যে একজন ভলান্টিযাব ভিতব থেকে ছুটে এলো।

গেটেব সামনে এসে হুইল-চেযাবে বসা ছেলেকে দেখিযে বলল, একে ভিতবে নিযে আসুন, জলদি।

হুইল-চেযাব নিযে বদ্ধ গেট ঠেলেই তাঁবা ভিতবে ঢোকাব জন্য ব্যস্ত হযে উঠলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাধা আবাব।—ও নো নো। ওনলি ওযান। ছুটে-আসা ভলান্টিযাবেব ব্যস্ত-সমস্ত নির্দেশ।—বোগীব সঙ্গে আপনাদেব যে-কোনো একজন আসুন, দু'জন আসাব নিযম নেই।

গৌবীনাথবাবু বিমূঢ় কযেক মুহূর্তেব জন্য। গেট আধখানা খোলা হযেছে। জোব কবে, দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে হুইল-চেযাব ঠেলে ভিতবে ঢুকতে গেলেন। কিন্তু পবক্ষণে কাঁধেব কাছে বেশ জোবেই একটা ঠেলা খেযে প্রায নিজেব অগোচবে একটু সবে গেলেন। তাজ্জব বিস্ময়ে দেখলেন স্ত্রী তাঁকে ঠেলে হুইল-চেযাবেব দখল নিযে বলছেন, সবো সবো, তুমি পাববে না, আমি যাচ্ছি—

বাধা দেবাবও অবকাশ পেলেন না গৌবীনাথবাবু। ছেলেসহ হুইল-চেযাব ঠেলে স্ত্রী গেটেব ভিতবে ঢুকে পড়েছেন। চিৎকাব কবে বলতে গেলেন, তুমি তো বোগেব নামটাও ঠিকমতো বলতে পাববে না—

বলা হল না। হতভম্ব বিস্ময়ে দু'চোখ বড বড কবে চেযে বইলেন তিনি। হুইল-চেযাব ঠেলে স্ত্রী তবতব কবে যেন এক লক্ষ্যকেন্দ্রেব দিকে এগিযে চলেছেন। স্ত্রীব এমন আত্মস্থ সমাহিত অথচ তৎপব মূর্তি আব বুঝি দেখেননি। নিষ্পলক চেযেই আছেন গৌবীনাথবাবু। আব সমস্ত সত্তা দিযে অনুভব কবছেন, ঠিক এই মুহূর্তে বাপেব তুলনায ছেলেব মাযেব সঙ্গে যাওযাটাব কত তফাৎ।

বাত আব দিনেব মতই তফাত।

দিনবদল

বৃন্দাবন পালেব পর্যন্ত একজন অনুগত সহকাবী আছে। যাবা জানে বৃন্দাবন পালকে তাবা হাসে। কাবণ বৃন্দাবনকেই তাবা চিনিব বলদ বলে ডাকে। তাব সহকাবী অমল দাস তাহলে কি?

বৃন্দাবন সীবিযাস মানুষ। তাব কানে তুলো পিঠে কুলো। কাবো ঠাট্টা তামাশাব

ধাব ধাবে না। একাগ্র নিষ্ঠায তাব মনিবেব সেবা কবে চলেছে। যে কাজ তাকে কবতে হয তাব ঝক্কি অনেক, বিপদও কম নয। এ যাবত ঝামেলা অনেক পোহাতে হযেছে, কিন্তু সত্যিকাবেব বিপদে কখনো পডেনি। দুই একবাব পড পড হযেছে, কিন্তু মনিবই সামলেছে। মনিবেব টাকাব ওপব ছাতা পডছে, তিনি সদয হলে টাকাব ঝাঁটা মেবেই মুশকিল আসান কবে দিতে পাবেন।

বৃন্দাবনেব খুব আশা, মনিব তাব ওপব একদিন সত্যিকাবেব সদয হবেন, ওব কদব বুঝে আব প্রভুভক্তি দেখে তাঁব বুকেব তলাব কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রে মোচড পডবে। তখন আব বৃন্দাবনকে পায কে। মনিব তখন একটু হাত ঝাডলেও যা পডবে তাতেই বাকিটা কাল পাযেব ওপব পা তুলে সুখে কেটে যেতে পাববে। মনিব লোকটা যেমনই হোক, তাঁব বুকেব তলায স্নেহ মাযা মমতা যে কিছু আছে সে-তো তাব কুকুব দুটোকে দেখলেই টেব পাওযা যায। স্থূল বপুখানা নবম গদিব সোফায ছেডে দিযে আব ভাবী ভাবী পা দুখানা মস্ত মস্ত দুটো অ্যালসেসিযানেব পিঠে চাপিযে দিযে যখন আদব কবেন, তখন তাঁব থলথলে মুখে স্নেহ উপছে পডতে দেখেছে বৃন্দাবন, আব সহকাবী অমলকেও দেখিযেছে।

একটাও ছেলেপুলে নেই, বউটাও মবে ভূত না কি পেত্নী হযে গেছে কোন কালে—এ-হেন ভাগ্যবান মনিব টাকাব আণ্ডিল আগলে বসে থাকবেন আব কতকাল? মা-লক্ষ্মীব কৃপায কুকুবেব প্রতি ওই দবদেব বাতাসটুকুও যদি বৃন্দাবনেব দিকে ফেবে তাহলেও দিন ফিবে গেল।

সহকাবী অমল অতশত বোঝে না। ভবিষ্যত ভেবে মাঝে মাঝে হতাশ হযে পডে। বৃন্দাবন তখন তাকে ওই সব কথা বলে, বোঝায, আশ্বাস দেয। বলে, দিন ফিববেই একদিন দেখে নিস, ওই খাম-খেযালী মনিব হঠাৎ দেখবি দযাব অবতাব বনে গেছে। নির্ঘাত তাই হবে, উইল কবে আধাআধি না হোক, চাব ভাগেব একভাগ সম্পত্তি দেখবি আমাকেই দিযে গেছে।...বযেস তো বাহাত্তব পেরুতে চলল, এত সব কাণ্ড মাগুব পব কত দিন আব বাঁচবে—নেহাত পযসাব জোবে শবীবেব ক্ষয-ক্ষতি সামলে আসছে, নইলে কবে অক্কা পেযে যেত। কেউ তো বোকা বলবে না তাকে, নিজেই বোঝে সব, এই জন্যেই উকীল অ্যাটর্নিব আসা-যাওযা লেগেই আছে দেখছিস না? আব আজকাল কেমন মিষ্টি মিষ্টি হেসে আমাব দিকে তাকায লক্ষ্য কবেছিস?

অমল দাস জবাব দেয না, গুরুটি তাব জবাবেব প্রত্যাশাও কবে না। নিজেব অনাগত সুখ-স্বপ্নে বিভোব সে। তাব বযেস এখন উনচল্লিশ। আব এক আধ বছবেব মধ্যে দিন বদলাবে। নিশ্চয বদলাবে। তখন ভোগেব বন্যায গা ভাসাতে বাধা কোথায। সমস্ত বকমেব কাল্পনিক বাধা একেব পব এক নাকচ কবে দিযেছে। টাকা থাকলে সব বাধা জল। আব বযেসটা তো কোন বাধাই নয। তাব মনিব এই বাহাত্তব বছবেও ভোগী। অবশ্য ভোগেব সাধ যত আছে এখন আব সাধ্য তত নেই। তাব ফলে যে-সব কাণ্ড কবে আনন্দ পেতে চেষ্টা কবেন ভাবতে গেলে বৃন্দাবনেব একটুও ভাল লাগে না। অত বযসে ভদ্রলোকেব একটু ধর্ম কর্মে মতি ফিবলে ববং বৃন্দাবনেব

সুবিধে হত। না, অত বয়সে বৃন্দাবন মনিবের মত হ্যাংলাপনা করবে না। বড় জোর ষাট বছর পর্যন্ত আনন্দের সময়। চল্লিশে তার দিন ফিরলেও আনন্দের ঢের সময় পড়ে থাকবে। কম করে বিশটি বছর। অতএব তার হতাশ হবার কিছু নেই।

এ-সব কথা সে হামেশাই অমলকে শোনায়। অমল তার ভোগের ছটকাও কিছু কিছু জেনেছে। যেমন; একটা ভাল বাসায় থাকবে, ভাল জামা-কাপড় পরবে, একটু ভাল খাবে-দাবে, আর মনের মত একটা মেয়ে এনে ঘর বাঁধবে।..ওই পোড়ারমুখি যদি কোথাও থেকে তাকে দেখে তখন, হিংসেয় কালি হয়ে যাবে।

পোড়ারমুখিটা কে তাও অমল ভাল জানে। তারই মাসতুতো দিদি শ্যামা। সম্পর্কে অমল বৃন্দাবনের মাসতুতো শ্যালক। দুজনকেই একসঙ্গে আশ্রয় দিয়েছিল বৃন্দাবন। অমলের তখন পনের বছর বয়েস আর মাসতুতো দিদির একুশ। আর বৃন্দাবন পালের তখন একত্রিশ। অমলের বয়েস এখন তেইশ আর শ্যামাদি আজ যেখানেই থাক—তার উনত্রিশ।...শ্যামাদি বৃন্দাদার ঘর করেছে মাত্র দুটি বছর। তার মধ্যেই অনেকবার ঘর ভাঙার দাখিল হয়েছে, তবু কোন রকমে টিকে ছিল। বৃন্দাবন পাল তার মনিব সুমন্ত চৌধুরীর খাস সরকার আর মোসাহেব ছিল তখন। ফাই ফরমাশ খাটা বা হঠাৎ দরকারে ছোটাছুটির জন্য কর্তার ড্রাইভারের পাশে বসে স্টুডিওতেও আসতে হত। স্টুডিওর অনুগ্রহ-প্রত্যাশীদের কাছে সেই কারণে তার কদরও ছিল একটু। কর্তাটি ছবির বাজোর নামজাদা প্রডিউসার।

নিজের গুণেই বিশেষ নজরে পড়েছিল সে। দু'দুটো ছবির ভবিষ্যত ভেবে কর্তা যখন মুষড়ে পড়েছিলেন, তখন টেকনিশিয়নদের সঙ্গে স্টুডিওতে সেই ছবি তন্ময় হয়ে দেখে বৃন্দাবন ছাড়া ওরকম ভবিষ্যদ্বাণী আর কেউ করেনি, কারণ কর্মকর্তারা মালিকের দুশ্চিন্তার ভাগ নেবার ফলে ভবিষ্যত সম্পর্কে বায় তেমন আশান্বিত হয়ে উঠতে পারেনি। বোকার মত সেই ছবিই হিট করবে বায় দেবার ফলে, তখনকার মত বৃন্দাবন বরং মালিকের বিরক্তিভাজন হয়েছিল। কিন্তু, সত্যি সত্যি সেই দুটো ছবিতেই অপ্রত্যাশিত ভাল লাভ হয়েছিল মালিকের। চৌধুরীমশায় সেইজন্য তাকে পুরস্কারও দিয়েছিলেন। এরপর দু'দুটো প্রেস্টিজ ছবি করেছিলেন কর্তা। মালিকের সঙ্গে সকলে একবাক্যে বায় দিয়েছে—ছবি হয়েছে বটে, একেবারে হীট। চৌধুরীমশাই সাগ্রহে বৃন্দাবনের মতামত জানতে চেয়েছেন। কিন্তু মাথা চুলকে সে বলেছে, আমি সবটা ঠিক বুঝতে পারিনি হুজুর—একটু হাই জিনিস তো...

অন্য মোসাহেবরা হেসে উঠেছে। কর্তা নিজেও। কিন্তু ছবির ফলাফল দেখে সকলের চক্ষুস্থির। ওই দুই ছবিতে বহু টাকা লোকসান হয়েছিল মালিকের।

ফলে কর্তার কাছে বৃন্দাবনের খাতির আরো বেড়ে গেছে। বৃন্দাবনের ভাল লাগলে তবে তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করেন। এই করেই ছবির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে লাগল বৃন্দাবন পাল। একটা দুটো করে কাজের ভার পড়তে লাগল তার ওপরে। বারকয়েক আধাবস্তি গোছের গরিব মহলে হানা দিয়ে ছবির জন্য কিছু একস্ট্রা মেয়ে সংগ্রহ করে দেবার ফলে এই কাজটাই ক্রমশঃ তার ওপর বর্তাল। নায়িকা বা সহ-নায়িকা ছাড়াও এক সীন দু'সীনের জন্য অনেক ভদ্র চেহারার মেয়ের দরকার হয়।

দিন পিছু তাদেব তিন টাকা পাঁচ টাকা বেট আব দুপুবেব খাওযাব ব্যবস্থা। এই কাজেই দস্তুবমত নাম কিনে ফেলল বৃন্দাবন পাল। সে যে-সব মেযেদেব আনে তাদেব বেশিব ভাগই মোটামুটি ভদ্র চেহাবাব, কেউ কেউ কথাবার্তাও কইতে পাবে বেশ, আবাব দুই একজন সুশ্রী মেযেও বেবিযে যায তাদেব মধ্যে। ছবিতে মেযেদেব কোন ভিডেব বোল থাকলেই বৃন্দাবন পালেব কাজ বাডল।

কর্তা এ-কাজেব জন্য একটা অল সেকশন ট্রামেব মান্থলি টিকিট ববাদ্দ কবে দিযেছেন তাকে। আব মাইনেও কিছু বাডিযেছেন, কাবণ, এ-কাজে একটু ভদ্র জামা-কাপড দবকাব।

বৃন্দাবন পাল সোৎসাহে এই কাজ কবে চলেছিল। কিন্তু মুশকিলে ফেললেন তাকে কর্তা নিজেই। এক্সট্রা মেযেদেব মধ্যে কাউকে মনে ধবলেই ওকে ডেকে কানে কানে কিছু প্রস্তাব কবেন। উদাব মুখে দশ পাঁচ টাকা আগাম বখশিসও কবে ফেলেন তাকে। ওই প্রস্তাব শুনে গোডায গোডায ভযানক অস্বস্তি বোধ কবত বৃন্দাবন পাল। কিন্তু ভগবানেব নাম কবে সেই দুরূহ কাজে ঝাপিযে পডেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে হযনি। কর্তাব নাম কবে ভবিষ্যতেব অনেক বকম লোভ-টোভ দেখিযে যেভাবেই হোক কর্তাব পছন্দেব বমণীটিকে বশে আনত। দেবি হলেও লেগে থাকত, কিছু খবচপত্র কবত এবং শেষ পর্যন্ত বিফল হত না।

..কিন্তু মালিকেব এই বোগ বাডতেই থাকল। ছবিব জন্য একস্ট্রা মেযেব কোন সীন না থাকলেও কর্তাব ঝোক চাপলে তাঁব মনেব মত মেযে সংগ্রহেব জন্য হন্যে হযে ঘুবতে হয তাকে। সে বকম কাউকে পেলে কর্তা দবাজ হাতে টাকা দেন, আবাব সেবকম না হলে তাব পছন্দেব খোঁটাও দেন। এই ফবমাশ খাটতে গিযে এক একসময গলদঘর্ম হযে ওঠে বৃন্দাবন পাল।

একবাব একদঙ্গল মেযেব মধ্যে থেকে একটি উদ্বাস্তু মেযেকে আব স্টুডিওতে না নিযে গিযে সোজা নিজেব ঘবে তুলল বৃন্দাবন। সেই মেযে অমলেব মাসতুতো দিদি শ্যামা। কালোব উপবে দিব্যি সুশ্রী মেযে। আব চৌকসও। ঠাবে-ঠোবে তাকাতে জানে, হাসতে জানে। এই মেযে কর্তাব চোখে পডলে আব বক্ষা নেই জানে। চোখে পডতে দিল না। নিজেই বিযে কবে বসল। দিন কযেক বাদে শ্যামা তাব মাসতুতো ভাই অর্থাৎ অমলকেও তাব নিজেব সংসাবে টেনে নিযে এল। অমলেবও আব তিনকূলে কেউ নেই।

কিন্তু বৃন্দাবনেব সংসাব বেশিদিন টিকল না। তাব ঘবে ছবিব জগতেব নীচু পর্যাযেব কর্মীদেব আনাগোনা ছিলই। কিছু দিনেব মধ্যেই শ্যামাব চোখ খুলে গেল। বৃন্দাবন ওকে বিযে কবে বঞ্চিত কবেছে কানে এমন মন্ত্র দেবাবও লোক জুটল। তাব ওপব স্বামীটি কি কাজ কবে বেডায জানাব পব থেকে শ্যামা বীতশ্রদ্ধ তাব ওপব। কতদিন ঝাঁঝেব মুখে বলে বসেছে, তুমি আবাব একটা মানুষ নাকি, কোনদিন তোমাব মনিবেব হুকুম হলে আমাকেই পাঠিযে দেবে তাব কাছে—তুমি না পাবো কি?

বৃন্দাবন পাল মনে মনে ভাবে মনিবের হুকুম হলে শ্যামা আর তার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে না, ছবিতে নামার আশায় নিজেই ছুটবে তাঁর কাছে। মেজাজ ভাল থাকলে শ্যামা অনেকদিন মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার কথা বলেওছে।

যাই হোক, দু'বছর না যেতে শ্যামা নিজেই তার ব্যর্থ জীবন সফল করতে ঘর ভেঙে দিয়ে চলে গেল। এক রাত্রিতে বৃন্দাবন ফিরে দেখে বউ ঘরে নেই। আর দিন দুই যেতে বুঝে নিল ওই বউ ঘরে আর ফিরবেও না।

কিন্তু চির অনুগতের মতই অমল দাস থেকে গেল তার কাছে। বউ চলে যাবার পর কিছুদিন পর্যন্ত সমস্ত মেয়ে জাতটার ওপরেই ঘেন্না ধরে গেছল বৃন্দাবনের। সেই ঘেন্নার ভাগ অমল দাসও নিয়েছিল। দুই এক বছর যেতে বৃন্দাবনের মন বদলেছে। আবার সে সুখের সংসার করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু অমল দাসের মন বদলায়নি। বৃন্দাদার কাজে সে যথেষ্ট সাহায্য করে বলেই ঘেন্না তার আরো বেড়েছে। মেয়েগুলোই দুনিয়ায় যত অনিষ্টের মূল ভাবে সে। বৃন্দাদাকে সে সাহায্য করে সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবেই। কসাইয়ের যেমন মাংস কাটা কাজ, অনেকটা সেই রকমই মনোভাব। বৃন্দাদার দিন ফিরলে তারও দিন ফিরবে এটুকুই আশ্বাস। কিন্তু দিন ফিরলেও কোন মেয়েকে নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখে না সে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেল। কলকাতার দিনকাল তখন খুব খারাপ। হামলা মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে। কিন্তু অমল নিঃশত্রু ভাবে নিজেকে, তাই রাত্রিতেও নিঃশঙ্কে চলাফেরা করে।

সবে রাত তখন আটটা সাড়ে আটটা হবে। স্টুডিওর পিছনের নির্জন রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছিল। বৃন্দাদার জন্য অর্থাৎ তার মালিকের জন্য একে একে তিনটে মেয়ের কাছে টোপ ফেলেও বিফল হয়েছে। ফলে ভিতরটা তেতে আছে তার। দুনিয়া থেকে মেয়েগুলোকে নির্মূল করে দিতে পারলে দিত। ওই বুড়ো হাঙর অর্থাৎ বৃন্দাদার মালিকের বিকৃত আনন্দের নিবৃত্তি যে কবে হবে তাও জানে না।

উঁচু রাস্তা, দুদিকে পোড়ো জমির ঢল। হঠাৎ অন্ধকারে মেয়ের গলার গোঙানি শুনে থমকে দাঁড়াল। হ্যাঁ, স্পষ্টই একটা চাপা আর্তস্বর কানে আসছে বাঁদিকের ঢল থেকে। অন্ধকারে ঠেকে-ঠোকে নীচু জমির দিকে পা বাড়ালো। আধা-আধি নেমেই সর্বাঙ্গ অবশ। সামনেই পুঁটলির মত পড়ে আছে একটা মেয়ে, অতি যন্ত্রণায় সে-ই কাতরাচ্ছে।

অমল দাস ঝুঁকে দেখল। তারপর পকেট থেকে দিয়াশলাই বার করে হাঁটু মুড়ে বসে দিয়াশলাই জ্বালল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কাঠিটা নিভে গেল আবার।

অমল দাস তার মধ্যে যা দেখার দেখে নিল। বছর উনিশ কুড়ির একটা অপুষ্ট মেয়ে। কিন্তু বেশ সুশ্রী মুখখানা। এক পিঠ চুল। হাত পা গা ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে।

কি যে করবে অমল দাস ভেবে পেল না। কিন্তু মেয়েটাই ককিয়ে উঠল, আমাকে তোলো—

অমল মেয়েটাকে টেনে বসাল। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। একটু বাদে ওকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, আমাকে বাঁচাও, ছুঁচোগুলো ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আমার হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছে। একটু জল খাব—

কিন্তু জল কোথায় মিলবে সেখানে? অমল টেনে তুলল তাকে। তারপর একবকম আলতো কবেই বাস্তায় এনে দাঁড় করাল। পরনের জামা-কাপড় যেভাবে ছিঁড়েছে আলোর দিকে যাবে কি করে ভেবে পেল না।

অন্ধকারে ভেঁপু বাজিয়ে একটা রিকশা আসছে। অমল দাস অন্য কোন দিশা না পেযে তাতেই উঠে বসল মেযেটাকে নিয়ে। সেও প্রায় কোলে করেই তুলতে হল। রিকশাওলাকে কৈফিযত দিল, হঠাৎ পড়ে গিয়ে চোট পেযেছে, তাই—

বিকশাওলাটা বিহারী। চাপা গলায অমল মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা কবল, তোমার বাড়ি কোথায ? কোথায় যাবে ?

কিছু জবাব পেল না। পিছনে মাথা এলিযে বেহুঁশেব মত পড়ে আছে মেযেটি। ধাক্কা দিল। কোন সাড়া নেই।

অমল ঘামতে শুরু কবেছে। কি কববে ভেবে না পেযে বিকশা নিয়ে সোজা নিজেদের ডেবায় চলে এল। দরজা খোলা দেখে আব আলো দেখে বুঝল বৃন্দাদা ঘবে আছে। একলাফে নেমে দু-এক কথায ব্যাপাবটা বলে তাকে টেনে নিয়ে এল। ... অজ্ঞান হযে আছে, তাকে নিযে এখন কি কবা হবে ?

কিন্তু বৃন্দাদাকে নিয়ে বিকশাব কাছে এসে অমল হাঁ। মেয়েটা বিকশা থেকে নেমে দাঁড়িযে আছে। চোখে মুখে যন্ত্রণাব ছাপ। নিঃশব্দে কাঁদছেও।

অমল দাস বলল, তুমি না অজ্ঞান হযে ছিলে ?

জবাব না দিয়ে মেযেটা করুণ দুটো চোখ মেলে তাকাল শুধু।

বৃন্দাবন তাড়াতাড়ি বাধা দিল, অজ্ঞান হলেও জ্ঞান ফিরেছে দেখছিস না, এস এস, ঘরে এস। হাত ধরে ঘরেব দিকে টানল তাকে। কিন্তু মেয়েটা সত্যিই জখম হয়েছে, হেঁটে আর আসতে পারছে না। বৃন্দাদা টেনেটুনে তাকে ঘবে এনে বসাল। তারপব সর্বাঙ্গেব আঘাত লক্ষ্য করে তক্ষুনি ডিসপেনসাবিব উদ্দেশ্যে ছুটল।

দু'হাত কোমবে তুলে অমল দাস গম্ভীব মুখে তাকে দেখল একটু।

তোমাব নাম কি ?

অতসী।

ওভাবে ওখানে পড়ে ছিলে কেন ?

ওরা চলন্ত গাড়ি থেকে আমাকে ঠেলে ফেলে দিযেছিল।

অমল দাস আঁতকে উঠল, কারা ফেলে দিয়েছিল ?

সংক্ষেপে যা শুনল তাতেই চক্ষুস্থির তাব। কতগুলো বদমাস ছেলে অতসীকে জোব করে বাস্তা থেকে গাড়িতে তুলে নিযে পালাচ্ছিল—পাড়ার চেনা গুণ্ডা ছেলে সব। সৎ মায়েব সঙ্গে তাদেব খুব ভাব ছিল, মনে হয সৎ মাকে টাকাও দিয়েছে ওরা। অনেক দূরে আসার পবে একটা পুলিশেব গাড়ি হঠাৎ পিছু ধাওযা কবতে সেই ছুটন্ত গাড়ি থেকে ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ওরা পালিযে যায়। তারপর আর কিছু জানে না।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা কাটিযে অমল দাস বলল, রিকশাতে জ্ঞান ছিল তোমার তবু অজ্ঞানেব ভান কবে ছিলে কেন ?

তুমি তাহলে বাড়ি দিয়ে আসতে চাইতে আমাকে।

বাড়ি যাবে না তো কোথায় থাকবে?

জানি না। বাড়ি গেলে বাবা আর সৎমা এবারে মেরেই ফেলবে আমাকে।

বাবা কি করে?

কলে কাজ করে...ভয়ানক মদ খায়। আর মায়ের কথা শুনে আমাকে মারে। আমাকে বাড়িতে দিয়ে আসতে চাইলে আমি আত্মহত্যা করব।

মেয়েটাকে খুঁটিয়ে দেখল অমল দাস। রোগা একটু, নইলে মন্দ না। খাইয়ে-দাইয়ে পুষ্ট করে তুলতে পারলে বৃন্দাদার লাভ মন্দ হবে না। মরুকগে, বৃন্দাদাই দায় সামলাক এখন, তার ভেবে কাজ কি?

বৃন্দাবন পাল একজন চেনা কম্পাউণ্ডার নিয়ে এল। সে ওষুধপত্র দিয়ে চলে গেল। তারপর অমলের মুখে সব শুনে বৃন্দাবনও খুব খুঁটিয়ে দেখে নিল মেয়েটাকে। তার চাপা আনন্দ গোপন থাকল না। অতসীর আদর যত্নের ব্যবস্থায় কোন রকম কার্পণ্য করল না। আশ্বাসও দিল, তার সুব্যবস্থা সে-ই করে দেবে।

আর ভাগ্য এমনই, পরদিনই একগাদা ভাল ভাল একস্ট্রা যোগাড় করতে হল নতুন ছবির কাজের জন্য। তাদের মধ্য থেকে কর্তার চোখে লাগা দু' দুটো মেয়ে একেবারে জলের মত টোপ গিলল। কর্তা তাদের এক মাসের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন নিজের বাগানবাড়িতে। আর সেই সঙ্গে বৃন্দাবনকে ঝোঁকের মাথায় দু'শ' টাকা বখশিস করে ফেললেন।

অতসীকে খুব পয়মন্ত মেয়ে ধরে নিল বৃন্দাবন।

এক মাসের মধ্যেই খেয়ে দেয়ে আর শান্তিতে থেকে শ্রী ফিরে গেল অতসীর। বৃন্দাবন দু'চোখ ভরে দেখে তাকে আর আরো ভাল দেখার আশায় দিন গোনে। তাছাড়া মেয়েটার মস্ত গুণ, সুন্দর বাঁধতে পারে—খেতে বসে মনে হয় অমৃত খাচ্ছে। অমল আর বৃন্দাবন মাঝারি ঘরটায় থাকে, আর খুপরিটাতে অতসী থাকে।

এক মাসের মধ্যেই অমলের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলল বৃন্দাবন। অতসীকে বিয়ে করবে। এদিকের খুপরি থেকে অতসী নিজের কানেই শুনল প্রস্তাবটা। অমলের জবাবও। এরা কেউ রেখে ঢেকে কথা বলে না। অমল জবাব দিল, কেন ঝামেলায় পড়বে আবার, তার থেকে আর একটু তরতাজা করে নিয়ে তোমার কর্তার কাছে পাঠিয়ে দাও, এদিকে ফোটো ভাল উঠলে ছবিতে একস্ট্রা করেও রোজগার করতে পারবে—মোট কথা তোমারও পয়সা হবে ওরও হিল্লে হবে।

বৃন্দাবন পাল বিরক্ত। বলল, তুই বড় নৃশংস হয়ে গেছিস। অতসী আমার লক্ষ্মী, ওকে আমি কোথাও পাঠাতে পারব না— দিন-টিন দেখে সামনের মাসেই বিয়েটা করে ফেলব ভাবছি।

এদিকের খুপরি থেকে অতসী তার উদ্দেশে বড়-সড় ভেঙচি কাটল একটা। কিন্তু সেই সঙ্গে কৌতূহলও খুব। অমলদা ওকে কার কাছে পাঠিয়ে পয়সা রোজগারের কথা বলছে? ফোটো ভাল হলেই বা কি করবে?

বৃন্দাবন বেবিযে যেতে তাব ওপব চডাও হল। বাডিতে মাঝে মাঝে দুই একটা মেযে এক একটা আবেদন নিযে আসে দেখে, কি চায ঠিক বুঝে ওঠে না। কিন্তু গোডা থেকেই অমল দাস অতসীব সঙ্গে ভালো ব্যবহাব কবেনি বড একটা। কেবল খেতে বসলে খুশি। বলে, তুই বাঁধিস বেশ, না হলে বৃন্দাদাব কথায তোকে কখনো বাডিতে বাখতুম না—মেযেছেলেব ঝামেলা ভাল লাগে না।

অতসীও ফোঁস কবে ওঠে, ঝামেলাটা কি?

ঝামেলা না তো কি, যে দেখে সে-ই জিজ্ঞেস কবে কে?

তা জবাব দিলেই পাবো?

কি জবাব দেব, বদ ছেলেদেব ফূর্তি ফসকে এখানে এসে গেছে?

তা কেন, বলবে ভবিষ্যতে আপনাব জন কেউ হবে।

অমল ওকে মাবাব জন্য তেডে আসে। অতসী ছুটে পালায। যখন তখন এইবকম খটাখটি লেগেই আছে। যা কবতে বলে একবাবে শোনে না। তর্ক কবে, অবাধ্য হয। শাসন কবতে গেলে বৃন্দাদাব কাছে পালায।

সেদিন অতসী সবাসবি এসে কৈফিযত তলব কবল, কি ব্যাপাব তোমাদেব বল তো? আমাকে কাব কাছে পাঠাবাব কথা বলছিলে? আব ফোটোব কথাই বা কি বলছিলে?

অমল খেঁকিযে উঠল, তা দিযে তোব দবকাব কি?

দেখ, বড ভাইযেব বউ হতে যাচ্ছি, দস্তুবমত মান্যিগন্যি কববে আমাকে—আব খবদ্দাব তুই-তুকাবি কববে না। তা আমাকে নিযে যখন কথা হচ্ছিল তখন আমি না শুনলে কে শুনবে?

যা যা এখান থেকে—বৃন্দাদাব ভীমবতি ধবেছে—

কেন, আমাকে বিযে কবতে চায বলে? তা তোমাব আপত্তি থাকে তো জোব দিযে বল না?

আমাব কি দায পডেছে?

তাহলে কুপবামর্শ দিচ্ছিলে কেন?

দিচ্ছিলাম মেযে জাতটা অতি অখাদ্য জিনিস বলে।

অতসী হেসে ফেলল।—দুই একটা মেযে খেযে দেখেছ? বলে হাসতে হাসতেই পালাল সেখান থেকে।

কিন্তু ভিতবে ভিতবে অতসীব বেশ ভাবনাই ধবে গেল। এখান থেকে নডাব ইচ্ছে একটুও নেই। কিন্তু বৃন্দাবন পাল বিযে কবতে চাইলেই বা ঠেকাবে কি কবে? তাকে বিযে কবাব ইচ্ছে একটুও নেই। ওদিকে আব একজন তো কাছে গেলেই মাবতে আসে।

ইনিযে বিনিযে বৃন্দাবন প্রস্তাবটা কবেই ফেলল একদিন। তাব শবীবটা ভাল যাচ্ছে না। প্রাযই একটু একটু জ্বব আব বুকেব ব্যথায় ভুগছে। তাই মাঝে মাঝে আব কাজে বেবোয না। সেই অবকাশে একদিন কথাটা বলে ফেলল।

শুনে অতসী ভযানক বিমর্ষ।—তা তো এখন হয না।

কেন ? কেন হয না ?

আমাব যে ভযানক ফাঁড়া আছে। জ্যোতিষী আমাকে দেখে মাকে আব বাবাকে বলেছিল। ফাঁড়া না কাটতে বিযে হলে আমাবও ক্ষতি হবে, যে বিযে কববে তাবও খুব অনিষ্ট হবে। এই জন্যেই তো বাবা ঘবে বেখেছিল—

বৃন্দাবন চিন্তিত। কতদিন ফাঁড়া আছে ?

একুশেব মাঝামাঝি পর্যন্ত।

এখন কত ?

এই কুড়িব মাঝামাঝি।

স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলল বৃন্দাবন, একটা বছব এমন কিছু দীর্ঘ নয। তাব পবেই কি মনে পড়তে পুলকিত। সেও তো গণক ঠাকুব দিযে হাত আব ঠিকুজী দেখিযে বেখেছে, আবো এক বছবেব মধ্যে তাব দিন ফেবাব কথা। যোগাযোগ একেই বলে, দিন তাহলে সর্ববকম ভাবেই বদলাবে।

অতসীব ফাঁড়া কাটাব কথা আব প্রায একই সময নিজেব দিন বদলেব কথা অমলকে না বলে পাবেনি বৃন্দাবন। তুই তো কিছুই বিশ্বাস কবিস না, কেমন মেলে দেখ এখন—

শুনে অমল ভুরু কুঁচকেছে শুধু। এসব প্রসঙ্গই বিবক্তিকব তাব কাছে।

বিবক্তি দিন দিন বাডতেই থাকল, কাবণ ভয-ডব গিযে অতসীব হামলা দিনে দিনে বাডছে তাব ওপব। কাবণে অকাবণে ঝগডা কবে, আবাব বৃন্দাদাব কাছে নালিশ কবে ওকে বকুনি খাওযাতে চেষ্টা কবে। ওব কাজেব জিনিস লুকিযে বাখে, ইচ্ছে কবে জামাব বোতাম ভেঙে বাখে। নিজেই অবশ্য আবাব বাব কবে দেয, বা পবিপাটি কবে নতুন বোতাম লাগিযে দেয। সেলাই কবতে কবতে দাতে কবে সুতো কাটে যখন, অমলেব দেখতে এক এক সময ভালই লাগে। কিন্তু ভাল লাগাব মেজাজ সব সময থাকে না। উল্টে বেশিব ভাগ সময হাত নিশপিশ কবে। কিন্তু গাযে আঙুল তুললে বৃন্দাদাব কাছে দশখানা কবে লাগায।

বেগে গিযে অমল বলে, তুই এখন থেকেই চাস না যে আমি এখানে থাকি— নিজেব একটা পেট আমি চালাতে পাবব না ভাবিস, কেমন ?

গম্ভীব মুখে অতসী জবাব দেয, একটা পাববে, দুটো পাববে কিনা আমাব সেই ভাবনা।

কি, বৃন্দাদাব মত হাঁদা পেযেছিস আমাকে ? আমি যাব ঝামেলা বাডাতে ! বৃন্দাদা ছাডছে না বলে, নইলে আমি পালাতেই চাই, বুঝলি ? তোব ফাঁড়া কাটতে আব বাকি কত ?

ভাল মুখ কবে অতসী জবাব দেয, সে-তো তোমাব ওপব নির্ভব কবছে—কাটিযে দাও না চট কবে।

অমল দাস ভাবে, পুজো আর্চা দেওযা বা জ্যোতিষীব কাছে ধর্ণা দেওযাব অনুবোধ। জবাব দেয, আমাব দ্বাবা কিছু হবে না, আমাব সময়ও নেই, আব ওসব কিছু বিশ্বাসও কবি না। নিজেদেবটা নিজেবা বোঝগে যাও—বড নিশ্বাস ফেলে অতসী জবাব দেয, মেযেছেলে...কত আব পাবি।

এক বছবেব দবকাব হল না, মাস আষ্টেকেব মধ্যে বেশ অপ্রত্যাশিতভাবেই দিন বদলেব চাকাটা ঘুবে গেল। অতসীব ফাঁড়া কাটল, কিন্তু এতটা অকরুণভাবে কাটাতে চাযনি সে।

বৃন্দাবন আগেব থেকে আবো বেশি ভুগছিল। কিন্তু মনিবেব ভ্রূকুটিব ভযে আব বোজগাবেব আশায অসুস্থ শবীব নিযেই কাজে বেরুতে হত। এবই মধ্যে অঘটন ঘটে গেল। মনিবেব কাছে মোটা বখশিসেব ইংগিত পেযে একটি মোটামুটি শিক্ষিতা মেযেকে লোভেব টোপে প্রায আটকে ফেলেছে ভেবেছিল। অদূব ভবিষ্যতে ছবিব নাযিকা হযে ওঠাব উজ্জ্বল সম্ভাবনাব কথাও বলেছিল তাকে। আব মনিবেব সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও কবিযে দিযেছিল।...মেযেটাব বোধহয ভালবাসাব লোক ছিল একজন, কিন্তু তা নিযে বৃন্দাবন মাথা ঘামাযনি। অমন অনেক দেখেছে। কিন্তু সেই ভালবাসাব লোক আব দুটো ষণ্ডামার্কা লোকেব সঙ্গে দিনমানে খোলা বাস্তায তাব ওপব আচমকা ঝাঁপিযে পডল—তাবপব বেদম মাব। মুখে বুকে পিঠে কিল চড লাথি। নাক মুখ দিযে গল গল কবে বক্ত বেরুতে লাগল। বৃন্দাবন পাল অজ্ঞান হযে মাটিতে গডাতে লাগল।

তাবপব হাসপাতাল। প্রায সন্ধ্যাব মুখে খবব পেযে অমল আব অতসী হাসপাতালে ছুটেছে। ওদেব দেখে বৃন্দাবন কেঁদে ভাসিযেছে।

দিন তিনেকেব মধ্যে সুস্থ হযে উঠেছিল। আব একটা দিন গেলেই বাডি ফেবাব কথা। পবদিন বিকেলে তাকে আনতে গিযে অমল আব অতসী শোনে বৃন্দাবন পাল মবে গেছে। ডাক্তাব জানালো, বাতে কবোনাবি অ্যাটাক হযেছিল, দুপুবেব মধ্যে শেষ।

দিন তিনেকেব চেষ্টায অমল দাস কর্তা চৌধুবীমশাযেব নাগাল পেল। নতুন ছবি নিযে খুবই ব্যস্ত তিনি। বৃন্দাবনেব মৃত্যুব খবব কানে এসেছে আগেই। অমলকে পবে দেখা কবতে বলেছিলেন।

বৃন্দাবনেব জন্য দুঃখ কবলেন একটু চৌধুবীমশাই। বড কাজেব লোক ছিল বললেন। তাবপব জিজ্ঞাসা কবলেন, ওব বউটাব কি দশা?

বৃন্দাবনেব বউ পালানোব খবব চৌধুবীমশাই বাখেন না বোঝামাত্র অমল দাস শুকনো মুখে জানিযে দিল, পাগলেব মত হযে আছে—এদিকে ঘবে একটা কপর্দকও নেই।

বাডিব সেক্রেটাবিকে ডেকে চৌধুবীমশাই হুকুম কবলেন, বৃন্দাবনেব দু'শ' টাকা মাইনে আব তিনশ'টা বাডতি টাকা নিজে গিযে বৃন্দাবনেব বউযেব হাতে দিযে আসতে। আব অমলকে বললেন, সে ইচ্ছে কবলে বৃন্দাবনেব কাজ কবতে পাবে, কিন্তু তাব মত খাঁটি হওযা চাই।

মনে মনে বুডো হাঙবেব মুণ্ডপাত কবতে কবতে সেক্রেটাবিকে সঙ্গে কবে ডেবায ফিবল। মেযেজাতটাব ওপবে সে এখন মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ। তাকে বাইবে দাঁড কবিযে তাডাতাডি ভিতবে গিযে অতসীকে টেনে এনে ঘবেব মেঝেতে বসিযে দিল। পবনেব কালো পেডে শাডিব আঁচলে নিজেই ওব মাথা আব মুখ ঢেকে দিযে ফিসফিস কবে বলল, খববদাব একটা কথাও বলবি না, মালিকেব সেক্রেটাবি টাকা দিতে আসছে।

ছুটে গিযে সেক্রেটাবিকে ডেকে নিযে এল। সে ভদ্রলোক মালিকেব বক্তব্য শুনিযে সামনে পাঁচশ' টাকা বেখে চলে গেল।

অমল দাস ফিরে এসে দেখে অতসী তেমনি ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসে আছে, কিন্তু সামনে টাকা নেই।

টাকাগুলো দে।

এক ঝটকায় ঘোমটা সরিয়ে ফেলে ছদ্মকোপে অতসী বলল, আমাকে বিধবা সাজিয়ে টাকার কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার? পারে না যাও—

এই রাগটুকু দেখতে কেন যেন অমল দাসের ভাল লাগল। বৃন্দাদা চলে যাবার পর থেকেই কেন যে অমলের দু'চোখ থেকে থেকে ওর দিকে ফেরে ঠিক বুঝে ওঠে না। কিন্তু মেয়েছেলেকে আর এই জীবনে আমল দেবে না ও—বৃন্দাদা অসময়ে চলে গেল, ওরাই যত সর্বনাশের মূল। অতসীকে ওই বুড়ো হাঙরের কাছেই দিয়ে আসবে, তাতে মোটা কিছু টাকাও হাতে আসবে। তারপর এই কাজে ইস্তাফা দেবে।

অতএব অতসীকে না রাগিয়ে একটু ভেবে চিন্তে আপোসের সুরে বলল, ঠিক আছে ওই পাঁচশ' থেকে আড়াইশ' টাকা আমাকে দে, অর্ধেক তোর অর্ধেক আমার—

অতসী জবাব দিল, সবটাই তোমার সবটাই আমার।

বিরক্ত হয়ে অমল চোখ পাকাল, তোর মতলবখানা কি শুনি?

পাল্টা ঝাঁঝে অতসী বলে উঠল, ছোটলোকের মত আর তুই-তোকারি করবে না বলে দিলাম। কোপের মুখেই হাসল আবার—মতলব ভাল, টাকার কথাই ভাবছিলাম দু'দিন ধরে, ভগবান জুটিয়ে দিলেন—তোমার বৃন্দাদার মত ওই সব জঘন্য কাজ আর তোমার করা হবে না—ওই মোড়ের মাথায় একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান দাও —আমি তোমাকে পান সাজা শিখিয়ে দেব, আর ফাঁক মত নিজেও দোকানে বসব। ফিক করে হাসল আবার, দোকানে সব পান খাওয়ার হিড়িক দেখবে তখন—

অমল দাস তার অবাধ্য চোখ দুটোকে জোর করেই শাসনের গাম্ভীর্যে টেনে আনল। —তারপর?

তারপর নয় তার আগে—তার আগে বিয়ে।

অমল দাস জোর দিয়েই ঝাঁঝিয়ে উঠল, কার সঙ্গে কার বিয়ে?

আমার সঙ্গে শ্রী অমলচন্দ্র দাসের।

অসহিষ্ণু ঝাঁঝে একটা প্রলোভন থেকে নিজেকে ছিনিয়ে আনতে চাইল অমল দাস। ক্রুদ্ধ মুখে বলল আমাকে ওই ফাঁদে পা দেবার মত আহাম্মক পেয়েছিস? বৃন্দাদা অকালে চলে গেল তোদের জন্যে—মেয়েগুলোর জন্যেই সকলে মরে বুঝলি? আমি ওর মধ্যে নেই।

অতসী তার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। নির্লিপ্ত মুখ। জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মালিক চৌধুরীমশাইয়ের বয়েস কত?

সঠিক না বুঝেই অমল জবাব দিল বাহাত্তর ছাড়িয়েছে।

আর তোমার বৃন্দাদা কত বছর বয়সে গেল?

চল্লিশের আগে।

তাহলে?

কি তাহলে?

অতসী আরো গম্ভীর জবাব দিল, তাহলে প্রমাণ হল তুমি একটি পয়লা নম্বরের গবেট। মেয়েদের জন্যে মরলে চৌধুরীমশাই আরো তিরিশ বছর আগে মরে ভূত হয়ে যেত—মেয়েদের জন্যে কেউ মরে না, অন্যের জন্য মেয়েদের যাদের তাড়া করে বেড়াতে হয় তারাই শুধু মরে।

অমল দাস হাঁ করে শুনল। তারপর হঠাৎই যেন কিছু তত্ত্বজ্ঞান লাভ হল তার। প্রশংসা-ভরা চোখে জ্ঞানদাত্রীটির দিকে চেয়ে রইল সে।

অতসী মেঝেতে বসেই ছিল তেমনি। এক লাফে এগিয়ে এসে তাকে আচমকা জাপটে ধরে মেঝের ওপরেই গড়াগড়ি খেতে লাগল অমল দাস।

পথচিত্র

আমার ভাল লাগে। পথে নেমে নিঃশব্দে আমি জীবন-চিত্র দেখি। জীবনের মিছিল দেখি। কেউ আমাকে কিছু দেখায় না। চলমান মানুষগুলো নিজেরা আপনা থেকে এক একটা চিত্র হয়ে আমার সামনে আসে আবার দূরে চলে যায়।

কোন কাজ না থাকলে আমি পথে নেমে আসি। নিরুদ্দিষ্টের মত হাঁটতে থাকি এক-একটা দিক ধরে। খেয়ালখুশি মত কখনো কোন ট্রামে উঠে পড়ি কখনো বা বাসে। কেউ বুঝতে পারে না আমি একজন বেকার দর্শক মাত্র। দেখাটা আমার নেশা।

দেখে দেখে মনে হয় প্রতিটি মানুষের ভিতরে যেন একটা করে সংকল্পের মোটর বসানো। সেই মোটরের দম-মাফিক তাদের ওঠা বসা চলা ফেরা কাঁদা হাসা। মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আমি তাদের ভিতরের সঙ্কল্পটি আঁচ করতে চেষ্টা করি। ঠিক হয় কিনা আমি জানি না। কিন্তু ভাল লাগে। বিশ্বাস, ঠিকও হয়।

বাসের গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে একসঙ্গে পাঁচ সাতটা মুখ আমার মুখের ওপর চড়াও হতে দেখেছি। আমার সামনের আসনে-বসা লোকটা উসখুস করছে। নেবে যাবার জন্য সে এক্ষুনি উঠে দাঁড়াবে মনে হয়। আমার চারদিকের লোকগুলোর জোড়া জোড়া চোখ আমারই মুখের ওপর আটকে আছে কেন তক্ষুনি বোঝা গেল। যে লোকটার সীট ছেড়ে ওঠার সম্ভাবনা তার একেবারে সামনেই আমি। অর্থাৎ সে উঠলে আমারই ওই সীটটা দখলের সম্ভাবনা।

বসা লোকটা উঠল ঠিকই। সেই মুহূর্তে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যমনস্কের মত আর এক দিকে মুখ ফিরিয়ে আছি। তক্ষুনি হুটোপুটি কাণ্ড বেধে গেল আমার দু'পাশে। ওই অন্যমনস্কতার ফাঁকে দুদিকের লোকই সেই খালি সীটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

...ট্রামে বসে আছি। বরাতক্রমে জানালার ধারের সীটটাই আমার দখলে। আমার পাশে যে আধবয়সী লোকটি বসে আছে সে কেন যেন ফিরে ফিরে আমার দিকেই তাকাচ্ছে। প্রথমে খেয়াল করিনি। একটু বাদেই করলাম। আমার পথচিত্র দেখার ঝোঁকটা সে ধরতে পারেনি। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি দেখে ভাবছে এক্ষুনি হয়তো নেমে যাব

আমি। উঠে দাঁড়ালেই সে জানালার ধারটার দখল নেবার জন্য প্রস্তুত।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যি মিথ্যে যাচাইয়ের জন্য উসখুস করে উঠল ভিতরটা। আধা-আধি উঠে কোমর বেঁকিয়ে একবার নিচের দিকে ঝুঁকলাম। সাগ্রহে পাশের লোক সেই বসা-অবস্থাতেই সাঁ করে জানালার ধারে সরে গিয়ে পা তুলে আমাকে বেরুবার জায়গা করে দিল। কিন্তু ওইরকম আধাআধি উঠে আসলে আমি কি করছিলাম? হাতের টিকিট মাটিতে ফেলে ঝুঁকে সেটাই আবার কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম। সেটা হাতে নিয়ে অবাক মুখ করে লোকটির দিকে তাকাতে সে তার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত।

সরি!

ঠিক আছে, বসুন বসুন।

জানালার ধার ছেড়ে দিয়ে আমি তার পাশে বসেছি।

...ময়দানের নিরিবিলি ধারটা দিয়ে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে চলেছে। ছেলেটার বয়েস সাতাশ-আটাশ আর মেয়েটার বড় জোর উনিশ। তেমন সুশ্রী নয় আবার তেমন কুরূপাও নয় মেয়েটা। হাত মুখ নেড়ে কথা বলতে বলতে চলেছে। কিন্তু আমার মনে হল তার সঙ্গীটি কথা যত না শুনছে তার থেকে দেখছে ঢের বেশী। তার একখানা হাত মেয়েটার কাঁধের ওপর। সেই হাত পিঠ বেয়ে মাঝে মাঝে মেয়েটার কোমরের দিকে নেমে আসছে। হাত বিশেক পিছনে চলেছি আমি। মেয়েটা পলকের সন্দিগ্ধ চোখে ঘাড় বাঁকিয়ে সঙ্গীর মুখখানা দেখে নিল একবার। সঙ্গীর হাত তক্ষুনি ওর কাধের দিকে উঠে গেল। আর পিছনে ফিরে একবার দেখেও নিল।

আমার মন বলছে তেমন অভিজ্ঞ নয় মেয়েটা। অনেকটা সরল বিশ্বাসেই সঙ্গীর পাশে চলেছে। আর মনে হল, ওই পাশের লোকটা নিরাপদ গোছের নির্জনতা খুঁজছে একটু। সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হয়ে এসেছে। ওরা এগিয়ে চলেছে। একটু বাদেই আর দেখা গেল না ওদের।

আমি মাঠেই এক জায়গায় বসে পড়লাম।

আধঘন্টার মধ্যেই প্রত্যাশিত নাটক দেখলাম। অন্ধকার ফুঁড়ে হনহন করে কেউ একজন এদিকে আসছে। প্রায় ছুটেই আসছে যেন। আমিও অন্ধকার বিদীর্ণ করে দেখছি। একটা মেয়েই। সেই মেয়ে। কেউ যেন ওকে তাড়া করেছে। ও পালাচ্ছে।

আমি ভুইফোড়ের মত সামনে উঠে দাড়ালাম। মেয়েটা আঁতকে উঠল।

বললাম, ভয় পেও না, দাড়াও—তোমার পিছনের ওই লোক এসে গেছে, এভাবে পালিয়ে পার পাবে না।

বলতে বলতে লোকটা এসে গেল। সেই লোক। দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না ভাবছিল। অস্ফুট গর্জনে একটা কটূক্তি করে উঠে আমি তেড়ে যেতেই সে ত্রস্ত কুকুরের মত ছুটে পালাল। আমি মেয়েটাকে বললাম, এবার যাও, আর সন্ধ্যায় হাওয়া খেতে এসো না।

অন্ধকারে আমিও পা চালিয়ে দিলাম।

...বাসের ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে সেই লোকটার মুখের দিকে আমার চোখ আটকাল কেন জানি না। বেশ ফিটফাট চেহারা। পরনে চকচকে প্যান্ট ঝকঝকে শার্ট।

মুখে দু-চারটে বসন্তের দাগ। বছর চব্বিশ-পঁচিশ বয়েস। সে আমাকে দেখছে না। তার চোখ আশ-পাশের মানুষদের উপর চক্কর খাচ্ছে। এই চিত্র যেন আমার ষষ্ঠ চেতনার ওপর আঘাত দিল একটা। মন বলল, লোকটা নিঃশব্দে অপরের পকেটের সন্ধানে আছে।

মিনিট কতকের জন্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ এক ভদ্রলোক চেঁচামেচি করে উঠল। তার পকেট থেকে মানিব্যাগ খোয়া গেছে। একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। আশপাশের সকলকেই সন্দেহ করছে ভদ্রলোক। আমি দেখলাম সেই লোকটি তখন বেশ দূরে দাঁড়িয়ে—অনেকটা সামনে এগিয়ে গেছে। আর নিস্পৃহ মুখে ঘাড় ফিরিয়ে একটা দৃশ্য দেখছে যেন।

কপাল ঠুকে একটা কাণ্ড করে বসলাম। টাকা যার খোয়া গেছে তার গা টিপে ওই লোকটাকে দেখিয়ে দিলাম। সে ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরল। লোকটা পাল্টা হুমকি দিয়ে উঠল, কিন্তু মুখখানা আমসি। আরো দু'চারজন উৎসাহী লোক তাকে ছেকে ধরে কোমরে হাত দিতেই ব্যাগ বেরুল। তারপর বহুজনের সে কি নৃশংস উল্লাস।

এই থেকেই নিজের ওপর একটা দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেছল। আমি পথচিত্র দেখি। আর তাই থেকে মানুষের ভিতরের চিত্রটাও স্পষ্ট দেখি।

সেদিন...

বেলা তখন তিনটে হবে। একটা পরিচিত ছোট রাস্তা ধরে আসছিলাম। উদ্দেশ্য মোড়ের ওই দোকান থেকে পান খাব। আমি ওই বিশেষ দোকানের খদ্দের। বলতে গেলে এ পাড়াতেই খানিক দূরে বাসা আমার। ওই অল্পবয়সী পানঅলাটাকে খুব পছন্দ আমার। দেশ উড়িষ্যায়। এখন বাঙালীই হয়ে গেছে। সব সময় মিষ্টি মিষ্টি হাসে, পান-সাজার ফাঁকে শরীর কেমন আছে না আছে খবর নেয়। মজাদার টাটকা খবর কিছু থাকলে তাও বলে ফেলে।

গজ বিশেক এ-ধারেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। সামনে কিসের জটলা একটা। একজন মহিলা—বছর পয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে বয়সে, ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর চারদিক থেকে তাকে ঘিরে অনেকে অনেক রকমের কথা বলছে। কেউ কেউ এটা সেটা জেরা করছে মহিলাকে, কিন্তু উদগত কান্না চেপে মহিলা জবাব দিয়ে উঠতে পারছে না। হাত তুলে সামনের গলিটা দেখিয়ে দিচ্ছে কেবল।

আমিও দাড়িয়ে গেছি। সমাচার যা শুনলাম তার সারমর্ম, মহিলা আজ সকালেই তার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে পঁচাত্তরটি টাকা স্বামীর চিকিৎসার জন্য ধার করে এনেছে। স্বামী একেবারে শয্যাশায়ী। ঘরে আর এক কপর্দকও নেই। ওই টাকায় স্বামীর জন্য ওষুধ আসবে আর তার বুকের এক্স-রে হবে। মহিলা আগে ওষুধটা কিনে নিয়ে বাড়ি যাবে ঠিক করে এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে একটা লোক ছোঁ মেরে তার হাতের ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে ওই গলিতে সেঁধিয়ে গেছে। মহিলা বুক চাপড়ে কেঁদে উঠেছে। কিন্তু গলির ভিতর দিয়ে লোকটা কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে ঠিক কি।

আমি দেখছি। মহিলাকে ঘিরে লোকের সংখ্যা এখন কম করে তিরিশজন। নানা বয়সের লোক। চেনা মুখও আছে এর মধ্যে অনেক। মহিলার দিকে তাকালাম আমি।

কান্না থামেনি তখনো। তাব হাতে প্রেসকৃপশনটা আছে শুধু।...এক কালে সুন্দবীই ছিল মনে হয। অনটনেব হাডকাঠে পড়ে সে-সৌন্দর্য গেছে বোঝা যায। কাঁদছে আব অসহায চোখে চাবদিকে তাকাচ্ছে। শোকে আব উত্তেজনায হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। ঈষৎ স্রস্ত বসনেব ওধাবে ওই বুকেব ওঠা-নামা দেখছে কেউ কেউ। কেউ পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিযে নিচ্ছে। কেউ বা জেবা কবে কবে ছিনতাইযেব আবো সঠিক হদিশ পেতে চেষ্টা কবছে।

আমি দেখছি একটা শোক আব হতাশা যেন মহিলাব দু'চোখ দিযে ঠেলে বেরুচ্ছে। ঘবে রুগ্ন স্বামী নিশ্চয তাব প্রতীক্ষায বসে আছে। কিন্তু সে ঘবে যাবে কোন মুখ নিযে?

এ পাড়ায এ বকম হামলা সন্ধ্যায বা বাতে আবো হযে গেছে। এখন দিন-মানেও এই উপদ্রব শুরু হযেছে। লোকচবিত্র বা পথচিত্র দেখে যদি কোন অভিজ্ঞতা হযে থাকে তাহলে আমাব ধাবণা মহিলাব এত বড ক্ষতিটা পূবণ কবে দেওযা সম্ভব। কিন্তু কোন একজনেব প্রথম এগিযে আসা দবকাব।

পকেটে হাত দিযে দেখলাম দুটো দশ টাকাব নোট আছে। কযেক মুহূর্তেব দ্বিধা কাটিযে আমিই এগিযে গেলাম। গোল হযে যাবা ঘিবে আছে মহিলাকে এবং নানা দিক থেকে নানাভাবে দেখছে, তাদেব সক্কলকে উদ্দেশ্য কবে বললাম, ছিনতাই ঠেকাতে পাবছি না, দিনে দুপুবে এই কাণ্ড—এ আমাদেব দোষ, আমাদেব পাডাব দুর্নাম। এই আমি কুড়িটাকা দিলাম, আপনাবা যে যা পাবেন দিযে মহিলাকে এই বিপদ থেকে বক্ষা কবুন।

নিন ধবুন।

মহিলা থমকে তাকাল আমাব দিকে। দু'গালে তখনো জলেব দাগ। কি কববে ভেবে পেল না।

ধবুন, ধবুন। এটা লজ্জা কবাব সময নয—দোষ আপনাব নয, দোষ আমাদেব। নোট দুটো হাতে গুঁজেই দিলাম একবকম।

আব একজন দেখলাম পকেট থেকে মানিব্যাগ বাব কবছে।

নাযকেব ভূমিকা নেবাব পব আব দাঁড়িযে থাকাব মানে হয না। এক-আধজন আবাব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য কবছে আমাকে।

কিন্তু বেশিবভাগ লোকেবই পকেটে হাত ঢুকছে দেখলাম। পথচিত্র দেখে অভ্যস্ত এই দুটো চোখ আগেই আঁচ কবেছিল এ বকম হবে।

সবে এসে পানেব দোকানেব সামনে সবে দাঁড়িযেছি। বছব চল্লিশ বিযাল্লিশেব একটি লোক সেখানে দাঁড়িযে মিটিমিটি হাসছে আব হুস হুস কবে সিগাবেট টানছে। আমাকে দেখেই একটা চোখ ছোট কবে আব সেই বকমই হেসে পবিচিতেব মতই জিজ্ঞাসা কবল, কি মশাই, টাকা দিযে এলেন নাকি?

সঠিক না বুঝে আমি বললাম, হ্যাঁ।

লোকটা ফিক ফিক কবে আবো বেশি হাসতে লাগল আব সেই সঙ্গে জোবে দু'তিনটে টান মাবল সিগাবেটে। ধোঁযা ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞাসা কবল, কেন দিলেন, সুন্দব মুখেব বিলাপটুকু পছন্দ হল?

আমি রুষ্ট-নেত্রে তাকালাম তার দিকে।—ভদ্রমহিলা এ-রকম বিপদে পড়েছেন, এসব কি বলছেন আপনি।

আরো বিচ্ছিরি করে হাসল লোকটা। বলল, ভদ্রমহিলা বিপদে পড়লে আপনাদের দরদ উথলে ওঠে, না? আর সুন্দর মুখ হলে তো কথাই নেই—কোন ভদ্রলোক ও-রকম বিপদে পড়লে ফিরে তাকাতেন?

আমি বললাম, শাট আপ, ভদ্রলোকের মত কথা বলুন, ওই মহিলা কি রকম বিপদে পড়েছেন আপনি জানেন?

হাসছে তখনো।—জানি বইকি, অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার টাকা ছিল ব্যাগে—সেই ব্যাগ ছিনতাই হয়েছে, এই তো?

আমি থমকে গেলাম।—ওই মহিলাকে আপনি চেনেন?

চিনি বইকি। আরো বেশি হাসতে লাগল।—ওই দেখুন আরো কত জনে টাকা পয়সা দিচ্ছে, ওয়াণ্ডারফুল।

ফিরে তাকালাম একবার। পানঅলাটা কি যেন ইশারা করছে আমাকে।

আমার ওর দিকে তাকাবার সময় নেই। রূঢ় স্বরে সামনের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কতটা চেনেন আর কি জানেন?

মুচকি হেসে সে জবাব দিল, এমনও হতে পারে ওই মহিলার সেই অসুস্থ স্বামীর সঙ্গেই আপনি দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। থ্যাংকস ফর দি চ্যারিটি—

দ্রুত চলে গেল লোকটা।

আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। পানঅলা আমাকে বাবু বলে হাঁক দিল। কিন্তু আমি সে ডাকে কর্ণপাত না করে ওই মহিলার দিকেই ছুটে গেলাম। রাগের মাথায় এক থাবা মেরে মহিলার হাত থেকে টাকা পয়সা সব মাটিতে ফেলে দিলাম। চিৎকার করে বলে উঠলাম, মশাইরা, কেউ এক পয়সাও দেবেন না, সব জোচ্চুরি,সব মিথ্যে। মহিলা হতভম্ব মুখে চেয়ে রইল আমার দিকে। যারা চারপাশে ছিল তখনো তারাও চিত্রার্পিত।

হাতে একটা টান পড়তে চেয়ে দেখি ওই পানঅলা টানছে আমাকে। ছুটে এসে হাঁপাচ্ছে সে। বলছে, শুনুন বাবু শুনুন, খুব ভুল হোয়ে গেল—

তিন হাত এদিকে টেনে এনে সে আমাকে বলল, ওই পাগলের কথা শুনে আপনি কি করছেন বাবু।

পাগল।

হ্যাঁ পাগল। দু'বছর আগে ওর বউ অন্য লোকের সঙ্গে ভেগে গেছে। তারপর থেকে একটু ভাল চেহারার কোন মেয়েছেলে দেখলেই বলে তার বউ।

আমি বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। ওদিকে লোকগুলোর মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হর-হর করছে। আমি তাড়াতাড়ি এসে ছড়ানো ছিটনো টাকা পয়সাগুলো রাস্তা থেকে কুড়োতে লাগলাম। অনেকে একসঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়ল, কি হয়েছে মশাই, কি হয়েছে?

আমি জবাব দিলাম, কিছু না মশাইরা, আমার মস্ত বড় একটা ভুল হয়েছে। সবিনয়ে আবার সেই টাকা পয়সা মহিলার সামনে ধরলাম, বললাম, অপরাধ নেবেন

না, নিন। মহিলা হাত বাড়িয়ে নিল। কিন্তু সেই সঙ্গে জ্বলন্ত চোখে আমার মুখটা একপ্রস্থ দগ্ধ করল।

এখনো আত্মবিস্মৃত তন্ময়তায় আমি পথচিত্র দেখে যাই। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আর কখনো নিঃসংশয় হতে পারি না।

বোরখা

নায়ক ছেড়ে এই কাহিনীর লেখকও আমি নই। আমি অনেকটা মুনশীর কাজ করছি। অর্থাৎ, কারো কাছ থেকে শুনে লিখছি। কিন্তু শোনাটা সেকেন্ড-হ্যান্ড নয়, ডাইরেক্ট। এর নায়ক বা নিয়ামক আমাদের কুঞ্জলাল।

আমাদের কুঞ্জলাল বলতে যাঁরা আমাদের সতীর্থ বা সমসাময়িক তাঁরাই চিনবেন। কারণ, কুঞ্জলালকে সেদিন য়ুনিভার্সিটির তো বটেই, আশপাশের কলেজের বহু ছেলেমেয়েও চিনত। প্রণয়ের ব্যাপারে কন্দর্পদেবটি তার বক্ষ-বরাবর একখানি শর উঁচিয়েই ছিলেন। কুঞ্জলালের অবিমিশ্র বাঙালী-প্রীতি আমাদের চক্ষু এবং জঠরগত লাভের কারণ ছিল। তার পয়সায় রেস্টুরেন্টে কত চপ-কাটলেট খেয়েছি, কত ছবি আর খেলা দেখেছি ঠিক নেই।

ইউ. পি-র শেঠেরা টাকা চেনে শুনেছিলাম। ব্যবসা ছাড়া এমনিতেই টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়ায়। তা যদি সত্যি হয়, তাহলে কুঞ্জলাল শেঠ-কুলের কলঙ্ক। সে টাকা গোছাতে জানে না, টাকা ছড়াতে জানে।

তার বাবা মানিকলাল শেঠ লক্ষ্ণৌয়ের নাম-করা চিকন কাপড়ের কারবারী। ভদ্রলোকের অনেকগুলো ছেলেপুলে হয়েছিল, কিন্তু একটাও টেঁকেনি। কুঞ্জলালের দু-বছর বয়সের সময় তার মাসি তাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। ছেলে নেই ভাবলে যদি ছেলে থাকে, সেই চেষ্টা করতে তাঁর আপত্তি নেই। এই উপায়টা ছেলের মাসি আর আত্মীয়-পরিজনেরা তাঁর মাথায় ঢুকিয়েছিল। বলা বাহুল্য, যে যোগাযোগেই হোক এই ছেলেটা বেঁচেছে, অন্যথায় এ কাহিনীর সূত্রপাত হত না।

কুঞ্জলাল কলকাতায় ম্যাট্রিক পাস করার পর তার বাবা তাকে কারবারে নিয়ে লাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভয়ে ভয়ে, কারণ তখনো ফাঁড়ার ভয় একেবারে কাটেনি। আই-এ পাস করার পর ছেলেকে নিয়ে যাবার আগ্রহ আর একটু বেড়েছিল, কিন্তু মাসি দেননি। বি-এ পাস করার পর তো রীতিমত বকাবকি করেছিলেন, ছেলের এত বিদ্যে তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। কিন্তু ছেলে নিজেই তখন বেঁকে বসেছে—এম-এ সে পড়বেই। তারপর এই দুই বছরের মধ্যে তাকে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, সত্রাসে লক্ষ্ণৌ থেকে তাঁকেই বার কয়েক কলকাতায় ছুটে আসতে হয়েছে।

একবার যখন বত্রা বোসকে সপ্তাহে সাতদিন,মাসে তিরিশ দিন কুঞ্জলাল মাসির গাড়িতে চড়াতে শুরু করেছিল। মাসির ছোট গাড়িটা সর্বক্ষণ তারই হেপাজতে থাকত।

সে গাড়িতে আমরাও হামেশা চড়তাম, কিন্তু সেটা তেমন কারো চোখে পড়ত না। বড়া বোস চড়লে পড়ত। বেগতিক দেখে মাসি বাপকে খবর দিয়েছিলেন। বাপ বাশভারি লোক, বিচক্ষণ, গম্ভীর প্রকৃতির। অন্যান্য সকলের দেখাদেখি ছেলেও তাকে কম সমীহ করে না। কিন্তু সেই নতুন বয়সের রোমান্সের জট ছাড়াতে ভদ্রলোকটিকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। শেষে মেয়ের বাপের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল তাঁকে। মেয়ের বাপেরও অবস্থা ভালো, কিন্তু কৃষ্ণলাল যে এমন নিরেট অবাঙালী, সেটা তার বাবাকে না দেখা পর্যন্ত ভদ্রলোক অনুমান করতে পারেন নি। একমাসের মধ্যেই তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়ে-জামাই দুজনকেই বিলেতের জাহাজে তুলে দিয়েছেন। মেয়ের বাবার অবস্থা যদিও ভালো, তবু এই খরচের ভারটা কৃষ্ণলালের বাবা বহন করেছেন কিনা, সেই সংশয়ে অনেককে কানাকানি করতে দেখা গেছে। কৃষ্ণলাল আমাদের মতই ফূর্তি করে বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছে, আর বিষণ্ণ মুখে বিলেতগামী জাহাজ সী-অফ করেছে।

এম. এ পড়তে পড়তেই কৃষ্ণলাল দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থবার প্রেমে পড়েছে। এবারও বাঙালী মেয়েই। প্রৌঢ় মানিকলালকে আরও বার কয়েক কলকাতায় ছুটোছুটি করতে হয়েছে। তবে এগুলো প্রথমবারের মত অত জোরাল প্রেম নয়। মানিকলালকে এগুলোর ধকল সামলে উঠতে খুব বেগ পেতে হয়নি। ত্যাজ্যপুত্র করার ভ্রূকুটিতেই ছেলে ঠাণ্ডা হয়েছে।

এই কৃষ্ণলাল একযুগ ধরে আমার সহপাঠী। স্কুল-কলেজ বা যুনিভার্সিটিতে তার মার্কা-মারা সাজ-সজ্জার বদল হয়নি, জামাকাপড়ের মাপ বদলেছে শুধু। চিকনের কারুকার্য-করা পাঞ্জাবির ওপর কুর্তা চাপিয়ে আসত। আমাদের অনেকবার চিকনের জামা-টামা উপহার দিতে চেয়েছে। কিন্তু মনে মনে লোভ থাকলেও আমরা ভরসা করে সেগুলো নিতে পারিনি। বরাবর চিকন পরত বলে ওকে সকলে বলত 'চিকন-বাবু'। আমাদের কি বলবে ঠিক কি!

তাছাড়া আমাদের বেশভূষা চাল-চলনের প্রতি তির্যক দৃষ্টি হানবার মত অভিভাবক ছিলেন বাড়িতে। লুকিয়ে-চুরিয়ে রেস্টুরেন্টে খাওয়া, সিনেমা দেখা, খেলা দেখা চলতে পারে। লুকিয়ে সাজ-সজ্জা চলবে কেমন করে?

এম-এ পাস করার পর তার বাবার করলে পড়ল কৃষ্ণলাল। ওদের সতের পুরুষের মধ্যে কেউ এম-এ পাস করেনি। তাই কৃষ্ণলাল তার বাপের কারবারে টিকে থাকবে এ আমরা একবারও ভাবিনি কৃষ্ণলালও ভাবেনি বোধহয়। লক্ষ্ণৌতে সে একটা বড় চাকরিই বাগিয়ে বসেছিল, শুনেছিলাম। সাতদিন না যেতে চাকরি ছেড়েছিল, তাও কানে এসেছে। কৃষ্ণলাল লিখেছিল, বাংলা দেশে এতকাল থাকলাম, সেখানেই মানুষ হলাম, কিন্তু চাকরি কি করে বরদাস্ত করতে হয় তাই শিখলাম না।

চিঠি-পত্রের যোগাযোগ ক্রমশ স্বাভাবিকভাবেই কমে এসেছে। তারপর স্মৃতিও মুছে গেছে। এমন কি বিশ বছরের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর লক্ষ্ণৌ এসেও কৃষ্ণলালের কথা একটি বার মনে পড়েনি।

নবাবের দেশ, ইতিহাসের দেশ, বিপর্যয়ের দেশে এসে আমি শুধু লেখার রসদ খুঁজে বেড়িয়েছি। আমি যাঁর আশ্রিত তিনি এখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা। ভদ্রলোক ডাক্তার।

সুবসিক। সাইকেল বিক্স আব টাঙ্গায আপদমস্তক কালো বোবখা-ঢাকা মহিলাদেব প্রতি আমাব একটু বিশেষ লক্ষ্য দেখে তিনি অনেকবকম ঠাট্টা-ইশাবা কবেছেন। এমন কি কলকাতায আমাব গৃহিণীকে সাবধান কববেন বলেও শাসিযেছেন।

কিন্তু সত্যিই আমাব বহস্যেব মত লাগত। বোবখা-ঢাকা প্রায মুখগুলোই দেখতে ইচ্ছে কবত। বোবখা জিনিসটাব উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তিব খবব জানি না। এককালে ওটা হযত নিষেধেবই নিদর্শন ছিল। কখনো-সখনো পুরুষ-সন্নিধানে আসতে হলে চোখেব আঁচ ঠেকাবাব উপকবণ ছিল হযত ওটা। কিন্তু এখন অন্তঃপুবিকাদেব পুরুষেব সমান তালে পথে বেবনো নৈমিত্তিক ব্যাপাব। তাই ওটা আব এখন নিষেধেব বস্তু মনে হয না, অঙ্গসজ্জা বলেই মনে হয। সহজ সান্নিধ্যেও নিজেকে আড়ালে বেখে পুরুষ-চেতনা সচেতন বাখাব মত লোভনীয অঙ্গ-সজ্জা। যা দেখলে কৌতূহল জাগে, কল্পনাব জাল বুনতে ইচ্ছে কবে।

সামনে দিযে সেদিন ঝকঝকে একটা প্রাইভেট টাঙ্গায দুজন বোবখা-ঢাকা মহিলা যাচ্ছিলেন। এক নজব তাকালেই অভিজাত মনে হয। আমি কত নজব তাকিযেছিলাম বলতে পাবব না। টাঙ্গা দৃষ্টিব বাইবে চলে যেতে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কবলাম, আপনাদেব এই বোবখা-পবা মেযেবা প্রায সবাই কি অপরূপ সুন্দবী?

সঙ্গী জবাব দিলেন, সুন্দবী অনেক আছে, কিন্তু প্রায সবাই কেন হবে? কেন বলুন তো?

—আমাব তো প্রায সকলকেই ভাবি সুন্দবী বলে মনে হয। হাতেব আব পাযেব যতটুকু দেখা যায ফুটফুট কবছে—

সঙ্গী ঠাট্টা কবলেন, সকলকেই যেন চাঁদে ধোযা, কেমন?

—তাই তো। দেখতে ইচ্ছে কবে.

—আচ্ছা, আপনাকে চেষ্টা কবব দু-চাবটে দেখাতে। তাবপব আব দেখতে ইচ্ছে কববে না—এতদিন ধবে এখানে ডাক্তাবী কবছি, দু-চাবটে ছেড়ে দু-চাবশ দেখেছি বোধহয। প্রথম প্রথম ওই হাত দেখে আব পা দেখে আপনাব মতই খুব দেখতে ইচ্ছে কবত। মাথা ধবাব ওষুধ নিতে এলেও, চোখ দেখা আব জিভ দেখাব নাম কবে কম দেখতাম না। এখন আব একটুও দেখতে ইচ্ছে কবে না।

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কবতে হল না, বিস্ময লক্ষ্য কবেই ভদ্রলোক হা-হা কবে হেসে উঠলেন।—আবে মশাই, এটা বঙেব যুগ, ভুলে যান কেন? মনে বঙ এলে বাজাবেব বঙ ঘবে আসতে কতক্ষণ। কত সুবিধে বলুন তো, শুধু হাত দুখানা আব পা দুখানা বঙ-পালিশ কবে নিলেই হল। আব নিখুঁতভাবে কবতেও পাবে এবা, হাত দেখলে মনে হবে চাঁপাব কলি, পা দেখে ভাববেন চবণকৌমুদী।

ছন্দপতন। ডাক্তাব হলেই কি এমন বেবসিক হতে হয। আমাব সৌন্দর্য কল্পনাব জালটা একেবাবে ছিন্নভিন্ন হযে গেল। এই জাল নিযে এবপব কোনো সত্যিকাবেব সুন্দবীকেও ছেঁকে তোলা শক্ত।

এবাবে কুঞ্জব কথা বলি। অর্থাৎ কুঞ্জলালেব কথা। গৃহিণীব জন্য একখানা চিকন শাড়ি নিযে যাব বলে এক মস্ত দোকানে ঢুকে পড়েছি। মাঝে বিশটা বছবেব

ব্যবধান—লক্ষ্ণৌযে এসেছি, চিকন শাড়ি কিনব বলে এসেছি—তখনো কুঞ্জলালেব কথা একটি বাব মনেও পড়েনি। সামনেব গদিব বৃদ্ধটি পবম সৌজন্যে আহবান জানালেন, আইযে—'

ভিতবেব মস্ত ফবাসে বড কাঠেব ক্যাশ-বাক্সব সামনে বসে যে লোকটি, সেও সবিনয আপ্যাযন জানাতে গিযে মুখেব দিকে চেযে হঠাৎ থমকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। দুজনেব এই থমকানি থেকেই সংশয দূব হযে গেল। কুঞ্জলাল ক্যাশ-বাক্স টপকে দুহাতে আমাকে জাপটে ধবে দু-চাব ঝাঁকানিব পবেই এমন একটা কাণ্ড কবে বসল, যা দেখে দোকানেব কর্মচাবীবা আব অন্যান্য ক্রেতাবা হা। আমাব শবীবেব ভাবও নেহাত কম নয, ফলে আমাকে নিযে ফবাসেব উপবেই একপ্রস্থ গড়াগড়ি। পবে দম নিতে নিতে বলল, তুই একটা ইডিযট, তুই একটা বাবিশ, কতকাল পবে দেখলাম বে তোকে! তুই একটা জেম! পাকাপোক্ত লেখক বনে গেছিস একেবাবে—অ্যাঁ? ...চোখ পাকাল, তোব বইযেব বিজ্ঞাপন দেখলেই আমি কিনে ফেলি সে-খবব বাখিস? থাকিস কোন চুলোয? প্রথম বই পড়ে দশ বছব আগে একটা চিঠি লিখেছিলাম —নো বিপ্লাই। উঃ, তোকে এখন খুন কবতে ইচ্ছে কবছে আমাব—

সকলেব অগোচবে তাব হাতেব কাছ থেকে একটু সবে বসে হাসতে লাগলাম। কর্মচাবীবা বা ক্রেতাবা বাংলা না বুঝলেও উচ্ছ্বাস বুঝল। সামনেব বৃদ্ধটি ঘাড় ঘিবিযে দেখছেন আব হাসছেন মিটিমিটি। কুঞ্জলালেব বাবা মানিকলাল নন, তাঁকে আমি কলকাতায দেখেছি।

আজকেব মত কুঞ্জলালেব দোকানে বসা হযে গেল—আমাব চিকন শাড়ি কেনাও। আমাকে নিযে উঠে পড়ল। বৃদ্ধটিকে বলল, কাকাজী, আমাব পুবনো বন্ধু এসেছে —একসঙ্গে দশ বছব পড়েছি আমবা—আমি এখন দোকানে থাকছি না।

তাবপব কযেকটা দিন কুঞ্জলালেব সঙ্গেই বেশিব ভাগ সময কেটেছে। কুঞ্জলাল বিযে-থা কবেছে, ছেলেপুলে আছে। না, বাঙালী মেযে নয, স্বজাতিকেই বিযে কবেছে। তাব বাবা বছব তিন-চাব হল মাবা গেছেন। এতবড কাববাবেব সে-ই মালিক এখন।

এই সাক্ষাতেব ফলে আমাব কলকাতায ফেবাই দিন কতক পিছিযে গেল। সকালেব দিকে তাব আড়তে বসে কথাবার্তা গল্প-গুজব হয। মস্ত আড়ত। চিকনেব কাবিগববা সব এখানেই আসে। পাবিশ্রমিক নেয, অর্ডাব-পত্র নেয। মেযে-পুরুষ দুই বকমেব কাবিগবই আছে। এব মধ্যে বর্ষীযসী কযেকটি বমণীব বোবখাব সামনেব দিকটা ঘোমটাব মত কবে তোলা। অল্পবযস্কা আপাদ-মস্তক বোবখা-ঢাকা কযেকটি মেযেকেও দেখলাম। কাবো হাত-পা তেমনি ফুটফুটে ফর্সা। কিন্তু ডাক্তাব বন্ধু আমাব রূপাভিসাব কল্পনাব ঝোঁকটা বিধ্বস্ত কবে দিযেছেন। এদেব হাত-পাযেব দিকে চেযে আমি এখন উল্টে আসল বঙ আবিষ্কাব কবতে চেষ্টা কবি।

কাবিগবদেব কাছে কুঞ্জলাল মনিব কড়া দেখলাম। কাজ মনেব মত না হলে কড় কথা মুখে আটকায না—তা সে মেযে হোক, বা পুরুষ হোক। তবে কাজেব হাত যাদেব ভালো, তাদেব সে অবজ্ঞা কবে বলে মনে হল না। কিন্তু অন্যেবা তটস্থ তাব সামনে।

সেদিনও তার আড়তে এসে দেখি, বোরখা-পরা একটি মেয়ে বসে। আগেও দেখেছি, কিন্তু দেখার মত নয়। অর্থাৎ, হাত আর পা শ্যামবর্ণ। তবে বেশ স্বাস্থ্যবতী মনে হয়। মেয়েটি স্থির বসে আছে, আর কুঞ্জলাল তার সামনে ঝুঁকে বসে সাগ্রহে কতকগুলো অর্ডার বুঝিয়ে দিচ্ছে। রাজা-মহারাজার ঘরের অর্ডার, এর দায়দায়িত্ব এবং মুনাফা, সবই বেশি।

মেয়েটি মাঝে মাঝে সায় দিয়ে অস্ফুট স্বরে বলছে, জী—।

অর্থাৎ, যা তাকে বোঝানো হচ্ছে, সে বুঝতে পারছে। কিন্তু ওইটুকু থেকেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর ভারি মিষ্টি মনে হল আমার। অর্ডারগুলো গুছিয়ে নিয়ে আমাদের দুজনের উদ্দেশ্যেই বিনীত অভিবাদন জানিয়ে মেয়েটি শান্ত পায়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কোনো কারিগরের প্রতি কুঞ্জলালের এতটা সম্ভ্রমপূর্ণ মিষ্টি ব্যবহার আর দেখিনি। মেয়েটি চলে যাবার পরেও কুঞ্জলালকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাল যেন। একটু বাদে আমাকে বলল, এই মেয়েটি আমার কারবারের সব থেকে সেরা কারিগর, মাস গেলে কম করে পাঁচ-ছশ' টাকা রোজগার করে। সী ইজ এ স্কীল আর্টিস্ট।

এত ভালোর কদর হতেই পারে। কিন্তু কুঞ্জলালের হাব-ভাব আমার কেমন যেন লাগল—এর সবটুকুই ব্যবসায়সুলভ মনে হচ্ছে না। প্রশংসাটুকু একটু যেন আবেগ-মেশান। অথচ মেয়েটি তো চোখে পড়া বা মনে ধরার মত কিছু নয়। তার ওই হাত আর পায়ের আভাসের ওপর সাদাটে গোলাপী রঙ চড়ালে বরং চোখে অন্য রকম লাগতে পারত।

কি মনে হতে কুঞ্জলাল নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। সাগ্রহে বলল, তুই তো লেখক বনে গেছিস—একটা গল্প শুনবি? এ লাইফ?

আমি শঙ্কা বোধ করলাম। কুঞ্জলাল বিয়ে করেছে, ছেলেপুলের বাপ, বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে—কিন্তু য়ুনিভার্সিটির সেই রোগ এখনও আছে নাকি!

কুঞ্জলাল আমার মুখের দিকে চেয়েই মনের কথাটা বুঝল বোধহয়। বলল, তুমি যা ভাবছ বন্ধু, তা নয়—মেয়েটিকে আমি আজ পর্যন্ত চোখেও দেখিনি।

কুঞ্জলাল গল্প শুনিয়েছে। গল্পটা ভোলা সম্ভব নয়। শোনার পর মনে হয়েছে, না শুনলে লক্ষ্মী আসা আমার ব্যর্থ হত।

বাপ বেঁচে থাকতেই কুঞ্জলাল কারবারের সমস্ত ভার নিজে নিয়েছিল। বাপ মানিকলাল প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। কুঞ্জলাল আর ওই কারিগরকে কারবার দেখতে হত। কুঞ্জলালের আমলে কারবারের অনেক উন্নতিও হয়েছে। সেই সময় ওই মেয়েটি কিছুদিন হয় কাজে লেগেছে। নাম রুমাবাঈ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাতের কাজ, কথামত কাজ দিয়ে যায়—একটা দিনের জন্যেও কথার খেলাপ করে না। কুঞ্জলালের তখন কারবার ফাঁপানোর নেশা, যে ভালো কাজ করবে, যার কাজ দেখে ক্রেতা মুগ্ধ হবে, তাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিতে, বা দ্বিগুণ কাজ দিতে তার আপত্তি নেই। দেখতে দেখতে রুমাবাঈয়ের রোজগার সকলকে ছাড়িয়ে গেল। সব থেকে সেরা অর্ডার নেবার জন্য তারই ডাক পড়ে।

অন্যান্য কারিগররা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল ক্রমশ। তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে লাগল একটু একটু করে। একটু আধটু রটনা শোনা যেতে লাগল। ব্যাপারটা

কাকাজীব চোখেও ঘোবালো ঠেকল কেমন। মেযেটি কপসী মনে হলে আগেই সন্দেহ হত তাঁব, আগেই উতলা হতেন। কিন্তু বটনা কানে আসতে আব স্থিব থাকতে পাবলেন না তিনি। ভাইপোব কলকাতাব কাণ্ডকাবখানা ভালোই জানেন। কপ থাক আব না থাক, কে কোথায মজে ঠিক কি। মেযেটিব হাতেব কাজ ভালো তিনিও স্বীকাব কবেন, কিন্তু বিপদেব সম্ভাবনাটাই আবো বড কবে দেখলেন তিনি। শুধু কাজ ভালো হলেই এত কদব হয না—ভালো কাজ কবে এমন বযস্ক অভিজ্ঞ কাবিগবও তো আছে।

ব্যাপাবটা অগ্রজ, অর্থাৎ মানিকলালকে জানানো কর্তব্য বোধ কবলেন তিনি। জানালেন। শুনেই মানিকলাল ত্রাসে অস্থিব। ছেলেব বিযে-থা দিযে তাব নতুন বযসেব বোগটাব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি। সেইদিনই কুমাবাঈকে আডতে ডেকে পাঠালেন। শুধু কাকাজী আছেন তাঁব সঙ্গে, আব কেউ না।

কুমাবাঈ এল। হিসেব-পত্র কবাই ছিল। মানিকলাল তাব পাওনা-গণ্ডা মিটিযে দিলেন। বললেন, তোমাকে আব প্রযোজন নেই, আব এস না।

কুমাবাঈ স্থিব পাথবেব মত বসে বইল কিছুক্ষণ। মুখ না দেখা গেলেও মুখেব অবস্থা অনুমান কবা কঠিন নয। তাবপব আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কবল, মালিক কি আমাব কাজে কোনো গাফিলতি পেযেছেন?

মানিকলাল বললেন, না, আমাব আব দবকাব নেই।

নবম অথচ স্পষ্ট কবে কুমাবাঈ বলল, কিন্তু আমাব যে বড দবকাব মালিক। হঠাৎ এভাবে কাজ বন্ধ কবে দিলে বড অসুবিধেয পডব—মালিক দযা কবে আব ক'টা দিন সময দিলে—

মানিকলালেব মেজাজ চডেছে। সাফ জবাব দিলেন, আব একদিনও না, অন্য জাযগায কাজ দেখে নাও গে যাও।

কিন্তু কুমাবাঈ উঠল না। তেমনি সবিনযে বলল, মালিক যে কাবণে আমাকে তাডাতে চাইছেন সেটা একেবাবে মিথ্যে। ছোট মালিক কাজ বোঝেন, কাজেব সমঝদাব তিনি, কাজ দেখে খুশী হযেছিলেন বলে আমাব নসীব ফিবেছিল। তিনি শুধু কাজই দেখেছেন, আমাকে কখনও দেখেন নি।

শোনামাত্র মাথায বক্ত চডেছিল মানিকলালেব। তিনি চেঁচিযে উঠেছেন, কি সত্য আব কি মিথ্যে, কে তোমাব কাছে শুনতে চেযেছে? ছোট মালিক কি দেখেছে না দেখেছে কে তোমাব কাছে জানতে চেযেছে? ছোট মালিকেব নাম কে তোমাকে তুলতে বলেছে এখানে? তোমাকে আমাব দবকাব নেই, তুমি চলে যাও, বাস।

কিন্তু কুমাবাঈ তবু গেল না। নিশ্চল মূর্তিব মত আবো খানিকক্ষণ বসেই বইল। তাবপব তেমনি নম্র অথচ দ্বিধাশূন্য স্পষ্ট গলায বলল, মালিক কেন আমাকে তাডাচ্ছেন, আমি তা জানি। ওদেব হিংসা আমিও দেখছি। বটনা যে একটুও সত্যি নয, আমি যদি তাব প্রমাণ দিতে পাবি, তাহলেও কি মালিক আমাকে বাখতে আপত্তি কববেন?

ওই কথা ক'টি, কণ্ঠস্বব, আব আচবণেব মধ্যেও কিছু বোধহয ছিল। কাকাজী বোবাব মত দাঁডিযে। আব মানিকলালও কৌতূহলে থমকালেন ঈষৎ।

—কি প্রমাণ দেবে?

প্রমাণ রুমাবাঈ মুখে কিছু দিল না। আস্তে আস্তে ঘন কালো বোরখাটা খুলে ফেলল শুধু। খুলে সেটা সরিয়ে রাখল। তারপর মানিকলালের দিকে দুচোখ মেলে তাকাল শুধু।

এতবড় বিস্ময় কাকাজী আর মানিকলালের জীবনে এই প্রথম।

কাকে দেখছেন তাঁরা কিছুই বুঝছেন না। রূপসাধক কোনো শিল্পীর আঁকা যেন —নাক-মুখ-চোখ—সমস্ত নারী-অঙ্গ। জ্যোৎস্নাধোয়া ধপধপে গায়ের রঙ। শুধু হাতের খানিকটা আর পায়ের খানিকটা কালো রঙ করা—বোরখা পরা থাকলে যতটুকুর আভাস পাওয়া সম্ভব ততটুকু।

মানিকলাল আর কাকাজীর চোখে পলক পড়ে না, মুখে কথা সরে না।

রুমাবাঈ তেমনি শান্ত মুখে বলে গেল, যে সন্দেহ করে মালিক আমাকে তাড়াতে চাইছেন, তা সত্যি হলে টাকার জন্যে এ-পথে আসার দরকার হত না বোধহয়—মেহনতী কাজ করতে হত না। তা চাই না বলে হাতে-পায়ে কালো রঙ মেখে সকলের চোখ থেকে নিজেকে আড়ালে রেখে সম্মানের উপার্জনে লেগেছি।

দু-চার কথায় এরপর পিতৃসদৃশ মানিকলাল আর কাকাজীর কাছে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলেছে সে। এই রূপই তার জীবনের সবথেকে বড় অভিশাপ, দুষ্ট লোকে তার নামে কলঙ্ক দিয়ে তার স্বামী কেড়ে নিয়েছে—একটি ছেলে নিয়ে তাকে পথে দাঁড়াতে হয়েছে। সেই ছেলেটিই এখন প্রাণ তার। তাকে সে মানুষ করছে, ভালো জায়গায় রেখে পড়াচ্ছে। তাকে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করলে সেই ছেলে বড় হবে কি করে, মানুষ হবে কি করে? মালিক যেন দয়া করে কাজ থেকে না ছাড়ান তাকে, ছোট মালিক কোনোদিন তার মুখ দেখেন নি, কোনোদিন দেখবেনও না।

কাকাজীর কাছে কুঞ্জলাল এ-সব শুনেছে বাবার মৃত্যুরও অনেক পরে। শুনেছিল, কারণ কুঞ্জলালই একবার তাকে কাজ থেকে জবাব দেবে স্থির করেছিল। যে মেয়ের কাজে কখনো কোনো ত্রুটি দেখেনি, তারই কাজে পর পর অনেকদিন গাফিলতি দেখেছে। সময়ে কাজ নেয়নি, সময়ে কাজ দেয়নি, যাও দিয়েছে তাও মনোমত হয় নি। কুঞ্জলাল ভেবেছিল, রোজগারের দেমাকে এই অধঃপতন। তার ওপর একটা বড় কাজের জন্য দু তিনবার তার কাছে কর্মচারী পাঠাতে সে বলে পাঠিয়েছিল, এখন অসুবিধের মধ্যে আছে ভারি কাজ নেওয়া এ সময়ে তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কুঞ্জলাল তেতে ছিল, এইবার আগুন হয়ে উঠল। তাছাড়া মেয়েটার চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করার লোকও সর্বদাই আছে। কর্মচারীদের অনেকেই ঠাট্টা করেছে, নাগর জুটেছে বোধহয়, এখন ভারি কাজ নিয়ে সময় নষ্ট করবে কেমন করে।

কুঞ্জলাল মেয়েটিকে জবাব দেবে স্থির করেছে শুনে কাকাজী তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, তার ছেলের খুব অসুখ—আমাকে সে জানিয়েছে।

কুঞ্জলাল সে-কথা কানে তোলেনি। আবার ছেলেও আছে শুনে মনে মনে উল্টে সে অশ্লীল কটূক্তি করেছে। ছেলে থাকলেও সুস্থ সামাজিক সন্তান ভাবেনি। আর ছেলের অসুখ, তাও বিশ্বাস করেনি। সে ব্যবসায়ী, ব্যবসা সব কিছুইর আগে— অসুখের বিন্যাস শোনার আগ্রহ তার নেই।

এবপব কুমাবাঈ আবাব একদিন কাজেব জন্য আসতে সে জবাব পাঠাতে যাচ্ছিল, কাজ নেই। কিন্তু কাকাজী আবাব বাধা দিযেছেন। তাকে আড়ালে টেনে নিযে গিযে সেই একদিনেব ঘটনা বলেছেন। শুনে কৃঞ্জলাল কতক্ষণ স্থাণুব মত বসেছিল, ঠিক নেই। ইতিমধ্যে কাকাজী কুমাবাঈকে পবদিন আডতে এসে মালিকেব সঙ্গে দেখা কবে কাজ নিযে যেতে বলে দিযেছেন।

কুমাবাঈ এসেছিল। কৃঞ্জলাল প্রথমেই ছেলে কেমন আছে জিজ্ঞাসা কবেছে। জবাব দেবাব আগে কুমাবাঈ চুপ কবে বসেছিল খানিক। ছেলেব অসুখেব খববটা সে একমাত্র কাকাজীকেই গোপনে দিযেছিল। অস্ফুট শান্ত জবাব দিযেছে, মালিকেব আশীর্বাদে ভালো আছে।

কৃঞ্জলাল আব কিছু জিজ্ঞাসা কবতে পাবেনি। চুপচাপ চেযে চেযে সেই কালো বোবখা আব কালো হাত-পা দেখেছিল। তাবপব নিঃশব্দে কাজ এগিযে দিযেছে।

কুমাবাঈযেব এই কালো বোবখা যেন স্পষ্ট নিষেধ। কিন্তু নিষেধ মানতে চাযনি কৃঞ্জলাল। একদিন ওই বোবখা সবাবাব জন্য অনুনয় কবেছিল। কাকাজীব কাছে সব শুনেছে জানিযে একটিবাব মাত্র তাকে দেখতে চেযেছিল।

কিন্তু ঘন-কালো বোবখাব আড়ালে নিষ্প্রাণ মূর্তিব মতই বুঝি বসেছিল কুমাবাঈ। তাবপব খুব নবম কবে আস্তে আস্তে বলেছে, কথা দিযে সে কখনো কথাব খেলাপ কবেনি—বড মালিককে সে কথা দিযেছিল। ছোট মালিককে সে শ্রদ্ধা কবে, তিনি যদি চান সে বোবখা সবাবে। কিন্তু তাহলে আব তাব কোনোদিন এখানে কাজ নিতে আসা হবে না।

কৃঞ্জলাল তা চায নি।

আরোগ্য

ব্যবস্থা দেখে বাধাবাণী খুশী।

জীবন এখানে যত্নেব জিনিস, লালনেব সামগ্রী। পাযে পাযে ক্ষযেব খোডল হাঁ কবে নেই। এখানে শুধু জীবনেব মূল্যবোধটুকুই স্পষ্ট। চাবদিক শুচিশুভ্র আবাম দিযে ঘেবা। বেশ ঠাণ্ডা নিবাপদ আবাম।

ঘবেব দুই কোণে দুটো তকতকে বেড। এব অর্ধেকেবও অনেক ছোট ঘবে চাবজনে থেকে অভ্যস্ত তাঁবা, ওইটুকুব মধ্যেই একটা গোটা সংসাব। বিবাহিত জীবনেব বাইশ বছবেব মধ্যে এই প্রথম যেন নতুন বাতাসেব স্বাদ পেলেন বাধাবাণী। বাঁচাব আগ্রহ বোধ কবতে লাগলেন, মনেব তলায এক ধবনেব উৎসাহ উকিঝুঁকি দিতে লাগল।

দিনে ছ' টাকা চার্জ। তাও ভৃতনাথবাবু ওপব-ওলাদেব ধবে পড়ে অর্ধেক দক্ষিণায বাজী কবাতে পেবেছেন বলে। নইলে চার্জ বাবো টাকা। কিন্তু দিনে ছ' টাকাই বাধাবাণীব কাছে আঁতকে ওঠাব মত—মাসে একশ' আশী টাকা। তাব ওপব ওষুধ-পত্র ফল-

টলে মাসে কম করে আরো পঞ্চাশ টাকার ধাক্কা—হল দু'শ' তিরিশ। শুনেই রাধারাণী বিগড়ে গিয়েছিলেন। ক'মাস থাকতে হবে কে জানে...। কিন্তু তিনি নিশ্চিত নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছেন দেখেই মুখ কালো করে ভূতনাথবাবু সবাসরি তাঁকে এখানে এনে ফেলেছেন। রাধারাণী সাহস করে আর আপত্তি করতে পারেন নি। মুখ খুললেই কুরুক্ষেত্র বাধবে জানেন, তখন আর ভদ্রলোক রোগিণী বলে রেহাই দেবেন না ওঁকে। ছেলেমেয়ের সামনেও এমন কথা বলে বসেন যে চামড়ার নিচে হাড়-পাঁজরসুদ্ধু খটখটিয়ে ওঠে। কিন্তু এখানে জীবন-রক্ষার উপকরণ দেখে রাধারাণীর মনে হল তাঁদের নেই—নইলে, এর তুলনায় দিনে ছ' টাকা ছেড়ে রাখো টাকাও কিছু নয়।

ও পাশের বেড়ে যে মেয়েটি থাকে তার বছর তিরিশ বয়েস। কিন্তু এরই মধ্যে কঠিন রোগ বাধিয়ে বসেছে। পেটে জল হয়েছে নাকি। দেখতে বেশ সুশ্রী। কিন্তু বড় বেশি রকম অবুঝপনা আর বায়নাক্কা। রোজ চারটে বাজতে না বাজতে মেয়েটির স্বামী দেখতে আসে ওকে—কালো মোটাসোটা, বছর চল্লিশ হবে বয়েস। সচ্ছল অবস্থা বোঝা যায়। রাধারাণী শুনেছেন কাগজের কারবার তাদের। লোকটি রোজই কিছু না কিছু হাতে করে নিয়ে আসে। দুর্মূল্যের ফল, দামী দামী টনিক ফুড, গল্পের বই, শখের ব্লাউস, রুমাল, এমনকি গয়নাও। রাধারাণী দূর থেকে লক্ষ্য করেন, কিছুতে যেন মন ওঠে না মেয়েটার—কোনো কিছুতেই তুষ্ট নয়। লোকটি ঘড়ি ধরে পুরো দু'ঘণ্টাই বসে থাকে তার শয্যার পাশে, স্ত্রীর সব কথাতেই সায় দেয়, সব আক্ষেপে সান্ত্বনা দেয়। দু-তিনদিন অন্তর বছর আটেকের একটি ছেলেও আসে বাপের সঙ্গে মাকে দেখতে। রাধারাণী শুনেছেন, ওই একটিই ছেলে ওদের, পুরনো ঝিয়ের জিম্মায় থাকে, বাড়িতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

রাধারাণী অবাক হয়ে ভাবেন, ছেলেটা রোজ আসে না কেন, আর ওই মা-ই বা ছেলেকে রোজ না দেখে থাকে কি করে। ওদিকে স্বামীটির আসতে আধ মিনিট দেরি হলে আধঘণ্টা তার জের চলতে দেখেছেন রাধারাণী। অনেক অনুনয় অজুহাত সাধ্য-সাধনায়ও সহজে মন গলে না। রাধারাণীর এক একসময় রাগই হয় মেয়েটার ওপর, অত পায় বলেই পাওয়ার ওপর এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। হয় তাঁর ঘরের লোকটির মত, এক দাবড়ানিতে সব ঠাণ্ডা।

যাই হোক, এখানকার এত সব সুব্যবস্থার মধ্যে এসে পড়েও রাধারাণীর মনের তলায় কোথায় যেন যাতনার মত একটু। দু-বেলা খাবার সময় মন বেশ খারাপ হয়। দীর্ঘকালের রক্তাল্পতার রোগী তিনি, হাসপাতালের নির্দেশ অনুযায়ী আহারের রাজসিক ব্যবস্থা। মাছ-মাংসর ছড়াছড়ি। রাধারাণী অর্ধেকও খেয়ে উঠতে পারেন না। এমনি একটুকরো মাছ বাড়িসুদ্ধু লোকের একবেলার বরাদ্দ। এখন খরচের ধাক্কায় তাও জুটছে না নিশ্চয়। মেয়েটা কলেজের আগে ছেলেটাকে সময়মত দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে পারে কিনা তাই সন্দেহ। তার ওপর উঠতে বসতে বাপের বকুনি তো আছেই—বকুনির চোটেই এখন সারা হল বোধ হয় দুটোতে।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের বেডের মেয়েটির কথা মনে হয়, আর তার স্বামীর কথা। অবশ্য সাত তাড়ার মধ্যেও ভূতনাথবাবু প্রায় রোজই একবার করে দেখে যান তাঁকে।

দবকাবী ওষুধ-পত্র সবই কিনে দেন, তাঁবও মিটসেফে ফলমূল থাকে কিছু। কিন্তু সে-সবই কিসেব বিনিময়ে আসছে সেটা রুক্ষ মূর্তিটিব দিকে একবাব তাকালেই বোঝা যায়। ভিতবে ভিতবে গুমবে ওঠেন বাধাবাণী, এতবড অসুস্থতাব চিন্তাটাও মানুষটাব সব থেকে বড চিন্তা নয় যেন, এখানে এসেও দু-দণ্ড হাসিমুখে কথা বলাব নাম নেই। ফলে মেজাজ সব দিন বাধাবাণীবও ঠিক থাকে না, এক কথায় তিন কথা শুনিয়ে দেন। বিশেষ কবে ওই বেডেব মেয়েটিব স্বামীটিকে দেখে দেখে তাঁব সহিষ্ণুতা কমেছে। অন্যেব ঘবে কি, আব তাঁব ঘবেই বা কি...।

সেদিন ভূতনাথবাবু আসতে ইঙ্গিতে বাধাবাণী ওই মেয়েটিকে দেখিয়ে কথায় কথায় বললেন, কাল সবস্বতীপূজো উপলক্ষে ওব স্বামী ওকে চমৎকাব একজোডা ফবাসডাঙাব শাডি এনে দিয়েছে—আমাকে আবাব ডেকে দেখাল।...ভদ্রলোক কত তোযাজে বেখেছে মেয়েটাকে, বাধাবাণী সেই গল্পও কবলেন।

ভূতনাথবাবু হঠাৎ রুক্ষ বিবক্তিতে বলে উঠলেন, আমাব তো সাধ্য নেই তোমাকে এখন ফবাসডাঙাব শাডি এনে দিই—এইতেই তো শেষ হযে গেলাম।

শুনে বাধাবাণী গুম হযে বসে বইলেন। তিনি শাডি চাননি। ওই বকম মনটি চেযেছিলে।, ওই বকম অনুবাগটুকুই লোভনীয ছিল।

এক মাসেব মাথায, এই ঘবে একটি মর্মান্তিক ব্যাপাব ঘটল।

ওই মেযেটাব স্বামী দু'ঘণ্টাব জাযগায চাব-ঘণ্টা ছ'-ঘণ্টা কাটিযে যেতে লাগল। শেষ অবস্থা বলেই অনুমতি মিলেছে বোধ হয।

সেদিন দুপুব থেকেই অক্সিজেন চলছে।

বাধাবাণীব বুকেব ভিতবটা সাবাক্ষণ কাঁপছে থবথব কবে। ওই মেযেটাব ভাগ্যব ওপব চোখ দিযেছিলেন বলে ভিতবে-ভিতবে অপবিসীম যাতনা একটা। দুপুবে খুব কেঁদেছেনও, আব প্রার্থনা কবেছেন, ঠাকুব ওকে বাঁচিযে দিও।

সন্ধ্যে থেকে তাব স্বামী নিজেই অক্সিজেন ধবে বসে আছে। শান্ত বিষণ্ণ মূর্তি। বাধাবাণীব সেদিকে তাকাতেও কষ্ট।...একসময দেখলেন, লোকটি অক্সিজেনেব নল বেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁডাল। চুপচাপ স্ত্রীব মুখেব দিকে চেযে বইল খানিক। তাবপব বুকেব কাছে মুখেব কাছে ঝুঁকে পডল।

বাধাবাণী চমকে উঠলেন। বুকেব ওপব ভেঙে পডবে নাকি—এখনো যে শেষ হয নি। অবশ্য শেষ হতে বাকিও নেই...কিন্তু লোকটা কবছে কি।

বাধাবাণী হঠাৎ নিস্পন্দ কাঠ একেবাবে।

লোকটি মেযেটিব গলাব হাব, কানেব দুল, হাতেব চুডি, বালা, আঙটি, সব একে একে খুলে পকেটে ফেলল। তাবপব চুপচাপ দাঁডিযে বইল।

আধঘণ্টাব মধ্যে সব শেষ। ডাক্তাব মাথা নেডে চলে গেলেন।

বাধাবাণীব বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত তখনো। চেযে আছেন বিস্ফাবিত নেত্রে। দেখছেন।

...লোকটি শান্ত মুখে একটা ঝোলাব মধ্যে স্ত্রীব শাডি ক'টা নিল, মিটসেফ খুলে নিজেব আনা বোতলেব খাবাব আব টনিকগুলো দেখে দেখে পুবল, তাবপব ভালো কবে স্ত্রীকে আব একবাব দেখে নিযে শ্রান্ত পাযে ঘব থেকে বেবিযে গেল।

বাধাবাণী চিত্রার্পিত।

ছেলে এবং লোকজন নিয়ে লোকটি ফিবল প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে। বাবান্দায় খাটিয়া পাতা—ওখান থেকেই শ্মশান-যাত্রা।

এই একমাসে শবীবেব আশাতিবিক্ত উন্নতি হযেছিল বাধাবাণীব। কিন্তু এব পবেব তিনদিনেব মধ্যেই অনেকটা খাবাপ হযে গেল। বাতে ঘুম নেই, চোখ বসা, আহাবে রুচি নেই, হজমে গোলমাল। দিনবাত গুম হযে ভাবেন কি যেন। ছেলে আসে, মেযে আসে, ভৃতনাথবাবু আসেন—বাধাবাণী ভালো কবে কথাও বলেন না কাবো সঙ্গেই। সকলেই চিন্তিত।

সেদিন সকালে ছেলে একটা ওষুধ দিযে যেতে এসেছিল। বাধাবাণী তাব হাতে খুব যত্ন কবে বাঁধা একটা পুঁটলি দিযে বললেন সাবধানে নিযে দিদিব হাতে দিবি, ওনাব বড ট্রাঙ্কেব একেবাবে তলায বেখে দেয যেন।

ঘণ্টাখানেকেব মধ্যেই হতভম্ব মুখে মেযে এসে হাজিব। এক নজবে দেখে নিল মাযেব হাতে শুধু দুগাছা শাঁখা আব একটা লোহা।

—ওগুলো সব খুলে পাঠালে কেন মা?

বাধাবাণী নিস্পৃহ মুখে ফিবে জিজ্ঞাসা কবলেন—তুলে বেখেছিস?

—না, চাবি তো বাবাব কাছে, বাবা বাড়ি নেই, তুমি—

—বাড়ি নেই তো তুই ওগুলো কাব কাছে বেখে এলি? ভযানক বেগে গেলেন বাধাবাণী, কে তোকে এখানে আসতে বলেছে এখন?

—কিন্তু তুমি হঠাৎ ওগুলো সব খুলে পাঠালে কেন?

—পাঠিযেছি, আমি মবলে ওগুলো তোদেব কাজে লাগবে বলে, সবেতে তোব বাড়াবাড়ি—যা শীগগিব।...খানিক বাদে একটু ঠাণ্ডা হযে বললেন, শবীবেব যা অবস্থা, এখানে এ-সব পবে থাকা ঠিক নয—শেষে হযত এটুকুও যাবে তোদেব।

মেযে কাঁদ কাদ মুখে উঠে চলে গেল।

বাধাবাণীব গত তিনদিনেব জ্বালা একটু জুড়োল যেন। টাকাওযালা লোকেবই স্ত্রীব প্রতি যে দবদ দেখেছেন..নিজেদেব তো প্রতি পযসাব হিসেব। তাব অন্তিম শয্যায কেউ তাঁব গাযেব গযনাব কথা ভাবছে সে-দৃশ্য কল্পনা কবেও বাধাবাণী বাববাব শিউবে উঠেছেন।

সেই পুঁটলি হাতে মেযে কাঁদ কাঁদ মুখ কবেই বিকেলে ফিবল আবাব। বাধাবাণী সমাচাব শুনলেন।...ছেলে বাপেব হাতে পুঁটলিটা দিযেছিল, আব মেযেকে বলতে হযেছিল মাযেব অবুঝপনাব কথা। শুনে উনি ফ্যাল ফ্যাল কবে চেযেছিলেন খানিকক্ষণ, তাবপব আচমকা এক চড়ে ছেলেব গালে পাঁচটা আঙুলই বসিযে দিযেছেন, গযনাগুলো ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দিযেছেন, তাবপব না খেযে অফিসে চলে গেছেন।

প্রত্যেকটা খববই বেগে ওঠাব মত। বাধাবাণী বাগতে চেষ্টাও কবলেন। কিন্তু বাগটা তেমন হল না।

সেদিন আব ভৃতনাথবাবু তাঁকে দেখতে এলেন না। তাব পবদিনও না।

তাব পবদিন এলেন।

গযনা ক'টা বাধাবাণী আবাব পবেছেন। একখানা মোটামুটি ভালো শাড়িও পবেছেন। একটু বোধ হয প্রসাধনও কবেছেন। শয্যায বসেছিলেন, বললেন, বোসো—

ভূতনাথবাবু টুলটা টেনে বসলেন। তাবপব চুপচাপ চেযে বইলেন।

কোটবগত চকচকে দুটো অনুযোগ-ভবা চোখ, হাড বাব-কবা চোযাল, আব শুকনো কালচে মুখেব দিকে চেযে বাধাবাণীব বুকেব ভিতবটা মোচড দিযে উঠল কেমন। সব সময এই ক্ষযেব জ্যোতি পোড়া চোখে পড়েও পড়ে না। বিনা ভনিতায বললেন, আব কতকাল পড়ে থাকব এখানে, সেবেই তো উঠেছি, ডাক্তাবকে বল, বাকি চিকিৎসা বাড়িতেই হতে পাববে—আব ভালো লাগছে না।

ভূতনাথবাবু চেযেই আছেন।

কি কাবণে মিট-সেফটাই একবাব খুলে দেখা দবকাব হযে পড়ল বাধাবাণীব। তাড়াতাড়ি ঘুবে বসে ঝুঁকে সেদিকে হাত বাড়ালেন।

রূপসী বাংলার মুখ

মেযেটাকে চোখেব ওপব বড হতে দেখেছি। ঢলঢলে মিষ্টি মুখ। না কালো না ফর্সা। চোখ দুটো ভাবী সুন্দব। না হাসলেও মনে হয চাউনিতে একটু হাসিব মাযা ছুঁযে আছে। নামও হাসি। ছ' মাস বযেস হতে ওব মা মনোবমা একদিন মেযে কোলে আমাব কাছে হাজিব। মুখে চিন্তাব ছাযা। বলল, আপনাব ভাগ্নীব তো ছ' মাস হযে এলো দাদা, এ-মাসেব শেষেই মুখে একটু মাযেব প্রসাদ দেব ভাবছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটা নামই ঠিক হল না—আজ আপনাব কাছ থেকে ওব একটা নাম না নিযে নড়ছি না।

মেযেব একটা নাম ঠিক কবে দেবাব তাগিদ এ পর্যন্ত ওব মা আমাকে অনেকবাব দিযেছে। তখন পর্যন্ত বাচ্চাটাব বাবা ওকে আদব কবে ডাকত বুচু। ওই ডাক শুনে পিত্তি জ্বলে যায এ-ও মনোবমা নিজেই অনেকবাব বলেছে। মেযে খ্যাদা নয বোঁচা নয তবু বুচু বলে ডাকলে কোন মাযেব ভালো লাগে। .ভাবতে গেলে মনে হয সেদিনেব কথা, মেযে কোলে মাযেব আক্ষেপ, পাড়াব সকলেও এখন বুচু বুচু শুরু কবেছে, শেষে ও-ই না ডাক-নাম হযে দাঁড়ায। আপনি এমন একটা নাম দিন দাদা যাতে ভালো নাম ডাক-নাম দুই-ই হযে যায। আমি ওকে বলে দিযেছি, দাদা নাম ঠিক কবে দিলে মেযেকে আব কোনো নামে ডাকা চলবে না।

ওকে অর্থাৎ ওব স্বামী নযনকে বলে দিযেছে। ওবা বসু চৌধুবী। আমি এদেব দাদা হলেও আত্মীযতাব কোনো যোগ নেই। লাগোযা পুবনো দোতলা বাড়িটা ওদেব। পৈতৃক ভিটে। দোতলাব দু'খানা ঘবে ওবা থাকে। জোবে কথা কইলে বা শব্দ কবে হাসলে-কাঁদলে আমাদেব বাড়িব ও-মুখো ঘব থেকে শোনা যায। একতলাব ঘব দুটো পুবনো ভাড়াটেব দখলে। নামমাত্র ভাড়া পায বলে অভিযোগ আছে। কিন্তু এতকালে

তাবাও আত্মীযেব মতো হযে গেছে, তাই মুখ ফুটে কিছু বলে না বা বলতে পাবে না। ওপব-নিচেব দুই পবিবাবই নিজেদেব সুখে-দুঃখে আমাদেব আপনাব জন ভাবে।

পঁযত্রিশ বছব হযে গেল, নামেব তাগিদে ছ' মাসেব মেযে কোলে মনোবমাব সেই ঘবে এসে চডাও হওযাটা স্পষ্ট মনে আছে। যাব কোলেই হোক, ঘবে এলেই মেযেটা আমাব টেবিলেব ওপব ঝাঁপিযে পডতে চায। লেখাব কাগজ কলম বই-পত্র বহস্যজনক খেলাব কিছু ভাবে হযতো। কিন্তু মাযেব কোলে চেপে সেদিন সামনে না ঝুঁকে মুখেব দিকে চেযে ফিক-ফিক কবে হাসছিল। ও-যেন আমাব ফ্যাসাদ বুঝেই মজা পাচ্ছে।

মেযেটাব হাসি দেখেই মনে হযেছিল এই নামটা আমাব অনেক আগেই মনে আসা উচিত ছিল। একটুও না ভেবে বলেছিলাম, মেযেব নাম বাখো হাসি।

অনেকদিনেব প্রত্যাশাব পবে লেখকেব কাছ থেকে এমন সাদামাটা নাম আশা কবেনি মুখ দেখেই বোঝা গেল। বলল, শুধু হাসি

—হাসি আবাব শুধু হাসি কি, চোখ বুজে নামটা বেখে ফেলো, ও-নামেব কদব পবে বুঝবে।

মেযেটাও ও-কথাব পবেই জোবে হেসে উঠেছিল মনে আছে।

পছন্দ হোক না হোক মনোবমা মেযেব নাম হাসিই বেখেছে। আব ওব আত্মীয-পবিজন বা চেনা-জানা কাউকেই বোধহয জানাতে বাকি বাখেনি মেযেব এই নাম ওমুক দাদা বেখেছে।

তাবপব দিনে দিনে মাসে মাসে বছবে বছবে হাসি আমাদেব চোখেব সামনে বড হযেছে। বিকেলে আব ছুটিব দিনেব দু'বেলাই ওদেব বাডিব সামনেব কাঁচা উঠোনে অন্য মেযেদেব সঙ্গে ছোটাছুটি কবে, এক্কা-দোক্কা খেলে, লাফাঝাঁপি কবে আব সমবযসী সব মেযেব ওপবেই সর্দাবি কবে। হঠাৎ হঠাৎ মুখ তুলে ওপব দিকে তাকায। ও ঠিক বুঝতে পাবে দোতলাব বেলিং-এ ভব দিযে দাঁডিযে অনেক সময়েই ওকে আমি লক্ষ্য কবি। ঝগডাঝাঁটি কবা বা সর্দাবি কবাও লক্ষ্য কবি। তখন লজ্জা পায আব খুব হাসে। সকালে স্কুল-বাসেব হর্ন শুনলেই বই-খাতাব ব্যাগ বুকে চেপে পডি-মবি কবে ছুটে আসে, আব তখনো একবাব তাকিযে দেখে দোতলাব বেলিং-এ আমি দাঁডিযে কিনা। ওব দৌলতে বাসেব মেযেবাও ওব মামাবাবুকে অর্থাৎ আমাকে চিনে গেছে, সকৌতুকে তাবাও চেযে চেযে দেখে। কোনো কাবণে পব পব দু-তিনদিন আমাকে না দেখলে হঠাৎ এক সময আমাব ঘবে এসে চডাও হয। গিন্নি গিন্নি মুখ।—বা-ব্বাঃ! এত লেখায ব্যস্ত যে ক'দিনেব মধ্যে দেখাই নেই, আমি ভাবলাম জ্বব-জ্বালা হল নাকি আবাব দেখে আসি—

সময সময় আমাবও গম্ভীব থাকাব চেষ্টা।—জ্বব জ্ববই লাগছে, দ্যাখ তো—

তক্ষুণি কাছে এসে কপালে হাত, বুকে হাত। তাব পবেই ঠোঁট উল্টে হাসি। —ধেৎ, পাথবেব মতো ঠাণ্ডা গা—তাছাডা জ্বব জ্বব মনে হলে কেউ পাখাব নিচে খালি গায়ে বসে লেখে? আমাকে ঠকাবাব মতলব?

—আব তোব পাকামো কবতে আসাব মতলব?

তক্ষুণি হি-হি হাসি আব ছুট। ভিতবে ভিতবে আমার এই হাসি দেখাবই লোভ।

আবো একটু বড হতে বইযেব তাগিদ।—আজ ওমুক দিদিমণি তোমাব একখানা বই চেযেছে মামাবাবু, সকালে তো মাযেব জ্বালায আসাব সময পাই না, আজই দিযে বাখো।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও গম্ভীব।—বই নেই।

—বা বে, কাল একটা বই না নিযে গেলে আমাব যে মান-ইজ্জৎ থাকে না।

—কি থাকে না? আবাব বলতো?

থতমত খেযে হেসে ফেলে। একদিন প্রস্তাব কবেছিলাম, আমি ঘডি দেখছি, তুই যদি আমাব সামনে দাঁডিযে টানা দু' মিনিট হাসতে পাবিস, তাহলে একটাব বদলে দুটো বই পাবি।

শোনামাত্র সে-কি হাসি। হাসিব চোটে চোখ মুখ লাল।—তুমি কি যে বলো মামাবাবু, ঘডি ধবে কেউ হাসতে পাবে, আমি কি পাগল...। আবাব হাসি আব ছুট।

এই মেযেব নাম হাসি ছাডা আব কিছু হতে পাবে। যত দিন যায নিজেই নিজেব বিবেচনাব তাবিফ কবি।

স্কুলেব পাট শেষ হবাব আগে থেকেই হাসিব শাডি পবাব ঝোঁক। চোখেব সামনে মেযেটা এব ফলে যেন হুট কবে এক লাফে বেশ খানিকটা বড হযে গেল। স্বাস্থ্য ভালো, লম্বা গডন, শাডি পবলে হাসি-খুশি মেযেটাকে আবো সুন্দব দেখায অবশ্য। তবু বলেছিলাম দশ ক্লাশ শেষ না হতেই শাডি কেন, আবো একটা দুটো বছব ফ্রক-ট্রক চালিযে গেলেই পাবতিস। কলেজেব মেযেবাও আজকাল শাডি পবতে চায না—

হাসিব সব কথাতেই হাসি।—কত ঢ্যাঙা হযে গেছি তোমাব চোখ নেই! স্কুলেব ঢ্যাঙা মেযেবা শাডি পবে দেখে আমিও ধবে ফেললাম। তুমি আবাব মা-কে কিছু বোলো না বাপু, এমনিতেই বলে আমাব দিকে তাকালে তাব চোখে এখন কাঁটা ফোঁটে।

মাযেব চোখেব খবব ঠিক বাখি না, কিন্তু পাডাব নতুন বযসেব ছেলেগুলোব চোখেব ভাষাব কিছু তাবতম্য বুঝতে পাবি। সময়ে অসময়ে তাদেব অনেককেই ও-বাডিব কাছাকাছি ছোঁক-ছোঁক কবে ঘুবে বেডাতে দেখি। হাসিকে বাডি থেকে বেরুতে দেখলে বা বাডিতে ঢুকতে দেখলে কেউ চকিত হয, কেউ মুখখানা গম্ভীব কবতে চেষ্টা কবে, দুঃসাহসী দুই একজন ওকে থামিযে কিছু কথাবার্তা কইতেও চেষ্টা কবে। হাসিব কাছে ছেলেগুলোব এই আচবণ ভাবী কৌতুকেব ব্যাপাব মনে হয। কিন্তু দোতলাব বাবান্দাব দিকে তাকিযে তখন আমাকে দাঁডানো দেখলে খুব লজ্জা পায। ওব মুখেব এই লজ্জাব হাসিটুকু ঠিক ঠিক বর্ণনা কবাব মতো কলমেব জোব নেই। শুধু ভাবি মেযেটাব হাসি নাম সার্থক।

ওদেব স্কুল ফাইনাল পবীক্ষাব বেজাল্ট বেরুবাব পবে হাসি দিন কতক বাডিতেই সেঁধিযে থাকল। চাব নম্বরেব জন্য ফার্স্ট ডিভিশন হযনি। ওব মা এসে জানান দিল, বাডিতে বলছে লজ্জায মামাবাবুকে আব মুখই দেখাতে পাববে না। দিন তিনেক না

যেতে আবাব ওব মাযেব মুখেই এক তাজ্জব খবব। হাসিব বিযে। গত পবশু বিকেল সাডে তিনটেয ছেলেব পক্ষ এসে মেযে দেখে গেছে। ছেলেব বাবা-মা নেই। বড দুই দাদা, তাদেব দুই বউ আব এক ছোট বোনকে নিযে ছেলে নিজেই হাসিকে দেখে গেছে। পছন্দ হযেছে সেদিনই বোঝা গেছে। আজ সকালে এসে পাকা কথা দিযে গেছে। এটা জ্যৈষ্ঠ মাস, এই আষাঢেই তাদেব ছেলেব বিযে দেবাব ইচ্ছে। মেযেব মাযেব অর্থাৎ মনোবমাব মাথায এখন ভাবনাব আকাশ ভেঙে পডেছে।

ভাবনাব কথা বলল বটে, কিন্তু মুখখানা খুশিতে ডগমগ মনে হল। হঠাৎ এ-খবব শুনে আমাব মাথায ববং দুশ্চিন্তা একটু।—সবে স্কুল ফাইনাল পাস কবল, এবই মধ্যে বিযে...ছেলে কেমন ভালো কবে খোঁজ-টোজ নিযেছ?

—তা আব নিইনি, আমাদেব কাছে সোনাব টুকবো ছেলে, বি. এসসি পাস, সবকাবী চাকবি, বিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টে কি একটা পোস্ট-এ আছে বলল, এবই মধ্যে ছ'শ' টাকাব ওপব মাইনে পায, আব প্রাযই ট্যুব-ফুবে যেতে হয, তাতেও মাসে শ-দেডশ' থাকেই। দাবি-দাওযা বলতে গেলে কিছুই না—ছেলে এখানে বিযে কববে বলতেই তাব দাদাবা উদ্যোগী হযে এগিযে এসেছে—ওব এক জ্যাঠতুতো ভাইযেব চেনা পবিবাব—তাবাই সম্বন্ধটা দিযেছিল, খুব ভালো বলেছে।

জিগ্যেস কবলাম ছেলেব বযস কত?

—পঁচিশ। তা হাসিও তো ষোল পেবিযে সতেবোয পা দিতে চলল, এমন কিছু খাবাপ হবে না। আপনি যেন ওকে ডেকে একটু উৎসাহ দেবেন দাদা, এমনিতেই সকাল থেকে আমাকে ঝাডছে, আপনি খুব খুশি হযেছেন না বুঝলে ঠিক বিগডে যাবে।.. এ-দিকেব শবীবেব অবস্থা তো জানেন, ভালোয ভালোয বিযেটা দিযে ফেলতে পাবলে একটা বড দায শেষ।

শেষেবটুকু যুক্তিব কথাই বটে। এই বযেসেই ওব স্বামী নযনেব ছোটখাট একটা হার্ট অ্যাটাক হযে গেছে।

সেই বিকেলেই হাসি এলো। হযতো বা লজ্জাতেই বেঁকে-চুবে সামনে এসে দাঁডালো। আমি সঙ্গে সঙ্গে দাকণ গম্ভীব।—আয, সেকেন্ড ডিভিশনে সেকেন্ডাবি পাস কবে আমাকে মুখ দেখাতে পাবছিস না, আব তাব মধ্যে দিব্যি আব একজনকে মুখ দেখিযে মুণ্ডু ঘুবিযে দিলি।

হাসি বলে উঠল, আমাব বযে গেছে মুণ্ডু ঘোবাতে, একটা ভোঁদকা—

শুনে ধাক্কা খেলাম একটু।—সে কি বে! আমি তো শুনলাম খুব ভালো ছেলে —তোব পছন্দ হযনি?

—আমাব এখন বিযেই পছন্দ নয, হাযাব সেকেণ্ডাবি পাস কবলাম না, এবই মধ্যে বিযে! তাবপবেই দস্তুবমতো মিনতি, তুমি মা-কে ডেকে একটু বলো মামাবাবু, তোমাব কথা শুনতে পাবে—

বিডম্বনায পডে জবাব দিলাম, ভালো ছেলে পেলে সব বাবা-মা-ই মেযেব বিযে দিযে ফেলতে চায, চোখ-কান বুজে আপাতত বিযেটা কবে ফ্যাল, আমি ববং তোব ববকে শাসিযে দেব, এবপব না পডালে বিযে নাকচ হযে যাবে।

ঠোঁট উল্টে হাসি বলল, আব ছাই পডা হবে, দেখো—

আষাঢেই বিযে হযে গেল। বব দেখে আমাবও যে খুব একটা পছন্দ হযেছে তা নয। ফর্সা, বেঁটে, মোটাসোটা, নাকেব নিচে এক ইঞ্চিব মতো এক খাবলা গোঁফ। কিন্তু সাধাবণ ঘবেব বিযেব বাজাবে ছেলেব বিদ্যে আব ভালো চাকবিবই কদব। মেযে সুখে থাকলে একেই সকলে সোনাব ছেলে বলবে।

শ্বশুব বাড়ি যাবাব আগে হাসি প্রণাম কবতে এলো। সেই প্রথম বোধ কবি ওব কাঁদ কাঁদ মুখ দেখলাম ছদ্ম বকুনিব সুবে বললাম. হাসিব মুখে কান্না দেখলে আমাব দেওযা নামেব অপবাদ হবে বলে দিলাম। ফিক কবে একবাব হাস দেখি?

এ-কথাব পব হাসিমুখেই প্রণাম কবে গেছে।

হিসেব না বাখলে সময পাখা মেলে ওডে। দশটা বছব কেটে গেছে। এব মধ্যে হাসি কত শত বাব বাপেব বাড়ি শ্বশুব বাড়ি কবেছে তা খেযাল কবাব মতো কখনো কিছু ঘটেনি। এই সাতাশ বছব বযসে হাসি বীতিমতো গিন্নি-বান্নি গোছেব হযে উঠেছে। এখন এক মেযে আব দুই ছেলেব মা। মেযে বডো। ছেলে দুটো ছোট। পডাশুনা আব হযনি। বিযেব এক বছব না ঘুবতে মেযেব মা হযে বসেছে, পডাশুনা হবে কি কবে! এই দশ বছবে খানিকটা মুটিযেছে, কিন্তু লম্বা বলে খাবাপ দেখায না, উল্টে আবো ফর্সা আব ঢলঢলে মনে হয। পান খায খুব, মুখে সেই হাসি লেগেই আছে। দেখা হলেই লাল দুই ঠোঁটেব হাসি সমস্ত মুখে ছডায। আমি বলি, পান খাস কেন, অত সুন্দব দাঁতগুলো বিচ্ছিবি হযে যাবে।

ও হেসেই বলে, গেলেই হল, কত বাব কবে দাঁত মাজি জানো।

দাঁতেব যত্ন নেয বোঝা যায, হাসলে পানেব লাল বসে ভেজা দাঁতে সাদাব চেকনাই ঝিকঝিক কবে। হাসিব মুখেব হাসি আগেব মতোই সুন্দব।

এই দশ বছবেব মাথায একটা অঘটন ঘটে গেল। তৃতীয বাবেব হার্ট অ্যাটাকে হাসিব বাবা নযন মাবা গেল। তাব পব থেকেই হাসি মেযে আব ছেলে দুটোকে নিযে বাপেব বাডিতে মাযেব কাছেই থাকে। বড মেযে আব বড ছেলেটা এ-দিকেব স্কুলেই ভর্তি হযেছে। হাসিব মুখেই শুনেছি ছেলে-মেযে নিযে মাযেব কাছেই থাকবে ভাসুবদেব সঙ্গে এই ব্যবস্থা কবে এসেছে। ওব ববেব নাম সুবিনয দত্ত। দশ বছবে ওব চেহাবা আবো পবিপুষ্ট আব ভাবিক্কি গোছেব হযেছে। তাকে এখন সপ্তাহে দু'তিন দিন অন্তত এই শ্বশুব বাডিব বাস্তায দেখা যায। শুনেছি বিহ্যাবিলিটেশনেব কাজে প্রাযই এখন তাকে কলকাতাব বাইবে থাকতে হয। ছেলে-মেযে নিযে হাসিব মাযেব কাছে এসে থাকাব এ-ও একটা কাবণ। তাছাডা ও না থাকলে এখন আব মাকে কে দেখবে।

আবো তিন বছব বাদে দ্বিতীয অঘটন। হাসিব মা মনোবমা লিভাব ক্যানসাবে মাবা গেল। বাবাব চিকিৎসা বা সেবা হাসি কবতে পাবেনি। কিন্তু মাযেব জন্য যথাসাধ্য কবেছে। বাপেব বাডিব ষোল আনাব মালিক হবাব জন্য মাকে এতটুকু তুচ্ছ কবেছে, এ ওব শত্রুও বলতে পাববে না। যদিও বব সুবিনয এ বাডিব পাকা বাসিন্দা হবাব

পব অনেকেব চোখ টাটিযেছে। আড়ালে কেউ কেউ বলেছে, লোকটাব ভাগ্য বটে, বিযেব দৌলতে কলকাতাব মতো জাযগায আস্ত একখানা বাড়িব মালিক হয়ে বসল।

কলকাতায থাকলে সুবিনয এখন এ-বাড়িতেই থাকে, এখান থেকে অফিস যাতাযাত কবে। তবে দফায দফায মাসেব প্রায অর্ধেক দিন বাইবে কাটাতে হয। হাসিব মতো গিন্নি মেযেব খুব বেশি দিন শোক আঁকড়ে বসে থাকাব কথা নয। সময়ে আবাবও তাব পান-খাওযা ঢলঢলে মুখে সেই পুবনো হাসিব ছোঁযা লাগল। ঘবেব বা ছেলেমেযেব ব্যাপাবে কোনো পবামর্শেব দবকাব হলে সোজা আমাব ঘবে চলে আসে। তেমনি হেসে বলে, এলাম আবাব জ্বালাতে, পবামর্শেব দবকাব হলে এখন আব তুমি ছাড়া কাব কাছেই বা আসব—

আমি বলি, কেন সুবিনয টুবে নাকি?

হাসি ঠোঁট উল্টে দেয, থাকলেই বা কি না থাকলেই বা কি, ভালো-মন্দ কোনো কিছুব মধ্যে আছে—বিযেব সময যা ছিল তাব থেকে আবো ভোঁদকা হযে গেছে দেখো না।

সেই বকমই চোখ-জুড়ানো হাসি।

ওব এখন বছব বত্রিশ বযেস। আব ছেলেপুলে হযনি। সে-জন্য মনে মনে ওবই বুদ্ধি আব বিবেচনাব প্রশংসা কবি। অনেক দিন আগে এই ছেলেপুলেব প্রসঙ্গে ওব মামী অর্থাৎ আমাব স্ত্রীকে নাকি বলেছিল, তোমাদেব জামাইযেব স্বভাব চবিত্র যা —ছ'বছবেব মধ্যে তিন-তিনটে চলে আসতে ওই ভালো-মুখো লোককে আব বিশ্বাস কবি। ছোটটা আসাব পবেই অপাবেশন কবিযে একেবাবে নিশ্চিন্ত।

হাসি হেসে-হেসেই এ-বকম কথা বলতে পাবে বটে।

এই হাসিব মুখ হঠাৎ থমথমে হযে ওঠা থেকেই এই কাহিনী। কিছুদিন ব্যস্ত ছিলাম, তাই লক্ষ্য কবিনি। হাসি অনেক দিন আসেনি তা-ও খেযাল কবিনি। সেদিন স্ত্রীব কথায টনক নড়ল। সে বলল, মেযেটাব কিছু একটা হযেছে বোধহয, আসে না, হাসে না, কথা-বার্তাও বলে না—

আমি অবাক।—কাব কথা বলছ?

—হাসিব। সুবিনযেব সঙ্গে কিছু একটা হযেছে, তিন সপ্তাহ হল ওকেও বাড়িতে বসা দেখছি, অফিস-টফিসেও যেতে দেখি না, মুখ চ্ন কবে বাড়িব সামনেব দাওযায বসে থাকে—আব এক-একদিন দেখি মেযেটা আগুনপানা মুখে ফটাফট কবে আমাদেব দিকেব ঘবেব জানলা-দবজা বন্ধ কবে দিচ্ছে, তা-সত্ত্বেও ও-ঘব থেকে ওব গর্জন আব বকাবকি কানে আসে—ডেকে কিছু জিগ্যেসও কবতে পাবি না—এরকম হাসি-খুশি মেযেটাব হঠাৎ কি হলো বলো তো?

হাসিব মুখে হাসি নেই এ আমাব কাছে শুধু বিস্ময নয, আঘাতেব মতোও। এবপব ক'দিন লক্ষ্য কবেও ওকে দেখতে পাইনি। ওদেব এ-বাড়িমুখো দোতলাব ঘবেব জানালা দুটো এখন প্রায সময়ই বন্ধ থাকে। সুবিনযকেও সত্যি ক'দিন একতলাব দাওযায বসে থাকতে দেখেছি। বিষণ্ণ, বিমর্ষ মুখ। ফর্সা মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। দেখলেই মনে হয সুখেব শবীব-মনেব ওপব দিযে কিছু একটা ঝড় গেছে।

বাস্তায হঠাৎ সেদিন মুখোমুখি দেখা। মাথা নিচু কবে সুবিনযেব পাশ কাটানোব চেষ্টা। কিন্তু হাসিব জন্যে আমাব মনেও কম অশান্তি নয। ওকে পাশ কাটাতে দিলাম না। জিগ্যেস কবলাম, অনেকদিন হাসিব দেখা নেই, ভালো আছো তো সব?

সুবিনয মিনমিন কবে জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ...ভালোই।

—তুমি অফিসে যাচ্ছ না দেখছি .ছুটিতে আছ নাকি?

—হ্যাঁ...অনেক ছুটি নষ্ট হযে যাচ্ছে..

আব কথাব ফুবসত না দিযে যেন পালিযে বাঁচল। বড বকমেব কিছু গণ্ডগোল বেধেছে তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু সেটা পাবিবাবিক ব্যাপাব না আব কিছু।

মাস দেডেক বাদে আবাব আমাব স্ত্রীব মুখেই সমাচাব শুনলাম। এব মধ্যে সে আবও অনেকবাব জানলা-দবজা বন্ধ ওই মুখোমুখি ঘব থেকে হাসিব তর্জন-গর্জন শুনেছে। সদ্য বর্তমানে হাসিদেব একতলাব পুবনো ভাডাটে-গিন্নি ওদেব ওপব দারুণ বিরূপ। হাসি নাকি এতকালেব হৃদ্যতা ভুলে ভাডা ডবল বাডানোব তাগিদ দিযে গেছে। ভাডাটে-গিন্নি আমাব স্ত্রীব কাছে এসে নালিশ কবেছে, মগেব মুলুক ভেবেছে এটা--ভাডা ডবল বাডাতে চাইলেই হল—আব যা ব্যাপাব এখন, ভাডা ডবল বাডালেই অভাব মিটবে—চবিত্র-দোষে জামাই অমন চাকবিখানা খুইযে বসেছে, এখন ভাডাটেব ওপব চডাও হলে কত আব সুবাহা হবে।

এবপব ওদেব ভাডাটে-গিন্নিব কথা থেকে বোঝা গেল, পাডাব মধ্যে আমবাই কেবল প্রতিবেশীব খবব বাখি না, নইলে কেলেঙ্কাবিব খবব কে আব না জানে। যে-টুকু বোঝা গেল তাব সাবমর্ম, পুনর্বাসন দপ্তবেব চাকবি সুবিনয দত্তব, গবিব ঘবেব কত উদ্বাস্তু পবিবাবেব হর্তাকর্তা বিধাতা ভাবত নিজেকে, কিন্তু ঘুঘু আব কতবাব ধান খেযে যাবে—একবাব ফাঁদে পডবে না? এক বিধবা মেযেব সর্বনাশ বলতে গেলে হাতে-নাতে প্রমাণ হযে গেছে, শুধু চাকবিব ওপব দিযে সব নিষ্পত্তি, জেল হযে যাযনি এই বক্ষে। সোযামিব সঙ্গে মেযেব দিন-বাত কুরুক্ষেত্র চলেছে এখন, মেযেব গলাব চোটে এক-তলায কান-পাতা দায, দু'বেলা হিসহিস কবে স্বামীকে শাসাচ্ছে, অমন লম্পটেব জেলে পচে মবাই উচিত ছিল, তাহলে তাব হাডে বাতাস লাগত। মেযেও বলিহাবি। দু'বেলা মাথা খোঁডে আব বিধবা হতে চায। বাইবে এ-দিকে ঢাক-ঢাক গুডগুড—কিন্তু সত্যি কথা ক'দিন আব জানতে বাকি থাকে।

বুঝলাম, পাডায এই সত্যি-কথা বাষ্ট্র কবাব গুরু দাযিত্ব ওদেব ভাডাটে-গিন্নিই নিযেছে।

আমাব হাড-পাজবে একটা বোবা যন্ত্রনা ছডিযে পডছিল। মেযেটাকে আমি কত ভালবাসি তা যেন এতদিন জানতাম না। কেবল আশা কবছি, বিনা দোষেও তো অনেকে অনেক সময বিপাকে পডে—এ কি সে-বকম কিছু হতে পাবে না? বাগে দুঃখে মাথাব ঠিক নেই বলেই হাসি হযতো সহ্য কবতে পাবে না। কিন্তু সুবিনযেব সর্বদা অপবাধী মুখ দেখে এ আশাও ফিকে হযে আসছিল।

পবেব একটা বছবে অনেক পবিবর্তন লক্ষ্য কবেছি। হাসিব মুখে হাসি তো নেই-ই। ওদেব সংসাবে অনটনেব ছাযা স্পষ্ট হযে উঠেছে। শুনেছি, সুবিনযেব চাকবিই শুধু যাযনি, হাতে শুধু নিজেব-দেওযা প্রভিডেন্ট ফান্ডেব টাকা কটাই পেযেছে। এ-ছাড়া সতেব বছবেব চাকবিব পেনশন গ্র্যাচুইটি সবই মাব গেছে। মেযে আর ছেলে দুটো নাম-কবা স্কুলে পডত, স্কুল বাসে যাতাযাত কবত। ক্লাস-প্রমোশন হযে যেতে তাবা কাছাকাছিব এমন স্কুলে ভর্তি হযেছে যেখানে স্বল্পবিত্তেব মানুষও পাবতে ছেলে-মেযে দিতে চায না। ওই ছেলে-মেযেব মুখেব হাসিতেও টান ধবেছে। হাসিকে থলে হাতে ইদানীং ক্বচিৎ কখনো কাছেব বাজাবে যেতে বা আসতে দেখি। কিন্তু এ-বাডিব দোতলাব দিকে ছেডে মুখ তুলে কোনদিকেই ওকে তাকাতে দেখি না। শুকনো টান ধবা মুখ। পূজো এলো গেল, কিন্তু এবাবে ও বিজযাব প্রণাম কবতেও এলো না। ডাকতে ইচ্ছে কবে। কিন্তু সংকোচ হয, ডাকতে পাবি না। আমাব স্ত্রীও দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে, অত হাসি-খুশি মেযেটা কি হযে গেল।

এক বছব বাদে। সকালে অন্যদিনেব মতোই কাজে বসেছিলাম। মুখ তুলে আমিই সচকিত হঠাৎ। হাসি দবজাব কাছে দাঁডিযে।

—ভিতবে আসব মামাবাবু?

আমিও গম্ভীব একটু।—আয। কবে আবাব জিগ্যেস কবে এ-ঘবে ঢুকেছিস? বোস—

হাসতে চেষ্টা কবল। এ হাসি কান্নাব মতোই। একটা মোডা টেনে বসল। বলল, মুখ কেন দেখাতে পাবি না জানোই তো...

আমি কিছুই জানি না, জানতে চেষ্টাও কবি না। বিনা দোষেও অনেকেব ওপবে অনেক অবিচাব হয। কিন্তু যত দুঃখেব ব্যাপাবই হোক, তুই আমাকে সুদ্ধু ছেঁটে দিলি?

চুপচাপ চেযে বইল একটু।—আমাব সব গুমব ভেঙে গেছে মামাবাবু, দিন আব চলছেই না, তাই না এসে পাবলাম না....যা হোক কিছু ব্যবস্থা কবতে পাবো?

হাসিব মতো মেযেব হাব-না-মানা মুখেব থেকে হাব-মানা মুখ দেখলে বেশি কষ্ট হয। আমি কি কবতে পাবি না বুঝে জিগ্যেস কবলাম, কি ব্যবস্থাব কথা বলছিস?

দেখলাম, সহানুভূতি সত্ত্বেও আমাব মাথায যা আসেনি, বিপাকে পডে হাসি তা ভাবতে পেবেছে। মাথা নীচু কবে সাদা কথায বলল, আমাব বেযাই বা জামাইকে বলে যদি সুবিনযেব কোনো কাজেব ব্যবস্থা কবতে পাবি। একবাব মুখ তুলে আমাব প্রতিক্রিযা দেখে আবাব মাথা নীচু কবল—লোকটা যেমনই হোক, কাজে-কর্মে খুব সুনাম ছিল মামাবাবু...।

আমাব বেযাই আব জামাইযেব মস্ত কন্ট্রাকটাবি ফার্ম। কনস্ট্রাকশন আব ডেভেলপমেন্ট দু'বকম কাজেই তাদেব বহু লোক খাটছে। কিন্তু সেখানে কাবো কাজেব সুপাবিশ এ-পর্যন্ত কবিনি। তবু আমিও যেন একটা পথ দেখতে পেলাম। কাবণ বেযাইযেব সঙ্গে আত্মীযতাব থেকেও হৃদ্যতাব দিকটা ঢেব বড। ভদ্রলোক বাইবে মেজাজী বাশভাবী মানুষ, কিন্তু ভিতবে যেমন উদাব তেমনি দিলদবিযা।

পবে জানাবো বলে হাসিকে তখনকাব মতো যেতে বললাম। বেযাই বেশি শুনতে চাইলেন না। আমি অনুবোধ কর্বছি সেটাই যথেষ্ট ধবে নিযে সুবিনয দত্তকে তাঁব কাছে পাঠিযে দিতে বললেন।

চাকবি হল। বিহ্যাবিলিটেশনে কাজ কবেছে জেনে ছেলেব অর্থাৎ আমাব জামাইযেব সঙ্গে পবামর্শ কবে তাকে ডেভেলপমেন্টের কাজে দিলেন। মাইনে সর্বসাকুল্যে ছ'শ'। দিন-কাল যা ছ'শ' টাকা কিছুই না। কিন্তু হাসি তাতেই হাতে স্বর্গ পেল। আমি বললাম, মন দিযে কাজ কবতে বল, এবা গুণেব কদব কবতে জানে।

হাসি হেসে জবাব দিল, সেটা আমি তাকে খুব ভালো কবে সমঝে দিযেছি —অনেক বাব বলেছি, বেযাইযেব কাছে কক্ষনো তোমাব জন্যে মামাবাবুব মুখ ছোট হলে বক্ষে থাকবে না।

এত দিন বাদে ওকে ওইটুকু হাসতে দেখেও মনে হল, সময়ে ও আবাবও আগেব মতোই হাসতে পাববে। মুখেও বললাম, আমাব মুখ নিযে তোকে চিন্তা কবতে হবে না, আমি কেবল তোব মুখে হাসি দেখতে চাই।

ছলছল চোখে হাসি পাযেব ধুলো নিল। বলল, আশীর্বাদ কবো মামাবাবু, তোমাব দেওযা নাম আব যেন কালো না হয।

হযনি। ছ'মাস না যেতে বেযাইযেব মুখে সুবিনযেব প্রশংসা। খাসা লোক দিযেছেন মশাই, চেহাবা দেখলে বোঝা যায না এত খাটতে পাবে, তাছাড়া সাবভেব কাজে বেশ পাকা, ডেভেলপমেন্টেব কাজেও ভালো মাথা—কেউ শত্রুতা না কবলে এ-বকম লোকেব চাকবি যায কি কবে।

চাকবি কি কবে যায সে-আলোচনায আমাব বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। বেযাই যে-খববটা নিজে আমাকে বলেননি, হাসিমুখে এসে সে-খবব আমাকে হাসি দিল। এই ছ'মাস যেতেই সুবিনযেব মাইনে আবো একশ' টাকা বেড়েছে—আব পাকা খাতায তাব নাম উঠেছে, অর্থাৎ এবপব চাকবিব শেষে প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটিও পাবে।

পবেব তিন বছবেব সমাচাবে নিবানন্দেব ছিটে ফোঁটাও নেই। হাসিব বযেস এখন ছত্তিবিশ, তাব মেযে সুমিতাব আঠাবো। মেযেব চেহাবা মোটামুটি। এ-বযসে তাব মা যা ছিল তাব ধাবে কাছেও নয। এবাবে হাযাব সেকেনডাবি দেবে। মেযেব বিয়েব ভাবনা-টাবনা হাসিব মাথায নেই। অনেক দিনই বলেছে, লেখাপডায ভালোই, যতটা পডতে চায পড়ুক, তাবপব বিযে। আঠাবো বছবেব মেযেব মুখেব হাসিব থেকে এখনো ছত্তিবিশ বছবেব মাযেব হাসি আমাব চোখে ঢেব বেশি সুন্দব।

বছবখানেক হল সুবিনযকে বাঁকুডায থাকতে হচ্ছে। বাঁকুডাব অনেকটা ভিতবে মেজিযা। সেখানে থাবমল পাওযাব স্টেশন হবে। সেইজন্যে আশপাশেব বিবাট এলাকা জুডে মাটি কাটা আব জমি ভবাটেব কাজ চলছে। এ-সব জাযগায নতুন টাউনশিপ গডে উঠবে। এই মাটি কাটা আব জমি ভবাটেব বিশাল কন্ট্রাক্ট আমাব বেযাই পেযেছেন। এই তিন বছবেব মধ্যেই নিজেব যোগ্যতায সুবিনয আবো অনেক ওপবে উঠেছে। বেযাই গত বছব তাকেই ম্যানেজাব অর্থাৎ এ-কাজেব সর্বেসর্বা কবে পাঠিযেছেন। এখন

তাব মাইনে বাবো শ' টাকাব ওপবে। দু'শ'ব মতো কুলি-মজুব কামিন খাটায, তাব অধীনে দু'জন সহকাবী ম্যানেজাব, জনা দুই সাবভেযাব, জনাকতক সুপাবভাইজাব আব ট্রাক, ড্রাইভিং ইউনিট কাজ কবছে। এবা সকলেই সাইট-এব টেন্ট-এ থাকে। সুবিনয গ্রামেব ধাবে ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নিযেছে। তাব এখন আলাদা মর্যাদা। তবে সক্কলেবই খাওযা-দাওযাব ব্যবস্থা টেন্ট ক্যানটিনে। আমাব বেযাই ভদ্রলোক নিজে ভোজন-বসিক, কর্মচাবীদেব খাওযা দাওযাব ব্যাপাবেও তাঁব ফার্মেব উদাব নীতি। বেশ বড আকাবেব এক ক্যানটিন ইউনিটও সেখানে বহাল।

কলকাতা থেকে মেজিযা মোটবে বা জীপে সাত ঘণ্টাব মতো পথ। বেযাই তাঁব নিজস্ব জোঙ্গায (জীপেব মতোই, আকাবে বড) মাসে দুই একবাব সেখানে ইনসপেকশনে যান। আব ছেলে অর্থাৎ আমাব জামাই এখানে ফার্মেব অন্য কাজে ব্যস্ত, তাই ফি সপ্তাহে দেখে শুনে আসাব জন্য অন্য ইনসপেক্টব আব এঞ্জিনিযাব পাঠাতে হয। সুবিনয দু'তিন মাসে দুই একদিনেব জন্য কলকাতায আসে, কাজেব চাপে তাব বেশি আসা সম্ভবও নয।

তকতকে নীল আকাশ থেকে বজ্রপাত কি সত্যি কখনো হয? সেদিন বিকেলে বেযাইযেব টেলিফোন পেযে অন্তত আমাব মনে কোনবকম আশংকাব ছাযাও পড়েনি। চিবাচবিত হাসি-ছোঁযা ভাবী গলা। বললেন, অনেক দিন বসা হযনি, সন্ধ্যাব দিকে একবাব আসুন না, একটা ভালো জিনিস খুলব...তাছাড়া একটু আলোচনাও আছে।

এ-বকম আমন্ত্রণ নতুন কিছু নয। ভালো জিনিসেব লোভ দেখানোব অর্থ বিলিতি বোতল। আনুষঙ্গিক খাওযা-দাওযাব ব্যবস্থাও ভালোই থাকে। ভদ্রলোকেব বড কোনো কাজেব ধকল শেষ হলে এই গোছেব আমন্ত্রণ আসে। এ-বযসেও ওই এক জিনিসে আমাবও একটু-আধটু লোভ আছেই।

খুশি মনেই গেলাম। তখনও ভদ্রলোকেব হাসিমুখে এতটুকু দুর্যোগেব আভাস পাইনি। সকলে মিলে খানিক গল্পগুজব চলল। বৈবাহিকা আব মেযে খাবাব আব অন্যান্য সবঞ্জাম সাজিযে দেবাব পব ভদ্রলোক বললেন, এখন আমাদেব একটু দবকাবি আলোচনা আছে—

আমাব মেযেকে নিযে ভদ্রমহিলা বেবিযে গিযে বাইবে থেকে দবজা দুটো টেনে দিলেন। আমি উৎসুক একটু, কি ব্যাপাব?

—এমন কিছু নয, ভদ্রলোকেব হাসি মুখ, আগে শুরু তো করুন—

প্রথম দফায ওই ড্রিংক আব ফুড নিযেই হালকা কথা-বার্তা। দ্বিতীয দফাব শুরুতে হাসিমুখেই ভদ্রলোক জিগ্যেস কবলেন, আচ্ছা বিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সুবিনয দত্তব চাকবিটা যে গেছল সে-কি কোনো মেযে-টেযেব সঙ্গে কিছু অ্যাফেযাবেব ব্যাপাবে?

আমি এত চমকে উঠলাম যে হাতেব গেলাস থেকে খানিকটা ড্রিংক চলকে জামায পড়ল। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত একটু, পাশ থেকে ছোট তোযালেটা এগিযে দিযে বললেন, কি কাণ্ড, এ-বকম ধাক্কা খাবাব মতো কিছু ব্যাপাব নয—

ভদ্রলোকের স্নায়ু আমার থেকে দশগুণ শক্ত এ অনেক দিন জানি। তাই আশ্বস্ত হওয়া গেল না। জামাটা মুছে সোজা তাকালাম, বললাম, চাকরি ওই রকম কিছু ব্যাপারেই গেছল শুনেছি...কি হয়েছে আমাকে খোলাখুলি বলুন।

—বলছি। খান...

খাওয়া মাথায় উঠেছে। কিন্তু ভদ্রলোকের কাছে ব্যস্ততা দেখিয়ে লাভ নেই। এরপর খেতে খেতে ধীরে সুস্থে যে সমাচার শোনালেন, ভিতরে ভিতরে আমি নিস্পন্দ কাঠ।

...মেজিয়ার একটা নিচু শ্রেণীর মেয়েকে নিয়েই ব্যাপার এবারও। বছর উনিশ হবে বয়েস। যারা দেখেছে তারা বলে খুব কালো হলেও ওদের মধ্যে অন্তত চোখে পড়ার মতো মেয়ে। ওদের শ্রেণীর একটা ছেলের সঙ্গে বিয়েও নাকি ঠিক হয়ে আছে, কিন্তু মেয়ের মা মোটা রকম পণ হাঁকতে ছেলেটা দেড় বছর ধরে টাকা জমানোর চেষ্টায় আছে। এর মধ্যে ওই মেয়েটাকে সুবিনয় টাকা গয়নার টোপ ফেলে বশ করেছে। ব্যাপারটা এখন ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। তিন-চার মাস যাবৎ বেয়াই এ নিয়ে কিছু কানা-ঘুষা শুনছেন। কিন্তু যে লোক অত ভাল কাজ করে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তিনি মাথা ঘামানো দরকার মনে করেন নি। এখন না ঘামিয়ে পারছেন না। ম্যানেজার সুবিনয় দত্তর নামে কয়েকটা বে-নামী চিঠি পেয়েছেন—তাঁর ধারণা, ওর আন্ডারের যে-সব লোক সাহস করে মুখে কিছু বলতে পারছে না, হিংসেয় হোক বা রাগে হোক তাদেরই কেউ কেউ এ-সব চিঠি পাঠাচ্ছে। বেয়াই তাতেও গা করতেন না, কিন্তু এখন লেবারের মধ্যেও এ নিয়ে অশান্তি দেখা দিচ্ছে, যে-ছেলেটার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে হবার কথা সেই এখন লেবারদের ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টায় আছে। ভালো করে খোঁজ-খবর নেবার জন্য বেয়াই এ-সপ্তাহে একজন বয়স্ক ইনসপেক্টরকে পাঠিয়েছিলেন। সে-ও এসে দুশ্চিন্তার কথাই বলেছে। মেয়েটার নাম দুলালী। সুবিনয় এখন নিজের বাড়িতেই এনে রেখেছে। খাবার সময় সাইটের ক্যানটিনে সে এখন খেতে পর্যন্ত আসে না। ক্যানটিন থেকে ওদের দু'জনের খাবার তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। এ-সব এখন অনেকেই বরদাস্ত করতে পারছে না। বক্তব্য শেষ করে ঈষৎ আশ্বাসের সুরে বেয়াই বললেন, সামনের শনিবারে কাউকে কিছু না জানিয়ে ওই ইনসপেক্টরকে নিয়ে আমি নিজে যাব, লেবার ক্লাসের মধ্যে গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখলে আমাকে স্টেপ নিতেই হবে তা না হলে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই—আমার ইচ্ছে শনিবার আপনিও আমার সঙ্গে চলুন।

মাথায় আগুন জ্বলছে। ব্লাড প্রেসারও চড়ে গেছে বোধহয়। বললাম, আমার যাবার দরকার নেই, আপনি সিভিয়ার স্টেপ নিন।

ওঠার আগে ভদ্রলোক বার বার বললেন, আপনার আজকের আনন্দটাই মাটি করে দিলাম দেখছি।

বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে একটি কথাও বললাম না। ভেতরে অশান্তির ঝড়। আবার মেয়ে আর ছেলে দুটোর শুকনো মুখ চোখে ভাসছে। হাসির কালো মুখ চোখে ভাসছে। এমন অশান্তিতে জীবনে কখনো পড়িনি। রাতে ঘুম হলই না। হাসি আর ওর মেয়ে

আর ছেলে দুটোর কথা ভেবে আমার মনের জোর কমে গেছে। সকালে উঠে ফোনে বেয়াইকে জানালাম, শনিবারে আমি তাঁর সঙ্গে মেজিয়ায় যাচ্ছি।

মনের তলায় ক্ষীণ আশা, ওই সুবিনয়কে শায়েস্তা করার জন্য পায়ের থেকে জুতো খুলে মেরেও যদি ওর চাকরিটা বজায় রাখার সুযোগ মেলে তো তাই করব —তবু চাই না এতবড় অশান্তির খবর হাসি বা তার সংসারের কেউ জানুক।

গরম কাল। সকাল ছ'টায় রওনা হয়ে সাড়ে বারোটায় বেয়াইয়ের সঙ্গে তাঁর জোপ্পায় চেপে মেজিয়ায় পৌঁছেছি। সঙ্গে সেই বয়স্ক ইনসপেক্টর আর আরো একজন লোক। খুব সকালে বেরুনোর ফলে এরই মধ্যে দুর্গাপুরে সকলে দুপুরের খাওয়াও সেরে নিতে পেরেছি।

মেজিয়ায় পৌঁছে আর সাইটে এসে বেয়াইকেও হতভম্ব দেখলাম একটু। সেখানে সুবিনয় নেই। ভয়ে ভয়ে একজন কর্মচারী জানালো, সে তার বাড়িতেও নেই, সকাল থেকেই বাড়ি তালা-বন্ধ। আরো খোঁজ নিতে জানা গেল গত রাতে পর্যন্ত সেই মেয়েটা অর্থাৎ দুলালীও তার বাড়িতে ছিল। সকালের মধ্যে দু'জনেই কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

মেজিয়া থেকে হামেশাই কেউ না কেউ কলকাতার অফিসে যাতায়ত করে। গত ক'দিনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সাহেব আজ আসছে আর কি জন্যে আসছে সে-খবর সুবিনয় কোনোভাবে জেনেছে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। তাই মেয়েটাকে সুদ্ধ নিয়ে কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে।

ঘণ্টা তিনেক থেকেও সেখানকার লেবার ক্লাসকে ম্যানেজারের ওপর ক্ষুব্ধ মনে হল না আমাদের। যার সঙ্গে দুলালীর বিয়ে হবার কথা সে এখানকার শ্রমিকদের কেউ নয়, কাজেই তার দেখা পাইনি। কিন্তু এখানকার শ্রমিকদের সে ক্ষেপিয়ে তুলছে এমন আভাসও পেলাম না। ম্যানেজারের ওপর ভদ্রলোক কর্মচারীরাই কেবল বিরূপ। ব্যাপারটা সম্ভবত তারাই বরদাস্ত করতে রাজি নয়। সাহস পেয়ে তারা অনেকেই বলেছে ম্যানেজার সুবিনয় দত্তকে এখান থেকে না সরালে তাদের মান থাকে না।

ফেরার সময় দুটি ছেলে কলকাতায় ফিরবে বলে আমাদের জোপ্পায় উঠেছে। সামনে ড্রাইভারের পাশে আমি আর বেয়াই। বেয়াইয়ের মুখ এখন থমথমে। চাপা রাগে বললেন, আমি আসছি জেনে এভাবে পালানোর জন্যেই তাকে স্যাক করব।

আমি নির্বাক। সামান্য মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তাই করা উচিত। নিজের মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকে নিয়ে এই কুৎসিত ব্যাপার সহ্য করব কি করে? ভয়ে পালিয়েছে সে-অপরাধ আমি অত বড় করে দেখছি না।

হঠাৎ সচকিত আমরা। পিছনের ছেলে দুটোর একজন বলে উঠল, ওই দুলালীর মা দাঁড়িয়ে।

মালিকের ইশারায় ড্রাইভার গাড়ির ব্রেক কষল। জংলা রাস্তার ধারে পঁচিশ ত্রিশ গজের মধ্যে বিবর্ণ খাটো শাড়ি-পরা এক রমণী দাঁড়িয়ে। হাড়ের ওপর কালো চামড়া মোড়া। চোখ দুটো গর্তে। চোয়ালের দু'দিকের হাড় উঁচিয়ে আছে। রুক্ষ চুলগুলো তেলজলের মুখ দেখে না।

আমাদেব দিকে, না ঠিক আমাদেব দিকে নয, সে মালিক চেনে মনে হল—বেযাইযেব দিকে এমন চেয়ে আছে যেন চোখেব আগুনেই তাঁকে ভস্ম কবে ফেলবে। চোখ দুটো সত্যি জ্বলছে। এমন ক্রুদ্ধ হিংস্র ভযংকব মূর্তি জীবনে দেখেছি কিনা জানিনা। পাবলে সে গাড়িটাব ওপবেই ঝাঁপিযে পড়ে।

তবু, যে লোকেব জন্য তাব মেযেব এতবড সর্বনাশ হযে গেছে, সেই লোকেব মনিবেব ওপব এই বাগ অস্বাভাবিক মনে হল না।

সামনে এসে বেযাই নামলেন। ভযে ভযে পিছনে আমিও। নিকষ কালো এই অগ্নিমূর্তিব মেযেলোকটা দিশেহাবা বাগে ভদ্রলোকেব ওপব ঝাঁপিযে পডতে পাবে।

তাব সামনে এসে ভাবী অথচ সদয গলায বেযাই জিগ্যেস কবলেন, তুমি দুলালীব মা?

তক্ষুণি জবাব না দিযে মেযেলোকটা জ্বলন্ত চোখে আমাদেব দু'জনকেই আব এক দফা ভস্ম কবে নিল। তাবপব হিসহিস গলায তবল আগুনেব ঝাপটা মাবল। —ক্যানে, মোব পবিচযে তোমাদেব কি দবকাব বটটে?

ঠাণ্ডা গলায বেযাই বললেন, দবকাব কিছু নেই।...আমবাও ওই ম্যানেজাবেব বিচাব কবতেই এসেছিলাম, কিন্তু দেখা পেলাম না, আপাতত পালিযেছে। সঙ্গে তোমাব মেযেও। ...ম্যানেজাবেব ব্যবস্থা হবে, কিন্তু তোমাবও মেযেকে একটু সামলে বাখা উচিত ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে শুকনো বারুদে আগুন ধবানো সম্পূর্ণ হল। হাত, মুখ নেড়ে চাবখানা হযে ফেটে পডল।—তোমবা ওই মানিজাবেব বিচাব কববেক, তাকে শাস্তি দিবেক? ক্যানে তোমাদেব এত হিংসা বটটে? ক্যানে শিকাবীব মতো তোমবা ওই ভালো মানুষ মানিজাবকে খুঁজতে লেগেছ? আমাব মেযেটা এট্টু ভালো খেতে পেলেক, পবাব ভালো ক'খানি শাড়ি পেলেক, কানে হাতে পাযে কপাব গযনা পেলেক—মুইও এট্টু সুখেব মুখ দেখতে পালাম—তোমাদেব তা সহ্যি হল না ক্যানে? তোমবা এততো নিষ্ঠুব ক্যানে? ক্যানে ক্যানে ক্যানে?

আমবা দুজনেই স্তব্ধ, নির্বাক, বিমূঢ়।

জোঙ্গা ছুটেছে। আমবা আবাব পাশাপাশি বসে। অনেকক্ষণ বাদে বেযাই মুখ খুললেন। তাঁব ঠোঁটে হাসিব আঁচড। ভাবী গলা যতটা সম্ভব মৃদু কবে বললেন, কে কাকে ফাঁদে ফেলেছে মশাই?...এবপব বিচাবটা কি-বকম হবে?

বিড়বিড কবে জবাব দিলাম, জানি না।

জোঙ্গা ছুটেছে। আমাব চোখেব সামনে হাসিব মুখ, তাব মেযে সুমিতাব মুখ, তাব ভাই দুটোব মুখ ভাসছে। বাস্তাব দু'দিকে আব কাছে-দূবে শাল পিযাশাল জিযাল পলাশ মহুযা বহেবাব গাছ। সামনে তকতকে নীল আকাশ। সব কিছু ছাপিযে চোখেব সামনে বড হযে উঠছে নিকষ কালো এক বমণীব ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত জ্বলন্ত ক্ষুধার্ত মুখ।

আতসী

অতসী একটি ফুলেব নাম। স্বর্ণাভ। দেখতেও মিষ্টি।

অতসী গাঙ্গুলিব বন্ধুবা ওই ফুলেব সঙ্গে নামেব মালিকেব তেমন মিষ্টি গোছেব মিল দেখতে পায। বন্ধু বলতে যুনিভার্সিটিব ছেলে-মেযেবা। এই মিলটা তাদেব চোখে আঙুল দিযে দেখিযে বা ধবিযে দিযেছে অতসী গাঙ্গুলিব ছেলে-বেলাব বন্ধু শোভনা বিশ্বাস। সে-ও তাবই সঙ্গে কলেজ ডিঙিযে ইকনমিক্স পডতে ঢুকেছে। এই মিল দেখানোব পিছনে একটু বাস্তব বসেব যোগ আছে।.. যে কলেজ থেকে তাবা পাশ কবে বেবিযে এসেছে, সেখানকাব দুজন তরুণ শিক্ষক ওই ফুলেব সঙ্গে এই মিল আব মিতালিটুকু প্রথম আবিষ্কাব কবেছিল। তাদেব একজন সেটুকু সামনা-সামনি ঘোষণা কবাব মতো সাহস দেখিযেছিল। অতসী গাঙ্গুলি খুব খুশি হযে তাকে চপ কাটলেট খাইযে বিদায কবেছিল। তাবপব ওই মন-পসন্দ নামেব মালিকেব কাছ থেকে আশানুকূল সাডা না পেযে ভদ্রলোক আব একদিন বাডিতেও এসেছিল। দূব থেকে অতসীকে সে দোতলাব ঘবেব জানলাব কাছে কযেক পলকেব জন্য দেখেও ছিল। আব অতসীও তাকে দেখেই সবে এসেছিল।

বাডিব কাজেব লোকটি এসে খবব দিতেই অতসীব সাফ জবাব, বলে দাও বাডি নেই, কখন ফিবব তাবও ঠিক নেই।

এই অতসী-স্তুতি সেখানেই শেষ। শুনে শোভনা বিশ্বাস বলেছিল, এত অকরুণ হতে পাবলি কি কবে—গোলাপে কাঁটা থাকে জানি, অতসীতেও থাকে।

দ্বিতীয় মিল-আবিষ্কাবক ওই কলেজেব বাংলাব তরুণ কবি-শিক্ষক। উঠতি কবি হিসেবে ভদ্রলোকেব বেশ সুনাম তখন। অতসী নামেব মূল তাব হৃদযে গেঁথে আছে দু'বছব ধবে ক্লাস কবেও সেটা বোঝা যাযনি। এম. এ ক্লাসে ভর্তি হবাব পব ডাকে একদিন অতসী গাঙ্গুলিব নামে আধুনিক কবিতাব মাসিক-পত্র এলো। কে পাঠালো ভেবে না পেযে পাতা উল্টেই দেখে ছাপা অক্ষবে প্রথম কবিতাব নামই 'অতসী'। নিচে কবিব নাম। বলাবাহুল্য কলেজেব সেই অতি চেনা নাম।

বাব কযেক মনোযোগ দিযে পডে কবিতাব মর্মোদ্ধাব কবা গেছে। চৌদ্দ লাইনেব মধ্যে পুষ্পবাহাব অতসীব বিশেষ একটি মানবী রূপেব কল্পনা এবং স্তুতি।

যা কবণীয অতসীব তা ঝটপট কবে ফেলা অভ্যাস। তাবপব চাব লাইনেব একটা চিঠিব নকলসহ কবিতাটা শোভনাকে দেখিযেছে। প্রথমে কবিতা এবং পবে চিঠিটা পডে শোভনাব দু'চোখ কপালে।—এই চিঠি সত্যি তুই ভদ্রলোককে পাঠাবি নাকি?

—পাঠাবো না, পাঠিযে দিযেছি।

রুদ্ধশ্বাসে শোভনা চিঠিটা আবাব পডেছে।

'কবিতা-পত্র পেলাম। ধন্যবাদ। আপনাব অতসী পডে মুগ্ধ হযেছি। পবেব সংখ্যায কৌটিল্য-ব্যঞ্জনাসহ অর্থশাস্ত্রেব ওপব একটি নিটোল সনেট দেখতে পেলে আবো মুগ্ধ হব।'

—চিঠিতে তোব নাম দিসনি? শোভনাব ব্যগ্র প্রশ্ন।

—দেব কেন, কবিতাব ওই মাসিক-পত্র যে পাঠিযেছে সে তাব নাম দিযেছে?

দু'জনেই ইকনমিক্স-এব ছাত্রী, অবশ্য বি-এ'ব বেজাল্ট দেখলে শোভনাব থেকে অতসী ঢেব বেশি এগিযে। সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হযেছিল। আত্মীয পবিজনেবা

তাইতেই বেশ খুশি। কেবল অতসীব বুকেব ভিতবটা চিনচিন জ্বলছে। মার্কশীটে দেখা গেছে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট-এব থেকে আট নম্বব মাত্র পিছিযে। তাব মধ্যে দু'দুজন ফার্স্ট ক্লাস পেযেছে, তাবা ছেলে। একজন সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হযেছে, সে মেযে। অতসী ওদেব থেকে নিজেকে কোনো অংশে খাটো ভাবে না। কিন্তু দু'দুটো টিউশনি চালিযে এব বেশি আব কত হবে। এম. এ-তে ওই তিনজনকেই মনে মনে দেখে নেবাব ইচ্ছে। কিন্তু ভিতবেব এই জ্বলুনি বা অভিলাষ কাউকেই বুঝতে দেবাব মেযে নয সে।

যাক। এবাবে বন্ধুব উৎসুক প্রশ্ন, কৌটিল্য-ব্যঞ্জনা সহ অর্থশাস্ত্রেব ওপব একটি নিটোল সনেট দেখা আব মুগ্ধ হওযাব অর্থ কি—কলেজেব বাংলা মাস্টাবেব আর্থিক সংগতিব খোঁচা দিলি?

অতসীব হাসি এবং জবাব, যা খুশি বুঝে নে বাপু, মনে এলো লিখে দিলাম।

সাদা-মাটা দেখতে শোভনা বিশ্বাস অবসিক বা অনুদাব নয। যুনিভার্সিটিতে ঢুকে প্রশংসাব ছলে দুই একটি উৎসুক ছেলেব কানে অতসী-নামেব মহিমা আব মাধুর্য তুলে দিতেই সেটা দ্রুত বিস্তাব লাভ কবেছে। দু'দুটি তরুণ মাস্টাবেব মুখে ঝামা ঘষে দেবাব ঘটনা শোভনা বিশ্বাস অবশ্যই অনুক্ত বেখেছে। সেটা বলা মানেই প্রকাবান্তবে তাদেব সতর্ক কবা আব সমঝে দেওযা। এই বোকামো কবলে ভবিষ্যতেব মজাব আশায জলাঞ্জলি। কলেজেব কবি-শিক্ষকেব লেখা পুষ্পবাহাব অতসীব বর্ণনা আব উপমা ক'টা কেবল সানুবাগে বন্ধুব ওপব চালিযে দিযে মন্তব্য কবেছে. নামেব সঙ্গে এমন মিষ্টি মিল কমই দেখা যায।

অতসী-ফুল বা গাছ কত ছেলে দেখেছে আব দেখলেও কত জনে মনে বেখেছে তাতে দুই বন্ধুবই সন্দেহ আছে। দু'জনেবই ধাবণা এই মিলটুকু ধবিযে দেবাব পব ছেলেগুলোব কেউ-কেউ আলিপুবেব হর্টিকালচাবাল গার্ডেনে হানা দিযেছে। তা না হলে ওই ফুলেব গুণগান ছেলে-মেযেদেব (বিশেষ কবে ছেলেদেব) মুখে মুখে এতটা প্রগলভ হযে ওঠে কি কবে? ফুলেব গুণ-গান বলতে নামেব মিলেব প্রশস্তি।

এই প্রশস্তিব ধাবে কাছে না ঘেঁষেও ওই নামেব ওপব ছোট্ট একটু কটাক্ষপাত কবে ছাত্রবন্ধুদেব মজাব খোবাক যুগিযেছিল যে ছেলে তাকে যুনিভার্সিটিব মধ্যমণি বললেও অত্যুক্তি হবে না। সমব ঘোষাল। কিন্তু এ প্রসঙ্গ একটু পবে। ছেলেবা সমব ঘোষালকে কেবল ভালবাসে না, অনেক উঁচু পর্যাযেব আত্মজন ভাবে। অতসীব থেকে বছব খানেকেব বড হবে, পড়েও এক ক্লাস ওপবে। সিক্সথ ইযাবেব ছাত্র, সাবজেক্ট ইংবেজি। গত তিন বছবেব মধ্যে তাব আগে বি. এ-তে ওই বিষযে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স কেউ পাযনি। সমব ঘোষাল বেশ দাপটেব সঙ্গে এই কলঙ্ক মোচন কবেছে। এম. এ-তেও ফার্স্ট ক্লাস পাবে, এ-ও যেন ধবা-বাঁধা ব্যাপাব। ভালো ক্রিকেটাব, নামী ক্লাবেব এ-ডিভিশনে খেলে, গত বছব থেকে বাংলা দলেব বাছাই বাবো জনেব মধ্যেও জাযগা কবে নিতে পেবেছে। মুরুব্বি জনেবা উৎসাহ দেয, লেগে থেকে সেভাবে চেষ্টা কবলে ভাবতীয বাছাই দলেবও সে নিশ্চয একজন হতে পাববে। এমনিতে চোখেব আড়ালেই

সরে থাকতে চায়, কিন্তু টেনে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে অন্য মানুষ। ইংরেজি বাংলা দুই-ই কান পেতে শোনার মতোই বলে। ছাত্র মহলের ইউনিয়নবাজী তথা রেষারেষি অনেকটা এই একজনের জন্যেই অনেক শান্ত এখন। মধ্যস্থতায় নামলে মিটমাট হয়ই। এ হেন গুণের ছেলেব সব থেকে বড় গুণ কথা-বার্তায চাল-চলনে এতটুকু দম্ভ নেই। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, ঠিক সেই রকমই থাকে। যে-যা বলুক মন দিযে শোনে, যেন সকলের কাছ থেকেই তাব কিছু শেখার আছে। এমনি সব কিছুর ভিতব দিয়ে তার শান্ত সহজ ব্যক্তিত্বটুকুই সকলকে আকর্ষণ করে।

শোভনা বিশ্বাসের একটা বড দোষ বা বড গুণ, সে সক্কলেব সঙ্গে যেচে আলাপ কবতে ওস্তাদ। কোনো নামী ছেলে বা মেযেব কথা শুনলে কতক্ষণে তাকে একটু নাড়াচাড়া করে দেখবে সেই ফাঁক খোঁজে। কলেজে পড়তে সাযেন্স গ্রুপ পডাতেন এক প্রৌঢ় নাম-করা প্রফেসার। তাঁর ছাত্রবা তাঁকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা কবত। কথায কথায শোভনা কাব মুখে শুনল ভদ্রলোক ম্যাট্রিক থেকে এম. এস-সি পর্যন্ত ফার্স্ট ছাডা কখনও সেকেন্ড হননি। কলেজ আঙিনায় ভদ্রলোককে সামনা-সামনি দেখেই এগিযে গিযে তাঁব পাযে হাত দিয়ে প্রণাম সেরে মুখোমুখি দাঁডালো।—আপনার হাতখানা একবাব আমাব মাথায় রাখুন তো সার।

ভদ্রলোক অপ্রস্তুত।—কেন বলো তো, তুমি কী পডো—কোন ইযাবেব ছাত্রী?

—বলছি। বিনীত নিবেদন, আগে আপনাব হাতখানা একবাব আমাব মাথায রাখুন না...।

কি আব করেন? বাখলেন।

—আমি বি. এ ফাইন্যাল ইয়াবের ইকনমিক্স-এব খুব সাধাবণ ছাত্রী...ম্যাট্রিক থেকে এম. এস-সি পর্যন্ত একজন ফার্স্ট হওয়া মানুষ জীবনে এই প্রথম দেখলাম সাব, দোষ নেবেন না।

অতসী একটু পিছনে দাঁডিযে দেখছিল আর শুনছিল। কলেজ গেট পেবিযে হাসতে হাসতে বলল, হায়াব সেকেন্ডাবি থেকে এম. এ. এম-এসসি পর্যন্ত ফার্স্ট আজকাল অনেকেই হয, এই ভদ্রলোকেব অর্ধেক বযসের সে-বকম কাউকে যদি সামনে দেখতিস?

—তাহলে মাথায় হাত রাখতে বলতে পারতাম না, আড়ালে টেনে নিয়ে গিযে একবার জড়িয়ে টডিয়ে ধরতে ইচ্ছে কবত, ফার্স্ট বা ফার্স্ট ক্লাস ছেডে মোটামুটি সেকেন্ড ক্লাস যদি একটা হয।

সেদিন লাইব্রেরি হলে দূরের টেবিলে একজনকে দেখা গেল। বিকেলে ওই টেবিলে তাকে প্রাযই দেখা যায়। অতসীকে ক্লাসেব পব নিযমিত লাইব্রেরিতে এসে পডাশুনা সেরে নিতে হয। ফিরে গিযে দু'দুটো টিউশনি আছে, সপ্তাহে তিন দিন করে পডায়, বাডি গেলে নিজেব পড়াব সময় মেলে না। তাছাডা বেশ অবস্থাপন্নর পক্ষেও এম. এ ক্লাসের সব বই কিনে পডা সম্ভব হয় না, অতসীর তো নিজস্ব খুব কম বই-ই আছে। ছুটিব দিনে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়তে যায। সেখানেও ওই ছেলেকে এক-আধ দিন দেখেছে। সামনা-সামনি পডে গেলে বা চোখাচোখি হয়ে গেলে পবিচিতের

মতোই সামান্য হেসে পাশ কাটিয়েছে। অতসীও তাই করেছে। য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে আজ ওই দূরের টেবিলে মুখোমুখি একজন মাত্র সহপাঠী বসে। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে টুকটাক কথা-বার্তা চলছে।

আঙুল তুলে অতসী ওই টেবিলটা দেখিয়ে বলল, ওই দ্যাখ, ম্যাট্রিক থেকে এম-এতে ফার্স্ট না হলেও এখানকার একটি অলবাউন্ড বত্ন বিশেষ—তোর জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করবে মতোই একজন সমর ঘোষাল।

শোভনা বেশ নিবিষ্ট চোখে দেখে নিল। দূরে হলেও এই দিকে মুখ করেই বসেছে। অস্ফুট মন্তব্য করল, আমার নয়, মনে হচ্ছে তোর ইচ্ছে করবে মতোই একজন। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো—চলি...।

—ওকি! এই শোন—

কর্ণপাত না করে এগিয়ে চলল। সোজা ওই টেবিলে। দু'দিকের দু'জনেই এক সঙ্গে মুখ তুলল। শোভনা সহপাঠীর দিকে তাকালোও না, সমর ঘোষালকে বলল, আমাদের ওই টেবিলে একবারটি অনুগ্রহ করে আসার সময় হবে?

আঙুল তুলে টেবিল দেখালো। সমর ঘোষাল পঞ্চাশ গজ দূরের টেবিলে তাকালো। এবং অতখানি দূর থেকেই অতসী গাঙ্গুলীর সঙ্গে চোখাচোখি।

উঠল। ঠোঁটে মৃদু হাসির আভাস। আসছে। আগে আগে শোভনা। একটা বড় কাজ সমাধা করার মতো মুখ। এই টেবিলে এসে দুই ভুরু সামান্য কুঁচকে একটু ঘটা করেই আর এক দফা বত্নটিকে দেখে নিল। অতসীর মনে হল, যে এলো সে এই দৃষ্টিবাণে আহত বা বিড়ম্বিত হবার মতো একজন নয়।

গম্ভীর মুখে শোভনা বলল, সদ্য কলেজ উৎরানো দুটো কচিকাঁচা আমরা। সেখানে ছেলে-মেয়ে সক্কলের সঙ্গে সকলের তুই তোকারির সম্পর্ক ছিল, এখানকার হাল কেমন, তুমি চলে না আপনি-আজ্ঞে?

তুমি'টাই ভালো চলে।

—বেশ। অতসীর মুখোমুখি চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, ওই চেয়ারে পাঁচটা মিনিট বোসো তাহলে, একটু আলাপ পরিচয় সেরে নিই—

সমর ঘোষাল হুকুম তামিল করল, অর্থাৎ বসল।

—আমি শোভনা বিশ্বাস, খুব সম্ভব সেকেন্ডক্লাস লাস্ট হয়ে ইকনমিক্স পড়তে ঢুকেছি, এ হল...(থেমে গিয়ে একটু ভ্রূকুটির ঘটা) কেন, এর নামের সৌরভ এখনো তোমার নাকে-কানে পৌঁছয়নি?

—কানে পৌঁছেছে, অতসী গাঙ্গুলি, তোমার পারলিসিটির গুণে ছেলেরা এই নাম নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে, পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম, আমার নাম—

—থাক, থাক, য়ুনিভার্সিটির আকাশে তুমি দীপ্ত সূর্য, তোমার আলোর গরিমায় চার দিকের নক্ষত্ররা টিপ টিপ জ্বলছে, এটুকু আমাদের জানা আছে। আমরাও গুণের কদর জানি আর সেই কারণেই এ হেন গুণীকে জবরদস্তি ধরে আমরা একটু টানাটানি করে থাকি—

খোঁটা দেবার সুরে অতসী বলল, আমরা বলে আবার আমাকে জড়াচ্ছিস কেন, নিজের কথা বল—

সঙ্গে সঙ্গে শোভনার ভ্রুকুটি এবং ঝাঁঝ। বেশি দেমাক দেখাস না, তোর মতো চেহারা আর বিদ্যের জোর থাকলে তোকে জড়াতে যাব, এতই বোকা ভাবিস আমাকে?

এবারে সমর ঘোষালের দু'চোখ শোভনার দিকেই মনোযোগী একটু। তারপর হাল্কা-গম্ভীর মন্তব্য—নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, তোমার মতো চেহারা আর বিদ্যের জোরের বসিকতার টানাটানিও ভালো না লাগার মতো উঁচু স্তরের কেউ নই আমি।

খুশিতে বিগলিত ভাব শোভনা বন্ধুর দিকে ফিরে ঠেস দিল, কি রে, শুনলি? খুব যে নাক সিটকোস—

চেয়ার ঠেলে সমর ঘোষাল উঠে দাঁড়ালো। ঠোঁটের ফাঁকে একই রকমের মৃদু হাসি, শোভনার দিকে চোখ।—অনুমতি হলে আমি স্বস্থানে ফিরি—এর (অতসীর) ক্ষতি হচ্ছে, পড়াশুনার ব্যাপারে খুব সীরিয়াস এখানেও দেখেছি, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেও লক্ষ্য করেছি।

তেমনি মৃদু হেসে অতসী জবাব দিল, কপাল গুণে আমার গোপাল ঠাকুরের পূজা আর্চা সবই লাইব্রেরিতে...বাড়িতে সময় হয় না।

দাঁড়িয়ে শুনল, দেখলও একটু, কিছু জিগেস না করে ফিরে গেল।

—যা। শোভনার গলায় হতাশা, ভেবেছিলাম যত জমাটি মগজই হোক, আগুনের আঁচে এনে ফেলতে পারলে একটু গলগলা ভাব দেখব, কিছুই তো দেখা গেল না।

—আর জ্বালাসনে বাপু, পড়তে হয় পড়। নয়তো পালা, এ চ্যাপ্টারটা আজ শেষ করতেই হবে।

শোভনার অত ধৈর্য নেই, তাছাড়া বাড়ির গাড়ি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। উঠে পড়ে বলল, এখন চ্যাপ্টারের চাপে বসে বসে চ্যাপ্টা হ', তারপর ট্রাম-বাসের ভিড়ে চ্যাপ্টা হওয়া আছেই—আমি বাপু সত্যি আর বসে থাকতে পারছি না।

এর পরেও অতসী আর সমর ঘোষালের দেখাসাক্ষাৎ যেটুকু তা এই লাইব্রেরিতে বা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। যুনিভার্সিটিতে কথাবার্তা বলতে গেলে হয়ই না। মুখোমুখি বা সামনাসামনি পড়ে গেলে সমর ঘোষাল হেসে মাথা নাড়ে। অতসীও একই জবাব দেয়। কথা টুকটাক ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দেখা হলে হয়। ফেরার সময় কিছু পথ হেঁটে দুজনেরই ট্রাম বা বাস ধরতে হয়। তারপর দু'জনের পথ দু'দিকে। সমর ঘোষাল থাকে, মধ্য কলকাতায়, অতসী দক্ষিণে। অতসী প্রায় প্রত্যেক ছুটির দিনেই ন্যাশনাল লাইব্রেরি আসে, সমর ঘোষাল মাঝেমধ্যে। এইটুকু দেখাসাক্ষাৎ বা কথা-বার্তার ফাঁকে বাড়তি আগ্রহের ছিটেফোঁটাও কেউ দেখেনি। দশ মিনিটের হাঁটা পথ ট্রাম-বাস পর্যন্ত পাশাপাশি আসার মধ্যেও সহজ ব্যক্তিত্বের ফারাক একটু থেকেই যায়। অতসীর এটুকুই খুব পছন্দ। গরীব ঘরের সুরূপা মেয়ে এযাবত পুরুষের হ্যাংলামো অনেক দেখেছে।

তবে ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে ফেরার সময় এটুকু পথ এক সঙ্গে আসে দু'জনে। সমর ঘোষালের আগে হয়ে গেলে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, হাসিমুখে জিগেস করে, কত দেরি? অতসীর প্রায়শঃ একই জবাব, আর দু'মিনিট অপেক্ষা করো। বা, আর পাঁচ মিনিট। আবার ওর আগে হয়ে গেলে ঝোলা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে হাসি-হাসি মুখে

তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায় কেবল, কিছুই জিগেস করে না। সমর ঘোষাল চটপট উঠে পড়ে। স্বাভাবিক সৌজন্যে আগে ওকে ট্রামে তুলে দিয়ে (চাপা-চাপির ভয়ে অতসী পারতপক্ষে বাসে ওঠে না) নিজের ট্রাম বা বাস ধরে।

এটুকুর মধ্যে দুই একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের টুকটাক কথাও হয়। এর মধ্যে সমর ঘোষাল একদিন জিগেস করেছিল, আচ্ছা, তোমার সব পড়াশুনা লাইব্রেরিতে, বাড়িতে একদম সময় পাও না বলেছিলে...কেন, অন্য কিছু শেখটেখ নাকি?

অতসী হেসেই জবাব দিয়েছিল, শিখি না, শেখাই। সপ্তাহে তিন দিন করে সন্ধ্যার পর দুটো মাড়োয়ারি বাড়িতে টিউশনি করি। তারা লোক ভালো, কেবল কামাই পছন্দ করে না। রাত্রিতে তারপরেও নোট-টোট বা লেখা-টেখা নিয়ে বসি—ফলে ঘুমোতে দেরি, সকালে উঠতেও দেরি—আর তার ফলে স্নান-টান সেরে নাকে-মুখে কিছু গুঁজে য়ুনিভার্সিটিতে ছোটার তাড়া—কম করে এক ঘন্টার পথ তো।

শোনার পর একটু শ্রদ্ধার ভাবই লক্ষ্য করেছে অতসী। চেহারা বা ছিমছাম বেশ-বাস দেখে গরীব ঘরের মেয়ে কেউ ভাবে না। চলতে চলতেই সমর ঘোষাল মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়েছে।—দু'দুটো টিউশনি কত দিন ধরে করছ?

—বি. এ পড়তে ঢোকার সময় থেকেই।

পরের বিস্ময়টুকুও নির্ভেজাল মনে হয়েছে অতসীর।—এই করে বি. এ-তে ইকনমিক্স-এর মতো সাবজেক্ট নিয়ে সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড—দারুণ তো।

শুনে মনে মনে সত্যিই খুশি অতসী, কারণ সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ডের খবরটা ও নিজে কখনো দেয়নি। মুখ টিপে হেসে বলল, তোমার ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার থেকেও কঠিন মনে হচ্ছে?

হেসে উঠল, ও একটা হয়ে গেছে...এবারে যে কি হবে ভাবতে গেলে ভয় করে বলে ভাবি না—

এমন শুনলে উৎসুক হবারই কথা।—কেন?

—আর বলো কেন, আমার বাইরেটাও খেলার মাঠ, বাড়িতেও খেলার মাঠ. গেল বার বেঙ্গল টিমে চান্স পেয়ে কি যে ক্ষতি হয়ে গেল সে-কেবল আমিই বুঝছি।

খেলার সমঝদার অতসী আদৌ নয়। তবু মুখে বলল, নামী খেলোয়াড় হওয়াও কম কথা নয়।

আবার হাসি—। আমার দৌড় আমি তো জানি। হাজার খেলি, কোনদিন গাভাসকার বা কপিলদেব হতে পারব না। এর থেকে ফার্স্ট-ক্লাস পাওয়াটা অনেক সহজ ছিল, কিন্তু বাড়িতে খেলার মাঠের শুভার্থীদের হামলায় দু'দিকই ফসকাবার দাখিল। সব নয়, এর মধ্যে একটা কথাই কুট করে কানে লাগল অতসীর।...খুব অনায়াসে বলতে পারল, এর থেকে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া অনেক সহজ ছিল। তা-ও এম. এ-তে আর ইংরেজি সাবজেক্ট নিয়ে। অতসীরও আত্মবিশ্বাস সব থেকে বড় পুঁজি। সে-ও অনেক সময় ভেবেছে, ওই দু'দুটো টিউশনি করতে না হলে সে-ও ইকনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস পেতে পারত।...সবে ফিফথ ইয়ার, ফাইনালের এখনো ঢের দেরি, এখনো অতসীকে যদি কেউ টিউশনি থেকে অব্যাহতি দেয়, সে কখনও এমন অনায়াস জোরের সঙ্গে বলতে

পাববে না, এবাবে ফার্স্ট ক্লাস পাওযাটা সহজ ব্যাপাব।...ইকনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস ফি-বছব একজন ছেড়ে দু'তিন জনও পায, কিন্তু ইংবেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওযাটা তাব বিবেচনায ভাগ্যেব শিকে ছেঁড়াব ব্যাপাব, অনন্য প্রতিভাধবও ওই বিষযে ফার্স্ট ক্লাস পাওযা সহজ বলতে পাববে কিনা সন্দেহ। কিন্তু যে বলল, সে একবাব ফার্স্ট ক্লাস পেযে দেখিযে দিযেই বলল, এটা বৃথা আস্ফালনেব পর্যাযে ফেলাব অজুহাত ভাবা যায না।

এবাবে অতসী নাম বাহাবেব প্রসঙ্গে বন্ধুদেব কাছে সমব ঘোষালেব সেই কটাক্ষপাতেব প্রসঙ্গ—যা যুগপৎ আনন্দেব সঙ্গে একটু তবল বিস্ময়েবও খোবাক যুগিযেছিল। সমব ঘোষাল টিপ্পনিব সুবে বলেছিল, নামেব মধ্যে তোমবা কেবল নৈসর্গিক বসেব বাস্তব রূপ দেখছো, কিন্তু ওই নামেব সঙ্গে অদৃশ্য ছোট্ট একটু আ-কাব যোগ কবলে কি দাঁড়ায তা কখনো ভেবেছ?

বলা-মাত্র কেউই বুঝে উঠল না। সমস্ববে প্রশ্ন, তাব মানে?

—তাব মানে অতসীব 'অ'-এব সঙ্গে ছোট্ট একটু আ-কাব জুড়ে দিলে কি দাঁড়ায?

দুই একজনে তক্ষুণি বলেছে, কেন আতসী।

—ঠিক। তাহলে মানেটা কি দাঁড়ায?

—ভেবে একজন বলেছে, আতসবাজি শুনেছি, আতসী সেই গোছেব কিছু হবে।

—খুব ঠিক। আতসী মানে আগ্নেয, যাব জ্বলে ওঠাব জন্য সামান্য একটু তাপই যথেষ্ট। তা তোমাদেব অতসীব সঙ্গে অদৃশ্য একটু আ-কাব যুক্ত আছে কিনা ভেবে দেখেছ?

কথাটা স-পল্লবে অতসীব কানে উঠতে সময লাগেনি। শোভনাই বলেছে। তাবপব উৎসুক প্রশ্ন, কি বে, সমব ঘোষালেব তোব মেজাজেব আঁচ পাওযাব মতো কোনো ঘটনা ঘটেছে নাকি?

না, অতসীব বাগ একটুও হযনি, ভিতবে ভিতবে কেবল অবাক হযেছে। অতসী'ব অ-এব সঙ্গে একটা আ-কাব যুক্ত কবলে কি হয, তা কখনো ভাবেনি। কিন্তু যা হয সেটা কত বড সত্য তা ওই ছেলে কি বুঝে এমন টিপ্পনী কেটেছে, না নিছক ঠাট্টাব ছলে? বাগ হলে বা আঘাত পেলে অতসীব ভিতবটা কি যে জ্বলে জ্বলে ওঠে, সব ভস্ম কবে ফেলাব মতো আক্রোশে ফুঁসতে থাকে সেটা ও নিজে ভিন্ন আব কে জানে? এমন হলে যন্ত্রণা আবো বেশি, কাবণ ভিতবে যতই জ্বলুক ফুঁসুক, বাইবে তাব প্রকাশ কম। বাইবেটা সর্বদাই দাহ নিবাবক শান্ত ব্যক্তিত্বে ঢাকা। ভিতবে বাইবে অতসী গাঙ্গুলী একজন নয, প্রায় বিপবীত দু'জন।

বাগেব বদলে ওই একজনেব প্রতি কৌতূহল দ্বিগুণ বেড়েছে। যুনিভার্সিটি লাইব্রেবিতে দেখা হলে বা চোখাচোখি হলে মিটিমিটি হেসেছে। তাবপব সেদিন এক ফাঁকে জিগ্যেসও কবেছে, সামনেব বোববাবে ন্যাশনাল লাইব্রেবিতে আসছ?

সমব ঘোষালও ক'দিন ধবে একটু যেন ব্যতিক্রম লক্ষ্য কবছিল।—কেন বলো তো?

—তোমাকে একটু কমপ্লিমেন্ট দেবার ছিল।

সত্যি অবাক। —কেন, কী করলাম?

কী করেছে মাথামুণ্ডু নেই বোঝা গেল। হেসেই জবাব দিল, তেমন কিছু না, দেখা হলে বলব।

লাইব্রেরিতে এসেছে। দু'জনে দু' জায়গায় বসে পড়াশুনা যেমন হয়—হয়েছে। তবে এইদিনে সমর ঘোষাল বেশ আগেই উঠে এসেছে। —দেবি আছে?

অতসী নিজের হাতঘড়ি দেখল।—এরই মধ্যে হয়ে গেল?

—হয়ে গেল না, কমপ্লিমেন্ট পাওয়ার আশায় আর মন বসছিল না।

অতসীও হাসি মুখেই খাতাপত্র গুছিয়ে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে পড়ল। রাস্তায় নেমেই সমর ঘোষাল তাড়া দিল, কিসের কমপ্লিমেন্ট বলে ফেলো, সবুর সইছে না।

—তুমি খুব লোভী তো?

সমর ঘোষাল একবার থমকে তাকালো। তারপর হেসেই বলল, এমনিতে আমি খুব লোভী ছিলাম না, তবে মানুষের চরিত্র বদলাতে কতক্ষণ।.. তা বলো, কমপ্লিমেন্ট কী কারণে?

অতসী কটাক্ষে একবার দেখে নিল। আগের মন্তব্য একেবারে তাৎপর্যশূন্য মনে হল না। বলল, কমপ্লিমেন্ট অতসীর অ-এর সঙ্গে ছোট্ট একটা আ-কার জুড়লে কী দাঁড়ায় ছেলেদের সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে।

শুনে সমর ঘোষাল প্রথমে জোরেই হেসে উঠল। ব্যাপারটা ভুলেই গেছল। হাসি থামাতে দু'চোখ আবার পাশের দিকে ঘুরল। কমপ্লিমেন্ট তো দিলে...কিন্তু আসলে রেগে যাওনি তো?

—রেগে যাব কেন, তুমি তো অনেকটাই সত্যের কাছাকাছি গেছ...তবে আমার কেবল কৌতূহল, গেলে কি করে, নাকি এটা কেবল বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে নিছক রঙ্গরসের ব্যাপার?

সমর ঘোষাল মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। —সত্যি জবাব দিলে রেগে যাবে না তো?

—কেউ রেগে যাবে মনে হলেও তুমি সত্যের অপলাপ করো নাকি?

—তাহলে বলি।...তুমি আয়নায় নিজেকে দেখো?

—এ আবার কি কথা, রোজই তো দেখি।

—বন্ধুদের যা বলেছি তার ষোল আনাই রঙ্গরসের কথা নয়, তার সঙ্গে তোমাকে নিয়ে আমার কিছু ধারণাও মেশানো ছিল।...তোমার চেহারাপত্র বা রুচির ছিমছাম বেশবাস চাল-চলন দেখলে কারো মনে হবে না দু'দুটো টিউশানি আর নিজের হিম্মতের ওপর নির্ভর করে বি এ ইকনমিক্সে সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়ে এম. এ পড়তে এসেছ। বাসের আ-দেখলে চাপাচাপির ভয়ে তুমি সর্বদা ট্রামে যাতায়াত করো, সংগতি থাকলে ট্রামও এড়াতে। চরিত্রগতভাবে তুমি কেবল অতসী ফুলখানা হয়ে বসে থাকলে এত কষ্ট করে এভারে এগোতে চেষ্টাই করতে না, অনেক আগেই যাচাই বাছাই করে কারো ঘরের শোভা বর্ধন করতে চলে যেতে। তাই আমার মনে হয়েছে যতই ওরা

তোমার মধ্যে ফুলবাহার অতসীর মিষ্টি মিল টেনে বার করুক, দরকার হলে অতসী থেকে তুমি আতসীও হয়ে উঠতে পারো।

অতসী কান পেতে শুনছিল। বলে উঠল, থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।

এরপর অনেক পাঠকের হয়তো প্রত্যাশা আর অনেক পাঠকের হতাশা, কাহিনী এবার চিরাচরিত প্রেমের রাস্তায় গড়াবে। ...হ্যাঁ প্রেমের রাস্তায় এখনো একটু আছেই, তবে সকালের ঘাসের ডগায় মুক্তা-বিন্দুর মতোই স্বল্প পরমায়ু তার।

পড়াশুনার চাপ যথাসম্ভব বাড়িয়েও সমর ঘোষাল এম এ'তে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি। কেউই পায়নি। সমর ঘোষাল সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে।

রেজাল্ট খুব প্রত্যাশিত হল না বলে অনেকে সহানুভূতি আর সান্ত্বনার কথা বলেছে। কেবল অতসী গাঙ্গুলী এ নিয়ে একটি কথাও বলল না বলে সমর ঘোষাল প্রথমে একটু অবাক হয়েছিল। পরে কিচ্ছু না বলাটাই তার ভালো লেগেছে—কথায় চিঁড়ে ভেজে না এই প্র্যাকটিকাল মেয়ে তা খুব ভালো করেই জানে।

অতসী ভেবেছিল দেখা-সাক্ষাতে এবারে একটু ছেদ পড়বে, আবার মনে মনে বিপরীত আশাও ছিল। বিপরীতটাই হয়েছে। য়ুনিভার্সিটির দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়েছে। তার বদলে প্রত্যেক ছুটির দিনে সমর ঘোষাল ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আসা শুরু করেছে। তার সাবজেক্ট ইংরেজি, বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, এম. এ-তে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট—রে-সরকারী কলেজে চটপট একটা মাস্টারি জুটিয়ে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধে হয়নি। অতসীকে বলেছে, এটা খুব সাময়িক, এবারে খেলার মাঠ ভুলে সে আই এ এস পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সেই প্রস্তুতির তাগিদেই ছুটির দিনে এখন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আসা। এই উচ্চাশার কথা শুনে অতসী একটা উৎসাহের কথাও বলেনি। এ-টুকুও সমর ঘোষাল লক্ষ্য করেছে, কিন্তু আদৌ অখুশি হয়নি। এই ব্যক্তিত্বের মেয়ের মুখের কথায় নেচে না ওঠারই কথা। অন্য দিকে অতসী জানেও না আই এ এস হওয়ার জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এসে কাজ করার কতটা দরকার।...সীরিয়াস ছেলে, এম এ-তে ঘা খেয়েছে, দরকার থাকতেও পারে। কিন্তু এ-ছাড়া এখানে আসার আর কোনো আকর্ষণই নেই এটা সে ভাবেও না, বিশ্বাসও করে না।

দিন গড়িয়েছে। সমর ঘোষালের আই এ এস পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। কারণ পরীক্ষার মাত্র ক'দিন আগে তার বাবা মারা গেছে। সামনের বারে দেবে বলেছে। অতসী বাবার মৃত্যুর জন্য সহানুভূতি এবং সান্ত্বনার কথা বলেছে। আই এ এস-এ বসা হল না বলে কোনো পরিতাপের কথা বলেনি। এই না বলার মধ্যে তার শান্ত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ পারসোনালিটির দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে সমর ঘোষালের কাছে। বনের পাখির আশায় কথা তারাই বেশি খরচ করে যাদের নিজের ওপর বা অন্যের ওপর আস্থা কম।

ততদিনে অতসীরও এম. এ পরীক্ষা শেষ। যথাসময়ে রেজাল্ট বেরিয়েছে। এবারে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট। ফার্স্ট ক্লাস তিনজন। শোভনা তাকে কংগ্র্যাচুলেট করতে বাড়িতে ছুটে এসেছিল। তার এম. এ পরীক্ষা দেওয়াই হয়নি। সিক্সথ ইয়ারে পৌঁছুবার আগেই

তার বিয়ে হয়ে গেছল। বড়লোকের মেয়ের রূপের ঘাটতি পূরণ করা কঠিন কিছু নয়। আপাদ-মস্তকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মনে মনে অতসী তাকে খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছে। শীগগিরই ছেলেপুলে হবে বোঝা যায়।

সমর ঘোষালও সেই প্রথম বাড়িতে এসেছে। তার কথায় উচ্ছ্বাস বা আতিশয্য নেই এটুকু ভালো লেগেছে। কিন্তু কথাগুলো খুব পছন্দ হয়নি। বলেছিল, ফার্স্ট ক্লাস পেলে আরো কত যে ভালো লাগত...মনে মনে আশাও করেছিলাম।

শুনে অতসী হেসেছে, কিন্তু ভেতরটা চিনচিন জ্বলেছে।...কারণ, এই লোক এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি বলেই তার নিজের ফার্স্ট ক্লাস পাবার উদ্দীপনাটা দ্বিগুণ বেড়ে গেছল। খেটেওছিল খুব।

এরপর দু'মাসের মধ্যে সমর ঘোষালের আর দেখা নেই। কেউ লক্ষ্য করছে না, অতসীর দুই ভুরুর মাঝে একটু কোঁচকানো ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সমর ঘোষালের বাড়িতে টেলিফোন আছে। নম্বরও জানা। বাইরে বেরিয়ে একটা ফোন করলেই হয়। তাতেও ভিতর থেকে বাধা।

না করে ভালই করেছে। আরো দিন দুই যেতে নিজেই এসে হাজির। বেলা তখন এগারোটা বেজে গেছে। অতসীর কেন যেন মনে হল, তার এখানে বসার ঘর বলতে একটাই, এবং সেটা বাবা মা ভাই বোন সকলের অধিকারে, আর কারো হানাদারি অভিপ্রেত নয় বলেই অসময়ে আসা। এটা কোনো ছুটির দিন নয়, এক বাবা-মা ভিন্ন আর কারো বাড়িতে থাকার সম্ভাবনাও কম।

বসতে দিয়ে এবং নিজে মুখোমুখি বসে নিরীহ প্রশ্ন করল, এ সময়ে যে...আজ কলেজ ছিল না?

—ছিল, কাল রাতে হঠাৎ ছোট্ট একটা গল্প মনে পড়ে যেতে একটু বাড়তি উৎসাহ নিয়ে কলেজ বাতিল করে তোমার এখানে চলে এলাম।

—তাই নাকি, কি এমন গল্প?

দ্বিধা-ভরে অন্দরের খোলা দরজার দিকে একবার তাকালো।—ইয়ে...কেউ নেই তো?

—তোমার গল্প শোনার জন্য কান পেতে বসে থাকার মতো কেউ নেই।

শুনে বেশ একটু জোরের সঙ্গেই সমর ঘোষাল বলল, তাহলে আজ আর আমাকে ঠেকায় কে? গল্পটা ছোট্ট, সাদা-সাপটা ব্যাপার।...কোনো ছেলের এক মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছে, কিন্তু অনেক পাঁয়তারা কষেও মেয়েকে কথাটা বলে উঠতে পারছে না। শেষে কি বলবে, অনেক গুছিয়ে রিহার্সাল দিয়ে বলবেই পণ করে সেই মেয়ের কাছে হাজির। কিন্তু এত বারের রিহার্সাল দেওয়া ভালো-ভালো সব কথাগুলোই ভুল হয়ে গেল। ফলে নিজের ওপরেই বিষম রেগে গিয়ে ঠাস-ঠাস করে কেবল তিনটে কথা বলে উঠল, আমি তোমাকে চাই। শুনে মেয়েটি একবার শুধু তাকালো বলল, নিয়ে নাও।...ছেলেটা হাঁ। ভাবছে ডারনড ইজি। সো ইজি।

দুই ঠোঁট চেপে অতসী হাসছে, চোখেও হাসি উছলে উঠেছে।

এবারে সমর ঘোষাল চেষ্টা করে গম্ভীর।—ভাবলাম ঝপ করে বলে ফেলতে পারলে

কপাল জোরে আমার কেসটাও তো ডাবলড ইজি অ্যান্ড সো ইজি হয়ে যেতে পারে —হাসি নয়, পারে কি পারে না বলো?

দুই ঠোঁটে আর চোখে হাসিটুকু তেমনি আগলে রেখে অতসী মাথা নাড়ল। পারে।

সঙ্গে সঙ্গে সমর ঘোষাল চোখ পাকালো, তাহলে দু'দুটো মাস আমাকে যন্ত্রণার মধ্যে না রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ফোন করলেই তো হত—করোনি কেন?

বসার ঢংটা একটু শিথিল করে নিয়ে অতসী বলল, এবার তাহলে আমার একটা ছোট্ট গল্প শোনো।...এক ছেলের আর এক মেয়ের ভাব-সাব, দু'জনে দু'জনকে পছন্দও করে, তাই থেকে মেয়েটার ধারণা ছেলেটাকে তার ষোল আনা জানা হয়ে গেছে। মেয়েটি একদিন প্রস্তাব করল, এবারে আমরা বিয়ে করে ফেললে কেমন হয়। মুখে চিন্তার ছায়া ফেলে ছেলেটা জবাব দিল, হয় তো ভালই কিন্তু কে আর আমাদের বিয়ে করতে এগিয়ে আসছে বলো...। তাই আমি ষোল আনা বোঝার জন্য তোমার গল্পটা আগে শোনার অপেক্ষায় ছিলাম।

এবারে সমর ঘোষাল এত জোরে হেসে উঠল যে নিজের ঘরে বসেও অতসী সচকিত একটু।

—তাহলে চলো উঠে পড়া যাক, এই দিনে ঘরে বসে আর ডাল ভাত-মাছ ভালো লাগবে না।

স্নান সারাই ছিল, খুশি হয়ে অতসী দশ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে এলো। তার এই অনাড়ম্বর ছিমছাম ভাবটা শুরু থেকেই সমর ঘোষালের পছন্দ। আর কেউ হলে কম করে আধ-ঘন্টা সময় নিত।

পার্কস্ট্রীটে এসে একটা ভালো রেস্তোরাঁ বেছে নিল। খাওয়ার ফাঁকে টুকটাক ভবিষ্যতের কথা শুরু হল। সমর ঘোষাল প্রস্তাব করল, তা'হলে মা-কে বলি পুরুত ডেকে যত তাড়াতাড়ি হয় দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলুক?

অতসী বলল, পুরুত ডেকে পিঁড়িতে বসে বিয়ে আমার পছন্দ নয়, তার থেকে রেজিস্ট্রি বিয়ে হোক।

—সে কি! কেন?

অতসী খুব অনায়াসে বলে গেল, কেন বুঝতে পারছ না? বড় বোনের বিয়ে দিতে গিয়েই বাবা প্রায় নিঃসম্বল, ছোট বোন দুটো এখনো কলেজে আর ভাইটা স্কুলে পড়ছে। ঘটার বিয়ে হলে লোকজনের ভিড় হয়ই, আর কনের সঙ্গে তারা আর কি ঘরে আসছে তা-ও লক্ষ্য করে। তুমি যখন বড়লোকের সালঙ্কারা কন্যা ঘরে এনে তুলছ না, আমার দিকের দৈন্য সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দরকার কি? এর থেকে নির্ঝঞ্ঝাটে রেজিস্ট্রি বিয়ে অনেক স্বস্তির হবে।

সমর ঘোষাল খাওয়া থামিয়ে শুনল। আরো মুগ্ধ হল। মাথা নেড়ে আন্তরিক সায় দিল।—খুব যুক্তির কথা, মা একটু খুঁত খুঁত করবে, কিন্তু কি আর করা যাবে! ঠিক আছে, রেজিস্ট্রি বিয়েই হবে।

এবারে অতসীর সোজা-সরল প্রশ্ন, এ-তো হল, তারপর?

—তারপর কি?

—বিয়েব পবেব প্রোগ্রামটা কি?

—আই এ এস পবীক্ষায ওপবেব দিকে ঠাঁই পাওযাব জন্য এবাবে আবো আদা-জল খেযে লাগব...মনে হয ভালোই কবব।

নিরুত্তাপ গলায অতসী বলল, মনে হয কেন, পবীক্ষা দিলে ভালো কববেই। ...কিন্তু আমাব দিকটা তাহলে ভাবছ না—

সমব ঘোষাল শশব্যস্ত, কেন কেন—তোমাব কথা ভেবেই তো আমাব আবো বেশি পছন্দ—কিন্তু তুমি কি ভাবাব কথা বলছ?

অতসী মুখেব দিকে চেযে টিপ-টিপ হাসছে।—তুমি আই এ এস অফিসাব হযে জাযগায-জাযগায ঘুবে বেড়াবে আব আমি তাহলে সেই অতসী ফুলটি হযেই কেবল তোমাব ঘবেব শোভা বাড়াবো?

এ দিকটা ভাবা হযনি বটে, সমব ঘোষাল মনে মনে একটু হোঁচট খেযে উঠল। তাবপব ব্যস্ত মুখেই বলল, তোমাবও তো কোযালিফিকেশন কম নয, তুমিও ভালো চাকবি পেযে যেতে পাবো, আব গভর্নমেন্টেব চাকবি হলে দু'জনেব এক-জাযগায থাকতেও অসুবিধে হবে না।

মুখে হাসিব আভাস লেগেই আছে। দু'চামচ ফ্রাযেড-বাইস চালান দিযে চিবুতে চিবুতে বলল, পাঁচ বছব ধবে ছেলে-মেযে পড়াচ্ছি, এই এক চাকবি ছাড়া আমাব আব কিছু ভালো লাগবে না। বি. এ এম এ-ব একটাতেও ফার্স্ট ক্লাস পেলাম না, গভর্নমেন্ট কলেজে চাকবি পাওযাব কোনো আশা নেই, এ তুমি খুব ভালোই জানো। গভমেন্ট স্কুলে চাকবি পেতে পাবি হযতো, কিন্তু আই এ এস অফিসাবেব বউ স্কুল মাস্টাব এটা তোমাব খুব ভালো লাগাব কথা নয, আব এখানকাব প্রাইভেট কলেজেব চাকবি যদি জোটেও তোমাব বদলীব চাকবিব সঙ্গে খাপ খাওযাব কোনো আশাই নেই, তখন তুমি এক জাযগায আমি এক জাযগায। গা-ঝাড়া দিযে হেসে নিল একটু. মোট-কথা তোমাব ওই আই এ এস চাকবি আমাব একটুও পছন্দ নয।

বলাব সুবটুকু এমনি সহজ অথচ স্পষ্ট যে সমস্যাটা সমব ঘোষালেব কাছে আন্তবিক হযে উঠল। একই সঙ্গে চিন্তাব কাবণও। বলল, তা'হলে এ-বকম একটা বাজে কলেজেই পড়ে থাকব?

—তা কেন, আগাগোড়া ভালো কেবিযাব তোমাব, ইংবেজিব মতো সাবজেক্ট একটাতে ফার্স্ট ক্লাস আব একটাতেও অদ্বিতীয সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট, এই প্রভিন্সেব এতগুলো যুনিভার্সিটিব কোথাও না কোথাও অনাযাসে ঢুকে পড়তে পাবো—পাবো না?

সমব ঘোষাল সায় দিল, তা পাবি।

উৎসাহে অতসীব মুখখানা আবো সুন্দব লাগছে।—টিচিং লাইনে এলে কত ছুটি ভেবে দেখেছ, আব কত সুবিধে? নিজেদেব মধ্যে আমবা কত সময় পাব—ইচ্ছে কবলে তুমি ডক্টবেটেব থিসিস সাবমিট কবতে পাবো, পযসা কবাব ইচ্ছে থাকলে ছাত্রদেব জন্য দবকাবি বই লেখাবও অঢেল সময পেতে পাবো—আই এ এস'এব পিছনে ছুটে কেবল প্রতিপত্তি ছাড়া খুব বেশি আব কি পাবে?

কান জুড়নোর মতোই কথা আর যুক্তি। সোৎসাহে বলল, বেশ বেশ। আমি কোনো যুনিভার্সিটির চাকরিতেই ঢুকে গেছি ধরে নাও কিন্তু তখন তুমি কি করবে?

অতসীর হালছাড়া হাসি আর জবাব, তখন আমার আর কি সমস্যা। যেখানে তুমি, আমিও সেখানেই। কলেজের মোহ আমার নেই, স্কুলের চাকরি তো একটা জোটাতে পারবই। প্রোফেসর হলে তখন আমার স্কুলের চাকরি নিয়ে কারোই কোনো কমপ্লেকস থাকবে না—দু'জনের রোজগারে দিব্যি চলে যাবে—তার বেশি আমাদের দরকার কি?

সমর ঘোষাল মুগ্ধ চোখে খানিক চেয়ে রইলো। তারপর আধাভরাট খাবারের ডিশ ফেলে কেবিনের পর্দা ঠেলে বেরিয়ে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এলো। ফিরে এসে অতসীর গলা জড়িয়ে ধরে ফ্রায়েড রাইস আর চিলি-চিকেন খাওয়া মুখে গভীর একটা চুমু খেল।

অতসীর হাঁসফাঁস দশা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তুমি একটি অসভ্য।

সমর ঘোষাল বলল, তোমার থেকে আমি যত ভালো রেজাল্টই করি, প্র্যাকটিকাল বিচারবুদ্ধিতে আমি তোমার নখের যোগ্যও নই।

অতসীর হাসিমুখ, সেই সঙ্গে ধমকের গলা, তা'বলে ভক্তিশ্রদ্ধার ঠেলায় এ-রকম হামলা। আরো সুযোগ সুবিধে থাকলে কি করতে?

শোনার পর সমর ঘোষালের দু'চোখে সত্যিই তিমির-তৃষ্ণা।

বিয়ে হয়ে গেল। অতসী গাঙ্গুলি অতসী ঘোষাল হল।

এর পরের সব-কিছুই যেন তাদের ইচ্ছার অনুকূলে সাজানো। তাদের বলা ঠিক হল না, অতসীর। সমর ঘোষাল যুগপৎ খুশি এবং অবাক হয়ে দেখছে পরের সব পদক্ষেপ অতসীর হিসের মতোই দু'জনকে বাস্তবের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

...ভালো মতো একটু নড়া-চড়া করতে দেখা গেল অতসীর কথা মিথ্যে নয়, কলেজ-যুনিভার্সিটির চাকরি যেন তার জন্য হাঁ করেই ছিল। মফঃস্বল কলেজের সরকারী চাকরি পছন্দ হল না, নর্থবেঙ্গল যুনিভার্সিটিতে লেকচারারের পোস্টটাই পছন্দ। এখানকার শ্রদ্ধেয় ইংরেজির প্রোফেসরও এই চাকরিই নিতে পরামর্শ দিলেন। আর বললেন, এ-লাইনেই এলে যখন যত তাড়াতাড়ি পার ডক্টরেটটা করে নাও, নইলে এগোতে অসুবিধে হবে।

সমর ঘোষাল তাঁরই আন্ডারে রিসার্চ করবে স্থির করেই রেখেছিল। ভদ্রলোকের খুবই স্নেহের পাত্র সে, খুশি হয়েই রাজি হয়ে গেলেন। কয়েক দিনের আলোচনায় রিসার্চের বিষয়ও স্থির করে অতসীকে নিয়ে সে শিলিগুড়ি রওনা হয়ে গেল। প্রোফেসার দূরে থাকলেও অসুবিধে কিছু হবার কথা নয়। মাঝে মধ্যে কলকাতায় আসতে হবে, ভেকেশনগুলো আছে, এটা কোনো বাধাই নয়।

যুনিভার্সিটি ক্যামপাস কলেজ থেকে অনেকটাই দূরে। এই এলাকায় ঘর আগেই ঠিক করে রেখে গেছল। দোতলা বাড়ির একতলায় দু'খানা বড় ঘর, কিচেন বাথ ইত্যাদির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাও অপছন্দের নয়। কলকাতার ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে এ-

বকম ফাঁকা জাযগায এসে অতসী খুশি। শিলিগুড়ি শহবেও শুনেছে লোকেব মাথা লোকে খায, শহবেব ভিতব দিযে আসাব সময যেটুকু দেখেছে তাতেই হাঁপ ধবাব দাখিল। এখানে এসে ওঠাব পব একটু কেবল খুঁতখুঁতুনি থেকেই গেল। বড় হলেও ঘব মাত্র দু'খানা। এবপব লোকজন আসা শুরু হলে তাদেব কোথায বসাবে কি কববে? যাক, অতসী কোন কিছুতে ঘাবড়াবাব মেযে নয, পুরুষেব বুদ্ধিতে যেটুকু হযেছে তাই যথেষ্ট, পবে দেখা যাবে।

নতুন একটা সংসাব পেতে বসাব ঝামেলা যে কত, দেখে প্রায অসহায অবস্থা সমব ঘোষালেব। ব্যবস্থা কবা আব গোছগাছেব ঠেলায অতসীব ফুবসৎ তো নেই-ই, নতুন কর্তাটিবও নাজেহাল দশা। তাব ওপবেও ফবমাশ বর্ষণ হযেই চলেছে, এটা আনো ওটা আনো, এটা কবো ওটা কবো। অতসীবও তো নতুন সংসাবই, সব একেবাবে মনে পড়ে না। ফলে যা একবাবে হযে যায তাব জন্য তিন বাব কবে ছোটাছুটি। আবাব ফবমাশ অনুযাযী যা আনে তাব বেশিবভাগই পছন্দ হয না, নাক-মুখ কুঁচকে বলে ওঠে, এ-বকম আনলে কেন—ও-বকম পেলে না? এ মা, প্লাস্টিকেব এত বড় বালতি আনতে বলেছি তোমাকে! দেখ কাণ্ড, কিচেন বাথরুম টযলেটেব জন্য তিনটেই লাল মগ—কোনো বুদ্ধি যদি থাকত, বদলা-বদলি হযে গেলে টেব পাবে।

ঘাম ঝবা নাক-মুখ কোঁচকানো মূর্তিখানা চোখে মিষ্টিই লাগে সমব ঘোষালেব, তাই বিবক্তিব বদলে হাল ছেড়ে বসে পড়ে।—আমাব দ্বাবা আব কিসসু হবে না, আমাব বদলে ওই ছেলেটাব ওপব তোমাব সর্দাবি চালাও।

ছেলে বলতে ওপবতলাব ভদ্রলোকেব ঠিক-কবা কাজেব লোকটা। জোযান, গাঁটা-গোট্টা চেহাবা, ভাবলেশশূন্য পালিশ কবা মুখ, নাম শেবিং। এই তিন দিন ধবে তাব নীবব দর্শক আব কলেব পুতুলেব মতো হুকুম তামিলেব ভূমিকা। বাংলা বলতে পাবে না, ভাঙা-ভাঙা হিন্দি বলতে পাবে এবং বোঝে। গত তিন দিন যাবত এই বংগালী মেমসাবটি তাব মনোযোগী দ্রষ্টব্যেব একজন। অতসী চাপা গলায গজগজ কবে উঠল, একটু গুছিযে নিযেই ওকে আমি তাড়াব, সব টানা-হেঁচড়া কবতে কবতে কতবাব কবে বুকেব কাপড় কাঁধেব কাপড় সবে যাচ্ছে, ওব হাঁ-চোখ দৃষ্টি তখনো নড়ে না—

একটা সিগাবেট ধবাবাব ফাঁকে সমব ঘোষাল আড়চোখে লোকটাকে দেখে নিযে বলল, বুক-কাঁধেব কাপড় তাহলে আব একটু বেশি-বেশি সবাও, দেখবে ও খুশি হযে আমাব থেকে ঢেব বেশি পছন্দ মতো তোমাব সব কাজ কবে কম্মে দেবে।

কিছু একটা উদ্দেশ্য নিযে অতসী বড় স্টিল ট্রাঙ্কটাব ও-ধাবে গিযে দাঁড়িযেছিল। ঠাট্টাব জবাবে গম্ভীব মুখে দেখে নিল একবাব তাবপব লোকটাব দিকে ফিবল।—শেবিং!

দু'চোখ তাব মুখেব ওপবেই ছিল। গলা দিযে বিড়বিড় শব্দ বাব হল, জি মেমসাব—

পাঁচ-পাঁচটা বছব মাড়োযাবী বাড়িতে মাস্টাবী কবাব ফলে অতসী হিন্দিটা মোটামুটি বপ্ত কবেছে। আঙুল দিযে ট্রাঙ্কটাব উল্টো দিক দেখিযে হুকুম কবল, ইধাব আও।

সমব ঘোষাল বুঝল ট্রাঙ্কটা যেখানে ছিল সেখানে বাখা আব পছন্দ নয়, অন্যত্র সবাবে। এ-বকম ওলট-পালট কবেই চলেছে। শেবিং এগিযে এসে যথাস্থানে দাঁড়ালো। ভাবলেশশূন্য দু'চোখ তখনো কর্ত্রীব মুখেব ওপব।

—আপনা দো আঁখো জমিন পব বাখো।

এবাবেব হুকুম শুনে সমব ঘোষাল ত্রস্ত একটু। লোকটা তাই কবল। দু'চোখ নিজেব পাযেব দিকে নামালো।

—আব উধাব পাকডো—আঁখো মাৎ উঁচানা—

ঝুঁকে অতসী নিজে ট্রাঙ্কেব এ-দিকেব আংটা ধবল।—লে আও।

ধবাধবি কবে ঢাউস ট্রাঙ্ক পছন্দেব জাযগায বেখে অতসী সোজা হযে দাঁড়ালো। কাজ সেবে লোকটাও মুখ তুলেছিল, কিন্তু সমব ঘোষাল আশ্চর্য হয়ে দেখল, কর্ত্রীব সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দু'চোখ আবাব মাটিব দিকে।

আব তুমি বাহাব যা কে ঠাযবো, হম বোলাযগা।

ঘব ছেড়ে বাইবেব বাবান্দায গিযে দাঁড়ালো। দৃষ্টি তাব পবেও পাযেব দিকে।

সমব ঘোষাল এবাব চাপা গলায বলে উঠল, এ-বকম কবলে লোকটা পালাবে যে।

অতসীব গম্ভীব মুখেব দুই ঠোঁটে এবাবে একটু হাসিব ফাটল। বলল, বেশি বাডলে তোমাবও ওই দশা হবে।

সমব ঘোষালেব মনে হযেছে এই ব্যক্তিত্বেব মাধুর্যটুকুই দু'চোখ ভবে দেখাব মতো।

দিন সাতেকেব চেষ্টায সব-কিছু চলনসই। মনে হল অতসীব। বড সমস্যা ছিল বান্না নিযে। কাবণ কলকাতায যেভাবে দিন কেটেছে, অতসীব কখনো বান্নাঘবে ঢোকাবও সময হযনি। এ-ব্যাপাবে তার সহজাত ঝোঁকও নেই। ওপবতলাব ভদ্রলোক বলে দিযেছিলেন, বাঙালি বাডিতে কাজ কবে কবে শেবিং মোটামুটি বান্নাও শিখেছে। দু'তিন দিন যুনিভার্সিটি-ক্যান্টিন থেকে খাবাব আনিযে লাঞ্চ ডিনাব সাবা হযেছে। কিন্তু এ-ব্যবস্থা ক'দিন আব চলতে পাবে, তাছাডা ক্যানটিন খুব কাছেও নয়। শেবিং কলেব মানুষ, তাই কর্ত্রীব কোনো হুকুমে তাব মুখে বিবক্তিব ছাযা নেই। আব তাব দু'চোখও এখন সর্বদা মাটিব দিকে। অতসী লক্ষ্য কবেছে সকালেব ব্রেকফাস্ট চা টোস্ট ডিমসেদ্ধ বা ওমলেট তাব আযত্তেব মধ্যে, বিকেলেবটা এপর্যন্ত পবখ কবা হযনি, কাবণ ক্যানটিনে সে-সময লুচি-পুবি তবকাবি আলুব দম ভালোই মেলে। অতসী হুকুম কবা মাত্র কলেব মানুষটা আশ্চর্যবকম তৎপব হযে তড়িঘড়ি নিযে আসে। অতসী এবপব তাকে বান্না-ঘবে ঠেলেছে। জিগেস কবা মাত্র সে বলেছে বাঙালী বান্না সে সবই জানে। কিন্তু তাব জানাব বহব দেখে প্রথম দিনই সমব ঘোষালেব দু'চোখ কপালে। ভাতে খুব ত্রুটি নেই, কেবল সেদ্ধ একটু কম, ডালেব সঙ্গে ভাজাও ঠিকই আছে, কিন্তু ডালটাকে ফ্রাযেড ডাল বলা যেতে পাবে। তবকাবি যা পাতে পড়ল সেটা একটা স্বাদশূন্য বকমাবি আনাজেব ঘ্যাঁট, মাছেব ঝোল একদিকে আব কডা ভাজা মাছেব খণ্ড আব একদিকে। তা-ও ছনছনে ঝাল।

প্রথম দিনেব বান্না কিছুটা চালান দিযেই হতাশ গলায সমব ঘোষাল বলে উঠেছিল, এবাবেই হযে গেল, দু'জনেবই আলসাব অনিবার্য।

অতসী কিন্তু মোটামুটি খেতে পেবেছে। ধমকেব সুবে বলেছে, একটু ধৈর্য ধবো তো, বলে দিলে আস্তে আস্তে সব ঠিক হযে যাবে।

কিন্তু সাহেবেব খাওযা দেখে শেবিঙেব নিজেবই খটকা লেগেছে। চাব ভাগেব তিন ভাগ তাব পাতে পড়ে। নিজেব পাযেব দিকে চোখ নামিযে মেমসাহেবেব কাছে নিবেদন কবেছে, মিট-কাবি, এগ কাবি সুপ-এ-সব হলে সে ভালো খানা পাকাতে পাবে।

দেখা গেল এ-গুলো সত্যিই চলনসই। কিন্তু দু'বেলা এই একই জিনিস কাঁহাতক চলে। দু'দিন না যেতে বিবক্ত হযে সমব ঘোষাল বলে উঠেছে, শোনো, আমাব জন্য সব কেবল সেদ্ধ কবে বাখতে বোলো, আমি সেদ্ধ-ভাত খাব। ডাল তবকাবি সুক্তোব স্বাদ তো ভুলতেই বসেছি।

শোনামাত্র অতসীব তপ্ত মুখ।—আমি যা পাবি না তা নিযে খোঁচা দিযে লাভ কি, তোমাব হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, দেখেশুনে একজন বাঁধুনি বিযে কবলেই ভালো কবতে। বোসো দু'দিন, সব ঠিক হযে যাবে।

দু'দিন যেতে দেখা গেল সত্যি অনেকটাই ঠিক হযে এসেছে। ডাল তবকাবী মাছ সবই মুখে দিতে পাবছে। কি ব্যাপাব? না, অতসী সোজা গিযে ওপবতলাব গৃহিণীব শবণাপন্ন হযেছিল। সমস্যাব কথা শুনে তিনি নেমে এসে হাতে ধবে শেবিংকে এই তিনটি জিনিস বাঁধতে শিখিযেছেন। এখন নাকি সুক্তো বাঁধতে শেখাচ্ছেন। অতসী হেসে সাবা, মহিলা যা দেখান যা শেখান শেবিঙেব মাটিব দিকে চোখ, শেষে ধমক খেযে বুঝেছে বান্না শেখাব জন্য তাঁব দিকে তাকানো যেতে পাবে।

সাত আটদিন যেতে অতসী নিজেব ভাবনা ভাবতে বসল। স্কুলেব চাকবি একটা জোটাতে হবে। কেবল এখানে কেন, কালিম্পং কাবসিযাং দার্জিলিং-এ যেতে হলেও তাব আপত্তি নেই। মেযেদেব হস্টেলে থাকবে, শনি বোববাবে বা অন্যান্য ছুটিব দিনে চলে আসবে। এ ক'টা দিন যেতে সমব ঘোষালও মোটামুটি সুস্থিব। ঘব গোছানো আব সংসাব পাতা নিযে অতসীব ফবমাশেব পব ফবমাশ, অনাদিকে ছাত্র পড়ানোব প্রস্তুতি—কোনো দিকে তাকানোব অবকাশ ছিল না। পবামর্শেব জন্য অতসী তাকে টেনে এনে সামনে বসালো—ইংবেজিটা তুমি আমাব থেকে ভালো জানো যখন নিজে আব কষ্ট কবি কেন, আমাব বাযোডাটা দিযে দবখাস্তেব জেনাবেল একটা খসডা কবে দাও, তাবপব চেষ্টা শুরু হোক, এ ক'টা দিন তো নিজেব তালেই কাটালে—

মুখেব দিকে চেযে এই প্রথম কি একটু বাতিক্রম চোখে পড়ল সমব ঘোষালেব। উঠে এসে সামনে দাঁড়ালো। —দেখি দেখি! দু'হাতে মাথাটা ধবে সামনে টেনে নিবিষ্ট চোখে কিছু দেখাব চেষ্টা, সঙ্গে মন্তব্য, একটা মাইক্রোসকোপ থাকলে ঠাওব কবা যেত—

অতসীব গলা দিযে প্রায আর্তনাদেব মতো বেবুলো, কি—পাকা চুলটুল নাকি?

সমর ঘোষাল হাসতে লাগল, বলল, না, লাল আঁচড়ের মতো একটু কিছু চোখে পড়েছে, এ ক'দিন খেয়ালই করিনি, কপালে এমন সুন্দর টকটকে সিঁদুরের টিপ পরতে, সিঁথির সিঁদুরও আগুনের শিখার মতো জ্বলজ্বল করত—সে-সব এরই মধ্যে বাতিল।

যাও! অতসী দু'হাতে তাকে ঠেলে সরালো।—কলকাতায় তোমার মায়ের পছন্দে ও-রকম পরতে হত, এখানে আমি ও-রকম গেঁয়ো সেজে বেড়াবো?

—সত্ত কেন, তোমার ফর্সা কপালে অমন টকটকে সিঁদুর টিপ আমার তো খুব ভাল লাগত, আর মনে হত একমাত্র আমি ছাড়া আর সকলের বেশি কাছে আসা নিষেধ।

অতসীর মুখে রাগত হাসি।—আর এখন কি মনে হচ্ছে, দু'হাত বাড়িয়ে সকলকে আমি কাছে ডাকছি?

সমর ঘোষাল মাথা নেড়ে সায় দিল, অর্থাৎ সে-রকমই লাগছে। তারপর নিরীহ প্রশ্ন, শেরিংকে ডেকে যাচাই করে নেব?

—যা বললাম, বসে করবে না এইসব করবে?

জবাবে আগে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল।—তা করতেই বা হাত উঠছে কই, এখন ধরো তোমার যদি কারসিয়ঙ বা দার্জিলিং-এ চাকরি হয়, আমার ভালো লাগবে? এখন তো ভাবনা আরো বাড়ল, তোমাকে কুমারী ভেবে ভালো লোকও যদি বেশি কাছে আসতে চায় তাকে দোষ দেওয়া যাবে না।

সমর ঘোষাল আশা করেছিল এতটা বলার পর ওই ফর্সা কপালে ছোট হলেও একটা সিঁদুর টিপ আর সিঁথির লাল আচড় আর একটু উজ্জ্বল দেখবে। এ ক'দিনে ওটুকু ভারী পছন্দের হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু দেখা গেল না।

তিন দিনের মধ্যে এই একই প্রসঙ্গে আবার একটু মজার যোগাযোগ। অতসী এখনকার সব থেকে নাম-করা মেয়ে স্কুলে এসে হাজির। ব্যাগে দরখাস্ত। নারভাস হবার মেয়েই নয় সে। অফিসের কেরানীর কাছে আগে প্রিন্সিপালের নাম জেনে নিল, মিসেস হৈমন্তী খাসনবিশ। তারপর বেরিয়ে এসে স্লিপে নিজের নাম লিখতে গিয়েই ভুল। লিখেছে শ্রীমতী অতসী গাঙ্গুলি। বিরক্তির একশেষ। দ্বিতীয় স্লিপে শ্রীমতী অতসী ঘোষাল লিখে বেয়ারার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিল। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ডাক এলো।

ব্যাপারটাই বোধহয় খাপছাড়া আজ। ঘরে পা দিয়ে নিজের অগোচরেই একটু অভব্যতা করে ফেলল। কারণ স্কুলের কোনো প্রিন্সিপালের এমন দশাসই চেহারা তার কল্পনার বাইরে। পোশাক পরিচ্ছদও একটু বিচিত্র ধরনের। বিশাল টেবিলের ওধারে মস্ত একটা রিভলভিং চেয়ার জুড়ে বসে অল্প অল্প দোল খাচ্ছেন। পরনে সাদা সিল্কের শাড়ি, গায়ে কাজ করা সিল্কের সাদা ব্লাউস, তার ওপর সাদা কাজ করা খয়েরি রঙের ঢাউস একটা বুক-খোলা এপ্রনগোছের হাফ-হাতা লং কোট। মাথায় অবিন্যস্ত সাদা-কালো চুলের বোঝা। নাকের নিচে ঘন লোম, দুই গালেরও অনেকটা আর হাতের কনুই থেকে যেটুকু চোখে পড়ে তা-ও ঘন লোমে বোঝাই। মুখের ছাঁদ পুরুষালি। শাড়ি

পবা না থাকলে বা খোলা এপ্রনেব মাঝখানে বক্ষেব বিপুল স্তন-ভাবেব আভাস না দেখা গেলে মেযে কি পুরুষ ভেবে দু'চোখ আবো বেশি বিভ্রান্ত হত।

ইযেস? আই অ্যাম মিসেস খাসনবিশ, সীট ডাউন প্লীজ। হোযাট ডু ইউ ওযান্ট?

অতসী ধবেই নিল সে ফেল। মানে মানে এখন সবে পডলেই হয। সেটা কবা আবো বিসদৃশ। দু'হাত জুডে একটু বেশি আনত হযে শ্রদ্ধা জানালো। মহিলাব দিক থেকে তাব কোনো জবাব মিলল না। বিশাল টেবিলেব এ-ধাবেব চেযাবে মুখোমুখি বসল। কিন্তু তাঁব চোখে চোখ বাখতে মনে হল, উনি যেন প্রথম দর্শনে ওব ভেবা-চ্যাকা খাওযা মূর্তি দেখে বেশ মজা পাচ্ছেন।

অতসী সবিনযে জানালো, সে একটা চাকবিব চেষ্টায এসে তাকে বিবক্ত কবতে বাধ্য হযেছে, এই এই কোযালিফিকেশন, যদি কোনো সুবিধে হয।

মিসেস খাসনবিশ ঝুকে আব একবাব স্লিপেব নামটা দেখলেন। গলাব স্বব এমনিতেই ফ্যাসফেসে, প্রশ্ন আবো রুক্ষ। এম, এ অ্যান্ড বি, এ ফ্রম হোযাট যুনিভার্সিটি?

—ক্যালকাটা যুনিভার্সিটি?

—দেন হোযাই হিযাব?

অতসী সবিনযেই জানালো, হাসব্যান্ড এখানকাব যুনিভার্সিটিতে জযেন কবেছেন তাই সে এখানে। মাত্র আট দশদিন হল তাবা এখানে এসেছে।

তখুনি সেই সিঁদুব প্রসঙ্গেব পবোক্ষ যোগাযোগ। হাসব্যান্ড শুনে প্রিন্সিপাল লোমশ দুই হাত টেবিলেব ওপব বেখে সামনে ঝুঁকলেন, থলথলে মুখেব দু'চোখ তাব দিকে নিবিষ্ট হল। তাবপব মন্তব্য, ইউ আব ম্যাবেড দেন...। ক্রিশ্চিযান?

—না হিন্দু।

শুনে কৌতূহল বাডলো যেন।—কতদিন বিযে হযেছে?

—মাস দুই আগে ।

থলথলে মুখে হাসিব আভাস একটু। আবাবও তেমনি ঝুঁকে বসেই নিবীক্ষণ কবলেন একটু। তাবপব সোজা হযে বসে বললেন, আই অ্যাম সবি, ক্লাস ইলেভেন টুযেলভ-এব জন্য আমাব একজনই ইকনমিকস-এব টিচাব আছে। তাব বিটাযাবমেন্টেব এখনো বছব দুই বাকি—

ফ্যাসফেসে গলাব স্বব একটু সদয মনে হল অতসীব। দ্রুত ভেবে নিল, দু'টো বছব সে যে কোনো নিচু ক্লাসেও পডাতে প্রস্তুত, বলবে কি বলবে না। কিন্তু তাব আগেই মিসেস খাসনবিশ বললেন, বাট আই মে ট্রাই টু হেলপ ইউ...জলপাইগুডিব গার্লস স্কুলেব হেডমিসট্রেস আমাব বন্ধু, শী বিগাবডস মি, তাঁব স্কুলে ইকনমিক্স-এব একটা লিভ ভেকেন্সিব পোস্ট খালি আছে শুনেছি, তাঁব ইকনমিক্স টিচাবেব টিউবাবকিউলোসিস ধবা পডতে সে লং লিভ এ আছে, তিন চাব দিন আগে হেডমিসট্রেস আমাকে ফোনে জিগেস কবেছিলেন, আমাব চেনা-জানা কেউ আছে কিনা, আপনি—

অতসী তক্ষুনি বলে উঠল, আমাকে আপনি বলে লজ্জা দেবেন না—

খুশি।—অলবাইট, গো অ্যান্ড সি হাব, এর মধ্যে কাউকে নিযে নেওযা হযেছে কিনা জানি না, যদি না নেওযা হযে থাকে, ইউ হ্যাভ ফেযাব চান্স...ইউ মে বেফাব মি।

মহিলা এতটা সদয হতে পাবে আশাতীত। জলপাইগুড়িতে চাকবি হলে এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জাবি কবা জল-ভাত ব্যাপাব। অতসী আব একটু ঝুঁকে কৃতজ্ঞতায টুপটুপ্ সুবে বলল, ইউ আব সো কাইন্ড ম্যাডাম, যেখানেই চাকবি কবি দু' বছব বাদে হলেও আমি এখানে আপনাব আশ্রযে আসব এই আশা নিযে যাচ্ছি, আমাব সঙ্গে অ্যাপ্লিকেশন আছে, যদি অনুমতি কবেন তো এখনই সেটা বেখে যেতে পাবি...।

থলথলে মুখেব খাঁজে খাঁজে হাসি উছলে উঠল।—ট্যা ইযাবস...এ লং টাইম মাই ডিযাব, হাউ এভাব ইউ বিযেলি দিস বিজনেস...অ্যান্ড দ্যাটস গুড। লোমশ হাত বাড়িযে দিলেন, লেট মি হ্যাভ ইট।

ব্যাগ খুলে তৎপব হাতে অতসী অ্যাপ্লিকেশনটা বাব কবে খসখস কবে নিজেব নাম সই কবল। তাবপব একটু থমকে জিগেস কবল, ডেট দেব?

—ও সিওব...আই অলওযেজ ওযান্ট টু বি ফেযাব-ডেট, উইল ক্লেইম প্রাযবিটি, হু নোজ দ্যাট দি প্রেজেন্ট ইকনমিক্স টিচাব উইল নট কুইট, আবলিযাব...আই ডোন্ট লাইক হাব, নাইদাব সি ডাজ মি, নাও আই হ্যাভ ওযার্কস, টু ডু উইশ ইউ গুড লাক।

বলবে না বলবে না কবেও হেসে গড়িযে কর্তাটিব কাছে প্রিন্সিপাল মিসেস খাসনবিশেব তাকে কুমাবী ভাবাব কথাটা না বলে পাবল না। আগে ইন্টাবভিউব আদ্যোপান্ত বলে পবে এটুকু শুনিযেছে। সঙ্গে সঙ্গে হতাশায যেন ভেঙে পড়ে সমব ঘোষাল অতসীব গা-ঘেঁষে শুযে পড়ল।—তাহলে বোঝ, ঝানু মহিলাবাই তোমাকে কুমাবী ভাবছে, পুরুষেবা হামলে পড়বে না কেন?

তাকে ঠেলে সবাতে চেষ্টা কবে অতসী হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু আমাব তো মনে হয, আমাকে কুমাবী ভেবে ঠকেছেন বলেই উনি পবে বেশি সদয।

সমব ঘোষাল তড়াক কবে উঠে বসেছে, মিসেস খাসনবিশ সধবা না বিধবা?

জব্দ কবাব জন্যেই অতসী জবাব দিল, সধবাই শুনেছি, কিন্তু কপালে সিঁথিতে সিঁদুবেব বংশও নেই (শেষেবটুকু সত্যি)।

সমব ঘোষাল চোখ পাকালো তুমি আব ওই স্কুলেব ত্রিসীমানায ঘেঁষবে না।

দেখা গেল চাকবিব ভাগ্য অতসীবও খাবাপ নয। জলপাইগুড়ি স্কুলেব চাকবিটা পেল। হেড মিসট্রেস তাকে পবেব সপ্তাহ থেকেই জযেন কবতে বলেছেন। সমব ঘোষালও আপাতত নিশ্চিন্ত। এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জাবি কবা কঠিন কিছু নয। সমূহ বিচ্ছেদেব সম্ভাবনা থাকল না।

কৃতজ্ঞতা আব ধন্যবাদ জানাতে অতসী তাব পবদিনই এখানকাব মেযে স্কুলেব প্রিন্সিপাল মিসেস হৈমন্তী খাসনবিশেব সঙ্গে দেখা কবতে ছুটল। এবাব দিনেব সাক্ষাৎকাবেব মিযাদ মিনিট দুই তিন। বললেন, দ্যাটস ইযোব লাক, আই অ্যাম গ্ল্যাড। ওঠাব আগে একবাব শুধু জিগেস কবলেন, যে পোস্ট-এই যাও হোল-টাইম সীনিযব

টিচাবেব ইলেভেন টুয়েলভ ছেড়ে ক্লাস নাইন টেন-এও পড়াতে হয...হোযাট এলস ইউ ক্যান টিচ?

—বি. এ পাস-এ ম্যাথস ছিল...ইংবেজিও পড়াতে পারি।

অতসী পিছু হটাব মেযেই নয।

—থিংক, দ্যাট উইল ড়, ও, কে—উইশ ইউ গুড লাক এগেন।

উঠে আসাব আগে অতসী সবিনযে বলল, আমাকে যদি আপনি একটু মনে বাখেন...

জবাবে জাঁদবেল মহিলাব দু'চোখ ওব মুখেব ওপবে উঠে এলো।—ডোন্ট ওযাবি, আই উইল গেট বিপোর্টস ফ্রম মাই কাউন্টাব-পার্ট দেযাব।

সাদা কথায তাব ছাত্রী পড়ানোব কেবামতিব খবব এখানে বসেই তিনি পাবেন, মনে বাখা না বাখা এব ওপব নির্ভব কববে। অতসী আব কথা বাড়ানো নিবাপদ বোধ কবল না।

যে সহজ এবং সবল ব্যক্তিত্বেব আকর্ষণ প্রায সম-বযসী একটি ছেলে আব একটি মেযেকে এত কাছাকাছি টেনে এনেছিল, সেই ব্যক্তিত্বেব সংঘাতেই দু'জনেব দু'দিকে ছিটকে যেতে দু'বছবও সময লাগল না। অবশ্য এই ব্যক্তিত্ব তখন আব পবস্পবেব কাবো কাছেই সহজ বা সবল মনে হযনি। ভুল দু'জনেবই। স্বভাব বা ব্যক্তিত্ব কাবোই বদলাযনি, কিন্তু গোড়ায সেটা বুঝতে ভুল হযেছে। প্রাথমিক মোহ কেটে যেতে এই ভুল দিনে দিনে স্পষ্ট হযে উঠেছে।

অতসীব ভুল, বিদ্যায বুদ্ধিতে চাল-চলন আচাব-আচবণে পাঁচজনেব চোখে পড়াব মতো একজন জোবালো পুরুষকে জীবনেব দোসব হিসেবে পেতে চেযেছিল। সমব ঘোষালেব মধ্যে এই গুণগুলোই সে পুবোমাত্রায দেখেছিল। নিজেব ওপব এমনি প্রবল আস্থা যে, বিযেব পব ধবেই নিযেছিল এই জোবালো পুরুষটি এব পব ষোল আনা তাব। ধবে না নেওযাব কাবণও নেই, একে একে তাব সমস্ত ইচ্ছে মেনে নেবাব পবেই এই বিযে। এব পবেও এই জোবালো পুরুষেব সত্তাসুদ্ধু নিজেব দখলে টেনে আনতে পাববে তাই বা ভাবতে যাবে কেন? এটুকু পাবাব মধ্যেই আনন্দ, পবিতৃপ্তি। নিজেব জগতে ববাববই সে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। সম্রাজ্ঞীব জগতে গুণধব শক্তিধব পাত্র-মিত্র থাকবে বই কি। কিন্তু তাব ইচ্ছেব ষোল আনা অধীনে থাকবে। সম্রাজ্ঞীব জগতেব সে সম্রাট হলেও একই কথা। তাবও ইচ্ছেব অধীনে না থাকাটা বিদ্রোহেব সামিল।

এখানেই ভুল অতসীব। তাব ঘবেব পুরুষেব প্রবলতব সত্তাব হদিশ সে পাযনি।

সমব ঘোষালেব ভুল, অতসীব সব-কিছুব মধ্যে সে অনাড়ম্বব চবিত্রগত দৃঢ়তা দেখত, সহজ ব্যক্তিত্বেব মহিমা আবিষ্কাব কবত। মোহগ্রস্ত না হলে তাব মতো মানুষেব অনাপোস প্রবল ইচ্ছা আব ব্যক্তিত্বেব মধ্যে তফাৎটা চোখে পড়াব কথা। চোখে পড়াব মতো অনেক নজিবই তো তাব সামনে ছিল, যা তখন পড়েনি। আব তাব ফলে সমব ঘোষাল নিজেও মোহগ্রস্ত হযে ছিল নাঁ তো কি?

খিটিব মিটিব বাধতে লাগল অতি তুচ্ছ সব ব্যাপাব নিযে। দোষেব মধ্যে সমব ঘোষালেব সবেতে উৎসাহ, সবেতে আগ্রহ। বাড়িতে লোক-জন আসা শুরু হযেছে, ঘবে ভালো এক প্রস্থ টি-সেট ডিনাব সেট এনে বাখা দবকাব। শুনেছে ফ্যান্সি মাবকেটে এ-সব খুব ভালো পাওযা যায। কিন্তু সব-কিছু সেখানে সাদা পথে আসে না বলে পুলিশেব হানাদাবিও হয শুনেছে। ছোট বড হাঙ্গামাও বাধে। তাই অতসীকেও সঙ্গে নিতে ভয। কিন্তু একলা গেলে সমব ঘোষালেব আব ভযেব কি আছে, চোবাই মাল তো আব কিছু কিনতে যাচ্ছে না। স্কুল কবে ট্রেনে ফিবে বাড়ি পৌঁছুতে অতসীব প্রায বাতই হযে যায। এই ফাঁকে তাকে খুশি এবং অবাক কবে দেওযাব জন্য সমব ঘোষাল একাই ফ্যান্সি মার্কেটে চলে গেছে। তাব বিশ্বাস অনেক দেখে আব যাচাই বাছাই কবে চোখ-জুড়ানো জিনিসই এনেছে। কিন্তু দেখে শুনে অতসীব ঠাণ্ডা মুখে চাপা বিবক্তি, তোমাকে এমন সর্দাবি কবতে কে বলেছিল, আব দুটো চাবটে দিন সবুব সইলো না?

সমব ঘোষালেব ভেবা-চ্যাকা খাওযা মুখ।—কেন, তোমাব পছন্দ হল না?

—না হলে কি কবব, টি সেটেব এত হালকা বং ক'দিন চকচকে থাকবে? ডিনাব সেটেব ডিজাইন আবাব তেমনি জববজং—এ বাপু চলবে না, বদলে নিযে এসো।

তিন বাব কবে ছোটাছুটি কবে সমব ঘোষালের হাঁপ ধবাব দাখিল, আব দোকানদাবও বিবক্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতসীব ষোল আনা পছন্দেব জিনিস আনাই গেল না।

অতসীব সময কম, এটা ওটা আনাব হুকুম হযই। নতুন আব এক সেট জানলা দবজাব পর্দাব কাপড আনতে বলে গেছে। একটু বেশি দাম দিযে যতটা সম্ভব পছন্দেব জিনিসই আনতে চেষ্টা কবেছে। কিন্তু দেখা-মাত্র মুখ গম্ভীব এবং বিরূপ মন্তব্য।—তোমাকে আনতে বলাই আমাব ভুল হযেছে, কি যে টেস্ট না তোমাব—এত দাম দিযে এই জিনিস নিযে এলে! থান থেকে কেটে এনেছ আব তো বদলানোও যাবে না—

টেস্ট-এব কথা শুনেই সমব ঘোষাল খাপ্পা।—এগুলো তাহলে বাস্তায ফেলে দাও, টাকা দিচ্ছি নিজেব পছন্দেব জিনিস নিযে এসো, আব কোনদিন আমাকে কিছু আনতেও বোলো না।

অতসীব কানেব দিকটা লাল হযে উঠছে।—তোমাব পছন্দেব সঙ্গে আমাব পছন্দ যদি না মেলে তাতে বাগেব কি হল?

সঙ্গে সঙ্গে তির্যক জবাব, আমাব পছন্দেব সঙ্গে তোমাব পছন্দ মেলে বলেই তুমি আমাব কাছে এসেছ।

—তাব মানে? তুমি দযা কবে আমাকে এনেছ?

—না, তুমি দযা কবে এসেছ।

চাযেব টেবিলে এমনি তুফান লেগেই আছে।

অতসীব নিজেব পছন্দেব কিছু কিনতে হলেও চলনদাব হিসেবে সমব ঘোষালকে সঙ্গে থাকতেই হয। দুটো বেড-শিট আব পছন্দসই একটা বেড-কভাব কেনা হবে।

প্রথমটা নিযে যাচাই বাছাইযেব প্রশ্ন নেই। অনেক দেখে যে দুটো বেড-কভাব নিযে বিবেচনা, সমব ঘোষালেব চোখে তাব একটা তো ভাবী সুন্দব লাগল। কিন্তু মতামত জিগেস না কবা পর্যন্ত সে চুপ।

—বলো, এ দুটোব কোনটা নেব?

সমব ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে আঙুল তুলে দেখালো, ওইটা অনেক বেশি সুন্দব।

ধাবণা, অতসীবও ওটাই বেশি পছন্দ। কিন্তু বলাব সঙ্গে সঙ্গে তাব খুঁতখুঁতুনি বাডতে থাকল। দুটোই আবাব পাশাপাশি খুলে দেখা হল। তাবপব মন্তব্য, ভালো তো...কিন্তু একটু বেশি গবজাস। আবো একটু বিবেচনাব পব অন্যটাই দোকানদাবেব দিকে এগিযে দিল, নাঃ, এটাই দিন।

সমব ঘোষাল নিঃসংশয, সে কিছু না বললে আগেব পছন্দেব জিনিসটাই ঘবে আসত।

কাউকে চাযে বা ডিনাবে ডাকলেও এমনি তুচ্ছ কাবণে মতবিবোধ। ঘবে কেবল চা-কফি ভিন্ন আব কিছু হয না। সবই, সবই কোনো ভালো বেস্তোবাঁ থেকে আসে। সমব ঘোষাল যদি বলে, কাজু খাস্তা কচুবি চিকেন-কাটলেট আব ভালো কিছু সন্দেশ আনাও তো অতসী ভুরু কুঁচকেই প্রথমে সব বাতিল বুঝিযে দেবে, তাবপব বলবে, কাজুব যা দাম তাব বদলে চিপস কবলেই হয। আজকাল ওসব কচুবি মিষ্টি-টিষ্টি অচল। তাব থেকে চীজ পকোডা ফিশ-ফিংগাব চিকেন প্যাটিস আব মিষ্টিব বদলে পেস্ট্রি অনেক ভদ্রস্থ হবে। ডিনাবে একজন যদি বলে বিবিযানি ফিশফ্রাই কোর্মা চাটনি মিষ্টি হোক, অন্যজন অবধাবিত বলবে, অত তেল মশলাব হেভি মেনুব দবকাব কি, তাব থেকে ফ্রাযেড বাইস ফ্রাযেড প্রন চিলি-চিকেন আইসক্রিম হলে খাবাপ হবে কিছু?

ডেলি প্যাসেঞ্জাবি কবে এসে ঘবে ফিবে অতসী কিছুটা ক্লান্ত থাকে ঠিকই। মুখ-হাতে জল দিযে বেশ খানিকক্ষণ শুযে থাকে। কিন্তু সে-সময সমব ঘোষালেব কাছে যুনিভার্সিটিব কেউ এলে আব গৃহিণীব খোঁজ কবলে তাকে ডাকতেই হয। অতসীব ফর্সা মুখ থমথমে হযে ওঠে। গলা দিযে চাপা ঝাঁঝ বেবিযে আসেই।—তোমাব কি দযামাযা বলে কিছু নেই? আমি কি তোমাব শো-কেসেব পুতুল, যে আসবে আমাকে টেনে নিযে গিযে দেখাতে হবে।

বাইবেব লোক চলে যেতে তাব পবেও তপতপে মুখ দেখে সমব ঘোষালও বেগে গিযে একদিন কেবল বলেছিল, কে তোমাকে মাথাব দিব্যি দিযে ওই চাকবি কবতে বলেছিল, ছেড়ে দিযে দেখো না আমি চালাতে পাবি কি না?

সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাত।—কি বললে? আব আমি যদি বলি তোমাব চাকবি ছেড়ে দিযে দেখো। আমি চালাতে পাবি কিনা—ছাডবে? তোমাব চাকবিটা চাকবি আব আমাবটা নয?

কিন্তু সমব ঘোষাল বিসার্চেব কাজে আব পড়াশুনায মন ঢেলে দিতে, দেখা গেল অতসী সব দিন আব অত ক্লান্ত থাকে না।

খানিক বাদে শয্যা ছেড়ে উঠে আসে, কাছাকাছিব মধ্যে ঘুব ঘুব কবে, এটা ওটা টুকটাক পবামর্শেব দবকাব হয, কিছু কেনাব কথা মনে পড়ে, নযতো কাবো বাডিতে বা কোথাও যেতে ইচ্ছে কবে।

সমর ঘোষাল বিরক্ত হয়, আমাকে রিসার্চের কাজটা ভালোভাবে করতে দেবে না কি?

খুব গায়ে মাখে না, ঠোঁটে হাসির আভাস দেখা দেয়। সেদিন বলল, ডক্টরেট হয়ে তোমার বিদ্যেবুদ্ধি আর এমন কি বাড়বে?

—বিদ্যেবুদ্ধি একটুও বাড়বে না, সামনে এগোবার রাস্তাটা পরিষ্কার হবে।

—সেটা কত এগোবার রাস্তা—রিডার প্রোফেসার ভাইস চ্যান্সেলার পর্যন্ত? কথার সুরে শ্লেষ, তখন তোমার স্কুল মাস্টার বউ মনে ধরবে তো?

সমর ঘোষালের আগে যা মনে হয়নি এখন তা হয়।

সে এম এ তে ফার্স্ট ক্লাস না পাওয়ার দরুন এই একজনেরই কোনো আক্ষেপ দেখেনি, প্রস্তুতি সত্ত্বেও তার আই এ এস পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করেছে, আর আজও তার নাগালের বাইরে যোগ্যতা আর প্রতিপত্তি অর্জন করুক এটা চায় না।

গত দেড় বছরের মধ্যে সমর ঘোষাল বার তিনেক কলকাতায় গেছে। অতসী দুটো ভেকেশনে সঙ্গে এসেছে, কর্তব্যের দায়ে দু'তিন দিনের বেশি শাশুড়ীর কাছে থাকেনি, বাপের বাড়িতে থেকেছে। সমর ঘোষালের কাছে এ-ও কম দৃষ্টিকটু ঠেকেনি, কারণ বয়স্কা বিধবা মা তাদের অপেক্ষায় দিন গোনে, বউকে বুকে আগলে রাখতে চায়। কিন্তু এ নিয়ে কিছু বললে অতসী তেতে ওঠে। বলে, এখানে এসে তো বেশির ভাগ সময় তুমি তোমার রিসার্চের প্রোফেসার আর বই-পত্র নিয়ে কাটাও, আমার কাঁহাতক ভালো লাগে—নিজের মা-বাবা ভাই বোনের কাছে ক'টা দিন থাকবো তা-ও দোষের?

সমর ঘোষাল খুব ভালো করেই জানে ওদের অনটনের সংসারে অতসীর বন্ধনের শিকড়টা কোনদিনই খুব গভীরে পৌঁছয়নি। এখনো মাঝে মাঝে মা-কে টাকা পাঠাতে হয় বলে তার বিরক্তি লক্ষ্য করেছে। পরের বোন দুটো অকর্মা বলে রাগ করে।

তৃতীয় বারে অতসী সঙ্গে আসেইনি। তার সাফ কথা, তোমার তো এখন ডক্টরেট হওয়ার স্বপ্ন, আর আমার লিভ ভেকেন্সির চাকরি কবে আছে কবে নেই ঠিক নেই, আমার তো চেষ্টা কিছু করতে হবে না এভাবেই চলবে?

—ছুটির মধ্যে কোথায় কি চেষ্টা করবে?

—আমার যেটুকু চেষ্টা ছুটির মধ্যেই করতে হবে, স্কুল কামাই করে চেষ্টা করতে গেলে যা আছে তা-ও যাবে—তা'ছাড়া এই ডেলি প্যাসেঞ্জারির চাকরি আর কতকাল করব?

তর্ক না বাড়িয়ে সমর ঘোষাল তাকে রেখে একলাই চলে গেছে। আর অতসী দুর্জয় রাগে ফুঁসেছে। ডেলি প্যাসেঞ্জারের চাকরি আর ভালো লাগে না এটা ঠিক, তা বলে চাকরি যাবার ভয় আর তেমন নেই বললেই চলে। যার জায়গায় আছে সেই মহিলা রিনে মাইনেয় আরো এক বছরের ছুটিতে। এলেও এই দেড় বছরে পড়ানোয় তার যা সুখ্যাতি হয়েছে, আর মেয়েদের কাছে সে এত পপুলার এখন যে হেডমিসট্রেস তাকে এক-রকম আশ্বাসই দিয়ে রেখেছেন ওখানে থেকে গেলে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা তিনিই করতে পারবেন। এদিকে এখানকার বড় স্কুলে চাকরির আশার

দিনও এগিযে আসছে। এই দেড বছবেব মধ্যে অতসীব প্রিন্সিপাল মিসেস খাসনবিশেব সঙ্গে দু'বাব দেখা হযেছে। দু'বাবই পুজোব পব গিযে দেখা কবাটা শ্রদ্ধানিবেদনেব সাক্ষাৎকাবই বলা চলে। মিসেস খাসনবিশ অখুশি হননি। বলেছেন, ইওব হেডমিস্ট্রেস স্পিক্স হাইলি অফ ইউ, বোসো আবো কিছু দিন দেখি কি কবতে পাবি।

একটা তুচ্ছ উপলক্ষ্য ধবেই অতসী ঠাণ্ডা মাথায শেষ ফয়সালা কবে ফেলল। এই লোকেব কাছে তাব সম্রাজ্ঞীব আসন টলে গেছে, এটা স্পষ্টই বুঝেছে। কিন্তু সম্রাজ্ঞী নিজে এ আসনচ্যুত হতে বাজি নয, এই এক ব্যাপাবে তাব কোনো আপোস নেই। অতএব শেষ ফযসালাব কিছু একটা উপলক্ষ্য কেবল দবকাব ছিল।

ইদানীং সমব ঘোষালেব কাছে তিনটি মেযে পডতে আসছিল। ছুটিব দিনে সকালে বা সন্ধ্যায। অতসী তাদেব ধাবে কাছে যেত না, ফবমাশ মতো শেবিং চা দিযে যেত। মেযেবা মাস্টাবমশাযেব স্ত্রীকে দেখাব জন্য বা একটু আলাপ কবাব জন্য উৎসুক বুঝেও সমব ঘোষাল এটা-ওটা বলে কাটিযে দিযে গম্ভীব মুখে কাজ সাবাব জন্য ব্যস্ত হয।

দিন কযেক এটা দেখে অতসী সোজাসুজি জিগেস কবেছে, এবা টাকা দিযে বাডতি বিদ্যার্জন কবতে আসে না এমনি?

—এমনি।

—ছেলেবা বুঝি আজকাল আব পডাশুনা নিযে তেমন মাথা ঘামায না, যত চাড মেযেগুলোবই?

বক্রোক্তিব জবাবে ভ্রূকুটি।

—ছুটি-টুটিব দিনে এ-বকমই তাহলে চলবে এখন?

—কেন, তোমাব অসুবিধে হচ্ছে?

—খুব বেশি বকম অসুবিধে হচ্ছে। দু'খানা মাত্র ঘব, উঠতে বসতে চলতে ফিবতে অসুবিধে হয কিনা তুমি বোঝো না?

সমব ঘোষালেব উষ্ণ জবাব, এবা খেলা কবতে আসে না, দু'খানা ছেডে দশখানা ঘব হলেও তোমাব অসুবিধেই হত...মনটাকে আব একটু উঁচুতে তুলতে চেষ্টা কবো অতসী।

—কি? কি বললে তুমি? তোমাব নিজেব মন এত উঁচুতে এখন যে ওই মেযেগুলোকে আমি হিংসে কবি এ-ও ভাবতে পাবলে তুমি? ওবা আমাব ঈর্ষাব পাত্রী?

অতসীব গলা খুব চডছে না কিন্তু দু'চোখ দিযে গলগল কবে বিদ্বেষ ঠিকবোচ্ছে। —চুপ কবে না থেকে জবাব দাও।

—আমি কিছুই ভাবি না, ভাবতে চাই না—তুমিই ভাবিযে ছাডছ।

দেহেব বক্ত-কণা মুখে আগেই জমছিল। মুখ থেকে চোখেব দিকে ছুটেছে।

অন্য ঘবে চলে গেল। বাতে দু'জনে মুখোমুখি বসে খাওযা সাবল, কেউ একটি কথাও বলল না। বাতে সমব ঘোষালেব ঘুম আসতে দেবি হল। অতসী তখনো শয্যায আসেনি। সকালে ঘুম ভাঙতে শয্যাব দিকে তাকিযেই বুঝল বাতে সে এ-ঘবে আসেনি।

সকালেব প্রক্ষালন সেবে টেবিলে এসে বসল। মুখোমুখি চেযাবে অতসীও। শেবিং পেযালা চায়েব পট টোস্ট-এব ট্রে টেবিলে বাখতে অতসী দু'জনেব পেযালাতেই চা ঢালতে ঢালতে শেবিংকে বলল, ঠিক হ্যায—

শেবিং টেবিল ছেড়ে সবে গেল। দু'জনে দু-জনেব পেযালা শুধু তুলে নিল, টোস্ট প'ড়ে থাকল। নিঃশব্দে দুটো চুমুক দেবাব পব খুব ঠাণ্ডা গলায় অতসী বলল, শোনো, আমি ভেবে দেখলাম এ-ভাবে আব বাইবেব ঠাট বজায বেখে চলতে চেষ্টা না কবাই ভালো, তাতে দিনে দিনে অশান্তি আবো বাড়বে।

পেযালা মুখেব কাছেই ধবা, সমব ঘোষালেবও ঠাণ্ডা প্রশ্ন, কি কবতে চাও?

—কবাব একটাই আছে, আমাব মনে হয যত ঠাণ্ডা আব শোভনভাবে সেটা কবা যায দু'জনেব পক্ষেই ততো ভালো।

—ডিভোর্স...?

অতসীব ভুরুব মাঝে ভাঁজ পড়ল একটু। এইটুকুই জবাব। চাযেব পেযালা খালি কবে সামনে বাখল।

পেযালায বাব দুই চুমুক দিযে সমব ঘোষাল জিগ্যেস কবল, তোমাব এ ডিসিশন ফাইনাল তাহলে?

—হ্যাঁ, ভাঙা পেযালা জুড়তে চেষ্টা না কবাই ভালো...আমাব যতদূব ধাবণা, বনিবনা হল না আব চিন্তাধাবায খাপ খেল না বলে মিউচুযাল কনসেন্টে ডিভোর্স চাইলে ব্যাপাবটা সহজেই ফযসালা হযে যায...যায না?

—তা যায।

—তা'হলে তাই কবো, সামনেব বড দিনেব ছুটিতে আমবা কলকাতা চলে যাই...কিন্তু আমাব দিকেব কোনো উকিল জানাশোনা নেই...তোমাব আছে?

সমব ঘোষাল সন্তর্পণে এক বড নিঃশ্বাস তল কবে নিল।—বাবাব এক বিশেষ বন্ধুই এ সবেব বড উকিল, তোমাব ব্যবস্থাও তিনি কবে দিতে পাববেন। ব্যাপাবটা তাতে সহজ হবে।

—খুব ভালো।...তাহলে এই কথাই বইলো, এই বড দিনেব ছুটিতেই আমবা কলকাতা যাচ্ছি, আমি আজ থেকেই আব ফিবছি না, সেখানে মেযেদেব হস্টেলে থাকাব ব্যবস্থা কবে নেব, স্কুলেব টেলিফোন নাম্বাব বেখে যাব, তেমন দবকাব হলে যুনিভার্সিটি থেকে তুমি ফোন কবতে পাবো।

—হ্যাঁ, এতবড ব্যাপাবেও অতসী ধীব স্থিব সম্রাজ্ঞীব ভূমিকা নিতে পেবেছে। সমব ঘোষাল সে তুলনায কেবল স্তব্ধ এবং তাজ্জব।

অতসীব এটুকুই সান্ত্বনা।

ঘোষাল নয, অতসী গাঙ্গুলী স্কুলে বসে সমব ঘোষালেব ফোন পেয়েছে সাড়ে তিন মাস বাদে। ও-দিকেব গলাব স্বব ঠাণ্ডা—তোমাব একটা চিঠি এসেছে, মনে হয দবকাবি...।

—কোত্থেকে?

—খামে এখানকাব মেযে স্কুলেব ছাপ দেখলাম।

—ও...! অতসীব গলায় আগ্রহ স্পষ্ট।—কি কবা যায বলো তো, বিডাইবেক্ট কবলে তো আবাব পেতে দেবি হযে যেতে পাবে।

সমর ঘোষালের গলায় গম্ভীর শ্লেষ, আমাকে হাতে হাতে পৌঁছে দিতে বলছ?

ভিতরে যতই জ্বলুক, অতসীর গলায় সম্রাজ্ঞীর হাসি।—খুব ইচ্ছে করলে নিয়ে আসতে পারো...কেন, তোমার সেই ছাত্রীরা বাড়িতে পড়তে আসা বন্ধ করে দিয়েছে?

রাগে থমথমে গলা সমর ঘোষালের। ফোন ছেড়ে দেব?

—না, চিঠি এই রাতটা তোমার কাছেই থাক, আমি কাল ভোরের ট্রেনে গিয়ে নিয়ে নেব, মনে হয় ওখানকার স্কুলের চাকরিটা হল।...থ্যাংক ইউ।

ইচ্ছে করেই সমর ঘোষাল সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। অতসী আসতে শেরিং তার হাতে চিঠি তুলে দিয়েছে। অতসীর ফর্সা মুখ লাল। সম্রাজ্ঞীর ভূমিকায় দাঁড়িয়েই সে এখানে এসেছিল।

প্রিন্সিপাল মিসেস খাসনবিশের টাইপ করা দু'লাইনের চিঠি। যত শীগগির সম্ভব দেখা করার নির্দেশ।

সীট ডাউন প্লীজ। লোমশ হাত দুটো টেবিলে রেখে মিসেস খাসনবিশ সামনে ঝুঁকলেন, এনিথিং সীরিয়াসলি রং উইথ ইউ?

অতসী হঠাৎ ভেরাচ্যাকাই খেয়ে গেল। মনে মনে এই স্কুলে চাকরিতে জয়েন করার নিশ্চিত আশা নিয়েই এসেছে। শুকনো গলায় বলল. বেগ ইওর পারডন ম্যাডাম?

মিসেস খাসনবিশ এটুকুতেই অসহিষ্ণু।—তোমার জলপাইগুড়ির হেড-মিসট্রেস জানালেন, হাসব্যান্ডের সঙ্গে তোমার ডিভোর্স হয়ে গেছে, তবু আমি তোমার দরখাস্ত থেকে এখানকার ঠিকানা বার করেই চিঠি দিলাম, জাস্ট টু অ্যাভয়েড সাসপিশন অফ মাই কাউন্টার পার্ট দেয়ার, সি লাইকস ইউ ভেরি মাচ, এই স্কুলের খাম দেখলে তার প্রথমেই সন্দেহ হত, আমি তোমাকে ভাঙিয়ে নেবার মতলবে আছি, অ্যান্ড থট এ য়ুনিভার্সিটি প্রোফেসার শুড আফটার অল বি এ জেন্টলম্যান —দ্য লেটার শুড বিচ ইউ। নাও টেল মি হোয়াটস দি ম্যাটার-হোয়াট আই হার্ড...এ ফ্যাক্ট?

নানান অসুবিধে এড়ানোর জন্য জলপাইগুড়ির হেডমিসট্রেসকে বলতে হয়েছিল, চাকরি হলে এখানেও গোপন করা যাবে না। অতসীর মনে ভয়ই ধরে গেল. এর জন্যে মিসেস খাসনবিশ কি তাকে বাতিল করে দেবেন?

জবাব দিল, ঠিকই শুনেছেন...।

—বাট হোয়াই...মে আই নো?

—বনিবনা হচ্ছিল না...ঠিক অ্যাডজাস্ট করা যাচ্ছিল না।

—দ্যাট সিম্পল? সেটলড ইট মিউচুয়ালি?

অতসী মাথা নেড়ে সায় দিল। মহিলার দিকে চেয়ে কেন যেন একটুও ক্ষুব্ধ মনে হল না তাঁকে। প্রশ্ন শুনে আরও আশান্বিত।—আর ইউ হ্যাপি ইন জলপাইগুড়ি অর স্টিল ওয়ান্ট টু কাম হিয়ার?

—আজ বললে আজই জয়েন করতে পারি।

থলথলে মুখখানা হাসি হাসি।—ইউ হ্যাভ সাম লাক অ্যাট লিস্ট, যাঁর জায়গায় তোমাকে নেবার কথা বলেছিলাম প্রিপারেটরি টু রিটায়ারমেন্ট লিভ-এ যাচ্ছেন, ইউ মে জয়েন নেক্সট মানডে—ইউ আর অতসী হোয়াট নাও?

—গাঙ্গুলি...।

—ওকে—কাম উইথ এ ফ্রেশ অ্যাপলিকেশন।

এই শিলিগুড়িতেই আবার জীবন শুরু অতসীর। অতসী গাঙ্গুলির। মনে হয়েছে, এই ডিভোর্সের ফলেই প্রিন্সিপাল মিসেস খাসনবিশের তাকে নিয়ে নেবার আগ্রহ আরো বেড়েছে। কিছু দিন যেতে ধারণাটা আরো মনে বসে গেছে।...মহিলা তাঁর কোয়ার্টারস-এ একা থাকেন, স্কুলেরই দুটো ক্লাস ফোর কর্মচারী তাঁর বাবুর্চি এবং পরিচারক। টিচাররা সকলেই জানে তাঁর স্বামী বর্তমান, কিন্তু চর্মচক্ষে কেউ সে ভদ্রলোককে কখনো দেখেনি। ভদ্রমহিলার যেমন মেজাজ তেমনি যাকে বলে হুইমজিকাল। আর খেতেও খুব ভালবাসেন। দু'তিন জন পেয়ারের টিচারকে মাঝে মাঝে বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়ান। স্কুল কম্পাউন্ডের মধ্যেই মেয়েদের বোর্ডিং, আলাদা আলাদা ঘর নিয়ে একপাশে জনা-কয়েক টিচারও থাকে। অতসীরও এখানেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আধ বয়সী বোর্ডার টিচার তিনজনেই অবিবাহিত এবং অনেকটা নিঃসঙ্গ বলেই প্রিন্সিপালের স্নেহের পাত্রী হয়তো, কেবল তাদেরই নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হয়। বরাত জোরে অতসীও এদের সঙ্গে যুক্ত এখন। স্বচক্ষে মিসেস খাসনবিশের খাওয়ার বহর দেখে মনে হয়েছে, গতরখানা এমন হবে সে আর দোষের কি। মহিলার নতুন বয়সের চেহারাখানা কল্পনা করতে চেষ্টা করেছে।...পুরুষ অতসীর দু'চোখের বিষ এখন, তবু কারো সঙ্গে এই মহিলার সুখের সংসার-জীবন ভাবতে গিয়ে হাসিই পেয়েছে।

জলপাইগুড়ি ছেড়ে এখানে আসতে পেরে অতসী ভেবেছিল তার অতীত নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না, সকলে তাকে কেবল অতসী গাঙ্গুলী বলেই জানবে।...কিন্তু এসব ব্যাপার বোধহয় গোপন থাকেই না। টিচাররা তো জেনেইছে, মেয়েদেরও জানতে খুব সময় লাগেনি। হতে পারে এদের কারো-কারো সঙ্গে য়ুনিভার্সিটির কারো ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। হতে পারে ওই জাঁদরেল প্রিন্সিপালই পেয়ারের তিন বোর্ডার শিক্ষয়িত্রীকে বলে দিয়েছেন। না, মুখে তাকে কোনো টিচার এ নিয়ে একটি কথাও বলেনি। কিন্তু তাকে নিয়ে কথা আর কানা-কানি যে হয় এটা খুব ভালোই বুঝতে পারে।...ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে সম্বন্ধে কিছু আভাস দেবার লোকও একজন এই ক'টা মাসের মধ্যে জুটেছে। স্কুলে মোট পাঁচজন পুরুষ টিচার আছে। তিনজনই সায়েন্স গ্রুপের, একজন জিওগ্রাফি টিচার, আর একজন অপেক্ষাকৃত কম বয়সের আর্ট বা ড্রইং টিচার অমরেশ ঘোষ। বোর্ডার টিচারদের মুখে অতসী জেনেছে স্কুল কমিটির একটি বিশিষ্ট মুরুব্বির জোরে বছর তিনেক আগে অমরেশ ঘোষের এখানে চাকরি হয়েছে। বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে বয়েস। অবিবাহিত।

অতসীর এখন সাতাশ চলছে, সতের বছর বয়েস থেকে পুরুষের চোখের স্তুতি দেখে অভ্যস্ত, চিনে অভ্যস্ত। অতসী হলপ করে বলতে পারে সে এই স্কুলে আসার পনেরো দিনের মধ্যে ওই ভদ্রলোক তার প্রেমে পড়ে গেছে। আর মাস তিনেকের

মধ্যে তো আপনাবজনেব মতো আচবণ তাব। এখন স্কুলেই দু'চাবটে কথাবার্তা বলাব ফাঁক খোঁজে। মাঝে-সাজে অতসী বিকেলেব দিকে একটু হাঁটতে বা বেড়াতে বেবোয। কিছুটা নিবিবিলিতে বেড়ানোব একটাই জাযগা। মহানন্দাব দিকে গেলে তাব সঙ্গে দেখা আব কথা হবেই। না গেলে অনুযোগ, যে একঘেযে জীবন আমাদেব, হাঁটা চলাব অভ্যাসটুকু ছাড়বেন না, শবীব মন দুই-ই ভালো থাকে, কিন্তু আপনি একদিন আসেন তো পাঁচ দিন আসেন না।

অতসী হাসে, যতটুকু সম্ভব সদ্ভাব বেখেই চলে। তাকে নিযে টিচাবস রুমে আলোচনা হয বলে ভদ্রলোক বিবক্তি প্রকাশ কবে এবং বেশিব ভাগ কি নিযে আলোচনা হয ঘুবিযে ফিবিযে তা-ও প্রকাশ কবে দেয।

অস্বস্তি গিযে অতসীব ববং সুবিধেই হযেছে। বাইবে বোঝা যায না, কিন্তু ভিতবে ভিতবে সে বেপবোযা হযে উঠতে পেবেছে। এব ওপব বোর্ডাব টিচাব তিনজনেব মুখে প্রিন্সিপাল তাব পড়ানোব প্রশংসা শুনে আব স্বচক্ষে ছাত্রীদেব সঙ্গে তাব অন্তবঙ্গ মেলামেশাব ফল দেখে আবো প্রসন্ন। ওই তিন টিচাবেব একজনকে বলেছিল, দা গার্ল হ্যাজ আ চার্মিং পাবসোনালিটি অফ হাব ওউন—ভেবি ডিফাবেন্ট ফ্রম আদাবস।

এবপব আব পবোযা কাকে কবে?

একে একে চাব বছবে চাব-চাবটে ব্যাচ অতসী গাঙ্গুলিব হাত দিযে হাযাব সেকেণ্ডাবি পাশ কবে বেবিযে গেল। প্রত্যেক ব্যাচেব থেকে প্রত্যেক ব্যাচেব ওপব অতসী গাঙ্গুলিব হিসেবী আধিপত্য বিস্তাব বেড়েই চলেছে। ব্যাচ বলতে সকলে নয, অতসীব নিজস্ব বাছাই ব্যাচ, অন্য টিচাবদেব বিবেচনায ওই দেমাকী টিচাবেব বিদ্রোহী ব্যাচ। তাদেব চাপা আক্রোশ অতসী গাঙ্গুলি মেযেগুলোব মগজ ধোলাই কবে ছেড়ে দিচ্ছে। যে মেযেবা মুখেব দিকে চেযে কথা বলত না, তাব সেই বাছাই মেযেগুলো দেখতে দেখতে সেযানা হযে উঠছে, হেসে-হেসে তর্ক কবে ভেবা-চ্যাকা খাওযাব মতো মুখ কবে প্রশ্ন কবে, বুদ্ধিমতীব মতো তির্যক মন্তব্য কবে, টিকা-টিপ্পনী কাটে।

যেমন, সোস্যাল সাযেন্সেব বযস্ক টিচাব কি আলোচনা প্রসঙ্গে একজনেব স্মবণীয উক্তি কোট কবেছিলেন, ম্যাবেজ ইজ এ গ্রেট ইনস্টিটিউশন—অতসী গাঙ্গুলিব এক সুশ্রী পেযাবেব ছাত্রীব আলতো মন্তব্য, মে বি, বাট হু ওযান্টস টু লিভ ইন অ্যান ইনস্টিটিউশান?

...ইংবেজি টেক্সটেব এক গল্পে বব-কনেব বিযেব বর্ণনা ছিল। দেখতে সুশ্রী একটি ভালো ছাত্রীব হঠাৎ প্রশ্ন, বিযেব সময কনেব ধপধপে সাদা পোশাক কেন?

শিক্ষযিত্রীব সাদা-সিধে জবাব, সাদাটা শান্তি আব আনন্দেব প্রতীক, মেযেদেব সেটা সব থেকে আনন্দেব দিন।

তক্ষুণি প্রশ্ন, ববেব গাযে তাহলে কালো পোশাক কেন, তাব কি তাহলে সেটা সব থেকে অশান্তি আব নিবানন্দেব দিন?

নিজেব বিযে-ভাঙা কপাল নিযে ওই রূপসী টিচাব মেযেগুলোব মাথা চিবিযে খাচ্ছে না তো কি? কিছু বলাবও উপায নেই, খামখেযালি প্রিন্সিপালেব দিনে-দিনে

চোখেব মণিটি হযে বসছে। খুশি হযে তাঁব উঁচু ক্লাসেব ইংবেজিবও অর্ধেক দিন এই একজনকেই পাঠিযে দিযে নিজে বসে বসে লজেন্স চকোলেট খায। আবাব অবাকও হয, অতসী গাঙ্গুলিব বাছাই মেযেগুলোব একটাবও যদি পবীক্ষাব ফল খাবাপ হত, ইকনমিক্স-এ তো সক্কলেব ভালো নম্বব। অবাক কেবল ড্রইং মাস্টাব অমবেশ ঘোষ হয না, বলে আপনাব হাতে পড়ে মেযেগুলো সব সোনাব টুকবো হযে উঠছে সেটা যদি এঁবা দেখতেন, কেবল হিংসেব কথা—

অতসী গাঙ্গুলিব ঠোঁটেব ফাঁকে একটু মজা-ছোঁযা হাসি লেগেই থাকে। প্রশ্রযেব সুবে জিজ্ঞেস কবে, কেন, কি বলেন..?

ও-টুকুতেই উৎসাহে টুপটুপ্ ভদ্রলোক, আব বলেন কেন, ভালো কাবো সহ্য হয, আপনি নাকি নিজেকে এডুকেশন ফ্যাক্টবি ভাবেন একটা, সিলেবাস বা নিযম-টিযমেব ধাব ধাবেন না, কেবল পড়ানোব চমক দেখান, মেযেগুলোকে আস্কাবা দিযে আদবে বাঁদব কবে তুলছেন।

এই চাব বছবে ভদ্রলোকেব দুর্বলতা মেযেবাও টেব পেযে গেছে, বিশেষ কবে অতসী গাঙ্গুলিব বাছাই ব্যাচেব মেযেবা। নিজেদেব মধ্যে তাবা হাসা-হাসি কানা-কানি কবে, বলে, কেন বামন কি চাঁদেব দিকে হাত বাড়ায না—নইলে কথাটা এলো কোত্থেকে?

.. অতসী গাঙ্গুলিব আত্মবিশ্বাস ওই কাঞ্চনজঙ্ঘাব চুড়োব মতো উর্ধ্বমুখী এখন। কাঁচা তাজা একটি মেযেকে তাব হাতে ছেড়ে দাও, তাব দখলে থাকতে দাও, দেখবে ববাববকাব মতো সে তাব হযে গেল। অতসী গাঙ্গুলি কল্পনায তাই দেখছে, তাই বিশ্বাস কবছে, অদূব ভবিষ্যতে তাবা তাব প্রতিশোধেব এক-একখানা হাতিযাব হযে উঠছে। আপন-আপন জগতে তাবাও এক-একটি সম্রাজ্ঞী হযে উঠছে। কেবল যে মেযেদেব তাব চাই তাদেব মোটামুটি সুশ্রী হতে হবে, পুরুষেব চোখ টানাব মতো কিছু প্রসাদ গুণ (অতসী গাঙ্গুলিব ভাষায ন্যাচাবাল ভাইটালিটি উইথ প্রসপেকটিভ ফেমিনাইন কাবুভস) তাদেব থাকতে হবে। এটুকু থাকলে রুচি-বোধ, প্রখব বিচাব-বিবেচনা-যুক্তিবোধ, সব থেকে বেশি স্বাধীনচেতা আত্মবোধেব স্বাদ আফিম গিলিযে আপন আপন জগতে তাদেব এক-একটি সম্রাজ্ঞী কবে তোলা এখন কঠিন ভাবে না অতসী গাঙ্গুলি। এবাই তাব প্রতিশোধেব ভবিষ্যৎ হাতিযাব।

তাব বাছাই প্রথম ব্যাচেব পাঁচটি মেযেব মধ্যে বি. এ আব এম এ পড়াব ফাঁকে চাবটিব বিযে হযে গেছল। তাদেব মধ্যে দু'জনেব ডিভোর্স হযে গেছে, একজনেব ডিভোর্স কেস কোর্টে ঝুলছে। চতুর্থজন তাব স্বামীকে ভেড়া বানিযে বেখেছে। পঞ্চমজন একেব পব এক প্রত্যাশীদেব বাতিল কবে চলেছে। অতসীকে সে বলেছে তাবও স্কুল টিচাব হবাব ইচ্ছে। হলে তো সোনায সোহাগা। একবাব যাবা তাব কেনা হযে গেছে, সময আব সুযোগ হলেই তাবা তাদেব গুরুদেবীব সঙ্গে যোগাযোগ বাখে। অতএব অতসী সকলেব সব খবব পায।...দ্বিতীয ব্যাচেব চাবজনেব মধ্যে বিযে হযেছে দু'জনেব, একজনেব ডিভোর্স কেস কোর্টে ঝুলছে, অন্যজন কোন এক বড কোম্পানিব বিসেপশনিস্ট-এব চাকবি জুটিযে স্বামীকে বুড়ো আঙুল দেখিযে চলে গেছে। বাকি

দু'জন প্রার্থীব আশায ছাই ঢেলে চলেছে। তৃতীয আব চতুর্থ ব্যাচেব সাত আব ছয তেবো জন এখনো অপেক্ষাকৃত নতুন। পুলকিত হবাব মতো ঘটনা এখনো ঘটেনি বটে। কিন্তু যোগাযোগ কাবো না কাবো সঙ্গে হযই। যাকে দেখে, কথা-বার্তা শুনে হাসি-খুশিব আত্মপ্রত্যয লক্ষ্য কবে অতসীব মনে হয প্রত্যেকে তাব নিজস্ব জগতেব সম্রাজ্ঞীটি হযেই বসে আছে। তাবা তাদেব দিনেব অপেক্ষায আছে।

এবাবেব বাছাই আটটি মেযেব ব্যাচেব যে-মেযেটি লিডাব, তাব ওপব অতসী গাঙ্গুলিব চোখ আবো চাব বছব আগে থেকে। ও মেযে যখন তাব ছাত্রীই নয, তখন থেকে। এখন বদ্ধ বিশ্বাস তাব এতদিনেব সব বাছাই মেযেদেব ওপব দিযে এই মেযে টেক্কা দেবে। দেবাব মতো সমস্ত গুণই তাব মধ্যে দেখেছে। মনে মনে অতসী গাঙ্গুলি তাকে বুকে আগলে বেখেছে।

.. চাব বছব আগেব সেই কৌতুক প্রহসনটুকু ভোলাব নয। কোন টিচাব অ্যাবসেন্ট থাকলে প্রিন্সিপালেব হুকুম-মতো লিজাব-আওযাবেব টিচাব তাব ক্লাস নিতে যায। ক্লাস এইটেব ম্যাথস টিচাব অনুপস্থিত। অতসী গাঙ্গুলি তাব ক্লাস নিতে ঢুকেছিল। ছাত্রী না হলেও সব ক্লাসেব মেযেবাই তাকে দেখলে খুশি হয।

মেযেদেব ফ্র্যাকশন জ্ঞান দেখাব জন্য অতসী ছোট্ট একটু বুদ্ধিব অঙ্ক দিযেছিল। একটা ফেন্স মানে বেড়াব মধ্যে পনেবোটা ভেড়া আছে, আব তাদেব জন্য তিবিশ দিনেব খাবাব মজুত আছে। কিন্তু একটা ভেড়া ফেন্স টপকে পালিযে গেল। তাহলে বাকি চৌদ্দটা ভেড়াব ওই মোট খাবাবে আবো কতদিন চলবে?

প্রশ্ন শুনে অনেক মেযেবই ধাঁধা লেগে গেল। অনেকেই কলম নিযে খাতাব ওপব ঝুঁকল। কোণেব বেঞ্চেব একটি মেযে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। ভাবী সুন্দব ফুটফুটে মেযে, মুখে আব চোখে দুষ্টু-দুষ্টু মিষ্টি-মিষ্টি হাসে, এখনই বেশ লম্বা আব সুডৌল স্বাস্থ্য, এক মাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল। ছাই বংযেব ওপব টকটকে লাল বর্ডাব দেওযা স্কুল ড্রেসে চমৎকাব মানিযেছে।

অতসী গাঙ্গুলি জিজ্ঞেস কবল, হযেছে?

মাথা নাড়ল, হযনি। তাব পবেই প্রশ্ন শুনে অবাক।—ম্যাডাম, যে-ভেড়াটা ফেন্স টপকে পালালো সেটা কি পালেব গোদা ভেড়া?

অতসী গাঙ্গুলি হাঁ কযেক পলক।—তাব সঙ্গে অঙ্কেব কি সম্পর্ক?

—গোদা ভেড়া হলে তিবিশ দিনেব খাবাবই পড়ে থাকবে, বাকি চৌদ্দটা ভেড়াই ওটাব পেছু পেছু ফেন্স টপকে পালাবে।

অতসী গাঙ্গুলি হেসে সাবা, মেযেবা আবো বেশি। হাসি থামতে বলল, আচ্ছা গোদা ভেড়া নয ধবে নিযেই কবো।

মেযে জবাব দিল—এব আব কবাব কি আছে, একটা ভেড়াব দু'দিনেব খাবাব চৌদ্দটা ভেড়া খাবে—এব একটাব ভাগে ওযান-সেভেনথ পড়বে, তাহলে টু ওযান-সেভেনথ ডে চলবে।

বসে পড়ল। অতসী গাঙ্গুলিব চোখে মুখে ঠোঁটে হাসি। হুকুম কবল, দাঁড়াও।

তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালো।

তোমার নাম কি?

—নৃপুর সরকার।

—কংগ্র্যাচুলেশনস, তোমাকে আমার মনে থাকবে। অন্য কয়েকটি মেয়ে বলে উঠল, ও বরাবর আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল ম্যাডাম।

অতসী গাঙ্গুলি মনে রেখেছে। পর পর দু'বছর তাকে ফার্স্ট প্রাইজ নিতে দেখেছে। সঙ্গে ইংরেজির আরো অনেক প্রাইজ নিতে দেখেছে। ক্লাস টেনে উঠে তার ছাত্রী হয়েছে। অতসী গাঙ্গুলি ইংরেজি এস্ এ-কম্পোজিশন ক্লাস নেয়, প্রিন্সিপাল না এলে ইংরেজি টেক্সটও পড়াতে হয়। প্রিন্সিপালের থেকে মেয়েরা তার ক্লাসেই বেশি মজা পায়। নৃপুর সরকার তখনো অতসী গাঙ্গুলির বাছাই ব্যাচের কেউ নয়, বাছাই ব্যাচ সে ছেকে তোলে এগারো আর বারো ক্লাসের মেয়েদের থেকে। কিন্তু এই একটি মেয়ের প্রতি আগে থাকতেই ষোল আনা মনোযোগ তার। শুধু চেহারাপত্র দেখার মতো হয়ে উঠেছে তা-ই নয়, দুষ্টুমিও বাড়ছে। এর ওপর তার সুন্দর ইংরেজি লেখা।

গেল সপ্তাহে এসএ লিখতে দিয়েছিল, 'এ পুওর গার্লস কনস্ট্রাকটিভ ফিউচার প্ল্যান'। এ-রকম উদ্ভট বিষয় নিয়ে লিখতে মেয়েরা মজা পায়। যে যতটা পারে বুদ্ধি ফলাতে চেষ্টা করে। অতসী গাঙ্গুলি এতদিনে জানে নৃপুর সরকার এখানকার একজন নামী ডাক্তারের মেয়ে, তার দাদাও ডাক্তার। কিন্তু গরীব মেয়ের ফিউচার প্ল্যান রচনায় কোনো মেয়েই তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। সুন্দর লিখেছে।

পরের সপ্তাহে এর উল্টো রচনা লিখতে দিল সকলকে। ধরো তোমাদের প্রত্যেকের কাছে দশ লক্ষ করে টাকা আছে, এবারে যার যার কনস্ট্রাকটিভ ফিউচার প্ল্যান লেখ।

সবাই দ্বিগুণ মজা পেয়ে লিখতে বসে গেল। একটু বাদে অতসী গাঙ্গুলির চোখ গেল নূপুর সরকারের দিকে। সে লিখছে না, চুপচাপ বসে আছে।

—কি হল, ভাবছ?

নূপুর মাথা নাড়ল, ভাবছে না।

—তাহলে লিখছ না কেন?

জবাবে সেই দুষ্টু-দুষ্টু মিষ্টি-মিষ্টি হাসি। বলল, দশ লক্ষ টাকা থাকলে আমি কিছুই করব না। এমনি চুপচাপ বসে থাকব।

এই মেয়েকে নিয়ে অতসী গাঙ্গুলি কি করে, কোথায় রাখে? হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে সব মেয়েকেই বলল, থাক বাপু থাক, আমার ঘাট হয়েছে, কাউকেই আর এই এসএ লিখতে হবে না।

সেকেন্ডারি পরীক্ষায় আরো দশ পনেরোটা নম্বর বেশি পেলে নূপুর সরকার স্কলারশিপ পেতে পারত। ক্লাস ইলেভেনে এসে নূপুর আর আরো সাতজন তার হাতের মুঠোয়। এদের সকলকে উদ্যোগী হয়ে সে ইকনমিক্সএ টেনে এনেছে। তাতে বাছাই ব্যাচের অবধারিত লিডার নূপুর সরকার। লিডার কাউকে করতে হয় না, ব্যাচের সব থেকে চৌকস মেয়েটি লিডার আপনি হয়ে বসে। এই লিডার বলতে যার পরামর্শ

আর বুদ্ধি নিয়ে ব্যাচের অন্যরা চলে ফেরে ওঠে বসে, গুরুদেবীর ভাব-ভাবনা আয়নার মতো দেখতে পায়।

ক্লাস ইলেভেনে নূপুর ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। দেখা-মাত্র অতসী গাঙ্গুলির মনে হয়েছে কিশোরীর সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে চট করে মেয়েটা যৌবনের সিংহাসনে দিব্যাঙ্গনার মতো বসে গেল।

তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে অভিনন্দন জানালো কংগ্র্যাচুলেশনস।

—থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।

পড়াশুনার মেজাজ আনতে গিয়ে সকলের উদ্দেশে অতসীর প্রশ্ন, আচ্ছা, ইকনমি বলতে তোমরা কে কি বোঝো বলো তো? নূপুর আগে বলো—

উঠে দাঁড়ালো। অতসী গাঙ্গুলি পুরুষের চোখ দিয়ে দেখছে ওকে, আর ভিতরটা ততো খুশি হয়ে উঠছে। এখন তো ছেনিখোন্তা মাল-মশলা সব তার হাতে, যাবে কোথায়।

নূপুর একটু ভেবে জবাব দিল, ইকনমি হল খরচ করার এমন একটা আর্ট, যাতে কোনো মজা নেই।

অতসী গাঙ্গুলি জোরেই হেসে উঠল।—আমার কাছে ফার্স্ট ক্লাস নম্বর পেলে, পরীক্ষার খাতায় গোল্লা।

নূপুর হাসতে হাসতে বসে পড়ল।

দু' বছরের মগজ ধোলাইয়ের ফাকে এই মেয়ে এমনি হাসির জবাব অনেক দিয়েছে।

প্রশ্ন কমিউনিস্ট আর ক্যাপিটালিস্টের মধ্যে তফাৎটা কি চার-চারে আট লাইনের মধ্যে লেখ।

নূপুর সরকার দু'লাইনের মধ্যে লিখেছে। 'কমিউনিস্ট বলবে এত কারো থাকা উচিত নয়। ক্যাপিটালিস্ট বলবে এতটা অন্তত সকলেরই থাকা উচিত।'

প্রশ্ন এ-দেশে প্রোটেকটিভ ফরেন হেল্প-এর চেহারাটা কেমন?

নূপুরের উত্তর লাইক এ ফিমেল ড্রেস উইদাউট অবস্ট্রাকটিং দি ভিউ।

আর একটা তৎপর জবাব মনে পড়লে অতসী গাঙ্গুলি হেসে বাঁচে না। প্রশ্ন ছিল, ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেশনের কিছু ভালো উদাহরণ দাও।

মেয়েরা লিখতে শুরু করে দিয়েছে। কোণের বেঞ্চ থেকে নূপুর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। দেহের ছাঁদ বদলেছে, কিন্তু চোখে আর ঠোঁটে সেই দুষ্টু-মিষ্টি হাসি লেগেই আছে।—একটা খুব রিয়েল আর ওরিজিন্যাল এগজাম্পল দেব ম্যাডাম?

—ও শিওর?

—আমার বউদি খরচের সতেরো ফিরিস্তি দিয়ে যে-টাকাটা আদায় করে নেয়, সেটা হল ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন। আর দাদা ঘুমিয়ে পড়লে যে টাকাটা তার পকেট থেকে হাতিয়ে নেয়, সেটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন।

এই উদাহরণ অতসী গাঙ্গুলির চিরদিন মনে থাকবে।

এ-ব্যাচেরও বারো ক্লাসের পরীক্ষা এসে গেল। মেয়েরা পড়াশুনায় ব্যস্ত। অতসী গাঙ্গুলিও তার বাছাই ব্যাচকে যতটা পারে এগিয়ে দেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। এ-বছরের মত তার মগজ ধোলাইয়ের পর্ব শেষ। সে পরিতুষ্ট, পরিতৃপ্ত। কেবল খেদ, নৃপুর সরকারের মতো আবার একটি গড়ে তোলার মতো লিডার করে পাবে।

এর মধ্যে আর্ট টিচার অমরেশ ঘোষ মুখখানা বেজার করে বলল, আপনার এবারের ব্যাচের ওই নৃপুর সরকার মেয়েটি এত মিষ্টি এত ভালো, কিন্তু বেজায় ফাজিল। আমি তো হঠাৎ বুঝতেই পারিনি কি বলছে।

অতসী গাঙ্গুলি নৃপুরের নাম শুনেই সচকিত একটু।—কেন, কি বলেছে?

—স্কুল থেকে কাল বাড়ি যাবার পথে রাস্তায় দেখা হতে আমাকে বলল, একটু নতুন কিছু আঁকুন না সার? কি-রকম জিজ্ঞেস করতে বলল, যেমন ধরুন, উমা নয়, শিব উমার জন্য তপস্যায় বসেছে গোছের...।

অতসী গাঙ্গুলি মনে মনে হেসে অস্থির। এ-রকম কথা নৃপুর বলবে না তো কে বলবে। পরে ওর সঙ্গে দেখা হতে ছদ্ম কোপে চোখ পাকিয়েছে, এই মেয়ে আর্ট টিচার অমরেশবাবুকে কি বলেছিস?

ক্লাসের বাইরে নৃপুর সরকারের এই ব্যাচটাকে তুমি ছেড়ে তুই বলা শুরু করেছিল। আর এই ব্যাচের মেয়েরাও বাইরে তাকে ম্যাডামের বদলে দিদি বলে। অতসীদি।

পরীক্ষা হয়ে গেল। বিদায়ের দিন এলো। অতসী গাঙ্গুলি প্রত্যেক ব্যাচকে যা বলে, নৃপুর সরকারের হাত ধরে এই ব্যাচকেও তাই বলল।—মনে রেখো, ভালো যদি কিছু করে থাকি তোমাদের লয়েলটিটুকুই কেবল আমার প্রাপ্য, আর কিছু চাই না।

অতসী গাঙ্গুলির বাছাই ব্যাচের সব মেয়েরাই য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকে ইকনমিক্স অনার্স পড়ে। এই ব্যাচে ব্যতিক্রম হল, নৃপুর সরকার, ইংরেজি অনার্স নিয়ে ভর্তি হল। অতসী গাঙ্গুলি এই মেয়ের বেলায় সেটাই স্বাভাবিক ভেবেছে। এটাই ওর সব থেকে প্রিয় সাবজেক্ট।

মনে মনে ভাবল, এটা মন্দ হল না, একজনের সম্পর্কে টাটকা খবর কিছু কিছু পাওয়া যাবে।

এখন ওই প্রিয় ছাত্রীর বাড়িতে যাতায়াতও সহজ হয়ে গেছে অতসী গাঙ্গুলির। ফাঁক পেলে নৃপুরও বোর্ডিং-এ এসে তার সঙ্গে গল্প করে, চা-চপ-কাটলেট রসগোল্লা সন্দেশ খেয়ে যায়।

ঠোঁট টিপে হেসে অতসী গাঙ্গুলি জিজ্ঞেস করে, তোদের ডক্টর ঘোষাল কেমন পড়াচ্ছে?

প্রায় দু'বছর আগে সমর ঘোষালের ডক্টরেট হবার খবর অতসী ঠিকই রাখে।

—খুব ভালো, তবে রেজায় গম্ভীর আর সীরিয়াস। তার প্রসঙ্গ কেন নৃপুরও জানে।

—সেটা বরদাস্ত করছিস নাকি তুইও! চোখে মুখে মজার হাসি।—এতদিন আমার কাছে কি শিখলি তাহলে?...এক কাজ করতে পারিস, মেয়েরা স্পেশাল সাহায্যের জন্য ছুটির দিনে তার বাড়িতে পড়তে আসত, গাম্ভীর্য আর সীরিয়াসনেস খাঁটি কি নকল বোঝার জন্য তুইও এ-সুযোগটা নিতে পারিস।

নূপুব হেসেছে কেবল, জবাব দেযনি।

বি এ ফাইনালেব ছ'মাস আগে একদিন এসে খবব দিযেছে, কি-যে মুশকিল হল, পবীক্ষাটাব মুখে ডক্টব ঘোষাল এই যুনিভার্সিটি ছেড়ে কলকাতাব না কোন যুনিভার্সিটিব বিডাব হযে চলে গেলেন।

অতসী গাঙ্গুলিব মুখখানা তেতে উঠল।—যাবে না তো কি, নিজেব স্বার্থ ছেড়ে কে আব আমাব মতো তোদেব জন্য প্রাণটা দিযে পড়ে থাকে।

ফাইনাল পবীক্ষাব খবব বেরুতে নূপুব এসে জানালো জার্নালিজম নিযে এম-এ পড়াব জন্য সে কলকাতায চলল। অতসী গাঙ্গুলি প্রথমে ভাবল, ওব মাথায আসেও। পবে মনে হল, এই সাবজেক্টই ওব পক্ষে ভালো, এ-লাইনে থাকলে গর্তেব অনেক সাপ টেনে বাব কবতে পাববে, অনেকেব মুখোশ ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিতে পাববে।

আবো বছব আড়াই কেটে গেছে। অতসী স্কুলে যাবাব জন্য তৈবি হযেছে। বেযাবা তাব হাতে একটা ডাকেব খাম দিযে গেল। খামেব লেখাটা চেনা-চেনা মনে হল। খাম খুলে দেখল তাই। নিচে নূপুবেব নাম।

শ্রীচবণেষু,

অতসীদি, আশা কবি আমাকে ভুলে যাননি। গত আড়াইটা বছব দ্রুত তালে কেটে গেল। জেনে খুশি হবেন, এম এ জার্নালিজম এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি। তাব আগে থেকে একটা কাগজে শিক্ষানবিসি কবছিলাম, এখন সেই কাগজেব সঙ্গেই যুক্ত হযেছি।

আমাদেব ব্যাচকে বিদায দেবাব কালে আপনি বলেছিলেন লযেলটিটুকুই আপনাব প্রাপ্য, আব কিছু চান না। অন্যদেব কথা জানি না, আমি ভুলিনি। এখানে পড়াব সময ইনভেসটিগেটিভ জার্নালিজম, বিষযটিব ওপব আমি বেশি গুরুত্ব দিযেছিলাম। আপনাব প্রতি লযেলটিব কথা ভেবে আমাব প্রথম অনুসন্ধানেব বিষয ছিল বিবাহ-বিচ্ছেদ। অন্য দেশ বা বাজ্যেব নয, কেবল এই বাংলাব। ভেবেছিলাম কাজটা কঠিন হবে না, কিন্তু শুরু কবে দেখি আমি অথৈ জলে। হাজাব-হাজাব কেস-এব ফযসালা হযে গেছে, হাজাব-হাজাব পেনডিং কেস্ লাখেব দিকে গড়াতে চলেছে। দ্রুত নিষ্পত্তিব জন্য বিদেশেব মতো অদূব ভবিষ্যতে এখানেও ডিভোর্স কোর্ট গজাবে। কাগজেব সঙ্গে যুক্ত থাকাব ফলে কেস স্টাডি কবাব কিছু সুবিধে হযেছে। ডিভোর্স ছাড়া গতি নেই এমন বেদনাকরুণ ঘটনা অবশ্যই অনেক পেযেছি। কিন্তু সামগ্রিক সংখ্যাব তুলনায নগণ্য। শতেকে নব্বুইটিব কাছাকাছি দেখলাম বিচ্ছেদেব মূলে ব্যক্তিত্বেব সংঘাত পাবসোনালিটি ক্ল্যাশ। কত তুচ্ছ কাবণে এই সংঘাত স্বামী-স্ত্রীব মাঝখানে বিচ্ছেদেব প্রাচীব তুলে দিতে পাবে দেখে আমি তাজ্জব। পবস্পবেব সদয বোঝা-পড়াব চেষ্টা, একটু অ্যাডজাস্টমেন্টেব চেষ্টা এমন নির্দযভাবে অনুপস্থিত হয কি কবে? এব নাম ব্যক্তিত্ব না সুপাবইগো? —আত্মকেন্দ্রিক অহংকাব? যাক, এব পবে বেছে-বেছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাবে নেমেছিলাম। প্রথমেই কাব কাছে গেছি আপনি নিশ্চয অনুমান

করতে পারছেন—ডক্টর সমর ঘোষালের কাছে। কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাঁর সাহায্য সর্বদাই পেয়েছি। এ-ব্যাপারে দেখলাম একমাত্র তিনিই অকপট হতে পেরেছেন, নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করেছেন। অন্য স্ত্রী-পুরুষদের বেশিরভাগ ডিভোর্সের পরেও আক্রোশ নিয়ে বসে আছেন, পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছেন।

...এরপর আরো একটু সমাচার আছে। আসছে সপ্তাহে ডক্টর ঘোষালের সঙ্গে আমার বিয়ে। পারস্পরিক বোঝাপড়া বা অ্যাড জাস্টমেন্ট সম্ভব কিনা সেটা ষোল আনা যাচাই করে দেখার জন্য একজন ভুক্তভোগীকেই জীবনে টেনে নিলাম। লয়েলটির-এর থেকে বড় প্রমাণ আপনার সামনে আর কি রাখতে পারি? অবশ্য আপনার তুলনায় আমার একটু সুবিধেও আছে। বয়সে তিনি আমার থেকে দশ-এগারো বছরের বড়, আর স্নেহ নিম্নগামী, চেষ্টা সত্ত্বেও আমার দিক থেকে বোঝাপড়ার ত্রুটি দেখলে স্নেহের দায়ে তিনি উপেক্ষা করবেন বা শুধরে দেবেন এই বিশ্বাস আর জোরও আমার মনে আছে। ...এর মধ্যেও আপনার কথা আমি ভেবেছি। আপনার মানসিকতার অনাপোস জয় যদি এখনো চান, মনে হয় সে-সময়ও একেবারে ফুরিয়ে যায়নি, এখনো আপনি আমাদের আর্ট টিচার অমরেশ ঘোষের দিকে ফিরে তাকাতে পারেন। প্রণতা, আপনার স্নেহের নূপুর।

ক্রোধে আর আক্রোশে অতসী গাঙ্গুলি কাঁপছে থরথর করে। সেই ক্রোধ আর আক্রোশ চোখ দিয়ে ভেঙে পড়তে শয্যায় আছড়ে পড়ল। অনেক-অনেকক্ষণ একভাবে পড়ে রইলো।...প্রথম ঘণ্টার ক্লাস মিস হয়ে গেছে। উঠল। মুখ-হাত ধুয়ে এসে সামান্য কুঁচকে যাওয়া শাড়িটা বদলে আরো একটু চকচকে শাড়ি পরল। অভ্যস্ত তৎপরতায় আবার প্রসাধন সেরে নিল। আয়নায় দাঁড়িয়ে বক্তিম দুই কানে, নাকের ডগায়, দু'চোখের কোণে আর একটু পাউডার বোলালো। ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে করিডোর ধরে দ্রুত সিঁড়ির দিকে চলল।

দ্বিতীয় ঘণ্টার ক্লাস না মিস হয়।

দীপ জ্বেলে যাই

মেন্টাল অবজারভেটরি। ছবির মত ঝকঝক করছে বাড়িটা। সামনে-পিছনে বাগান। দু'দিকের রাস্তাগুলো যেন কালো বার্ণিশ করা। ভিতরে জনা চল্লিশেক রোগী। রোগী বলা ঠিক হবে না। রোগিণীও আছে চৌদ্দ-পনের জন। আলাদা আলাদা ঘর। মস্তিষ্ক-বিকৃতির কারণ সকলের এক নয়। চিকিৎসা ব্যবস্থাও বিভিন্ন।

অদূরে নার্স কোয়ার্টার্স। বাঙ্গালী আর ফিরিঙ্গী মেয়ের জগা-খিচুড়ি। এঁকে অপরের ইয়ারকি-ফাজলামোগুলো মক্স করে। দিশি মেয়ে মেম-সাহেবের বাংলা নকল করে মুখ ভেঙায়। মেম-সাহেব দিশি মেয়ের পিঠে কিল বসিয়ে ছুটে পালায়। শিথিল অবকাশটুকু হাসি-ঠাট্টায় ভরাট থাকে।

তবু এরই মধ্যে একজনকে যেন সমীহ করে চলে ওরা। বাইরে নয়, মনে মনে। ঈর্ষা বলা যেত, কিন্তু সে কথা ভাবতে নিজেরাই লজ্জা পাবে। রেখা মিত্র, সিস্টার-ইনচার্জ। কর্তামো করে এ অপবাদ তার শত্রুও দেবে না। আগের বুড়ি ইনচার্জ যা ছিল, বাবা। নাকের জলে চোখের জলে এক করে ছাড়ত। এ বরং ভালো, দরকার হলে উল্টে তড়পে আসা যায়। তাছাড়া ছিল তো ওদেরই একজন, এখন না হয় মাথার ওপর উঠে বসেছে। চ্যারিটি মিশনের মেয়ে না হলে এতদিনে বাড়ি-গাড়িওয়ালা ঘরে বরে ভরে যেত কোন কালে এ সকলেই উপলব্ধি করতে পারে। সারা দেহে রূপ আর স্বাস্থ্য যেন একসঙ্গে মাথা খুঁড়ছে। কিন্তু এ নিয়েও কটাক্ষ করে না কেউ। কারণ নিজেই সে নিজেকে আগলে রাখতে ব্যস্ত। প্রাচুর্যের আভাসটুকু অবশ্য ঢেকে রাখা সম্ভব নয়।

হাসপাতালের বড়কর্তা মনস্তাত্ত্বিক কর্ণেল পাকড়াশী। নামের মত মানুষটিও গুরুগম্ভীর। কাছে এলেই বুকের ভেতরটা গুরগুর করে ওঠে। নার্স, এ্যাসিসট্যান্ট সকলেরই। তাঁরই দু'দুটো উদ্ভট এক্সপেরিমেন্ট সফল করেছে রেখা মিত্র। নির্দেশ মত নিখুঁত অভিনয় করেছে। এতটুকু ভুল হয়নি, এতটুকু ত্রুটি ঘটেনি। এক বছরের মধ্যে পর পর দু'জন মৃত্যুপথযাত্রী বিকৃত-মস্তিষ্ক মানুষ সুস্থ নিরাময় হয়ে ঘরে ফিরে গেল। কর্ণেল পাকড়াশী লিপিবদ্ধ করছেন তার গবেষণার ইতিবৃত্ত। হয়ত রেখা মিত্রর৪ নাম থাকবে তাতে। কিন্তু ইতিমধ্যে তৃতীয় রোগীর আবির্ভাব ঘটল। একই রোগ, একই কারণে মস্তিষ্ক-বিকৃতি। কর্ণেলের আগ্রহ বাড়ে। রেখা মিত্রর ডাক পড়ে তৃতীয় বারও। প্রথম সফলতার পরে সহকর্মিণীদের মনে হয়েছে মেয়েটা যেন বদলেছে একটু। দ্বিতীয় বারের পরিবর্তন আরো সুস্পষ্ট। কথা বলা কমিয়েছে। অকারণ হাসিখুশীটুকুও। চলনে-বলনে কেমন যেন একটু বিচ্ছিন্নতা। ফিরিঙ্গি মেয়েরা সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে তাকে। স্বজাতীয়াদের মধ্যে চাপা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে ফেলে কেউ কেউ, যশস্বিনী হয়ে পড়েছেন, প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে, মাটিতে পা পড়বে কেন।

কর্তব্যবোধে আর একজন হয়ত থামাতে চেষ্টা করে তাকে, এই, শুনলে দেবে'খন।

—শুনুক, কর্ণেলের পকেট-ঘড়ি হয়ে থাকলে অমন রবাত সকলেরই খুলত।

—যাঃ, মেয়ের মত মানুষ করেছে, কি আরোল-তারোল বকিস? বিরক্তি প্রকাশ করেছিল নার্স মহলের দ্বিতীয় তারকা বীণা সরকার। শিক্ষা এবং রুচিজ্ঞান আছে। বুড়ি সিস্টার-ইন-চার্জের পর সেই হতে পারত সর্বেসর্বা। কিন্তু দু'বছর আগে কোথা থেকে হুট করে বদলি হয়ে এলেন কর্ণেল, সঙ্গে এল রেখা মিত্র। তার দিন গেল।

এরই মুখ থেকে প্রতিবাদ শুনে পূর্বোক্ত শুশ্রূষাকারিণী চুপসে গেল যেন। প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল, সেকথা কে বলেছে, আমি বলছিলাম অমন জয়ঢাক বাজাবারও কোন মানে হয় না। আসলে পুরুষগুলিই সব ভেড়া-মার্কা, রূপসীর মুখে দু'টো নকল ভালবাসার কথা শুনেই গলে জল হয়ে গেল। পাগল না হাতী।

কিন্তু এও যে রাগের কথা সকলেই উপলব্ধি করতে পারে। দ্বিতীয় রোগীটির ভার কর্ণেল প্রথমে বীণা সরকারকেই দিয়েছিলেন। রেখা মিত্রর মতই সুনাম অর্জনের

আশায় প্রাণপণ চেষ্টা করেছে কর্ণেলের নির্দেশ কলের মত মেনে চলতে। অভিনয়ে এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না তারও। তবু পারল না। তাকে সরিয়ে কর্ণেল রেখাকে নিয়ে এলেন আবার। এখনো ভেবে পায় না, সেই মুমূর্ষু উন্মাদকেও সে কি করে ছ'মাসের মধ্যে একটু একটু করে সম্পূর্ণ নীরোগ করে তুলল।

দুর্নিবার কৌতূহলে ঠাট্টার ছলেই সে রেখাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি করে কি করলি রে?

নিজের ঘরের চৌকাঠের কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল রেখা মিত্র। প্রশ্ন শুনে তার চোখে চোখ রেখে নীরবে চেয়েছিল কিছুক্ষণ। পরে তেমনি হালকা জবাবই দিয়েছে, গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, ভালবাসি প্রিয়তম, আগের সব কথা ভোলো—

বীণা হেসে ফেলেছিল।—ভুলল?

শব্দ করে হেসে উঠেছিল রেখা মিত্রও।—ভুললই তো।

বীণার মনে হয়েছে, ইচ্ছে করেই সে তার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল, যশের ডালি ভবিষ্যতেও আর কাউকে ভাগ করে দিতে রাজি নয় বোধ হয়। ভ্রূ কুঁচকে বলল, তা এমন অভিনয় করিস যদি থিয়েটার বায়স্কোপে ঢুকে পড় গে যা না, হাসপাতালে পচে মরছিস কেন?

—পারি। হলিউড থেকে ডেকেও পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি গেলে তোর ছোট ডাক্তার হার্ট ফেল করবে, সেজন্যেই যেতে পারছি না।

হাসতে হাসতে মুখের ওপরেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। বীণা সরকার স্তব্ধ। ..ছোট ডাক্তার নিখিল গুহ। রেখা মিত্র না এলে এতদিনে সত্যিই একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত। সে জ্বালা আছেই। কিন্তু তবু রাগতে পারেনি। কারণ, আজ পর্যন্ত ছোট ডাক্তার এই মেয়েটির কাছ থেকে শুধু নীরস অবহেলা ছাড়া আর কিছু পায়নি। কর্ণেলের হাতের মেয়ে না হলে এতদিন এখানে আর চাকরী করতে হত না ওকে।

কিন্তু পুরানো কথা থাক। তিন নম্বর রোগী এসেছে। তৃতীয় বার ডাক পড়েছে রেখা মিত্রর। নার্স কোয়ার্টারের আবহাওয়া চঞ্চল। কর্ণেলের তলব শুনলে পড়িমরি করে ছুটে যাওয়াই রীতি। কিন্তু ওর ঘরের দরজা বন্ধ এখনো। করছে কী? ঘুমুচ্ছে? না সাজছে?

কিন্তু রেখা মিত্র কিছুই করছে না। শিথিল আলস্যে স্রেফ শুয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে। বুকের ওপরের বইখানা দেখলেও সহকর্মিণীরা হাঁ করে ফেলত হয়ত। বিবেকানন্দের কর্মযোগ। তুলে নিল। উল্টে-পাল্টে দেখল একবার। হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ঘরের কোণে আলনার নীচে গিয়ে আশ্রয় নিল সেটা। উঠে বসল পা ঝুলিয়ে। পরনের বেশ-বাসের দিকে তাকালো একবার। চলে যাবে। ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। চোখের সামনে ভাসছে দু'টি মুখ। সমরেশ চক্রবর্তী আর মাধব সোম। সুপুরুষ দু'জনেই। কিন্তু পাগল হলে কি বীভৎসই না হয় মানুষ। প্রাণের জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে বলে গেছে। রেখা মিত্র নিজের মনেই হেসে উঠল।...তা থাকবে হয়ত।

আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। একটু প্রসাধন দরকার। বুড়ো কর্ণেল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে আবার। চোখ নয় ত, যেন দু'খানা এক্স-রে'র কাচ। কিন্তু আয়নার দিকে চেয়ে

চেয়ে আত্মবিস্মৃত তন্ময়তা নেমে এলো কেমন। চেয়েই আছে। দেখছে। কিন্তু কে দেখছে কাকে? কে বেখা মিত্র? ওই শুভ্রশ্রী নারীমূর্তি? কি আছে ওতে।...রক্ত, মাংস, নীল নীল কতগুলো শিরা-উপশিরা। গা ঘিন ঘিন করে উঠল। তারপর?...শুকনো, কঠিন, কুৎসিত কঙ্কাল একটা। শিউরে উঠল আবারও। তাহলে কে দেখছে? আর বাকি থাকল কী?

দরজার গায়ে শব্দ হল ঠক ঠক করে। বিষম চমকে উঠল সে। আরার বেয়ারা পাঠিয়েছে নিশ্চয়। দরজা না খুলেই জবাব দিল, 'বলো গিয়ে এক্ষুনি যাচ্ছি—।' বুড়ো দেরে দফা সেরে। চটপট এপ্রোন পরে নিয়ে হুডটা মাথায় চড়ালো। জুতো বদলাতে গিয়ে আলনার নীচে কর্মযোগের দুর্দশা দেখে জিভ কাটল তিন আঙুল। তুলে নিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে একবার কপালে ছুঁইয়ে ড্রয়ারে রেখে দিল বইখানা।

নাকের ডগা থেকে চশমা কপালে তুলে দিলেন কর্ণেল।—বোসো। পেশেন্ট দেখেছ?

রেখা ঘাড় নাড়ল, দেখিনি।

—হাউ এ্যাবসার্ড। —এ থার্ড কনসিকিউটিভ সাকসেস উইল মেক ইউ এ ফিনিসড এ্যাকট্রেস মাই ডিয়ার। হেসে কাজের কথায় এলেন, সেইম কেস, সেইম ট্রিটমেন্ট। কিন্তু একটু গণ্ডগোল আছে। নাটক নভেল কি সব লিখত টিকত। ইউ শুড বি মোর এলার্ট, এমনিতেই আধ পাগল এসব লোক। টাইপ-করা কেস-হিস্ট্রি বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে, দেখো—।

কাগজগুলো নিয়ে রেখা চোখ বুলোতে লাগল। এক অক্ষরও পড়ল না। কারণ, এরারে আর রোগী ভালো হবে না সে জানে। আর কিই বা হবে পড়ে। নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বগ্রাসী শূন্যতার মাশুল দিচ্ছে সেই ইতিহাসই তো। তাকে নতুন করে রোগে ফেলতে হবে আরার। ভালবাসার রোগ। যে নারীর অমোঘ স্মৃতি মানুষটাকে দেউলে করেছে, বিকল করেছে, তার মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। কিছুদিনের জন্য তার মানসপটে অধিষ্ঠাত্রিণী হবে রেখা মিত্র। এটুকুই চিকিৎসা। তারপর এই নতুন রোগ আর কাচা মোহ ছাড়ারার কলাকৌশল ভালই জানেন মনোবিজ্ঞানী কর্ণেল। ছদ্ম-গাম্ভীর্যের আড়ালে রেখা হাসছে মনে মনে। বুড়োর সকল আশায় ছাই পড়রে এরার।

কিন্তু রেখা মিত্রর সঙ্কল্পে ছেদ পড়ল রোধ করি প্রথম দিনই। দোতলায় কোণের দিকে ঘর। কান পেতেও কোন সাড়াশব্দ পেল না। দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল। স্প্রীং-রসানো দরজা আপনি আরজে যায় আরার।

বাহুতে চোখ ঢেকে শুয়ে আছে লোকটি। আধ ময়লা, রোগা মুখে এক-আধটা রসন্তের দাগ। সুশ্রী রলা চলে না কোন রকমে। পায়ের শব্দে চোখের ওপর থেকে হাত সরালো সে। হাসল একটু, নমস্কার, রেশ ভালই আছি আমি।

আগের দু'জন রোগীর কাছে যাওয়াটাও নিরাপদ ছিল না প্রথম প্রথম। চোখে চোখ রেখে রেখা দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। সে আরার রলল, আপনাদের এই জায়গাটা ভালো, রেশ নিরিরিলি, কোন অসুরিধে হচ্ছে না আমার। চোখের ওপর হাত নেমে এলো, আচ্ছা, দরকার হলে খরর দের'খন—।

বেখা এগিযে এসে বোগীর চার্ট দেখে নিল, ঠিক ঘরে এসেছে কি না। অমব দত্ত...। ঠিকই আছে। বকিং চেযাবটায এসে বসল। আধ ঘণ্টা কেটে গেল, টুঁ-শব্দটি নেই। স্থাণুব মত পড়ে আছে মানুষটা। তাবপব এক সময হাত সবে গেল আবাব। সবিস্ময়ে তাকালো সে, কি আশ্চর্য। সেই থেকে বসে আছেন আপনি? মিথ্যে কষ্ট কবছেন কেন, দবকাব হলেই আমি ডাকব'খন, আপনি যান—।

বিস্মিত বেখাও কম হযনি।—আপনি ভাবচেন কী?

অস্ফুট শব্দ কবে হেসে উঠল সে।—একটা লাইন কিছুতে মনে কবতে পাবছি নে সেই থেকে। 'সব দিতে সব নিতে যে বাডাল কমণ্ডলু দ্যুলোকে ভূলোকে...'তাব পব ভুলে গেছি। ববি ঠাকুব চুবি কবেছে।...চুবি ঠিক নয, আগে ভাগেই লিখে বসে আছে। নইলে আমি লিখতুম। কিন্তু তাব পবেব কথাগুলো...

নড়েচড়ে সোজা হযে বসল বেখা মিত্র। স্থিবনেত্রে চেযে বইল।

—আপনাব জানা আছে? নেই, না? সুলেখা কিন্তু ফস কবে বলে দিত।

নামটা বলাব সঙ্গে সঙ্গে যেন ইলেকট্রিক শক খেযে চমকে উঠল নিজেই। বিহ্বল, বিমূঢ়। মাত্র কযেক মুহূর্ত। কঠোব কঠিন কতগুলো বেখা সুস্পষ্ট হল সাবা মুখে। চোখেব দৃষ্টি গেল বদলে। দুই চোখে আগুনেব হলকা। ঝুঁকে এলো সামনেব দিকে।

—আপনি, আপনিও তো মেযেছেলে?

বেখা চেযাব ছেড়ে এক পা অগ্রসব হতেই সে গর্জে উঠল আবাব।—দাঁড়ান ওখানে। আমি জানতে চাই আপনি মেযেছেলে কি না?

বেখা ঘাড় নাড়ল, মেযেছেলেই বটে।

—যান আমাব সুমুখ থেকে। আব কখনো আসবেন না। মেযেদেব আমি আব দেখতে চাই নে কোন কালে। কোন দিন না। এত বড় অভিশাপ আব নেই। দাঁড়িযে আছেন কি? যাবেন না? যান, যান, বলছি—।

চোখে পলক পড়ে না বেখা মিত্রব। অদ্ভুত রূপান্তবটা উপলব্ধি কবতে চেষ্টা কবছে। ঠক ঠক কবে কাঁপছে মানুষটা। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।

দবজা খুলে বেখা বাইবে এসে দাঁড়াল। অমব দত্ত বিড় বিড় কবে বকে চলেছে তখনো। উত্তেজনা বাড়ছেই। একটা ইনজেকশান নিযে বেখা আবাব ভিতবে এলো। কনুইযে ভব কবে অমব দত্ত আধা-আধি উঠে বসল প্রায।—আবাব এসেছ? সুলেখা পাঠিযেছে, কেমন? তোমাদেব ভয-ডব নেই? আমাব কলমেব ডগায কত বিষ জানো?

—জানি, শুযে পড়ুন।

—ফার্স্ট, ইউ গেট আউট।

ইনজেকশান আব আবকেব তুলোটা এক হাতে নিযে অন্য হাতে ধবে বেখা তাব কাঁধে আচমকা ধাক্কা দিযে শুইযে দিল। এবকম একটা সবল নিষ্ঠুবতাব জন্য বোগীও প্রস্তুত ছিল না। হকচকিযে গেল কেমন। ততক্ষণে তাব সামনেব বাহু উঠে এসেছে ওব শক্ত হাতেব মুঠোয। কিছু বুঝে ওঠাব আগেই ইনজেকশান শেষ।

...পাঁচ মিনিটও গেল না। চোখেব পাতা ভাবী হযে আসছে বোগীব। তবু যতক্ষণ পাবল চোখ টান কবে সে দেখতে চেষ্টা কবল এই নির্মম শুশ্রূষাকাবিণীকে।

ইনজেকশান বেখে নীববে অপেক্ষা কবছিল বেখা। সে ঘুমিযে পডতে কাছে এসে দাঁডাল। বিছানাটা অবিন্যস্ত হযে আছে। টান কবে দিল। চুলগুলো কপালেব ওপব দিযে চোখে এসে পডেছে। সবিযে দিল। গাযেব চাদবটা টেনে দিল বুক পর্যন্ত। নিঃশব্দে চেযে বইল তাব পব। ঘুমন্ত মুখেও বহু দিনেব একটা ক্লিষ্ট যাতনা সুপবিস্ফুট যেন। লোকটা ভালো কি মন্দ সে কথা এক বাবও মনে আসছে না তো। তাদেবই এক জনেব জন্য এই মানুষেব সকল বৃত্তি হাবাতে বসেছে। হঠাৎ মনস্তাত্ত্বিক কর্ণেলেব ওপব ক্ষেপে আগুন হযে গেল বেখা মিত্র। তাঁব সকৌতুক কণ্ঠস্বব যেন গলানো সীসে ঢেলে দিতে লাগল কানে, এ থার্ড কনসিকিউটিভ সাকসেস...।

এব পবেব দু'তিন মাসেব চিকিৎসা-পবে নতুন কবে বর্ণনাব কিছু নেই। এক নাবীব স্মৃতি মনে এলেই অমব দত্ত চিৎকাব-চেঁচামেচি কবে ওঠে তেমনি, নিঃস্ব হিম-শীতল জীবনেব হাহাকাবে জলে-পুডে খাক হযে যায। বেখা কখনো ঘব ছেডে চলে যায তাব কথা মত, কখনো বা উল্টে ধমকে ওঠে সুষ্ঠু অভিনেত্রীব মত. কখনো বা প্রণযিনীব আকুলতায কাছে এসে গাযে-মাথায হাত বুলিযে দেয। শেষেব দিকে একটু পবিবর্তন যেন উপলব্ধি কবতে পাবে। তর্জন-গর্জন তেমনি আছে, কিন্তু বেশিক্ষণ সে অনুপস্থিত থাকলে অসহিষ্ণুতাও বাডে।

—এতক্ষণ কোথায ছিলেন?

—বাইবে।

—কেন?

—আপনিই তো ঘব থেকে বাব কবে দিলেন।

—আপনি গেলেন কেন?

বেখা হেসে ফেলে, আচ্ছা, আব যাব না। কিন্তু আবাবও তাকে যেতে হয, আবাবও আসতে হয। তবু বেখা বোঝে, দিন বদলাবে। অনেক বদলাবে। কিন্তু বলে না কাউকে কিছু। কর্ণেলেব নীবব প্রশ্ন এডিযে যায। সহকর্মিণীদেব কৌতূহলও জানবাব। বিশেষ কবে বীণা সবকাব ছাডবাব পাত্রী নয।

—নতুন নাগবটি কেমন?

—ভালো।

—তবু, নমুনাটা শুনিই না একটু?

—মর্কটেব মত।

—আঁচডে কামডে দেয?

—দেযনি, দিতে পাবে।

বীণা সবকাব হেসে ওঠে, কিছুতে পোষ মানছে না বল?

হেসে টিপ্পনী কাটে বেখা মিত্রও, ছোট ডাক্তাবকে নিযে পড গে না, আমাকে নিযে কেন—।

অমব দত্ত ভালো হবে। এবাবও এই বিধিলিপি। আবও মাস দুই পবেব সেই বিশেষ মুহূর্তটিব অপেক্ষা শুধু। বেখা বকিং চেযাবে বসে হাসছে মৃদু মৃদু। অল্প অল্প দুলছে চেযাবটা। অ. দত্ত নির্নিমেষ নেত্রে তাব দিকে চেযে চেযে কি যেন দেখছে।

বেখা উঠে গাযেব এপ্রোনটা খুলে চেযাবেব কাঁধে বাখল। মাথাব হুডটাও। খোঁপাব আধখানা পিঠেব ওপব ভেঙ্গে পডল। বসল আবাব। বকিং চেয়াব সজোবে দুলে উঠল।

—কি হল?

—গবম লাগছিল।

—হাসছেন যে?

—এমনি।

—এমনি কেউ হাসে?

—তাহলে আপনাকে দেখে।

—আমি তো কুৎসিত দেখতে।

—ছিলেন, এখন মোটামুটি মন্দ নয।

অমব দত্তও হাসতে লাগল। একটু বাদে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবল, আচ্ছা, আপনি আমাব জন্য এতটা কবেন কেন?

—কতটা কবি?

—বলুন না শুনি?

—আপনি একজন এত বড লেখক, আপনাব জন্য কবব না তো কাব জন্য কবব। কত লোক কত কিছু আশা কবে আপনাব কাছে।

হঠাৎ যেন একটা ঝাঁকুনি খেল অমব দত্ত। সমস্ত বক্ত যেন উবে গেল মুখ থেকে। নিঃসাড, পাণ্ডুবর্ণ। আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, এ তো সুলেখাব কথা। সুলেখা বলত। আমাব মত লেখক নেই, আমাব জন্য সব পাবা যায, সব কবা যায—। এব পব তাবই মত বলে বেডাবেন তো, আমি গবীব, খেতে-পবতে পাই নে ভালো কবে, মুখে বসন্তেব দাগ, পাগল-ছাগলেব মত লিখি যা মনে আসে, দুবাশা দেখে হাসি পায-—বলবেন? বলবেন তো?

স্থিব, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিবীক্ষণ কবছিল বেখা। উঠে কাছে এলো।—সুলেখা এসব বলেছে?

—হ্যাঁ বলেছে, সর্বত্র বলেছে, হেসে আটখানা হযে বলেছে। আপনিও বলবেন, হাত বাডালেই বলবেন—। আবাব সে কাঁপতে সুরু কবেছে, মুখে দুঃসহ যাতনাব চিহ্ন।

কণ্ঠস্বব কান্নাব মত শোনায এবাব।—আমি তো কোন অপবাধ কবিনি। বুকেব ভেতবটা জ্বলে-পুডে যেতে দেখলে আপনাদেব এত আনন্দ হয কেন? ভযাবহ নিঃসঙ্গতায হাড-পাঁজব শুদ্ধ যখন ভেঙ্গে দুমডে একাকাব হযে যায, সে যাতনা বোঝেন? আকণ্ঠ পিপাসায যখন...

আব কথা বেরুল না। বাহুতে মুখ ঢেকে ফেলল সে। বেখা আস্তে আস্তে হাতখানি সবিযে দিল আবাব। এক পা মাটিতে বেখে শয্যায ঠেস দিযে বসেছে। শুভ্র, নিটোল দুই হাতে মুখখানা ঘুবিযে দিল নিজেব দিকে। ঝুঁকে এলো আবো কাছে।

দু'-চাব মুহূর্তেব নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময।

অমব দত্তব ঠোঁট দুটো আব একবাব থব-থব কবে কেঁপে উঠল শেষ বাবেব মত। তাব পব এক বিস্মৃতিদায়িনী স্পর্শেব মধ্যে নিবিড় কবে আশ্রয় পেল তাবা। এত কালেব হাড় কাঁপানো হিমশীতল অনুভূতিটা যেন নিঃশেষে মিলিযে যাচ্ছে। উষ্ণ। ...নবম।...তন্দ্রাব মত।...ঘুমেব মত।...ঘুমিযেই পডল।

পবেব ক'টা দিনেব তুচ্ছতা বাদ দেওযা যাক। নির্দেশ মত তাকে নিযে বাইবে বেডানো, সিনেমা দেখা, থিযেটাব দেখা।

বেখা তাগিদ দিল কর্ণেলকে, এব পবে মুশকিলে পডব, তাডান শীগগিব।

কর্ণেল হাসেন, ইউ প্রেটি উইচ।

বেখা প্রতিবাদ কবে, ফিনিস্‌ড এ্যাকট্রেস।

এব পব ক'দিন ধবে কর্ণেলেব ঘবে বসে নিজেব বোগজীর্ণ প্রতিচ্ছবিটি দেখেছে অমব দত্ত। বৈজ্ঞানিক বেকর্ডে নিজেবই দুই একটা পাগলামীব নমুনা শুনে শিউবে উঠেছে। আগেব দু'জন বোগীকে কি কবে ভালো কবেছে বেখা মিত্র তাও শুনল। সব শেষে, একই উপাযে নিজেব আবোগ্য লাভেব ইতিবৃত্ত। নিপুণ মনোবিজ্ঞানীব পবামর্শ এবং সাবগর্ভ উপদেশ শিবোধার্য কবে গৃহপ্রত্যাবর্তনেব উদ্যোগ কবল যখন, তখন মনটাই শুধু ভাবাক্রান্ত হযে আছে ক্লান্তিকব বোঝাব মত। এ ছাডা আব কোন উপসর্গ নেই।

বেখাব প্রতীক্ষা কবছিল। সে এলো।

—যাবাব সময হলো, এই জন্যেই ডেকেছিলাম। .আপনাকে চিবকাল মনে থাকবে আমাব।

সমবেশ চক্রবর্তী বলেছিল। মাধব সোমও বলেছিল। বেখা হাসল।—সেটা কি খুব ভালো কথা হবে?

দুই-একটা মৌন মুহূর্ত। অমব দত্ত হাত তুলে নমস্কাব জানালো, আচ্ছা, চলি—।

হাত তুলে প্রতি নমস্কাব কবল, বেখাও—, হ্যাঁ, আসুন—।

অমব দত্তব কাহিনী শেষ হযেছে। কিন্তু এ কাহিনী অমব দত্তব নয। বেখা মিত্রব। অনেক, অনেক দেবীতে জেনেছে বীণা সবকাব, বেখা মিত্রব বোগী ভালো কববাব বহস্যটুকু কি। অনেক, অনেক দেবীতে জেনেছেন মনোবিজ্ঞানী কর্ণেল পাকডাশী, কোন নির্দেশই তাঁব মেনে চলেনি বেখা মিত্র। অনেক, অনেক দেবীতে জেনেছে বাকি সকলে, বেখা মিত্র বোগী ভাল কবেছে, ফাঁকি দিযে নয, ভালবাসাব অভিনয কবে নয, সত্যিকাবেব ভালবেসে। পব-পব তিন জনকেই।

হাসপাতালে বোগীব সংখ্যা আব একজন বেডেছে। বোগী নয, বোগিণী। সে বেখা মিত্র।

বারমুডা লিলি

কুণাল বোস হেসেই বাঁচে না। শিবু কাকাব দপ্তবে বসেও হেসেছিল। তাই দেখে শিবু কাকা ধমকেই উঠেছিল। বলেছিল, আমি কি তোকে তোযাজ তোষামোদ কবে চলাব

পাত্র, যে মিথ্যে তোকে বাড়াতে যাব? না কি আমার কাগজটা আঁস্তাকুড় একটা যে ছাই-ভস্ম যা পাব তাই নিয়ে ছাপার জন্য হাঁ করে থাকব? এত কাল কাগজ চালাচ্ছি, এত লেখা লিখছি কলমের আঁচড় টানা দেখলে কার মধ্যে কি আছে বুঝতে পারি না—আঁচ করতে পারি না? যে লেখা দেখে তোর বাবা অমন আগুন হয়েছে, তোকে কেটে দুখানা করতে পারলে শান্তি হয় বলে।২, আর তারপর মাথার বিকৃতি কি না দেখার জন্য অত চুপিচুপি ডায়েরিটা আমার কাছে চালান করেছে—সেই সব ছাইভস্ম লেখার মধ্যেও একটা সম্ভাবনা দেখেই তোকে আমার কাছে পাঠাতে বলেছিলাম—নইলে আমার সময় কি কুল গাছ যে তোদের মতো অকাল কুষ্মাণ্ড এসে ঝাঁকালেও ঝরঝর করে পড়বে? বাঁদর কোথাকারের।

নিচের কুচকুচে কালো ঠোঁটটা ছাতলা পড়া দাঁতে ঘষে কুণাল সবিনয়ে আপত্তি জানিয়েছে, ওই জীবটার অসম্মান কেন করছেন শিবু কাকা—বরং বাঁদরেতর কোথাকার বলুন।

শিবুকাকা আবার বেগে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল। (কি বললি? বাঁদরের থেকে ইতর বাঁদরেতর—) হাঃ হাঃ হাঃ—ওই জন্যই তো বলছিলাম আদা জল খেয়ে লেগে যদি যাস তোর হবে। হলে দুটো পয়সারও মুখ দেখতে পারি—বাপ-দাদার হোটেলে খাচ্ছিস বলে দিন-রাত অত লাথি গুঁতোও খেতে হবে না। তা বলে ছাই ভস্ম যা হোক লিখে আনলেই তো আর আমি ছাপব না—সে রকম কিছু থাকলে তবে কথা। সেটা এমনি হয় না, বাঁদরামি ছেড়ে, মানে বাঁদরেতরামি ছেড়ে অনেক কাঠ-খড় পোড়ালে তবে হয়। কালো লম্বাটে বাঁধানো ডায়েরি বইটা শিবুকাকা তার দিকে ছুড়ে দিয়েছে। যা এখন, অনেক সময় ঢেলেছি তোর জন্যে, আর না।

ওটা হাতে করে কুণাল শিবুকাকার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঝোলানো গোঁফ আর থুতনির নিচের অল্প দাড়ির গোছায় মুখের হাসি ছড়িয়ে পড়ছে। তারপরেই গর্তের প্রায় গোল চোখ দুটো সচকিত। শিবুকাকার ঘরের পার্টিশনের এ ধারে একজন সার এডিটর আর দু'জন প্রুফরিডার মাথা গুজে কাজ করছে। তাদের থেকে একটু দূরের চেয়ারে বেশ সুশ্রী একটি মেয়ে বসে আছে। বয়সে কুণালের থেকে বছর দুই তিন বড়ই হতে পারে...বছর পঁচিশ ছাব্বিশের কম নয়। কপাল ফাঁকা, সিঁথিতে সরু একটু সিঁদুরের দাগ ঝিলিক দিচ্ছে। কুণাল শিবুকাকার পার্টিশন দরজার ওধার থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়ে আসতেই চোখাচোখি। ও ঘরে ছিল বলেই মেয়েটিকে এদিকের এরা বসিয়ে রেখেছে মনে হয়। কুণালের লুব্ধ দু'চোখ কয়েক নিমেষের মধ্যে নারীদেহ ছিঁড়ে খুঁড়ে আবার মুখের ওপর এসে স্থির হল। এই চাউনি পড়ে নিতে বা বুঝে নিতে কোনো মেয়েরই ভুল হয় না বা সময় লাগে না। তখন কত রকম দেখতে হয়। সুন্দর মুখে বিরক্তির আঁচড় পড়ে। ধারালো হয়, ঘোরালো হয়, চোখে আগুনও ছোটে। কুণালের তখন আরও মজা লাগে। মনে হয় ও যেন চোখ থেকেই দুটো হাত বার করে দিয়ে কোনো মোহিনী তনু জাপটে ধরেছে, আর রণ-রঙ্গিনী তাই থেকে বেঁকেচুরে গুমরে দুমড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে।

সামনেব বমণীমুখ ভালো কবে তেতে ওঠাব আগেই কুণাল বোস লম্বা পা ফেলে তাব দু'হাতেব মধ্যে এসে দাঁড়ালো। নিজেব চেষ্টায় গড়া চেহাবাব ছাঁদ ছিবি যেমনই হোক, গলাব স্বব যে এই মূর্তিব সঙ্গে বেখাপ্পা বকমেব মিষ্টি আব নবম তা-ও জানে। নিঃসংকোচে পিছনেব দবজাটা আঙুল দেখিযে বললে, উনি এখন একা আছেন, আপনি যেতে পাবেন।

বিপবীত প্রতিক্রিযায মেযেটি নড়ে চড়ে ওঠাব আগেই কুণাল বোস ঘবেব বাইবে। সিঁড়ি পর্যন্ত গিযে আস্তে আস্তে ঘুবে দাঁড়ালো। এখান থেকেও সামনেব দবজা দিযে সোজা শিবু কাকাব পার্টিশন ঘেবা পর্যন্ত চোখ চলে। মেযেটি ললিত ছন্দে ওই ঘবেব দবজা পর্যন্ত পৌঁছেছে। মেযেদেব সামনে থেকে দেখতে বেশি ভালো লাগে কি পিছন থেকে কুণাল বোস ঠিক হদিস পায না। অনেক সময খেযাল কবে দেখেছে, যে মেযেদেব সামনে থেকে ভালো লাগে পিছন থেকে তাদেব বেশিব ভাগই যেন আবো ভালো লাগে। কিন্তু সামনে থেকে দেখতে যাদেব হত-কুচ্ছিত লাগে তাদেবও এক-একজনকে পিছন থেকে দেখতে অদ্ভুত ভালো। এমন একটা অভিজ্ঞতাব কথা হাতেব এই ডাযেবিটাতেই লেখা আছে।. আজ এক শ্যামাঙ্গী দীর্ঘাঙ্গীকে দেখলাম বিশ গজ আগে আগে হাঁটছে। দেখাব সঙ্গে সঙ্গে সেই সুঠাম বমণীঅঙ্গ ঘিবে আমাব গর্তে ঢোকা আদেখলে চোখ দুটো বনবন কবে চক্কব খেতে লাগল। পা চালিযে ফাবাক যত কমিযে আনছি, ভিতবেব পশুটা ততো থাবা খুলছে। চলাব ঠমকে সর্বাঙ্গেব জোযাব ঢেউ খেলে খেলে বেখায বেখায তটে তটে পা বেযে নেমে আসছে। গা ঘেঁষে তিন পা এগিযে গেলাম, ঘুবে তাকালাম। কি কুচ্ছিত কি কুচ্ছিত। কেউ যেন আমাব গালে কষে একখানা থাপ্পড বসিযে সব কিছুব ছন্দপতন ঘটিযে দিল। তাবপব আবাব আমি পিছনে। সে সামনে।. দেখে দেখে আমাব মনে হচ্ছিল দ্বাপবেব মানুষগুলো অনেক অকপট ছিল। যুধিষ্ঠিবকে পর্যন্ত দ্রৌপদীকে কযেক জাযগায অযি নিতম্বিনী বলে সম্বোধন কবতে দেখা গেছে। কিন্তু এ-কালেব দ্রৌপদীবা ওই বচন শুনলে সোজা একখানা চড় বসিযে দেবে।

লেখাব সময সেই বাস্তব অনুভূতিটা এমনি প্রত্যক্ষ সত্য হযে উঠেছিল, যে হাতেব ডাযেবি না খুলেও মুখস্তব মতো বলে যেতে পাবে। দ্বিধান্বিতচবণ মেযেটিকে শিবুকাকাব দবজা ঠেলে ভিতবে ঢুকে যেতে দেখা গেল। মনে হয কোনো লেখা-টেখাব তদবিব তদাবকে আসা। শিবুকাকা ঘবে একা। তাব দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য কে জানে। বোধহয দুইই। শিবুকাকাব বযস ষাট, সেইজন্য সুবিধে। সুবিধে ক্যাশ কবাব বযেস কিন্তু গতব যখন নেই দুর্ভাগ্য ছাড়া আব কি?

সিঁড়ি দিযে নেমে বাস্তায। দোকানেব ঘড়িতে বিকেল প্রায চাবটে। এক দেড ঘণ্টা সময খামোখা নষ্ট। একেবাবে নষ্টই বা বলে কি কবে। হাতেব এই গাবদা ডাযেবিটা তো উদ্ধাব হল। এটা এ বছবেব নয। তিন বছব আগেব। কোনো মেযে গুরুকে প্রেজেন্ট কবেছিল। গুরু বলতে প্রদীপ ব্যাণ্ডো। ডাযেবিটাতে কালোব চেকনাই ঠিকবে পড়ছিল। তাব ওপব জ্বলজ্বল কবছিল বড বড হবফেব সোনালি ছাপ। ভিতবে সিল্কেব ফিতে। ডাযেবি বসিকদেব পছন্দ হবাব কথা। কিন্তু কুণাল তখন পর্যন্ত একটুও ডাযেবি

বসিক নয। ওই কলেজে পডা মেযেই বা অমন ডাযেবি কোথায পাবে! বাপ কাকা দাদা কাবো কাছ থেকে হাঁতডেছে। তাবপব যে মুখ কবে গুরুকে ওটা প্রেজেন্ট কবেছিল, কুণালেব মনে হযেছিল মেযেটা তাব সর্বস্ব ওই হাতে দিযে দিলে, ছ'টাব শোযে সিনেমা দেখাব প্রোগ্রাম পাকা কবে মেযেটা চলে যেতেই গুরু তাচ্ছিল্য ভবে ডাযেবিটা টেবিলেব ওপব ছুঁডে দিযেছিল, সুন্দব মুখে বিবক্তিব হিজিবিজি দাগ ফেলে বলেছিল, ভাল্লাগে না এ-দেশেব মেযেগুলো সব ভীতুব হদ্দ। অন্ধকাবে বসে গা টেপাটেপি কবতে দেবে, সিনেমাব পব ভালো বেস্তোবাঁয নিযে গেলে আব আলাদা ক্যাবিনে নিযে ঢোকাতে পাবলে বড জোব একটু জাপটে ধবতে দেবে আব দুটো চুমু খেতে দেবে—তাব বেশি এগোতে যাও অমনি হৃৎকম্প। আব নিউইযর্কেব মেযেগুলো? শালা বাবো বছব বযসে ছেলেগুলোকে কাচপোকাব মত হিডহিড কবে টেনে নিযে যায—নিজেবা যেমন লোটে তেমনি লুঠতেও দেয।

গুরুব মুখে নিউইযর্কেব গল্প শুনে শুনে কুণালেব দু'কান হেজে পচে যাবাব কথা। কিন্তু উল্টে যেন মজা নদীতে বসেব বান ডাকে। আগে তো শুনেই ওব কান গবম হত, সমস্ত শবীব গবম হত। শুনে শুনে গুরুব নিউইযর্ক কুণালেব কাছেও স্বর্গ। উত্তেজনাব এমন জাযগা পৃথিবীতে আব কোথাও আছে নাকি? সেখানে উত্তেজনাবই অন্য নাম জীবন। সেই জীবনেব স্বাদ ভালো কবে পাবাব আগেই গুরুকে চলে আসতে হযেছে এই খেদ তাব যাবাব নয। গুরুব বাপ ছিল সেখানকাব ডাক্তাব। সেখানে এক একজন ডাক্তাব—মানে কি? আইনেব জাল-ছেঁডা ডাকাত। দু'বেলা দু'পকেট বোঝাই কবে ডলাব আনত। সে কি বাজাব হালে থাকা। তিন তিনটে গাডি ছিল ওদেব। একটা বাবাব, একটা মাযেব, আব একটা ওদেব তিন ভাইযেব। বাবাব গাডি বাবা, মাযেব গাডি মা চালাতো। আব ওদেব তিন ভাইযেব গাডি 'সফাব' চালাতো। সেখানে একজন সফাবেব মাইনে কি তোব ধাবণা আছে? এখানকাব মাসেব দশ হাজাবিবাও সেই মাইনেব ড্রাইভাব বাখতে হলে ফতুব হযে যাবে।

গুরুব সেই ডাক্তাব বাবাব আব ভোঁদা মাযেব কি মতি হল—বাডি ঘব বেচে দিযে কযেক ঝাঁক-বোঝাই টাকা নিযে দেশে চলে এলো। ঢেব সুখ কবা গেছে এখন ছেলেদেব জন্যেই নাকি তাদেব চাটি-বাটি তুলে চলে আসা। বাগে মুখ লাল কবে গুরু বলত, অনেক সুখ তোমবা কবলে, আমাদেব কি হল? ছেলে মেযেব সুখেব এমন বাবোটা যে বাজায তাবা বাবা-মা না শত্রু! এখানে তাবা এসে বিবাট বাডি হাঁকিযে, দাসদাসী বাবুর্চি খানসামা বেখে দিব্যি পাযেব ওপব পা তুলে দিন কাটাচ্ছে। বাবাব প্র্যাকটিসও এখানে নামেই, বিকেলে দু'ঘণ্টাব জন্য চেম্বাবে যায—সন্ধ্যায মাযেব সঙ্গে হুইস্কি গেলে। আমাদেব জন্য আসা, আমবাই বা কি দিগগজ হলাম। আমাকে তো অন্তত বি, এ-টাও পাশ কবাতে পাবলে না। ভাই দুটো যা-হোক মেজে-ঘষে গ্র্যাজুযেট হযেছে।

গুরু মানে প্রদীপ ব্যাণ্ডোব বযস এখন সাতাশ। কুণালেব থেকে চাব বছবেব বড। নিউইযর্ক ছেডে কলকাতায চলে এসেছিল তেবো বছব বযেসে। কুণালেব পনেব বছব বযেস থেকে সে এই গুরুব চেলা। এদিক থেকে গুরু উদাব বলতে হবে।

সে বয়েস দেখে না, বশ্যতা দেখে। হুকুম তামিল করার কেরামতি দেখে। সেই পনের বছর বয়েস থেকে এ এলাকার এমন কি পাড়ার কত মেয়ের কাছে গুরুর চিঠি চালান করেছে, জবাব নিয়ে এসেছে—সন্ধ্যার পর লেকে দূরে দাঁড়িয়ে তাদের পাহারা দিয়েছে, ঠিক আছে? আদর করে কুণাল মাঝে মাঝে শালা গুরু তুমি বলে কথা ঝাড়ে তাতেও গুরু হাসে। আনন্দে পিঠ চাপড়ায়। গুরুর নিজস্ব একটা ছোট্ট গাড়ি ছিল আরো ছ'বছর আগে পর্যন্ত। গুরুই চালাতো। তার পাশে কোনো না কোনো চটকদার মেয়ে থাকতই। আর পিছনে থাকত কুণাল। শুধু কি বাঙালী মেয়ে? বড় বড় বেস্তোরাঁ বা তার পাশের রাস্তা থেকে অবাঙালী মেয়ে গাড়িতে তোলার ব্যাপারেও গুরু কি কম ওস্তাদ ছিল। চোখা-চোখি হলেই বুঝতে পারত কে উঠবে আর কে উঠবে না।

ওই রকম মেয়ের পাল্লায় পড়ে আর নেশার রসদ জোগানোর তাগিদে গাড়িটা জলের দরে বেচে দিয়েছিল। গুরুর নেশা তো আর মদ বা বিড়ি সিগারেট নয়। সে তখন থেকেই হাসিস আর মারিজুয়ানার খদ্দের। বাবা আরার একটা গাড়ি কিনে দেবে ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু আজও দিল না। গুরু এ জন্যে যে ভাষায় নিজের বাবা-মাকে গালাগালি করে শুনে কুণাল মুগ্ধ।

গুরুর সব থেকে বড় পাসপোর্ট তার চেহারা। এখনো। কোনো ছেলে যদি মাখনের দলা হয় অনেক ডাঁশা মেয়ে তাকে পাত্তা দেয় না। কিন্তু সেই মাখনের দলা যদি স্মার্ট হয়, একসঙ্গে চোখ আর ঠোঁটে হাসতে জানে, তার কথার থেকে কাজের হাত যদি বেশি এগোয়—তাহলে কিস্তি মাত। গুরুর এই সাতাশ বছর বয়সে এমন কিস্তি মাত কম দেখল না কুণাল বোস। ভালো ঘরের কলেজে পড়া একে একে দু'দুটো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেখল আর ডিভোর্স দেখল। কোর্টে এ পর্যন্ত তিন তিনটে মেয়ে ফুসলে নিয়ে পালানোর কেস দেখল, কি সেনসেশন, কি উত্তেজনা কুণালেরই তখন। যে উত্তেজনার নাম জীবন, গুরু হাতে-নাতে ওকে তাই দেখিয়েছে। পাড়ার কোনো মেয়ে এখন গুরুর দিকে তাকালে পর্যন্ত বাপ-মা মেয়েকে শাসন করে। কিন্তু তবু গুরুকে ঠেকায় কে? তার লীলা কি শুধু এই পাড়াটুকুর মধ্যে?

গুরুর মধ্যে অভিজ্ঞতার বীজ বোনা হয়েছে কি আজকে? বীজ বোনা হয়েছে সেই তের বছর বয়সে—নিউ ইয়র্কে। একটু ভালো করে বোঝার আগে বাবা মা যে তাকে কি আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে, মনে হলে তাদের খুন করতে সাধ যায় ছেলের। এই কলকাতা শহরে কত লোক অসময়ে পটাপট মরছে—আর তার বাবা মা যেন একটা বেঁচে থাকার খুঁটি ধরে বসে আছে। সম্ভব হলে, নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে আসার জন্যেই বাবা মাকে সে চরম শাস্তি দিত। আর, সেখানকার মেয়েগুলো কি মেয়ে? জলজ্যান্ত আপেল এক একখানা। ফাঁক পেলে পনের ষোল সতের বছরের সেই মেয়েগুলো ওকে বুকে জাপটে তুলে নিয়ে পালানোর জায়গা খুঁজত। চুমু খেয়ে খেয়ে গালে ঠোঁটে জ্বালা ধরিয়ে দিত—ঝোপঝাড়ের আড়ালে গিয়ে ওকে বুকের ওপরে চেপে ধরে শুয়ে থাকত—আরো কত কাণ্ডমাণ্ড করত শুনলে তোর নোলা দিয়ে জল গড়াবে।

জল যেটুকু শুনতো তাতেই গডাতো কুণালেব।

হ্যাঁ...এই ডাযেবিটাব কথা। তিন বছব আগে টেবিলেব ওপব গুরু ওটা ছুঁডে দিতেই বুকেব ভিতবটা চডচড কবে উঠেছিল কুণালেব। ওব ততক্ষণে কেমন যেন বদ্ধ ধাবণা, দেবাব আগে ওই কালো ডাযেবিব চকচকে বোর্ডে অন্তত গণ্ডা আষ্টেক চুমু খেযেছে মেযেটা। সেই তাপ ওতে এখনো লেগে আছে। তখুনি বলে বসেছিল, গুরু এই ডাযেবিটা আমাকে দেবে?

—ওটা দিযে তুই কি কববি?

কি বললে গুরু খুশি হবে আব উদাব হবে কুণালেব ততদিনে ভালোই জানা। জবাব দিযেছিল মাঝে মাঝে বুকেব ওপব বাখব আব চুমু খাব। আমি আব এব থেকে বেশি কি পাব বলো।

শুনে গুরু হেসে সাবা। হাসি আব থামতেই চায না। শেষে বলেছে, আমাব শিষ্য হযে তোব এ-বকম আনপ্র্যাকটিক্যাল সেলফ-স্যাটিসফ্যাকশন—অ্যাঁ? আবে কল্পনাব ভোগ তো কবিদেব জন্য আব স্পাইনলেস ছেলেদেব জন্য। আমাব শিষ্য হবে মোস্ট বেকলেস প্র্যাকটিক্যাল—সাধ গেলে হাতে হাতে আদায। এই যে ডাযেবি দিযে গেল এব ওপবে আমি বিবক্ত কেন? সাধ আছে, সাহস নেই। আবে বাপু বেখে ঢেকে সব দিক বজায বেখে কতটুকু পাবে—ভিতবে বান যখন ডেকেছে সব দিক তছনছ কবে দিযে ছোটো না, তবে তো থ্রিল—তবে তো একসাইটমেন্ট তবে তো লাইফ। ডাযেবিটা তাবপব ওব দিকে ঠেলে দিযেছিল, যা নিযে যা, দুধেব সাধ ঘোলে মেটা।

তাব পবেই মাথায একটা উদাব প্ল্যান এসে গেছল। তোকেও ছিটেফোঁটা প্র্যাকটিক্যাল আনন্দ দেবাব ব্যবস্থা কবছি। তোব জন্যে একটা টিকিট কেটে বাখব আব মেযেটাকে যা বলাব বলে বাখব। ছ'টায শো, তুই ঠিক সময়ে মেট্রোয থাকিস।

তিন বছব আগে এই ডাযেবি হাতে কবে বাতাস সাঁতবে নিজেব ঘবে ফিবে দবজা বন্ধ কবে ছিল। ব্যাণ্ডোদা যতই মুখ বাকাক আব ছেলেমানুষ ভাবুক ওকে, এটুকুতেই যে এত থ্রিল এত উত্তেজনা এ কি ভেবেছিল। বযেস তো সবে তখন কুডি। বি, এ ফেল কবে আব পডা ছেডে সবে গুরুব যোগ্য শিষ্য হযেছে। তাব আগে যেটুকু উত্তেজনাব দিন গেছে তাব বেশিব ভাগ কাল্পনিক। গুরুব চেলাগবি কবে আব তাব ভোগ কল্পনা কবে যেটুকু আনন্দ। কিন্তু এই ডাযেবিটা বা ডাযেবিতে মেযেটাব স্পর্শ তো আব কল্পনা নয। ফেবাব আগে ওই মেযে যে ডাযেবিব মলাটে গণ্ডাকতক চুমু খেযে নিযেছে তা-ও কল্পনা বলে স্বীকাব কবতে বাজি নয কুণাল। ঘবে এসে ওই ডাযেবিব মলাটে গাদা গাদা চুমু খেযে বাব বাব ওটা বুকে চেপে ধরে বেশ একটু নতুন থ্রিল আব উত্তেজনা উপভোগ কবেছে। কিন্তু সিনেমা হলে আরো থ্রিল ওব জন্যে অপেক্ষা কবছে সেটা ভাবতে গিযেই শিবায শিবায বক্ত গবম। ওব জন্যেও ব্যাণ্ডোদা টিকিট তো কেটে বাখবে, কিন্তু মেযেটাকে আবাব কি বলে বাখবে? মেযেব পাশে বসে ছবি যে দেখেনি এমন নয। আব তখন খুব সংগোপনে আব অন্যমনস্কেব মতো এক একবাব হাত ঠেকিযেছে, হাঁটুতে হাঁটু লাগিয়েছে—তক্ষণি আবাব অপ্রস্তুত

ভদ্রলোকের মতো গুটিযেও বসেছে। একবার তো চিত্তির। বার কযেক ও রকম করার পর হাফটাইমের আলো জ্বলতে দেখে মাযের বযসী একজন।

বিকেলে আধঘণ্টা আগেই মেট্রোর সামনে অপেক্ষা করছিল, আর সব থেকে শস্তার সব চেযে কড়া সিগারেট টেনে সময পার করছিল। ঠিক সময ধরেই ব্যাণ্ডোদা আর সেই মেযে হাত ধরাধরি করে হাজির। ও সামনে আসতে ব্যাণ্ডোদা (কুণাল অনেক সময শুরু ছেড়ে ব্যাণ্ডোদা বলে কারণ এই ডাকের মধ্যে একটা নতুনের চমক আছে —অন্তত তখন ছিল) পরিচয করিযে দিল। বলল, এই আমার সেই কচি-কাঁচা লাজুক শিষ্য কুণাল বোস—তুমি আসছ তাই লাজুক তো আসতেই চায না। সঙ্গে সঙ্গে এক চোখ একটু ছোট করে মেযেটাকে গুরু একটু ইশারাও করল। ভব্যতার খাতিরে সেই মেযে কুণালের দিকে ফিরে একটু মাথা নাড়ল, আর ঠোঁটের কোণে হাসল, আর চোখের কোণে ভালো করে দেখে নিল। গুরুর কি কারসাজি ঠাওর করতে না পারার ফলে কুণাল মুখে একটু লাজুক-লাজুক ভাব টানাই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবল।

কিন্তু বুকের ভিতরটা সত্যিই তখন একটা বাস্তব খিলের তৃষ্ণায় ধকধক করছিল। এই মেযের উঁচু বুক আর টসটসে ঠোঁট দুটো শুকনো ডাযরি নয—তার থেকে ঢের-ঢের নরম-গরম বাস্তব।

একেবারে সারির শেষের তিনটে সীটে তারা তিনজন। প্রথমে গুরু মাঝে মেযেটা শেষে কুণাল। কুণালের পরে সেই রো-তে আর সিট নেই। আলো নিভল। ছবি শুরু হল। মেযে পুরুষের মাখামাখি লপটা-লপটির হিন্দী ছবি। শুরু থেকে ঢলাঢলি। কিন্তু ছবি দেখবে কি, খানিক বাদেই কুণালের সর্বাঙ্গে কাটা। মেযেটার হাঁটু আর হাঁটুর ওপরের খানিকটা কুণালের একদিকের সঙ্গে ক্রমে সেঁটে যেতে লাগল। আর কাঁধের ওপরের দিকটা ওর কাঁধের সঙ্গে একটা চাপাচাপির খেলা শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে অন্ধকারেই আরার ঘুরে তাকায। কুণালের গালে গরম নিঃশ্বাসের ছেঁকা লাগে।

হাফটাইমের আলো জ্বলতেই মেযে আরার শান্তশিষ্ট। মাঝে ভব্যরকমের ফারাক। এক একবার গুরুর কানে মুখ ঠেকিযে ফিসফিস করে বলছে কিছু আর কুঁই কুঁই করে হাসছে। গুরুর তাকানো দেখে মনে হয মজাটা ওকে অর্থাৎ কুণালকে নিযেই। রোগাপটকা কুণালের ভিতরে যে তখন মদমত্ত দামাল হাতি দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে সে যদি ওই মেযে জানত।

আরার ছবি শুরু হতে একই কাণ্ড শুরু হল। কুণালের শরীরের কণায কণায এবারে ডবল সাড়া দেরার ইচ্ছে। কিন্তু ও বুঝে নিযেছে তাহলে মজা মাটি—ওকে লাজুক ছেলের ভূমিকা নিতে হবে। খানিক এ-রকম চলার পর মেযেটার একটা আলতো হাত ওর হাতের ওপর এসে পড়ল। পড়ার পর পড়েই থাকল। তারপর উঠল যখন কুণালের হাতখানা সুদ্ধ নিযে উঠল। ওর হাতটা গরম হাতে ধরে চেযারের হাতলের তলা দিযে টেনে নিজের কোলের ওপর ফেলল। তারপরে ওই হাত কোলের ওপর রেখে আর গরম হাতের আঙুলে আঙুলে খেলা চলল।

ছবি শেষ হরার পর বাইরে বেরিযে ঠোঁটের কোণে তেমনি হেসে আর চোখের কোণে তেমনি করে চেযে মেযেটা জিজ্ঞাসা করেছিল, ছবি কেমন লাগল কুণাল বাবু?

নিবীহ লাজুক মুখ কবে কুণাল জবাব দিয়েছে, ছবি আব দেখতে দিলেন কই। চারুমুখিব দু'চোখ কপালে। আমি আবাব কি কবলাম।

গুরু হেসে উঠেছিল। বলেছিল, সম্পর্কটা যখন বউদি হতে চলেছে মওকা পেযে তুমিও একটু বাড়লে খুব অন্যায হত না হাঁদা কোথাকাবেব।

ওকে বিদায় দিযে তাবা পার্ক স্ট্রীটেব দিকে চলে গেছল। আব কুণাল সর্বাঙ্গে জ্বলুনি নিযে ঘবে ফিবেছে। পবে গুরুব মুখে শুনেছে, মেযেটাকে বলে বেখেছিল, শিষ্য—তাব দারুণ লাজুক আব দারুণ ভালো ছেলে, সিনেমা হলে বসে ওব যদি ঘাম ছুটিযে দিতে না পাবো তাহলে মজাই মাটি।

হেসে হেসে গুরু জিজ্ঞেস কবেছিল, তা তোব ওটুকু বাস্তব অভিজ্ঞতা কেমন লাগল বল।

কুণাল গলা শুকিযে জবাব দিযেছে, তুমি শালা এক নম্বরেব শত্রু গুরু—বুকেব মধ্যে এখন সাহাবা জ্বলছে—ফেব পেলে ওই ভাবী বউদিকে আমি না খুন কবে বসে থাকি।

ওই ভাবী বউদিটিই ছ'মাস বাদে গুরুব বিরুদ্ধে কোর্টে কেস ঠুকে দিযেছিল। গুরু নাকি তাকে বিযে কবাব প্রতিশ্রুতি দিযে তাব সঙ্গে মেলামেশা কবত। শেষে একদিন তাব সর্বনাশ কবে সবে পড়েছে। মেডিক্যাল চেকআপে পর্যন্ত সর্বনাশ প্রমাণ হযেছিল। কিন্তু সর্বনাশটা শেষ পর্যন্ত কাব মাবফৎ হযেছে সেটা প্রমাণ হযনি। কাবণ জেবায জেবায সাবালিকা মেযেব অনেক গলদ বেবিযে পড়েছে।

যাক, এই সুন্দব ডাযেবিটাব পাতা একটা দুটো কবে ভবাটি হতে শুরু কবেছে আবো সাত আট মাস পব থেকে। হঠাৎই খেযালেব বশে ব্যাপাবটা শুরু হযেছিল। তাবপব গুরুব তাবিফ পেযে উৎসাহ বেড়েছিল। ব্যাপাব আব কিছু না, ভিতবে কোনো বাসনা যখন দুর্বাব হযে ওঠে, বা কোনো ঘটনায স্নাযুগুলো যখন উথাল পাথাল কবতে থাকে—তখন ডাযেবিব পাতায সে-সব লেখা। লিখে ফেলে তাব ওপবে কিছু মন্তব্য কবা।

যেমন প্রথমেই লিখেছিল, এই ডাযেবি যাব কাছ থেকে পাওযা সেই ভাবী বউদিব মতো একটি মেযেকে সমস্ত নিষেধেব গণ্ডী থেকে ছিনিযে নিযে যেতে পাবলে কুণাল বোস কি কবে? ওই ভাবী বউদিব মতো স্বভাব চবিত্রেব মেযে নয, শুধু তাব মতো অমন টসটসে দেখতে—কিন্তু তাব ভেতবখানা তখন পর্যন্ত কোন সভ্যভব্য সুপুরুষকে নিযে কল্পনাব জাল বুনছে। অবাধ্যতাব জন্য তাব ওপব প্রথমে কি ভাবে নির্মম আঘাত কবে তাকে বোবা বানিযে দিত আগে তাই লিখেছে। কিন্তু বোবা বাধ্য মেযে কোন ছেলে চায? সেই আক্রোশে তাকে কতভাবে নবকেব তলায টেনে নিযে চলেছে তাব হুবহু বণনা। কিন্তু মেযেটা যখন শেষে আব বোঝে না, তাকেই যখন নবকেব দোসবে মেনে নিযেছে, আত্মহুতি সম্পূর্ণ ভাবছে, তখন আবাব কুণাল বোস নতুন চমক সৃষ্টিতে মেতে উঠেছে। যে সুন্দবেব স্বপ্ন দেখত মেযেটা, যে স্বপ্নেব জাল বুনত, নবক ছেড়ে তাকে নিযে সেই দিকে এগিযেছে। সেই সুন্দবেব দবজা তাবই বুকেব তলায—একটু একটু কবে এবাবে সেই দবজা খুলে দিয়েছে। তাব সেই স্বপ্নেব জালে এসে নিজেই

ধরা দিয়েছে। মেয়েটা হতভম্ব হয়ে দেখছে, যার একদিক এমন কুৎসিত নরক, তারই আর একদিক কি অনির্বচনীয় সুন্দর! লেখার শেষে মন্তব্য, আমি কুৎসিত আমিই, সুন্দর আমার একটাকে যে নেবে সে আধখানা নেবে। আমার শালা একটাতে ক্লান্তি ধরে যায় বলে আমি ভোগে কখনো সুন্দর কখনো কুৎসিত।

ভাবী বউদির মতো সুন্দর চেহারার মেয়ের ওপর কুণাল বোসের পুরুষের নির্মম অত্যাচার আর তাকে নিয়ে নরকে তলিয়ে যাবার প্রত্যক্ষ বর্ণনা পর্যন্ত গুরুর দারুণ ভালো লেগেছিল। বারবার বাহবা দিয়েছিল। কিন্তু তাকে নিয়ে আবার সুন্দরের অভিসারে যাত্রা-পর্ব শুনে নাক সিঁটকেছিল।—ও আবার কি, ক্লাইম্যাক্স থেকে অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স —কেটে দে কেটে দে—যত সব সিলি ডে-ড্রিমিং।

খবরের কাগজ খুললেই রোজ কটা করে ধর্ষণের খবর। কুণাল বোস সে-সব খুঁটিয়ে পড়ে। যে খবর যত নির্মম তার প্রতি ততো আগ্রহ। তার ভিতরে ততো উত্তেজনা। চোখের সামনে সমস্ত ব্যাপারটা কল্পনা করে ভারী আনন্দ পায়। ডায়েরিতে অকপটে সে-সব স্বীকার-উক্তি আছে। সঙ্গে মন্তব্যও—শালার খবরের কাগজগুলো ঘটা করে প্রথম পাতায় এসব খবরগুলো ছাপে কেন? পড়ে সুড়সুড়ি লাগে বলেই তো। আরো মন্তব্য, মেয়ের মতো মেয়ে হলে এ ব্যাপারটা অপছন্দ করার কথা নয়—আসলে ভয় আর লোকলজ্জা। শালার কুকুর বেড়াল গোরু ছাগলও এ-ব্যাপারে মানুষের থেকে �ের বেশি অকপট আর সৎ।

এটা পড়েও প্রদীপ ব্যাণ্ডো খুব পিঠ চাপড়েছিল।

...বোমাঞ্চকর ডাকাতির খবর পড়তেও তেমনি ভালো লাগে কুণাল বোসের। ঘটনা যতো বড় দরের হয় উত্তেজনাও ততো বাড়ে। এ-সবেরও স্বাদ তাকে পেতে শিখিয়েছে তার গুরু প্রদীপ ব্যাণ্ডো। পয়সা খরচ করে সেক্স আর ক্রাইমের গায়ে কাঁটা দেওয়া বই কিনে আগে নিজে পড়ে, পরে ওকে পড়ায়। বলে, এই তো লাইফ, থ্রিল আর একসাইটমেন্ট যেখানে নেই সে আবার লাইফ। এই সেক্স আর এই ক্রাইমের ব্যাপার কলকাতায়ও এখন কম ঘটছে না। ডায়েরিতে নিজের ভাবনা লেখা শুরু করার পরে মস্ত একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছিল। কালো অ্যামবাসাডারে চেপে ছ'জন লোক এসেছিল। সতের মিনিটের আগেই সতের লক্ষ টাকা হাতিয়ে সরে পড়েছিল তারা। এই অপারেশন সারতে গিয়ে মাত্র দু'জন লোক খুন হয়েছিল আর জন পাঁচেক জখম। ডাকাতদের কেউ ধরা পড়েনি।

ঘটনাটা কুণাল বোসের কাছে এত সেনশেসনাল মনে হয়েছিল যে তিনবার করে আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে পড়েছে খবরটা। যত ভেবেছে ততো উত্তেজনা বেড়েছে। শেষে ডায়েরি নিয়ে বসেছে।

—মনে মনে আমিও একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে উঠলাম। সঙ্গে সেই ছ'জনই লোক। আমি তাদের লিডার। সমস্ত প্ল্যান আমার। অপারেশন ফরমুলা আমার। প্রথমে ভেবেছিলাম পাঁচজনকে খুন করলে আর বারো চোদ্দ জনকে জখম করলেই কাজ হাসিল হবে। তাদের রক্তাক্ত মৃতদেহগুলো আমি আগেই চোখের সামনে দেখলাম। দেখলাম এই দেখাটা মন্দ উত্তেজনার ব্যাপার নয়। কিন্তু শেষে আর ওই প্ল্যান ভালো

লাগল না। কারণ লোক মারা আর জখম করার উত্তেজনাটা পুরনো ব্যাপার। তার থেকে ঢের বেশি উত্তেজনার ব্যাপার কারো গায়ে একটা আঁচড় না বসিয়ে কাজ সারাটা। কাগজে এমন ডাকাতি নিয়ে দারুণ হৈ-চৈ হবে—পড়তে পড়তে সকলের বুকের তলায় একটা ঠাণ্ডা স্রোত বইবে। হ্যাঁ, সেই প্ল্যানেই অপারেশন পাকা করলাম। এক-একজনের বিভলভারের মুখে তিনজন করে লোক পুতুল হয়ে থাকল। স্ট্রং রুমের চাবি আমার হাতে। চোদ্দ মিনিট লাগল টাকার বস্তা পিছনের গাড়ির ক্যারিয়ারে ঢোকাতে। পালাবার সময় ছ'টা বিভলবার থেকে মাত্র আঠারটা ফাঁকা আওয়াজের দরকার হয়েছিল।

—কিন্তু কত টাকার ডাকাতি সেটা ঠিক করতেই সময় লেগেছে একটু। প্রথমে ওই সতের লক্ষ টাকার অঙ্কটাই মাথায় ছিল। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলাম সতের লক্ষ টাকা আর কত টাকা? ভোগের শেষ দেখতে হলে এ টাকায় আর কদিন চলবে। ডাকাতি তো আমি মাত্র একটাই করেছি বা করলাম। টাকার অঙ্কটা বাড়াতে বাড়াতে সতের লাখ থেকে সত্তর লাখে তুললাম। কিন্তু ওতেও ভোগের শেষ হয় না। ডাকাতি করে সে টাকা তো আর আমি ব্যাঙ্কে রাখতে যাচ্ছি না যে সুদের টাকায় পায়ের ওপর পা তুলে জীবন কাটিয়ে দেব? শেষে সতের কোটিতে এসে থামলাম। কোনো ব্যাঙ্কে সতের কোটি টাকা নগদ থাকে কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমার ডাকাতি আমারই। থাকতে হবে। আমি কাগজ কলম নিয়ে হিসেব করে দেখেছি। মাসে দু'লক্ষ করে খরচ করলে (দু'লক্ষ কাকে বলে তা-ও আমি জানি না, কিন্তু আমার মনে হল ওতে ভোগের সমস্ত রাস্তা খুলে দেওয়া যেতে পারে।) এক কোটিতে পঞ্চাশ মাস যাব। তাহলে সতের কোটিতে আটশ পঞ্চাশ মাস অর্থাৎ সতের বছর দশ মাস চলবে। এখন আমার বয়েস একুশ (তখন একুশই ছিল), তাহলে তখন বয়েস দাঁড়াবে একানব্বুই বছর দশ মাস। তার বেশি ভাবার আর কোনো মানে হয় না। ও...আপনারা ভাবছেন আমার কাঁচা হিসেব—সঙ্গী ছয় জনের ভাগ কী হবে? আসল থ্রিল তো সেইখানে। আমার অপারেশনে লোক মারা নেই, মানে ব্যাঙ্কের নিরীহ লোকগুলোকে মারা নেই। তা বলে শত্রু মারক না এমন হলপ কে করেছে? ডাকাতির রাতে খেয়ে দেয়ে ফূর্তি করে ঘুমিয়ে আমার সঙ্গীরা কি আর দিনের মুখ দেখেছে? কাজটা কত সহজ। মদ খেয়ে সকলের তখন টইটম্বুর অবস্থা। সেই অবস্থায় আমি নিজের হাতে প্রত্যেকের ড্রিংক সাজিয়ে হাঁক দিলাম, 'লাস্ট ড্রিংক ফর দি রেড'। হ্যাঁ, ডাকাতির পর কুচকুচে কালো অ্যামবাসাডারের বদলে ধপধপে সাদা অ্যামবাসাডার চেপে আমরা দেড়শ মাইল দূরের এক হোটেলে উঠেছিলাম। একসঙ্গে নয়। আলাদা আলাদা। একে একে। কেউ কাউকে চিনি না। একেবারে শেষে সাদা অ্যামবাসাডার হাঁকিয়ে এসেছি একলা আমি। তখন রাত। অন্য ছ'জন যে যার ঘরে। আমার গাড়ির পিছনের ক্যারিয়ারে সতের কোটি টাকা কে আর জানছে। (ক্যারিয়ারে সতের কোটি টাকা আবার ধরে তো?) যাক সঙ্গীরাও জানে না, আমি শুধু রাতটুকুর জন্যেই আগাম টাকা দিয়ে ঘর বুক করেছি—ভোর রাতে উঠে গাড়ি নিয়ে চলে যাবার কথাও বুকিং ক্লার্ককে বলে রেখেছি। যাক, মনের আনন্দে আমার ঘরের রাতের আসর শেষে আমার অর্থাৎ লিডারের হাত থেকে সঙ্গীরা লাস্ট ড্রিংক ফর দি রেড নিল। প্রত্যেকের গেলাসে (নিজের বাদে)

সেই লাস্ট ড্রিংকে আমি কখন কি মিশিয়েছি সজাগ সচেতন থাকলেও তাবা টের পেত না। তখন তো নেশায় বুঁদ। কি মিশিয়েছি সেটা অবশ্য আমি নিজেও এই লেখাব সময় পর্যন্ত জানি না। এমন কিছু যা মদেব গেলাস শেষ হবার পবেও ওরা যে যাব ঘবে গিযে শুযে পড়া পর্যন্ত কোনো কাজ করবে না। তারপবই ওই ড্রিংক লাস্ট ড্রিংকই হবে। আর উঠবে না। আব এই না ওঠাটা যখন জানা-জানি হবে তখন আমি কোথায় আব আমাকে সন্দেহই বা করে কে?

—তারপর আমার ভোগেব পালা শুরু। যত বকমেব ভোগ এই পৃথিবীতে আছে সব আমাব হাতের মুঠোয। সদয ভোগ, নির্দয ভোগ, হিংস্র ভোগ, অহিংস ভোগ, সচেতন ভোগ, অচেতন ভোগ। আমি এই পৃথিবীব একমাত্র ভোগবাজ।

শেষে মন্তব্য, 'শালা ভোগেব কিছু জানো না বলেই এক কথায় নিজেকে ভোগবাজ বানিযে শেষ কবলে। অমন ভোগে হাবুডুবু খেতেই যদি পাবো—তখন মনের ঘবে মাসে দু'লাখের বদলে দু'শ টাকা খবচেব জীবন ঢেব বেশি স্বাদেব মনে হবে হযতো—কিন্তু সেটা ওই ভোগেব আগে নয।'

এই শেষেব মন্তব্যটা শুধু গুরুব পছন্দ হযনি। নইলে বাকিটা বেশ লেগেছিল। যাক ডাযেরিব আগাগোডা কুণাল বোসেব ভিতবেব মনটা এখনি ছড়ানো ছিটানো। শিবুকাকা তাব লেখা একটুও ভালো বলেনি, কিন্তু মন্তব্যগুলোব মধ্যে আব সব জিনিস খুঁটিযে দেখাব মধ্যে কিছু সম্ভাবনা দেখেছে। তবে একটা লেখাব প্রশংসাই কবেছে। গুরুব মতে যেটা কোনো লেখাই নয।

লেখাটাব নাম 'ওড অন এ বাবমুডা লিলি।'

পবীক্ষায় ফেল করুক আব যাই করুক চেঁচিযে পাঠ্য বইযেব ইংবেজি বাংলা কবিতা পডত, ইংরেজিতে নম্বব পেত একশর মধ্যে বড জোব তিবিশ। কিন্তু কীটসএব ওড-অন এ গ্রীসিয়ান আবন তা বলে কম বার চেঁচিযে পডেনি। কুণাল বোসেব কল্পনায এব বিষয-বস্তুও অনেকটা এক বকম। তবে কুণাল বোসেব ভাব আলাদা।

...বাবমুডা লিলি হল একটা ফুলেব নাম। যা কুণাল কখনো চর্ম-চোখে দেখেনি। ঘবেব বঙিন ক্যালেণ্ডারে দেখেছে। ক্যালেণ্ডাবে লম্বা তকতকে একটা সবুজ ডাঁটাব ওপবে ফুটে আছে বাবমুডা লিলি। তাব লম্বা লম্বা সাদা মসৃণ অদ্ভুত নবম ছ'টি পাপডি। ভিতবে বঙ-বেবঙেব ছ'টি কেশব। বিলিতি ক্যালেণ্ডাবেব আর্ট পেপাবে ছাপা ভাবী সুন্দব একটা জীবন্ত ফুল দেখলে মনে হবে ওটা শুচিতাব প্রতিচ্ছবি। কিন্তু ওই সবুজ ডাঁটা বেযে উঠছে বঙিন একটা বীভৎস পোকা। পোকাব লুব্ধ দুটো চোখ ডাঁটাব মাথাব ওই ফুলটার দিকে। ওই পর্যন্ত উঠে ফুলটা কুবে কুবে খেতে পাবলে তাব জন্ম সার্থক, জীবন সার্থক। ক্যালেণ্ডাবেব ওই ছবিটাব দিকে তাকালেই অদ্ভুত একটা শিহবণ হত কুণালেব। ছবিটার দিকে চেযে থাকত আর কল্পনায় দেখত ওই বঙিন বীভৎস পোকাটা স্থির অব্যর্থ গতিতে ওই ফুলটার কাছে পৌঁছাচ্ছে—কিন্তু ফুল জানেও না কি শোচনীয় তাব পবিণতি। কল্পনাটা যত ঘন হত ততো যেন গায়ে কাঁটা দিতো কুণালের, একটা অস্বাভাবিক বোমাঞ্চ অনুভব কবত। সেটা দুঃখের কি বীভৎস আনন্দের ঠিক কবে উঠতে পারত না। যদিও জানা কথাই ছবির ওই লোভী পোকা কোনদিনই ফুল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না।

ওই ছবিটা দেখে দেখে মাথায় হঠাৎ একদিন একটা অদ্ভুত খেয়াল চাপল কুণালের। ডায়েরির পাতার মাপের এক টুকরো আর্ট পেপার কেটে নিয়ে ওই ক্যালেণ্ডার আর কাগজ, তার এক আর্টিস্ট বন্ধুর কাছে দিয়ে এলো। ক্যালেণ্ডারের ওই রঙিন ছবি আর্ট পেপারে হুবহু তুলে দিতে হবে। ক্যালেণ্ডারের ওই রং ফুল পোকা সব একরকম হওয়া চাই। ঠিক ঠিক হলে একটা ছোট বোতল তাকে প্রেজেন্ট করবে। বোতলের লোভে না হোক তাগিদের চোটে আর্টিস্ট বন্ধু তাই করে দিল। রং ফুল পোকা এক রকমই হয়েছে। সেই আঁকা আর্ট পেপারটা এনে কুণাল ডায়েরির বাঁ দিকের পাতায় সাঁটল। তারপর ডান দিকে ওড অন এ বারমুডা লিলি লিখল।

—বারমুডা লিলি, আসলে তুমি এক অনন্তযৌবনা অক্ষতসুন্দর নিষ্পাপ মেয়ে। তুমি নিশ্চিন্তে রূপের ডালি ছড়িয়ে বসে আছ। জানোও না কে তোমাকে গুটিগুটি খেতে আসছে—শেষ করতে আসছে। ও এসে পৌঁছুলে তুমি কি করবে—কেমন চমকাবে? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে। ভয়ের ছায়া তো আগে চলে। কিন্তু সুন্দরী, তোমার মনে কি ভয়ের ছায়াও পড়ে না? এ যৌবন ছড়িয়ে অমন নিশ্চিন্তে আনন্দে বসে আছ কি করে?...নাকি তুমি জানো, ওই নির্মম যম কোনদিন তোমার কাছে পৌঁছুতে পারবে না—ওর লুব্ধ চোখ আর জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে ও যেমন আছে চিরকাল সেই রকমই থেকে যাবে?...তাই ঠিক বোধহয়। বাসনার চূড়ান্ত স্বপ্নের নাগাল আমরা কে কবে পেয়েছি? যার পরে আর কিছু নেই এমন ভোগবতীর কাছে কে কবে পৌঁছুতে পেরেছি? হয়তো তার হদিশ পেয়েছি, ওই ভীষণ রঙিন পোকাটার মতো লুব্ধ চোখে তাকে দেখেছি, লোভে হাত চেটেছি, গুটিগুটি সেদিকে এগোতে চেয়েছি। কিন্তু ওই বাসনার ডালি মরীচিকার মতো যেমন দূরে তেমনি দূরে। অনন্তযৌবনা বাসনার বারমুডা লিলি লোভের ডগার শেষ মাথায় চিরকালই ওমনি অক্ষতসুন্দর।'

...আর ডায়েরির শেষ লেখাটার পরের মন্তব্য পড়ে শিবুকাকা একটু ঘুরিয়ে প্রশংসা করেছিল। বলেছিল, ঠিকই তো বুঝেছিস দেখি, তোকে গাধার মতো গোরু কে বলে? জেনে শুনে উল্লুক হয়ে বসে থাকলে কে তোকে ঠেলে তুলবে? শিবুকাকা নাকি প্রাচীন ইতিহাস আর সংস্কৃতির স্কলার ছিল। নিজের কাগজে নিজে লেখেও ওই ছাইভস্ম নিয়েই। কিন্তু তার জিভ যখন নড়ে তখন মনে হয় সে প্রাণিবিদ্যাবিশারদ ছিল। যাক, ওই শেষে কুণাল বোস লিখেছিল তার পরের মন্তব্য পড়লে গুরু নিশ্চয় তেড়ে মারতে আসত।

—আমরা জীবন খুঁজছি। জীবনের অর্থ খুঁজছি। গুরু খুঁজছে। সঙ্গে আমিও। ভোগের তলকুল দেখতে না পেলে জীবনের কি অর্থ? ল, এথিকস, ডিসেন্সি—এসব অসার কথার লাগাম ছিঁড়তে যদি না পারো তো ভেড়া হয়ে থাকো। ও-সব আবেগ টাবেগের আমরা ধার ধারি না। আমাদের জীবন মানে সেনসুয়াল প্লেজার। এক ভোগ ছাই করো, অন্য ভোগের পিছনে ছোটো। থ্রিল আর উত্তেজনা জীবনের সার কথা। সেটাই জীবন। তাই মেয়েমানুষের পিছনে ছুটি, তাকে ভালবাসার ফাঁদে ফেলি, নাচি (গুরুর খরচে হোটেলের এক মেয়েমানুষের কাঁধ ধরে দাঁড়কাকের মতো সত্যি আমি খাসা নেচেছিলাম—উঃ, সে কি থ্রিল!) মদ খাই, ম্যারিজুয়ানা টানি। এই থ্রিল আর

উত্তেজনার লোভেই শুধু একবার আমি বাবার পকেট থেকে তার মানিব্যাগটাই হাপিস করে দিয়েছিলাম। এমনি থ্রিল আর উত্তেজনার মধ্য দিয়েই আমরা জীবন খুঁজে চলেছি।'

মন্তব্য : জীবন খুঁজছ না এই করে তুমি শালা জীবন থেকে পালাচ্ছ সেটা তলিয়ে ভাবার সাহস নেই কেন?

.. কুণাল বোসের এই সম্পদখানা অর্থাৎ এই ডায়েরিটা হারিয়ে গেছল। আর সেই কারণে চোখে একটু আধটু সর্ষেফুলও দেখছিল। হারানো ঠিক নয়, চুরি গেছল জানা কথাই। ওর ঘরে বাড়ির কেউই ঢোকে না। রুচি হয় না বলে ঢোকে না। রুচি যাতে না হয় কুণাল নিজেই সে-ভাবে ঘরখানা রাখত। ডায়েরিটা থাকত তার সুটকেসে। গোড়ায় গোড়ায় ওই ডায়েরিটা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার জন্যই চাবি দিত। কিন্তু পরে আর চাবি দেওয়া দরকার মনে করত না। কে আসছে তার ঘরে আর কে-বা দেখছে।...কুণাল খুব ভালো করেই জানে ডায়েরি সরানোটা কার কাজ। বড় বউদি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। বড় বউদি কুণালের থেকে ন'বছরের বড়। কুণাল তার আওতার মধ্যে ছিল যখন, একটু শাসন-টাসনও করত। সে অবশ্য আট দশ বছর আগে। এখন কাছেও ঘেসে না। দূর থেকে সন্দিগ্ধ চোখে দেখে। কুণাল নিজের কানে শুনেছে, দাদাকে একদিন বলছিল, ও যে-রকম মরা মাছের মতো চোখ করে তাকায় ওর কাছে যেতেই ভয় করে। ওর হাড়ে মাংসে শয়তানি ঢুকেছে বলে দিলাম।

কুণাল রোস রাগ করেনি। বরং মনে মনে হেসেছে। ওর কাছে যা জীবন—থ্রিল, এদের বিচারে তা শয়তানি হতেও পারে। যাক, তার কয়েক দিনের মধ্যে সুটকেশ খুলে দেখে ডায়রিটা নেই। নেই তো নেই-ই। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। শেষে বুঝল, কেউ সরালে আর খুঁজে লাভ নেই। সরিয়েছে যে তার আর ভুল কোথায়। বাড়ির লোকের মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছে সকলের সব চিন্তার বাইরে বিষম কিছু ঘটে গেছে। বাবা শেষ পর্যন্ত কি করে কুণাল সেই অপেক্ষায় ছিল। যতই ক্ষেপে যাক না কেন, মার-ধোর করতে সাহস করবে না। আর দাদারা তো নিরীহ গোছের ভীতু মানুষ। ভাইয়ের পয়সা-অলা গুরুর খবর তারা রাখে, কিন্তু তলায় তলায় কোন গ্যাঙ-ট্যাঙের সঙ্গে মেশে কে জানে। বাড়ির এই অনিশ্চিত অবস্থাটাও মন্দ উপভোগ্য মনে হত না শেষের দিকে। এতেও যেন একটু থ্রিল আছে।

অবশ্য গুরু ব্যাণ্ডোদাকে ব্যাপারখানা বলে রেখেছিল। বাড়িতে ঠাঁই এর পর আর হবে কি হবে না ঠিক নেই। গুরু ঠোঁট উল্টে নিশ্চিন্ত করছে ওকে। বলেছে, আমাদের ডিকশনারিতে আবার ভাবনা বলে কোনো কথা আছে নাকি। তাড়িয়ে দেয় চলে আসবি।

শেষে দেখা গেল ভেবে-চিন্তে বাবা এই কাণ্ড করেছে। ডায়েরিটা শিবুকাকার হাতে তুলে দিয়েছে। বাবা আর শিবুকাকা ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল, সেই সুবাদে কাকা। একেবারে উল্টো মানুষ দুজনে। বাবা এমনিতে ঠাণ্ডা ভীতু স্বভাবের হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে গেলে বাড়ি মাথায় করে তোলে। তারপর আবার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় চুপসে যায়। নানা রকম ভাবনাচিন্তা মাথায় ঢোকে। কুণালের বেলায়ও তাই হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই।

আর শিবুকাকা হাসি-খুশি মেজাজী মানুষ, খেতে ভালবাসে, গালমন্দ করে জিভের ঝাল ঝাড়তে ভালবাসে। তার সবেতে উৎসাহ, সবেতে কৌতূহল। এমন না হলে কুণালের এই ডায়েরি পড়েও কিছু সুসম্ভাবনার কথা তার মনে আসে।

ডায়েরি হাতে কুণাল একটা বাসে উঠে পড়ল। এমন খবরটা গুরুকে না দিলেই নয়। ডায়েরি ফিরে পাওয়ার থেকেও 'শিউলি' মাসিক-পত্রের মালিক আর সম্পাদক শিবু আচার্যি ওর মধ্যে এক ভাবীকালের লেখককে আবিষ্কার করেছে এটাই আরো মজার খবর। তাছাড়া, আর এক তৃষ্ণা ভিতর থেকে সুড়সুড় করে ওপরের দিকে উঠে জিভটাকে বার বার শুকিয়ে দিচ্ছে। সেটা সিগারেটের তৃষ্ণা নয়। শিবুকাকার দপ্তর থেকে বেরিয়ে সিগারেট তো পর পর দুটো খেল। এটা তার থেকেও ঢের কড়া তৃষ্ণা। মারিজুয়ানার তৃষ্ণা। গুরু হয়তো তাই টেনে তার নিচের ঘরের ফরাসে চিৎপাত হয়ে আছে।

. বিকেল ছ'টায় প্রায় নিয়মিত একবার করে ঘণ্টা দুই আড়াইয়ের জন্য পার্ক স্ট্রীটে হানা দিতে হয়। আজ আর হয়তো সেটা হয়ে উঠবে না। বাড়ির লোক বেকার ভাবে কুণালকে। কিন্তু নিজের খরচ, নিজের ছোটখাট নেশার খরচ (বড় নেশার খরচ তো গুরু গৌরী সেনের কাছ থেকেই আসে), এমন কি নিজের জামা কাপড়ের খরচের জন্যও কারো কাছে তাকে হাত পাততে হয় না। এই রোজগারের ব্যবস্থাও গুরুর কল্যাণেই হয়েছিল অবশ্য। এখন নিজের চেষ্টায় পসার বেড়েছে। তাদেরও মতো জীবন খুঁজছে অথচ ভিতরে ভীতুর ডিম এমন লোকের কি অভাব আছে? এই লোকেরা তার খদ্দের। তাদের মধ্যে বাঙালী আছে, অবাঙালী আছে।. .বছর খানেক আগে গুরুর সঙ্গে একবার বম্বে আর গোয়ায় বেড়াতে গেছল। সেখান থেকে গুরু গাদা গাদা ব্লু-পিকচার আর ব্লু-ফিলম কিনেছিল। ততদিনে সে-সব দেখে-দেখে গুরুর তো বটেই, কুণালেরও চোখ পচে গেছল—রক্তমাংসের জ্যান্ত মেয়েগুলোর মধ্যেই এখন আর আগের মত থ্রিল খুঁজে পায় না—এ-তো ছবি আর ফিলম। কিন্তু তবু গুরু কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে এত ছবি আর ফিলম কিনছে কেন মাথায় ঢোকেনি। পরে গুরুই বলেছে, কেন? কলকাতায় এগুলোর দারুণ ডিম্যাণ্ড—যে দুটো দোকান থেকে গুরু পর্ণোগ্রাফির বই কেনে বা পয়সা দিয়ে বাড়ি এনে পড়ে, আসার আগে সেই দুটো দোকান থেকেই বলে দিয়েছে ভালো মাল পেলে ভালো দামে কিনবে। হ্যাঁ, গুরুর পর্ণোগ্রাফি পড়ার ঝোঁক এখনো আছে। বলে, মানুষের ভোগের নিত্য নতুন যত রকমের বৈচিত্র্য আছে, কোনো কোনো লেখায় তা মেলে। এতে দস্তুরমতো মাথা-খাটানোর স্কোপ আছে। স্টিল ছবি বা ফিল্ম-এর থেকে বইয়ের মতো বই হলে ঢের বেশি ইন্টারেস্টিং।

গুরু বলল, এগুলো কেমন মোটা লাভে ঝেড়ে দিই দেখিস—তোকেও লাভের কিছু ভাগ দেব। আর ওই দুটো দোকানের মালিকের সঙ্গেও তোর আলাপ করিয়ে দেব। খদ্দের আনার চৌকস লোক তো তাদের সব সময়ই দরকার হয়। কুণাল বোস এখন এই দালালির কাজে পাকা হয়ে গেছে। কাঁচপোকার মতো খদ্দের ধরে নিয়ে আসে। আবার নিজেও ঘুরে ঘুরে বেশি লাজুক খদ্দেরের কাছে সাপ্তাহিক ভাড়ায় ছবি

আব পর্ণোগ্রাফিব বই পৌঁছে দেয। এই খদ্দেববাই আবাব ক'দিন গেলে পবদায মুভি ব্লু ফিল্ম দেখাব আশায ওকে তেল দেয।

অকাতবে এব জন্যে তাবা মোটা টাকা খবচ কবে। কুণালেব ঝোপ বুঝে কোপ, অর্থাৎ খদ্দেবেব পকেটেব ওজন বুঝে মাশুল আদায। এই কবে দালালিব বোজগাব বাডছেই। অথচ এক বছব আগেও কি জানত ওই দুটো দোকানেবই গোপনে মুভি ব্লু ফিল্ম দেখানোব এমন পবিপাটি ব্যবস্থা আছে?

যা ভেবেছিল তা নয। গুরু চিৎপাত হযেই তাব 'এক্সক্লুসিভ' নিজেব ঘবেব ফবাসে শুযে আছে। তাব পাশে দুটো পোস্টকার্ড সাইজেব ফটো পডে আছে, হাতেও একটা খুব মনোযোগ দিযে সেই ফটো দেখছে গুরু।

কুণাল শব্দ না কবে পাশে বসল। আলতো হাতে ওই বাকি ফটো দুটো তুলে নিল। দুটো ফটোই একটা মেযেব। ফুটফুটে সুন্দব কচি মুখ। বড জোব বছব সতেবো আঠাবো হবে বযেস। ডাগব চোখ। চোখেব পাতা ফেললে বোধহয নাকেব ডগা অনেকটা ছাডিযে যাবে। মোটাও নয, বোগাও নয। সব থেকে চোখে পডাব মতো মেযেটাব মুখেব কমনীযতা। কেউ যেন ছাঁচে গডে কমনীযতাব বস উপুড কবে ঢেলেছে।

হাতেব ছবিটা সামনে বেখে গুরু আডচোখে কুণালকে দেখছে আব টিপটিপ হাসছে। চোখা-চোখি হতে বলল, দেখে ফেললি তো। তোকে অবাক কবে দেব বলে একমাস ধবে চেপে বসে আছি।

—কি ব্যাপাব গুরু, এ আবাব কোথাকাব হুবী পবী? কিন্তু এ তো একেবাবে কচি।

তেমনি হেসে গুরু জবাব দিল, বাগবাজাবেব। হাতেব ফটোটা এগিযে দিল। দেখে ফেলেছিস যখন এটাও দ্যাখ।

অর্থাৎ এটা কচি বলাব জবাব। একটু আড হযে মেযেটা বাঁ-হাত মাথাব পিছনে তুলে খোঁপা ঠিক কবছে—সেই সমযেব ছবি। ফলে পিছনেব খানিকটা আব বুকেব এক দিকেব সুডৌল মাধুবী যেন উপছে পডেছে। চোখ ফেবানো যায না।

গুরু হৃষ্টমুখে জানান দিল, এ ছবিতে কোন কাযাদায কি তুলেছি ও মেযে নিজেও জানে না।...তা কি বকম মনে হচ্ছে?

দারুণ।

চোখে দেখলে বাতে তোব ঘুম হবে কিনা সন্দেহ। দেখবি?

বাগবাজাবে গিযে?

ইদানীং তো আমি প্রায বোজই যাচ্ছি। এই ফটোটা আমাব থাকবে, আজ ওই ফটো দুটো দিযে আসতে যাব। চল...।

কুণাল বিকেল থেকে বাত পর্যন্ত থাকে পার্ক স্ট্রীটে। সে-সময গুরুব কোন লীলা চলছে জানবে কি কবে। লোভ হচ্ছে বটে, আবাব নেশাব লোভ নিযে এসেছিল তা-ও বাতিল কবতে মন চায না। বলল, একটু বড গাঁজাব ইচ্ছে ছিল যে গুরু...।

বড গাঁজা অর্থাৎ মাবিজুযানা। গুরু আমল দিল না। বলল, ও-সব এসে হবে, আগে বড গাঁজাব বাণী দেখবি চল।

গুরু তৈরী হয়ে রাস্তায় বেরুলো। ট্যাক্সি নিল। হুকুম করল, বাগবাজার।

ডায়েরি ফেরত পাওয়া বা কুণালের লেখক হবার সম্ভাবনার মজার খবরটা আর দেওয়াই হল না। ওর হাতের সেই কালো ডায়েরিটা গুরুর চোখে পড়েও পড়ল না। ট্যাক্সি ছুটেছে আর এদিকের বসের ব্যাপারখানা কি থেকে কি গড়াচ্ছে ব্যাণ্ডোদা মনের আনন্দে সেই ফিরিস্তি শোনাচ্ছে শিষ্যকে।...ওই ফটোর মেয়ের মা গুরুর মায়ের ছেলেবেলার খুব বন্ধু ছিল। একদিন দুজনের দুজন'কে না দেখলে চলত না এমন নাকি। হঠাৎ এর মধ্যে একদিন কার মুখে শুনেছে সেই ছেলেবেলার বন্ধু আজ চৌদ্দ বছর ধরেই কলকাতায়। আমেরিকায় নয়। সে দিন-আনা দিন-খাওয়া গরীবের বউ আমেরিকা ফেরত এত বড়লোক বান্ধবীর কাছে আসবে কি আসবে না সেই দ্বিধা ছিল। শেষে ইচ্ছেটাই বড় হয়েছে। ফোন গাইডে ঠিকানা দেখে ছোট মেয়েকে সঙ্গে করে এক-সন্ধ্যায় চলেই এসেছে। নিচে তখন গুরু ছিল। তার সঙ্গেই মা-মেয়ের প্রথম দেখা। সে-যে কি দেখা গুরুই জানে। এত বড় বাড়িতে পা ফেলে দু'জনেই তারা বেশ জড়সড়। চন্দনা মানে ফটোর মেয়ে সেদিন একখানা ঘন নীল শাড়ী পরে এসেছিল। গুরুর মনে হচ্ছিল, নীলের মধ্যে আকাশের চাঁদখানা মুখ বাড়িয়ে আছে।

কাকে চাই শুনে সঙ্গে করে দোতলায় নিয়ে চলল। বাবা মা তখন মুখোমুখি বসে মদ গিলছে জেনেও। ছেলেবেলার বান্ধবী শুনে আর নিরাভরণা মহিলার একেবারে সাদামাটা বেশবাস দেখেই তার মগজে একটা আশা উঁকি ঝুঁকি দিয়ে গেছে। বান্ধবীকে স্বামীর সঙ্গে মদের বোতল আর মদের গেলাস নিয়ে বসা দেখেই তো মহিলার হয়ে গেল। ওদিকে বাবা-মাও অবাক। গুরুই ভিতরে ডাকল, আসুন মাসিমা ভিতরে আসুন। মা-কে বলল, তোমার ছেলেবেলার বন্ধুকে চিনতে পারছ না?

নাম বলার পরেও ব্যাণ্ডোদার মায়ের চিনতে সময় লাগল একটু। বাবা সাহেবী কায়দায় নিজে উঠে ওদের বসতে আপ্যায়ন করল। তারপর অন্য ঘরে চলে গেল।ওরা জড়সড় হয়ে বসল। ব্যাণ্ডোদা বাইরে থেকে লক্ষ্য করল, চেনার পরেও মা তেমন আগ্রহ দেখালো না। ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করল, ড্রিংক চলে কিনা। মহিলা এমন মাথা নাড়ল যে বাইরে থেকে ব্যাণ্ডোদা হেসেই ফেলল। সে যেন উঠে ওই ঘর ছেড়ে ছুটে বেরুতে পারলে বাঁচে। দু'চার কথায় মা তার ঘরের খবর নিল। মহিলা বাগবাজারে থাকে।চন্দনারা চার বোন। চন্দনা ছোট। বড় তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী পোস্ট অফিসের চাকরি থেকে এ বছরেই রিটায়ার করেছে, এখন ডায়রেটিসে প্রায় শয্যাশায়ী। মায়ের জেরার মতো প্রশ্নে দুই এক কথায় এইসব জবাব এসেছে। একটু বাদেই মহিলা বলল, উনি গেলাস রেখে চলে গেলেন, আমি অসময়ে এসেছি, আজ উঠি। ব্যাণ্ডোদার মা আপত্তি করল না, মাথা নাড়ল। ওরা উঠতে বলল, তোর এই ছোট মেয়েটা তো বেশ সুন্দর হয়েছে, বিয়ের চেষ্টা করছিস নাকি? মহিলা মিনমিন করে জবাব দিল, সে-রকম কিছু না, সবে এবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিল...এখনো ফল বেরোয়নি...বয়েস মাত্র সতের।

তারা নামার আগেই ব্যাণ্ডোদা সরে গেছল। তার বাবাকে বলেছে, তোমার গাড়িটা নিয়ে ঘণ্টাখানেকের জন্য বেরুচ্ছি। তাতে তার বাবা কলেও বেরোয় না গাড়ির ও দরকার হয় না।

মা মেয়ে খানিকটা এগোবার পর পিছন থেকে গাড়ি থামিয়ে ব্যাণ্ডোদা তাদের ধরেছে। নেমে এসে পিছনের দরজা খুলে দিয়ে মহিলাকে বলেছে, উঠুন মাসিমা —পৌঁছে দিচ্ছি।

মা মেয়ে দুজনেই খুব হকচকিয়ে গেছে। মহিলা বলেছে, আমরা তো বাগবাজারে থাকি—

ব্যাণ্ডোদা বলেছে, গাড়িতে বাগবাজার আর কতক্ষণের পথ। আর বলেছে, পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে বাগবাজার থেকে এসে আপনি কেমন দেখা করলেন আমি দেখেছি, আর বুঝেছি, এমন জানলে আপনি আসতেন না। তাই আমিই যেটুকু পারি প্রায়শ্চিত্ত করি—উঠুন উঠুন পিছনে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে।

মহিলা তাড়া খেয়ে উঠে বাঁচল। মেয়েটা আদব-কায়দা জানে না বলে সেও মায়ের পিছনে উঠল। গাড়ি হাঁকিয়ে সামনে চোখ রেখেই ব্যাণ্ডোদা আলাপ জুড়ে দিল। আর ফাঁকে ফাঁকে বিষার গ্লাসে মেয়েটাকে দেখতে লাগল। সংকোচ কাটিয়ে মহিলা বলল, তুমি এভাবে গাড়িতে আমাদের পৌঁছে দিতে চললে, তোমার মা হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন।

ব্যাণ্ডোদা বেশ গলা ছেড়ে হাসল (ওটা সরলতার লক্ষণ জানে), জবাব দিল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মাসিমা, আমাদের কারো ব্যাপারে কারো ইন্টারফিয়ার করা রীতি নয়—একদিক থেকে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তা আমার মায়ের সঙ্গে এককালে খুব ভাব ছিল বুঝি আপনার?

—খুব। এই জন্যেই তো

কিছু বলতে গিয়ে থমকালো। আবারও হা-হা হেসে ব্যাণ্ডোদা বলল, আপনাকে কিচ্ছু লজ্জা পেতে হবে না, আমি এক-নজরেই সব বুঝে নিয়েছি। মা অনেক বদলেছে, অনেক বড়লোক হয়েছে। তবে আমার শুধু অনুরোধ বাবা মাকে দেখে আপনি তাদের ছেলেকে বিচার করবেন না। মায়ের আচরণে আজ আমি কোথায় আঘাত পেয়েছি জানলে আমার জন্য আপনার কষ্ট হত।

মহিলা বলেছে, সে-কি কথা বাবা, আমি একই মধ্যে বুঝেছি তুমি সোনার ছেলে।

বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়ে ব্যাণ্ডো দেখেছে, নিতান্তই দীন দশা তাদের। ভদ্রলোক হয়তো বড় তিন মেয়ে পার করতেই ফতুর হয়েছে। মেয়েগুলোর চেহারা খাসা বলে তবু পার হয়েছে। ভদ্রলোক সত্যিই প্রায় অথর্ব। একবার ডায়বেটিক স্ট্রোক পর্যন্ত হয়ে গেছে। তাকে দেখার কর্তব্যেই ব্যাণ্ডোদা এরপর ঘন ঘন এসেছে। তাদের চোখে সে তখন আর সোনার ছেলে নয়, হীরের টুকরো ছেলে। হ্যাঁ, মহিলা ততদিনে তারও খোঁজ খবর সব নিয়েছে বইকি। অবশ্য ব্যাণ্ডোদার কাছ থেকেই। গেলেই একরাশ ফল মিষ্টি নিয়ে যায়। মহিলা কিছু বলতে গেলে অভিমান করে, আমাকে ছেলে ভাবলে কিছু বলবেন না, আমার মা আছে, কিন্তু আপনাকে দেখার আগে আমি মা পাইনি।

পাঁচ দিন আগে ব্যাণ্ডোদা তিন হাজার টাকা জোর করে মহিলার হাতে গুঁজে দিয়েছে—মেসোমশাইয়ের সব থেকে ভালো চিকিৎসা হওয়াই চাই। মহিলা তিন হাজার টাকা একসঙ্গে দেখেছে বলে মনে হয়নি ব্যাণ্ডোদার। তার যে দেবার অধিকার আছে তার দু'দিন আগে মহিলাকে সে সেটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, আমাকে

যদি খুব অপছন্দ না হয, তাহলে যেদিন বলবেন সেদিন আমি গাড়ি নিযে এসে আপনাকে আমাব মাযেব কাছে নিযে যাব...অবশ্য আমাব ব্যাপাবে আমাব ডিসিশনই ফাইন্যাল, তবু একটা ফবম্যালিটিব ব্যাপাব আছে তো। আমি মা-কে বলেই বেখেছি, ওঁদেব আপত্তি না হলে চন্দনাকে বউ কবে ঘবে তোলাব জন্য বেড়ি থেকো।

মহিলা তো আকাশেব চাঁদ হাতে পাবেই। মা বাগ কবেছে কিনা জিজ্ঞেস কবতে ব্যাণ্ডোদা আবাব সেই হা-হা হাসি হেসেছিল বলেছিল, এবাবে গিযেই দেখতে পাবেন —তাছাড়া জানেন তো কাবো ব্যাপাবে ইন্টাবফিযাব কবা আমাদেব বীতি নয।

যাক, ব্যাণ্ডোদাব অভিমান দেখেই মহিলা সেই তিন হাজাব টাকা হাত পেতে নিযেছে। তাবপব এইসব ছবি-টবি তুলতে দিতে আব বাধা কোথায। ব্যাণ্ডোদাব আফসোস, ওই দুটো খুপবি ঘব, চন্দনাকে সেভাবে একলা পাচ্ছে না—তবে পাবাব চান্স এবাবে একটু হযেছে। ব্যাণ্ডোদা বলল, মেযেটা এখনো এমন চেযে থাকে না, যেন বিশ্বাসই কবতে পাবছে না কি হতে যাচ্ছে। তখন ইচ্ছে কবে, ওকে বুকেব মধ্যে নিযে একেবাবে পিষে ফেলি, আব টসটসে চোখ দুটো দাঁতে কবে ছিঁড়ে আনি।

ওবা পৌঁছুলো। কুণাল দেখল মেযেটাকে। ছবি অত সুন্দব, কিন্তু এব বুঝি তুলনা নেই। দেখামাত্র সদ্যফোটা যুঁই ফুলেব মতো মনে হল কুণালেব। আড়চোখে কুণালকেও দেখল। ঠোঁটেব ফাকে হাসিব দাগ পড়ল একটু। ছাগলদাড়ি দেখে হাসি পাচ্ছিল বোধহয। যে-লোকেব বন্ধু, কুণালেবও আদব যত্ন কম হবে কেন? যতক্ষণ ছিল ওবা, চন্দনাব মাযেব অস্থিব অস্থিব ভাব। এবই মধ্যে ফাক বুঝে ব্যাণ্ডোদা বাব দুই চোখে চোখে কথা কইতে চেষ্টা কবল চন্দনাব সঙ্গে। কিন্তু চন্দনাব আযত গভীব কালো চোখে আব দুটো ঠোঁটেব ফাঁকে একটু হাসিব আভাস খেলা কবে গেল শুধু। আব খেযাল না কবে ব্যাণ্ডোদা একটু কাছাকাছি হতে চেষ্টা কবলেই তেমনি খেযাল না কবেই যেন ওই মেযে একটু তফাতে সবে যায। দু'বাব হযেছে এমন। আ-হা-হা, কুণালেব চোখে পলক পড়ে না—কি যে দেখাচ্ছিল না মেযেটাব মুখখানা তখন—যেন একখানা কালো মেঘেব সঙ্গে চাঁদেব লুকোচুবি খেলা। উপমা ঠিক হল না। চাদ হাসে। এই মেযেব মুখে শুধু একটু হাসিব আভা ছড়ায।

ওঠাব সময চন্দনাব মা ব্যাণ্ডোদাকে জিজ্ঞেস কবল, কাল আসছ তো বাবা? কুণালকেও নিযে এসো।

ব্যাণ্ডোদা বলল, কাল হযে উঠবে না...দেখি। আপনাকে আমাদেব বাড়ি কবে নিযে যাচ্ছি বলুন?

—যেতে তো হবেই, শীগগিবই যাব...তবে আমাব কেমন ভয কবে বাবা।

জবাবে কুণাল ব্যাণ্ডোদাব হা-হা হাসিব একটা নমুনা দেখল।

আবাব ট্যাক্সি। ব্যাণ্ডোদা বলল, কি বকম বুঝলি?

কুণাল ঝুঁকে পাযেব ধুলো নিতে গেল।—তোমাব জবাব নেই গুরু, পাযেব ধুলো দাও। দারুণ—দারুণ—আমাব বুকে চিতাব আগুন জ্বলছে।

গুরু খুশি।

—তোমাব মাকে সত্যি বলে বেখেছ?

—না বলাব কি আছে। বলতে তো হবেই। তা কেমন লাগল বল।

—বললাম তো জবাব নেই। বয়েস সতেবো হলেও খুব বাড়ন্ত গড়ন।

—বয়েস সতেবো নয়, আঠাবো। আমাব সাতাশ শুনে ওব মা-ই স্বীকাব কবেছে। আঠাবো না হলে সব-দিকে অমন ডবকা হয়?

—তুমি কাল আসছ না বললে, ফেব কবে আসছ?

—পবশু। মুচকি হাসল।—তবে পবশু তোকে আনা যাচ্ছে না।

—কেন?

—চন্দনাব বাবাকে নিয়ে ওব মা পনেব দিনে একদিন পোলিক্লিনিকে দেখাতে যায়...পবশু শনিবাব, যাবে আমি ক'দিন আগেই শুনেছিলাম। ঘণ্টা কয়েকেব মামলা। পুবনো ঝি'টা অবশ্য বাড়ি আগলে বসে থাকে, তবু এই মওকায় তাকে এদিক ওদিক সবিয়ে চন্দনাকে দুই একবাব বুকে চেপে তো ধবতে পাবব আব কষে দু'চাব বাব চুমুও খেতে পাবব—এবাবে কোন শালা ঠেকায়।—তা তোব ভিতবটা খুব চড়চড় কবছে?

—খাঁ-খাঁ কবছে।

—সত্যি বলছিস?

—এই দেখানোব আগে আমাব চোখ দুটো তুমি অন্ধ কবে দিলে না কেন গুরু।

প্রদীপ ব্যাগো হাসতে লাগল। খানিক বাদে হঠাৎ বলল, যা এত যখন...ছ'মাস এক বছব বাদে সুবিধে বুঝে তোকেই দিয়ে দেব।

কুণাল আঁতকে উঠল।—দিয়ে দেবে!

—না তো কি। কোন একটা মেয়েকে নিয়ে আমি জীবন কাটাবো ভাবিস নাকি? ঐ আগেব অন্য বউ দুটোব মতো হবে না—সাপেব মতো ফোঁস-ফোঁস কববে না...ঠিক টিট কবা যাবে। তোকে নিয়ে আমাব একটা দায়িত্ব আছে না?

বাত ন'টা নাগাদ কুণাল বাড়ি ফিবে দেখে শিবুকাকা বসে আছে। সামনে বাবা আব দাদাবাও আছে। ওকে দেখেই শিবুকাকা বলল, তোব কথাই এদেব বলছিলাম এতক্ষণ। তোব সাবজেক্ট ঠিক কবে ফেলেছি—

বাবা আব দাদাদেব মুখ দেখে মনে হল তাবা আশাব কথাই শুনছিল কিছু। বাবা বলে উঠল, আগে কাকাব পায়েব ধুলো নে হাবামজাদা পায়েব ধুলো নে।

কুণাল পিতৃ আদেশ পালন কবল।

শিবুকাকা বলল, ওই বাদবেতবদেব নিয়েই তোব ফীচাব স্টার্ট কবব। মানে 'তরুণেব মন' নাম দিয়ে তুই মাসে একটা কবে ফীচাব লিখবি। এক এক পর্যায়েব এক-একটা তরুণ রেছে নিবি—তাব মনেব কথা সুখ দুঃখেব কথা শুনবি তাবপব লিখবি। শেষে তোব মন্তব্য জুড়ে দিবি। মন্তব্য ওই বকম সবস হওয়া চাই—বুঝলি কোন বকম?

কুণাল সুবোধ ছেলেব মতো মাথা নাড়ল, বুঝেছে।

—প্রত্যেকটা লেখাব জন্য পঁচিশ টাকা আব ঘোবাঘুবিব জন্য পাঁচ টাকা কবে পাবি। সেবকম উতবোলে বই ছাপাব ব্যবস্থাও আমি কবে দেব। বাবাকে বলল, তুমি

কিছু ভেব না ভাযা, ওব ভাব আমি নিলাম—আজ পর্যন্ত অনেক গাধা পিটিযে ঘোডা কবেছি।

বাবা কৃতজ্ঞতায গদগদ।

আবো বাত্রি।

ঘুম থেকে ধডমড কবে একেবাবে বিছানায উঠে বসল কুণাল। বেডসুইচ টিপে আলো জ্বালল। ঘেমে গেছে। এ কি অদ্ভুত স্বপ্ন বে বাবা। ঘুবে ঘবেব কোণেব সুটকেসটাব দিকে তাকালো। না, থাক—স্বপ্ন ছাডা আব কি। কিন্তু বুকেব ভিতবটা ধপধপ কবছে এখনো। হাত বাডিযে ড্রযাবটা খুলল। ছোট হুইস্কিব বোতলটা খুলে কাঁচাই গলায ঢেলে দিল। দুই একবাব গা ঝাঁকানি দিযে টেবিলেব গেলাস থেকে অল্প একটু জল খেল। বোতলটা ড্রযাবে বেখে আলো নিভিযে আবাব শুযে পডল। কিন্তু ঘুম আব আসে না। যতবাব চোখ লেগে আসে, গুরুব মুখ আব চন্দনাব মুখ চোখেব সামনে ভেসে উঠছে।...চন্দনাকে বুকে চেপে গুরু চুমু খেতে যাচ্ছে। কাল বাদে পবশু দুপুবে যা ঘটবে।

বাব কযেক এ-বকম হতে আবাব বেডসুইচ টিপে উঠে বসল। নিজেব উদ্দেশে গাল পাডল, শালা পেট জ্বালিযে দিযে তোব জেগে খোযাব দেখা বাব কবছি। ড্রযাব খুলল। হুইস্কিব বোতলটা এবাবে গলায ঢেলে শেষই কবে দিল।

পবেব দিন।

দুপুব তিনটেয একটা বিকশ চেপে কুণাল বোস বাডি ফিবল। এই দুপুবে ঘবেব বাইবে কেউ নেই, নইলে ওকে দেখলে হাঁ হযে যেত। ট্রাউজাবেব ওপব ওব গাযে শুধু একটা সুতিব গেঞ্জি। জামাটা এক হাতে গোল কবে দলা পাকানো।

বিকশা ভাডা দিযে নিঃশব্দে নিজেব ঘবে চলে এলো। দলা পাকানো জামাটা চৌকিব কোণে ছুঁডে ফেলে দিল। সুটকেস খুলে কালো ডাযেবিটা বাব কবল। ড্রযাব হাতডে একটা পুবনো ব্লেড নিযে বসল। ওড অন বাবমুডা লিলিব পাতাটা খুলল। তকতকে সবুজ ডাঁটাব ওপব বসা বঙিন বীভৎস পোকাটাব মাথাটুকু শুধু ব্লেড দিযে কেটে দিল। তাবপব নতুন পাতায চলে এলো। কলম বাব কবল। শিবু কাকাব কাগজেব জন্য 'তরুণেব মন'এব প্রথম বা শেষ ফীচাব এক্ষুণি লিখে ফেলবে। বাবমুডা লিলিব লেখাটা পছন্দ হযেছিল যখন, এ লেখাটা নিশ্চয আবো ঢেব বেশি পছন্দ হবে।

—আমি এক্ষুণি গুরুব বাডি থেকে ফিবলাম। বেলা বাবোটা থেকে পৌনে তিনটে পর্যন্ত তাব ওখানে তাব সঙ্গেই ছিলাম। গুরু পবেব দিনেব অপেক্ষায মশগুল। আব আমি? না, জীবনে এত থ্রিল আব এমন উত্তেজনাব স্বাদ আমি পাইনি। গ্র্যাণ্ড—যাকে বলে সুপাব গ্র্যাণ্ড। অথচ নেশা কেবল একলা গুরুই কবছিল। আমি যোগান দিযে চলেছিলাম। গুরুব তখন আমাব দিকে মন দেবাব চোখ কোথায। ভাবে মশগুল। তাব থেকে ঢেব বেশি নেশায মশগুল। আমাব নেশা যোগানদাবিব ব্যাপাবটা তো আব খেযাল কবে দেখেনি। কেবল টেনেই চলেছে।...তাবপবে একসময মাথা আব

তুলতে পারছে না। চোখ আর খুলতে পারছে না। আমার থ্রিল আর উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। গ্যাণ্ড গ্যাণ্ড গ্যাণ্ড।

সময় হয়েছে মনে হতে গুরুর ড্রয়ার খুললাম। খাপ থেকে তার সোনালি বাঁটের বিলিতি ক্ষুরটা বার করলাম। গুরু বরাবর নিজের এই ক্ষুরে কামাতে ভালবাসে। গুরুর পাশে বসলাম। বাঁ হাতে তার বালিশটা ঘাড়ের একটু তলার দিকে নিয়ে এলাম। তারপর সেই হাতেই থুতনিটা একটু ওপরের দিকে ঠেলে বললাম, গুরু মুখখানা একটু ওপরের দিকে তোলো তো—

চোখ খুলতে না পেরে গুরু খুব অস্পষ্ট গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে চেষ্টা করল, কি করবি

—তোলোই না, যা করব তুমি টেরও পাবে না। থুতনি আরো ঠেলে তোলার কাজটা আমিই করলাম। তারপর চেপে ধরে চোখের পলকে যা করার করে ফেললাম। ফিনকি দিয়ে এক ঝলক রক্ত আমার চোখে মুখে দাড়িতে আর জামায় লাগল। কিন্তু নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি থামি কি করে? ক'সেকেণ্ডই বা লাগল। গুরু বার কয়েক মাত্র হাত-পা ছুঁড়ল। আধ-কাটা খাসীকে আমি এর থেকে ঢের বেশি পা ছুঁড়ে দাপাতে দেখেছি। নেশার জন্য অত পারে নি কি, কি জন্য আমি জানি না। আমার দু'হাতে লালে লাল। ফরাস রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গুরুর রক্ত যে এমন বিষম লাল আর এত গরম কে জানত। ছুটে বাথরুমে এলাম। ভালো করে মুখ হাত ধুলাম। জামাটা খুলে পুঁটলি করলাম। আমার হাতে সময় খুব নেই জানি। পুলিশ ধাওয়া করার আগে বাড়ি গিয়ে শিবু কাকার তরুণের মন লিখে ফেলতে হবে।

রিকশা চেপে বাড়ি চলে এলাম। লিখতে বসলাম। যা বলছিলাম, ওই বীভৎস রঙিন পোকাটা রারমুড়া লিলির কাছে পৌঁছে যাবে এ কেমন করে হয়? কি করে হয়? অথচ পরশু মাঝরাতে আমি সেই স্বপ্নই দেখে উঠলাম। দেখলাম সেই সবুজ ডাঁটা বেয়ে বেয়ে ওটা সত্যি উঠছে। উঠছেই। যত উঠছে ততো ওটার দু'চোখ আরো লোলুপ বীভৎস হয়ে উঠছে। প্রায় ডগা পর্যন্ত উঠতে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর সকালে গুরুর ওখানে যাওয়া পর্যন্ত জেগে জেগেই কতবার যে ওই স্বপ্নের দৃশ্যটা দেখলাম ঠিক নেই। বাকা চোরা আট দশটা লিকলিকে পা বার করে ওটা উঠেই চলেছে।

কিন্তু তা কি কখনো হয়? হতে পারে? এখন আমি নিশ্চিন্ত। ওই লোলুপ বীভৎস রঙিন পোকাটা কোনো দিন আর রারমুড়া লিলির নাগাল পাবে না।

কোনদিন না। কখনো না।

সোনালী রেখা

আত্মীয়-পরিজন সকলেই জানল রুচিরা জিতেছে। আনন্দে ডগমগ হবার মতো হারজিতের খেলা নয় এটা। এই হারজিতের ওপর স্বস্তি নির্ভর করছিল। শান্তি নির্ভর

করছিল। তাই আনন্দে আটখানা না হোক, রুচিরা জেতার ফলে সকলে খুশী। সকলে বলতে একান্ত শুভার্থী জনেরা। বাবা-মা। দাদা-দিদি। নইলে খবরটা জানাজানি হবার পর মুখ মচকারে এমনও অনেকে আছে। রুচিরা ফিরে আবার গাঙ্গুলী হয়েছে এটুকুই তার জিত।

এতদিন ছিল রুচিরা ব্যানার্জী। মিসেস ব্যানার্জী। এখন এই দুপুরের পর থেকে আর মিস মিসেস কিছুই নয়। শুধু রুচিরা গাঙ্গুলী। সাতাশ মাসের একটা দুঃস্বপ্নের শেষ। এই সাতাশ মাসের মধ্যে পনেরো মাস হাতে নোয়া বা শাঁখা ছিল না। কপালে বা সিঁথিতে সিঁদুরও ছিল না। তবু অক্টোপাসের মতো দুটো ক্রুর লোলুপ হাতের অধিকার যেন ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ছিল।

সেই দুটো হাত পুরুষের। শক্ত সবল পুরুষ তাকে বলবে না রুচিরা। গোড়ায় সেই রকমই বুঝেছিল। সেই রকমই ভেবেছিল। স্বয়ং ইন্দ্রের মতোই মাথা উঁচু মনে হয়েছিল ইন্দ্র ব্যানার্জীর। তার দর্প দেখে তার দম্ভ দেখে তখন শুধু পুরুষকারের ছটাই বড় হয়ে উঠেছিল রুচিরার চোখে। তার সঙ্গে বিয়ের যখন সব ঠিক তখনো সেই লোকের ছোটখাটো দুই-একটা অপরাধের নজির সামনে এনে বিয়ে রদ করতে চেয়েছে কেউ কেউ। বাবা-মা শুনে চিন্তায় পড়েছিলেন। দাদা-বউদি দিদি-জামাইবাবু থমকে ছিল।

চাঁদে কলঙ্ক নেই, গোলাপে কাঁটা নেই—এ কি হয়? কোকিল কালো নয়—এ কি হয়? সোনায় কিছু খাদ না মিশলে তা দিয়ে গয়না হয়? ইন্দ্র ব্যানার্জীর চরিত্রের যেটুকু আভাস পেয়ে বাড়ির সকলে ধাক্কা খেয়েছিল, রুচিরার চোখে পুরুষ প্রবৃত্তির একটা বেপরোয়া দিক মাত্র সেটা। লোকটার মধ্যে লুকোচুরির ব্যাপার নেই, পায়ে কোনো ভয়ের বেড়ি নেই। থাকলে সব-কিছু একটা ম্যাডমেডে ব্যাপার হয়ে যেত। তাহলে সুশীতল চক্রবর্তীর সঙ্গে তার কোনো তফাত থাকত না। হায়ার সেকেন্ডারি থেকে এম. এ. পর্যন্ত নাম-করা ভাল ছাত্র সুশীতল চক্রবর্তী। বি. এ-তে ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এম. এ-তেও তাই। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল ছেলে। পান-সিগারেট পর্যন্ত খায় না। চোখে পুরু চশমা। তার ও-ধারের একটু ছোট চোখ দুটো বুদ্ধিতে চিক-চিক করে। জোর-জুলুম কাকে বলে জানে না। মিষ্টি মিষ্টি হাসে। সকলে ভেবেছিল, এত ভাল ছেলে আই. এ. এস-এ বসবে। আর বসলে যে পাঁচজনের একজন হবে জানা কথাই।

কিন্তু বসল না। কারণটা রুচিরাকেই কেবল বলেছিল সুশীতল চক্রবর্তী। চোখের যা পাওয়ার তাতে বাতিল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ষোল-আনা। এই দোষ চাপা দিতে হলে অনেক কারচুপির দরকার। তার মধ্যে সে নেই। তাছাড়া ও-সব লাইন ভালও লাগে না। দু-দুটো ভাল কলেজ থেকে অফার এসেছে। কলেজের মাইনে-পত্র আজকাল খারাপ নয় খুব। একটা নিয়ে নেবে। আরো পড়াশুনা করার ইচ্ছে। সুযোগ হলে ডক্টরেট করে নিয়ে কিছু বই-পত্র লেখার ইচ্ছে।

এই লোক রুচিরার জীবনে সেধে এগিয়ে আসতে চেয়েছিল। বিনয়দার নিজের ছোট মাসতুতো ভাই সুশীতল চক্রবর্তী। বিনয়দা হল দিদির বর। বিলেত-ফেরত

এঞ্জিনীয়ার। এক প্রাইভেট এঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে মস্ত চাকরি করে বিনয়দা। স্বামীকে নিয়ে দিদির ভিতরে ভিতরে বেশ গর্ব আছে। এই বিনয়দার সুবাদে সুশীতল চক্রবর্তীর এ-বাড়িতে অল্প-স্বল্প আসা-যাওয়া ছিল। রুচিরার থেকে তিন ক্লাস ওপরে পড়ত।

এই বিদ্বান মাসতুতো ভাইটিকে বিনয়দা ভালবাসে খুব। আর দিদি তার থেকেও বেশি। দিদি বয়সে বোধহয় ওর থেকে বছর দেড়েকের বড় হবে। কিন্তু কাছে পেলে রসিকতার ছলে দিদি একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো আদর করত ওকে। একবার তো রুচিরা আর বিনয়দার সামনেই কি কারণে খুশী হয়ে দিদি আচমকা ওর দু-গালে দুটো চুমু খেয়ে বসেছিল। সুশীতল চক্রবর্তীর মুখখানা দেখতে তখন হেসে গড়াবার মতই হয়েছিল।

রুচিরা যখন হায়ার সেকেন্ডারিতে মোটামুটি ভাল রেজাল্ট করে ফিলসফি অনার্সে তিন বছরের কোর্সে বি এ পড়তে ঢুকল, সুশীতল চক্রবর্তী তখন এম. এ ফার্স্ট ইয়ার। দর্শনশাস্ত্রের সেতু ধরে তার পর থেকে দুজনের মধ্যে দর্শনের ব্যাপারটা আরো অনেক সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। রুচিরার যেবার বি এ পার্ট টু ফাইনাল পরীক্ষা, তার আগের বছর এম এ পরীক্ষা দিয়ে সুশীতল চক্রবর্তী সোনার মুখ করে যুনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছে। আর সেই অবকাশের অনেকখানি রুচিরাকে সাহায্য করার ব্যাপারে ঢেলে দিয়েছে। মাত্র চারটি নম্বরের জন্য বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস না পেয়ে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল রুচিরা। এও তার কাছে এমন কি বাড়ির সকলের কাছেও আশাতীত। ফার্স্ট ক্লাস না পাওয়ার খেদ শুধু ওই সুশীতলের।

রেজাল্ট খুশী হয়ে দিদি বলেছিল, এবারে পায়ে হাত দিয়ে তোর মাস্টারকে প্রণাম কর একটা, আর প্রার্থনা কর এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাস।

আজকালকার কলেজে-পড়া ছেলে-মেয়েদের রীতি অনুযায়ী সুশীতলকে নাম ধরে অর্থাৎ বাড়ির সকলের মত শীতল বলেই ডাকত রুচিরা। দিদি এই জন্যেও কম মন্দ বলত না ওকে। শুনলেই চোখ পাকিয়ে ধমক লাগাত।—এই। বড় না তোর থেকে?

দিদি এমন কিছু সেকেলে মেয়ে নয়, মাত্র সাড়ে চার পাঁচ বছরের বড় রুচিরার থেকে। তার সময়েও কলেজের সমবয়সী বা একটু আধটু বয়েসের পাড়াকের ছেলেমেয়েদের নাম ধরে ডাকাডাকির রীতি ছিল। কিন্তু নিজের আদরের ওই মাসতুতো দেওরটির বেলায় দিদির গোঁড়ামি।

প্রণাম করার হুকুম শুনে বেশ মজার কাণ্ডই করেছিল রুচিরা। চট করে গম্ভীর হয়ে ভারী গলায় ডেকে বসেছিল, শীতল এদিকে আয়—

না, একেবারে আধুনিকাদের মতো 'তুই' কখনো বলেনি। 'তুমি' করে বলত। এই ডাক শুনে তো দিদির চক্ষু কপালে। সে ভাবল হয়তো মাঝের এই তিন বছরে বোনের এই উন্নতি। সুশীতল কিন্তু মিটিমিটি হাসছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন?

—দিদি বলল শুনলি না? আয় প্রণাম করি—

সুশীতল তার পরেও ভালমানুষের মতো এগিয়ে আসতে ধাক্কা মেরে তাকে দিদির গায়ের ওপর ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। প্রণাম সত্যি করবে দিদি আশা করেনি, কিন্তু ওই 'তুই-তোকারি' শুনে বেগেই গেছল। দিদির মনের তলায় তখনো কি আশা রুচিরা বুঝতে পারেনি।

বি. এ. পবীক্ষাব সময সপ্তাহে কম কবে চাব পাঁচদিন তাকে পডাতে আসত সুশীতল। এম.এ-তে ঢোকাব গোডা থেকেই সেই বকমই আসতে লাগল। মুখে কোনো দিন এতটুকু আভাস ব্যক্ত না কবলেও তাবপব থেকে কেন যেন একটু অস্বস্তি বোধ কবছিল রুচিবা। জল হোক ঝড হোক সে ঠিক আসবে। এসে যে কোনো বকম বাজে কথায সময কাটাত তা নয। তখন আবাব কলেজেব নতুন মাস্টাব সুশীতল। উৎসাহ বা উদ্দীপনাব অভাব নেই। গোডা থেকেই নিযম কবে পডাশোনাব তাগিদও দিত। কিন্তু ইদানীং ওব এম. এ-তে ভাল বেজাল্টই লক্ষ্য লোকটাব, ভাবা যাচ্ছিল না। যা ভাবছিল, সেই গোছেব ব্যাপাব অনেক সময চোখে-মুখে লেখা হযে যায। রুচিবাব ধাবণা, সে সেটা নির্ভুল পডে নিতে পাবছিল। একদিন তাই সবাসবি বলে ফেলেছিল, গোডা থেকেই এত লেখাপডা আমাব পোষাবে না বাপু, এ বছবটা অন্তত আগেব মত সপ্তাহে দু'দিনেব বেশি পডছি না, পবীক্ষা এলে তাবপব দেখা যাবে। বেশি পডলে মাথা ঝিম ঝিম কবে।

পুরু লেন্সেব ওধাবেব চোখ দুটো তাব মুখেব ওপব থমকেছিল একটু।—মাত্র দু'দিন ?

—হ্যাঁ। দু'দিন তোমাব কাছে পডব, দু'দিন আবাব গানে লেগে যাব ভাবছি, আব দু'দিন নিজে পডব—এমনিতেই তো দিদি কথা শোনায আমাব বি. এ-ব বেজাল্টেব পিছনে সবটাই তোমাব বাহাদুবি।

মুখেব দিকে তেমনি চেযে ছিল সুশীতল। যদি ফিবে জিজ্ঞাসা কবত বাহাদুবিটা সে অস্বীকাব কবে কিনা, রুচিবা তেমন যুৎসই জবাব কিছু দিযে উঠতে পাবত না। কিন্তু সে-বকম দাবি জাহিব কবাব মানুষ সুশীতল চক্রবর্তী নয। তাঁছাডা সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হওযাটা তাব কাছে কোনো ভাল বেজাল্টই না।

কথা-মতো সপ্তাহে দু'দিন কবেই আসছিল এব পব। কিন্তু মুখে যাই বলুক, একটু ভাল বেজাল্ট কবাব তাগিদ রুচিবাব ভিতবে ভিতবে ছিলই। আব সেটা যে সবটাই সুশীতল চক্রবর্তীব ওপব নির্ভব, তাও স্বীকাব না কবে উপায় নেই। ফাইনাল ইযাবে পা দিযেই সুশীতলেব আসাটা দু'দিনেব জাযগায এবাব তিন দিন কবে দেবে কিনা, আপনা থেকেই ভাবছিল।

এবই মধ্যে যা ভাবেনি, এক সন্ধ্যায তাই হযে গেল। পডানোব মতো মুখ কবেই সুশীতল বলল, অনেকদিন ধবে একটা কথা তোমাকে বলি-বলি কবে বলা হচ্ছিল না। বউদিকে, মানে তোমাব দিদিকে বলেছিলাম, উনি আবাব আমাকেই ঠেলে দিলেন। কথা আব কিছু নয, তোমাব বাবা মা-কে এবাবে যদি আমি একটা বিযেব প্রস্তাব দিই, তোমাব তাতে আপত্তি হবে কি না।

এমন মুখ কবে বলল, যেন বাজাবেব আলু-পটল কেনাব মতো সাদামাটা প্রস্তাব একটা। কিন্তু তাই শুনেই রুচিবা বিষম চমকে উঠল। অতর্কিতে আক্রান্ত হবাব মতো মুখ।—বাবা-মাযেব কাছে বিযেব প্রস্তাব ...ইযে, মানে আমাকে বিযে ?

পুরু লেন্সের ওধারের দু'চোখে হাসির ছোঁয়া লাগল।—তা না হলে আর তোমার আপত্তি হবে কিনা জিগেস করব কেন?

ভিতরে ভিতরে হাঁসফাঁস দশা রুচিরার।—আমি, মানে, আমি কখনো কিছু এ নিয়ে ভাবিইনি—

—ভাবতে অসুবিধে হচ্ছে?

এমন সঙ্কটে রুচিরা বোধহয় জীবনে আর পড়েনি। ভিতরে ভিতরে দিদির ওপরেই আচ্ছা রাগ হতে থাকল। দিদির মারফত প্রস্তাবটা এলে যা বলার বলে দেওয়া সহজ হত, অন্তত চক্ষুলজ্জার বালাই থাকত না। এরারে জবাব দিতে সময় নিল একটু। তারপর যতটা সম্ভব নরম করে বলল, দেখ, তুমি খুব ভাল, আর তোমাকে আমার ভালও লাগে—কিন্তু এ-রকম চিন্তা আমার কখনো মাথায় আসেনি বা সেভাবে তোমাকে কক্ষনো দেখিনি—

রুচিরার দেখার ভুল নয়। চোখের হাসি মিলিয়ে গেছে। না, এই জবাব আশা করেনি। উল্টে বোধহয় ধরেই নিয়েছিল রুচিরার চোখেমুখে সম্মতির খুশীর ছটা দেখবে। তার দিকেই চেয়ে আছে তখনো। বিস্ময়-আশাহত চাউনি। না বুঝে-শুনে দিদি একে কতখানি আশা দিয়ে বসেছিল কে জানে।

বিড়ম্বনা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা মানুষটার। গলার স্বরও এরারে ঠাণ্ডা একটু।—সে-ভাবে দেখেছ এমন কেউ এসে গেছে?

প্রাণের দায়ে এরারে সোজাসুজি মাথা নাড়ল রুচিরা। অর্থাৎ তাই। এসে গেছে। খুব সত্যি নয়। আবার একেবারে যে মিথ্যে তাও নয়। ইন্দ্র ব্যানার্জী তখন পর্যন্ত ওর মনের দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়েনি। তবু এর কাছে স্পষ্ট মনোভাবটাই প্রকাশ করল রুচিরা। এসেই গেছে। একেবারে কেউ না এলেও এই মিথ্যের আশ্রয় নিত কিনা জানে না।

সুশীতল চক্রবর্তীর মুখে আবার বিস্ময়ের আঁচড় পড়ছিল।—তোমার দিদিরও এটা জানা নেই নিশ্চয়?

মরীয়া হয়েই জবাব দিল রুচিরা—দিদি কেন, এখন পর্যন্ত কেউ জানে না। প্লীজ, তুমিও আর দয়া করে জানতে চেও না।

সত্যিই ঠাণ্ডা আর ভদ্র এই মানুষটা। এ নিয়ে আর একটি কথাও বলেনি। আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। খানিকটা আত্মস্থ হয়ে উল্টে বলেছিল, কিছু মনে করো না...আমার জানা থাকলে তোমাকে এভাবে অপ্রস্তুত করতাম না।

রুচিরা সাগ্রহে বলেছে, আমি কিছু মনে করিনি, তুমি কিছু মনে করলে না তো?

—না।...আজ কি পড়বে?

—আজ থাক।

টেবিলের বই দুটো একবার নাড়াচাড়া করে আবার রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। —চলি তাহলে?

কেন যেন ভয়ানক বিচ্ছিরি লাগছিল রুচিরার। তেমনি অস্বস্তি। বলেই ফেলল, পড়াশুনার ব্যাপারে আর তোমার সাহায্য পাওয়ার আশা করাটা ঠিক হবে না বোধহয়?

—কেন ?

—আসবে ?

—তুমি না চাইলে আসব না।

ভাবেব আবেগে রুচিবা বলেছিল, শীতল, তুমি সত্যি অনেক বড। আমি কিছু না।

সুশীতল চলে যাবাব পব ওব কান্নাই পাচ্ছিল। কেন এ-বকম হল ? কেন এ-বকম হয ? সুশীতল খুব—খুব ভাল এটা সে অস্বীকাব কবতে পাবে না। কিন্তু স্বামী হিসেবে তাকে ভাবা যায না কেন ? ও এমন কি মেযে ? পুরুষেব চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পাবে এমন রূপেব সম্বল কিছুই নেই। গাযেব বং ঠিক ফর্সা বলা চলে না, স্বাস্থ্য মোটামুটি, নাক-মুখ পটে আঁকা নয। কেবল, ওপবতলাব কিছু প্রসাদ আছে ওব চোখ দুটোতে। যে দেখে সে-ই সুন্দব বলে। লুকিযে চুবিযে রুচিবাও আযনায নিজেব এই চোখ দুটোকে কম দেখে না। ওব আব যা-কিছু রূপ তাব সবটাই বুকেব তলায। কাবো কষ্ট দেখলে দুঃখ হয, কাবও আনন্দ দেখলে খুশী হয। কাবো উদাবতা দেখলে ভিতবটা ভবে যায, নিপীডন দেখলে নিজেব ভিতবেই যন্ত্রণা হতে থাকে। কত সময ভাবে, সকলেই একটু উদাব হলে, একটু দবদী হলে, একটু নিঃস্বার্থ হলে, এই পৃথিবীটা তো কত সুন্দব হতে পাবে।...হয না কেন ?

চোখ দুটো ছাডা ওব ভিতবেব এই রূপেব খোঁজ পেতে হলে স্বাদ পেতে হলে যে অবকাশ দবকাব আব অন্তবঙ্গ সান্নিধ্য দবকাব, একমাত্র সুশীতল চক্রবর্তীই সেটা পেযেছিল। কিন্তু তাকে তো সে সবাসবি বাতিল কবে দিল। অথচ তাব জন্যও যে কত দুঃখ হচ্ছে রুচিবা সেটা কাকে বলবে ?

সুশীতল চলে যাবাব পবদিনই দিদি এসেছিল, গম্ভীব। হাব-ভাবে বুঝিযেই দিল বোনেব ওপব বাগ হযেছে। বহুক্ষণেব মধ্যে ওব সঙ্গে কোনো কথাই বলল না। ফলে রুচিবাব বাগ দ্বিগুণ। ও ভাল কথায জল, মেজাজ দেখালে আগুন। মনে মনে ভাবল, দিদিব চেহাবা-পত্র ওব থেকে একটু ভাল, সেই দেমাকে ভাবে ওব দেওবেব থেকে ভাল বব আব পাব কোথায।

রুচিবাও সেধে একটি কথাও বলতে এল না।

যাবাব আগে দিদি ব্যঙ্গ কবে জিজ্ঞাসা কবল, কাকে সব সমর্পণ কবে বসে আছিস ?

—তোব ববকে। হল ?

যা-ই হোক, বোনকে দিদি ভালই বাসে। হেসে ফেলল।—থাপ্পড খাবি। কে এমন লোক এল যে শীতলকে একেবাবে বাতিল কবে দিলি—শুনিই না ?

রুচিবাব মেজাজ তখনো ঠাণ্ডা হযনি। চটপট জবাব দিল, বিনযদার থেকে ভাল এটুকু জেনে বাখ—জানলে তোব হিংসে হতে পাবে।

বাগ দেখিযে চলে গেল। না গিযে কববে কি ? দিদিব জেবাব মুখে পডলে কি বলবে ? কাব নাম কববে ?

কিন্তু রুচিরা আর যা-ই হোক, মেয়েটা বোকা নয় একটুও। ওরই দিকে চেয়ে একজন বেপরোয়া মানুষ যে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে এটা সে অনুভব করতে পারে। তার নাম ইন্দ্র ব্যানার্জী। এই অভিজাত দক্ষিণ এলাকায় তাকে চেনে না এমন কেউ নেই। রুচিরা অন্তত ছেলেবেলা থেকেই চিনত। কলেজে পড়তেই পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের মাতব্বর হয়ে বসেছিল। সেই খুনোখুনির রাজনীতির সময় তার সম্পর্কে গা-কাঁটা দেবার মত অনেক গাল-গল্প কানে এসেছে। মোট কথা, সেই দুর্যোগের সময় এই এলাকা একেবারে ঠাণ্ডা ছিল শুধু তার দাপটে। একবার মাত্র এই পাড়ার ওপর হামলার সূচনা হয়েছিল। সুযোগ পেয়ে বাইশ বছরের একটা ছেলেকে কারা ছোরা আর বিভলভার দেখিয়ে জীপে তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। ঘটনাটা তক্ষুণি পাড়াময় রটে গেছল। সেই বিধবা বুক চাপড়ে রাস্তায় বেরিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছল। পাড়ার ছেলেরা তাকে ধরাধরি করে রুচিরাদের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। রুচিরার বাবা তার চিকিৎসা করেছিলেন। শুধু এ-এলাকার কেন, কলকাতার মধ্যেই একজন নামী ডাক্তার রুচিরার বাবা।

কিন্তু দু'ঘন্টার মধ্যেই পাড়ায় আবার হৈ-চৈ। বিধবার সেই ছেলে অক্ষত অবস্থায় আবার ঘরে ফিরে এসেছে। পরদিন কাগজে খবর বেরিয়েছে, হত্যার উদ্দেশ্যে অমুক জায়গার একটি ছেলেকে কারা জীপে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কোথা থেকে আরো দুটো জিপ হঠাৎ এসে তাদের ওপর চড়াও হয়। অতর্কিতে আক্রান্ত হবার ফলে দুষ্কৃতকারীদের তিনজন গুরুতর আহত হয়, আর বাকি দুজন হত্যার বলি সেই ছেলেটাকে ফেলে পালিয়ে যায়। ছেলেটা নিরাপদে ঘরে ফিরেছে। কিন্তু কে বা কারা তাকে উদ্ধার করেছে জানা যায়নি, কারণ তারাও পুলিস আসার আগে নিজেদের জীপ নিয়ে সরে পড়েছে। ছেলেটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কিছু জানা যায়নি। মনে হয় এটা কোনো রাজনৈতিক দলাদলির ফল। আহতদের অবস্থা আশংকাজনক।

ওই বিধবার ছেলেটা যে রুচিরার বন্ধু সুমিতার পিসতুতো ভাই জানা ছিল না। সে চুপি চুপি রুচিরাকে বলেছিল, এত বুকের পাটা কার জানিস না? ইন্দ্রদার।—খবর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দুটো জীপ নিয়ে আর দল নিয়ে ওদের ঘাঁটিতে গিয়ে হানা দিয়েছিল।

শুনে রুচিরা কন্টকিত।—পুলিস জানে না?

—জানলেই বা কি। ইন্দ্রদার বাবা কংগ্রেসের কত বড় চাঁই জানিস না?

তা অবশ্য জানে। অনেক এম এল এ ছেড়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও কত সময় ইন্দ্র ব্যানার্জীদের বাড়ি আসে।

ইন্দ্র ব্যানার্জীর বাবা হাই ব্লাডপ্রেসারের রোগী। রুচিরার বাবার পেশেন্ট। বাবা বুদ্ধিমান মানুষ, তাঁর কাছ থেকে ফী নিতেন না। বাবার খবর দেবার জন্য ইন্দ্র ব্যানার্জী কখনো-সখনো তাদের বাড়ি আসত। তখন কখনো কখনো রুচিরার সঙ্গে চোখের দেখা হত শুধু, মনের ব্যাপারের ধারে-কাছেও কেউ নেই। কিন্তু রুচিরার ভিতরে ভিতরে এই বেপরোয়া ছেলেটার প্রতি কৌতূহল ছিল।

রুচিরা যখন বি. এ. পড়ে, তখন সেই বন্ধু সুমিতার কাছেই হঠাৎ একদিন শুনল, ওদের ইন্দ্রদা নাকি রুচিরার চোখ দুটোর খুব প্রশংসা করছিল—

সুমিতা বলছিল আর হাসছিল খুব। রুচিরা অবাক, তোকে কে বলল?

বলেছে সুমিতার সেই পিসতুতো ভাই—যে এখন ওই ইন্দ্রদার অন্ধ ভক্ত।

তার দলের ছেলেরা নাকি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, ডাক্তারের ছোট মেয়েটার বড় দেমাক, ঝকঝকে গাড়ি চেপে কলেজে যায়, কলেজ থেকে ফেরে—কোনো দিকে তাকায় না। কত যেন রূপসী, যেন তাকালে ছেলেরা হাঁ করে ওকে গেলার জন্য বসে আছে।

তাই শুনে ইন্দ্র ব্যানার্জী নাকি বলেছে, মেয়েটার চোখ দুটো কি সুন্দর লক্ষ্য করে দেখেছিস তোরা? খবরদার ওর পিছনে লাগবি না।

ছেলেরা নাকি তাদের মুকুটমণি ইন্দ্রদার ওই কথায় মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে চুপ মেরে গেছে।

শুনে রুচিরার কেন যেন হঠাৎ রাগ হয়ে গেছে, আবার ভিতরে ভিতরে একটু খুশীও হয়েছে। রাগ ছেলেগুলোর কথা শুনে হতে পারে, আবার ইন্দ্র ব্যানার্জীর মুরুব্বিয়ানার কথা শুনেও হতে পারে। ওর পিছনে লাগার সাহস যেন কারো আছে। আর খুশীর কারণ হয়তো বা ছেলেটার দেখার মতো নিজের দুটো চোখ আছে ভেবে হতে পারে।

কিন্তু ইন্দ্র ব্যানার্জীর সমস্ত চেহারার মধ্যে যে বেশ একটা জোরালো পুরুষের ছাপ আছে এটা রুচিরা নিজের মনেও অস্বীকার করতে পারে না। গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা, দস্তুরমতো লম্বা। বুদ্ধিমাখা চাউনি, জোড়া ভুরু। মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি, কিন্তু ইচ্ছে করলেই চোয়াল দুটো যেন কঠিন হতে পারে। না মোটা না রোগা। মাথার ঝাঁকড়া চুলে চিরুনির বদলে হাত চালায় বেশি। ওদের বাড়ির পাশ দিয়েই গাড়ি চেপে সে কলেজে যায় আর কলেজ থেকে ফেরে। যাবার সময় প্রায়ই নিজের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সাগরেদদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখে। ভিতরে একটু কৌতূহল ছিল বলেই হয়তো বাড়ির সামনে চোখ ফিরিয়ে বড় একটা তাকায় না রুচিরা। যেটুকু দেখার দূর থেকেই দেখে নেয়। কলেজ থেকে ফেরার সময় গেটটা ফাকাই দেখে। তখন বড় একটা চোখে পড়ে না।

সুমিতার মুখে এ-খবরটা শোনার পর রুচিরার কেমন মনে হয়েছে, কলেজে যাবার সময় প্রায়ই যে ওই ছেলেকে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কারো না কারো সঙ্গে কথা বলতে দেখে, তার পিছনে ব্যাপার কিছু থাকতেও পারে। ঘরে বসে আড্ডা দেয় না কেন? সুমিতা চলে যেতে সেদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের এই দুটো চোখের দিকেই অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল রুচিরা। তারপর নিজেই লজ্জা পেয়েছে। ভ্রূ কুঁচকে আয়নার সামনে থেকে সরে এসেছে। কিন্তু একটু খুশীর ছোঁয়া যে মনে লেগেছিল সেটা অস্বীকার করতে পারে না। সুমিতার কাছ থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটা কথা জেনে নিতে পারলে মন্দ হত না। বীরপুরুষটি লেখাপড়া করছে কিনা, বা কদ্দুর করেছে। নাকি বিদ্যাদিগগজ হয়ে মস্তানি করে বেড়াচ্ছে? আবার ভেবেছে, একেবারে

শূন্যকুম্ভ হলে পাড়ার অল্পবয়সী এম. এল. এ. দুজন হামেশাই ও-বাড়ি আসে কেন? বাপের সঙ্গে হোমরা-চোমরাদের খুব দহরম-মহরম হলেও ওই দুজনের তাঁর ছেলের সঙ্গেই খাতির বেশি। তারা লেখাপড়া জানা ছেলে শুনেছে। তাদের বন্ধুর পেটে একেবারেই কিছু থাকবে না? তাছাড়া বেপরোয়া হলেও হাব-ভাব আচরণ শিক্ষিত ছেলের মতই।

খেয়াল হতে রুচিরা নিজেকেই চোখ রাঙিয়েছে আবার। লেখাপড়া জানা হোক বা ক' অক্ষর গোমাংস হোক, ওর অত ভাবার দরকার কি?

দরকার থাক বা না থাক, পরদিন কলেজ যাবার সময় চেষ্টা করেও চোখ দুটো অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। অথচ গাড়িতে ওঠার সময় বার বার নিজের মনে সংকল্প করেছে, কক্ষনো কোনো দিকে তাকাবে না। কিন্তু পরিচিত গেটটা পার হবার আগেই চোখ দুটো ঠিক ওই দিকেই ঘুরেছে।

আর যোগাযোগ এমনি যে, এই দিনে গেটের সামনে একলাই দাঁড়িয়ে সে। সঙ্গী-সাথী নেই। রুচিরা ঘাড় ফেরানো মাত্র চোখাচোখি। ওই গেট পার হবার আগেই। আর সঙ্গে সঙ্গে রুচিরার নিজের ওপর রাগ যেমন, ভিতরের গোঁ-ও তেমনি। চেয়ে বইল তো চেয়েই বইল।

সেই ছেলেও।

গেট ছাড়িয়ে গাড়িটা এগিয়ে গেল। রুচিরার তখন নিজের ওপরেই এমনি রাগ যে ইচ্ছে করছিল গাড়িতেই ঘুরে বসে পিছনের কাচের ভিতর দিয়ে সেই দিকে চেয়েই থাকে। কারণ চোখাচোখি হতে ইন্দ্র ব্যানার্জীর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি দেখেছে। যেন বলতে চেয়েছে এতদিনে সদয় হলে যা হোক—

কিন্তু এরপর এই চোখাচোখি হওয়ার ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটতে লাগল। রুচিরার ঠোঁটের ফাঁকে কখনো হাসির ছোঁয়া লাগে, কখনো বা ভুরুর মাঝে ছদ্ম বিরক্তির ভাঁজ পড়ে। কথা নেই বার্তা নেই, এ যেন এক মজার খেলা।

দিন-কতক বাদে পর পর কয়েক দিন ওই গেটের সামনে ইন্দ্র ব্যানার্জীকে দেখা গেল না। অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে এমন নয়। দু'দিন আগে ওর বাবা রুচিরার বাবার কাছে এসে ব্লাডপ্রেসার চেক করিয়ে গেছেন। ওপর থেকে তাঁর গাড়ি দেখে রুচিরা বাবার চেম্বারের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বাবাকে ধরে নিয়ে গেলে বোঝা যেত কারো কিছু অসুখবিসুখ করেছে। তা যখন নয় ঘরে ঢুকে তো আর জিজ্ঞাসা করতে পারে না, আপনার গুণধর ছেলের খবর কি?

অপ্রত্যাশিত খবরটা হঠাৎ কাগজে দেখা গেল। কয়েক দিন ধরেই কাগজে জলপাইগুড়িতে ভয়াল বন্যার খবর বেরুচ্ছিল। কাগজের এ-সব খবর রুচিরা দেখেও দেখে না। কিন্তু সেদিন আর না দেখে বা ঘটনাটার আদ্যোপান্ত না পড়ে পারা গেল না। গোড়াতেই ইন্দ্র ব্যানার্জীর ছবি একখানা। তারপর তার দুঃসাহসের প্রশংসার ফিরিস্তি।

...সর্বগ্রাসী বন্যার খবর পেয়ে কলকাতা থেকে কংগ্রেসের এক তরুণ দল সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা নিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গেছল। সেই তরুণ দলের নায়ক ইন্দ্র

ব্যানার্জী। সেখানে গিয়ে নায়কের মতই একটি কাজ করেছে। নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে জলমগ্ন কুটিরের এক বুড়ীকে উদ্ধার করে এনেছে। কাগজে যা লিখেছে তা সত্যি হলে ওই ছেলেও যে মস্ত এক ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই। বুড়ীকে আগলে পুরো ছত্তিরশটি ঘণ্টা অনাহার আর অনিদ্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি বসে থাকতে হয়েছিল তাকে।

দিন-কতক বাদে আবার তাকে গেটের সামনে দেখতে পেল রুচিরা। আগের দিনই তার আসার খবর কানে এসেছিল। খুব ঘটা করে মালাটালা পরিয়ে পাড়ার ছেলেরা নাকি তাকে স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছে।

গাড়িটা ও-বাড়ির গেট পার হওয়ার সময় এই একটি দিন আবার রুচিরা তাকে যেন দেখতেই পেল না। ইচ্ছে করে রাস্তার উল্টো দিকে মুখ করে বসে রইল। ভেবেছে, অত বাহাদুরির খবর পড়ে রুচিরাও আনন্দে গলে গিয়ে বীরপুরুষকে নতুন চোখে দেখবে। কিন্তু কাগজের ছবি দেখে আর খবর পড়ে রুচিরাও যে দুঃসাহসের প্রশংসা মনে মনে করেনি, এমন নয়।

পরের দিনের ব্যাপারটা অন্যরকম। রুচিরার প্রথমে রাগ যেমন হয়েছে, পরে মজাও তেমনি লেগেছে। ওর কলেজ যাবার সময় ইন্দ্র ব্যানার্জী সেদিনও গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে দুজন স্তাবকও ছিল। ও ছেলের সঙ্গী-সাথীদের স্তাবক ছাড়া আর কিছু ভাবে না। দূর থেকে ওদের দেখে এই দিনও রুচিরা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল।

হঠাৎ গাড়িটা প্রায় থেমেই যেতে ঈষৎ বিস্ময়ে ড্রাইভারের দিকে তাকাতে গিয়ে রুচিরার সামনের দিকে চোখ পড়ল। রাস্তার ঠিক মাঝখানে গাড়ির পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্র ব্যানার্জী। গাড়িটা প্রায় থামিয়ে ড্রাইভারও সবিস্ময়ে তাকিয়েছে সেদিকে।

রুচিরার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ধীর গম্ভীর মুখে রাস্তা ছেড়ে আবার নিজের বাড়ির গেটের দিকে চলল। রুচিরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সেখানে অন্য ছেলে দুটো ওর দিকে চেয়েই হাসছে ফিক ফিক করে।

রুচিরা সেদিন জ্বলতে জ্বলতে কলেজে চলল। হিন্দুস্থানী ড্রাইভারটা পর্যন্ত কি ভাবল কে জানে। কিন্তু জ্বলুনি থাকল না বেশিক্ষণ। তার ওপর মজার প্রলেপ পড়তে লাগল।

এর পরদিন থেকে কলেজ যাবার সময় আবার চোখ দুটোকে ওবাড়ির গেটের দিকে ফেরাতে হল তাকে। তা না হলে পরদিনই আবার রাস্তা আগলে দাঁড়াবে কিনা কে জানে। লোকটার ঠোঁটের ফাঁকে জ্বালা-ধরানো হাসি। তাকে অবজ্ঞা করলে কি হবে সেটাই যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। রুচিরার এ জুলুম বরদাস্ত করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলে ও করবে কি? আর টের পেয়ে গেলে লোকেই বা ভাববে কি? এর থেকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকানো স্বস্তির ব্যাপার।

আরো কিছুদিন পরের কথা। রাত তখন সাড়ে ন'টা। পড়াশুনার পাট শেষ করে রুচিরা খাবার টেবিলের দিকে যাচ্ছিল। দাদা তার উদ্দেশ্যে একটা হাঁক দিয়ে বসে গেছে। রাতে দাদা-বউদির সঙ্গে খায়। দিনের বেলা যে-যার সময় মত খেয়ে নেয়। রাতে বাবার খাওয়া একটু দুধ, একটা সন্দেশ, আর খই। তাঁর খাবারটা মা এর অনেক আগেই ঘরে দিয়ে আসেন।

বাধা পড়ল। পুরনো চাকর মহেশ এসে বলল, একটি বাবু নীচে ডাকছেন।

রাত সাড়ে ন'টায় নীচে বাবু ডাকছেন শুনে রুচিরা হাঁ। ছেলেদের মধ্যে এ-বাড়িতে একমাত্র আসে সুশীতল। তাকে খবর দিয়ে আসতে হয় না। সরাসরি আসে।

—কে বাবু?

—ইন্দ্রবাবু।

রুচিরা হতচকিত কয়েক মুহূর্ত। কি করবে বা কি বলবে ভেবে পেল না। তারপর মায়ের চোখের আড়াল হয়ে চুপচাপ নীচে নেমে এল। রাত সাড়ে ন'টায় বাড়ি এসে চাকর দিয়ে তাকে খবর দেওয়া যে চলবে না এটা প্রথম দিনেই তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

বৈঠকখানার দরজা খোলা। ইন্দ্র ব্যানার্জী সেখানে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের ছবি দেখছে। মুখ গম্ভীর, একটু ক্লান্তও যেন।

রুচিরা এসে দাঁড়াতেই কোনো ভূমিকা না করে বলল, আমি ডক্টর গাঙ্গুলীর কাছে এসেছিলাম, কিন্তু এখানকার লোকটা বলল, ডাক্তারবাবুকে এখন আর খবর দেওয়া চলবে না, তাই একটু বিরক্ত করতে হল। ডক্টর গাঙ্গুলীকে একবার খবর দিতে হবে, বিশেষ দরকার।

চোখ-মুখ দেখে রুচিরার মনে হল কারো বাড়াবাড়ি গোছের ব্যাপার কিছু। প্রথমেই তার বাবার কথা মনে হল।

—বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।

দৌড়ে ওপরে চলে এল। ডাক্তারের বাড়ি, এ-সব ব্যাপারে ঘড়ির নিয়ম মানা চলে না। বাবা তখন আধ-শোয়া হয়ে একটা ডাক্তারি জার্নাল পড়ছেন। বলল, ইন্দ্র ব্যানার্জীর বাবার বোধহয় বাড়াবাড়ি অসুখ কিছু হবে, সে নীচে তোমাকে ডাকছে, বলল খুব দরকার—

শুনে রুচিরার বাবা একেবারে তৈরি হয়ে তাড়াতাড়িই নেমে এলেন। পিছনে রুচিরাও না এসে পারল না। কিন্তু তারপর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে যে-কথা শুনল, তার দু-চক্ষু স্থির। শোনার পর লোকটার ওপর যত রাগ, বাবাকে না বুঝে-শুনে এভাবে ডেকে আনল বলে তেমনি সংকোচ।

বাবা ঘরে ঢুকতেই দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, আপনাকে এখনই একবার আমার সঙ্গে এক জায়গায় একটু যেতে হবে।

এ-কথা শুনে বাবা অবাক।—কি ব্যাপার?

—চলুন। সঙ্গে গাড়ি আছে। গাড়িতে বসে বলছি।

এবারে বাবা বিরক্ত একটু।—এত রাতে আমি কোথাও যাই না—কোথায় যেতে হবে?

—পার্ক সার্কাসের দিকে। আমার এক বন্ধু কিছুদিন ধরে ভুগছিল, টাকা-পয়সার অভাবে ভাল ডাক্তারও দেখাতে পারেনি। খবর পেয়ে তাকে দেখতে গেছলাম। গিয়ে দেখি অজ্ঞান হয়ে আছে। চার টাকা ফী-এর এক ডাক্তার দেখছিল, সে কিছু বুঝতে পারছে বলেই মনে হল না। আপনি দয়া করে চলুন আমার সঙ্গে, আমি নিজে আবার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব—

বিরক্তি চেপে বাবা বললেন, কিন্তু এত রাতে আবার আমি পার্ক সার্কাস যাব—ওদিককার কাউকে পেলে না?

লোকটার জবাব দস্তুর মত উদ্ধত ঠেকল রুচিরার কানে। সে বলছে, আর দেরি করবেন না, আমি আপনাকেই নিয়ে যাবার জন্য এসেছি, আমি সঙ্গে থাকছি, আপনার কোনো ভয় নেই। আর রাতও খুব একটা বেশি হয়নি।

বাবা তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটু। তারপর বললেন, আচ্ছা, তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো, আমি ব্যাগটা নিয়ে আসছি—.

ইন্দ্র ব্যানার্জী ও-দিকের দরজা দিয়ে বেরুলো, বাবা এদিকে ফিরলেন। দরজার কাছে রুচিরাকে দেখে বললেন, ব্যাগটা এনে দে—

মেয়ের দ্বিধা দেখেই তিনি বুঝলেন সে না বুঝেই তাঁকে ওপর থেকে ডেকে এনেছে। গলা খাটো করে বললেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই, ব্যাগটা নিয়ে আয়—না গেলে বরং ঝামেলার ব্যাপার হতে পারে, দিন-কাল ভাল নয়।

রুচিরা তক্ষুণি ওপরে এসে বাবার ডাক্তারি ব্যাগটা এনে দিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার ওই লোকটার ওপর। বাবাকে প্রায় শাসিয়েই এই রাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মনে হতে লাগল তার।

এক ঘণ্টার মধ্যেই বাবা বাড়ি ফিরলেন। রুচিরা দোতলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। নিজেই জীপ ড্রাইভ করে বাবাকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু দোতলায় উঠতে রুচিরা দেখল বাবার এখন প্রসন্ন মুখ। তাঁর হাত থেকে ব্যাগটা নিতে নিতে রুচিরা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বাবা বললেন, না রে, ছেলেটার অন্তঃকরণ আছে। গিয়ে দেখি ওর সেই বন্ধু বলতে গেলে এক বস্তি-ঘরের ছেলে। তাকে ঘিরে বিধবা মা আর বোন-টোনগুলো কান্নাকাটি করছে।...হার্ট অ্যাটাক, বেঁচে যেতে পারে হয়তো, কিন্তু ঝামেলা আছে। আমাকে নিয়ে ফেরার আগে ওই বিধবা মায়ের হাতে ব্যানার্জীর ছেলেটা তিনশো টাকা গুঁজে দিয়ে এল দেখলাম, বলল, কান্নাকাটি রেখে এখন ভাল শুশ্রূষার দিকে মন দিন, কিছু ভাবনা নেই, ভাল চিকিৎসাও হবে, সেরেও যাবে।

রুচিরা তবু ফোঁস করেই বলে উঠল, আর তোমার ফী?

বাবা হাসলেন। বললেন, দূর পাগলি, এই দেখেও হাত পেতে আমি ফী নিতে পারি নাকি! চৌষট্টি টাকা ফী দেবার জন্যেই ঝোলাঝুলি করছিল, আমি ধমকে উঠতে আর কিছু বলেনি।

শুনল যা তাতে কারো রাগ হবার কথা নয়। শুনে ওরও ভাল খুবই লেগেছে। কিন্তু ওই দাপট দেখিয়ে বাবাকে টেনে বার করে নিয়ে গেছল যে সেটা কিছুতে ভোলা যাচ্ছিল না।

পরদিন গেটের সামনে ইন্দ্র ব্যানার্জীকে দেখা গেল না। মন বলল, তার সেই অসুস্থ গরীব বন্ধুকেই দেখতে গেছে।

সন্ধ্যের দিকে জীপ হাঁকিয়ে তাকে বাবার চেম্বারে আসতে দেখেছে পর পর কয়েকদিন। আবার একদিন দিনের বেলায় এসে বাবাকে নিয়েও গেছে। রুচিরা সব

দোতলা থেকেই লক্ষ্য করেছে। একদিনও নীচে নেমে আসেনি। কিন্তু এখন আর বাগ নেই। ভিতরে ভিতরে উল্টে কেন যেন খুশীই একটু। বন্ধুর কঠিন অসুখে বাবা সাহায্য করছেন বলে কি আর কোনো কারণে, বলা শক্ত।

দুজনের সম্পর্কটা বেশ একটু সরস নাটকের দিকে গড়ালো রুচিরার বি. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুনোর পর। গাড়ি চেপে সেদিন বিকেলের দিকে দিদির বাড়ি যাচ্ছিল, ওই মূর্তি তখন তার বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে। গাড়িতে ওকে আসতে দেখেই গেট ছেড়ে রাস্তায় এসে একটা হাত তুলে ড্রাইভারকে গাড়িটা থামাতে হুকুম করল। আর হিন্দুস্থানী ড্রাইভারটাও কিছু না বুঝে গাড়িটা থামিয়ে নিল।

মিষ্টি মিষ্টি হেসে পিছনের খোলা কাঁচ নামানো জানলায় দু-হাতে ঠেস দিয়ে বলল, কংগ্র্যাচুলেশনস।

রুচিরা হাসছে না। গম্ভীর।—কেন?

—শুনলাম বি. এ. পরীক্ষায় তুমি সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ—

তুমি। শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাড়-পিত্তি যেন একসঙ্গে জ্বলে উঠল রুচিরার। আর সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানও প্রায় খুইয়ে বসল। বলে উঠল, থ্যাংক ইউ। তা তোমার নিজের পড়াশুনার দৌড় কদ্দুর?

এই ঝাপটা খেয়েই ইন্দ্র ব্যানার্জী যেন, সত্যিকারের খুশীতে আটখানা একেবারে। তার যেন কান-মন জুড়িয়ে গেল। এ-যাবৎ মেয়েদের ও স্তব-স্তুতি দেখে অভ্যস্ত। এই এক মেয়ে তার ব্যতিক্রম বটে।

বলল, নিশ্চয় সেটা তোমার জানার অধিকার আছে। তিন বছর আগের কলকাতা য়ুনিভার্সিটির গেজেট খুলে দেখো—কোনরকমে এম. এস-সি-টা পাস করেছিলাম।

এ খবর অপ্রত্যাশিত বটে। সোজা মুখের দিকে আরার তাকাল রুচিরা, মিথ্যে বলল বলে মনে হল না। কিন্তু এ-ভাবে জানলায় ঠেস দিয়ে গাড়ি থামিয়ে রাখাটাই বা বরদাস্ত করে কি করে? তাছাড়া আরারও 'তুমি' বলল, আর বলল, জানার তোমার অধিকার আছে। রুচিরার তার ওপর অধিকার ফলাবার কি দায় পড়েছে?

তেমনি ঝাঁঝালো সুরেই আরার বলে উঠল, তবে আর কি, এতবড় পণ্ডিত হবার পর বাতদিন এখন লোকের ওপর মাতব্বরি করে বেড়ানো ছাড়া আর কি কাজ থাকতে পারে।

—সে কি কথা! উৎফুল্ল অথচ আহত যেন।—আমার ওপর এই বিচার তোমার! তুমি কলেজে চলে যাবার পরেই নাকে-মুখে ভাত গুজে আমাকে ছুটতে হয় কারখানায়, আমি এখন একখানা কেমিক্যাল ফার্মের অর্ধেক মালিক সে-খবর রাখো?

এ জবার শুনে রুচিরার মেজাজ আরো গরম হল বই ঠাণ্ডা হল না। বলে উঠল, না, আমি তোমার কোনো খবরই রাখি না—বুঝলে? ড্রাইভার!

ড্রাইভারটা কি ভেবে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছিল কে জানে। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে সেলফ টানল।

কিন্তু ইন্দ্র ব্যানার্জী হাসছে। আর তক্ষুনি জানলা ছেড়ে সরেও দাঁড়াল না। বলল, মেয়েদের এমন খামোখা রাগের কি যে অর্থ কে জানে। আমি আরো খুশী হয়ে এলাম অভিনন্দন জানাতে। যাক, আমার সম্পর্কে খবর রাখে না এ তল্লাটে এমন কেউ আছে জানা ছিল না। খবর এরপর আমিই দিতে চেষ্টা করব তাহলে।

গাড়ি ছেড়ে সরে দাঁড়াতে ড্রাইভারটাই যেন হাঁপ ফেলে বাচল। গাড়ি ছাড়ার পর রুচিরার মেজাজ ঠাণ্ডা হতে বেশি সময় লাগেনি। সত্যি তার রাগ করার কোনো মানে হয় না। পাড়ার মধ্যে নামজাদা মানুষ একটা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওই শুরুতেই 'তুমি' শুনে মেজাজটা বিগড়ে গেছল। জবাবে সেও ছেড়ে কথা বলেনি —'তুমি'ই বলেছে। এত হিম্মত এ-তল্লাটের কোনো মেয়ের হত বলে মনে হয় না। যেতে যেতে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা অজানা রসের মতো পেতে লাগল রুচিরা। ...এমন ডাকসাইটে মাতব্বর মানুষ, ওর পাসের খবরটা ঠিক রেখেছে। আবার রুচিরার রাগের জবাবে চান্স পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের এম এস-সি পাস করার খবর জানিয়ে দিয়েছে। রুচিরা এটা সত্যিই আশা করেনি। এম. এস-সি পাস জেনে এখন যেন একটু ভালই লাগছে। বিদ্বানের দুরন্তপনা একটু অন্য ব্যাপার। সেটা মস্তানির পর্যায়ে পড়ে না। তাছাড়া চাকরি-বাকরির মধ্যে না ঢুকে নিজে কেমিক্যাল কারখানা করেছে এটাও পুরুষোচিত কাজ মনে হয়েছে। গোলামি করা রুচিরা দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তাছাড়া ওই লোক কোথাও চাকরি করতে গেলে রক্তারক্তি করে বেরুনোও বিচিত্র নয়।

মরুকগে। রুচিরা এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন ? মাথায় ব্যাপারটা তবু ঘুরপাক খেতেই থাকল। কায়দা করে কারখানার আধখানা মালিকানার কথাও জানিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা ঠিকই কানে লেগে আছে রুচিরার। ও গাড়ি চেপে এই গেট ছাড়িয়ে কলেজের দিকে চলে গেলেই ওই লোক নাকে-মুখে ভাত গুঁজে কারখানায় ছোটে। তার মানে, বাড়ির গেটের কাছে ও-সময় তার দাড়িয়ে থাকাটা শুধু ওরই জন্যে। কথাবার্তার মধ্যেও কোথাও যদি ছিটেফোঁটা রাখা-ঢাকার ব্যাপার থাকত ! নির্লজ্জ আবার কাকে বলে !..এর পর থেকে নিজেই নিজের খবর দেবে বলে দিল। রুচিরার অস্বস্তি। এ-লোক মুখে যা বলে কাজেও অনায়াসে তাই করতে পারে। কি করবে ? রোজ রাস্তায় এভাবে গাড়ি আটকাবে, না, বাড়ি এসে হাজির হবে ? রুচিরার ভাবনাই ধরে গেল।

সে যুনিভার্সিটিতে ঢোকার মুখে এই লোককে নিয়ে ঝামেলার মোড় ঘুরল আর এক ভাবে। ঝামেলা ছাড়া আর কি বলবে রুচিরা ? না, গাড়ি আর একদিনও থামায়নি। আর রুচিরার সময়ের হিসের পায় না বলে রোজ আর গেটেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না তাকে। এম. এ. ক্লাসের রুটিন আর কলেজের রুটিনে তফাত আছে। কোনোদিন এগারোটায় ক্লাস, কোনোদিন বারোটায়, কোনোদিন একটায়। এই রুটিনের কল্যাণেই এদিক থেকে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। এদিকে যুনিভার্সিটিতে ঢোকার পর রুচিরার যাতায়াতের ব্যবস্থাও কিছু বদলাতে হয়েছে। বিকালের দিকে বাবা বড়জোর এক ঘণ্টা সোয়া ঘণ্টার জন্য গাড়ি ছেড়ে দিতে পারেন। আগে কাছেই কলেজ ছিল, ড্রাইভার

এক ফাঁকে গিয়ে তাকে নিয়ে আসত। তাই যাতাযাত দুটোই বাড়িব গাড়িতে চলত। এখন শুধু যাওযাটা গাড়িতে হয। আসাটা ট্রামে বা বাসে। কিন্তু রুচিবা এ পর্যন্ত ট্রাম বা এমনি বাসে উঠতেই পাবে না। ওই গাদাগাদি ভিড দেখলেই তাব মাথা ঘোবে। দুই একদিন চেষ্টা কবে উঠেছিল। কিন্তু ভিডেব চাপে দম বন্ধ হওযাব দাখিল। মেযে দেখলে অসভ্য লোকগুলোব চাপাচাপি যেন আবো বাডে। সবাই যে অভব্য তাই বলে তা নয, বেশিব ভাগই সভ্য। কিন্তু এমন যাচ্ছেতাই ভিড হলে লোকে কববেই বা কি।

অতএব ওকে আসতে হয বেশি পযসা খবচ কবে মিনিবাসে। কিন্তু ওই সময়ে মিনিবাসও বেশিব ভাগ বোঝাই হযে আসে। পব পব কযেকটা ছাডলে একটাতে যদি জাযগা মেলে। তাও না হয হল, কিন্তু কোনো মিনিবাসই তো উত্তব থেকে টানা দক্ষিণ কলকাতায আসে না। এসপ্লানেডে এসে সেই মিনিবাসও আবাব চেঞ্জ কবতে হয। আব এটাই সব থেকে অসহ্য ব্যাপাব। এক ঘণ্টা দাডিযেও একটা মিনিবাস ধবতে পাবে না এমনও হয। ফলে বোজই বাডি ফিবতে রুচিবাব সন্ধ্যে গডিযে যায, যাব ফলে বাডি ফেবাব পব থেকে মেজাজটা খিঁচডেই থাকে। সমস্যাটা মাকে বলেছে। মা বলেছে বাবাকে। বাবা ধকলটা অস্বীকাব কবেন না কিন্তু মুখে বলেন, দশজনে যা কবছে তাই একটু-আধটু কবতে পাবাব অভ্যাস থাকা ভাল—তা না হলে রুচিব জন্যে তো আবাব একটা গাডি কিনতে হয।

আবাব একটা মানে দাদাব জন্য একটা ছোট গাডি আছে এবং সেটা বাবাব টাকাতেই কেনা। দাদাও ডাক্তাব। কিন্তু তাব গাডি চাওযা আব তাব একখানা হাত বা পা চেযে বসা যেন একই ব্যাপাব। দাদাব পসাব বাবাব ষোল আনাব এক আনাও না। কিন্তু সকাল থেকে বাত পর্যন্ত তাব গাডি চবকিব মতো কলকাতাব বাস্তা চষে বেডাচ্ছে। গাডি পেতে হলে বউদিকেই দস্তুবমতো ঝগডাঝাটি কবে আদায কবতে হয। তাছাডা দাদাব গাডি পেলেই বা কি? চালাবে কে? দাদা তাব নিজেব গাডিব নিজেই ড্রাইভাব।

গাডি আবো একখানা বাবা ইচ্ছে কবলে কিনতে পাবেন বটে, কিন্তু এম এ. পডাব জন্য ড্রাইভাব সমেত আবো একটা গাডি বাখাব কথা ভাবতেও রুচিবাব লজ্জা।

এই ভাবেই চলেছিল গোডাব মাস দুই। তাবপব হঠাৎ ব্যতিক্রম একদিন। ছুটিব পব মিনিবাসেব অপেক্ষায দাঁডিযে ছিল। ঘ্যাঁচ কবে পাশেই একটা জীপ এসে থামল। তাব পবেই চক্ষুস্থিব রুচিবাব। সেই জীপে শুধু ড্রাইভাব বসে। এবং সে স্বযং ইন্দ্র ব্যানার্জী। রুচিবা তাকে না দেখতেই চেষ্টা কবল। তাডাতাডি অন্য দিকে মুখ ঘুবিযে নিল। কিন্তু জীপ থামিযে যে দাঁডিযে গেছে সে এটুকু দেখেই চলে যাবাব লোক নয। জীপেব ওই বিতিকিচ্ছিবি হর্নটা টিপে ধবে বসে বইল। আব একটানা সেই শব্দে বাসেব জন্য আব যাবা অপেক্ষা কবছিল, চকিত হযে তাবা ওদেব দুজনকেই দেখতে লাগল।

বিপাকে পডে রুচিবাকে আবাব ওই জীপেব দিকেই ঘুবে দাঁডাতে হল। আব একগাল হেসে তক্ষুণি ওই বেহাযা বেশ চেঁচিযেই অতিপবিচিতেব মতো বলে উঠল, বাস্তায দাঁডিযে পডাশুনাব ধ্যান হচ্ছে নাকি? উঠে এস—

ঠিক যেমনটি হলে রুচিবার মাথাযও ঝোঁক চেপে যায়, এও যেন তেমনি পরিস্থিতি একটি। কোনোদিকে না চেয়ে সোজা জীপে উঠে এল। পাশের সীটে বসল। তারপর গাড়ি তিরিশ গজ এগোতেই ঝাঁঝাল গলায় জিজ্ঞাসা করল, এ-রকম অসভ্যতার মানে কি?

সামনের দিকে চোখ রেখে হাসিমুখে নির্লিপ্ত গলায় ইন্দ্র ব্যানার্জী ফিরে জিজ্ঞাসা করল, দেখেও না-দেখার ভান করে অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে থাকার মানে কি?

—মানে আমার দেখার ইচ্ছে নেই।

—আমারও অসভ্যতার মানে জোর করে দেখানোর ইচ্ছে।

আরো রাগত স্বরে রুচিরা বলল, আমি জীপে না উঠলে কি করতে পারতে?

—না উঠতে পারলে তুমি উঠতে না। আমার ইচ্ছে বাতিল করা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

—তাহলে গাড়ি থামাও, আমি নেমে যেতে পারি কিনা দেখো।

থামানোর বদলে হাসতে হাসতে গাড়ির বেগ আরো বাড়িয়ে দিল ইন্দ্র ব্যানার্জী। তারপর আলতো করে বলল, এত রাগের কারণ কি, ট্রামে-বাসে চাপাচাপি করে যেতে খুব ভাল লাগত?

—হ্যাঁ, লাগত। তোমার তাতে কি? সত্যি সত্যি এত রাগ কেন হচ্ছে রুচিরা জানে না।

—হিংসে, স্রেফ হিংসে। তা বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলে, গাড়ি কি হল? রুচিরা এবার চেষ্টা করল ঠাণ্ডা হতে। ও যত বেগে যাচ্ছে, লোকটার যেন তত মজা। জবাব দিল, গাড়ি ঠিকই আছে, কারো হিংসে হলেই এখানে চার বার করে গাড়ি যাতায়াত করবে না।

—তার মানে বোজ, ট্রাম-বাসে যাতায়াত?

—আসি গাড়িতে, যাই মিনিবাসে।

—তার মানে তো আবার একদফা এসপ্লানেডে চেঞ্জ!

—তাতে কার কি?

হাসছে আবার বলল, এই যুগটাই অন্যরকম। কত ধকল বাঁচালাম, উপকার করলাম—তার বদলে পাচ্ছি রাগ। অবশ্য এও আমার ভালই লাগছে।

আরারও রাগের অনুভূতিটা ঠেলে তরল করল রুচিরা। ঠাণ্ডা মুখে জিজ্ঞাসা করল, ধকল বাঁচানো আর উপকার করার জন্য জীপ নিয়ে ঘুরে বেড়াও?

হাসছে।—কাজ না থাকলে তাও বেড়াই। ধকল বাঁচানো আর উপকার করার মতো মেয়ে দেখলে তুলেও নিই।

কানের ভিতরটা ঝি-ঝি করে উঠল রুচিরার।—আমাকে তুলে নেবার মতো মেয়ে ভেবেছ?

সামনে চলন্ত গাড়ির ভিড়। তার ফাঁকেই মুখ ঘুরিয়ে ওকে একবার ভাল করে দেখে নিল। হেসেও উঠল হা-হা করে। জবাব দিল, তুলে নিলাম কিনা দেখলে না?

রুচিরা গুম হয়ে বসে রইল। মনে মনে নিজেরই মুন্ডপাত করতে লাগল সে। কেন সে জীপে উঠতে গেল। এবারে কিছুটা আন্তরিক সুরে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, সত্যি অনেক দিন তোমাকে না দেখে মেজাজটা এত খারাপ হয়ে গেছল। আজ ভাগ্যিস ঠিক এই সময়ে এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম।

এ-কথা শোনার পর রুচিরার কেন যেন আগের মতো রাগ হল না। দোষ এই লোকেরই। হঠাৎ হঠাৎ মগজের মধ্যে ওলট-পালট কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। ইচ্ছে থাকলেও ঠাণ্ডা মাথায় এখন দুটো ভাল কথা বলার উপায় নেই।

এসপ্লানেড ছাড়িয়ে জীপ মাঠের মাঝের ফাঁকা রাস্তা ধরে ছুটল। স্পীড কম করে ষাট মাইল হবে। রুচিরা আড়চোখে দেখছে এক একবার। লোকটার যেন ধৈর্য বলে কিছু নেই, সবেতে হুড়মাড় ব্যাপার।

বাড়ির সামনের মোড়টার কাছে আসার আগেই রুচিরা বলল, এখানে থামতে হবে।

—কেন?

—আমি নামব।

—কেন?

—কেন আবার কি, আমার খুশি।

কেন এখানে নামতে চায় ইন্দ্র ব্যানার্জীর না-বোঝার কথা না। বাড়ির লোকেরা আর পাড়ার লোকের চোখ এড়াতে চায়। আপত্তি না করে জীপ থামাল। রুচিরা নেমেই হন হন করে সামনে এগোলো। পিছনে বসে লোকটা যে হাসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পরদিনও যুনিভার্সিটির শেষ ক্লাস সারা হবার আগে রুচিরার কেমন মনে হল ইন্দ্র ব্যানার্জী আজও জীপ নিয়ে আসবে। প্রোফেসারের লেকচার শোনা হয়ে গেল। আর কিছু কানে ঢুকছে না। ঘণ্টা বাজতে রুচিরা বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবছিল, তাকে ফাঁকি দেবার জন্য উল্টো দিকের কোনো ট্রামে বা বাসে উঠে পড়বে কি না। কিন্তু ভিতর থেকে সায় মিলল না। তাতে কোথায় যেন নিজেরই লোকসান। আসে যদি, আর কিছু না হোক বাসে ওঠা আর বাস বদলানোর ধকলটা তো বাঁচে।

যুনিভার্সিটির গেটের বাইরে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিচিত হর্ন। রুচিরা বিষম চমকে ঘুরে তাকাল। আজ একেবারে যুনিভার্সিটির ফুটপাথ ঘেঁষেই জীপ নিয়ে অপেক্ষা করছে। হাসছে।

রুচিরা থমকে দাড়াল একটু। চোখে চোখ। হঠাৎ হাসি পেয়ে যাচ্ছিল তারও। কিন্তু হাসল না। এমন মুখ করে জীপে গিয়ে উঠে বসল যেন ওরই জীপে ড্রাইভার গোছের কেউ অপেক্ষা করছে। ভিড়ের মধ্য দিয়ে সুপটু হাতে চালাতে চালাতে হৃষ্টমুখে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, আজও আসব, ভাবনি তো?

—ভেবেছি। তোমার কেমিক্যাল কারখানা কি এদিকে নাকি?

হেসে উঠল।—আমার কারখানা উল্টোদিকে, এখান থেকে বারো মাইল দূরে—সেই যাদবপুর ছাড়িয়ে গড়িয়ার কাছাকাছি।

—তেলের অভাব নেই বোঝা যাচ্ছে।

ইন্দ্র ব্যানার্জী আরো হাসতে লাগল।—এই দিনে আবার তেলের অভাব। একটু তেল দেবার জন্য গৌরী সেনরা সব বসেই আছে।

—বেশ। এ-রকমটা সপ্তাহের মধ্যে ক'দিন চলবে?

—এ-রকমটা মানে?

—এই বারো মাইল ঠেঙিয়ে এসে আমার ট্রাম-বাসের ধকল বাঁচানো?

গম্ভীর মুখেই একটু হিসেব করে নিল।—সপ্তাহে দু'তিন দিন আমাকে চৌরঙ্গীর দিকে আসতেই হয়।

ছদ্ম গাম্ভীর্যে একটা নিশ্বাস ফেলল রুচিরা।— মাত্র!

ইন্দ্র ব্যানার্জী সকৌতুকে ফিরে তাকাল একবার।—বল তো বাকি ক'দিন কারখানার ড্রাইভারকে দিয়ে জীপ পাঠিয়ে দিতে পারি।

রুচিরা এবারে উৎসুক যেন একটু। ঘুরে তাকাল।—দু'তিন দিনই যথেষ্ট, এই দু'তিন দিনও শুধু ড্রাইভারকে পাঠানো যায় না?

ইন্দ্র ব্যানার্জী আবার ঘাড় ফেরালো তার দিকে। রুচিরা হেসেই ফেলল।

বলতে গেলে বছরের মধ্যে ছ'মাসই ছুটি কলেজ-য়ুনিভার্সিটিগুলোর। সব মিলিয়ে বাকি ছ'মাসের মধ্যে সপ্তাহে দু'তিন দিন সত্যিই ইন্দ্র ব্যানার্জীর জীপে চেপে সে বাড়ি ফিরেছে। না, বাড়িতে নয়, সামনের ওই মোড় পর্যন্ত। কিন্তু পাড়ার অনেকের সেটা চোখে পড়েছে। য়ুনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েরা তো কিছু একটা ধরেই নিয়েছে। কিন্তু সত্যিই এই একটা বছরে ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো দিন কোনো রকম কথা-বার্তা হয়নি। মানুষটা কত যে বেপরোয়া এই একটা বছরে রুচিরা খুব ভাল বুঝে নিয়েছে। এ-রকম লোককে কথায় কৌতুকে বিদ্রূপে নাজেহাল করতে পারার মধ্যে বেশ একটা মাদকতা আছে। মেজাজ দেখালে রুচিরা ডবল মেজাজ দেখায়। ইন্দ্র ব্যানার্জী ওর দিকে চেয়ে হাসে। বলে, তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে।

রুচিরা জবাব দেয়, অদৃষ্টের হাত তোমার ইচ্ছেয় ঘুরবে না কোনোদিন।

কিন্তু এর বেশি কথা কখনো হয়নি।

এরপর সুশীতল চক্রবর্তীর ওই প্রস্তাব, আর রুচিরার প্রত্যাখ্যান এবং অস্বস্তি। সুশীতল যা বুঝে গেছে তার অনেকটাই যে সত্যি, রুচিরা সেটা অনুভব করে। কিন্তু সত্যি তো ইন্দ্র ব্যানার্জীর সঙ্গে এ-নিয়ে কোনো রকম ফয়সলায় আসেনি সে।

দু'দিন বাদে তার সঙ্গে দেখা। জীপ একটু ফাঁকায় আসতে রুচিরা জিজ্ঞাসা করল, সুশীতল চক্রবর্তীকে চেনো?

—না। সে আবার কে?

—য়ুনিভার্সিটির নাম-করা ছাত্র ছিল আগাগোড়া, এখন কলেজের প্রোফেসর। সম্পর্কে দিদির দেওর। বি. এ. পড়ার দু'বছর আমাকে বাড়িতে এসে পড়িয়েছে—

মুখে শঙ্কার ভাব এনে ইন্দ্র ব্যানার্জী জিজ্ঞাসা করল, বিনে পয়সায়?

—তাছাড়া আবার কি? এখনও পড়াচ্ছে।

—কি সর্বনাশ। তারপর?

—পরশুর আগের দিন সে এসে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল।

রুচিরা হঠাৎ সত্যি সত্যি গম্ভীর দেখল ইন্দ্র ব্যানার্জীর মুখ। জীপটা রাস্তার ধারে থামিয়ে দিতে দেখে আরো অবাক।

ইন্দ্র ব্যানার্জী জীপেই ঘুরে বসল তার দিকে।—লোকটার ঠিকানা কি?

—তার ঠিকানা দিয়ে কি হবে?

—ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে নিয়ে আসি।

রুচিরা হঠাৎ যেন ধাক্কাই খেল একটা। মানুষটা সত্যি-সত্যি ক্রুদ্ধ না ইয়ার্কি করছে তাই বোঝা গেল না। এবারে সেও ঝাঁঝিয়ে উঠল, ইস, মুরোদ কত, তুমি তার গায়ে আঙুল ছুঁইয়ে দেখ দেখি।

এবারে ঠাণ্ডা হল একটু।—তোমার সায় না থাকলে ছোঁয়ার না। তারপর কি দাঁড়াল?

—কি আবার দাঁড়াবে? মাঝখানে তুমি দাঁড়ালে।

এবারে উৎফুল্ল।—সত্যি?

রুচিরা হাসিমুখে মাথা নাড়ল। সত্যি।

আনন্দে জীপ হাঁকাল আবার। একটু ভেবে নিয়ে রুচিরা বলেই ফেলল, কিন্তু এ-ভাবে আর কতদিন চলতে পারে? তোমার মতলবখানা কি?

—আমার মতলব অনেকদিন ধরেই খারাপ। এম. এ. পরীক্ষার আগে তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো ঝুলে পড়ি এসো।

রুচিরা ধমকে উঠল, কথাবার্তার ছিরি কি। বাবাকে তো বলতে হবে।

—আজই চল। বলে ফেলি।

রুচিরা হেসে ফেলল। ভাল লাগছে। এই মানুষকে ভয়ানক ভাল লাগছে আজ তার। এরকম ভাল লাগার স্বাদ এই যেন প্রথম। মাথা নাড়ল, তোমাকে বলতে হবে না, আমি মাকে বলে রাখব, আমাদের বাড়ি থেকে তোমার বাবার কাছে প্রস্তাব গেলে তিনি যেন আকাশ থেকে না পড়েন—তাঁকে বলে রেখো। বুঝেছ?

—খুব বুঝেছি। তোমার আমার ব্যাপারের মধ্যে আবার বাবা-মাদের ধরে টানাটানি। ঠিক আছে—

জীপ হাওয়ায় ছুটেছে এখন। এক নাম-করা অভিজাত হোটেলের সামনে এসে থামল সেটা। রুচিরাকে নামিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। দিনটা সেলিব্রেট না করে আজ আর বাড়ি ফিরতে দিচ্ছে না তাকে, আগেই বলেছে। রুচিরা হাঁ করে দেখল, এখানকার কায়দা-দুরস্ত মানুষগুলো সব এই লোকের সুপরিচিত। কোট প্যান্ট টাই পরা একজন ছুটে এল। কি কথা হল রুচিরা জানে না। লিফটে করে দোতলায় নিয়ে গিয়ে সে তাদের ছোট্ট ফিটফাট গালচে বিছানো ঘরে এনে ছেড়ে দিল। ঘরে বড় বড় শৌখিন সোফা সেটি পাতা।

লোকটা চলে যেতে রুচিরা জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি?

—এখানে খাওয়াদাওয়া আর আনন্দ।

বলেই দবজাটা জোবে ঠেলে দিযে মানুষটা আচমকা যে আনন্দে মেতে উঠল তাব জন্য রুচিবা একটুও প্রস্তুত ছিল না।

ওব হাড-পাঁজবগুলোও যেন খসে খসে পডবে। ওই বুকেব সঙ্গে ওব বুক পিষে ফেলাব আগে যেন ছাডবে না। এমন চুমু খেযে চলেছে যে দম বন্ধ হওযাব দাখিল। গোটা দেহটা অবশ কবে ফেলছে। তাবপব পিঠেব ওপব অকরুণ দুটো হাতও যেন অবাধ্য হযে উঠছে।

শেষে প্রাণপণ চেষ্টায রুচিবা ছাডিযে নিল নিজেকে, দূবে সবে গিযে হাঁপাতে লাগল। মাথা ঝিম ঝিম কবছে তখনো। ইন্দ্র ব্যানার্জী হাসছে তাব দিকে চেযে।

—আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি—এই অসভ্যতা কবাব জন্য আমাকে এখানে নিযে এসেছ?

ইন্দ্র ব্যানার্জীব অবাক মুখ।—এব নাম অসভ্যতা?

আবাব এগোচ্ছে ওব দিকে।

—ভাল হবে না বলছি। আমি চলে যাব।

হাসতে হাসতে ইন্দ্র ব্যানার্জী একটা সোফায বসে পডল।

দেড মাসেব মধ্যে বিযেটা হযে গেল। বিযে ঠিক হবাব পব তাডা ছেলেব তবফেবই বেশি। কাবণ, ইন্দ্র ব্যানার্জীব বাবাব শবীব হঠাৎ বেশি বকম অসুস্থ হযে পডেছিল। ব্লাডপ্রেসাব সর্বদা টঙে উঠে থাকে। কখন কি হয ঠিক নেই, বিযে যখন হবে, আগেই হযে যাওযা ভাল।

এই দেড মাস সাগ্রহে একটি একটি কবে দিন গুনেছে রুচিবাও। এই দেড মাসেব অবাধ মেলামেশায রুচিবাব বাডিব দিক থেকেও কোনো আপত্তিব প্রশ্ন ওঠেনি। তাই এই সময়টুকুব মধ্যে লোকটাব পুরুষকাবেব ছটা আবও যেন অনেকগুণ বেশি চোখে পডেছে। তাব সঙ্গে তাদেব ক্লাবে গেছে, পার্টিতে গেছে, কংগ্রেসেব উৎসবে গেছে। ওই লোকেব সর্বত্র সমাদব। বড বড ঘবেব মেযেবা পর্যন্ত তাব পিছনে পিছনে ঘোবে, একটু তোযাজ তোষামোদ কবতে পেলে বর্তে যায। মদ খাওযা রুচিবা পছন্দ কবে না, দাদা চুপিচুপি মাঝেসাঝে খায টেব পায। কিন্তু মদ খাওযাব পব সকলেব যে মূর্তি, এব তা নয। মদ আব জল দুই-ই যেন সমান তাব কাছে। চোখ আব মুখ সামান্য লাল হয শুধু, আব কোনো বিকাব নেই, তাব পবেও দিব্যি গাডি হাকিযে বেডায ওকে নিযে।

এত সব রূপসী চটকদাব মেযে থাকতে এই লোক ওব মধ্যে কি দেখল রুচিবা সময সময ভেবে পায না। দেখে-শুনে মনে হযেছে, যাকে ডাকত সেই বর্তে যেত।

রুচিবাব দিন গোনাব আবো একটা কাবণ, ভয। এই মানুষেব বেপরোযা মতিগতিব কিছু বিশ্বাস নেই। অভিজাত হোটেলেব সেই ঘবে আবো একাধিক দিন ওকে নিযে গিযে তুলতে চেযেছে। রুচিবা সবাসবি বেঁকে বসতে অবুঝেব মতো বাগও কবেছে। সঙ্গে আবো ভদ্রলোক আব ভদ্রমহিলা ছিল বলে একদিন নির্ভযে গেছল। হোটেলেব

ওই ঘবটা যেন এবই দখলে। চাইলেই মেলে—ঘণ্টা দেড দুই খানাপিনা হৈ-হুল্লোডেব পব রুচিবা বেশ বুঝল চালাকি কবেই অন্য মেযে-পুরুষদেব জুটিগুলোকে একে একে বিদায দেওযা হচ্ছে। বিযেব তখন মাত্র আব ন'দিন বাকি। শেষ জুটি বিদায নিযে বেবোবাব আগেই রুচিবা উঠে পডল। যাবে। গম্ভীব মুখে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, বিল নিযে আসছে, মিটিযে দিযে বেরুচ্ছি, বসো।

তাবপবেই এগিযে গিযে চোখেব পলকে দবজাব লক টেনে দিল।

সেই একদিনেব মতোই ব্যাপাব শুরু হল তাবপব। কিন্তু শেষ কোন দিকে গডাচ্ছে, মতলবখানা কি রুচিবা স্পষ্ট বুঝতে পেবেছে। সেটা চোখেমুখে স্পষ্ট লেখা। কিন্তু এ-দিন আব অপ্রস্তুত ছিল না। জোব কবে বাব বাব তাকে ঠেলে সবিযেছে। শেষে বেগেই গেছে অবুঝ মানুষটা।

—কেন?

—না।

—না কেন, বিযেব তো ন'দিন মাত্র বাকি আব।

বাগ হযে যাচ্ছিল রুচিবাবও।—সেই কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে তো ওই ন'দিন আগে তুমি আমাকে ছোঁবে না পর্যন্ত বলে দিলাম।

—আচ্ছা, অবাধ্যতাব ফল টেব পাবে। প্রচণ্ড বাগ চেপেই ঘব থেকে বেবিযেছে ইন্দ্র ব্যানার্জী।

ন'টা দিন এবপব ভালয ভালয কেটেছে। বিযে হযে গেছে। কিন্তু ফুলশয্যাব বাতে ভিতবে ভিতবে বেশ একটু ধাক্কাই খেযেছে রুচিবা। ভিতবে ভিতবে মানুষটা সত্যি নিষ্ঠুব কিনা ভেবে পাযনি। ন'দিন আগেব সেই অবাধ্যতাব জবাব দেবাবই যেন বাত এটা। সাবাক্ষণ শিকাবীব মতো সময আব সুযোগেব অপেক্ষায ছিল যেন। সেটা মিলতেই ঝাঁপিযে পডেছে।

তাবপব এই দেহটা যেন শুধু তাবই বেপবোযা ভোগেব সামগ্রী। এব সঙ্গে আব কাবো যেন আনন্দেব যোগ নেই। ছিঁডে-খুঁডে একাকাব কবে দিযে মত্ত উল্লাসে বিস্মৃতিব অতলে ডুবে যাওযাব তাডনা। না বলেও পাবেনি।

এ বকম কবছ কেন? আমি কি ফুবিযে যাচ্ছি যে একেবাবে খেযে না ফেলা পর্যন্ত শান্তি নেই?

চোখে-মুখে সেই বকমই উল্লাস নিযে ইন্দ্র ব্যানার্জী সদর্পে বলেছে, আমাব কথা শোননি কেন? আমাব অবাধ্য হযেছিলে কেন?

রুচিবাব দিক থেকে প্রথম ফুলশয্যাব বাত ব্যর্থ গেছে।

মেজাজ-পত্র তাব ঠাণ্ডা হলে কি হত বলা যায না, মন বুঝে মানিযে নিতে চেষ্টা কবলে কি হত তাও বলা যায না। কিন্তু রুচিবাব মনে হত সে-ভাবে চলা মানে একজনেব ইচ্ছা-অনিচ্ছাব দাসী হযে থাকা। পবিচযেব গোডায যে-ভাবে ফোস কবে উঠত, এখনো তাব সেই মেজাজ। বিযেব আগে ইন্দ্র ব্যানার্জীব কাছে তাব এই মেজাজ একটা বড আকর্ষণ ছিল। বিযেব পবে বউযেব এই মেজাজ নিজেব একচ্ছত্র বশে আনাব অহংকাবে ঘা পডলে সেও কডা দাপুটেব মানুষ।

প্রথম পনেবো বিশটা দিন তৃষ্ণা যেন মাথায় চেপেই থাকল তার। বেপরোয়া সম্ভোগে কোনোরকম বাধা বরদাস্ত করার পাত্র নয়। কিন্তু মদ খেয়ে এলে রুচিরা সাফ বলে দিয়েছে, ও-সব খেয়ে এদিক ঘেঁষবে না। ব্যস, তারপর আরো বেশি খারে আর জোর করেই আরো বেশি ঘেঁষবে, দখল নেবে। তারও সাফ কথা, দেখো, আমার ইচ্ছেটাই সব, যখন যেমন চেয়েছি তেমনি হয়ে আসছে, আর তেমনি হবে। তুমি এটা মনে রাখলে ভাল, না রাখলে কিছু এসে যায় না, তবে তাতে তোমারই অশান্তি।

আর এক ব্যাপারে রুচিরা গোড়াতেই সাবধান করে দিয়েছিল। এম. এ. ফাইনাল পরীক্ষার আগে কোনো ছেলেপুলে নয়। তারও সাফ জবাব, ও তোমার ব্যাপার তুমি ভাববে, সাবধান হতে হয় নিজে হবে—ওসব আমার কোষ্ঠীতে লেখা নেই।

গোড়া থেকেই বুকের তলায় ঘা পড়ছিল রুচিরার। কিন্তু এখনো সে ভাবতে চায় না জীবনের সব থেকে বড় ব্যাপারে সব থেকে বড় ভুলটাই সে করে বসেছে। কিন্তু সে-রকম কোনো গণ্ডগোল দানা বেধে ওঠার আগেই বাড়ির কর্তা অর্থাৎ রুচিরার শ্বশুর হঠাৎ বেশিরকম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন আবার এই ছেলের মতি-গতি অন্যরকম দেখল। রুচিরার বাবার তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু শ্বশুরের তাতে আপত্তি। ছেলে দু'হাতে পয়সা খরচ করে হাসপাতালের সমস্ত সুব্যবস্থা বাড়িতেই করে ফেলল। শাশুড়ী অনেককাল আগেই গত হয়েছিলেন, রুচিরা ভিন্ন বাড়িতে আর দ্বিতীয় মেয়েছেলে নেই। চব্বিশ ঘন্টার জন্য দুজন নার্স রাখা হল, আয়া রাখা হল। রোগীর অবস্থা যত ঘোরালো হয়ে উঠছে, ইন্দ্র ব্যানার্জীর মনের অবস্থাও তত খারাপ হচ্ছে। দিন-রাত বাপের কাছে বসে থাকে, কারখানায়ও যায় না। পাগলের মতো সাত বার করে রুচিরার বাবার কাছে ছোটে। বাবাকে সারিয়ে তুলতেই হবে—আর কি করা যায়?

সেদিন তো রুচিরার সামনে ওর বাবাকে ধমকেই উঠল প্রায়, একটুও তো সুবিধের দেখছি না, আরো বড় ডাক্তার কে কোথায় আছে ডাকুন।

এই রোগে রুচিরার বাবাই নামজাদা স্পেশালিস্ট। কিন্তু জামাইয়ের মানসিক অবস্থা দেখে কোনো অভিমান না রেখে ভদ্রলোক আরো দুজন নাম-করা ডাক্তার নিয়ে এলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না শেষ পর্যন্ত। ওদের বিয়ের আড়াই মাসের মধ্যে শ্বশুর চোখ বুজলেন।

...এই দাপটের ছেলেকে তখন বাপের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে দেখেছে রুচিরা। একেবারে অসহায় বাচ্চা ছেলের মতো কান্না। রুচিরাই তখন সান্ত্বনা দিয়েছে তাকে। টেনে তুলতে চেষ্টা করেছে। ওই লোক তখন অকারণে রাগ করলে বা বিরক্ত হলেও ওর সহিষ্ণুতায় ফাটল ধরেনি।

কিন্তু মানুষের চরিত্র যাবে কোথায়? আবার দু'মাস যেতে-না-যেতে যে-কে সেই। বাবা ঘরে থাকার দরুন ঘরে যেটুকু সংযম ছিল সেটুকুও গেল। আবার খটাখটি বাধতে লাগল। রুচিরা যদি চুপচাপ দেখে যায়, যা বলে প্রতিবাদ না করে শুনে যায়,তাহলে হয়তো কোনো গোল থাকে না। কিন্তু অন্যায় দেখলে বা স্নায়ুতে ঘা খেলে রুচিরাও যুঝতে ছাড়বে না। যা বলার সোজাসুজি বলে দেবে। কিন্তু বাধা পেলেই মানুষটার

ভিতবে যেন কি বিষেব ক্রিযা শুরু হযে যায। অন্যায বা জুলুম বুঝলেও জোব কবেই তা কববে। সব কিছুই তখন যেন একটা চ্যালেঞ্জেব ব্যাপাব হযে যায। উল্টে শাসায, কাবো বাবাব ধাব ধাবি না, ভাল না লাগে চুপ কবে থাক, মাস্টাবি কবতে এসো না।

রুচিবাব ধাবণা, ও পছন্দ কবে না বলেই বন্ধুবান্ধব নিযে বাড়িতে বসেই এক-এক সন্ধ্যায মদ গেলে এখন। বাগ কবে রুচিবা বাপেব বাড়ি চলে এলে দস্তুবমত শাসায, এ-ধবনেব অবাধ্যতা ববদাস্ত কবাব ধাত নয তাব। সেই মত্ত অবস্থাতেই এক-এক বাতে জোব কবে দখল নিতে আসে। নেযও। ও কিছুতে আপত্তি কবলেই সেটা আবো বেশি কবে কবাব দুবন্ত ঝোঁক চাপে লোকটাব। এমন কাণ্ড কবে যে রুচিবাব মাথা খাবাপ হবাব দাখিল এক-একসময।

তাব স্তাবকেব সংখ্যা আবো অনেক বেড়েছে। আড্ডায বসে গেলে কাবখানা কামাই কবে। বলতে গেলে ঝাঁঝালো জবাব দেয, আমি কাবখানায যাই বা না যাই তোমাব তাতে কি?

অবশ্য রুচিবা যখন বলতে যায তখনো সেটা একেবাবে শ্লেষশূন্য হয না। এদিকে কোথা থেকে তাড়া তাড়া নোট আসছে, রুচিবা ভেবে পায না। ওড়াচ্ছে, ফূর্তি কবছে। কিছু বলতে গেলেই দাবড়ানি। কিন্তু বলাব যা রুচিবাও বলবেই। আবো খাবাপ লাগে যখন সাঙ্গোপাঙ্গব মাবফত একে-ওকে হুমকি দিযে পাঠায। রুচিবা বলে, এটা কি মগেব মুলুক নাকি?

সে হেসে জবাব দেয, মগেব মুলুক কিনা দেখছ না?

রুচিবাব ভিতবটা বিষিযেই যেতে থাকল। মনেব অবস্থা এমন দাড়াল যে সে-বছব আব তাব এম. এ. পবীক্ষাই দেওযা হল না। হেসে হেসে কাটা ঘাযে নুনেব ছিটে ছড়াল ইন্দ্র ব্যানার্জী। বলল, ভালই হল, এই বিদ্যেব ঝাঁঝেই অস্থিব আছি।

মেযে কেমন আছে রুচিবাব বাবা-মাযেব কাছেও সেটা গোপন থাকল না। একদিন জামাইকে এ নিযে দু'কথা বলতে এসে বাবা দস্তুবমতো অপমানিত হযে ফিবে গেলেন।

গোঁ ধবে বাতে এক-একদিন বাড়িই ফেবে না ইন্দ্র ব্যানার্জী। রুচিবা একদিন কটূক্তিই কবে উঠেছিল। জবাবে সে বলেছে, হোটেলেব সেই একটা ঘব তো তুমি চেনো, সে-ঘবে তোমাব আগেও মেযে এসেছে, এখনো আসে—বুঝলে?

শুনে রুচিবা স্তব্ধ। তখন থেকেই পবিত্রাণেব বাস্তব কথা ভাবতে লেগেছে কিনা বলা যায না। এব কিছু দিনেব মধ্যে শেষ ঘনাল সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপাব নিযে।

যে-বাড়িতে থাকে তাব ভাড়া মাসে ছ'শো। এখন এ-বাড়ি ছাড়লে ভাড়া তাব ডবল হবে। শ্বশুব থাকতে কখনো বাড়ি-ভাড়া বাকি পড়েনি। কিন্তু এখন চাব মাসেব ভাড়া বাকি। বাব কযেক লোক পাঠিযে বযস্ক বাড়িঅলা নিজে এসেছেন ভাড়াব তদবিব কবতে।

তাকে দেখেই ইন্দ্র ব্যানার্জী খাপ্পা—লোক পাঠিযে উত্যক্ত কবছেন, এখন নিজে এসেছেন ভাড়া আদায কবতে, কেমন? যান, দেব না—হিম্মত থাকে কোর্টে গিযে ভাড়া আদায কবুন।

শুকনো পাংশু মুখে ভদ্রলোক চলে যেতেই লজ্জায় অপমানে রুচিরা ঝলসে উঠল।—এ-সবের মানে কি আমি জানতে চাই। এদিকে টাকা ওড়াচ্ছ, ফূর্তি করছ, আর চার মাস ভাড়া দাওনি লজ্জা করে না? নিজে দোষ করে আবার ছোটলোকের মতো ভদ্রলোকের ওপর হম্বি-তম্বি করছ?

'ছোটলোকের মত' শুনেই ইন্দ্র ব্যানার্জীর মাথায় রক্ত উঠে গেল। মুখের সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। চোয়াল দুটো এঁটে বসল।—কি বললে?

—কি বললাম তুমি শোননি?

—শুনেছি। আর একবার বল তো?

—বললে তুমি কি করবে?

—একটা একটা করে ওই দাঁতগুলো খুলে নেব।

রুচিরা থমকাল। তক্ষুণি মনে হল, পারে। এও পারে।

দুপুরে সে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুচিরা নিজের ট্রাঙ্ক গোছাল। গয়নাপত্র সব বার করে নিল। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে সোজা বাপের বাড়ি।

তারপর দিন গেছে, মাস গেছে, একে একে দুটো বছর ঘুরেছে। ওই এক মানুষকে নিয়ে এই বাড়িতে, এ-বাড়ির রাস্তায় অনেক ঝড় বয়ে গেছে। হুমকি শাসানি আর শেষ পর্যন্ত বোমাবাজীর ভয় পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।

গোঁ রুচিরার বাবারও কম নয়। নামী ডাক্তার, পাঁচজন হোমরা-চোমরা মানুষ খাতির করেন তাঁকেও। তাঁদের সহায়তায় বোমাবাজীর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। বাড়িতে তবু বাড়তি দরোয়ান রাখতে হয়েছে। রুচিরাকেও একলা কোথাও বেরুতে দেওয়া হয়নি।

এদিকে কেস চলেছে। জোর ও-তরফেরও কম নয়। বিচ্ছেদের মামলা আনা হয়েছিল রুচিরা স্বামীর ঘর ছাড়ার পাঁচ মাস বাদে। কোর্টের রায় বেরুতে আরো ন-দশ মাস।

সব মিলিয়ে সাতাশ মাসের একটা অধ্যায় শেষ। এর পরেও হামলা হত কিনা বলা যায় না। কিন্তু দেশের হাওয়া বাতাবাতি বদলেছে। দিল্লীর শাসন-ক্ষমতা জনতার হাতে এসেছে গত মার্চের শেষে। এখানকার এতদিনের ডাকসাইটে পাণ্ডাদের মাথায়ও আচমকা বজ্রাঘাত ঘটে গেছে যেন। এপ্রিলের এই গোড়াতেই কোর্টের রায় বেরুল।

এক বছর বাদ গেছে, তার পরের বছরেই এম. এ. পাস করে ঘরে বসেছিল রুচিরা। এতদিন সাহস পায়নি, এখন একটা কাজ-টাজ দেখে নেবার ইচ্ছে। নইলে সময় কাটে কি করে?

কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর কোথা থেকে যে রাজ্যের ক্লান্তি এসে ছেঁকে ধরেছে তাকে কে জানে। কিচ্ছু ভাল লাগে না। ওই দাপটের মানুষের এখন আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেউ আর কেয়ার করে না তাকে। শুনেছে, বাড়িঅলাও এবার তার বিরুদ্ধে কেস ঠুকে দিয়েছে।

দিদিব আবাব মতলব, সুশীতলেব সঙ্গেই এবাব তাব বিযেটা হোক। এ-পর্যন্তও সে বিযে কবেনি। দিদি প্রাযই বোনেব মন বুঝতে আসে। কিন্তু রুচিবা কি বলবে? নিজেব মনেব হদিস নিজেই ভাল পায না।

সুশীতল চক্রবর্তী নিজেই এল একদিন। রুচিবাব হাঁস-ফাঁস্ দশা। কথা উঠলে কি বলবে জানে না।

কিন্তু নবম কবে সুশীতল যে-কথা বলল, এ-বকমটা শোনাব জন্যও প্রস্তুত ছিল না। বলল, দেখ তোমাব দিদিব একটা মতলব টেব পাচ্ছি। সেই জন্যই তোমাকে দুটো কথা বলতে এলাম, নইলে তুমি ভাববে হযতো আমাব ইচ্ছে বুঝেই তিনি এই মতলব কবছেন। কিন্তু আমি তোমাকে সত্যি কথা বলছি, আমি এতে বাজী নই আমাব মতো মানুষকে ভালবাসতে পাবলে তুমি আগেই বাসতে। তুমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস কবেই একজনকে ভালবেসে তাব ঘবে গেছলে। যা হযে গেল সেটা দুর্ভাগ্য, সেটা তোমাব ভালবাসাব দোষ নয। এই দুর্ভাগ্যেব সুযোগ নিযে আবাব আমি এগিযে এসে ভালবাসাব দাবী কবব—এটা বোধহয আবো বেশি ভুল হবে। আমি ববং প্রার্থনা কবব, যে ধাতেব মানুষকে তুমি ভালবাসতে পাব সে-বকম একজনকেই যেন পাও।

সুশীতলেব কথাগুলো অনেক ভেবেছে রুচিবা। প্রতিটি কথা যে সত্যি সে আব ওব থেকে বেশি কে অনুভব কবতে পাবে?

ডিভোর্সেব দেড মাসেব মধ্যে বাবা হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মাবা গেলেন। এতবড ডাক্তাব, নিজেব কোনো বকম চিকিৎসাব সুযোগটুকুও দিলেন না।

রুচিবাব আবো বুক ফেটে কান্না এল যখন জানতে পাবল বাবা এব আগেই ওব জন্য ভবিষ্যতেব কি ব্যবস্থা কবে গেছেন। তাব উইলে বাড়িব দু ভাগ দাদা আব দিদিব, একভাগ রুচিবা আব মাযেব। এ ছাড়া শুধু রুচিবাব জন্য ব্যাঙ্কে বেখেছেন নগদ দু লক্ষ টাকা। না, রুচিবাকে খাওযা-পবাব ভাবনা ভবিষ্যতে কোনোদিন ভাবতে হবে না।

কিন্তু দিন বাতই ভাবছে। বাবাব কাজ-কর্ম চুকে যেতে শোকতপ্ত মাকে নিযে বেশ কিছুদিনেব জন্য বাইবে বেবিযে পড়ল সে। কাবণ বাবা থাকতে মাযেব মুখেব একটা খেদ সে অনেকবাব শুনেছে। জীবনে এ-পর্যন্ত এক কলকাতা ছাড়া আব কোনো তীর্থেব জাযগা দেখা হল না। তীর্থেব টান রুচিবাব একফোটাও নেই, কিন্তু এখানে যেন দম বন্ধ হযে আসছিল তাব। মা তীর্থ করুক, ওব ঘুবে বেড়ানোটাই লাভ।

কাশী মথুবা বৃন্দাবন সেবে দিল্লী হযে হবিদ্বাবে এল তাবা। ফেবাব তাড়া কিছু নেই। প্রায দুটো মাস কেটে গেছে। হবিদ্বাবে দিন পনেবো থাকবে। মাঝে ঋষিকেশ লছমনঝোলা যাবে, দেবাদুন আব মুসৌবিটাও ঘুবে আসবে। রুচিবাব এই ভেসে বেডানোব মতো ব্যাপাবটা ভাল লাগছিল। তীর্থেব টান থাক না থাক, প্রকৃতিব সঙ্গে বুকেব তলায কোথায একটা বড যোগ আছে, সেটা বেশ অনুভব কবা যাচ্ছিল।

হবিদ্বাবে এসে মাযেব সঙ্গে যোগাযোগ একজনেব। লোকটা সাধু-সন্ন্যাসী কিনা জানে না। পবনে ধপধপে সাদা থান, গাযে সাদা ফতুযাব ওপব সাদা চাদব। লম্বা দোহাবা চেহাবা, গাযেব বং ফর্সা নয, তামাটে। মাথাব চুলে কদমছাঁট। দাড়ি-গোঁপ কামানো পবিষ্কাব হাসি-হাসি মুখ। বছব বত্রিশ-তেত্রিশেব মধ্যে বযেস।

প্রথম দেখা হব কী পিযাবীব ঘাটে। জনাকতক আধবযসী মেযে-পুরুষ ঘিবে দাঁড়িযেছিল তাকে। হাত নেড়ে হাসিমুখে তিনি সামনেব আছাড়ি-পিছাড়ি গঙ্গাকে দেখিযে কি বলছিলেন। এব মধ্যে নতুন যাবা আসছে তাবা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবছে তাঁকে। কে প্রণাম কবছে না কবছে ভদ্রলোক তাও খেযাল কবছিলেন না।

মাযেব সঙ্গে একটু দূবেব উঁচু ধাপে দাঁড়িযেছিল রুচিবা। কথা বলতে বলতে মানুষটিব হঠাৎ এদিকে চোখ পড়ল। দূব থেকেও রুচিবাব মনে হল চোখ দুটো ভযানক ঝকঝকে। আব তাব থেকে যেন একটু হাসিব আভাস ছিটকে বেবোয। রুচিবা অন্য দিকে মুখ ফেবাতে যাচ্ছিল। কিন্তু এবাবে মনে হল অপলক চোখে ভদ্রলোক এখন মাকে দেখছেন। তাকে ঘিবে যাবা ছিল, এই দেখাটা তাদেবও চোখে পড়েছে। তাবাও এ-দিকে ঘুবে তাকাচ্ছে।

তাদেব সবিযে মানুষটি হঠাৎ এদিকে আসতে লাগলেন। রুচিবা ভেবে পেল না কি ব্যাপাব। কাছে এসে হেসে মাকে বললেন, মাসিমা, চিনতে পাবেন?

মা হকচকিযে গেলেন। দূব থেকে আগে মা-ও একে দেখেছেন আব মস্ত কোনো সাধু-টাধু ভেবে বসেছিলেন। মাসিমা ডাক শুনে তাব হতচকিত হবাব কথাই।

উনি হেসে বললেন, চিনতে পাবলেন না তো, আপনাদেব কলকাতাব সেই উমাদিদিব ছেলে শঙ্কব—মনে পড়ছে না?

মাযেব সমস্ত মুখে যে বিস্মযেব আচড়গুলো পড়তে থাকল রুচিবা তা ঠিকই লক্ষ্য কবছে। মা যেন ঠিক ধবতে-ছুতে পেবেও পাবছেন না। তাবপবেই মনে পড়ল। ব্যগ্র মুখে বললেন, সেই ঈশ্বব গাঙ্গুলী বোডেব আমাদেব পিছনেব বাড়ির উমাদি? উমা চ্যাটার্জী?

হেসে মাথা নাড়লেন।—এবাবে চিনেছেন? দেযাল টপকে আপনাদেব বাড়ি গিযে কত দৌবাত্ম্য কবেছি, যখন-তখন খেতে চেযেছি, মনে পড়ে? আমি তো এই বাইশ বছব বাদেও আপনাকে দেখেই চিনে ফেললাম।

মাযেব মুখখানা যেন হঠাৎ ব্যাকুলতায ভবে গেল একেবাবে।—হ্যা বাবা চিনেছি—কিন্তু তুমি এখানে আছ, উমাদি জানেন? তুমি তাদেব সঙ্গে যোগাযোগ কবেছ? উমাদি কি এখনো ঈশ্বব গাঙ্গুলী বোডেব সেই বাড়িতেই আছেন?

মানুষটি হাসছেন। চোখ দুটো আশ্চর্য ঝকঝকে বটে। একবাব রুচিবাব দিকে তাকালেন। মনে হল ওই দুটো চোখেব একটা বিদ্যুৎ-তবঙ্গ বুঝি গাযে এসে লাগল। হঠাৎ কেন যে একটু অস্বস্তি বোধ কবতে লাগল রুচিবা জানে না।

—মা দু'বছব আগেই গত হযেছেন। আমি তখন বাইবে। আব সব ও-বাড়িতেই আছেন।

ব্যাকুল মুখে মা বলে উঠলেন, সেই বিশ বছব বযসে ঘব ছেড়ে চলে গেছলে, এতকালেব মধ্যে তোমাব মাযেব সঙ্গে আব দেখাই হল না?

—মা মাবা যাবাব সময আমি তাঁর কাছেই ছিলাম।

রুচিবাব মনে হল তাব মা যেন স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। একটা ব্যাপাবে একটু অবাকই লাগল। মা বলছেন বিশ বছব বযসে ঘব ছেড়েছে, আর ইনি একটু

আগে বললেন, বাইশ বছর বাদেও দেখেই মাকে চিনেছেন—মানুষটির বয়েস কি তাহলে বাইশ আর কুড়ি বিয়াল্লিশ এখন? মুখ দেখলে এর কাছাকাছি মনে হয় না।

রুচিরার মা বললেন, যাক, তবু তাহলে মাকে শেষ সময়ে শান্তি দিতে পেরেছ একটু। বলা নেই কওয়া নেই, বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে আর উমাদি একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেল—দেখে আমাদের চোখে জল আসত। মাকে এভাবে কষ্ট দিয়ে কি যে পুণ্য হয় আমি বুঝি না।

হাসিমুখেই মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। বললেন পুণ্য হয় না।

তার পরে ঘুরে তাকালেন রুচিরার দিকে। গভীর, একেবারে ভেতর দেখে নেবার মতো চাউনি। এমন যে, রুচিরার মনে হতে লাগল গায়ে যেন যথেষ্ট আবরণ নেই। একটু বাদে মায়ের দিকে ফিরলেন আবার। জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ের বিয়েটা বুঝি সুখের হল না?

শোনার সঙ্গে সঙ্গে রুচিরা চমকেই উঠল। মাও প্রথমে হতভম্ব, তারপরে ব্যাকুল।

—তুমি দেখে বুঝলে বাবা? তুমি সেই শঙ্কর—না কোনো মহাপুরুষ তুমি?

হাসছেন।—আমি মহাপুরুষ টুরুষ কিছু নই মাসিমা।

—না না। ও-সব আমি শুনছি না, তুমি সব জান, সব বুঝতে পার নইলে তুমি জানলে কি করে? তুমি বল ওর কি হবে? ওর অদৃষ্টে কি আছে? ওর কথা ভাবলে আমার প্রাণটা একেবারে শুকিয়ে যায়।

এর মধ্যে একজন লোক এসে তার কানের কাছে মুখ এনে কি বলতে মাথা নেড়ে তিনি আবার মায়ের দিকে ফিরলেন।—আপনি বিশ্বাস করুন মাসিমা, আমি কিচ্ছু জানি না, ও-সব বিদ্যে আমার নেই। আমার ওখানে একদিন এলে খুশী হব। মিশনে লোক এসেছেন, এখন আমি যাই—

মিশনের নাম এবং হদিস বলে দিয়ে চলে গেলেন।

মা ব্যাকুল চোখে সেদিকে চেয়ে রইলেন।

ধরমশালার তিনতলায় একটা সুইট ভাড়া করে মাকে নিয়ে উঠেছিল রুচিরা। ঘরে ফিরে দু-চার কথায় মায়ের কাছে ব্যাপারটা শুনে নিল। উমাদি বলতে মায়ের সত্যি সম্পর্কের কেউ নয়। শঙ্করের বাবা ছিলেন উকিল, কিন্তু খুব পসার ছিল না। রুচিরার বাবা মা-ও তখন ঈশ্বর গাঙ্গুলী বোডে এক ছোট বাড়িতে থাকতেন। রুচিরার মনে থাকার কথা নয়, কারণ তার তখন মাত্র বছর তিন-চার বয়েস। সেই বাড়ির ঠিক পিছনে ছোট একটা ভাঙা পৈতৃক বাড়িতে উমাদি আর অনেকগুলো মেয়ে আর এই একটা ছেলেকে নিয়ে থাকতেন সেই উকিল ভদ্রলোক। এই ছেলেটা সত্যি খুব দুরন্ত আর খেয়ালী ছিল। রুচিরার মায়ের কাছে যখন-তখন আসত, খেতে চাইত। ওদের বিশেষ করে রুচিরাকে নিয়ে নাকি লোফালুফি খেলত। তাই দেখে রুচিরার বাবা নাকি একদিন খুব বকেও দিয়েছিলেন তাকে। শঙ্কর নিজের মাকে আর রুচিরার মাকেও এক-এক সময় বলত, বেশিদিন সে আর এ সংসারে থাকছে না—তার ভাল লাগে না। কিন্তু তার সে-কথায় কেউ কান দিত না। রুচিরার মা ভাবতেন অভাবের সংসারে ভাল খেতে পরতে পায় না বলেই এ সব কথা বলে।

কিন্তু বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে সত্যিই আর সে ঘরে থাকল না। দু-লাইনের এক চিঠিতে মাকে তার জন্য ভাবতে বারণ করে কোথায় যে চলে গেল কেউ জানে না। ভালমানুষ উমাদির অনেকগুলো মেয়ে আর ওই একটাই ছেলে। সে পাগলের মতো হয়ে গেল। এর বছর দেড়েকের মধ্যে রুচিরার বাবা-মা ও-বাড়ি ছেড়ে অন্য বড় বাড়িতে উঠে আসেন। আরো বছর দুই-তিন যাতায়াত ছিল। কিন্তু তখনো উমাদি ছেলের কোনো খবর পায়নি। এরপর রুচিরার বাবা এখনকার এই বাড়ি করে উঠে আসেন। তারপর থেকে আর যোগাযোগ ছিল না।

রুচিরার মায়ের মনে কি আশা কে জানে। পরদিনই বিকেলে সেই মিশনের উদ্দেশ্যে ছুটলেন। রুচিরার সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। মাকে একলা ছেড়ে দেওয়া যায় না। দেড় মাইলের মধ্যে সেই মিশন। টাঙ্গাঅলাকে বলতে সে-ই নিয়ে গেল। বিরাট এলাকা, বিশাল ব্যাপার। সেখানে সাধন-ভজন ছাড়াও সেবাব্রত একটা বড় কাজ বোঝা গেল। ভিতরে ডিসপেনসারি, হাসপাতাল। পয়সা দিয়ে পড়তে পারে না এমন ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাও আছে।

ঝকঝকে মস্ত একটা হলঘরে বক্তৃতার আসর বসেছিল। শঙ্কর চ্যাটার্জীর খোঁজ করতে ওদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। অনেক বিদেশীর সমাগম ঘটেছে সেদিন। আর বহু গেরুয়া-পরা সাধুও বসে। বিদেশীদের কারণেই হয়তো ইংরেজিতে বক্তৃতা করছেন শঙ্কর চ্যাটার্জী। বিশুদ্ধ উচ্চারণ বলার সাবলীল ভঙ্গি। সকলে একাগ্র মনে শুনছেন। ধর্মীয় দর্শনের কিছু একটা ব্যাখ্যা চলেছে। রুচিরার ভাল লাগছে। কান পেতে শুনতে এবং বুঝতে চেষ্টা করল সেও।

বক্তৃতার পরে মা সেদিন আর তাঁকে নিরিবিলিতে পেলেন না। কারণ এর পরেই তার অন্যত্র কোথায় যাবার কথা। তবু হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়ালেন একটু। মায়ের সঙ্গে পাঁচ-সাত মিনিট কথা বললেন। রুচিরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে। বার কয়েক ওকেও ঘুরে দেখলেন তিনি। কিন্তু রুচিরার সেই আগের দিনের গঙ্গার ঘাটের মতোই অস্বস্তি। তাকালেই ভদ্রলোক যেন বড় বেশি দেখতে পান। পুরুষের এই দেখাটাকে রুচিরা খুব যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারে না।

পরদিন সকালে টাঙ্গা নিয়ে মা একলাই চলে গেলেন সেখানে। রুচিরাকে ডাকতে সে স্পষ্ট বলে দিল তার ভাল লাগছে না। ঘণ্টা দুই বাদে মা ফিরে ওই লোকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সকালেও উনি কোথায় চলে গেছলেন বলে মায়ের ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেই সময় এক বুড়ো সাধুর সঙ্গে মায়ের অনেক কথা হয়েছে। তাঁর মুখে মা শুনেছেন, শঙ্কর চাটুজ্যে সাধু-টাধু কিছু নন কিন্তু এখানকার সব সাধুরাই তাঁকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। তাঁরা তাঁকে পরম সমাদরে ওখানে রেখেছেন, কখন হুট করে আবার চলে যান সেই ভাবনা সকলের। ভদ্রলোক টানা ষোল বছর বিদেশে কাটিয়েছেন। পৃথিবীর বহু জায়গায় ঘুরেছেন। এই আশ্রমের সঙ্গে তাঁর যোগ পাঁচ বছরের, তার মধ্যেও দু-বার কাউকে কিছু না জানিয়ে একবার এক বছর আর একবার ন'-মাসের জন্য কোথায় চলে গেছলেন। আধ্যাত্ম জগতের শিক্ষিত মানুষেরা এখানে এলে তাঁর কথা, তাঁর ব্যাখ্যা শোনার জন্য ছুটে আসেন। সেই জন্যেই সপ্তাহে একদিন

করে এক একটা বিষয়ের ওপর তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। আগের দিন সেই বক্তৃতাই তারা শুনে গেছল। অন্যান্য দিন এখানকার সাধুদের তিনি এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা করে দেশ-বিদেশের দর্শনশাস্ত্র পড়ান। সাধুরাও তাঁকে তেমনি ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন।

এর পর শঙ্কর চ্যাটার্জীর সঙ্গে মায়ের দেখা হয়েছে, এক ঘণ্টা ধরে অনেক কথা হয়েছে। তাঁর কথা শুনলে নাকি কান-মন জুড়িয়ে যায়। মায়ের মুখখানা আনন্দে বিহ্বল। ঠিক কোন প্রত্যাশায়, রুচিরা ঠাওর করতে পারল না। মা যে গলগল করে ওই লোকের কাছে মেয়ের সর্ব দুর্ভাগ্যের কথা বলে এসেছেন তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। ওর প্রসঙ্গে উনি নাকি হেসেই মাকে বলেছেন, আপনার মেয়ে আমাকে ঠিক পছন্দ করতে পারছে না তাই আসেনি।

রুচিরা কেন যেন তেতে উঠল হঠাৎ।—কি-রকম পছন্দ করতে হবে তাঁকে?

মা থতমত খেলেন। তারপর ধমকের সুরে বললেন, মহাপুরুষদের নিয়েও কি ভাবে যে কথা বলিস ঠিক নেই। বিকেলে তোকে নিয়ে যাব বলেছি।

—কেন? মহাপুরুষদের কাছ থেকে কি আশা কর তুমি? কি করবেন?

মা জবাব দিলেন, কেন রাগ করিস বুঝি না। মায়ের ভাবনা জানিস না?...এবা কত কি দেখতে পায়, বোঝে. হয়তো তোর ভাল হবে এমন কিছু বলে দেবে—নইলে এদের কাছে মানুষ ছুটে ছুটে আসে কেন?

রুচিরা আর কিছু বলল না। নিজের জ্বালায় রাগ করে। নইলে ওই লোকটি সম্পর্কে মায়ের মুখে শোনা বৃদ্ধ সাধুর কথাগুলো ভারি ভাল লেগেছে। সেদিনের বক্তৃতার অংশ মা হয়তো বোঝেনি, কিন্তু যেটুকু শুনেছে তাতেই ওর মনে দাগ পড়েছে। অসাধারণ কিছু আছেই ওই লোকের মধ্যে, নইলে এ-ভাবে কেউ জীবন কাটাতে পারে না। আশ্চর্য, আজ সেখানে যাবার জন্য দুপুর থেকে ও নিজেই কিরকম একটা তাগিদ অনুভব করছে। ওই লোকের চোখ দুটোকে কেমন ভয়-ভয় করে, আবার টানেও যে খুব সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বিকেলে একটুও আপত্তি না করে মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। আশ্রমের আঙিনায় পা ফেললে মনটা আপনা থেকে খুশী হয়। এখানে-ওখানে পরিচ্ছন্ন বাগান। গাছ-গাছড়া। মালি কাজ করছে, সঙ্গে দু-চার জন সাধুও। অদূরের হাসপাতালের দিকে সাধু আর লোকজনের যাতায়াত বেশি। এই পরিবেশের ভারী একটা আকর্ষণ আছে।

মা শঙ্কর চ্যাটার্জীর ঘর চেনেন। ওকে নিয়ে সোজা সেদিকে চললেন।

ভদ্রলোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একমুখ হেসে এগিয়ে এসে সমাদরে ওদের ঘরে নিয়ে এলেন। পরিচ্ছন্ন ঘর। দেয়ালে কোনো দেবদেবীর ছবি নেই। কাঠের চৌকির ওপর পাতলা শয্যা বিছানো। সামনে খান-দুই মোড়া।

মা রুচিরাকে বললেন, প্রণাম কর—

রুচিরা বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে গেল। ওই ঝকঝকে চোখে চোখ পড়তে ভদ্রলোক হেসেই বললেন, কেন ওকে ব্যস্ত করছেন মাসিমা—আপনি বরং আশ্রমটা একটু ঘুরে টুরে দেখে আসুন, অনেক দেখার আছে—আমি ততক্ষণ দিদির সঙ্গে একটু গল্প করি।—বোসো দিদি, তুমি বোসো—

'দিদি' শুনেই রুচিরার মনে হল মানুষটি যেন ওর মনের তলার কোনো সংশয়ের জবাব দিলেন। মা কিছু একটা আশা নিয়েই আশ্রম দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রুচিরা তাকাল তাঁর দিকে। সেই ঝকঝকে চোখ। হাসছেন। কিন্তু আপনা থেকেই এখন সমস্ত সংকোচ ধুয়ে-মুছে যাচ্ছে রুচিরার। মানুষটির চোখে মুখে হাসিতে যেন জাদু আছে। অদ্ভুত ভাল লাগছে।

এগিয়ে এসে প্রথমে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, তারপর মোড়ায় বসল।

চৌকিতে বসে শঙ্কর চ্যাটার্জী বললেন, তোমার মায়ের মুখে সব শুনলাম। বড় দুঃখের কথা। ভাল ভাবে এম. এ. পাস করেছ শুনলাম; কোনো মেয়ে-কলেজে কাজ-টাজ দেখে নাও না।

হঠাৎ একটু আগ্রহ নিয়েই রুচিরা বলল, আপনাদের এই সব জায়গায় আমরা কোনো কাজ-টাজ করতে পারি না?

হেসে বললেন, পার, কিন্তু তাতে অন্যের কাজ পণ্ড হবে।

—কেন? মেয়ে বলে?

শঙ্কর চ্যাটার্জী হাসিমুখে মাথা নাড়লেন। তাই।

এই সংস্রবে এটুকু সময়ের মধ্যে রুচিরা প্রায় মুখরা হয়ে উঠল কি করে জানে না। বলল, সাধুরা তাহলে কিরকম সাধু?

হাসছেন।—শরীর ধরলে কেউ সবটা সাধু নয়, আবার সবটা অসাধু নয়। যখন যার চাষ হয় সে বাড়ে। খাঁটি দুধও জলে ফেললে মিশে যায়, মাখন তুলে সেটা ফেললে জলে ভাসে। সাধুদের বেশির ভাগ মাখন হতে চাইছেন, হননি এখনো। হলে পরে ভয় থাকে না।

সহজ কথা। কিন্তু নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। রুচিরা তবু ফস করেই জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার কোন অবস্থা?

জোরেই হেসে উঠলেন শঙ্কর চ্যাটার্জী। বললেন, তুমি বড় সাদা মনের ভাল মেয়ে দিদি, তোমার এরকম বরাত হবার কথা নয়। আমি একটা রক্ত-মাংসের মানুষের ঢেলার বেশি কিছু নয়।

—রক্ত-মাংসের মানুষ হলে কেউ মাকে ছেড়ে পালায়?

হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, ওটা একটা নেশা। নেশায় পেয়ে বসলে কে আর বাপ-মা মানছে?

এই মানুষ নিজের প্রসঙ্গে কিছু বলবেন না রুচিরা বুঝে নিল। কিন্তু সত্যি ভাল লাগছে তার, হালকা লাগছে। বলল, মায়ের খুব বিশ্বাস আপনি আমার জন্য কিছু করতে পারেন, কিছু দৈব অনুগ্রহও পাইয়ে দিতে পারেন।

হেসে মাথা নাড়লেন।—না, আমি সে রকম ম্যাজিক কিছু জানি না।

—না জানলে আমার বিয়ে সুখের হল না, গঙ্গার ঘাটে আমাকে দেখেই সে কথা বললেন কি করে?

এবারে অবাক একটু। তার পরেই আবার হাসি।—ও, এই জন্যে তোমরা একটা কিছু ভেবে বসে আছ? বছর তিন সাড়ে তিন আগে মাকে দেখতে যখন কলকাতায়

গেছলাম, এক বাস্তায তোমাব দাদা সঞ্জযেব সঙ্গে হঠাৎ দেখা আমাব। সে চেনেনি, আমি চিনেছি। তাকে খবব জিগেস কবতে সে বলেছিল তোমাদেব দু বোনেবই বিযে হযে গেছে। তা আমাব পোশাক-আশাক দেখে সেও আমাকে তোমাব মতোই ভণ্ড-টণ্ড কিছু ভেবে সবে গেছল। তেমন পাত্তা দেযনি।

মানুষটাব সবলতা দেখে রুচিবা মুগ্ধ হল, আবাব লজ্জাও পেল একটু। সবল না হলে বিযে সুখেব হল না বলাব কৃতিত্বটুকু নিজেই নিত। আব লজ্জা পেল কাবণ, গঙ্গাব ঘাটে প্রথম দেখে সত্যিই অস্বস্তি বোধ কবেছিল। তবু জিজ্ঞাসা কবল, দাদাব মুখে বিযেব খবব শুনতে পাবেন, কিন্তু সুখেব হল না জানলেন কি কবে?

—এটা জানা যে সহজ সে এখন তুমি নিজে ভাবলেই বুঝতে পাববে। যাক, তোমাকে আমাব বড ভাল লেগেছে দিদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা কবব?

রুচিবা আবাব কেন একটু অস্বস্তি বোধ কবছে জানে না। মাথা নাডল।

—তোমাব মত মেযেও একটা লোককে ধবে বাখতে পাবল না, ফেবাতে পাবল না, এটা ভাবতে আমাব কষ্ট হচ্ছে। কেন পাবলে না? চেষ্টা কবেছিলে?

রুচিবাব ভিতবটা হঠাৎই তেতে উঠল।—তাকে জানলে আপনি এ কথা বলতেন না।

শঙ্কব চাটার্জী চুপ কবে বইলেন। কিন্তু মুখ দেখে মনে হল ঠিক অনুমোদন কবতে পাবলেন না যেন।

—আপনাব বিশ্বাস হল না?

—না।

রুচিবা প্রায তীক্ষ্ণস্ববে বলে উঠল, কেন? আপনি তাব কতটুকু জানেন?

—একটুও জানি না। শান্তমুখেই বললেন, কিন্তু সামনা-সামনি কাউকে দেখলে আমি তাব অনেকটা ভেতব দেখতে পাই। তাছাডা তোমাব মাযেব কাছেও অনেক কথা শুনেছি।...তুমি সোনাব মেযে। সোনা গডিযে গহনা কবা যায, আবাব ডাণ্ডা বানিযে তা দিযে ঘা দিলেও আঘাত লাগে। আমি ভাবছি সে-বকম কোনো ভুল হযে গেল কিনা।

কথাগুলি সুন্দব, কিন্তু একটা দুর্বল জাযগায আবাব ঘা পডল রুচিবাব। বলল, আপনি তাকে জানলে এ-কথা একবাবও বলতেন না।

এখন আব হাসছেন না। ঝকঝকে চোখ দুটো ওব মুখেব ওপব আটকে আছে। —বিযেব আগে ইন্দ্রব সঙ্গে কতদিন মিশেছিলে?

নামটা মাযেব কাছে শুনে থাকবেন। জবাব দিল, এক বছব।

—এই এক বছবে তাব মধ্যে যা দেখে তোমাব ভাল লেগেছিল, যা দেখে তাকে তুমি ভালবেসেছিলে—সেটা মিথ্যে হতে পাবে না। তোমাব চোখে পডা মনে ধবাব মতো তাব মধ্যে কিছু ছিলই—সেও মিথ্যে হতে পাবে না, একটু আগে তোমাকে বলছিলাম, শবীব ধবলে কেউ সবটা ভাল নয, আবাব সবটা মন্দও নয, যখন যেটা চাষ হয সেটা বাডে। তুমি ভালটা দেখেছিলে, মন্দটা দেখনি। সেই মন্দেব ছাযাটা দূব কবতে হলে অহংকাব আব অভিমান ছেডে তাবই ভালব আলোটুকু সব থেকে

জোবালো কবে তুলতে হয। আমাব ভুল হতে পাবে, তোমাব অভিমানে ঘা পডেছিল কিনা সে আমাব থেকে তুমিই ভাল জান। এব পবেও তুমি তাব মন্দটাই যদি একমাত্র সত্যি বলে ভাবো তাহলে তাব আবো দুর্ভাগ্য, তোমাবও আবো বেশি অশান্তি। কিন্তু ভাল স্বীকাব কবাব আব ভাল বড কবে তোলাব এমনি জোব যে সেটা পাবলে এখনো তোমাব সব শেষ হযে গেল আমি ভাবি না। কোনো কিছুবই শেষ বলে কিছু নেই।

রুচিবা আব কিছু বলেনি। কিন্তু ভিতবটা বিষাক্ত লাগছিল তাব। অথচ এই লোকেব সঙ্গে তর্ক কবাবও কেন যেন আব সাহস নেই।

রুচিবা মাকে নিযে বেবিযে পডেছিল জুন মাসেব মাঝামাঝি। এখানেও কংগ্রেস শাসন উৎখাত হযে বামজোটেব দল ক্ষমতায এসেছে। তখন সত্যিকাবেব আনন্দ হযেছিল তাব। দু'মাস বাদে অর্থাৎ আগস্টেব মাঝামাঝি কলকাতায ফিবল। সুস্থিব হযে দু'দিন না কাটতে দাদা-বৌদিব মুখে যে সুখববটা শুনল তাতে রুচিবাবও আনন্দে আটখানা হবাব কথা। ইন্দ্র ব্যানার্জীব সব দিক থেকেই ভবাডুবি হযেছে। তাব বাডিঅলা কেসে জিতেছে, কোর্ট-থেকে বকেযা ভাডা মিটিযে দেবাব হুকুম হযেছে। তাব ওপব বাডি ছাডাব কেস ঝুলছে। এদিকে নতুন সবকাব তহবিল তছরুপেব অভিযোগে তাকে থানায টেনে নিয়ে গেছে। আগেব সবকাবেব আমলে চল্লিশ হাজাব টাকা সে তাব কেমিক্যাল কাবখানা সম্প্রসাবণেব জন্য পেযেছিল। বলা বাহুল্য, সেটা তখনকাব সমযেব ধবা-কবাব ব্যাপাব। কিন্তু এখন ধবা পডেছে, সে টাকাব এক পযসাও সেই কাবখানায যাযনি, কাবখানাব বাকি অর্ধেকেব মালিক সেই টাকাপ্রাপ্তিব ব্যাপাব স্রেফ অস্বীকাব কবছে। এবং সেও পার্টনাবশিপ বাতিলেব ব্যবস্থা পাকা কবে এনেছে, কাবণ, সেখানেও ইন্দ্র ব্যানার্জীব নামে বহু টাকা ব্যক্তিগত ধাব হিসেবে লেখাপডা কবা আছে। তাতে ইন্দ্র ব্যানার্জীব সইও আছে। অনেক তদবিব-তদাবক কবে সে এখন জামিনে খালাস আছে। কিন্তু সুদ-সহ ওই চল্লিশ হাজাব টাকা সবকাবকে বুঝিযে দিতে না পাবলে তাব জেল অনিবার্য। চল্লিশ হাজাব দূবে থাক, চল্লিশ টাকা বাব কবাবও তাব মুবোদ নেই এখন।

শুনে সকলে ছেডে মা পর্যন্ত খুশী। ধর্মেব কল বাতাসে নডে। খুশী রুচিবাও হতে চেষ্টা কবেছে। কিন্তু কোথায যেন একটা কাঁটা খচ-খচ কবে বিঁধছে। শঙ্কব চ্যাটার্জীব সেই হাসি-হাসি মুখ আব ঝকঝকে দুটো চোখ আব তাব কথাগুলো চেষ্টা কবেও মন থেকে তাডাতে পাবে না। আগেও ওই মুখ ওই চোখ আব ওই সব কথা বাব বাব সামনে ভিড কবে এসেছে। কিন্তু রুচিবা আব কিছু ভাবতে চায না, সে-সব মন থেকে ঠেলে সবিযেছে।

এখন আব তাও পাবছে না।...শঙ্কব চ্যাটার্জী বলেছিলেন, একটা বছবেব মেলামেশাব মধ্যে ওব চোখে পডা মনে ধবাব মধ্যে কিছু ছিলই—সেটা মিথ্যে হতে পাবে না।...বলেছিলেন, তুমি সোনাব মেযে, সোনা গলিযে গযনা কবা যায, আবাব ডাণ্ডা বানিযে তা দিযে ঘা দিলেও আঘাত লাগে, আমি ভাবছি অভিমান-বশে সে-বকম কোনো ভুল হযে গেল কিনা।

...তিনি বলতে চেয়েছিলেন, সোনার স্পর্শ দিয়ে তার মন্দটা তুমি দূর করতে পারলে না কেন।

রুচিরা ভাবতে চায় না। কিন্তু ভাবনা আসছেই। আসছেই। তিনি বলেছিলেন, ভালটুকু স্বীকার করার আর ভালটুকু বড় করে তোলার এমনি জোর যে সেটা পারলে এখনো তোমার সবশেষ হয়ে গেল আমি ভাবি না।

...কিন্তু কি শেষ হয়ে গেল ভাবেন না তিনি? রুচিরার তাতে মনের প্রসারতা বাড়বে? আর কিছু না হোক শান্তি আসবে? ওই নির্মম দাম্ভিক লোকের মধ্যে ভাল দেখার মতো কি আছে? কি ছিল?

চকিতে এক অদেখা বিধবা মায়ের মুখ যেন চোখে ভেসে উঠল তার। ওর বান্ধবীর সে পিসিমা। যার ছেলেকে হত্যা করার জন্য গাড়িতে তুলে নিয়ে পালিয়েছিল। একটি লোক নিজের প্রাণের ভয়-ডর বিসর্জন দিয়ে বেপরোয়ার মতো সেই দুষ্কৃতকারীদের আড্ডায় হানা দিয়ে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে সেই বিধবা মায়ের ছেলেকে উদ্ধার করেছে ...জলপাইগুড়ির বন্যায় ত্রাণের সাহায্য করতে গিয়ে নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে একটি অতি-বৃদ্ধ প্রাণকে জীবনের আলোয় ফিরিয়ে এনেছে। ..অসুখে বিসুখে.এক গরিব বন্ধুর প্রাণের আশংকা দেখা দিতে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে বাবাকে প্রায় হুমকি দিয়েই ধরে নিয়ে গেছে চিকিৎসার জন্য। তারপর সেই অসুস্থ বন্ধুর মায়ের হাতে থোকে টাকা গুজে দিয়ে আসতে দেখে ফিরে এসে বাবা পর্যন্ত বলেছিলেন, লোকটার দরাজ অন্তঃকরণ সন্দেহ নেই...নিজের বাপের মৃত্যুতে ওই দাপটের লোককে বাচ্চা ছেলের মতো মাটিতে গড়াগড়ি করে কাদতে দেখেছে রুচিরা নিজের চোখে।

...শঙ্কর চ্যাটার্জী এ আপনি আমার কি করে দিলেন? এখন আমি কি করব?

দু'দিন পরে। গাড়ি করে দিদির বাড়িতেই যাচ্ছিল রুচিরা। ওই বাড়ির গেটের দিকে চোখ পড়তেই বুকের তলায় একটা অদ্ভুত মোচড় দিয়ে উঠল তার। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। পরনে আধময়লা পা-জামা, গায়ে আধময়লা গেঞ্জি। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। বিবর্ণ মুখ।

রুচিরা দেখল।

সেও দেখছে। ক্রুর খরখরে চাউনি।

গাড়িটা গেট পেরিয়ে যেতেই রুচিরা ড্রাইভারকে বলল, থামো।

গাড়ি থামতে নেমে এল। কাছে এল।

ইন্দ্র ব্যানার্জী এ-রকমটা ভাবেনি। চেয়ে আছে। চোয়াল দুটো এঁটে বসছে।

রুচিরা শান্ত মুখে বলল, আমি দু'মাসের ওপর এখানে ছিলাম না। তোমার শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।

—তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

—না।

—বল কি? কেন?

—কারণ, আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম।

হঠাৎ যেন একটু আশার আলো লাগল ইন্দ্র ব্যানার্জীর বিবর্ণ মুখে। তবু অবিশ্বাসভরে বলল, এখন? অনুকম্পার দরুন গাড়ি থেকে নেমে এলে?

—না, এখনো তোমার ভালই চাই।

—ভাল চাও? সত্যি তুমি ভাল চাও?

মুখের দিকে পরিষ্কার চেয়ে রুচিরা মাথা নাড়ল। চায়।

চোখে-মুখে আগ্রহ উপচে উঠল ইন্দ্র ব্যানার্জীর।—আমার এখনকার অবস্থা সব শুনেছ তুমি? জানো?

—জানি।

—তাহলে একটু ভিতরে আসবে? দুই-একটা কথা বলার ছিল...শুনবে?

রুচিরা চুপচাপ চেয়ে রইল কয়েক নিমেষ। ওই ব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে বুকের তলায় আবার মোচড় পড়ছে।

বলল, আমি শুনে কি করতে পারি জানি না। আমার এখন যাওয়া সম্ভব নয়, তুমি ইচ্ছে করলে আমার ওখানে আসতে পার। শুনব।

—কবে?

—কাল, পরশু—যেদিন তোমার ইচ্ছে।

আবার গিয়ে গাড়িতে বসল। দিদির ওখানে যেতে আর ইচ্ছে করল না। একটু ঘুরে-টুরে আবার বাড়ি ফিরে এল।

সমস্ত রাত ঘুম হল না রুচিরার। ভেবেছে। শুধু ভেবেছে।

...পরশু নয়, ওই লোক কালই আসবে জানে।

এল।

বাড়ির লোক, দাদা বউদি মা সকলেই বিরক্ত। ওকে দেখা করতে নিষেধ করল। রুচিরা বলল, আমি তাকে আসতে বলেছিলাম।

সকলে অবাক।

রুচিরা এল। ইন্দ্র ব্যানার্জী বসেছিল। উঠে দাঁড়াল।

—বসো।

ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, তুমি বসো।

রুচিরা বসল।—বল।

সোফাটা একটু কাছে টেনে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, আমি সত্যি বিশ্বাস করব আমাকে তুমি ভালবেসেছিলে?

—কি বলবে বল?

—সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার ভয়ানক দরকার। না পেলে আমার জেল হবেই। আমি জানি এ-টাকাটা তুমি ইচ্ছে করলেই দিতে পার। পার না?

—পারি।

—তুমি আমাকে এবারের মতো বাঁচাও রুচি, আমার আর কোনো পথ খোলা নেই। তুমি অনেক বড়, সব ভুলে এবারের মতো আমাকে রক্ষা কর। তারপর তুমি

কি বিচার করবে না করবে জানি না, কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, আমি ভাল হতে চেষ্টা করব, সৎ হতে চেষ্টা করব।

আগ্রহের আতিশয্যে সে উঠে দাঁড়াল। রুচিরা চেয়ে আছে। দেখছে।

—চেষ্টা করবে? চেষ্টা?

—রুচি, আমি কি বলতে চাই তুমি বুঝেছ। প্লীজ।

—টাকা না দিলে তোমার কত দিনের জেল হবে?

ইন্দ্র ব্যানার্জী থমকাল।—কম করে পাঁচ বছরের। কিন্তু টাকা তুমি দেবে না?

—না। অটল ঠাণ্ডা মুখ রুচিরার।—তুমি যে পুরুষ ছিলে সেই পুরুষ কখনো দয়া চায় না। দয়া দেখিয়ে কাউকে ফেরানো যায় না। আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম না শুধু, এখনো ভালবাসি। পাঁচটা বছর প্রায়শ্চিত্ত করে যদি এটুকু বুঝতে পার, তাহলে পাঁচটা বছরকে ভয় না করে জঞ্জালমুক্ত হয়ে এস। আমি যাকে ভালবাসি তার ভয় সাজে না। আমার কথায় যদি বিশ্বাস করতে পার, তারপর এস। টাকা পাবে, আমাকেও পাবে।

ইন্দ্র ব্যানার্জী আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নির্বাক হতভম্বের মতো চেয়ে রইল খানিক। তারপর ঝড়ের বেগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুচিরা নিস্পন্দের মতো বসে। স্থির, শান্ত।

সুলক্ষণা

পাঠক ধরে নেবেন না একটা গল্প লেখার তাগিদে বাইশ বছর বাদে শেষে হরির দুয়ারে এসে তার সঙ্গে হঠাৎ এভাবে দেখা হয়ে গেল। হরির দুয়ার বলতে হরিদ্বার। আর তার সঙ্গে মানে সুলক্ষণা দয়ালের সঙ্গে। খবরটা আমাকে দিয়েছিল ছেলেবেলার বন্ধু জয়ন্ত বক্স। নতুন বয়সের কালে কোনো রাজনীতির দলে ভিড়েছিলাম। হালকা গোছের ব্যাপার সেটা। তবু উৎসাহ আর উদ্দীপনা কম ছিল না। জায়গাটা এলাহাবাদ। সর্ব ব্যাপারেই বেশ নিরাপদ গোছের পটভূমি। শাসক দলের সব কাজে প্রতিবাদের ঝড় তুললেও গর্দান যাবার ভয় ছিল না। এমন কি হাজত বাসের ঝুঁকিও যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতাম। বেকার জীবনের স্বল্পমেয়াদী শৌখিন রাজনীতির অধ্যায় বললে যতটুকু বোঝায়। যুক্তির থেকে তর্কের ঝোঁক বেশি ছিল। শোনার থেকে শোনানোর।

জয়ন্ত বক্স সেই সময়ের আর সেই দলের অন্তরঙ্গ একজন। পেশার ক্ষেত্রে এখনো সতীর্থই বলা চলে তাকে। ইউ. পি-র এক নামী কাগজের হোমরাচোমরা সাংবাদিক। বছরে দু-একবার কলকাতায় আসে। তখন দেখা হয়। মন-খোলা গল্পও হয়। গেল মাসে এসেছিল। খবরের কাগজের মানুষ। প্রথমেই জোরদার খবর দেবার মতো করে বলল, মাঝে দিন কয়েকের জন্য হরদোয়ার বেড়াতে গেছলাম, সেখানে হর কী পিয়ারীর ঘাটে হঠাৎ তোমার সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা—

কার কথা বলছে বা কি বলছে ভেবে না পেয়ে আমি অবাক একটু।—আমার সুলক্ষণা। সে আবার কে?

চোখ পিটপিট করে জয়ন্ত বলল, ক্যা তাজ্জব কি বাত—এলাহাবাদেব সেই সুলক্ষণা দযাল—কৃষ্ণকুমারেব বোন—ভুলে গেলে? তোমার সেই ঝুমরি।

শোনাব সঙ্গে সঙ্গে আমার মগজেব মধ্যে একটা ওলটপালট কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। যার ফলে তখনো বোধ হয হাঁ করে চেযেই ছিলাম ওব দিকে। এবারে হালছাড়া গলায চোস্ত উর্দুতে জযন্ত বঙ্গ রসিকতা কুরে উঠল, কি বকম বসেব কাববাবী তুমি, যে মেযেব মন পাবাব জন্য আমাকে কাটতি দিযে গাযে আতব মেখে দু বেলা কৃষ্ণকুমাবের বাড়ি পলিটিক্স কপচাতে যেতে, আর হঠাৎ নিপাত্তা হযে যেতে যাব খোঁজে তামাম এলাহাবাদ চষে বেড়িযে শেষে আমাব গলা চেপে ধবলে—সেই পহেলী চিড়িয়াকে বেমালুম ভুলে মেবে দিলে।

ভুলিনি। বিস্মবণেব পলস্তবা পড়ে ছিল। শোনাব সঙ্গে সঙ্গে বাইশ বছবেব একটা ভাবী পর্দা চোখেব সামনে থেকে সবে গেছে। এক বাড়িব মেযে পুরুষ ছেলে বুড়ো সক্কলেব গাযেব চামড়া চোখে লাগাব মতো ধপধপে ফর্সা। সকলেব মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু উনিশ-কুড়ি বছবেব একটি মেযে। যাব গাযের বঙ ফর্সা নয। তা বলে কালোও ঠিক নয। কিন্তু বাড়িব লোকেব পাশে কালোই দেখাতো। বাড়িব মানুষেবা তাব গাযের বং নিযে খুঁতখুঁত কবত। কিন্তু সেই মেযেব আয়তপক্ষ্ম নিবিড় কালো চোখেব তাবায আমি যে আলো ঠিকবোতে দেখেছি, আব তাব সুচারু দুই ঠোঁটেব ফাঁকে যে অধবা-হাসিব ঝিলিক দেখেছি, এই খুঁতখুঁতুনিব কথা শুনলে বাড়িব মানুষগুলোকে আমাব অন্ধ মনে হত। কৃষ্ণকুমাব অবশ্য বলত, ঝুমরিব গাযেব বং একটু চাপা হলেও অমন রূপ কটা মেযেব হয। এবা সব মিথ্যে ভাবে, ওব খুব ভালো বিযে হবে আমি বলে দিলাম।

ঝুমবি বা সুলক্ষণা কৃষ্ণকুমাবেব মামাতো বোন। এ-বাড়িব সমাদবেব আশ্রিতা। বছর দুই আগে কলেজে পড়াব নাম কবে বাপেব বাড়িব সংস্রব ছেড়ে এলাহাবাদে পিসিব কাছে চলে এসেছিল। কলেজে পড়ছিলও। কিন্তু পড়াশুনায তেমন মতি আছে আমাব মতো নীবব ভক্তও সে-কথা বলবে না। কৃষ্ণকুমাব বলত, ঝুমবিব মাথা খুব, একটু পড়লেই ভাল বেজাল্ট কবতে পাবে, কিন্তু পড়তে ডাকলেই ওব গাযে জ্বব আসে—

যেটুকু বলত তাব থেকেও বেশি বিশ্বাস কবতাম আমি। ঝুমরিব মাথা খুব, বুদ্ধি খুব। এত বুদ্ধি আব এত মাথা বলেই যেন ওব নিযম কবে কৃষ্ণকুমারের কাছে বই নিয়ে বসাব দাযটাকে বড কর্তব্য ভাবতাম না। ওব নাম সুলক্ষণা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবটুকুই যেন তাই। আবার সুলক্ষণাব ভিতবটা যদি নদীব মতো খবস্রোতা হয় তাহলে ওই পোশাকী নাম ছেড়ে ঝুমবি নামটাই যেন সব থেকে মানায় ভাল। আমার চোখে ও আড়াল হলে সুলক্ষণা, সামনে এলে ঝুমবি।

বাড়ির লোকেব অবিবেচনা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণকুমাব ওব রূপেব কথা তুললে ঝুমবি মিটিমিটি হাসত আর আড়ে-আড়ে আমাকে লক্ষ্য কবত। আমার মুখ থেকে নীরব সমর্থন ভিন্ন কোনো বকম মন্তব্য আশা করত না। দু-একটা কটাক্ষেই বুঝে নিত ভিতবে ভিতরে কতগুণ বেশি সায় দিলাম। তারপর আবো বেশি মজা পেত যেন। চোখের

তাবায আব ঠোঁটেব ফাঁকেব হাসিব ছোঁযাটুকু আবো তীক্ষ্ণ মনে হত তখন। ফাঁক পেযে চাপা ঝাঁঝালো গলায ঝিলিক তুলে একদিন আমাকে বলেছিল, আমাব চেহাবা নিযে কৃষ্ণদাব তোমাব কাছে মাথা ব্যথা কেন—আমাকে ভেতো বাঙালীব কাছে গছাবাব মতলব নাকি!

জবাব হাতডে না পেযে হাসতে চেষ্টা কবেছিলাম। কিন্তু আমাব বুকেব তলায যে ঝড উঠেছিল সেও ওই মেযে ঠিকই আঁচ কবেছিল মনে হয।

কৃষ্ণকুমাবেব মনে মুখে লাগাম নেই। ঝুমবিব দুঃখেব খববও শুনিযেছে আমাদেব। আব একই প্রসঙ্গে নিজেব মামাবও কচ সমালোচনা কবেছে। মামাব শিক্ষা-দীক্ষা আছে, কিন্তু স্বভাব-চবিত্র ভাল নয। হৃদয বলেও কিছু নেই। মামীটা জ্বলে পুডে খাক হযে অকালে চোখ বুজেছে। বছব না ঘুবতে মামা একটা বাজে মেযেছেলেকে বিযে কবে ঘবে এনে তুলেছে। দুজনে মিলে মেযেটাকে নির্যাতন কবত। কিন্তু ঝুমবি মাযেব মতো মুখ বুজে সহ্য কবাব মেযে নয। স্কুলেব পবীক্ষা সাবা হতেই এক জামাকাপডে বাডি থেকে পালিযে এসেছে। এলাহাবাদ থেকে খবব যেতে মাবমুখী বাপ মেযেকে শাসন কবতে আব নিযে যেতে এসেছিল। সেই মামাকে কৃষ্ণকুমাব বলতে গেলে ঘাড ধাক্কা দিযেই তাডিযেছে। বাজনীতিতে কৃষ্ণকুমাব আমাব থেকে অন্তত ঢেব বেশি মাথা গলিযেছিল। টানা ছ'মাস জেলও খেটেছে একবাব। তাছাডা তখনো কাল বোগে ধবেনি তাকে। নীতিগত ব্যাপাবে সেই নবম-সবম মিষ্টি ছেলেটাব এক ধবনেব অনাপোস মেজাজ ছিল। গোঁ ছিল। ফলে আত্মীয পবিজনেবা বেশ সমীহ কবে চলত তাকে। মামা সেই যে প্রস্থান কবেছে আব কোনোদিন মেযেব খোঁজও নেযনি।

জযন্ত বঙ্গ খুব মিথ্যে ঠাট্টা কবেনি। সুলক্ষণাকে নিযে ওব সঙ্গে বেশ একটা বেষাবেষি ছিল আমাব। বলত, মনে ধবলেই বা ইউ পি-ব মেযেকে নিযে বাঙালীবাবুব কি আশা। সুলক্ষণাব সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখলে সামনে চোখ পিটপিট কবত, আডালে বিচ্ছিবি কবে হাসত। বাজনীতিব আলোচনায গলা চডালেই টিপ্পনী কাটত, ঝুমবি তো কাছেই বসে আছে, অত চেঁচিযে গলাব শিবা ফোলানোব কি দবকাব? ঝুমবিব অনুপস্থিতিতে চুপ মেবে গেলেও জযন্ত হুল ফোটাতে ছাডত না। বলত, মেঘ দেখলে তবে ময়ূব নাচে। শ্রীমতী কাছে না থাকলে বাঙালীবাবুব জিভ নডে না। কৃষ্ণকুমাবকে চুপিচুপি একবাব সতর্কও কবে দিতে চেষ্টা কবেছিল শুনেছি। ঝুমবিব ব্যাপাবে আমাব হাবভাব নাকি ভাল নয। কৃষ্ণকুমাব কানে তোলেনি। ঝুমবিকেই বলে দিযেছিল। সে-কথা শুনে ঝুমবিব কি বাগ। আমাকেই বলেছিল, ফাঁক পেলেই ও আমাকে কি জ্বালান জ্বালায তোমবা তাব খবব বাখো? কৃষ্ণদাকে বলি না বলে—

বললে খুশি হতাম। আমাব হাবভাব যা-ই হোক তাতে কোনোবকম নোংবামি ছিল না। তবু এ-কথা ঠিক, আচমকা অতবড একটা অঘটন ঘটে না গেলে ওই মেযেকে নিযে নিজেব বাডিব লোকেব সঙ্গে বড বকমেব কোনো বিদ্রোহেব সূচনা হত কিনা বলা যায না। ঝুমবিকে নিযে আমি সম্ভব অসম্ভব অনেক বকমেব কল্পনাব জালে জডিযে পডছিলাম।

কৃষ্ণকুমারের ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হয়নি। ঝুমরির ভালো বিয়ে হওয়া দূরে থাক, এ-ভাবে যে ও নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনতে পারে কেউ কল্পনাও করেনি। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই বিমূঢ় হয়ে গেছলাম আমরা। ও বাড়ির লোকেরাও। এ আশ্রয় ছেড়ে, বিশেষ করে কৃষ্ণকুমারের মায়া ছেড়ে হঠাৎ এক রাতে ও নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে—এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড কে ভাবতে পারে? কৃষ্ণকুমারের অবস্থা তখন ভাল নয়। কাল ব্যাধি। গলা দিয়ে প্রায়ই রক্ত ওঠে। ঝুমরির তার জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কৃষ্ণকুমারের বাবা ছিলেন গোঁড়া কবিরাজ। নাম যশও ছিল। গোঁ ধরে ছেলের কবিরাজি চিকিৎসাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর মতে আয়ুর্বেদের ওপর আর কোনো চিকিৎসা নেই। কৃষ্ণকুমারও তাই মেনে নিয়েছিল কিনা জানি না। নিজের চিকিৎসা নিয়ে বাপের ওপর কখনো কথা বলেনি। কিন্তু আমরা বলতাম। ঘর ছাড়ার দিন কতক আগেও ঝুমরি আমাদের ওপরেই ফুঁসে উঠেছিল, কৃষ্ণদাকে তোমরা এখান থেকে নিয়ে চলে যেতে পারো না? অন্য চিকিৎসা করাতে পারো না? কৃষ্ণদা মরতে চলেছে দেখেও বুঝতে পারছ না?

বুঝতে পেরেও আমরা কিছুই করিনি বা করতে পারিনি। কিন্তু ঝুমরি এ কি করল? তার কৃষ্ণদাকে পর্যন্ত এত বড় আঘাত দিয়ে চলে গেল! শোনার পরেও ও সত্যি কারো সঙ্গে স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে চলে গেছে এ কিছুতে বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। ক্ষেপে গিয়ে কৃষ্ণকুমারের বাবা বার বার বলেছে, রক্তের দোষ। রক্তের দোষ যাবে কোথায়! বাপ যেমন মেয়ে তেমন। কৃষ্ণকুমারের মা বেচারীর লজ্জায় আর অপমানে মাথা নীচু। রক্তের দোষ বললে তারও লাগার কথা। নিজের ভাইয়ের মেয়ে, রক্তের যোগ তার সঙ্গেও আছে। ঝুমরির খোঁজে আমার ছোটাছুটি আর হয়রানি দেখে কৃষ্ণকুমারও শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই বলেছে, কোথাও পাবে না, যেখানেই যাক ও নিজের ইচ্ছেতেই গেছে। শুনে আমি দমে গেছি, কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। ঝুমরির মধ্যে কোনো মন্দের ছিটেফোটাও আছে ভাবতে পারতাম না। হাসি খুশি বুদ্ধিমতী মেয়েটা প্রয়োজনে তীক্ষ্ণ হতে পারে, কঠিন হতে পারে, সেটা বুঝতে পারতাম। বাপের কারণে হোক বা যে-কারণেই হোক ওর ভিতরটা যে খুব সুস্থির নয় তাও অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু তা বলে ঝুমরির এমন মতি হবে, কৃষ্ণকুমার বললেও মন সেটা মেনে নিতে চায়নি। উল্টে বরং মনে হয়েছে বিপাকে পড়ে ঝুমরি হয়তো আমাকেই সব থেকে বেশি স্মরণ করছে। আমি আছি বলেই হয়ত তার উদ্ধারের প্রত্যাশা।

ফলে কৃষ্ণকুমার যা বলেছে সেটা আমাকে বিচলিত করলেও মনের সায় মেলেনি। সন্দেহটা প্রথমে যার ওপর ঘোরালো হয়ে উঠেছিল সে এই জয়ন্ত বক্স। ও যে রসিকতা করল তা অবশ্য করিনি। গলায় হাত দিইনি। তবে তার দিক থেকে গলদ কিছু থাকলে গলা যে কাটা যাবেই হারভাবে সেটা ওকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। বড়লোকের ছেলে। চটুল মতি। মুখের কথা খসালে ঝুমরির জন্য অনেক খরচ করত। প্রায়ই সিনেমা দেখাতে চাইত, রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে চাইত। ঝুমরি ওকে একেবারে যে বাতিল করত তা নয়, কিন্তু আড়ালে বলত, পাজির পা-ঝাড়া একটা। কিন্তু আমি যদি কখনো

বলি, ওকে প্রশ্রয় দাও কেন—ঝুমরি ফোঁস করে উঠেছে, বেশ করি, তোমার গায়ে জ্বালা ধরে কেন?

ঝুমরির চোখের আগুন আর ঠোঁটের হাসির এই রীতি। আর আমার চোখে এও তার রূপ। ও নিখোঁজ হবার পর জয়ন্তকে ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেক জেরা করেছি। আর আড্ডা দেবার ছলে কম করে পনের দিন কড়া নজরে রেখেছি ওকে। ওকে সঙ্গে করেই ঝুমরির খোঁজে এলাহাবাদ চষেছি।

জয়ন্ত রঙ্গকে বাতিল করার পর আর একটা বাজে লোককেও সন্দেহ হয়েছিল আমার। তার নাম মধু যাদব। বিহারের লোক। জীবিকার তাগিদে কেমন করে কৃষ্ণকুমারদের বাড়ি এসে জুটেছিল জানা নেই। ঝুমরি আসারও বছর দুই আগে থেকে ও-বাড়িতে ছিল সে। বয়সে আমাদের থেকে বছর তিনেক বড় হতে পারে। খাওয়া থাকা ছাড়া কৃষ্ণকুমারের বাবা সেই দিনে মাসে চল্লিশ টাকা মাইনে দিত ওকে। ফলে ঠিক চাকরের পর্যায়ে পড়ে না লোকটা। তবে বাড়ির লোক ফরমাশ করলে মুখ বুজে চাকরের কাজও করত। আর ঝুমরি বললে তো কথাই নেই। মুখের কথা খসালে গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে আসবে। আড়ালে আবডালে আমরা ঠাট্টা করতাম সীতা দেবীর হনুমানের মতোই সুলক্ষণার ভক্ত হনুমান মধু যাদব। শুনে ঝুমরিও হাসত খুব। কখনো বলত, দাঁড়াও বলছি ওকে।

লোকটার গায়ের জোর কখনো পরখ করে দেখার সুযোগ হয়নি। তবে দেখলেই মনে হত অসুরের শক্তি রাখে। ঝুমরি উসকে দিলে আমাদের ধড় থেকে মাথা ছিঁড়ে নেওয়াও ওর পক্ষে অসম্ভব নয় হয়তো। মিশকালো গায়ের রঙ। খুব লম্বা নয় আবার বেঁটেও নয়। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, ড্যাবডেবে দুটো চোখ। সে-চোখে পলক পড়তে দেখা যায় না বড়। মুখের দিকে চেয়ে থাকলে অস্বস্তি হয়। ওর মধু নাম একটা বিতিকিচ্ছিরি রসিকতা যেন।

ওর আসল কাজ কবিরাজির মালমশলা সংগ্রহ করা আর ওষুধ বানানোর ব্যাপারে কৃষ্ণকুমারের বাবাকে সাহায্য করা। বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে ওষুধের শিকড়-বাকড়, লতাপাতা, ফলমূল যোগাড় করে আনে। কোন জিনিসগুলো মনিবের বেশি দরকার এ ক' বছরে ভালই বুঝে নিয়েছে। ওর অপলক ড্যাবডেবে চাউনির কথা উঠলে কৃষ্ণকুমার হেসে বলত, ওর চোখ আছে, বাবা একবার যা ওকে দেখিয়ে দেয় সহজে ভোলে না। ঠিক চিনে নিয়ে আসে। কৃষ্ণকুমারের বাবা শুধু বিচক্ষণ নয়, টাকা-কড়ির ব্যাপারেও বেশ একটু হাত-টান আছে। তা সত্ত্বেও ভদ্রলোক সেই দিনে খাওয়া পরার ওপরে মাসে চল্লিশ টাকা মাইনে কেন ওকে দেন সেটা আঁচ করা যেত। বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মধু যা সংগ্রহ করে আনত সে-সব আর বাজার থেকে কিনতে হত না। ফলে অনেক সাশ্রয় হত। তারপর সেসব বাছাবাছি করে ধুয়ে শুকিয়ে গুঁড়িয়ে পিষিয়ে কবিরাজ মশায়ের হাতের কাছে এনে মজুত করা কম ধকলের ব্যাপার নয়। কিন্তু মধু যাদব অনায়াসেই তা করত। যেন কলের মানুষ একটা যন্ত্রের মতোই খাটতে পারে।

এ-হেন মানুষের একটু রসজ্ঞানের পরিচয়ও আমরা পেতাম, আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতাম। সুলক্ষণা বা ঝুমরির গানের গলাটি ভাল ছিল। যেমন লোকই হোক,

গান-বাজনার প্রতি ঝোঁক ছিল ওর বাবার। মাস্টার রেখে মেয়েকেও একটু আধটু শেখাতে চেষ্টা করেছিল। এখানে আসার পর কৃষ্ণকুমার সে-ব্যবস্থা বাতিল হতে দেয়নি। সামান্য মাইনেয় তার খাতিরের এক বুড়ো ওস্তাদের বাড়ি গিয়ে ঝুমরি গান শিখত। মাঝে মাঝে ওস্তাদও বাড়িতে আসতেন। কৃষ্ণকুমারের বাবা ওই কটা টাকাই বাজে খরচ ভাবত। কিন্তু ছেলের ব্যবস্থা নাকচ করার সাহস তার ছিল না। এই গান শেখার ব্যাপারেও ঝুমরির খুব যে একটা নিষ্ঠা ছিল তা নয়। তবে ওর গলা মিষ্টি, আর গানের ঢংটুকু আমার চোখে অন্তত আরো মিষ্টি। মেজাজ এসে গেলে গান গাইতে গাইতে অল্প অল্প দুলত, কালো চোখের গভীরের হাসির ছোয়াটুকু তখন অদ্ভুত মায়াচ্ছন্ন মনে হত। ঝুমরির গানের সব থেকে সেরা আর নীরব ভক্ত ছিল বোধকরি মধু যাদব। বাইরের অন্ধকার দাওয়ায় একখানা পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ বসে থাকত। যতক্ষণ গান চলত ওর নড়াচড়া নেই। সে-সময় কেউ কোনো কাজের ফরমাশ করলে ও একদম কালা বনে যেত। নেহাত বাড়ির কর্তা বা কর্ত্রীর ডাক না পড়লে দাওয়া থেকে ওকে নড়ানো যেত না। আগে শুনেছি, ঝুমরির গানের সময় ও নাকি দরজার সামনেই এসে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। ঝুমরি নিষেধ করার পর আর দাঁড়ায় না। নিষেধ না করে উপায় কি, চোখের ওপর ও-রকম সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকলে ঝুমরির হাসি পেয়ে যায়।

ঝুমরি বাড়ি থেকে নিখোঁজ হবার মাত্র তিন সপ্তাহ আগে এই মধু যাদবকে বাড়ি থেকে তাড়ানো হয়েছিল। তার আগে দস্তুরমতো থানা পুলিস করা হয়েছিল ওকে নিয়ে। চুরির ব্যাপার। ঝুমরির হার চুরি। সে-চুরি ঝুমরি বলতে গেলে স্বচক্ষেই দেখেছে। ওর মায়ের হার। মায়ের স্মৃতি। ওটার ওপর যে ঝুমরির অত মায়া জানতাম না। আমার ধারণা মধুকে তলায় তলায় একটু স্নেহই করত ও। কিন্তু হার খোয়া যাওয়া আর প্রায় হাতে-নাতে ধরা পড়ার পরেও মধুকে অস্বীকার করতে দেখে ঝুমরি রাগে ঠক ঠক করে কাঁপছিল। দু চোখে আগুন ছুটেছিল। বাথরুম থেকে সবে স্নান সেরে বেরিয়েছে। হারটা খুলে তাকের ওপর রেখেছিল। ওটা ফেলে এসে নিজের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়াতেই চোখে পড়েছে গলায় হার নেই। তক্ষুনি আবার ফিরে আসতে দেখে বাথরুমে মধু কলের নিচে বালতি বসিয়েছে। মনিরের স্নানের জল রোদে দেবে। বাথরুমের দোরগোড়া থেকেই ঝুমরি দেখে তাকের ওপর হারটা নেই। ধরেই নিল, হার পড়ে আছে দেখে মধু তাকে দেবার জন্যেই নিয়েছে ওটা। হাত বাড়িয়ে বলেছে, দাও—

জবাবে মধু ড্যাব ড্যাব করে মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু।

বিরক্ত হয়ে ঝুমরি আবার বলেছে, কি হল, হারটা দাও?

এবারে মধু নিজে থেকেই ঘুরে দেয়ালের তাকটা দেখেছে। তারপর তার দিকে ফিরেছে। আবার অপলক চাউনি, মুখে কোনো রকম ভাববিকার নেই।

ঝুমরিকে সহিষ্ণু মেয়ে কেউ বলবে না। ঝাঁঝিয়ে উঠল, হাঁ করে দেখছ কি চেয়ে, ওই তাক থেকে তুমি হারটা তোলোনি?

মধু মাথা নেড়েছে। তোলেনি।

আব যায কোথায়। ঝুমবিব মাথায় বক্ত উঠে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, চালাকি পেয়েছ ? এক মিনিট হয়নি আমি ঘরে গেছি আব এসেছি, এব মধ্যে তুমি ছাড়া আব এখানে কে ঢুকেছে ? হাবটা আকাশে উড়ে গেল ? ভাল চাও তো এক্ষুনি দিয়ে দাও।

মধু আবাব মাথা নাড়ল। সে নেযনি, অথবা সে কিছু জানে না।

ক্ষিপ্ত হযে ঝুমরি পিসিব কাছে ছুটল। বাড়িতে এ-সময় ঝি-চাকব কেউ নেই। এব মধ্যে একমাত্র পিসী যদি বাথরুমে ঢুকে থাকে আর হাব তুলে থাকে। যদিও জানে তা হতে পাবে না, কাবণ পিসী তখন বান্নায় ব্যস্ত। মোটা শবীব নিযে তাব বান্নাঘব থেকে এ-পর্যন্ত আসতেই দু-চাব মিনিট লাগাব কথা।

যা ভেবেছিল তাই। পিসীও শুনে আকাশ থেকে পড়ল। বাগে কাঁপতে কাঁপতে ঝুমবি আবাব এদিকে ছুটে এলো। সেই সঙ্গে হাঁকডাক কবে আমাদেবও ডাকল। কিন্তু এটুকু সমযেব মধ্যেই বাথরুম ছেড়ে মধু হাওযা। সব শুনে আমবা স্তম্ভিত। বাড়িতে আব কাক-পক্ষী নেই। এক মিনিটেব মধ্যে ফিবে গিযে ঝুমবি ওকেই দেখেছে বাথরুমে। হারেব খোঁজ নেবাব সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তাকেব দিকেও তাকিযেছে বোকাব মতো। অর্থাৎ যেখানে হাব ছিল সেখানে আপনা থেকেই চোখ গেছে। আব ধবা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বালতি ফেলে ও নিখোঁজ। ও যে হাব নিযেছে তাতে আব সন্দেহেব কি থাকতে পাবে ? কিন্তু আমবা আবো হতবাক এই কাবণে, মধু শেষ পর্যন্ত ঝুমবিব জিনিস চুবি কবতে পাবে। এব থেকে অবিশ্বাস্য আব যেন কিছু নেই। আব ঝুমবিবও হযতো এত বাগ সেই কাবণেই। তলায় তলায় ওই লোকটাকে সে নিজের দাসানুদাস ভাবত। বাগে জ্বলে জ্বলে বাব বাব বলতে লাগল, এই চুবি একবকম স্বচক্ষেই দেখেছি আমি--যখন চাইলাম তখন হাব ওব কাছেই ছিল—বোকাব মতো মামীব কাছে ছুটে যেতেই হাব সবানোব জন্য ও চোখে ধুলো দিযে গেল।

বেশ একটা উত্তেজনাব হাওযা থিতিয়ে উঠল বাড়িতে। কৃষ্ণকুমাবেব বাবাও সব শুনে স্তম্ভিত। কৃষ্ণকুমাবও নির্বাক। মোট কথা, মধু এ-বকম কাজ কবতে পাবে কাবো কল্পনাব মধ্যেও ছিল না।

বেশি খোঁজাখুঁজি কবতে হল না। আধ ঘণ্টাব মধ্যে ও মূর্তি নিজেই এসে হাজিব আবাব। তেমনি ড্যাবডেবে চাউনি, ভাবলেশশূন্য মুখ। এ-বকম বিশ্বাসঘাতকতাব ফলে বাড়িব কর্তা অর্থাৎ কৃষ্ণকুমাবেব বাবারও অগ্নিমূর্তি। সে আসাব সঙ্গে সঙ্গে হুমকি দিয়ে উঠলো, হাব বাব কব।

মধু মাথা নাড়ল। নেযনি বা জানে না।

কর্তা ঠাস কবে একটা চড বসিযে দিল গালে।—নিসনি তো হার গেল কোথায় ? বাব কর শিগগিব।

কালো মুখে চড়ের লালচে দাগ পড়ে গেল। চুপচাপ কর্তাব মুখের দিকেই চেযে রইল সে।

কর্তা গর্জে উঠলো, এই আধঘণ্টা কোথায় ছিলি তুই ? কোথায় গেছলি ?

মধু জবাব দিল, দিদিমণি চোব বলাতে দুঃখ হল, তাই বাগানে বসেছিলুম।

এব মধ্যে আমবা ওব খোঁজে বাগানে ঘুবে এসেছি। এই মিথ্যেও হাতে-নাতে ধবা পড়ল। অব্যক্ত বাগে হাত আমাদেবও নিশপিশ কবছিল। কিন্তু আমাদেব চেঁচামেচিব জবাবে ও যে-ভাবে তাকাচ্ছিল এত বড অপবাধেব পবেও কি জানি কেন গাযে হাত তোলাব সাহস আমাদেব হল না।

কর্তাই আবো কটা চডচাপড বসালো, অনেক ভয দেখালো, ভাল কথায হাব ফেবত দিতে বললো, কিন্তু মধুব কানে তুলো, পিঠে কুলো। শেষে পুলিসে খবব দেওয়া হল। তাবা ওকে থানায ধবে নিযে গিযে তিন দিন আটকে বেখে অনেক জেবা কবল, মাবেব চোটে হাড গুঁডিযে দেবাব উপক্রম কবল, কিন্তু কবুল কবাতে পাবল না। ফলে ছেডে দিযে ওব ওপব চোখ বাখাব মতলব ফাঁদল তাবা। তখন সন্ধ্যা হয হয। বাডিব দাওযায না এসে মধু সোজা বাগানে নিজেব ঘবে গিযে ঢুকল। বাতে খেতেও এলো না। কেউ ডাকেওনি ওকে। পবদিন ভোবে ওব আব টিকি দেখল না কেউ। আবাব পুলিসে খবব গেল। কিন্তু পুলিসও তাব নাগাল পেল না।

মধু যাদবেব অধ্যায এখানেই শেষ। আব কখনো কেউ তাকে এলাহাবাদেই দেখেনি। মাযেব স্মৃতি ঝুমবিব সেই হাব খোযা যেতে আমাদেবও একটু দুঃখ হযেছিল বটে, কিন্তু ওই মূর্তি বিদেয হবাব ফলে এক ধবনেব স্বস্তি বোধ কবেছিলাম। লোকটা যেন জানত, অসুখেব দরুন কৃষ্ণকুমাবকে সঙ্গ দিতে আসা, বা বাজনীতি আলোচনাব লোভে এ-বাডিতে ছুটে-ছুটে আসাব লোভটাই সব নয, এ ছাডাও আবো কিছু বাডতি আকর্ষণ আছে। ভাবলেশশূন্য মুখে ড্যাবড্যাব কবে চেযে থেকে ও যেন এটুকুই ভাল কবে বুঝিযে দিত আমাদেব। এমনও মনে হযেছে, কখন না জানি টুঁটি টিপে ধবে সোজা যমেব দোব দেখিযে দেয।

এই লোক গেছে আপদ গেছে।

মধু যাদব বিদেয হবাব তিন সপ্তাহেব মধ্যে সুলক্ষণা উধাও। আগেব দিনও তাকে দেখেছি, কথা বলেছি। আমাদেব মনে এতটুকু খটকা লাগাব মতো কোনো কাবণ ঘটেনি। ওব হাব-ভাব আচবণেব কিছুমাত্র ব্যতিক্রম চোখে পডেনি আমাদেব। কেবল শেষেব দিন দশ-বাবো কৃষ্ণকুমাবেব সেবাযত্ন বেশি কবছিল। আব, একটা জলজ্যান্ত লোক বাপেব চিকিৎসাব দম্ভেব চোটে কোন খেযা পাডি দিতে চলেছে, অথচ আমবা চোখ কান বুজে বসে আছি—ইদানীং সেই ঝাঁঝেব কথাও একটু বেশি শোনা যাচ্ছিল। এব কোনোটাই ও-মেযেব ভিতবেব কোনো মতলবেব নজিব নয। তাই খববটা শোনাব সঙ্গে সঙ্গে আমবা হকচকিযে গেছি, দিশেহাবা হযেছি। কৃষ্ণকুমাবেবও একই বকম অবস্থা প্রথম। তাবপব হঠাৎ কি বকম যেন ঠাণ্ডা মেবে গেছে। বিবর্ণ পাংশু মুখ। তাব পাশে বসেই তাব বাবাব তর্জন-গর্জন শুনেছি। স্ত্রীব মানসিক অবস্থা দেখে ভদ্রলোকেব মেজাজ আবো বেশি তপ্ত। চিৎকাব কবে থেকে থেকে এক কথাই বলেছিলো।—কাব জন্য এমন হা-হুতাশ কবছ, কি জন্য খবব কবতে বলছ? যে মেযে এ-ভাবে মুখে চুন-কালি দিযে চলে গেল, খুঁজে-পেতে তাকে ধবে এনে আবাব ঘবে ঢোকাব? একেবাবে মুখ বুজে বসে থাকো, কেউ জিজ্ঞেস কবলে বলে দেবে বাপেব

বাড়ি চলে গেছে। গেছে কিনা তোমার ভাইকে একটা চিঠি লিখে দেখতে পারো। যাক না যাক, এখানে আর জায়গা হবে না এও পষ্ট করে জানিয়ে দিও।

এ-ঘরে বসে সবই শোনা যাচ্ছিল। বিমনার মতো কৃষ্ণকুমার আমার মুখের দিকেই চেয়েছিল। একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, ঝুমরি সেখানে যায়নি, যেতে পারে না।

কৃষ্ণকুমারের বিবেচনার ওপর আমার অটুট আস্থা। সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্ভাবনা আমিও বাতিল করেছি। আর তিন দিনের মধ্যে খবরও এসেছে ঝুমরি সেখানে নেই। সেখানে যায়নি। কিন্তু কৃষ্ণকুমারের বাবার কথার মধ্যেও সত্যের ছিটে-ফোঁটা আছে বলে ভাবিনি। নিজের এত বড় সর্বনাশ ঝুমরি স্বেচ্ছায় ঘটাতে পারে না। বড় রকমের অঘটনই ঘটে গেছে কিছু। চরম কোনো বিপদে পড়ে ঝুমরি হয়তো নিঃশব্দে আর্তনাদ করছে, হাহাকার করছে। ঝুমরির চোখে যে-আগুন জ্বলে, নরক-যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে দিবা-রাত্র এখন হয়তো সেই আগুনই জ্বলছে। কৃষ্ণকুমারের বাবার কথা শুনে উল্টে ভদ্রলোককে নির্মম নিষ্ঠুর মনে হয়েছে আমার। চেনা-জানা মুখগুলো আঁতিপাতি করে খুঁজেছি তারপর। কে হতে পারে? ঝুমরির এত বড় সর্বনাশ কে করতে পারে?

জয়ন্ত বঙ্গ খুব একটা জোরালো লোক নয়। কিন্তু বাপের টাকার জোর আছে। ঝুমরিকে ঘিরে ওর বাসনার আঁচও পেতাম। বাসনা বেপরোয়া হয়ে উঠলে মানুষ অমানুষ হতে কতক্ষণ। তাছাড়া এ-পর্যন্ত তার দেখা নেই কেন? এ-পর্যন্ত বলতে পরদিন এই সকাল পর্যন্ত। সব দিনের মতোই ঝুমরি খেয়েদেয়ে কলেজ গেছল। সেই কলেজ থেকে আর ফেরেনি। একটা রাত কেটে গেছে। পরদিন সকাল ন'টায় কৃষ্ণকুমারের কাছে এসে দেখি, নির্বাক বিবর্ণ মুখ। বাড়ির হাওয়া থমথমে। কিছু বোঝার আগেই কৃষ্ণকুমার বিড়বিড় করে বলেছে, ঝুমরি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, কাল কলেজ থেকে আর বাড়ি ফেরেনি।

খবরটা এমন আকস্মিক যে আমার বুঝতেই সময় লেগেছিল। ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকেই চেয়েছিলাম আমি। কৃষ্ণকুমার আবার বলল, কলেজে খোঁজ করা হয়েছিল, ঝুমরি কাল কলেজে মোটে যায়নি।

আমি হতভম্ব। বুকের তলায় ঠক-ঠক কাঁপুনি ধরেছিল। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ঘরে ফিরেছে কৃষ্ণকুমারের বাবা। গনগনে ধারালো মুখ। ছেলের মুখের ওপর একটা বিরক্তির ঝাপটা মেরে ভিতরে চলে গেছে। তারপর ভিতর থেকে ওই তর্জন-গর্জন শোনা গেছে।

ঝুমরি বাপের বাড়ি যায়নি, যেতে পারে না, কৃষ্ণকুমারের মুখে এ-কথা শোনার পর আর বেশিক্ষণ ওর কাছে বসে থাকতে পারিনি। জয়ন্ত বঙ্গর চপল মুখ বার বার চোখের সামনে এগিয়ে আসছিল। সাইকেল নিয়ে সোজা তার বাড়ি ছুটেছি। ধমনীর রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছে। আমার সবুজ পৃথিবী নিমেষে বর্ণশূন্য হয়ে গেছে। সেই রিক্ত আগুন-ঝরা পৃথিবীর এখন ভেঙে ফেটে চৌচির হবার প্রতীক্ষা শুধু।

কিন্তু দিন-কয়েক যেতেই বোঝা গেছে জয়ন্ত রঙ্গ নয়। ওর সেই সাহস নেই, সেই মেরুদণ্ড নেই। তারপরে আরো মনে হয়েছে, জয়ন্তর মতো ছেলেকে ঝুমরি

অনায়াসে নিজেই টিট করতে পারে। ওর ওপর দখল নিতে পারে এমন মরদ এই ছেলে নয়।

জয়ন্ত বক্সিকে বাতিল করার পরে চকিতে আর একটা সন্দেহ মনে এসেছে আমার। আর তক্ষুনি সেই সম্ভাবনাই অবধারিত মনে হয়েছে। এর ঢের আগেই ঝুমরির বাপের বাড়ি থেকেও খবর এসেছে সে সেখানেও যায়নি। তাহলে?

তাহলে মধু যাদব। একমাত্র সে ছাড়া কার আর এত বড় দুঃসাহস হতে পারে? হার চুরি দূরের কথা, আমার বদ্ধ ধারণা অনায়াসে ওই শয়তান মানুষও খুন করতে পারে। একটাও স্নায়ু কাঁপবে না, একটুও হাত কাঁপবে না। সে ভিন্ন বাড়ি ছাড়ার মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে এত বড় অঘটন ঘটে কি করে? এই পৃথিবীতে ঝুমরির ওপরেই তো সব থেকে বেশি রাগ তার। ওর জন্যেই পুলিস তাকে তিন দিন থানায় আটকে রেখে মার মেরেছে। সে মারের এ-রকম প্রতিশোধ একমাত্র ওই লোকই নিতে পারে। তা ছাড়াও আমার স্থির বিশ্বাস ঝুমরিকে নিয়ে প্রথম থেকেই খারাপ মতলব ছিল ওর। ঝুমরি যদি সীতা দেবী হয়, ও তার হনুমান নয়। রাবণ। এ-কাজ ওর ছাড়া আর কারো নয়।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আগুন জ্বলেছে। আবার অসহায়ও বোধ করেছি কেমন। ওই নৃশংস মানুষটার কবল থেকে ঝুমরির মুক্তির আশা দুরাশাই বুঝি।

...কিন্তু এ-সম্ভাবনার কথা কৃষ্ণকুমারের বাবা মায়ের মনে এলো না কেন? বিশেষ করে কৃষ্ণকুমারের মাথায় এলো না কেন? থানায় খবর দিয়ে মধুর নামে হুলিয়া বার করা হল না কেন? এখনো সময় আছে। কৃষ্ণকুমারের কাছে ছুটে এলাম আমি।

সন্দেহের কথা শুনে কৃষ্ণকুমার চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। এতটুকু উত্তেজনার আভাস না পেয়ে উল্টে অবাক। একটু বাদে ও ক্লান্ত স্বরে জবাব দিল, তা নয়, ঝুমরি নিজের ইচ্ছেতে অন্য কারো সঙ্গে চলে গেছে।

অবিশ্বাসের সুরে আমি জোর দিয়ে বলে উঠলাম, তুমি কি করে জানলে? এ হতেই পারে না—আমি এক্ষুনি থানায় গিয়ে যা করার করে আসি।

কৃষ্ণকুমার আবার খানিক চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ আমাকে নিষেধ করল। তারপর আস্তে আস্তে যে কথাগুলো বলল, শুনে ভয়ানক দমে গেলাম আমি।...সেদিন সকালে কলেজ যাবার আগে পর্যন্ত ঝুমরি নাকি প্রায় সারাক্ষণ কৃষ্ণকুমারের কাছেই ছিল। এগারোটায় কলেজ, সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত। তার সেবা-যত্ন করেছে, নিয়ম করে ওষুধ-পত্র খাওয়া আর সময়ে ঘুমনোর ব্যাপারে পাকা গিন্নীর মতো উপদেশ দিয়েছে। বেলা সাড়ে দশটার সময় উঠে গিয়ে সামান্য কিছু নাকে-মুখে গুঁজে কলেজ যাবার জন্য তৈরি হয়ে আবার ঘরে এসেছে। বলেছে, মাথাটা একটু তোলো দেখি—

কিছু না বুঝেই কৃষ্ণকুমার উঠে বসেছিল। বলা নেই কওয়া নেই ঝুমরি তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একটা প্রণাম সেরে নিল। অবাক হয়ে কৃষ্ণকুমার জিজ্ঞাসা করেছে, কি ব্যাপার রে, পরীক্ষা-টরীক্ষা কিছু নাকি?

ঝুমবি হেসেই জবাব দিয়েছে, দারুণ পবীক্ষা, জীবন-মবণ নির্ভব একেবাবে।

হাসতে হাসতে চলে গেছে।

বেদনা-বিবর্ণ মুখে কৃষ্ণকুমাব বলেছে ও আব ফিববে না এজনেই প্রণাম কবে গেছে আব ওই কথা বলে গেছে। তাবপব কৃষ্ণকুমাব ওব কলেজেব দুজন পবিচিতা শিক্ষযিত্রীকে ডেকে খবব নিযেছে। পবীক্ষা-টবীক্ষা কিছুই ছিল না সেদিন। তাদেব মুখ থেকেই শুনেছে, পাঁচ-সাতদিন আগে থেকেই মাঝে মাঝে ক্লাস পালানো শুরু কবেছিল ঝুমবি। ওই শিক্ষযিত্রীদেব একজনেব মেযে ঝুমবিব সঙ্গে পড়ে। সে নাকি তাব মাকে বলেছে, একটা মস্ত ঝকঝকে বিলিতি গাড়িতে একজনেব পাশে বসে ঝুমবিকে এখানে-সেখানে যেতে দেখেছে। কলেজেব অনেক মেযেই দেখেছে।

আমাব মুখে আব একটিও কথা সবেনি। কৃষ্ণকুমাবকে আব কোনো সান্ত্বনাব কথা বলতে পাবিনি। নিজেব বুকেব তলায যে কাটা ছেঁড়া চলেছিল তাও প্রকাশ কবতে পাবিনি। কৃষ্ণকুমাবদেব বাড়ি আসাই কমিযে দিযেছিলাম এব পব। একটা মেযে ঘব ছেড়ে চলে গেছে বলে নয, কৃষ্ণকুমাবেব মুখখানা বড় বেশি অসহায আব কৰুণ মনে হত। মেযেটা যেন ওব জীবনেব শেষ সলতেটা নিভিযে দিযে চলে গেছে।

বিতৃষ্ণা-ভবা একটা আক্রোশ নিযেই সেই মেযেকে আমি মন থেকে ছেঁটে দিচ্ছিলাম। কিন্তু মাঝেসাঝে চেনা-পবিচিত মুখেব মাবফত দু-একটা খবব কানে আসত। সুলক্ষণা দযালকে কখনো লক্ষ্ণৌব ওমুক অভিজাত হোটেলে দেখা গেছে, কখনো বেনাবসে কখনো বা আলমোড়ায। আমাব মনে হত, ওই বসেব খবব যাবা দিচ্ছে তলায তলায তাবা মুচকি মুচকি হাসছেও। আমাকে বিঁধতে চায। কিন্তু আমি আব বিদ্ধ হতে বাজি নই। কে সুলক্ষণা দযাল তাই যেন চট কবে মনে পড়ত না আমাব।

কিন্তু ঘব ছাড়াব ঠিক এক বছব দু' মাস বাদে এক বিজাতীয আক্রোশে ওই সুলক্ষণা দযালকেই মনে মনে সব থেকে বেশি খুঁজেছিলাম আমি। কৃষ্ণকুমাব মাবা গেল। শেষ নিঃশ্বাস ফেলাব আগে ওব শূন্য দু' চোখ একবাব ঘবেব মধ্যে চক্কব খেযে কাউকে যেন খুজেছিল। এব পবেই যদি সুলক্ষণা দযালেব দেখা পেতাম কোথাও, আব এ-খববটা যদি সকলেব আগে হেসে হেসে তাব কানে তুলে দিতে পাবতাম!

বাইশ বছব বাদে জযন্ত বঙ্গব মুখে আবাব সেই সুলক্ষণা-প্রসঙ্গ।

এবাবে গোড়ায হঠাৎ ঠাওব কবতে না পাবাটা ভনিতা কিছু নয। বাইশ বছবে গঙ্গায অনেক জল বযে গেছে, বুকেব তলাব অনেক নবম জাযগায শুকনো চড়া পড়ে গেছে। কিন্তু মানুষেব একটা বযেস চিবকালই বোধহয নিজেব অগোচবে কোনো এক জাযগায আটকে থাকে। বিস্মৃতিব পর্দাটা সবে যাওযাব সঙ্গে সঙ্গে সেই আগেব দিনেব মতোই নাড়াচাড়া খেলাম একপ্রস্থ। ভিতবটা উন্মুখ হযে উঠল।

হেসে একটা চোখ একটু ছোট কবে জযন্ত বলল, কত হবে বলো তো তোমাব ঝুমবিব বযেস এখন? কম কবে বিযাল্লিশ-তেতাল্লিশ না? কিন্তু এখনো বেশ মাইবি! আগেব থেকে সামান্য মোটা হযেছে, গাযেব বং এখন ফর্সাই বলতে পাবো, এক-পিঠ খোলা চুল, ইচ্ছে কবলে এখনো সেই আগেব মতো হাসতে পাবে—তাকাতেও পাবে।

শ্লেষেব সুবে জিজ্ঞাসা কবলাম, হবিদ্বাবে কি কবছে—জপ-তপ আব প্রাযশ্চিত্ত?

—তাই তো বলল। আমি খোঁজ নিতে দিব্যি হেসে জবাব দিলে, সব খুইয়ে আমার মতো মেয়েরা শেষে কাশী মথুরা বৃন্দাবন বা হরিদ্বার ছাড়া আর কোথায় এসে ঠেকবে?

কিন্তু খুব একটা প্রায়শ্চিত্ত করছে বলে জয়ন্তর মনে হয়নি। রসিকতার মেজাজটি এখনো নাকি দিব্যি আছে।

...জয়ন্ত বঙ্গর সঙ্গে সুলক্ষণা দয়ালের দেখা হয়েছিল বিকেলের হর-কী-পিয়ারী ঘাটে। সকালের দিকে সেখানে পুণ্যার্থীদের চিঁড়ে-চ্যাপ্টা ভিড়, বিকেলের দিকে হাওয়া-বিলাসীদের। জয়ন্ত বঙ্গ চুপচাপ দাঁড়িয়ে গঙ্গার শোভা দেখছিল, ছেলে-ছোকরাদের শিকল-ধরে গঙ্গায় হুটোপুটি খাওয়া দেখছিল। কোত্থেকে একজন মহিলা পাশে এসে বাঙ্গের বিস্ময় গলায় ঢেলে জিজ্ঞাসা করল, ও মা—বঙ্গ সাহেব না?

তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ চিনেছে, কারণ চেহারায় শুধু বয়েসের প্রসন্ন ছোঁয়া লেগেছে একটু—কিছুই খোয়া যায়নি।

অনেক কাল বাদে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে যেমন হয় তেমনি আনন্দ সুলক্ষণার। জয়ন্তকে ঘাট থেকে একটা নিরিবিলি দিকে টেনে নিয়ে গেছে। গঙ্গার ধারে দুজনে পাশাপাশি বসেছে। নিজের প্রসঙ্গে প্রায় কোনো কথাই বলেনি বা বলতে চায়নি। জয়ন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করলে মৃদু টিপে হেসেছে, আর শেষ বয়সে তাদের মতো মেয়েদের যে এ-সব জায়গাতে আশ্রয়—সেই কথাই বলেছে। কিন্তু সেই বলার মধ্যেও কোনো পরিতাপ ছিল না।

জয়ন্ত ঠাট্টা করেছে, শেষ বয়েস বলে তো একটুও মনে হচ্ছে না তোমাকে দেখে?

জবাবে হেসে ভ্রূকুটি করেছে সুলক্ষণা। বলেছে, এখনো তোমার চোখের দোষ। বোসো, নিজের এই চুলের বোঝা ছেঁটে ফেলব ভাবছি, তাহলে তোমাদের আর অসুবিধে হবে না।

নিজের কথা কিছু না বললেও বিশেষ করে আমার কথা নাকি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে সুলক্ষণা। কৃষ্ণকুমারের নামও মুখে আনেনি। এই থেকেই বোঝা গেছে সে-যে নেই সেটা ও জানে। জয়ন্ত বলল, তুমি লিখে নাম-টাম করেছ শুনে সুলক্ষণা যেমন অবাক তেমনি খুশি। তোমার বউয়ের কথা আর ছেলেপুলের কথা শুনতে চাইল—আমি আর কতটুকু জানি যে বলব।

আবার দেখা করার জন্য জয়ন্ত বঙ্গ তার হরিদ্বারের আস্তানার হদিস পেতে চেয়েছিল। ঘুরিয়ে সে-আবেদন নাকচ করেছে সুলক্ষণা। তরল জবাব দিয়েছে, ঠিকানা আর কোথায়, ঠিকানাই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি। যদি থাকো তো এই হর-কী-পিয়ারীর ঘাটেই দেখা হবে আবার।

আরো তিনদিন হরিদ্বারে ছিল জয়ন্ত বঙ্গ। তিনদিনই ঘাটে এসে ঘণ্টা-দুঘণ্টা করে অপেক্ষা করেছে। সুলক্ষণা দয়াল আর আসেনি। আর দেখা হয়নি।

জয়ন্ত বঙ্গ চলে যাবার পর এক মাস কেটে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই সুলক্ষণা দয়ালের কথা আবার ভুলেছি। এক মাস বাদে হঠাৎ দিল্লীতে একটু কাজ পড়ে গেল আমার। আর দু'দিনের মধ্যে সে-কাজও শেষ হয়ে গেল। আমার ফিরতি টিকিটের

তারিখে পৌঁছুতে মাঝে পাঁচটা দিন বাকি এখনো। এই পাঁচ-পাঁচটা দিন কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। দিল্লী আমার কাছে প্রায় কলকাতার মতোই পুরনো।

রাতের নিরিবিলিতে হঠাৎ সুলক্ষণা দয়ালের কথা মনে পড়ে গেল। আবার দেখা হওয়াটা ভবিতব্য ছিল বলেই হয়তো মনে পড়ল। ছেলেবেলার মতো এখন আর সে-রকম ভাবপ্রবণ তাড়না কিছু থাকার কথা নয়—ছিলও না। তাছাড়া মনের যে আসন থেকে সেই মেয়ে সরে গিয়ে প্রবৃত্তির পাতালে ডুব দিয়েছে—তারপর সে হরিদ্বারেই থাকুক বা মথুরা বৃন্দাবন করে বেড়াক—সেই আসনে আর সে কোনোদিন ফিরে আসবে না জানি। তবু তাকে আর একটি বার দেখার জন্য ভিতরটা কেমন উন্মুখ হয়ে উঠল।

দিল্লী থেকে সকালে হরিদ্বারের লাক্সারি বাস ছাড়ে। ভিড়ের সময় নয়, বাসের টিকিট পেলাম। বাস ন'টায় ছাড়ে, আড়াইটে তিনটের মধ্যে হরিদ্বারে পৌঁছয়।

বাসে বসেও অনেক বার মনে হয়েছে নেমে যাই। ফিরে যাই। বাইশ বছর আগের সব স্মৃতি বুকের তলায় আজও যে তেমনি তাজা আছে কে জানত? কেন যাচ্ছি, কি জন্যে দেখতে যাচ্ছি? একদিন যেমন চেয়েছিলাম তেমনি করে কৃষ্ণকুমারের মৃত্যুর ছবিটা মর্মান্তিক করে তোলার অকরুণ লোভে? না, সেই মেজাজ এখন আর নেই। আবার মন বলছে বওনা হয়েছি যখন যাওয়াই যাক না। সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা যে হবেই তার কি মানে। জয়ন্ত বক্সির সঙ্গে আর তো দেখা হয়নি। সে যে ইচ্ছে করেই ওকে নিজের বাড়ির হদিস দেয়নি বা আর এসে দেখাও করেনি, তাতেও আমার মনের তলায় বিস্ময়ের আঁচড় পড়েছে। প্রায়শ্চিত্তের তাগিদেই সে-যে হরিদ্বারে এসেছিল এই বা কে জোর দিয়ে বলতে পারে? প্রদীপের নিচেটাই তো অন্ধকার। পুণ্যস্থানে এ-যাবৎ পাপের মিছিলও আমি কম দেখিনি। দেখা হলে হবে, নয়তো দিন দুই একটু বেড়িয়ে আবার ফেরা যাবে।

কিন্তু এও জানি, এ-সবই আমার নিজেকে ভোলানোর চিন্তা। নিজের বিবেক একটু পরিষ্কার রাখার তাড়না। নইলে ভিতরে ভিতরে ওকে দেখার একটু ইচ্ছে যে ছিলই সেটা মিথ্যে নয়।

হরিদ্বার আমার মোটামুটি চেনা জায়গা। চেনা বলতে বেড়াবার জায়গাগুলো আর স্নানের ঘাট-টাটগুলো চিনি। কিন্তু বাড়ির হদিস বা ঠিকানা জানা না থাকলেও সেখান থেকে এক রমণীকে খুঁজে বার করতে পারব এমন ভরসা ছিলই না। একটা হোটেলে আস্তানা নিয়েছিলাম। তারপর সকালে বিকেলে ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে হাজিরা দিচ্ছিলাম। প্রথম বিকেলটা কাটল, পরের দুটো দিনের সকাল বিকেলও কাটল। হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে দুবেলা আমার দুটো চোখ অভদ্রের মতো মেয়েদের দিকে ধাওয়া করেছে। দেখা মিলল না। আর মিলবেও না ধরেই নিয়েছিলাম। কালকের দিনটা দেখে আবার দিল্লী ফেরার সঙ্কল্প। আমার বাইরেটা মোটামুটি নির্লিপ্ত। সুলক্ষণার দেখা না পেয়ে খুব হতাশ হয়েছি, নিজের কাছে সেটা স্বীকার করতেও সংকোচ। জায়গাটা ভালো। দেখা হলে আরো ভালো হত। হল না যখন কি আর করা যাবে। দু'-বেলা ওই হর-কী-পিয়ারীর ঘাটও একটা দেখার জায়গা, বেড়ানোর জায়গা। দুপুরের রোদ চড়া না থাকলে এখানে তিন-চার মাইল হেঁটে বেড়ানোর মধ্যেও আনন্দ আছে।

দেখা হল। পবদিন নয়, এই বিকেলেই। ঘণ্টাখানেক ঘাটে পাযচাবি কবাব পব নেমে সোজা একদিকে পা চালিযে দিযেছিলাম। সেটা কোন দিক আমি জানি না। বাস্তাটা নির্জন। ফাঁকায ফাঁকায এক-একটা ডেবা। হঠাৎ এক জাযগায এসে পা দুটো মাটিব সঙ্গে যেন আটকে গেল।

যে জাযগাব কথা বলছি, ঘাট থেকে কম কবে মাইল তিনেক দূবে। এখানে সন্ধ্যা নামে দেবিতে। সবে তখন বিকেলেব আলোয টান ধবেছে। চাবদিকে বাঁশেব বেডা দেওযা ছোট একটা আঙিনা। তাব এক প্রান্তে একটা টালিব দালান। তাব সামনেব প্রাঙ্গণে ঘাসেব ওপব বসে আছে পাঁচ-ছ'টি বমণী। নিজেদেব মধ্যে গল্প কবছে, কেউ কেউ হাসছে। ঠিক তাদেব পিছনেই দাওযাব ওপব যে বসে, তাকেই আমি খুজছি তাব জন্যেই দিল্লী থেকে এখানে আসা।

বেডাব বাইবে কোনো পুরুষ যদি দাড়িযে গিযে গুটিকতক মেযেকে দেখতে থাকে, সেটা চোখে পডতে সময লাগে না বোধহয। ঘাসেব ওপব যাবা বসেছিল, তাদেব বযেস অনুমান বাইশ চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ-পঁযত্রিশেব মধ্যে। আব এখান থেকে অন্তত সকলকেই বেশ সুশ্রী মনে হল আমাব। তাবাই প্রথম দেখেছে আমাকে। কাবণ আমি যাকে দেখছি তাব হাতে একখানা বই কি বাধানো খাতা বোঝা যাচ্ছিল না। তাব দৃষ্টি সেদিকেই।

মেযেগুলো নিজেদেব মধ্যে হযতো বলাবলি কবল কিছু। আগেও হাসছিল আমাকে দেখাব পবেব হাসিটা ভিন্ন বিষযগত কিনা জানি না। দুই-একটি বযস্কাব বেশ বিবক্ত মুখও দেখলাম। তাদেবই একজন মুখ ফিবিযে পিছনেব দাওযায বসা বমণীটিকে বলল হযতো কিছু। কাবণ বই বা খাতা থেকে তাব দৃষ্টিটা এই বাশেব ফটকেব দিকে ঘুবল।

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, মনে হল স্থিব নিশ্চল কযেক মুহূর্ত। তাবপব উঠল। তাবপব বেশ ধীবেসুস্থে এদিকে এগিযে আসতে লাগল।

আমি চেযেই আছি। জযন্ত বঙ্গ খুব বাড়িযে বলেনি। সামান্য মোটাব দিক ঘেষলেও শ্রী যেন আগেব থেকেও বেড়েছে। এক পিঠ খোলা চুল। তেলেব সঙ্গে যোগ কম বলেই হযতো লালচে দেখাচ্ছে একটু। গাযেব বংও আগেব থেকে ফর্সাই মনে হয। পবনে চওডা হলদে ছাপা পাড়েব পাতলা সাদা শাড়ি। গাযে মুগো বঙেব ব্লাউস। হাতে কিছু কাচেব চুড়ি।

..সেই সুলক্ষণা দযাল এখন তাহলে এই। আসতে আসতে একবাবও আমাব দিক থেকে চোখ ফেবাযনি সে। আমিও না। ঠোঁটেব ফাকে সামান্য হাসি। চোখেও। আগেব মতো তীক্ষ্ণ নয আদৌ। উল্টে কৌতুকমাখা।

সামনে এলো। দেখল আব একবাব। হাসল আবাব একটু। দড়ি বাধা গেটটা খুলে দিযে ডাকল, এসো।

বাইশ বছব নয, যেন কিছুদিন আগেই আমাকে দেখেছে সে। আজ আবাব দেখল। এখন ভিতবে ডাকছে।

স্থান কাল ভুলে আমি ওব দিকেই চেযে আছি। ওকেই দেখছি। সবাব আগে আমাব মগজে যে চিন্তাটা ঘা দিযেছে, নিজেব অগোচবে এবই মধ্যে হযতো তাব

জবাবও খুঁজছি। বিগত বাইশটা বছরের মধ্যে এই মেয়ের কতগুলো বছর পুরুষের অশুচি বাসনার সহচরী হয়ে কেটেছে জানি না। এখনো যেমনটি দেখছি, পুরুষের চোখে না পড়ার মতো নয়— ডাক পড়ে কিনা জানি না। কিন্তু কোনো ব্যভিচারিণী মেয়ের চোখে মুখে হাসিতে এই প্রসন্নতা লেগে থাকে কি করে?

—কি হল, এসো? ওই মেয়েগুলো ভাবছে কি?

ভিতরে এলাম। তারপর পাশে পাশে টালি ঘরগুলোর দিকে এগোলাম। সুলক্ষণা হালকা হেসে বলল, তোমার সঙ্গে শীগগিরই একদিন দেখা হয়ে যাবে আমি ঠিক জানতাম।

—কি করে?

—বাঃ তোমার সঙ্গে জয়ন্তর দেখা হয়নি?

মাথা নাড়লাম।—হয়েছে। কলকাতায়।

—সে তোমাকে আমার কথা বলেনি?

—বলেছে। বলেছে, হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে হঠাৎ সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কে সুলক্ষণা আমি হঠাৎ বুঝতেই পারিনি।

ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রূ-ভঙ্গি করে তাকালো মুখের দিকে।—বা-ব্বাঃ, তাহলে তুমি মস্ত একজনই হয়েছ বটে। তারপর কি করে বুঝলে?

—ও যখন বলল, ঝুমরির সঙ্গে দেখা হয়েছে।

ইচ্ছে করেই আমাদের চলার গতি শিথিল। আবার সেই হাসিমাখা ভ্রূ-ভঙ্গি। —ওই মেয়েদের সামনে তুমি আবার আমাকে ঝুমরি-টুমরি ডেকে বোসো না যেন। ওদের কাছে আমি সুলক্ষণাদিদি।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম শুধু একবার। ও আবার ঘাড় ফিরিয়ে ফিক করে হেসে নিল একটু।—কি দেখলে? সুলক্ষণা ডাকার মতো কিছু চোখে পড়ছে না বুঝি?

মনে মনে বললাম, সবটাই সুলক্ষণা দেখছি—আর সেই জন্যেই অবাক লাগছে। মুখে বললাম, আমার সঙ্গে শীগগিরই দেখা হবে ভাবলে কি করে, জয়ন্তর মুখে তোমার কথা শুনে কলকাতা থেকে ছুটে আসব ধরে নিয়েছিলে?

মাথা নেড়ে সুলক্ষণা জবাব দিল অত ভাগ্যি ভাবিনি, তবে এদিকে এলে একবার খোঁজটোজ করবে আশা ছিল।

বললাম, তাই বা করব ভাবলে কি করে, জয়ন্তকে তো নিজের বাড়ির হদিস দাওনি। হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে আবার দেখা হবে বলেও আর সেদিক মাড়াওনি। দেখা হতে পারে ভেবে আমিও ওই ঘাটে দু'দিন দু'বেলা করে হাজিরা দিয়েছি। কাল ফিরব, আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে দু' চোখ বড় বড় করে তাকালো সুলক্ষণা। সেই চোখে হাসি উপচে পড়ছে। মুখে বিড়ম্বনার ছোঁয়া।—কি কাণ্ড! আমারই পোড়া কপাল, ইস, দু-দুটো দিন এ-ভাবে পণ্ড হয়ে গেল!...জয়ন্তর কাছে শুনে সত্যিই কি কলকাতা থেকে চলে এসেছ নাকি?

—না, দিল্লী থেকে, দিল্লীতে কাজে এসেছিলাম। একটু শ্লেষের লোভ সামলানো গেল না, বললাম, তা হঠাৎ জয়ন্তকে ওভাবে কাটতে দিলে কেন—লজ্জায় না ভয়ে?

হাসতে লাগল। ওই মেয়েদের কাছে পৌঁছনোর আগে একটু সময় নেবার জন্যেই হয়তো সামনের বাগান ঘুরে চলেছে। যেখানে ফুল বেশি ফুটে আছে, সেখানে দাঁড়াচ্ছেও দুই-এক মিনিট করে। হাসিমুখে সাদা-সাপটা জবাবও দিল। বলল, কাটান দিলাম, কারণ জয়ন্ত এখনো সেই আগের জয়ন্তই আছে মনে হল, আর আমি কেমন মেয়ে জানে বলেই কথার ফাঁকে ফাঁকে আমার মুখ থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নিতেও ছাড়েনি—আর, বাড়ির সন্ধান পেলে ওর হয়তো দুই-এক রাত আমার কাছে কাটিয়ে যেতেও আপত্তি হত না।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় ভিতরটা বি-বি করে উঠল আমার। এই কথাগুলো এমন অনায়াস কৌতুকে বলতে পারল বলেই রাগ। দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম, দেখা তো হল, আজ চলি তাহলে?

দাঁড়িয়ে গিয়ে থমকে তাকালো আমার দিকে। তারপর তেমনি পলকা রসিকতার সুরেই পাল্টা জবাব দিল, যাবে যাও—অত ভয় দেখাচ্ছ কি? তারপরেই হেসে বলল, তোমাকে জয়ন্ত ভাবছি না, এসো—

এর পরেও আঘাত দেবার ইচ্ছেটাই প্রবল আমার। বললাম, জয়ন্ত হলে বা জয়ন্ত ভাবলেই বা তোমার এমন কি সাংঘাতিক ক্ষতি আর আপত্তি?

আবারও দাঁড়িয়ে গেল। কয়েক পলকের জন্য সমস্ত মুখ লাল একটু। আমার মনে হল কালো চোখের তারায় সেই আগের মতো আবার এক ঝলক বিদ্যুতও ঝলসে উঠতে পারে। না, তা উঠল না, একটু দেখেই নিল শুধু। তারপর মুখ টিপে হেসে বলল, এই বাইশ বছর বাদেও তোমার ভয়ানক রাগ দেখছি আমার ওপর। কেন গো?

এবারে নিজেরই কানের কাছটা গরম ঠেকছে। সুলক্ষণা বলল, চলে এসো, ওই মেয়েগুলো কি ভাবছে ঠিক নেই—

তার সঙ্গ ধরে আবারও শ্লেষ মাখানো জবাব দিলাম, তোমার পুরনো কোনো প্রীতির পাত্র ভাবছে হয়তো।

হেসে ফেলল। মাথা দুলিয়ে জবাব দিল, তাহলে তো ঠিকই ভাবছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওই মেয়েরা কারা?

—আমার কাছেই থাকে, আর আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। বড় ভালো মেয়েগুলো। কিন্তু ওদের এক-একজনের কথা শুনলে তুমি হয়তো এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে সোজা কলকাতার গাড়িতে চেপে বসবে।

যা বোঝার এটুকু থেকেই বোঝা গেল।

আমরা সামনে আসতে মেয়েগুলো উঠে দাঁড়াল। তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্রটি অমন হাসিমুখে এতক্ষণ ধরে কার সঙ্গে আড্ডা পাড়ি দিল, তলায় তলায় হয়তো সেই কৌতূহলও আছে।

সুলক্ষণা বলল, এই মেয়েরা, কাকে দেখে তোরা হাসাহাসি করছিলি। কলকাতার একজন নামকরা লেখক। বামুন মানুষ, প্রণাম কর।

আমার অস্বস্তির একশেষ। ওরা একে একে পা ছুঁয়ে প্রণাম সারল। আমার দিকে চেয়ে সুলক্ষণা হেসে জিজ্ঞাসা করল, আমিও ঠুকব নাকি একটা?

গম্ভীর মুখে আমি আঙুল দিয়ে নিজের পা দেখিয়ে দিলাম। ও ছদ্ম কোপে ফোঁস করে উঠল, উঃ! বয়ে গেছে—

আগন্তুক দেখে ভিতর থেকে আরো তিন-চারটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। খুব না হোক, এরাও মোটামুটি সুশ্রী। আর বয়েস বাইশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে। আমি বাঙালী লেখক পরিচয় পেলেও আমার সঙ্গে তাদের সুলক্ষণাদিদিটির সম্পর্ক কি এরা জানে না। আর সুলক্ষণারও আর বেশি পরিচয় দেবার উৎসাহ দেখা গেল না। সকলের উদ্দেশেই সে বলল, চা কর, তোরাও খা আমাদেরও দে—এঁর জন্যে একটু খাবার-টাবারও করিস। আমাদের আজ বাইরে কোনো প্রোগ্রাম নেই তো?

ওরা মাথা নাড়ল। নেই।

—বাঁচা গেল। আমি এঁকে নিয়ে একটু ঘরে বসছি, সময় হলেই ডাকিস—

কিসের সময় হলে কেন ডাকবে বোঝা গেল না। দিনের আলো এখন শেষ প্রায়। টালির ঘরগুলোতে আলো জ্বালা হয়েছে। একটি পরিচারিকা ঘরে ঘরে লণ্ঠন রেখে যাচ্ছে দেখলাম।

আমাকে নিয়ে সুলক্ষণা দাওয়ার সামনের ঘরটাতেই ঢুকে পড়ল। পাশাপাশি একই সাইজের চারটে ঘর। তারপর শেষের দিকে আর একটা বড় হলঘরের মতো। টালির ছাদ হলেও ঘরের মেঝে সিমেন্টের, আর ইট-সুরকির দেয়াল। পরিষ্কার তকতকে ঘর। দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারে গোপালের মূর্তি। কোণের দিকে একটা নেয়ারের খাটিয়া পাতা। তাতে পরিচ্ছন্ন সাদাসিধে শয্যা বিছানো। আলনায় খান-দুই শাড়ি আর জামা ঝুলছে। এদিকের দেয়ালে একটা আয়না টাঙানো।

কোথাও এতটুকু আতিশয্য নেই। এ-রকম একটা ঘরে এসে দাঁড়ালে ভিতরটা আপনা থেকে খুশী হয়।

সুলক্ষণা জানালো, এটা তার ঘর। এতগুলো মেয়ের মধ্যে শুধু তারই একলার একখানা ঘর। অন্য ঘরগুলোর এক-একটায় তিন-চারটে করে মেয়ে থাকে।

রসিকতা করে বললাম, প্রমীলারাজ্যে এসে গেলাম মনে হচ্ছে।

হেসে মাথা নেড়ে সুলক্ষণা সায় দিল। বলল, সমস্ত বাড়িতে পুরুষও একজন আছেন—তিনি গোপাল। আর দ্বিতীয় পুরুষ তুমি এলে।

বললাম, গোপালের তাতে হিংসে হবে না?

—একটু হলেই বা, সেও তো খুব সুবিধের পুরুষ নয়। হাসিমুখে একটা আসন টেনে নিয়েও থমকালো একটু, তারপর হেসে আসনটা আবার যথাস্থানে রাখতে রাখতে বলল, যাকগে, তুমি ওই বিছানাতেই বসো—গোপালের আর একটু বেশি হিংসে হোক!

আমিও ঠাট্টা করলাম, ঠাকুর দেবতার হিংসে কুড়িয়ে কাজ কি।

—আচ্ছা তুমি বসো তো, ঠাকুর দেবতা আমি মেয়েটা কেমন ভালো করেই চেনে।

শয্যার এক ধারে বসলাম। একটা ভাঁজ করা কম্বলের ওপর চাদর বিছানো। নিজেকে নিয়ে ও অনায়াসে যে ইঙ্গিত করল, সেটুকুর জন্যেই আমার বাইশ বছরের ক্রোধ আর পরিতাপ। অথচ আশ্চর্য, সব জানা থাকা সত্ত্বেও সুলক্ষণার দিকে চেয়ে আমার বার বার মনে হচ্ছিল, একটা শুচিতা যেন ওকে ঘিরে আছে।

ও সামনে এসে দাড়াল। চাউনিটা গভীর একটু।

—কি দেখছ?

—তোমাকে। সেই বাইশ বছর আগের মতোই কাঁচা কাঁচা লাগছে। বিয়ে করেছ শুনেছি—বউ কেমন?

হেসে জবাব দিলাম, বিয়ে তো সেই কোন যুগে করেছি—এখন আর কেমন-এর কি আছে?

চোখ পাকালো।—তার মানে বউ পুরনো হয়ে গেছে? হাসলও সঙ্গে সঙ্গে। —ছেলে মেয়ে পড়ছে?

মাথা নাড়লাম।

ও ছেলেমানুষের মতোই বলে উঠল, আমার ছুটে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করছে।

—চলো না।

—ইস, কি পরিচয় দেবে?

—বলব, তোদের অদেখা অনেককাল আগের এক হারানো মাসি।

হেসে উঠে লঘু সুরে সুলক্ষণা বলল, কেন পিসী বলবে না?

বাইশ বছরের সঠিক ইতিবৃত্ত কিছুই জানি না। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যেই আমার ভালো লাগছে, হালকা লাগছে। মাথা নাড়লাম, নাঃ, অতটা নীরস হতে পারব না।

সুলক্ষণা হাসছে। চেয়ে আছে। বললাম, বসো—

তেমনি চেয়ে থেকেই রসিকতা করল, এক্ষুনি চা দিতে আসবে, তুমি ওখানে বসে আছ দেখেই অবাক হবে, পাশে আমাকে দেখলে তো কথাই নেই। সামনে দাড়িয়েই ভালো লাগছে। জয়ন্ত বলছিল, অনেক নাকি বই-টই লিখেছ?

—লিখেছি।

—কি বই?

—গল্প, উপন্যাস।

টিপ্পনীর সুরে একটু বিস্ময় প্রকাশ করল সুলক্ষণা, তোমার মধ্যে এত রস আছে জানতাম না।.. দু-একখানা পাঠাও না, এককালে তো আমাকে বাংলা শেখানোর কি ঝোঁক ছিল তোমার—ঠেকে ঠেকে ঠিক পড়ে নিতে পারব।

—হিন্দী অনুবাদও আছে, তাই পাঠাব, ঠেকে ঠেকে পড়তে হবে না।

সুলক্ষণা ছেলেমানুষের মতোই খুশী হয়ে উঠল। মুখে বলল, তুমি এখান থেকে বেরিয়েই ভুলে যাবে। বাইশ বছরের মধ্যে একদিনও আমার কথা মনে পড়েছে?

—তোমার পড়েছে?

—আমার! হুঃ। তাহলে তো খুব উপন্যাস লেখো তুমি! কি মনে হতেই আবার হাসি—আমার গল্প লিখবে না?

বললাম, তুমি সদয় হলেই লিখতে পারি।

ছদ্ম ভয়ে দু চোখ বড় করে ফেলল একটু, সদয় হলে মানে? কি করতে হবে?

—মাঝের বাইশটা বছরের ফারাক জুড়তে হবে, অর্থাৎ বাইশ বছরের খবর সব বলতে হবে।

সুলক্ষণা বলল, না শুনেই তো ঘেন্নায় চলে যেতে চাইছিলে, শুনলে তো এ নাম আর মুখেও আনবে না—কলম ধরা তো দূরের কথা।

সেই বিরূপ অনুভূতিটা এরই মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল কি করে ভেবে পাচ্ছিলাম না। এখন থেকে থেকে কেন যেন কেবলই মনে হচ্ছে শোনার মতো অনেক কথা আছে, আর শুনলে পর কলমও ধরা যাবে। গম্ভীর বক্তৃতার সুরে বললাম, লেখক হিসেবে আমি ভালো-মন্দ সুন্দর-কুৎসিত সব দেখি আর শুনি, শেষে তাই থেকেই জীবন-সোনা ঝালিয়ে তুলি।

সুলক্ষণা তেমনি চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখতে লাগল। তারপর বলল, ও বাবা। থাক, এটুকু শুনেই আমি পারবো যাচ্ছি।

চায়ের ট্রে হাতে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। দু পেয়ালা চা, একটা ডিশে কিছু ঘরের তৈরি খাবার। একটা কাগজ পেতে দিয়ে সেই ট্রেও শয্যার ওপরেই রাখতে বলল সুলক্ষণা। এটুকুও ব্যতিক্রম মনে হল আমার। কারণ, মেয়েটির মুখে বিস্ময় মাখা সম্ভ্রম দেখলাম।

মেয়েটি চলে যেতে সুলক্ষণা ট্রে থেকে নিজের পেয়ালাটা শুধু তুলে নিল। বললাম, আর কিছু নেবে না?

—নাঃ, তোমার খাতিরে চা খাচ্ছি, নইলে এ-সময় কিছুই চলে না। তুমি খাও—

একটু বাদে হালকা সুরে জিজ্ঞাসা করল, জয়ন্ত আমার কথা আর কি বলেছে তোমাকে?

—বলেছে, বয়েস হলেও এখনো বেশ মাইরি, চোখ ফেরানো যায় না।

হাসতে গিয়ে চা আটকে বিষম খেল সুলক্ষণা। তারপর আধা-খাওয়া পেয়ালা ঘরের কোণে সরিয়ে রাখতে রাখতে হেসেই রাগ দেখালো, বরাবর ওটা পাজির পা-ঝাড়া একটা—

আমি নরম প্রতিবাদ করলাম, কেন, খুব মিথ্যে তো বলেনি।

হাঁ, চাইলে ওর চোখে বাইশ বছর আগের সেই হাসি এখনো ঝিলিক দিয়ে উঠতে পারে বটে। মুখে তরল ঝাঝালো সুরে বলল, দেখো, তুমি ওর সঙ্গে গলা মিলিও না বলছি।

খেতে খেতে নিরীহ প্রশ্ন ছুঁড়লাম, মেলালে ওর মতোই গলাধাক্কা দেবে?

—ও মা, ওকে গলাধাক্কা কখন দিলাম!

—বাড়ির হদিস দিলে না, আসবে বলে এলেও না—গলাধাক্কা আর কাকে বলে?

ও হাসতে লাগল। তারপর বলল, নাঃ, তোমার সঙ্গে ওর মতো ব্যবহার করব না, হাজার হোক দুর্বলতা একদা ছিলই—

—কার ছিল, তোমার না আমার?

—তুমি বড জেবা কবো। প্রসঙ্গ ঘুবিযে জিজ্ঞাসা কবল, এখানে কোথায উঠেছ?

বললাম। একটু ভেবে নিযে সুলক্ষণা বলল, লোভ হলেও এখানে তোমাকে থাকতে বলতে পাবছি না, জানলে কত জনেব চোখ টাটাবে ঠিক নেই। তাব থেকে দুপুবে আব বাতে এখানে এসে খাবে—বেশি দুব নয, টাঙায মিনিট দশেক লাগে।

—আমি তো কালই দিল্লী চলে যাচ্ছি।

যেন আমাব ওপব এখনো জোব আছে, এমনি কবে সুলক্ষণা বলল, কাল তুমি মোটেই যাচ্ছ না।

আপত্তি নেই খুব, কাবণ সুলক্ষণাব জীবনেব মাঝেব এই বাইশটা বছব নিযে এখন দুর্বাব কৌতূহল আমাব। এতগুলো মেযেব মধ্যে ওকে ঠিক এই পবিবেশে না দেখলে এত আগ্রহ হত না হযতো।

একটু বাদেই ওদিক থেকে শাঁখেব আওযাজ কানে এলো। একটি মেযে সাঁঝেব ধূপধুনো দিযে গেল। তাবপবেই খোলকবতালেব আওযাজ শুনলাম। সুলক্ষণা আমাকে নিযে ঘব থেকে বেরুলো। শেষেব বড ঘবটায এসে ঢুকলাম ওব সঙ্গে। সেখানে এ-মাথা ও-মাথা শতবঞ্জীব ওপব ফবাস পাতা। সেই ফবাসে এখন তিবিশ-চল্লিশটি মেযেছেলে বসে। বেশিব ভাগই বযস্কা আব বিধবা। ঘবেব এক মাথায মালা গলায বেশ বডসড গোপাল মূর্তি। তাব সামনে হাবমোনিযাম, তবলা, খোল কবতাল। সেখানে এখানকাব অর্থাৎ এই ডেবাব মেযেবা বসে। তাদেব সামনে বেশ সুন্দব একটা আসন পাতা।

আমাকে সামনেব দিকে বসিযে সুলক্ষণা এগিযে গিযে মাটিতে মাথা ঠেকিযে গোপাল প্রণাম কবল। কম কবে তিন-চাব মিনিট মাথা ঠেকিযে পডে বইল সে। তাবপব উঠে আস্তে আস্তে সেই খালি আসনটায গিযে বসল।

গান শুরু হল। একটানা ভজন গান। মূল গাযিকা সুলক্ষণা। অন্য মেযেবাও থেকে থেকে সুব মেলাচ্ছে, সুলক্ষণা থামলে তাবা সেই বিবতিটুকু ভবাট কবে বাখছে। প্রায ঘণ্টাখানেক চলল এই গান। না, এবকম গান আমি খুব বেশি শুনিনি। গলা ববাববই মিষ্টি ছিল সুলক্ষণাব। সেই গলা কত যে ভালো হযেছে আবো, কানে না শুনলে বিশ্বাস হত না। কিন্তু এই গানেব গলা আব সুবই যেন সব নয, সমষ্টিগত সত্তাব নিবিড যোগ না থাকলে এমন গান হয না, এ-বকম পবিবেশ সৃষ্টি হয না।

বাইবেব মহিলাবা সব উঠে উঠে গোপাল প্রণাম কবে টাকা আধুলি সিকিটা ফেলে চলে যেতে লাগলেন।

আমি উঠে পাযে পাযে আবাব সুলক্ষণাব ঘবে এসে বসলাম। বাইশ বছব আগেব সুলক্ষণাব সঙ্গে একে যেন কিছুতে মেলাতে পাবছিলাম না।

মিনিট পনেব বাদে সুলক্ষণা ঘবে এলো। চোখে মুখেব সেই তন্ময ভাবটুকু গেছে। হালকা সুবেই জিজ্ঞাসা কবল, কেমন লাগল?

—বেশ।

ঠিক এইটুকু জবাব আশা কবেনি হযতো। মুখেব দিকে চেযে বইল। ভিতবটা আমাব হঠাৎই আবাব কেন যে অসহিষ্ণু হযে উঠল জানি না। হযতো, সুলক্ষণাব

বাইশ বছর আগের ঘর ছাড়া, আর এই গোপাল চরণে আত্মসমর্পণ—এর কোনোটার সঙ্গেই আপোস নেই আমার।

বললাম, সবটুকুই ভক্তি না এর সঙ্গে জীবিকার যোগও আছে?

থমকে তাকালো মুখের দিকে। মনে হল বেদনার ছায়াও পড়ল একটু। জবাব দিল, জীবিকার ব্যবস্থা না থাকলে ভক্তি আসবে কোত্থেকে?

—কিন্তু এই দিয়েই তোমাদের এতগুলো মেয়ের দিন চলে যায়?

হয়তো এই প্রশ্নে তির্যক কটাক্ষ ছিল একটু। কিন্তু সুলক্ষণা দয়ালের একটা পরিবর্তন স্পষ্ট। আগের মতো সহজে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে না, ঝলসে ওঠে না, হয়তো বা অনেক নিগ্রহের পরে এই সংযমটুকু আয়ত্ত করেছে। যাক, আমার কথার জবাবে ও যা বলল, সেও অবাক হবার মতোই। সপ্তাহে কম করে তিন-চারদিন বাইরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গানের প্রোগ্রাম থাকে তাদের। হরিদ্বারে কোথাও না কোথাও সে রকম অনুষ্ঠান লেগেই আছে। সবার আগে তাদেরই ডাক পড়ে। সুলক্ষণাদের বিশেষ কিছু দাবিদাওয়া নেই, যারা যেমন দেয়। এখন নাম হয়েছে বলে খুব কমও দেয় না কেউ। এমন কি হরিদ্বারের বাইরেও বহু জায়গায় গাইতে যেতে হয়। দিন বেশ ভালোই চলে যায় তাদের, অভাব-টভাব নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই গানের দল তুমি কতদিন গড়েছ?

একটু ভেবে নিয়ে ও বলল, তা প্রায় বছর নয় হবে।

এবারে আমি সত্যিই অবাক একটু। ন'বছর আগে হলে তখন তেত্রিশ চৌত্রিশ হবে ওর বয়েস। এখন যা দেখছি, সে-সময় নিশ্চয় ওর ভরা যৌবন, ভরা রূপ। সব ছেড়ে সেই সময় থেকে ও গোপাল আশ্রয় করেছে—এটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয় আদৌ। আমি চেয়ে আছি, ওর মুখ থেকেই সেই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা টেনে বার করতে চেষ্টা করছি। শেষে বলেই ফেললাম, ও-বয়সে এ-রকম তো হবার কথা নয়, গোপাল এমন টানা টানলে, কি ব্যাপার?

মুখের দিকে চেয়ে টিপ-টিপ হাসতে লাগল। তারপর বলল, গোপাল টানলে এমনিই হয়।...তখন ভর-ভরতি অবস্থা আমার, পায়ে করে পুরুষের মন মাড়িয়ে যেতেই আনন্দ, তারই মধ্যে কি কাণ্ড—একেবারে চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে নিজের পায়ে মুখটা আচ্ছা করে ঘষে দিয়ে তবে ছাড়লে—ছাড়লেই বা বলছি কেন, এখনো এই দুষ্টুমিই চলছে।

শুনতে ভালো লাগছে, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। আমি চেয়েই আছি।

আত্মস্থ হয়ে সুলক্ষণা বলল, অত ব্যস্ত কেন, সব শোনার বলেই তো ধরে রেখেছি। বোসো, নিজের ভিতরটা আরো ভালো করে খুঁজে দেখে নিই আগে—

হেঁয়ালির মতো লাগল। ভিতরের তাগিদ সত্ত্বেও আর জোর করলাম না। কি মনে হতে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার এই মেয়েদের পেলে কোথায়?

নিঃসঙ্কোচে সুলক্ষণা দয়াল জবাব দিল, নিজে থেকেই এসেছে, আগে মাত্র একটি চেনা মেয়ে ছিল, এখন ওরা ন'জন।...সবই আমার মতো, কেউ নিজে ভুল করেছে, কাউকে বা জোর করে ভুল করানো হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, ওদেরও ভিতর-বার এখন গোপালের পাশে?

হেসে ফেলল।—তাই যাতে হয় আমি তো চেষ্টা করি, আর নেবার আগে যতটা পারি যাচাই বাছাই করে নিই। তবু গণ্ডগোল কি হয় না, এ-পর্যন্ত দু-দুটো মেয়ে ফের আবার লোভে পড়ে এখান থেকে সরে গেছে—আর তোমাদের পুরুষের লোভও বলিহারি, ঠাকুরঘরে থাকো আর যেখানেই থাকো, জাল ফেলার কামাই নেই, পুণ্যিস্থানে যেন আরো বেশি পাপের বাসা।

সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা হবার পরেও চার দিন চার রাত হরিদ্বারে ছিলাম। বলতে গেলে দু বেলাই ওদের এখানে এসেছি। বাড়ির বাইরে দু'দিন গানের প্রোগ্রাম ছিল সেখানেও গেছি। এখানকার মেয়েরা আমাকে শুভার্থী আত্মীয় ভেবেছে। সুলক্ষণা তাদের কি বলেছে জানি না, কিন্তু আমার প্রতি তাদেরও কোনো রকম পলকা কৌতূহল দেখিনি। উল্টে অবিমিশ্র শ্রদ্ধাই দেখেছি।

ফাকে ফাকে অনেক কথা হয়েছে সুলক্ষণার সঙ্গে, কিন্তু একটি বারও সে এর মধ্যে কৃষ্ণকুমারের বা তাদের বাড়ির কারো নামও উচ্চারণ করেনি। ক্রমে আমারই ধৈর্য কমে আসছিল। ফাক পেলেই তাগিদ দিচ্ছি, বলবে বলেও তো কিছুই বললে না—এবার যেতে হচ্ছে আমাকে।

গতকালও বলেছিলাম। ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে ঝাঁঝ দেখিয়েছে, আমি কি তোমাকে ধরে রেখেছি?

বলেছিলাম তা অবশ্য রাখোনি—

তেমনি করেই ও আবার বলেছিল, পুরুষের স্বভাবই ওই রকম, এতবড় দেবস্থানে এসেও নরকের কথা শোনার লোভ।

আমি হেসেই জবাব দিয়েছিলাম, নরকের কথা তো নয়, নরক থেকে ওঠার কথা। সেটা শোনার মধ্যে পুণ্যি আছে।

—ছাই আছে। ওঠা তো ভারি, এই যে তুমি চলে যাবেই, তোমার বাড়ি-ঘর স্ত্রী ছেলেমেয়ে আছে—অথচ তোমাকে সত্যি ধরে রাখতে ইচ্ছে করছে।

দু' কান ভরে শোনার মতো কথা, একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম, করলেই বা এ ইচ্ছের মধ্যে তো নরক নেই।

..ওর চোখেমুখে যে সুন্দর হাসিটুকু দেখেছিলাম তাও ভোলার নয়।

আজ সকালে আবার বললাম, কাল সকালে আর না গেলেই নয়, কাজের খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে—রিজারভেশান পেলে সোজা এখান থেকে কলকাতাই চলে যাব।

সুলক্ষণা বলল, ঠিক আছে, নাম-গানের দৌলতে আমার একটু চেনা-জানা আছে, একেবারে অসম্ভব না হলে রিজারভেশান পেয়ে যাবে।

সন্ধ্যেয় রিজারভেশানের টিকিট আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, নিশ্চিন্ত?

আমিও হেসেই মাথা নাড়লাম।

এই রাতটুকুই প্রত্যাশা আমার। ছিলামও রাত প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত। কিন্তু এ-দিন দেখলাম একলা পাওয়াই ভার ওকে। মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত, আমার খাওয়ার

ব্যাপারে ব্যস্ত। কাল ট্রেনে আমার সঙ্গে কি কি খাবার যাবে—মেয়েদের সেই নির্দেশও দিচ্ছে।

রাতে হোটেলে ফেরার মুখে ওকে কাছে দেখলাম না। একটি মেয়ে বলল, দিদি এইমাত্র তাঁর ঘরে গেলেন—

পায়ে পায়ে তার ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালাম। স্টীলের বাক্স খুলে ওদিক ফিরে কিছু একটা করছে ও।

—ঝুমরি...।

চমকে ফিরে তাকালো। তারপর হেসেই ফেলল। বলল, বাইশ বছর বাদে এ ডাক শুনে ভয়ানক চমকে গেছলাম।—

চললে?

—হ্যাঁ।

এগিয়ে এলো। হাসছে তখনো।—ঠিক আছে। তোমার খাবার নিয়ে সকালে ঠিক সময়ে আমি স্টেশনে যাব'খন।

এসেছে। একলাই। ট্রেন ছাড়তে তখন আর মিনিট দশেক মাত্র বাকি। খাবারের পাত্রটা জায়গা মতো রেখে এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, জল কোথায়?

—আছে। বসো তুমি। আমি ভাবলাম আর এলেই না।

কুপেতে তখন পর্যন্ত আমি একা। আমার হাতখানেক তফাতে বসে সুলক্ষণা বলল, তোমাদের তো ওই রকমই ভাবনার দৌড়।...কলকাতায় পৌঁছে চিঠি দেবে তো?

—চিঠি দিলে জবাব পাব?

হাসিমুখেই মাথা নাড়ল, তা অবশ্য পাবে না। আচ্ছা তোমাকেও চিঠি লিখতে হবে না, দেখা হল, এই ভালো। গোপালের দয়ায় নিরাপদে পৌঁছুবে জানিই তো।

ঘড়ি দেখলাম। আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি। অভিমানাহত সুরে বললাম, আমারই শেষ পর্যন্ত কিছু জানা হল না।

—হবে, হবে। হাতের ঝোলা খুলে বাদামী রংয়ের বড় খাম বার করল একটা।—তুমিও যেমন, এ-সব কথা মুখে বলা যায় নাকি। খামটা হাতে দেবার আগে থমকালো একবার।—কিন্তু একটা কথা, আমাকে নিয়ে কোথায়ও কিচ্ছু লিখবে না।

—কেন?

লিখলে তুমি ঠিক আমাকে বাড়াবে জানি। সব কবুল করতে পেরে আমার মনে একটু শান্তি এলো—ব্যস, এর বেশি আর কিছু চাই নে। রাস্তায় যেতে যেতে পড়বে, তারপর ছিঁড়ে কুচি কুচি করে জানলা দিয়ে ফেলে দেবে। ঠিক তো?

হাত বাড়িয়ে ওর হাত থেকে খামটা নিলাম। বললাম, সেটা না পড়া পর্যন্ত বলতে পারছি না—তবে বাড়াবো না, কথা দিলাম।

ঘড়ি ধরে গাড়ি ছেড়েছে। তার আগে সুলক্ষণা নেমে জানলার কাছে দাঁড়িয়েছে। চলন্ত ট্রেন থেকে যে কয়েক সেকেন্ড দেখা গেছে তাকে, দেখেছি। তারপর খাম খুলে বসেছি।

কথাব খেলাপ কবব না। বাডানোব ভয় আছে বলেই, সুলক্ষণা দয়াল যা লিখেছে সেটুকুই শুধু তুলে ধবছি।

বাঙালীবাবু বাতে যাবাব আগে তুমি ঝুমরি বলে ডাকলে, আমারও বাইশ বছর আগেব প্রিয নামে তোমাকে ডাকাব সুবিধে হযে গেল। আমার মেয়েদেব কাছে এ ক'দিন তোমাকে বাঙালীবাবুই বলেছি, আর আমাব নিজেবই দু'.কান যেন ভবে গেছে।

তোমার অনেক জানতে চাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বড নোংরা ব্যাপাব সব। সাধকরা বলেন, পাপ ধুয়ে ফেলতে চাও তো পাপ স্বীকাব করো। কিন্তু কার কাছে স্বীকাব কবব? ঘবেব দেওযালেব কাছে? তোমাকে দেখাব সঙ্গে সঙ্গে তোমাব জানাব লোভ থেকে আমাব জানানোব লোভটা কম ছিল না। কিন্তু দোহাই তোমার, সবটুকু পডাব আগেই ঘেন্নায ছিঁডে ফেলে দিও না।

...জীবনে প্রথম যে মানুষকে দেখলে আমাব দু'চোখ ঘৃণায ঠিকবতো, আব মাথায খুন চাপতো, সে আমাব বাবা। একদিন আমি এই বাবাকেই দুনিযাব সেবা সুন্দব পুরুষ ভাবতাম। বাবা যখন গান-বাজনা নিযে বসত, আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম আব ভাবতাম ওবকম গানেব আসবে কবে আমারও জাযগা হবে।

বাবা মদ খেত তাও আমাব কাছে খুব একটা দোষেব কিছু নয। মা বাগ কবত, আব আমি ভাবতাম মা-ই ইচ্ছে কবে ঝগড়া বাধায। আমাব পনেব বছর বযসেব সময মাযেব শবীব একেবাবেই ভেঙে গেল। চডা ডাযবেটিস। উঠতে বসতে মাথা ঘোবে। একদিন বাথরুমে মাথা ঘুরে পডে গেল। তখন সন্ধ্যা হয-হয়। বাডিতে কেউ নেই, উর্ধ্বশ্বাসে আমি ছুটলাম দুর্গা মাসিব বাডি। বাবা সেখানে আড্ডা দিতে যায়। এই দুর্গা মাসিব সম্পর্কেও পাডার লোকে ভালো বলে না। দুর্গা মাসিব কেন বিযেই হল না, তাই নিযেও এক-একজন এক-এক রকম বলে। কিন্তু ও-সবেও আমি কান দিই না। কাবণ দুর্গা মাসি হাসে খুব, আমি গেলে আদব কবে কাছে টেনে নেয। ভালো ভালো খেতে দেয।

বাডি থেকে পনেব মিনিটেব হাঁটা পথ এক ছুটে চলে এসেছি। বেদম হাঁপাচ্ছি। কিন্তু দুর্গা মাসিব বাডি এসে মনে হল, কেউ নেই। দুটো ঘবই অন্ধকাব। সামনেব ঘবেব দবজা খোলা, পিছনের অর্থাৎ দুর্গা মাসিব ঘবেব দবজা ভেজানো। ঠেলতেই দবজা খুলে গেল। ভিতবে ঢুকে আলো জ্বাললাম।

তাবপবে কযেক পলকেব জন্য যেন পাথব আমি। কি দেখলাম তা আর বলে কাজ নেই। ঘব থেকে ছিটকে বেবিযে এলাম আবাব। আবো দ্বিগুণ ছুটে সোজা বাডি। এর মধ্যে বিকেলেব ঠিকে ঝিটা এসেছিল। মাকে ওই অবস্থায দেখে সেই পাডাব লোক ডাকাডাকি করে তাকে ঘরে এনেছে।

আমি সে-ঘবেও আব থাকতে পারলাম না। বাইবেব দাওয়ায় দাঁডিযে ঠকঠক করে কাঁপছি। সমস্ত পৃথিবীটা আমাব কাছে একটা দগদগে ঘাযের মতো বীভৎস লাগছে।

মিনিট কুডির মধ্যে বাবা এলো। এসেই আমাব গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিযে দিল। এমন চড যে আমি ঘুরে পড়ে গেলাম।

মা আর সে-যাত্রা রক্ষা পেল না। তার তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করে বাবা দুর্গা মাসিকে ঘরে নিয়ে এলো। দুর্গা মাসি গোড়ায় গোড়ায় আমার মন পেতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাকে দেখলেই আমার দু'চোখে গলগল করে ঘৃণা ঠিকরতো। ফলে বাবা আমাকে শাসন করত। তার ফলও উল্টো হত।

ভালবাসা ঠিক কাকে যে বলে আমি তখনো জানি না। শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে কিনা জানি না, আমার জীবনে প্রথম ভালবাসার মানুষ কৃষ্ণদাদা। ওই 'কাজিন' বিয়ে না কি বলে, আমাদের সমাজে সেটা চালু থাকলে যে করে হোক কৃষ্ণদাকে নিয়ে আমি পালাতাম, প্রাণ দিয়ে চিকিৎসা করতাম, তাকে ভালো করে তুলতাম। কৃষ্ণদাদার ঝাঁঝরা বুকের সঙ্গে নিজের বুকটা বদলাবদলি করা সম্ভব হলে তাও করতাম বোধহয়। আমার ভালবাসা কৃষ্ণদাকে শুধু সুস্থ করে তুলতে চেয়েছে, আর কিছু না। এই ভালবাসা কি পাপ?

কিন্তু এখানেও নিজের বাবার মতোই একজনকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করলাম। সে কৃষ্ণকুমারের বাবা। আমার পিসেমশাই। তার সেই বড় আদরের বন্ধু যজ্ঞেশ্বরবাবুকে নিশ্চয় মনে আছে তোমার? বয়সে পিসেমশাইয়ের থেকে পাঁচ-ছ' বছরের ছোট, পিসেমশাইকে দাদা-দাদা করত। পয়সাঅলা মানুষ, আমি এলাহাবাদে আসার আগেই তার বউ মরেছে শুনেছিলাম। তখন উনিশ পেরিয়ে সবে কুড়িতে পা দিয়েছি আমি, বোনকে একদিন আমাকে দেখাতে নিয়ে এলো যজ্ঞেশ্বরবাবু। ওই বোনের ছেলে মস্ত সরকারী চাকুরে, তার বিয়ে দেওয়া হবে। ভালো মেয়ে চাই। দায়িত্ব নেই। পিসেমশাই আর পিসির অনুরোধ ঠেলতে না পেরে যজ্ঞেশ্বরবাবু বোনকে নিয়ে এলো মেয়ে দেখাতে। মানে আমাকে দেখাতে। আমি জোর করে বলতে পারি সেই বোনের আমাকে পছন্দ হয়েছিল। নানাভাবে আমাকে যাচাই করে দেখে আর গান শুনে খুশীতে আটখানা হয়ে চলে গেছল। কিন্তু পরে গম্ভীরমুখে পিসেমশাই এসে খবর দিল তার নাকি মেয়ে পছন্দ হয়নি।

পছন্দ না হওয়ার কারণটা দুদিন না যেতেই বেশ বোঝা গেল। সন্ধ্যায় পিসেমশাই কেমন যেন চুপিচুপি এক জায়গায় যেতে হবে বলে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। রাস্তায় বলল, যজ্ঞেশ্বরের শরীরটা ভালো না, তার গান শোনার ইচ্ছে হয়েছে, তাই—

তখনো সাদা মনেই গেছি আমি। বিরাট চক-মিলানো দালান। যজ্ঞেশ্বরবাবুর ঐশ্বর্যের কথা বলতে বলতে পিসেমশাই আমাকে তার কাছে নিয়ে গেল। যজ্ঞেশ্বরবাবুর ছেলে তিনটে কাছাকাছিই ছিল, বড় ছেলেটা আমার থেকে বড় হবে বয়সে—সে আমাকে চোখ দিয়ে গিলতে গিলতে আর একদিকে চলে গেল।

যজ্ঞেশ্বরবাবুকে একটুও অসুস্থ মনে হল না আমার। দিব্যি হাসিখুশি ফূর্তির মেজাজ। আমাকে আর পিসেমশাইকে একরাশ খেতে দিল। তারপর গান নিয়ে বসলাম। গাইতে গাইতে ওই লোকটার সঙ্গে বার কয়েক চোখাচোখি হতেই আমার মনে হল কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে পড়তে চলেছি। গান একটুও ভালো হল না। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরবাবু প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একে একে অনেকগুলো গান গাইয়ে ছাড়লে।

ফেরার সময় পিসেমশাই আমাকে খোলাখুলি যা বলল, তার সার কথা—যজ্ঞেশ্বরের মতো অত ভালো লোক আর হয় না, যেমন পয়সা তেমনি দরাজ মন। বয়েস একটু হয়েছে, তাও পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের মধ্যে—ব্যাটাছেলের সেটা এমন কিছু বয়েস নয়। তার খুব পছন্দ তোকে, বাবার হালে থাকবি—মাথা ঠাণ্ডা করে ওকেই বিয়েটা করে ফেলা উচিত।

শোনার পর সর্বাঙ্গ বি-বি করে উঠল আমার। জবাব না দিয়ে আমি শুধু মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ তা হবে না।

তাইতেই পিসেমশাই রেগে উঠল। আমার অবাধ্য হবি? আমি তোর ভালো বুঝি না?

আমাকে চুপ দেখে একরকম শাসিয়েই দিল তারপর। যা হবার পরে ভেবে-চিন্তে হবে, কিন্তু এ নিয়ে যেন বাড়ির কাউকে একটি কথাও না বলি।

তার ভয় কৃষ্ণদাদাকে। কিন্তু তাকেও কিছু বলতে পারা গেল না। বললে কতবড় অশান্তির সৃষ্টি হত জানি। আর তখন কৃষ্ণদার যা শরীরের হাল।

ক'দিন না যেতে পিসেমশাই আবার আর একদিন যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাড়ি নিয়ে যেতে চাইল। আমি গেলাম না। পিসেমশাই রাগে ফুঁসতে লাগল। এর একদিন পরেই যজ্ঞেশ্বরবাবু বাড়ি এসে হাজির। পিসেমশাইও ঘটা করে তার আদর আপ্যায়ন করল। তারপর আমার ডাক পড়লো, গান শোনাতে হবে। কৃষ্ণদাই আমাকে ঠেলে পাঠালো, ভদ্রলোক এসেছেন বাড়ি বয়ে, গান শোনাবি না তো গান শিখিস কেন?

এক ঘণ্টা ধরে গান হল। আর সেই এক ঘণ্টা ধরে দুই চোখ দিয়ে আমার শরীরটা যেন চেটেপুটে খেল যজ্ঞেশ্বরবাবু। চলে যাবার পর পিসেমশাই আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে প্রায় শাসিয়েই দিল, আমার অবাধ্যপনা বরদাস্ত করা হবে না, দু'দিন আগে হোক পরে হোক বিয়ে ওখানেই হবে। তোর পিসিকেও আমি বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করিয়েছি—এর থেকে ভালো যে আর কিছু হয় না সেটা সেও বুঝেছে। আর তার শেষ কথা, ছেলে এখন অসুস্থ, তাকে যেন এখন এ-সব কথা শুনিয়ে একটুও বিরক্ত না করা হয়। আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে এটুকুই তার নির্দেশ।

আমি চারদিকে তখন অন্ধকার দেখছি। এর ওপর পরদিনই আবার কৃষ্ণদার গলগল করে রক্ত পড়ল গলা দিয়ে। আমার মনে হল কৃষ্ণদা দশ-বিশ দিনের মধ্যেই চলে যাবে। তারপর? ওই পিসেমশাই আর ওই যজ্ঞেশ্বরের হাত থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? বিশ্বাস করো বাঙালীবাবু, আমার তখন প্রথমেই তোমার কথা মনে হয়েছিল। তোমাকে ভালো লাগে, বাঁচার তাগিদে তোমাকে নিয়ে পালাতে আমার একটুও আপত্তি হত না। আর সেভাবে আঁকড়ে ধরতে পারলে তুমিও আমাকে ছাড়তে পারতে না। কিন্তু তারপরেই মনে হল, তোমার অন্য রকম সমাজ, অন্য রকম পরিবার। আমার প্রতি তোমার একটু দুর্বলতা আছে বলে এমন একটা শাস্তি তোমার ওপর চাপিয়ে দেব। নিজের সমাজ, সংসার থেকে বঞ্চিত হয়ে একদিন তুমিই কি আমাকে ঘৃণা করবে না?

তোমাকেও বাতিল করে দিলাম। তখন থাকল আর একজন। তার খবর তোমরা কেউ রাখো না। তার নাম কিশোর শেঠ। যে ওস্তাদের কাছে আমি গান শিখতাম, তারই আর এক শিষ্য। মাখনখানার মতো চেহারা। দু'হাতের পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আংটি ঝকমক করত। জামায়ও হীরের বোতাম পরত। নিজের ঝকমকে একখানা গাড়ি হাঁকিয়ে আসত সে। আমার সপ্তাহে যে দু'দিন গান শেখার পালা, তার সেদিন আসার কথাও নয়। কিন্তু দু-চারবার দেখা হয়ে যাওয়ার পর ক্রমে দেখা গেল ওই দু-দিনই সে সব থেকে নিয়ম করে আসত। গুরুর কাছে আসবে, তালিম দেওয়া শুনবে—তাতে আর কার কি বলার আছে। তাছাড়া ওই ওস্তাদের মতো ভালো মানুষও কম হয়।

কিশোর শেঠ কেন যে আসত আমিই শুধু ভালো বুঝতাম। এক-একদিন গাড়ি নিয়ে সে একটু দূরে অপেক্ষা করত। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইত। আমি তার সঙ্গে কথা বলতাম না, চোখ দিয়ে চারকে অন্য দিকে ফিরে চলে আসতাম।

কলেজ যাবার সময়ও এক-একদিন তার গাড়ি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে যেত। গাড়িতে আমাকে কলেজে পৌঁছে দেবার জন্য অনুনয়ই করত। আমি ঝাঁঝিয়ে উঠতাম, ফের এ-ভাবে আমার পিছু নিলে মুশকিল হবে। কিশোর শেঠ হাসত, বলত, তুমি নারাজ, এর থেকে মুশকিল আর কি হতে পারে?

বড়লোক শিষ্যকে গুরু যে একটু বেশি খাতির করতেন সে আমার নিজের চোখেই দেখা। সেখানে বলে কিছু সুবিধে হবে না। বাড়িতে কৃষ্ণদার এই হাল। মাঝখান থেকে লোক জানাজানি হয়ে একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হবে। আমি রাগে ফুলতাম, কিন্তু সহ্যও করতে হত। লোকটারও মুণ্ডু যে ভালোভাবেই ঘুরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গুরুর বাড়ির আর কলেজ যাওয়ার পথ যে আকৃতি নিয়ে গাড়িতে বসে থাকত, তাই দেখে সময় সময় হাসিও পেত। আমাকে একটু চোখের দেখা দেখতে পেলেও যেন জীবন ধন্য ওর।

আমার সেই সংকটের সময় ওর কথাই মনে এলো আমার। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাঙচুরের নেশা যেন পেয়ে বসল আমাকে। এই করলে বাবার ওপর শোধ নেওয়া হবে, পিসেমশাইয়ের ওপরেও।

সেদিনও কলেজের পথে কিশোর শেঠের গাড়ি দাঁড়িয়ে দেখলাম। সোজা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে তার পাশে বসলাম। এ-রকম ভাগ্য ওর কল্পনার বাইরে। আনন্দে ডগমগ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কলেজে তো?

—না। যেখানে খুশি।

হাওয়ায় ভেসে চলল কিশোর শেঠের গাড়ি। আমি সোজা ঘুরে বসলাম তার দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ঠিক ঠিক কি চাও বলো?

ও বলল, তোমাকে।

—বিয়ে করবে?

দম বন্ধ করে ও মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, করব।

—তোমাদের বাড়িতে আপত্তি হবে না?

মুখ কাঁচুমাচু করে ও বলল, তা একটু হবে হয়তো...।

—তাহলে ?

ও প্রাণপণে এই তাহলেব জবাব হাতড়ে বেড়াতে লাগল। আমিই বাস্তা দেখালাম, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পাববে ?

ও লাফিয়ে উঠল। তক্ষুনি বাজী। আমি বললাম, আজ নয, সময়ে বলব। বাড়িতে বলে বেখো কিছুদিনেব জন্য বাইবে যাচ্ছ, নইলে তোমাব বাড়ি থেকেও আবাব খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। আব বেশ কিছুদিন চলাব মতো টাকাকড়ি সঙ্গে নিও।

অত বলাব দবকাব ছিল না। ব্যবস্থামতো আমবা চলে এলাম বেনাবসে। এক নাগাড়ে কোথাও বেশিদিন থাকতাম না। ইউ পি-ব সর্বত্র প্রায় মাসখানেক ঘোবাঘুবি কবে কাটল। কিশোব শেঠ আমাব কেনা গোলাম যেন। যা বলি তাই শোনে। আমাব একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আব আনন্দেব জন্য দেদাব খবচ কবে। ওকে যতটুকু পাগল কবা দবকাব কবেছি। বিকেল হতে না হতে বাতেব প্রত্যাশায় বসে থাকত। কিন্তু বিযেব কথা তুললেই ওব মুখ ছাইযেব মতো ফ্যাকাশে হযে যেত। বলত, হবে, খুব শীগগিবই হবে, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?

আমাব সন্দেহ বাড়তে থাকল। শেষে জেবাব ফলে একদিন ধবা পড়ে গেল। দু-বছব আগেই ওব বিযে হযে গেছে। ঘবে বউ আছে। হাঁটু গেড়ে আমাব পা দুটো জড়িযে ধবে ওব সে-কি আকুতি। বিযে কবলেও আমিই ওব ধ্যান জ্ঞান, আমিই সব। বিযে ও আমাকে ঠিকই কববে, কিন্তু তাব আগে সব দিক গুছিযে নেবাব জন্য ওব কিছু সময দবকাব।

আমাব মাথায় আকাশ ভেঙেছে। ওব বুকে একটা ধাবালো ছোবা বসিযে দিতে পাবলে মন ঠাণ্ডা হত। সেই বাতে আমাব শয্যাব দিকে ওকে ঘেঁষতে দিলাম না। সমস্ত বাত বসে ভাবলাম। একদিন ওই কিশোব শেঠ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে ঠিক জানি। কিন্তু তাব আগে ওকে অবলম্বন কবেই আমাকে দাঁড়াতে হবে, ভবিষ্যতেব অনিশ্চযতা দূব কবতে হবে। এটুকু যদি না পাবি, আমাব রূপ যৌবন চোখেব আগুন সব মিথ্যা।

পবদিনই আবাব ওকে কাছে টেনে নিলাম। খুব হাসলাম। খুব আদব কবলাম। বললাম, তুমি এত ছেলেমানুষ আমি জানতাম না, প্রথমেই সব আমাকে খুলে বললে পাবতে—সত্যিকাবেব ভালবাসাব মানুষকে ওটুকুব জন্যে কেউ কি ফেলে দিতে পাবে, না কি সত্যিকাবেব ভালবাসা সমাজসংসাবেব পবোযা কবে ?

কিশোব শেঠ বর্তে গেল।

আমি আবো নিশ্চিন্ত কবে দিলাম তাকে। বললাম, যাকগে, বিয়েব ভাবনা আব তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি তোমাব প্রেযসী হযেই থাকব—কিন্তু তুমি আমাকে তোমাব রুচিব যোগ্য কবে তোলো, এই যৌবনেব ফুল শুধু তোমাব জন্যেই যেন সম্পূর্ণ হযে ফুটতে পাবে সেই ব্যবস্থা কবো।

ব্যবস্থাটা কি প্রথমে বোঝেনি, পবে বোঝাব পব আনন্দে আত্মহারা হযেছে। হবে না কেন, টাকাব তো অঢেল জোব। ওকে নিযে আমি লক্ষ্ণৌ চলে এসেছি। সেখানে অনেক খবচ কবে গুণী ওস্তাদ বেখে আবাব গান বাজনাব তালিম নিতে শুরু কবেছি।

নাচও বাদ দিইনি। নামী বাঈজীর কাছে সহবৎ শিক্ষা করেছি। না, বোকার মতো কিশোর শেঠকে আমি সেখানে আটকে রাখিনি। সে তারই ইচ্ছে মতো বাড়িতে গেছে এসেছে। যখনই এসেছে দু' পকেট বোঝাই টাকা এনেছে। আমি অম্লান বদনে সে-টাকা নিজের দখলে রেখেছি, আর প্রতি বারের থেকে প্রত্যেক বারে বেশি প্রেমের অভিনয় করেছি। ওকে পাগল করাটাই আমার লক্ষ্য। পাগল করেছি।

খুব বেশি সময় লাগেনি। গলা তো অনেকটা তৈরিই ছিল, বছর চারেকের মধ্যেই আমাকে নিয়ে টানাটানি পড়তে লাগল। আমার রূপ যৌবন কটাক্ষ সবই কাজ করত, ফলে টাকাও বেশি পেতাম। নাচ গান তো আছেই, আরো প্রত্যাশায় টাকার মানুষেরা পায়ে এসে গড়াগড়ি খেত। প্রাপ্যগণ্ডা মনের মতো হলে তাদেরও করুণা করতে আমার আপত্তি হত না। আমার ভিতরে সেই থেকেই শুধু ধ্বংসের আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে নিজেকে পোড়ানো আর মত্ত উল্লাসে পুরুষ পোড়ানোই একমাত্র লক্ষ্য। সে-সময়ে যদি তোমার দেখা পেতাম বাঙালীবাবু, তাহলে তোমারও কি সর্বনাশ যে হত কে জানে। কৃষ্ণদা অনেক আগেই মারা গেছে সে-খবর কিশোর শেঠ আমাকে এনে দিয়েছিল। আমার কাছে দুনিয়ার বাকি সব পুরুষ নরকের জীব। তারা যত বেশি জ্বলবে আমার তত উল্লাস।

এর পর আমার প্রথম কাজ কিশোর শেঠকে ছিবড়ের মতো বাতিল করা। আমার আশা ছেড়ে তাকেও একদিন জ্বলতে জ্বলতে ঘরে ফিরতে হয়েছে। আমার ব্যাঙ্কের জমা টাকা বাড়ছেই, অলঙ্কারের ঐশ্বর্যও বাড়ছেই। পুরনো হয়ে যাবার ভয়ে খুব বেশিদিন কাউকে আমি এক নাগাড়ে ধরে রাখি না। ফলে নতুন নতুন মানুষের ধর্ণা দেওয়া আর মাথা খোঁড়ারও বিরাম নেই।

এবারে নিশ্চয় ঘৃণায় শিউরে উঠছ বাঙালীবাবু। আরো একটু বাকি—শোনো। তখন আমার বয়েস বত্রিশ পেরিয়েছে। অর্থাৎ এলাহাবাদ ছাড়ার পর তের-চোদ্দ বছর কেটে গেছে। কিন্তু পুরুষ তখনো আমাকে নিয়ে এমনি মত্ত যে বয়েস দেখার চোখ কারো নেই। এদিক থেকে ভগবানের কিছু মাত্র কার্পণ্য ছিল না বলে বয়েস চোখে পড়ার কারণও নেই। সেবারে এক ধনীর দুলালের সঙ্গে এসেছি মধ্যপ্রদেশের কোনো এক জায়গায়। টাকার অঙ্ক সে-রকম হলে তাতেই বা আপত্তি কি? এ-রকম কত সময় কত জায়গায় গেছি, ঠিক নেই।

জঙ্গলের মধ্যেই মাঝারি আকারের একটা ডাক-বাংলো। ফুর্তির জায়গা হিসেবে আমার সঙ্গী সেই বাংলোটাই বেছে নিয়েছে। বাংলোয় আমি আর সে ছাড়া আর যে লোকটার অবস্থান, মানুষ না বলে তাকে জানোয়ারই বলা চলে। বছর সাঁইতিরিশ-আটতিরিশ হয়তো বয়েস, পা থেকে গলা পর্যন্ত গরম কম্বল জড়ানো, মাথার চুল পিছন দিকে পিঠে এসে নেমেছে, আর গাল বোঝাই দাড়ি বুকের দিকে। গায়ের আর চুল দাড়ির রং মিলেমিশে একাকার। এখানে আসার পর এমনি হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়েছিল যেন জীবনে আর কখনো মেয়েছেলে দেখেনি। আমার সঙ্গী ধমকে উঠতে তবে সে আত্মস্থ হয়েছে।

লোকটা এই বাংলোর চৌকিদার।

আমরা বিকেলের দিকে এসেছি। দিন দুই থাকার ইচ্ছে। সন্ধ্যা নামতেই সঙ্গী মদের গেলাস নিয়ে বসেছে। ওরা যত মদ গেলে আমার তত সুবিধে। হামলা হুজ্জোত কম হয়। ওকে সঙ্গ দেবার জন্য আমিও গেলাস নিয়ে বসেছি। আর খাচ্ছিও একটু বেশিই। সেই সঙ্গে গুনগুন করে বসের গানও গেয়ে উঠছি। এক-একবার উঠে নাচার চেষ্টাও করছি।

রাত তখন ন'টা-দশটার বেশি নয়। কিন্তু এখানে তখন নিঝুম রাত। খাওয়াদাওয়ার পরে আরার এক-প্রস্থ মদ গিলল লোকটা। তারপর আমার দিকে এগলো। ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে। আমার ঘুম পাচ্ছে। কতক্ষণে অব্যাহতি পাব ভাবছি।

হঠাৎ ঠাস করে ঘরের ভেজানো দরজা দুটো খুলে গেল। কেউ যেন প্রচণ্ড এক লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলল। ঘরে এসে দাঁড়াল যমদূতের মতো সেই চৌকিদার। জন্তুর মতোই জ্বলছে তার দুটো চোখ। গায়ের কম্বল ফেলে এগিয়ে এসে আমার বুকের ওপর থেকে সঙ্গীকে যেন ছোঁ মেরে টেনে তুলে নিয়েই এক আছাড়। লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। আমি কাঠ। যমদূতের মতো ওই চৌকিদার আরারও এগিয়ে গেল তার দিকে, আরারও টেনে শূন্যে তুলে নিল। তারপর তাকে নিয়ে চোখের পলকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি কাঁপছি থরথর করে। কি চায় লোকটা? কি মতলব ওর? একে একে দুজনকেই খুন করবে আমাদের?

একটু বাদেই মোটর স্টার্ট দেবার শব্দ কানে এলো। কি হল? আমাকে রেখে সঙ্গীকে গাড়িসুদ্ধ তাড়িয়ে দিল। ওই শীতেও আমি ঘামছি। শয্যায় উঠে বসে কাঁপছি।

সাক্ষাৎ যমের মতো ওই চৌকিদার ফিরল আরার। আমার দু হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে অপলক চেয়ে রইল। এখন আর ওই দুটো চোখ জানোয়ারের মতো জ্বলছে না। তার বদলে গলগল করে যেন ঘৃণা ঠিকরোচ্ছে। সেই ঘৃণা আমার চোখে মুখে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে!

কিন্তু এরকম অপলক চাউনি আমি আর কি দেখেছি? কার দেখেছি? কবে দেখেছি? কোথায় দেখেছি? এ কাকে দেখছি আমি? আমার সামনে দাড়িয়ে এ কে?

লোকটা নিজের মোটা ময়লা জামার পকেটে হাত ঢোকালো। কি যেন বার করল। তারপর সেটা আমার সামনে, সজোরে আমার বিছানার ওপর আছড়ে ফেলল।

জিনিসটা চিকচিক করে উঠল। দু চোখ বিস্ফারিত করে আমি দেখলাম একটা হার। আমার মায়ের দেওয়া সেই চুরি যাওয়া হার।

মুখ তুলে দেখলাম, লোকটা ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

এবারে চিনলাম। সেই মধু। সেই মধু যাদব।

...তার পর থেকে বাঙালীবাবু, তুমি যা দেখলে আমি তাই। এক বছর বাদে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের সেই বাংলোয় আর একবার গেছলাম মধুর খোঁজে। সে নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। আমি এখনো গান গাই আর গোপাল পুজো করি। আমার গোপালের মুখ আর মধুর মুখ আজও মাঝে মাঝে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সেও কি পাপ?

আমি জানি না।

দ্বিতীয় বাসর গাঁজাখুরি

১

কাহিনীব নামেব প্রসঙ্গ পবে। কাহিনী প্রসঙ্গও পবে।

একজোড়া দম্পতি ঘাটশিলা বেড়াতে গেছেন সেটা গাঁজাখুবি ব্যাপাব কিছু নয়। বেড়ানোব মৌসুমে বহুজোড়া দম্পতি গিযে থাকেন। এটাও বেড়ানোব অথবা স্বাস্থ্যোদ্ধাবেব মৌসুম। এই বছবেবই অর্থাৎ আশি সালেব আশ্বিন মাস। সালটা টাটকা বটে, কিন্তু ওই দম্পতি টাটকা বা কাচা কিছু নয। চৌষট্টি আব সাতান্ন। মোহিনী সবকাব চৌষট্টি। লম্বা, কালো। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। চাউনিতে বুদ্ধিব ছাপ। এই বযসেও শক্ত-সমর্থ মনে হয। কিন্তু বছব দুই আগে একবাব ছোট-খাটো হার্ট অ্যাটাক হযে গেছে। হাইকোর্টেব নামী অ্যাডভোকেট। সকাল সাতটা থেকে বাত দশটা পর্যন্ত সেবেস্তা-কোর্ট সেবেস্তা কবে অভ্যস্ত। কিন্তু দু'বছব আগে ওই অ্যাটাকটি হযে যাবাব পবে জীবনেব দোসব সাতান্নটি অর্থাৎ বিভা সবকাব তাব সমযেব ওপব প্রকাণ্ড একটা থাবা বসিযেছেন এবং ফাক পেলেই বসিযে চলেছেন। বিভা সবকাবেব ডাক্তাব বাবা এখনো বেচে, আব ডাক্তাব দাদা তো বহাল তবিযতে বেঁচে। তাঁদেব পবামর্শেব পবোযানা নিযে বিভা সবকাব দাবি কবেছিলেন, প্র্যাকটিস থেকে সম্পূর্ণ অবসব নিতে হবে। অনেক বাক-বিতণ্ডাব পব আপসবফা হযেছে। বাছাই দু'চাবটে কেস শুধু নেবেন, তাব বেশি নয। সপ্তাহে বড়জোব তিন দিন কোর্টে যাবেন, তাব বেশি নয। আব বছবে অন্তত তিন বাব বেড়াতে বেরুবেন, তাব কম নয।

বিভা সবকাবেব সাদা সাপ্টা হিসেব। মানুষ যা কিছু চায সবই তো হযেছে বাপু, আব কেন? নিজেব মস্ত বাড়ি হযেছে, দু-তিন বছব অন্তব নতুন নতুন গাড়ি হচ্ছে, ব্যাঙ্কে টাকা যা আছে দেড়শ' বছব বেঁচে থেকে বসে খেলেও ফুবোবে না —এ ছাড়া ওপবে নিচে দুটো দুটো কবে এযাবকুলাব, দুটো ফ্রিজ, টি-ভি—কি না হযেছে। আব কি চাই বা কত চাই? তাব মতে কেবল কাজ কবা আব টাকা আনা একটা অভ্যাসেব বোগ ছাড়া আব কিছু নয।

মাযেব সঙ্গে একেবাবে একমত তাঁদেব ব্যাবিস্টাব ছেলেব। একমাত্র ছেলে। আব কোনো সন্তান নেই। অতএব তাব মতেবও বীতিমতো জোব থাকাই স্বাভাবিক। ব্যাবিস্টাব ছেলেব যা আয তাব বেশিব ভাগ বাবাব জনিযব হিসেবে। বাধ্য হযেই এই বাস্তব তাকে মেনে নিতে হযেছিল। বাবা প্র্যাকটিস কমানো মানেই তাব প্র্যাকটিস বাড়া। কাবণ বাবা যখন একেবাবে সবে দাড়াচ্ছে না, তখন মক্কেলবাই বা একেবাবে সবে যাবে কেন?

অগত্যা একা মোহিনী সবকাব সকলেব সঙ্গে আব কত যুঝতে পাবেন? তাই বুদ্ধিমানেব মতো অনেকটা অবকাশেব কোলে গা ছেড়ে দিযেছেন। তাব মনে মনে ধাবণা, ছোটখাটো হার্ট অ্যাটাকেব ফলে স্ত্রী-টি ভিতবে ভিতবে একটু খুশিই হযেছেন। তাঁব কাজকর্মেব ওপব এত জাবিজুবি আব কখনো খাটাতে পাবেন নি। এই বযসে এসে স্বামীটিকে মোটামুটি দখলেব ওপব পেযেছেন। গোড়ায গোড়ায মোহিনী সবকাবেব

এত অবকাশ ভালো লাগত না। হাঁপ ধবে যেত। এখন সযে যাচ্ছে শুধু নয়, তাঁবও ভিতবে একটু গা-ছাড়া ভাব এসেছে। এই দেশটা যে বেশ একটু ঘুবে বেডাবাব জাযগাও এটা অনুভব কবছেন। এখন অনেক কিছু খুটিযে দেখেন যা আগে দেখতেন না। অনেক কিছু পডেন যা আগে পডতেন না।

হালেব গল্প-উপন্যাস ছেডে ববি ঠাকুবেব কবিতা পডেও বেশ বস পাচ্ছেন আজকাল। পডাব ব্যাপাবে তাঁব গাইডেব কাজ কবছেন বিভা সবকাব। এককালে স্ত্রীটিব লেখিকা হবাব সখ ছিল। বযেসকালে কিছু লেখা খুব সংগোপনে মাসিক-সাপ্তাহিকেব দপ্তবে পাঠিযেছেন এবং তা ফেবতও এসেছে। ক্রমে লেখিকা হবাব সাধ গেছে, কিন্তু গল্প-উপন্যাস পডাব ঝোঁক বেডেছে। নেশা বলতে এখন ওই একটাই। হাতে গোনা যে দু'চাবজন লেখকেব লেখা তাঁব ভালো লাগে তা বাবকযেক পডা না হলে তৃপ্তি নেই। দিনে হোক বাতে হোক ভালো গল্প উপন্যাস পডাব অভ্যাসটা শুযে এবং বই বুকে নিযে। তাই দেখে মোহিনী সবকাব কত ঠাট্টা কবেছেন। বলেছেন, তোমাব ভালো লেখকদেব ভাগ্য বটে, ষোল থেকে সত্তব বছবেব তরুণী যুবতী প্রৌঢা আব বৃদ্ধাব বুকে বুকে ঘুবে বেডান। এমন জানলে ওকালতিব দিকে না গিযে লেখক হতাম।

বিভা সবকাবও সমান তালে জবাব দিতেন, মেযেদেব বুকে ওঠাব মতো লেখক ইচ্ছে কবলেই হওযা যায না—বুঝলে। এ তোমাব পেনাল কোড না যে ঝেডে মুখস্ত কবে মেবে দিলেই হল। লেখক হতে হলে জীবন দেখাব আব জীবন-জটিলতা বোঝাব আলাদা চোখ আলাদা মন দবকাব।

মহিলাব বাছাই-কবা লেখকদেব বই বেরুলে তিনি কিনেই ফেলেন। লাইব্রেবি থেকে এনে পডাব অপেক্ষায থাকেন না। এই কবে তাঁব নিজস্ব লাইব্রেবিটি কম বড নয। এখন সেখান থেকে বই বেছে বেছে নিযে তিনি স্বামীকে পডান। পডাব পব আলোচনা কবেন। এক-এক সময জোব তর্কও বেধে যায। কাবণ স্ত্রীটিব যে লেখক যত প্রিয, তাব এই সমালোচনায মোহিনী সবকাব ততো নির্মম। স্ত্রীব কাছে ভালো লাগাব দিকটা এডিযে কেবল খুঁতগুলোই বড কবে তোলেন এবং স্ত্রীব তর্কেব মেজাজ দেখে মনে মনে খুশি হন। মোটকথা স্ত্রীব পাল্লায পডে আব সময কাটানোব দাযে ইদানীং গল্প-উপন্যাস পডতেও ভদ্রলোকেব ভালোই লাগে।

এবাবে কাছাকাছিব মধ্যে সস্ত্রীক ঘাটশিলায এসেছেন। ছেলে বা ছেলেব বউ তাঁদেব সঙ্গে কখনো বেবোয না। এদিকে মোহিনী সবকাব সস্ত্রীক আসা মানে সঙ্গে পুবনো খানসামা আসা, একটা ছোকবা চাকব আসা, চাকবেব থেকে প্রমোশন পাওযা বযস্ক অথচ কর্মঠ কেযাবটেকাবেব আসা। সকলেই এসেছে। সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে আবামে বা ভালো থাকাব জন্যে যেসব সবঞ্জাম আনা সম্ভব তা-ও এসেছে। অথচ সবকাব দম্পতি এখানে একমাস থাকবেন কি এক সপ্তাহ সেটা কেমন লাগে তাব ওপব নির্ভব। বেশ নিবিবিলি ছিমছাম জাযগা. স্বাস্থ্যকব তো বটেই, আশা কবা যায ভালোই লাগবে।

এখানে এসে তিন চাব দিন ধবে মোহিনী সবকাব আব বিভা সবকাব আব একজোডা ভদ্রলোক আব ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য কবছেন। এদেব দৃষ্টিতে তাঁবা আব

যা-ই হোন দম্পতি বলে মনে হয় নি। মোহিনী সরকার উকিলের চোখ দিয়ে তাঁদের দেখছেন। আর বিভা সরকার তাঁব সহজাত মেয়েলি কৌতূহলের চোখ দিযে। খুব সকালে তিন মাইল দূবেব বাজারে বা কিছুটা কাছের হাটে দুজনকে দেখেছেন। এখানে খুব সকালে ভিন্ন বাজার থেকে পছন্দের মাছ তরকারি বা মাংস মেলা ভাব। বেড়ানোর মৌসুমে লোকের ভিড়ে তো বাজাব আরো আকাল হয়ে ওঠে। মোহিনী সরকার সস্ত্রীক সাইকেল বিকশয় আসেন, হাট বা বাজাব সেবে তাতেই ফেরেন। তাঁদের লক্ষ্যের ওই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাও তাই। মোহিনী সবকাব তাঁদের বাজাব করাও একটু-আধটু লক্ষ্য কবেছেন। ভদ্রলোককে এই বযসেও একটু পেটুক মনে হয তাঁব। কাবণ, সামনে যা দেখেন সঙ্গিনীকে তাই কিনতে বলেন। আব সঙ্গিনীটি সুন্দব মুখে একটু ভুরু কুঁচকে বা একটা হাত অল্প একটু নেড়ে তাব বেশির ভাগই বাতিল কবে দেন। মোহিনী সবকাব বেশ লক্ষ্য কবেছেন, মহিলা নিজের বিবেচনামতো পবিমিত বাজাব কবেন। নিজেই শক্ত হাতে বাস্কেট বা ব্যাগ নিয়ে বাজাব বহন কবেন। মাথায কাপড় থাকে না তখন, শাড়িব আঁচল গাছকোমর কবে জড়ানো থাকে। মোহিনী বা বিভা সবকাবেব বাজাবের ব্যাগ আব থলে অবশ্যই ছোকবা চাকবটাব হাতে। সময় হিসেব কবে তাকে আগেই পাঠিয়ে দেওযা হয। বাজাব শেষে ছোকরাটা হেঁটে ফেবে, আর বাজার ফেবে তাঁদেব বিকশয।

হাটে বা বাজারে ছাড়া বাস্তায দেখা হচ্ছে, শীর্ণ সুবর্ণরেখাব ধাবে বা কাছেব পাহাড়ী টিলাটাব কাছেও দেখা হচ্ছে। কাছাকাছির মধ্যে বেড়াবাব জাযগা এই দুটোই। শহবেব মধ্যে বেড়াতে বেরুলে এব এক জাযগায না এক জাযগায দেখা হবেই। কিন্তু বেড়াতে তো আবো অনেকেই বেবিযে থাকেন। অথচ সবকাব দম্পতিব অবধারিত লক্ষ্য ওই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাটি।

লক্ষ্যেব প্রধান কাবণ বোধহয দুজনেব বযসেব ফাবাক। ফাবাকটা অবশ্য সবকার দম্পতিব বিবেচনায। দুজনেবই ধাবণা, ভদ্রলোকেব বযেস সত্তবেব কিছু ওপবে ছাড়া নিচে হবে না। মাথায চুল যেটুকু আছে সবই সাদা। গাযেব বং না কালো না ফর্সা। চোখে মোটা কাচ আব মোটা ফ্রেমেব চশমা। লাঠি ব্যবহার করেন না বটে তবে ধীবেসুস্থে পা ফেলে হাঁটেন। মুখখানা হাসি-হাসি, কিন্তু, মহিলাব তুলনায কথা কম বলেন যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যখনই দেখা হয, মহিলাকে বেশ সুন্দব ভঙ্গীতে একটু একটু হাত নেড়ে কথা বলতে দেখা যায। ভদ্রলোকেব বেশির ভাগ শ্রোতাব আব অল্প অল্প হাসাব ভূমিকা।

কৌতূহলেব বা লক্ষণীয হযে ওঠাব আসল কাবণ ওই মহিলা। দুজনেরই মতে তাঁর বয়েস খুব বেশি হলে সাতচল্লিশ কি আটচল্লিশ। মাথায় একবাশ কুচকুচে চুলেব ওপব দিযে কতগুলো রুপোলি চুল ছড়িয়ে না থাকলে বা কানেব দুপাশেও কিছু পাকা চুল দেখা না গেলে সাতচল্লিশ আটচল্লিশও আদৌ বলা যেত না। গায়ের রং বীতিমতো ফর্সা, মুখশ্রীও সুন্দবই বলতে হবে। কিন্তু অমন ফর্সা বা অমন মুখশ্রীও হামেশাই দেখা যায। এ ছাড়াও মহিলাব মধ্যে দর্শনীয কিছু আছে যা চট কবে ঠাহব করা যায না, অথচ অনুভব কবা যায়। বযেসকালে প্রায় দীর্ঘাঙ্গী মহিলার স্বাস্থ্য-সম্পদ নিশ্চয়

চোখে পড়াব মতো ছিল। তাবই তৎপবতাটুকু এখনো যেন সর্ব অঙ্গে ছড়িযে আছে। তাঁব বাস্কেট হাতে বাজাব কবা, হাঁটা চলা কথা বলাব সময় ঈষৎ চঞ্চল ভঙ্গীতে সুডৌল হাত নাড়া—সবকিছুব মধ্যে সেই সুতৎপব মাধুর্যটুকু বমণীয হযে ওঠে। সুগৌব কপালে ছোটব ওপব জ্বলজ্বলে সিঁদুবেব টিপ, সিঁথিতে সিঁদুবেব জ্বলন্ত আঁচড। এ বকমই হযতো সকলে পবে, কিন্তু মহিলাব সজীবতাব দরুন তা-ই হযতো একটু বেশি উজ্জ্বল মনে হয। মহিলাব মধ্যে দর্শনীয় কি মোহিনী সবকাবেব ধাবণা তিনি ধবতে পেবেছেন এবং স্ত্রীকেও বলেছেন। সাতচল্লিশ বা আটচল্লিশ যে বযেসই হোক এখন, মহিলাব চাল-চলনে তা-ও যেন একটু তফাতে সবে আছে—ছুঁযে থেকেও ছুঁতে পাবছে না। বিভা সবকাব এই মন্তব্যেব সঙ্গে খুব দ্বিমত হননি।

এখন প্রশ্ন বা কৌতূহল, ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকেব কে হতে পাবেন? আত্মীযা তো বটেই। তাঁদেব বাড়িব আধ মাইলেব মধ্যে বেল লাইনেব কাছাকাছি দু'খানা ঘবেব একটা ছোট্ট বাংলোয ওঁবা আছেন—আসতে যেতে সবকাব দম্পতি তা-ও দেখে বেখেছেন। আত্মীযা ভিন্ন ওই বুড়োব সঙ্গে এসে এক বাড়িতে থাকা, এক বিকশয চেপে বাজাবে যাওযা বা বিকেলে একসঙ্গে বেড়াতে যাওযা সম্ভব কেউ ভাবে না। আত্মীযা তো বটেই, ঘনিষ্ঠ আত্মীযই মনে হয। কিন্তু সেটা কি হতে পাবে? অবকাশ অঢেল, তাই আলোচনাতেও আলস্য নেই। মোহিনী সবকাব আব বিভা একটু হিসেবও কবেছেন। বিভা বলেছেন, ধবা যাক ভদ্রলোকেব বযেস বাহাত্তব, তাব বেশি ছাড়া কম কিছুতে হবে না, আব ওই মহিলাব বড়জোব আটচল্লিশ—তাহলে তফাৎ কত হল?

—চব্বিশ।

বিভাব মন্তব্য, আগেব দিনেব মানুষদেব বিযে তো একটু আগেই হত—তাহলে ভদ্রলোকেব মেযে হওযাই সম্ভব।

মোহিনী সবকাবেব উকীলেব মাথা, তাব ভাবনাও একেবাবে অত সহজ বা সবল কিছু না। জবাব দেন কিন্তু মেযে মনে হয না। প্রথম কথা, ভদ্রলোককে মহিলাব আগলে বাখাব মধ্যে একটু মিষ্টি শাসনেব ভাব আছে যা বাদ দিলে তোমাব সঙ্গেও একটু আধটু মেলে।

বিভা ছোট্ট প্রতিবাদ কবলেন, আ-হা—

—দ্বিতীয় কথা, আজই তোমাতে আমাতে ওই ঢিবিতে বেড়াতে গিযে দেখলাম, বিকেলেব আলোয টান ধবতে না ধবতে ব্যাগ থেকে চাদব বাব কবে মহিলা নিজেব হাতে বেশ কবে ভদ্রলোকেব গাযে গলায জড়িযে দিলেন, যা অনেকটা শবৎবাবুব নাযিকাদেব সঙ্গে মেলে। কিন্তু তাদেব মধ্যে একমাত্র শেষ প্রশ্নে তাজমহলে বেড়াতে এসে আশু বদ্যিব মেযে মনোবমাকে বাব দুই বলতে শুনেছি বাবা ওঠো, তোমাব ঠাণ্ডা লাগবে। নিজে হাতে কিছু কবে নি। মোট কথা, ওভাবে চাদব জড়িযে দেওযাটা বাবা মেযেব সম্পর্কেব মতো আমাব একটুও মনে হয নি।

কি বলতে চান বিভা অতটা তলিযে না ভেবেই জিজ্ঞাসা কবলেন, তাহলে কি অনেক ছোট বোন-টোন হবে?

মোহিনী সবকার হালছাড়া গলায় বললেন, এত আধুনিক বই গিলে শেষে এই ছন্দপতন! ভাই-বোনের ছাঁদ-ছিরিতে এমন অসম্ভব তফাৎ হয়! হলেও আমার ভাবতেই নীরস লাগে। আমি বলছিলাম, ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকের তৃতীয় বা চতুর্থ পক্ষের উনি হতে বাধাটা কি—তা হলে অনেকগুলো কনডাক্ট রুল মানে আচরণ-বিধি মেলে।

বিভা সবকার বক্র শ্লেষে তক্ষুণি সেই সম্ভাবনা বাতিল করেছেন।—হুঁঃ, খোঁজ নিয়ে দেখো গে যাও বয়েসকালে প্রথম পক্ষ করার জন্য কত ছেলে ও মেয়ের পায়ের কাছে গড়াগড়ি খেয়েছে—দেখলে বুঝতে পারো না? অমন খ্যাংরাকাঠির তৃতীয়-চতুর্থ হবার তার দায় পড়েছে।

—তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু অমনটি হলেই একটু বয়সের হয় না?

—রাজে বোকো না, শেষে দেখবে বাপ-মেয়ে বা সেই গোছের কিছু, তখন রস বেরিয়ে যাবে। তুমি যে বলেছিলে, কদিন দেখার পর ভদ্রলোকের মুখখানা একটু চেনা-চেনা ঠেকছে, কোথাও দেখেছ মনে হচ্ছে—মনে পড়ছে?

দু'তিন দিন দেখার পর মোহিনী সরকারের সত্যি মনে হয়েছে ভদ্রলোকের ওরকম একখানা মুখের আদল, বিশেষ করে ওই গোছের একটু মিষ্টি মিষ্টি হাসি করে কোথাও দেখেছেন। ওকালতিতে আইনের ধারা পড়ে পড়ে হোক বা যে কারণেই হোক, আজও তাঁর প্রখর স্মরণশক্তি। কিন্তু অনেক ভেবেও তিনি ঠিক করতে পারেন নি, এই ভদ্রলোকটিকে কোথাও তিনি দেখেছেন কি দেখেন নি। অথচ মনে হয় দেখেছেন।

জবাব দিলেন, না, কত অচেনা লোককেই তো অনেক সময় চেনা-চেনা মনে হয়।

স্ত্রীটি তক্ষুণি সন্দিগ্ধ।—আসলে তোমার মেমরি খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

আরো দু'দিন বাদে চাক্ষুষ দেখা আর সামনা-সামনি আলাপ। বিকেলের দিকে মোহিনী সরকার আর বিভা সরকার বেল লাইনের দিক ধরে বেড়াতে বেড়াতে আসছিলেন। ওই দ' ঘরের বাংলোর সামনের ঘরের দরজা খোলা। দরজা আগলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। গায়ে একটা আধা গরম চাদর জড়ানো। তাঁদের দিকেই চেয়ে আছেন।

মোহিনী সরকারও তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ হাসলেন একটু। অবশ্যই সৌজন্যের হাসি।

ভদ্রলোকও তক্ষুণি হাসলেন এবং মিষ্টি হাসি।

মোহিনী সরকার আর বিভা সরকার তখন বাংলোর দশ গজের মধ্য দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। মোহিনী সরকার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হাসিমুখে দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানালেন।

ভদ্রলোকও তক্ষুণি প্রতি-নমস্কার করে অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন আসুন —বেড়িয়ে ফিরছেন?

মোহিনী সরকার ঘুরে স্ত্রীর হাসিছোঁয়া মুখখানা একবার দেখে নিয়ে ভদ্রলোকের দু' গজের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।—হ্যাঁ... আপনারা আজ বেরোন নি?

মুখখানা একটু বিবস করে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, নাঃ, আমার শরীরটা নাকি আজ খুব ভালো নেই।

শুনে মোহিনী সরকার এবং তাঁর পিছনে বিভা সরকার অবাক। নিজে বলছেন, শরীরটা নাকি ভালো নেই—এ আবার কি কথা?

ভদ্রলোক আবার সাদর আহ্বান জানালেন, আসুন, ভিতরে আসুন।

তাঁরা তবু একটু দ্বিধান্বিত। অসুবিধে হবে কিনা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই ভদ্রলোকের পিছন থেকে কচি ছেলের গলার মতো মিষ্টি রমণীকণ্ঠ শোনা গেল, কার সঙ্গে কথা হচ্ছে?

ভদ্রলোকের এবারের জবাবও অদ্ভুত। পাশের ঘরের দিকে সামান্য ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিলেন, আমাদের সেই ওঁরা—

না বুঝে ঈষৎ বিস্ময়ে ভিতরের মহিলা এগিয়ে এসে ভদ্রলোকের পাশ দিয়ে দেখলেন। তারপরেই হাসিমুখে ব্যস্ত আহ্বান জানালেন, ও... আসুন আসুন। আঃ, দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকলে ওঁরা আসেন কি করে।

শেষেরটুকু ভদ্রলোকের উদ্দেশে। তিনি অপ্রস্তুত মুখে সরে দাঁড়ালেন। মোহিনী আর বিভা সরকার ভিতরে ঢুকলেন। মহিলা সামনের কাঠের চেয়ার দুটো দেখিয়ে বললেন, বসুন—

চেয়ার দুটোর পাশেই একটা ইজিচেয়ার পাতা। বিভা হাসি হাসি মুখে একটা কাঠের চেয়ারের দিকে এগোলেন। কিন্তু বসার আগেই বাধা পড়ল। মোহিনী সরকার প্র্যাকটিস অনেক ছেঁটে দিলেও বাঘা উকিল তো বটেন। মনে মুখে তেমন লাগাম টেনে কথা বলার অভ্যেস নেই। তিনি ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বলে উঠলেন, দাঁড়ান, একটা জিনিস আগে বুঝে নিই, উনি (মহিলা) কার সঙ্গে কথা হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে আপনি জবাব দিলেন, আমাদের সেই ওরা—মানে, আপনাদের আমরা... কি রকম ব্যাপার?

বিভা সরকারের চোখে কৌতুক, মহিলার অপ্রতিভ মিষ্টি মুখ। ভদ্রলোকের গাইরেটা একটু নির্লিপ্ত গম্ভীর বটে, কিন্তু কথা একটু কৌতুক-ছোঁয়া হেয়ালি গোছের। বিনীত জবাব দিলেন, আমার বলার মধ্যে একটু ভুল হয়েছে। বলা উচিত ছিল বাইরে দেখা হয়ে গেলে আমরা যাঁদের সেই ওঁরা।

জবাব শুনে তুখোড় চালাক মানুষ মোহিনী সরকার ভিতরে ভিতরে একটু হোঁচট খেলেন। অথচ কথাগুলো সঠিক বোধগম্য হল না। মহিলা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, আপনারা বসুন, ওঁর কথায় কান দেবেন না—

বসার আগে মোহিনী সরকার বললেন, দাঁড়ান, আগে নিজেরা নিজেরা পরিচয় করে নিই। আমি মোহিনী সরকার, পেশা হাইকোর্টের ওকালতি—আর ইনি আমার স্ত্রী মিসেস সরকার—আপাতত প্র্যাকটিস অর্ধেকের বেশি ছেড়ে দিয়ে এঁর শাসনে আছি—

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, আ-হা, সুশাসন বলুন। নমস্কার, নমস্কার। আমার যে নামটা ইদানীং সব থেকে প্রিয় সেটা হল খোকা—যত বয়েস হচ্ছে এই নামের টান ততো বাড়ছে। তাই আমি খোকা গাঙ্গুলি।

মোহিনী সরকার এবারে বুঝলেন, ভদ্রলোক বাইরে যেমনই হোক ভিতরে রসিক মানুষ। হাসিমুখে নিজেও তক্ষুণি একটু রসিকতা করে বসলেন, আপনাকে তাহলে খোকাবাবু বলে ডাকব?

—নিশ্চয় ডাকবেন। একদিকে মিষ্টি, অন্যদিকে লোকে শুনলে মজা পাবে।

পরিচয় শেষ হবার আগেই থেমে যাবার উপক্রম দেখে একটু বেশি আগ্রহ নিয়েই হয়তো মহিলাকে দেখিয়ে মোহিনী সরকার জিজ্ঞেস করলেন, ইনি...?

নির্লিপ্ত গম্ভীর গলায় খোকা গাঙ্গুলি বললেন, ইনি আমার ছোট শালী।

শোনামাত্র মোহিনী সরকার আর বিভা সরকার বিমূঢ়, হতচকিত। এটা বাইরের ঘর, যত বয়সই হোক শালী নিয়ে একঘরে...

কিন্তু ভালো করে মাথায় কিছু ঢোকার আগেই ভদ্রলোকের উদ্দেশে মহিলার ধমক শোনা গেল।—কি হচ্ছে? মুখ লাল করে অভ্যাগতদের দিকে ফিরে সুন্দর দু'খানা হাত জোড় করে বললেন, আমি মিসেস গাঙ্গুলি।

পলকে ঘর ছেড়ে পাশের ঘর থেকে একটা মোড়া নিয়ে এলেন।—বসুন আপনারা, আমি এতে বসি।

যে যার আসন নিলেন। সরকাররা দু'জন কাঠের চেয়ারে, খোকা গাঙ্গুলি ইজি-চেয়ারে। বসার পরেই মোহিনী সরকার অপ্রস্তুত। কারণ বসার ফাঁকটুকুর মধ্যে স্ত্রীর দিকে চেয়ে তিনি একটা বিজয়ীর দৃষ্টি হেনেছেন, তারপর মুখ ফিরিয়েই দেখেন, ভদ্রলোকের নির্লিপ্ত দু'চোখ তাঁরই মুখের ওপর। চোখোচোখি হওয়ামাত্র খোকা গাঙ্গুলি আলতো করে জিজ্ঞেস করলেন, কি হল? আপনি জিতেছেন আর আপনার স্ত্রী হেরেছেন?

শুনে ঝরঝরকার স্মার্ট মানুষ মোহিনী সরকার হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকাই খেলেন একটু। —কি বলছেন?

—দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান, না, মানে সবুর করুন। গম্ভীর মুখে ঈষৎ ভ্রূকুটি।—সেই প্রথম থেকে দেখছি আপনি আমার সোজা-সোজা কথাগুলোও বুঝতে পারছেন না। আচ্ছা, গোড়া থেকে একে একে বোঝাপড়াটা হয়ে যাক—

এ পর্যন্ত বলেই স্ত্রীর দিকে ফিরলেন।—এঁদের একটু চা দিতে বলো... আমি আধ পেয়ালার বেশি না।

সকোপে তাঁর দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে মহিলা হেসে ফেললেন। অতিথিদের বললেন, আসলে এঁর দু'বার হয়ে গেছে বলে আর সিকি পেয়ালাও জোটার কথা নয়—

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় তাগিদ দিলেন, তাড়াতাড়ি। এঁদের সঙ্গে বোঝাপড়াটা শুরু করতে পারছি না।

মহিলা তক্ষুণি উঠে গেলেন। প্রথম পরিচয়পর্ব এমনি অভিনব যে সৌজন্যের খাতিরেও দু'জনের কেউ চা থাক বলার ফুরসত পেলেন না। খোকা গাঙ্গুলি আধবসা থেকে তিন কোয়ার্টার শুয়ে পড়লেন। আর সেই ফাঁকে সরকার-দম্পতি বার দুই দৃষ্টিবিনিময় করে নিলেন। কাজের লোকটিকে চায়ের কথা বলে মিসেস গাঙ্গুলি এক মিনিটের মধ্যে ফিরে হাসিমুখে আবার মোড়ায় বসলেন।

মোহিনী সবকাব ভিতবে ভিতবে বেশ কৌতুকবোধ কবছিলেন। সপ্রতিভ মুখে বললেন, খোকাবাবু এবাবে বোঝাপড়া শুরু হোক—

খোকাবাবু আবাব সোজা হলেন। কিন্তু অতিথিব কথা কানেও গেল না যেন। স্ত্রীব দিকে ঝুঁকলেন, বেন্দাটাকে কি বলে এলে, আমাকে এই একটুখানি অন্তত দেবে তো? আঙুলে কবে পবিমাণ দেখালেন।—না কি এঁবা খাবেন আমি বসে বসে দেখব?

সবকাব-দম্পতি একটু জোবেই হেসে উঠলেন। মহিলাব হালছাড়া হাসিটুকু আবো সুন্দব। বললেন, এই বকমই বলাব স্বভাব, আপনাবা ভাবছেন আমি ভালো কবে খেতেই দিই না—

সঙ্গে সঙ্গে খোকা গাঙ্গুলিব ভ্রূকুটি এবং বিস্ময়।—সোমা। তুমি আব যা-ই কবো, মিথোব আশ্রয় তো নাও না। ওঁবা ভাবছেন কি বকম? সামান্য একটু চা নিয়েই যা ব্যাপাব, বৃহৎ ব্যাপাবে তুমি কি কবো সে-কি এঁদেব বুঝতে বাকি যে তুমি এঁদেব অন্যবকম ভাবাতে চাইছ।

এ ক'দিনেব দূব থেকে দেখা মানুষটাব এমন বসেব ফল্গুধাবা কল্পনা কবা যায নি। তাঁদেব বিশেষ জল্পনা-কল্পনা ছিল এই সোমা গাঙ্গুলিকে নিযে। সোমা নামটাও বেশ লাগল মোহিনী সবকাবেব। খোকা গাঙ্গুলি ছাড়া হাসছেন সকলেই। সোমা বললেন, লোকেব সামনে আমাকে নাকাল কবতে পাবলেই ওঁব খুব আনন্দ।

মোটা ফ্রেমেব পুরু কাচেব চশমাব ওধাবে খোকাবাবুব দু' চোখ এবাব মোহিনী সবকাবেব মুখেব ওপব।—কি বলছিলেন.. বোঝাপড়া? হ্যাঁ, আমি বলছিলাম আপনি আমাব জলেব মতো কথাগুলোও বুঝতে পাবছেন না। যেমন, এক—যেমন, আমবা আজ বেরুইনি কেন জিজ্ঞেস কবতে আমি বললাম, আমাব শবীবটা নাকি আজ ভালো নেই। ওই 'নাকি' শুনে আপনি অবাক। অথচ একটু আগে আপনি নিজেই বললেন, প্র্যাকটিস অর্ধেকেব বেশি ছেড়ে এখন স্ত্রীব শাসনে আছেন। সেই শাসনটা যদি আস্তে আস্তে নিখাদ সুশাসনেব দিকে গড়ায তাহলে দেখবেন আপনাব শবীবেব খবব আপনাব থেকে আপনাব স্ত্রী ঢেব বেশি বাখেন।

—দই। আমি স্বীকাবই কবলাম, আপনাদেব আমাদেব সেই ওবা বলা ঠিক হযনি —বলা উচিত ছিল, বাইবে দেখা হযে গেলে আমবা যাদেব সেই ওঁবা। তাই শুনেও আপনি বিলক্ষণ অবাক। অথচ বাইবে দেখা হযে গেলেই আপনাবা যে আমাদেব বেশ খুঁটিযে দেখেন, একজনেব চোখে না পড়লে আব একজনকে খোঁচা দিযে বা ইশাবায আমাদেব দেখান, আব আমাদেব নিযে আলোচনা কবেন—এসব আমাব থেকে আপনাবাই ভালো জানেন। এবাবে আমাব জবাবটা বুঝতে আব বোধহয খুব অসুবিধে হচ্ছে না।

—তিন। সোমা আমাব স্ত্রী শুনেই যেভাবে আপনি আপনাব স্ত্রীব দিকে তাকালেন, আমাব ধাবণা, শুধু বাজী জিতলেই অমন কবে তাকানো যায। কিন্তু আমি জেতা-হাবাব কথা বলতে আপনি বুঝতেই পাবলেন না।

বিভা সবকাবেব দু' চোখ কপালে। লজ্জিত আব অপ্রস্তুত তো বটেই, অদ্ভুত ভালোও লাগছে। অথচ এই মানুষকে দেখে দূব থেকে স্বল্পভাষী মনে হত। অ্যাডভোকেট

মোহিনী সবকার চক্ষুলজ্জার ধার ধারেন না। এ যাবৎ অনেক মানুষ দেখেছেন, অনেক মানুষ চরিয়েছেন। সামান্য আলাপে এই লোকের বিচক্ষণ দৃষ্টিশক্তি আর অতি সহজে দু'য়ে দু'য়ে চারে পৌঁছানোর ক্ষমতার প্রশংসা না করে পারলেন না। কোনো কথার প্রতিবাদ না করে অল্প অল্প হাসছিলেন তিনি। মুখের দিকে চেয়েছিলেন। হঠাৎ একটু উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, এর আগে আপনাকে কি আমি কখনো কোথাও দেখেছি—অথবা আপনি আমাকে দেখেছেন?

ভালো করে মুখের ওপর একটু চোখ বুলিয়ে খোকাবাবু জবাব দিলেন, শাস্ত্রমতে দু'জনেই দু'জনকে দেখেছি।

—সেটা কি রকম? মোহিনী সরকার উৎসুক।

—শাস্ত্র বলে আমাদের প্রত্যেকটা যোগাযোগ পূর্বনির্দিষ্ট। আগের যোগাযোগ ভিন্ন কোনদিন কারো সঙ্গে পরের যোগাযোগ হয় না।

—আগের বলতে?

—আগের বলতে আগের জন্মের হতে পারে—তার আগেরও হতে পারে।

মোহিনী সরকার হাসলেন একটু।—না আমি এই জন্মের কথাই বলছি।

খোকাবাবু আবার তাঁকে দেখলেন। বললেন, মনে পড়ছে না।

বৃন্দাবন ট্রে তে তিন পেয়ালা চা আর ডিশে বিস্কুট নিয়ে এলো। সোমা মোড়া ছেড়ে উঠে ভরতি পেয়ালা দুটো অভ্যাগতদের দিলেন আর কম চায়ের পেয়ালাটা তৃতীয় জনকে। বিভা সরকার জিজ্ঞেস করলেন, আপনারটা?

জবাব দেবার আগেই খোকা গাঙ্গুলি বলে উঠলেন, চলে না, চলে না—আমার আর এক দুর্ভাগ্য দেখুন, চায়ের সঙ্গী পর্যন্ত নেই। স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, তুমি আর এক পেয়ালা দুধ নিয়ে বোসো না, লজ্জা কি?

অন্যদিক থেকে কোপের প্রতিক্রিয়াটুকু অবিমিশ্র মিষ্টি লাগল মোহিনীবাবুর।

পরপর কয়েক চুমুকে নিজের পেয়ালা খালি করে এবং সেটা ইজিচেয়ারের পাশে রেখে খোকা গাঙ্গুলি নিশ্চিন্ত। একটু চুপ করে থেকে বললেন, এবারে আমাদের নিয়ে আপনাদের আসল যা কৌতূহল সেটা ব্যক্ত করে ফেলুন—একটুও লজ্জা করবেন না, আমি ও জিনিসটা অনেককাল বর্জন করেছি।

মোহিনী সরকার ঠোঁট-কাটা মানুষ, কিন্তু এ এমনি এক পরিস্থিতি যে অজ্ঞতার ভান করা ছাড়া উপায় নেই। বললেন, আর কি কৌতূহল?

—বলেন কি মশায়! ভদ্রলোক সত্যের অপলাপ দেখেই যেন আরো অবাক। —উনি আমার দ্বিতীয় পক্ষ না তৃতীয় পক্ষ নাকি চতুর্থ পক্ষ এই প্রশ্ন আপনাদের মনে নেই বলতে চান?

কর্তার থেকেও এবারে বিভা সরকার বেশি ফাঁপরে পড়লেন। সোমা গাঙ্গুলি এবারে ধমকেই উঠলেন, সেই থেকে তুমি যা করছ ওঁরা আর এদিক মাড়াবেন না।

মোহিনী সরকার বললেন, নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনারা না চাইলেও আমরা নিশ্চয় মাড়াবো, কারণ দোষী হয়েও এত আনন্দ কমই মেলে—লোকচরিত্র পাঠে উনি সিদ্ধ মানুষ এ অস্বীকার করতে পারছি না।

লজ্জা পেযেও সোমা গাঙ্গুলি বলতে গেলেন, শুনুন এব মধ্যে ওঁব শবীবটা—

খোকা গাঙ্গুলি একটা হাত তুলে বাধা দিলেন।—থামো, অপ্রাসঙ্গিক কথা আমি ববদাস্ত কবি না জানোই তো। গম্ভীব।—কথা তোমাকে নিযে আমাকে নিযে নয। এঁদেব কৌতূহল এমন বৃদ্ধেব অমন প্রায-তরুণী ভার্যা কেন—বা কোন্ পক্ষেব। মোহিনী সবকাবেব দিকে ফিবলেন।—ঠিক কি না?

মোহিনী সবকাব ওকালতিব মাথা খাটালেন। জবাব দিলেন, কৌতূহল যদি অস্বাভাবিক না হয, অপবাধ স্বীকাব কবছি।

—খুব স্বাভাবিক। আমাব মতো বৃদ্ধ কাবো কৌতূহলেব বিষয নয, ওঁব মতো মেযেও কাবো কৌতূহলেব ব্যাপাব নয—দুই অসমেব সাতপাকেব অঘটনটুকুই কৌতূহলেব স্বাভাবিক কাবণ। এই কাবণ না থাকলে আপনাবা হযতো আসতেনই না। স্ত্রীব দিকে ফিবলেন. অতিথিদেব বিমুখ না কবে তুমিই বলে দাও কোন পক্ষ। এব মধ্যে লজ্জা পাবাব বযেস তো কাবো নেই—

সোমা গাঙ্গুলি প্রায ধমকেব সুবে বললেন, চালাকি কবে কেবল কথা ঘোবাচ্ছ, তুমি আমাকে বলতে দিচ্ছ? বিভাব দিকে ফিবলেন।—শুনুন, যা বলছিলাম, এই ছ' মাস হল—

—অবজেকশন মাই লর্ড অ্যান্ড লেডি—অবজেকশন। ইবেগুলাব, ইব্যাশানাল অ্যান্ড ইমমেটিবিযাল। মোহিনী সবকাবেব দিকে তাকিযে গলা খাটো কবলেন খোকা গাঙ্গুলি।—আপনাদেব ভাষাটা ঠিক হল? তাবপবেই আবাব গলা চড়ালেন।—শুনুন, মেযেবা—না মানে আমাব স্ত্রী অন্তত ঘোবা পথে চলেন, অর্থাৎ সোজা প্রশ্নেব সোজা জবাব দিতে চান না, এ প্রমাণ তাহলে হযেই গেল। ঠিক আছে, জবাব আমিই দিচ্ছি। পক্ষ বিচাবে আপনাদেব সব অনুমানই ভুল, এ সম্পর্কে একটা বিচাবই খাটে—উনি চিবদিনই আমাব বিপক্ষ।

হাসিব মধ্যেই বিভা সরকাব ঈষৎ বিস্ময়ে বলে উঠলেন, তাব মানে উনি তাহলে প্রথম পক্ষ?

—একেবাবে খাঁটি ধবেছেন ম্যাডাম। আদি এবং অকৃত্রিম। স্ত্রীব লাল মুখেব দিকে চেযে এবাবে গম্ভীব আবাব।—তাহলে একটা প্রশ্ন থেকেই যায—প্রজাপতিব এমন অসম নির্বন্ধ ঘটে কি কবে। অতিথি দুজনকে সচকিত কবে স্ত্রীকে হঠাৎ রুক্ষ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন তিনি, কতদিন বলেছি বযেসেব সার্টিফিকেটটা গলায ঝুলিযে নাও—লোকেব কাছে আমাকে এমন অপ্রস্তুত কবাব মানে কি?

বক্তব্য শেষ শুনে সবকাব-দম্পতি আবও মজাদাব বিস্ময়েব আঁচ পেলেন। সোমাব লালচে মুখে হাসি চুঁযে পড়ছে। বললেন, নিজে অসময়ে সাত বুড়োব এক বুড়ো সেজে বসে আছ লজ্জাও কবে না।

অন্য দুজন মুখ চাওযা-চাওযি কবছেন। খোকা গাঙ্গুলিব মুখে স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যেব ফাঁকে টিপটিপ হাসি। বললেন, এবাবে তাহলে উপসংহাবে আসা যাক। যদিও মেযেদেব বযেস নিযে আলোচনা এটিকেটেব বাইবে, তবু এই জমাটি পবিবেশেব খাতিবে আমবা অকপট হতে পাবি। বিশেষ কবে যা নিযে এত কাণ্ড—দু'চোখ মোহিনী সবকাবেব দিকে।—এবাব আপনি তাহলে আমাব মিসেসেব বযেসটা অনুমান করুন।

মোহিনী সবকাব বোকা নন আদৌ। অনুমানেব বেশ ওপরেই উঠলেন—পঞ্চাশ একান্ন...

হাসিমুখে সোমা গাঙ্গুলি ঘোষণা কবলেন, আটান্ন।

—কক্ষনো না। প্রতিবাদ বিভা সবকাবেব। তাঁব থেকেও মহিলা এক বছরেব বড এ বিশ্বাস কবেন কি কবে?

সোমা গাঙ্গুলি তেমনি হেসেই বললেন, তা হলে কলকাতায ফিরে একদিন বাড়িতে আসুন, এজ সার্টিফিকেট দেখাব।

মোহিনী সবকাব বলে উঠলেন, তাহলে কংগ্র্যাচুলেশনস—অনেক কংগ্র্যাচুলেশনস সোমা দেবী। এভাবে বযসেব চোখে ধুলো দেওযাটা আমি দস্তুবমতো ক্রেডিট মনে কবি।

ঘবেব লোককে দেখিযে এবাবে টিপ্পনীব সুবে সোমা গাঙ্গুলি বললেন, তাহলে ওঁকেও একটু কংগ্র্যাচুলেট কবুন, আমাব থেকে উনিও বযেসেব চোখে কম ধুলো দেননি--উনি সবে তেষট্টি এ কেউ বিশ্বাস কববেন, আমাব থেকে মাত্র পাঁচ বছরেব বড।

অর্থাৎ মোহিনী সবকাবেব সমবযসী। অন্য দু'জনকে এবাবেও একটু হকচকিয়ে যেতে দেখা গেল। খোকা গাঙ্গুলি বললেন, বিশ্বাস কববেন না। আপনাব বৃদ্ধেব তরুণী ভার্যাব বসটুকুই মাটি তাহলে।

—থামো। অন্যদেব দিকে ফিবলেন সোমা গাঙ্গুলি।—এই জন্যেই আমাকে বাব বাব থামিযে দিচ্ছিলেন, বুঝলেন?... ক'মাস আগে ওঁব একটা অপাবেশন হয়ে গেল, প্রোসট্রেট অপাবেশন—সঙ্গে আবো সতেব ব্যাপাব—অপাবেশনেব পবেই তাব ওপব নিউমোনিযা—যমে-মানুষে এমন টানাটানি আমি আব দেখিনি। তাবপবেই মাথাব চুলগুলো সব সাদা হযে গেল আব শবীবেব এই হাল। দেখলে কেউ ভাবতেও পাববে না কি চেহাবা কি হযে গেল।

খোকা গাঙ্গুলি গম্ভীব।—অর্থাৎ তখন ওঁব মতে আমি রূপবান পুরুষ ছিলাম।

মোহিনী সবকাব আর বিভা সবকাবেব সত্যি ভাবি ভালো লাগছিল। বিভা বললেন, আপনি যা-ই বলুন, অনেক ঠকেছি আমরা, আব আপনাব কথাব ফাঁদে পডতে বাজি নই।

খোকা গাঙ্গুলি স্ত্রীকে বললেন, এবাবে শুধু ওঁদেবই তাহলে আর এক পেযালা করে চা হোক।

মোহিনী সরকাব তাডাতাড়ি বাধা দিলেন, আব চা না, আমাবও বেশি চাযে একটু অসুবিধে আছে—গল্প কবতে খুব ভালো লাগছে... আপনাদেব সময নিচ্ছি না তো?

—দয়া কবে সময় দিচ্ছেন, খোকা গাঙ্গুলিব বিনীত জবাব, একটা বিকেল সন্ধ্যা ভালো কাটছে।

ভালো বিভারও খুব লাগছে। গলা একটু খাটো কবে সোমাকে বললেন, অসুস্থ মানুষকে একলা নিয়ে বেবিযে পড়েছেন, আপনাব ছেলেপুলে...?

খোকা গাঙ্গুলি বলে উঠলেন, সে কথা তুলে আর লজ্জা দেবেন না, একটা দুটো নয, একেবাবে পাঁচটি। প্রথমে দুই ছেলে পবে তিন মেযে। গেলবারে ছোট মেযেটাবও বিয়ে হযে যেতে এখন আমাদেব নির্ঝঞ্ঝাটি হনিমুন।

যিনি বলছেন, তাঁরই শুধু সিবিয়াস মুখ। অন্য সকলের হাসির ফাঁকে বিভা সরকার পাঁচ ছেলেমেয়ের মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর আর একবার চোখ না বুলিয়ে পারলেন না। সোমা গাঙ্গুলি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারাও তো দু'জনেই এসেছেন দেখছি... আপনার?

—একটি ছেলে। ব্যারিস্টার। উনি প্র্যাকটিস কমিয়ে দিতে ওর ওপর চাপ বেশি—বেড়াবার সময়-টময় হয় না।

খোকা গাঙ্গুলি গম্ভীর মন্তব্য করলেন, ইন্দিরা গান্ধীর প্রাইজ দেওয়া উচিত আপনাদের—ছোট পরিবার সুখী পরিবার।

তেমনি নকল গাম্ভীর্যে মোহিনী সরকার বললেন, আপনাদের দেখে অসুখী যারা বলবে তাদের জরিমানা হওয়া উচিত। একটু কৌতূহল হচ্ছে, আপনার পেশাটি জানতে পারি?

খোকা গাঙ্গুলি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, ব্যবসা।

—ব্যবসা বলতে?

—মিথ্যেকথার ব্যবসা। যত মিথ্যে বলি লোকে ততো খুশি আর ব্যবসাও ততো জমজমাট।

মোহিনী সরকার বিভা সরকার দু'জনেই চেয়ে আছেন। সোমা অল্প অল্প হাসছেন। খোকা গাঙ্গুলি বললেন, বুঝলেন না তো? তাহলে শুনুন—

নিজের ইজি-চেয়ারেই জমিয়ে বসলেন একটু। তেমনি গম্ভীর। পুরনো দিনের কথা মনে করার মতো করে বলে গেলেন, সে অনেক কাল আগের কথা, বিলেত থেকে এক জাহাজ মিথ্যেকথা চালান এসেছিল আউট্রাম ঘাটে। আমার তখন বেকার দশা। শুনে পড়ি-মরি করে ছুটলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি সর্বনাশ কাণ্ড। আগেভাগে টের পেয়ে বাঘা-বাঘা ব্যবসায়ীরা এসে সব কিনে নিয়ে গেছে। আমার মনে দুঃখ শুধু হল না, ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে লাগলাম। রাগে শোকে ওই গঙ্গাতেই প্রাণ বিসর্জন দেব ঠিক করে ফেললাম। বেগতিক দেখে মা গঙ্গা উঠলেন। বললেন, বাছা আত্মঘাতী হয়ে কাজ নেই, এখন থেকে মিথ্যেই তোর স্বচ্ছন্দ জীবিকার অবলম্বন হবে। ব্যস, আর কি, তারপর থেকে ওই মিথ্যের নৌকোতেই ভেসে চলেছি।

বিভা সরকার হাসতেও পারছেন না, হাসি চাপতেও পারছেন না। সোমা গাঙ্গুলি সকৌতুকে স্বামীর গম্ভীর মুখের দিকেই চেয়ে আছেন। মোহিনী সরকার ধরে নিলেন, ব্রোকারি অর্থাৎ দালালি টালালি হবে ভদ্রলোকের জীবিকা। মিথ্যের ফুলঝুরি ওই লাইনেই বেশি ছোটাতে হয়। তাই আর জেরার মধ্যে না গিয়ে তারিপ করলেন, আপনি তো ভাগ্যবান, অসৎ রাস্তা ধরেন নি—আমরা সত্যকে মিথ্যে করছি আর মিথ্যেকে সত্য বানাচ্ছি। যাক, এখানে আছেন কতদিন?

—জানি না। উনি যদি মনে করেন আমার শরীর ভালো যাচ্ছে তাহলে চট করে নড়া-চড়ার কোনো প্রশ্ন নেই। আপনারা?

—আপনার মতো অতটা না হলেও আমারও উনিশ বিশ একই ব্যাপার। দু'বছর আগে একটু মাইলড স্ট্রোক হয়েছিল, সেই থেকে ওঁর বিবেচনায় খুব সুস্থ থাকছি না।

খোকা গাঙ্গুলি বলে উঠলেন, বাঃ এদিক থেকে আমরা তাহলে সতীর্থ।

বিভা সরকার এবারে উঠে দাঁড়ালেন, এখন চলো, অনেক জ্বালিয়েছি, আর না। খোকা গাঙ্গুলির দিকে ফিরলেন, আপনারা আমাদের বাড়িতে কবে যাচ্ছেন বলুন, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে যেতে হবে—আর আপনি কি খেতে ভালবাসেন বলুন।

খোকা গাঙ্গুলি নিজের স্ত্রীর দিকে তাকালেন।—দেখলে, কেবল তুমিই বলো কথার চোটে কান ঝালা-পালা—কথার জাদু দেখলে? বিভার দিকে ফিরলেন, খাওয়ার ব্যাপারে আমি ভেজ ননভেজ দুইয়েরই উপাসক—মোচার কাটলেট আর চিকেন কাটলেট দুইই সমান রেলিশ করে খাই। আপনি যেভাবে বলছেন, কাল যেতে পারি, পরশু যেতে পারি, তরশু যেতে পারি—আবার কাল পরশু-তরশু রোজই যেতে পারি।

বিভা সরকার হাসি মুখে মাথা নাড়লেন, বেশ তো যাবেন—এমন কান ঝালাপালার আশায় আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করব।

পরদিন না হোক, তার পরদিন সত্যিই এসেছেন তাঁরা। সরকার-দম্পতি খুশির অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। আর ভদ্রলোকের গল্প জমাবার প্রতিভা দেখে এদিনও মুগ্ধ হয়েছেন। আর খোকা গাঙ্গুলি মুগ্ধ হয়েছেন এমন অল্প সময়ের মধ্যে খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে। সত্যি গরম চিকেন কাটলেট এসেছে, চমৎকার স্যালাড এসেছে, ফ্রায়েড পোটাটো এসেছে, শেষে পুডিংও। খোকা গাঙ্গুলি হাঁ করে খানিক দেখলেন। তারপর না হেসে সোল্লাসে বলে উঠলেন, আপনি একি জাদু জানেন—ঘাটশিলায় এই সব!

বিভা বললেন, আমার বাহাদুরি নেই, উনি বাইরে বেরুলে আমি সঙ্গে না থাকলেও চলে—পুরনো খানসামাটা না হলে চলে না—তাকে সঙ্গে আনাই চাই।

—খানসামা! আ-হা! সোমার দিকে ফিরলেন, দেখো, এবার থেকে ওঁদের আর কষ্ট করে আমাদের ওখানে যাওয়ার দরকার নেই, আমরাই যখন পারি এসে যাব'খন।

বিভা খুশিমুখে রাজি।—আসবেন, ও জন্যে ঘাবড়াই না। স্বামীকে দেখিয়ে শোনালেন, উনি সেদিন বলছিলেন, ভদ্রলোকের কথা শুনলে আর তাঁর সঙ্গে কথা বললে মনে হয় খানিকটা আয়ু বাড়ল। তবে এর পরে আপনার খাওয়ার ব্যাপারে আপনার মিসেসের মতামত নেব কিন্তু।

—নিশ্চয় নেবেন। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর সায়।—তবে দয়া করে আমার খাওয়ার আগে নয়, পরে।

খাওয়ার শেষে বড় করে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।—আঃ, আমারও পরমায়ু কিছু বাড়ল!... তবে আমাদের তফাৎ খুব নেই বুঝলেন, আমি খাই-খাই করে খাই আর উনি (স্ত্রীকে দেখিয়ে) ভালো জিনিস হলে খাই-না খাই-না ভাব দেখিয়ে খান।

সোমা গাঙ্গুলির পুডিং খাওয়ায় ছেদ পড়ল। হেসে ফেললেন।

বিভা তাড়াতাড়ি বললেন, আপনি খান তো। ভদ্রলোকের দিকে ফিরলেন, আপনি সব থেকে বেশি মজা পান দেখছি ওঁর পিছনে লেগে।

খোকা গাঙ্গুলির নিরীহ মুখ।—অন্যের পিছনে লেগে অত নিরাপদ বোধ করি না।

মোহিনী সরকার হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন।—আপনাকে কথাশিল্পী বলি, না কথাসাগর বলি।

এই সামান্য কথায় সোমা গাঙ্গুলির বেশ একটু আনন্দ দেখা গেল। মন্তব্য করলেন, তাই বললে যদি একটু জব্দ হন।

আর এই সামান্যতেও খোকা গাঙ্গুলি দমে গেলেন।—অমন কাণ্ডটি করবেন না, শুনলে সাহিত্যিকের দল আপনাকে ঘেরাও করবে। যাক, ঘাটশিলায় বেড়ালেন কেমন?

বিভা জবাব দিলেন, এখানে ওই সরু পাথুরে সুবর্ণরেখা আর ওই টিবি ছাড়া বেড়াবার কি আছে—দেখারই বা কি আছে!

খোকা গাঙ্গুলি বললেন, সুবর্ণরেখার বিক্রম দেখতে হলে বর্ষায় আসবেন। মৌভাণ্ডারের কপার কর্পোরেশন তো মাত্র দেড় মাইলের মধ্যে—দেখে আসতে পারেন। ..কপার মাইন অবশ্য মাইল ছয়েক হবে এখান থেকে, মোসাবাণী থেকে বারা মাইনস পর্যন্ত চলে গেছে। সাইকেল রিকশ নিয়ে তা-ও ঘুরে আসতে পারেন। একটু থেমে আবার বললেন, এই ঘাটশিলাকে হেলাফেলা করবেন না—একদিন এই ঘাটশিলা ছিল ধলভূমের রাজধানী। ধলভূম রাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বংকিণীর মন্দিরও দেখে আসতে পারেন—এই আশ্বিনেই সেখানে সাঁওতালদের বিন্দ মেলা হয়, টানা পনের দিন চলে—ওদের সব থেকে বড় উৎসব এখানকার।

সরকার-দম্পতি মন দিয়ে শুনছিলেন। বিভা সরকার বললেন, কিছুই তো দেখি নি এখনো . আপনি বুঝি অনেকবার এখানে এসেছেন?

খোকা গাঙ্গুলি তক্ষুণি মাথা নাড়লেন।—আমারও এখানে এই প্রথম, আর এখন পর্যন্ত সুবর্ণরেখা ছাড়া আর কিছুই দেখি নি।

তাঁরা অবাক।—সে কি?

সোমা মুখ টিপে হেসে জবাব দিলেন, এটা মিথ্যে নয়, যেখানে যখন যান, আগে লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে সে জায়গা সম্পর্কে খুঁটিয়ে পড়ে নেন।

অন্য দুজনের কৌতূহল স্বাভাবিক। মোহিনী সরকার জিজ্ঞেস করলেন, কেন, পরে দেখতে সুবিধে হয় বলে?

সোমা গাঙ্গুলি তেমনি জবাব দিলেন, মিথ্যের ব্যবসারও কিছু সুবিধে হয় বোধহয়।

ওঁরা না বুঝেও হাসলেন। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, এবার ওঠার তাড়া। অবশ্য রিকশতেই যাবেন, অল্প রাস্তা হলেও হিম লাগার ভয়ে সোমা তাঁর ভদ্রলোককে হাঁটতে দেবেন না।

সকলে একসঙ্গে নেমে আসতেই খোকা গাঙ্গুলির দু'চোখ তামার খনির দিকে গেল। ওদিকটা গনগনে লাল। সেই লালের আভা আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়েছে। রাত হতে না হতে রোজই সকলের চোখে পড়ে তামার খনির অগ্নিকুণ্ডের আগুন। সেদিকে চোখ রেখে খোকা গাঙ্গুলি নিস্পৃহ মন্তব্য করলেন, ওই তপতপে লাল দেখতে বেশ লাগে আমার, ঘরে যিনি আছেন তার সঙ্গে ওটার প্রায়ই খুব মিল দেখি।

মোহিনী সরকার জোরেই বলে উঠলেন, অবজেকশন—অবজেকশন। একজন মহিলার ওপর আপনি মিথ্যে অপবাদ চাপাচ্ছেন।

সোমা চাপা গলায় ঠেস দিলেন, মিথ্যের ব্যবসা পেশা নিজেই তো স্বীকার করেছেন—অবজেকশন দিয়ে কি লাভ।

পরেব তিনদিন বোজই হাটে বা বাজারে আব সুবর্ণবেখার ধারে দেখা হয়েছে। এই অন্য জুটিকে পেয়ে সরকার-দম্পতির দিন বেশ হাসিখুশিব মধ্যে কাটছে। সেদিন বাজাবে এসে তাঁবা অন্য জুটিকে দেখলেন না। অবশ্য বাজারে ওঁবা রোজ আসেন না, মাঝে মাঝে বৃন্দাবন আসে। তাকেই দেখলেন। তক্ষুণি দুজনেব মধ্যে প্ল্যান হল। একটু ঘটা করেই বাজাব সারলেন তাঁবা। বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ দুজনে বেড়াবাব জন্য তৈবি হযে বাংলো থেকে বেরুলেন। সোজা রেল লাইনের দিকে অর্থাৎ গাঙ্গুলি বাড়িব দিকে চললেন। উদ্দেশ্য বাতে বাড়িতে ওঁদেব ডিনাবেব নেমন্তন্ন কববেন। সকলে একসঙ্গে বেড়ানো সেবে ওঁদেব সঙ্গে কবে বাংলোয ফিববেন।

পৌঁছুলেন। সামনেব ঘবেব ভেজানো দরজা দুটো চাব-ছ' আঙুল ফাঁক। মোহিনী সবকাব দরজা ঠেলতেই মেঝেতে তিনটে খাম চোখে পড়ল। ডাক-পিওন দবজাব ফাঁক দিযে ফেলে দিযে গেছে। খাম তিনটে তিনি ম্যাট থেকে কুড়িযে নিযে সোজা হবাব ফাঁকে একটা খামেব ওপবে চোখ পড়তেই থমকালেন একটু। তাবপবেই বিমূঢ় কেমন। ভুরু কুঁচকে পবেব খামটাব নাম ঠিকানা দেখলেন। তাব পবেবটাবও। তাবপব আকাশ থেকে পড়া মুখ কবে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

স্বামীব এই আচবণ দেখে বিভা সবকাবও কম অবাক নন। তিনি কিছু বলতে যেতেই একটা আঙুল ঠোঁটে ঠেকিযে মোহিনী সবকাব তাঁকে কথা বলতে নিষেধ কবলেন। তাব পবে তিনটে খামেবই ওপবেব নাম দেখালেন। ঠিকানাব ওপরে প্রত্যেকটাতে নাম লেখা, মহাদেব গাঙ্গুলি।

বিভা সবকাবও প্রথমে বিমূঢ় কযেক মুহূর্ত। তাবপবেই বেশ বড় সড় ঝাঁকুনি খেলেন একটা। ওই খামেব নামেব ওপব দু' চোখ ঠিকবে পড়াব দাখিল—দেখেও বিশ্বাস কবতে পারছেন না। নিজেব অগোচবে গলা দিযে অস্ফুট একটা শব্দই বেবিযে এলো। সেটা আনন্দেব থেকে ঢেব বেশি বিস্ময়েব।

ভিতব থেকে খোকা গাঙ্গুলিব গলা শোনা গেল, দেখ তো ওঁরা এলেন বোধ হয়।

সোমা গাঙ্গুলি এলেন। হেসে আপ্যাযন জানাতে গিযেও থমকালেন। বিশেষ কবে বিভা সরকারেব মুখ আব চাউনি কি বকম লাগল, বললেন, কি ব্যাপাব, ওঁকে কি ছুটিয়ে নিযে এলেন নাকি?

মোহিনী সবকাবের হাত দুটো পিছনে। জবাব দিলেন, না, এখানে এসে ছুটছেন। আপনাব ভদ্রলোককে ডাকুন।

ডাকতে হল না। নিজেই এলেন। সেই চিবাচবিত গম্ভীব মুখ।—এই যে আসুন, আজ একটু সকাল সকাল মনে হচ্ছে...।

সে কথাব জবাব না দিয়ে মোহিনী সবকার একটা খাম তাঁব দিকে বাড়িযে দিলেন। —এই মেঝেতে পড়েছিল, দেখুন তো পিওনটা ভুল করে দিয়ে গেল নাকি!

খামটা হাতে নিযে চোখ বোলাবাব সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী সবকাব এই প্রথম ভদ্রলোকেব মুখে চকিত বিড়ম্বনার ছাযা দেখলেন একটু। অস্ফুট কথাও শুনলেন, তাই তো দেখছি...

—এটা? দ্বিতীয় খাম সামনে ধরলেন মোহিনী সরকার।

—এ-ও তো...

—আর এটা? কিছু বলার আগেই তৃতীয় খাম।

তৃতীয় খামটাও হাতে নেবার পর ভদ্রলোকের মুখে বিড়ম্বনার হাসি একটু।—এ যে দেখি মহাদেব গাঙ্গুলির ট্র্যাজো একেবারে।

সোমা গাঙ্গুলি দ্বিতীয় খাম দেখার পরেই ব্যাপার বুঝেছেন। হাসি চাপার চেষ্টায় মুখে আচল চাপা দিয়েছেন।

মোহিনী সরকার তাঁর স্ত্রীর দিকে ফিরলেন। গম্ভীর আদেশের সুরে বললেন, চলো—

সোমা ব্যস্ত।—ও কি, বসুন।

—বসব। ওর নামে আমি ক্রিমিন্যাল কেস আনব—নাম ভাঁড়ানোর মজাখানা উনি টের পাবেন।

সোমা হেসে বললেন, বেশ আনবেন। এখন তো বসুন।

বিভা সরকারের মুখে রাগ-বিরাগের কোনো চিহ্নই নেই। দেখলে মনে হবে হঠাৎ যেন তিনি এক নতুন জগতে ঢুকে পড়েছেন। সেই উত্তেজনায় দাড়াতেও পারছেন না। একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। দ্বিতীয় চেয়ারের দিকে এগোতে এগোতে মোহিনী সরকার বললেন, হ্যা মশাই এতগুলো দিন দিব্যি নিজেকে খোকা গাঙ্গুলি বলে চালিয়ে দিলেন?

মহাদেববাবুর শুধু ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি। জবাব দিলেন, মা গঙ্গার সেই আশীর্বাদে আমার অদৃষ্টখানা দেখুন—সত্যি বললেও সেটা মিথ্যে হয়ে যায়। ওই নামটাও মিথ্যে নয়, বাপ-মায়ের আদরের নাম।

—আমরা তো আপনার বাপ-মা নই, আমাদের কাছে ওই আদরের নাম চালানোর অর্থ কি?

ইজি-চেয়ারে শরীরটাকে আরো একটু শিথিল করে জবাব দিলেন, প্রাণের দায়ে মশাই, প্রাণের দায়ে। এখানে একটা কলেজ আছে জানি, আর এসে জানলাম বড় একটা পাবলিক লাইব্রেরি আছে—আর অন্যদিকে দেয়ালেরও কান আছে। তাই এখানে এসেই আমি খোকা গাঙ্গুলি।

মোহিনী সরকার জিজ্ঞেস করলেন, কলেজ আর লাইব্রেরি আছে তাতে কি?

—এরা থাকা মানেই সাহিত্যিক শিকারের ফাঁদ পাতা—সাহিত্য সভা—সাহিত্য মিটিং—হরিবল।

—আর এখন যদি আমরাই খবর দিয়ে দিই?

—প্রাণে মারা যাব। ওর (স্ত্রীকে দেখিয়ে) সেই মূর্তি আপনারা দেখতে পাবেন?

সোমা গাঙ্গুলি হাসতে হাসতে বললেন, বসুন, চা আনি।

মোহিনী সরকার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে পড়লেন।—দাঁড়ান।

নিজেই গটগট করে ভিতরের ঘরে ঢুকে মোড়াটা এনে পেতে দিলেন।—বসুন। এখানে চা নয়। যে ভাঁওতাবাজি ইনি আমাদের সঙ্গে করেছেন, আপনিও চুপ করে

থেকে ওঁর অ্যাকসেসরি হয়েছেন, তার জের আপনাদের সামলাতে হবে। আমার বায় আমি পরে দিচ্ছি। তাছাড়া আমার আবার না ডাক্তারের কাছে ছুটতে হয়, ইনি কে জানার পর আমার স্ত্রীর কথা বন্ধ হয়ে গেছে। যাক, আগে আপনি বসুন—

নিজের চেয়ার টেনে নিয়ে আবার মহাদেব গাঙ্গুলির মুখোমুখি।—আপনার মিথ্যের ব্যবসাটা তাহলে এই?

মহাদেববাবু অম্লানবদনে সায় দিলেন। এই।

বিভা সরকারের এতক্ষণে জিভ নড়ল।—আপনি এত বড় স্রষ্টা বলেই নিজের সৃষ্টিকেও অনায়াসে মিথ্যে বলতে পারছেন।

মোহিনী সরকার মন্তব্য করলেন, বাচা গেল, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না। সোমাকে বললেন, ওঁর এখনকার কথার মধ্যে কেবল সুপারলেটিভ ডিগ্রিটা লক্ষ্য করে যাবেন।

সোমা হেসেই বললেন আপনিও তো ওর পিছনে কম লাগেন না দেখি। উনি বুঝি গল্প-উপন্যাস পড়তে খুব ভালবাসেন?

—মুখ দেখে বুঝে নিন। তবে গল্পকার ও ঔপন্যাসিক মাত্র দুই একজনকে মাত্রাত্মক ভালবাসেন। এখন আমিই ওঁকে নিয়ে কলকাতায় সরে পড়ব কিনা ভাবছি।

মহাদেব গাঙ্গুলি গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, কি ভাগ্য—কি ভাগ্য!

মহিলারা দু'জন কেবল হাসছেন। মোহিনী সরকার ভদ্রলোকের দিকে ফিরলেন। —এই বছর তিনেক আগে আপনাকে একবার কলকাতার বোটানি ক্লাবে আনা হয়েছিল?

একটু ভেবে মহাদেববাবু জবাব দিলেন, হয়েছিল।

—আপনি সেদিন অ্যাংবি জেনারেশন আর জেনারেশন-গ্যাপ সম্পর্কে বলেছিলেন?

আবারও ভেবে জবাব দিলেন, হবে...।

—হবে না। আমি বোটানিয়ান, সেদিন উপস্থিতও ছিলাম। চেনা চেনা মনে হতেও চিনতে পারি নি, কারণ উনি (সোমা) ঠিক কথাই বলেছিলেন—আপনার ওই অসুখ আপনার কতটা খেয়ে দিয়েছে এখন বুঝতে পারছি। যাক, বোটানি থেকে ফিরে আমার স্ত্রীকে আপনার কথা বলতে উনি টানা তিন দিন অভিযোগ করেছিলেন, কেন কিছু একটা ব্যবস্থা করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল না।

মহাদেব গাঙ্গুলি আবার বলে উঠলেন, ভাগ্য—ভাগ্য।

এবারে জোরালো অনুযোগের সুরে বিভা সরকার বললেন, কিন্তু আমাদের তো আপনি দুর্ভাগ্যের দিকেই ঠেলে দিয়েছিলেন। আপনার লেখা পড়ে মনে হয় মানুষের জন্য আপনার কত মমতা, কিন্তু নিজে কত নির্মম হতে পারেন তার প্রমাণ পেলাম। আজ এই খাম ক'টা ওঁর হাতে না পড়লে আমরা জানতেও পারতাম না কার সঙ্গে এত দিন ঘুরলাম বেড়ালাম কথা কইলাম। এ কথা মনে হতে এখন আপনার ওপর আমার রাগই হচ্ছে।

জবাবে মহাদেববাবু আবার একটা ভারী নিঃশ্বাস ছেড়ে শুধু বললেন, বেচারা খোকা গাঙ্গুলি।

গম্ভীর মুখের যে কৌতুক এতদিন এমনি ভালো লাগছিল এখন সেটা দ্বিগুণ ভালো লাগছে দু'জনেরই। মোহিনী সরকার এবার হুকুমের সুরে সোমাকে বললেন, দশ মিনিট সময় দিলাম, এর মধ্যে রেডি হয়ে আসুন।

সোমা বললেন, দাঁড়ান, আগে চা হোক, ওঁরও এখন পর্যন্ত জোটেনি।

—নো টি! মোহিনী সরকারের বিচারের মুখ।—এখন আপনারা দু'জনেই আমাদের আসামী—আমাদের খুশিমতো আমরা আসামী ধরে নিয়ে যাব। চটপট রেডি হোন।

সোমাই জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়?

—আগে ঠিক ছিল এখানে এসে আপনাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুব। বেড়িয়ে আপনাদের আমার বাড়ি নিয়ে যাব, কারণ সেখানে আপনাদের রাতের ডিনার রেডি থাকবে—

মহাদেব গাঙ্গুলি তাঁর বলার মাঝে গুরুগম্ভীর আর্তনাদ করে উঠলেন, যাঃ কলা, এখন সেটা বাতিল নাকি?

বিভা সরকার হেসে উঠলেন। মোহিনী সরকার বললেন, না, আজ বেড়ানো বাতিল —এক্ষুণি আমাদের বাড়িতে আপনাদের হাজতবাস, রাতেও ফিরতে পারছেন কিনা সন্দেহ। স্ত্রীর দিকে ফিরে গলা খাটো করলেন, কেমন, জাঁদরেল লেখকের সঙ্গে কথাবার্তা সমান তালে হচ্ছে তো?

জবাব মহাদেববাবুই দিলেন, বললেন, বেশ হচ্ছে। কিন্তু নিয়ে গিয়ে তারপর উত্তরপ্রদেশ থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত শাস্তির ব্যবস্থাটা কেমন হবে?

প্রশ্নটা হঠাৎ না বুঝে মোহিনী সরকার থতমত খেলেন একটু। তারপর জোরে হেসে উঠলেন।—মুখ থেকে পেট পর্যন্ত শাস্তির ব্যবস্থা?. তা ভালোই হবে। ইংরেজি, বাংলা দু'রকমেরই শাস্তির আয়োজন। মোচার কাটলেট পাবেন আবার চিকেন কাটলেটও পাবেন, ফ্রায়েড পোটাটো পাবেন ফ্রায়েড ফিশও পাবেন, ভাত পাবেন ফ্রায়েড রাইসও পাবেন, মাছের কালিয়া পাবেন চিকেন কারিও পাবেন, কাস্টার্ড পাবেন আবার রসগোল্লাও পাবেন—

—ব্যস ব্যস ব্যস, আমি রসের অতলে মানে রসাতলে চলে যাচ্ছি। স্ত্রীর দিকে ফিরে তাড়া দিলেন, কই, ওঠো না শীগগির। এত শাস্তি কি একবারে সহ্য করতে পারব—এখন থেকেই শুরু হোক। শীগগির যাও, আর দেরি কোরো না।

বারান্দায় পা দিয়ে এইদিন মোহিনী সরকার সোজা তাঁদের শোবার ঘরে নিয়ে এলেন। সামনে বইয়ের তাকে তিনটে মোটা বই, আর তিনটে বিপুল আকারের পূজাসংখ্যা। তিনটে বইয়েরই লেখক মহাদেব গাঙ্গুলি। একটা শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন, একটা লেখকের নির্বাচিত গল্পগুচ্ছ আর একটা হালের ছাপা পরিপুষ্ট আকারের উপন্যাস। এবারের ওই পূজাসংখ্যা তিনটেতেও মহাদেব গাঙ্গুলির তিনখানা উপন্যাস আছে। মোহিনী সরকার বললেন, তাহলে বুঝুন আমার গৃহিণীর হৃদয়ে আপনার জায়গাটি কোথায়।

বিভা সরকার প্রতিবাদ করলেন, কেন, তুমি পড়ো না?

মোহিনী সরকার জবাব দিলেন, পড়তে হয। কারণ আলোচনা যখন হয় তখন আমি তোমাকে বিপাকে ফেলার মতো তবলচির কাজ করি। যেমন ধরো ওই পূজাসংখ্যাটায় ওঁর এবারের উপন্যাস 'দ্বিতীয় বাসর' পড়ে আলোচনায় আমি তোমাকে যে-রকম কোণ-ঠাসা করেছিলাম, যার ফলে তুমি একেবারে দাম্পত্য কলহের পর্যায়ে চলে গেছলে।

বিভা সরকার তক্ষুনি তাঁকে সামলাবার জন্য ব্যস্ত।—থাক থাক, আমি ঠিক জানি তুমি সব ছেড়ে ওঁর এই লেখাটা নিয়েই পড়বে। লেখকের দিকে ফিরলেন, ওকালতি করে করে লোকের কেবল ছিদ্রি বার করতেই শিখেছে—বুঝলেন?

—বুঝলাম। মহাদেববাবু গম্ভীর মুখে সায় দিলেন।—কিন্তু আমাদের তো বিকেল থেকেই শান্তি শুরু হবার কথা ছিল।

সাহিত্য-বিতর্ক আপাতত চাপা পড়ে গেল। চা আর পরিপাটি জলখাবার সহযোগে গল্পে-গল্পে শীতের ছোট বেলা পার। সন্ধ্যার একটু পরেই মোহিনী সরকার মহাদেববাবুর কানে কানে কি বলতে তিনি মুখখানা এমন করলেন যেন দুনিয়ার সব থেকে বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বলে উঠলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনার নিখুঁত আতিথেয়তা নিয়েই আমাকে কিছু লিখতে হবে—বিকেলে মধ্যপ্রদেশে যা চালান গেছে একটু ওষুধ না পড়লে রাতে ওর ওপর আবার চাপার কি করে! আপনার বিবেচনার জয় হোক!

অন্য দুই মহিলা সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন ব্যাপারখানা। বিভা সরকার ঈষৎ বিব্রত মুখে সোমা গাঙ্গুলির দিকে তাকালেন একবার, তারপর সকোপে স্বামীর দিকে ফিরলেন। —আজ খুব সুবিধে পেয়ে গেছ, না?

মোহিনী সরকার বললেন, অতিথির দরকার কিনা খোঁজ নিলাম।... তুমি সঙ্গ দাও তো আমি ছোঁবও না। লেখকের দিকে ফিরলেন, গৃহিণী ডাক্তার হলে যে কি বিপদ মশাই আপনিও তো নিশ্চয় জানেন। ডাক্তার পরোয়ানা দিয়েছে, একটু-আধটু চলতে পারে, তাতে হার্টের ক্ষতি হবার কোনো আশংকা নেই। কিন্তু ওঁর বিশ্বাস সাংঘাতিক ক্ষতি হবার আশংকা, আমি ঘুষ দিয়ে ডাক্তারকে বশ করেছি। সঙ্গে আছে অথচ নির্জলা বাত কাটছে। যাক, অতিথির দরকার যখন কি আর করা যাবে?

বিভা সরকার মাথা নেড়ে সোমাকে দেখালেন, ওঁর পারমিশন না হলে দেব না।

সোমা গাঙ্গুলি হেসে ফিরে বললেন, আপনার কি ধারণা, উনি আমার কথায় ওঠেন-বসেন?

বিভা হালকা জবাব দিলেন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে পর্যন্ত তাই কিন্তু ভাবতাম। এখন দেব কিনা বলুন—

—ক'টা দেবেন আগে কড়ার করে নিন।

বিভা সরকার হাসিমুখে মহাদেববাবুর দিকে তাকালেন। জবাবে তাঁর সীরিয়াস মুখ।—খেলে উনি আমাকে দুটোর বেশি খেতে দেন না, আজ মনে হচ্ছে, তিনটেতে আপত্তি করবেন না।

বিভা সরকার বলে উঠলেন, ওঁর কিন্তু দুটোর বেশি কখখনো চলবে না। দুটোতেই দেখবেন কেমন স্পষ্ট বক্তা হয়ে উঠেছেন।

মহাদেববাবু সায দিলেন, দুটোব বেশি চলাব দবকাব নেই তাহলে। প্রথমে ওঁকে একটা পুবো দেবেন, পবেব দুটো হাফ হাফ।

বিভা সবকাব উঠে হুইস্কিব বোতল গেলাস আব জল এনে সামনে বাখলেন। বিলিতি জিনিস দেখে কর্তাব দিকে চেযে মহাদেববাবু মন্তব্য কবলেন, উকিল না হযে আপনাব ওমব খৈযাম হওযা উচিত ছিল—ঘাটশিলায বিলিতি জিনিস। স্ত্রীব দিকে ফিবলেন, ও-গো, তুমি কি তিন'টাকে চাব কবতে পাবমিশান দেবে?

সোমা গাঙ্গুলি বললেন, আমাব তিনেই আপত্তি।

—থাক থাক, তাহলে আব চা-বে কাজ নেই।

প্রথম দফা শুরু হতে নিজেব গেলাসে বাবকযেক ছোট ছোট চুমুক দিযে মহাদেববাবু একটা আবামেব নিঃশ্বাস ফেলে স্ত্রীব কথাই সমর্থন কবলেন যেন। সীবিযাস মুখ কবে বললেন, বেশি না খাওযাই ভালো।. একবাব এক ভদ্রলোক বাব থেকে বেবিযে নিজেব গাডিতে উঠে হাঁ। ড্রাইভ কববেন কি, তাঁব স্টিযাবিং, ব্রেক, অ্যাকসেলাবেটব, ক্লাচ, ড্যাশবোর্ড—সব কিছু চুবি হযে গেছে। তক্ষুণি নেমে ছুটে গিযে তিনি ওই বাব থেকেই পুলিশে ফোন কবলেন। এমন তাজ্জব চুবিব কথা শুনে পুলিশও পাঁচ মিনিটেব মধ্যে ছুটে এলো। এসে দেখে স্টিযাবিং-এ হাত দিযে ভদ্রলোক বিমর্ষ মুখে বসে আছে। তাবা উঁকি দিযে দেখল, কিছুই চুবি যায নি। সবই ঠিক আছে। তখন তাবা বেগে আগুন। ভদ্রলোক তখন বললেন, আমাব সত্যি একটু ভুল হযে গেছে, তখন আমি ভুল কবে পিছনেব সীটে উঠে বসেছিলাম ।

সকলকে ছাডিযে মোহিনী সবকাব হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন। বললেন আপনি তাহলে সর্বদা অত সীবিযাস গল্প লেখেন কেন মশাই—হাসিব গল্প লিখলে তো এব থেকে ঢেব বেশি ভালো কবতেন।

শুনেই মহাদেববাবু দস্তুবমতো গম্ভীব। একচুমুকে গ্লাসের বাকিটুকু শেষ কবলেন। বিভা সবকাবেব দিকে তাকাতে তিনি উঠে দ্বিতীয দফা তাব গেলাস সাজিযে দিলেন। দেখাদেখি মোহিনী সবকাবও চটপট তাব গেলাস শেষ কবে ওটা সামনে এগিযে দিলেন। বিভা সবকাব তাকে মেপে অর্ধেকই দিলেন।

নিজেব গেলাসটা তুলে নিযে মহাদেব গাঙ্গুলি আগেব কথাব জেব টেনে মোহিনী সবকাবকে জিজ্ঞেস কবলেন, সীবিযাস গল্প বলতে একটা নমুনা দিন। দ্বিতীয বাসব?

দ্বিতীয গেলাস হাতে নেবাব পব মোহিনী সবকাবেবও ভিতব চাঙ্গা একটু। জবাব দিলেন, তা তো বটেই, ওটা আপনাব সীবিযাস উপন্যাসেব সব থেকে অসাব নমুনা—

বিভা সবকাব বলে উঠলেন, তখনই বলেছিলাম এসব খেলে—

একটা হাত তুলে মহাদেব গাঙ্গুলি তাঁকে থামিযে দিলেন। গেলাসে একবাব চুমুক দিযে ওটা সামনে বাখলেন। পলকা গম্ভীব চাউনি মোহিনী সবকাবেব মুখেব ওপব। —'দ্বিতীয বাসব' আপনি মন দিযে পডেছেন?

—পডেছি।

—'দ্বিতীয বাসব গাঁজাখুবি' পডেছেন?

—তা-ও পড়েছি।

—কোনটা আগে পড়েছেন?

মোহিনী সরকার একটু আমতা-আমতা করার ফাঁকে বিভা সরকার জানান দিলেন, 'দ্বিতীয় বাসর গাঁজাখুরি' পড়েই তো আমাকে জব্দ করার জন্য তাড়াতাড়ি ওই পূজাসংখ্যাটা নিয়ে বসেছিলেন।

'দ্বিতীয় বাসর গাঁজাখুরি' একজন ক্ষ্যাপা অথচ নামী সমালোচকের সমালোচনার হেড-লাইন। একে একে তিনি এবারের নামী লেখকদের লেখা নিয়ে একটা নামকরা কাগজে আলোচনা করেছেন। প্রথমেই মহাদেব গাঙ্গুলির 'দ্বিতীয় বাসর' নিয়ে পড়েছেন আর বাস্তবশূন্যতার তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে হেড-লাইন দিয়েছেন, 'দ্বিতীয় বাসর গাঁজাখুরি'।

নিজের গেলাসে আর একটা চুমুক দিয়ে মহাদেব গাঙ্গুলি বললেন, বেশ।... পূজাসংখ্যায় কিছুটা তাড়াহুড়োর মধ্যে লিখতে হয়, কি লিখেছি না লিখেছি মনেও থাকে না। নিজেকে ডিফেন্ড করতে হলে গল্পটা আগে ভালো করে মনে পড়া দরকার। 'দ্বিতীয় বাসরে' কি আছে আপনি ছোটর ওপরে বলতে পারবেন?

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো করে মোহিনী সরকার জবাব দিলেন, নিশ্চয় পারব।

—বলুন তাহলে। আমার বক্তব্য পরে।

পরিবেশ জমে উঠেছে। মোহিনী সরকার মাঝে মাঝে গেলাসে চুমুক দিয়ে যা বললেন, সংক্ষেপে 'দ্বিতীয় বাসর'-এর কাহিনী মোটামুটি তাই। এবং সেটা এইরকম।

—দু'টি গ্রামের ছেলেমেয়েকে নিয়ে গল্প। ছেলেটি জগৎ মিত্র। কাছাকাছির শহরের কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে তিন বছর যাবৎ কলকাতার এক রে-সরকারী অফিসে চাকরি করছে। বয়েস চব্বিশ। চাকরি করলেও গান তার ধ্যানজ্ঞান। কলেজে পড়তে ছাত্রমহলে তার গানের সুনাম হয়েছিল। কলকাতার ছোট, মাঝারি, বড় আধুনিক গানের আসরেও ইদানীং তার ডাক পড়ছে। রেডিওয় চান্স পাচ্ছে। তার গাওয়া এক ছবির দুটো গান রীতিমতো হীট করেছে। জগৎ মিত্র আশা করছে, শীগগিরই আর তার চাকরি করতে হবে না। কারণ গানের রোজগার আশাতিরিক্ত বাড়ছে।

মেয়েটির নাম রত্না। একই গাঁয়ের মেয়ে। বসু ছিল, মিত্র হয়েছে। সে-ও ওই কাছাকাছি শহরের আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। চেনা-জানা ঘর, জগৎ মিত্রের অথর্ব বাবার আগে থাকতে মেয়েটার ওপর চোখ ছিল। ছেলে চাকরিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। এই বিয়েতে প্রেমট্রেমের কোনো ব্যাপার নেই। মেয়েটাকে রূপসী না বললেও বেশ সুশ্রীই বলতে হবে। তার বয়েস উনিশ। সে গ্রামে থেকে প্যারালিটিক শ্বশুরের পরিচর্যা করে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই চঞ্চল বউটিকে দারুণ ভালবাসেন। তাঁর শাসন নেই বলেই রত্নার আচরণ গাঁয়ের বউয়ের মতো নয়—শ্বশুরের আদুরে মেয়ের মতো। শ্বশুরের সেবা-যত্ন করে, পুকুরে সাঁতার কাটে, ওর থেকে বয়সে ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে চোবায়, দুপুরে নিরিবিলি। পেয়ারা, কুল, আতা, জামরুল গাছে ওঠে, নয় তো এক মাইল দূরের বাপের বাড়িতে টহল দিয়ে আসে। প্রত্যেক শনিবারের বিকেলে জগৎ আসে, সোমবার খুব ভোরে চলে যায়। এই শনিবারটার জন্য রত্না যে উন্মুখ হয়ে থাকে জগৎকে তা বুঝতে দেয় না। দুষ্টুমি মাখায়

চাপলে সে আসাব পব বিকেল থেকে বাত পর্যন্ত শ্বশুবকে নিযে বা বাঁধা-বাড়া নিযে এমন ব্যস্ত থাকে যে, জগৎ তাকে ধবা-ছোঁযাব মধ্যে পায না। ফলে তাব বাগ হবেই। সে অন্য পাশ ফিবে চুপচাপ শুযে থাকে। কিন্তু বত্নাব বাগ ভাঙানোব বীতিটাও আসুবিক। সুড়সুড়ি দেবে, কথা না বলে খুনসুড়ি কববে, তাবপব একসময জগৎকে জাপটে ধবে খাটেই গড়াগড়ি খাবে। জগৎ তখন ছাড়াতে চেষ্টা কবেও পাবে না। তবু বাগ দেখায। বলে, সামনেব শনিবাব আমি আসছি না—

বত্না বড় বড় চোখ কবে বলে, তুমি হলে গিযে আমাব জগৎ। না এলে তো অন্ধকাব দেখব।

—অন্ধকাব দেখবে। তাহলে এতক্ষণ কি হচ্ছিল?

বত্না হেসে গড়িযে জবাব দেয, এতক্ষণ জগৎ-এব সঙ্গেই বসকবা হচ্ছিল।

এব পবে আব বাগেব আয়ু কতক্ষণ? গুনগুন কবে অন্তত চাব-পাঁচখানা গান শোনাতে হয। জোবে গাওযাব উপায নেই, বাবাব ঘুম ভেঙে যাবে। কলকাতায কবে কোথায, কি গাইল সেই গল্প কবে। মাসেব বোজগাবেব বাইবে গানেব কল্যাণে কত বাড়তি বোজগাব হল বলে। আব, আবো কিছু বোজগাব বাড়লে কলকাতায বাসা ঠিক কবে বত্নাকে আব বাবাকে নিযে যাবাব কথাও বলে। বত্না সাগ্রহে শোনে, কিন্তু রুগ্ন শ্বশুব যে গাঁযেব বাড়ি ছেড়ে আব কোথাও যাবে না তাও জানে। আব এত সুন্দব জাযগা ছেড়ে ওব নিজেবও দু'খানা খুপবিব মধ্যে গিযে উঠতে কেমন লাগে সে সন্দেহও আছে।

জগৎ-এব ইচ্ছা ছিল, বউ কলেজে পড়ুক। ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ কবেছে, কলেজে পড়লেও খাবাপ বেজাল্ট কববে না নিশ্চয। কিন্তু শ্বশুবেব দোহাই দিযে বত্না সে-প্রসঙ্গ এড়াতে চেষ্টা কবে। আসলে দিব্যি আনন্দে আছে, এব মধ্যে আবাব পড়াশুনাব ঝামেলাব মধ্যে কে ঢোকে। জগৎ প্রাইভেটে আই. এ. পবীক্ষা দেবাব জন্য তাকে তৈবী হতে বলে। বত্না তখন তাকে কাজেব যে ফিবিস্তি দেয, তাতে পড়াশুনা ছেড়ে কাবো নিঃশ্বাস ফেলাবও সময হবাব কথা নয।

এই সুখেব দিন হঠাৎ ফুবালো।

তাব সূচনাও আকস্মিক। কলকাতাব সমস্ত অফিসেব কর্মচাবীবা হঠাৎ একদিনেব ধর্মঘটে নেমেছিল। তাঁদেব মিছিলে জগৎকেও টেনে নামানো হযেছিল। সেটা একচল্লিশ সাল। স্বাধীনতাব দাবি বা ইংবেজ শাসনেব কোন-না-কোন অন্যায উপলক্ষে কলকাতায তখনও মিছিল লেগেই ছিল। অভিযোগ অন্য কোন অফিসেব একজন কর্মচাবীকে ইংবেজেব পুলিশ ঠেঙিযে মেবে ফেলেছে। তাই সমস্ত অফিসেব কর্মচাবীদেব পবদিন অফিস বযকটেব ডাক। একে যুদ্ধেব সময সেটা। দু'-পক্ষই মাবমুখী। সবকাব ট্রাম-বাস গাড়ি চলাচল বন্ধ হতে দেযনি। অন্যদিকে এই বিশাল মিছিলও পথ আগলে মনুমেন্টেব দিকে এগোচ্ছে। ফলে বাস্তা জ্যাম। ট্রাম, বাস, মোটব, লবিব লম্বা জট। এক জাযগায মিছিলও দাঁড়িযে গেছে, ওগুলোও। জগৎ মিত্র কেটে পড়াব তাল খুঁজছিল। এক্ষুণি হযতো পুলিশ এসে কাঁদানে বোমা ছুঁড়বে আব লাঠিপেটা কবে মিছিল ভেঙে দিতে চাইবে।

এই সময় পাশের একটা গাড়ির দিকে দু'চোখ আটকে গেল। পিছনের সীটে একটি মেয়ে বসে আছে, বছর একুশ হবে বয়েস। মেয়েটির চোখে বড়-সড় একটা সানগ্লাস। একটু লালচে চুল, বেশ ফর্সা। গাড়ি এভাবে আটকে যাওয়ার দরুন মুখে বাজ্যেব বিরক্তি। জগৎ হাঁ করে তাকেই দেখতে লাগল। মেয়েটা তার পাশেই দু'হাতেব মধ্যে।

সেই মেয়েও দেখল তাকে। বার কয়েকই দেখল। দেখছে যে, সানগ্লাসের দরুন জগৎ সেটা বুঝতে পাবল না। নইলে অমন বোকাব মতো চেয়ে থাকত না।

মেয়েটা হঠাৎ একঝটকায় সানগ্লাসটা খুলে ফেলে মুখটা গাড়ির জানালা দিয়ে একটু বার কবে, দু'চোখ টান কবে তাব দিকে চেয়ে বইল। বাগত মুখেব ভাবখানা, কত দেখবে দেখো, খুব ভালো কবে দেখো! এই যাদের স্বভাব তাবা আবাব পথ আগলে দেশ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

জগৎ হঠাৎ এত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল যে, মেয়েটা একটু বাদে ফিক কবে হেসেই ফেলল। আর কথা নেই। জগৎ এদিক-ওদিক চেয়ে হঠাৎ লাইন থেকে সটকান। গাড়িটার পাশ দিয়ে পালানোব সময় মেয়েটা জোবেই হেসে উঠল। জগৎ-এব দু'কান গবম। এদিকেব ফুটপাথে উঠে ঘুবে তাকালো। মজা পেয়ে মেয়েটা এদিকেব জানলায় সবে এলো। আব সোজা ওব দিকে চেয়েই হাসতে লাগল। জগৎ হনহন কবে উল্টো দিকেব রাস্তা ধবল।

মেয়েটাব ওই হাসি আব ওই চাউনি ওব গায়ে জ্বালা ধবিয়ে দিল। অন্যদিকে আত্মাভিমানও চাড়িয়ে উঠতে লাগল। আগামী দিনেব কতবড এক গায়ক ঐ মিছিলে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা যদি জানত, আক্কেল হত। মেসে ফিবে কল্পনায় আক্কেল হওযাব ছবিটা ধবতে চেষ্টা কবল। করে প্রতিশোধ নিতে পারাব আনন্দ পেতে চেষ্টা করল। শেষে কলম নিয়ে বউকে চিঠি লিখতে বসল। সেটা সবে সোমবার, শনিবাব পর্যন্ত ঘটনাটা পেটে চেপে বাখা কঠিন।

লিখে সেই দুপুবেই পোস্ট কবে দিল।

তাব ঠিক দু'দিনেব মধ্যে সত্যিই এক বিচিত্র যোগাযোগ। বালিগঞ্জেব এক বডলোক বন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে নেমন্তন্ন খেতে গেছল। জগৎ মিত্র সেখানে মাননীয় অতিথি। তাব সোলো গানের আসব হবে। বন্ধুব বাযনা অন্তত দশখানা গাইতে হবে। গাড়ি পাঠিয়ে তাকে নিয়ে যাওযা হয়েছে। সেই গাড়িতে জগৎ তাব হারমোনিয়াম নিয়েছে। তবলচি বন্ধুই জোগাড কবে রেখেছে। বেডিও আর্টিস্ট, কয়েকটা গান বেকর্ড হয়েছে, দু' দুটো গান ছবিতে সুপাবহীট—এমন ছোট আসবে দারুণ খাতিব কদব হবে না কেন?

ছেলের থেকে মেয়েব ভিডই বেশি। তাদেব মুখে মুখে বাযনা এটা গান, ওটা গান। এক-একটা গান শেষ হলেই আবাব বাযনা। পাঁচখানা গান গাওযার পর ষষ্ঠ গান সবে শুরু করবে, সামনের মেয়ে পুরুষদেব ঠেলে সবিয়ে যে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়ালো তাকে দেখেই জগৎ-এর দু'চক্ষু স্থির। মিছিলেব রাস্তাব সেই মোটরগাড়ির মেয়ে। কল্পনার প্রতিশোধ যে এমন বাস্তব হয়ে উঠতে পারে ভাবা যায় না।

মেয়েটি খুব সপ্রতিভ মুখে বলল, আমার নাম সুমিত্রা চৌধুরী—আমি আপনার এখানকার বন্ধুর স্ত্রীর বন্ধু। আচ্ছা, আপনাকে আমি খুব শীগগিরই কোথায় দেখেছি বলুন তো—দেখেছি ঠিক, কিন্তু মনে করতে পারছি না।

একটু দম নিয়ে জগৎ বলল, তবশুদিন দুপুরে রাস্তায় মিছিলে দেখেছিলেন... আপনি গাড়িতে বসেছিলেন, আমি আপনার পাশেই মিছিলে ছিলাম।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে এবারে আকাশ থেকেই পড়ল সুমিত্রা চৌধুরী।—এই খেয়েছে। আমি কার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছি। তাই তো—আপনিই তো সেই—মিছিল ছেড়ে একেবারে ছুটেই পালিয়ে গেলেন। ছি ছি ছি, আচ্ছা আপনার গান শেষ হোক, তারপর ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

জগৎ আবার গান ধরল। এমন মনপ্রাণ ঢেলে আর কখনো গেয়েছে কিনা জানে না। একে একে আরো চারখানা গান। সকলে বাহবা বাহবা করে উঠল। খাওয়ার পরে সুমিত্রা চৌধুরী এসে ধরল তাকে।—চলুন, আমার বাড়ি একবারটি যেতে হবে।—এই কাছেই।

জগৎ মিত্র বলল, আজ থাক, সঙ্গে হারমোনিয়াম আছে, গাড়ি না পেলে অসুবিধে হবে।

কানেই তুলল না। বলল, আপনার হারমোনিয়াম অলরেডি আমি আমার গাড়িতে তুলিয়েছি—ওটা আর তার মালিককে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। আসুন, ছাড়া পাচ্ছেন না—সেদিনের কাণ্ড আমি বাড়ি এসেই বাবা-মাকে বলেছিলাম আর হেসে গড়িয়েছিলাম—ছি ছি ছি ঃ না জেনে—কি কাণ্ড করেছি বলুন তো।

জগৎ বলল, দোষ হয়তো আমারও কিছু ছিল।

অম্লানবদনে সুমিত্রা চৌধুরী বলল, তা তো ছিলই। মিছিলে দাড়িয়ে আপনি ড্যাবড্যাব করে আমাকে দেখছিলেন—আপনি জগৎ মিত্র সেই লোক জানলে তো উল্টে গর্ববোধ করতাম।

জগৎ আরো লজ্জা পেল। তাকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে সেই মেয়ে এক হৈ-চৈ কাণ্ড বাধিয়ে দিল। কত বড়লোকের মেয়ে বাড়িতে ঢুকেই জগৎ টের পেয়েছে। তকতকে সাজানো-গোছানো সব ঘর, জেল্লা ঠিকরানো আসবাবপত্র। সুমিত্রার বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ হল। তারাও অমায়িক। আর একমাত্র মেয়ের প্রতি বাবা-মায়ের অন্ধ স্নেহেরও আচ পেল। চাকর দিয়ে হারমোনিয়াম নামিয়ে জোর করে আবার তাকে বসিয়ে দিল—বাবা-মাকে দুটো গান অন্তত শোনাতে হবে।

জগৎ-এর মনে হল, এই মেয়েটার ইচ্ছেতেই যেন জগৎ চলছে। কোনো বাধা মানার বা আপত্তি শোনার পাত্রী নয় সে। দুটো গানের পর বাবা-মায়ের সামনে সে কথা আদায় করতে চাইল, সামনের রবিবার সন্ধ্যায় এখানে আসবে এবং খাবে। কারণ আজ নেমন্তন্ন খেয়ে আসার পর আর খাওয়ানোর প্রশ্ন ওঠে না। ফাঁপরে পড়ে জগৎ মিত্র বলল, বোরবারে আমি কলকাতায় থাকি না, দেশে যেতে হয়।

সুমিত্রার মা জিজ্ঞেস করলেন, দেশে কে আছে তোমার?

—অসুস্থ বাবা। আর কে আছে সেখানে সেটা যে বলা হল না জগৎ মিত্রর ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরে মনে হয়েছে।

রবিবার বাদ দিয়ে পরের সোমবার জগৎ এখানে আসবে, গাইবে, গল্প করবে, খাবে কথা দিয়ে তবে নিষ্কৃতি। একেবারে নিষ্কৃতি, ঠিক বলা যায় না। কারণ, সুমিত্রাও তার সঙ্গে এসে গাড়িতে উঠল। মেসে পৌঁছে দিয়ে ফিরবে। তার বাবা-মা আদরের মেয়ের স্বাধীনতায় এতটুকুও কটাক্ষ পর্যন্ত করেন না লক্ষ্য করল।

জগৎ-এর ভালোও লাগছে, আবার বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। দু'জনের মাঝখানে চার-ছ' আঙুলও ফারাক নেই, মেয়েটার সেদিকে হুঁশ নেই। মাঝে মাঝে কাঁধে কাঁধ ঠেকছে, ওর তপ্ত নিঃশ্বাস মুখে লাগছে। খুশি মেজাজে সুমিত্রা বকেই চলেছে। এ-রকম এক অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে ওর নাকি দারুণ মজা লাগছে। আজকের গানগুলোর প্রশংসা করল, এমনি একখানা রেকর্ড আর ছবির হীট গানের রেকর্ড তার কালেকশানে আছে জানালো। আবার কবে নতুন রেকর্ড বেরুবে খোঁজ নিল। ফাকে ফাকে নিজের কথাও ঘুরিয়ে বলল। বি-এ পাশ করে এবারে এম-এতে ভর্তি হয়েছিল—আর পড়তে ভালো লাগল না বলে ছেড়ে দিল। গান তার দারুণ ভাল লাগে—ওরও ইচ্ছে করে বড় বড় শিল্পীর মতো গাইতে। একজন ওস্তাদ রাখা হয়েছিল, কিন্তু তিন মাস ধরে সে সা রে গা মা পা ধা নি নিয়ে ওকে এমন নাকানি-চোপানি খাওয়াতে লাগল যে, সুমিত্রা তাকে বিদায় করে বাঁচল। আর শেষে জিজ্ঞেস করল, আপনি সেদিন মিছিলে দাড়িয়েছিলেন কেন—চাকরি করেন নাকি?

এত বড়লোকের মেয়ের কাছে সামান্য চাকরির কথা বলতেও লজ্জা। জবাব দিল, এখনো করছি, আর বেশিদিন বোধহয় দরকার হবে না।

—তা তো হবেই না, এরই মধ্যেই যা নামখানা করে ফেলেছেন। জানেন, আপনার বন্ধুর বউ প্রমীলার সঙ্গে আমার এমন কিছু খাতির নেই—ও মনে মনে আমাকে হিংসা করে—কিন্তু আপনি আসছেন খবর পেয়ে ফোন করে নিজে সেধে নেমন্তন্ন নিলুম। তখন কি জানি আপনি—সেই মিছিলের আপনি।

গলির মধ্যে মেসবাড়ি। গাড়ি ঢোকে না। হারমোনিয়ামটা ড্রাইভারকে দিয়ে মেসে পাঠানো হল। দ্বিধা কাটিয়ে জগৎ বলল, মেসবাড়ির যা দশা আপনাকে ডাকতে পারছি না—

—আর ডেকে কাজ নেই। কিন্তু আপনিই বা এ-রকম একটা জায়গায় থাকেন কেন? খুব পয়সা জমাচ্ছেন বুঝি?

—না, দেখেশুনে উঠে যাব ভাবছি কিন্তু সময় হয়ে ওঠে না।

তার অফিসের ফোন নম্বর লিখে নিয়ে আর সোমবার রাতের কথা আবার মনে করিয়ে দিয়ে সুমিত্রা চলে গেল। জগৎ মিত্রের মনে হল একঝলক বিদ্যুৎ সরে গেল।

পরদিন রত্নার চিঠি পেল। পারতে চিঠি লেখে না। কিন্তু মিছিলে এক মেয়ের কাছে হেনস্তার খবর জেনেই লিখেছে নিশ্চয়। তাই। ছোটর ওপর সুন্দর চিঠি।—তোমার চোখের ভাষায় নিশ্চয় কিছু ছিল। নইলে অচেনা অজানা ভদ্রলোকের মেয়ে ও-রকম করতে যাবে কেন? যাক, ওতেও যদি তোমার শিক্ষা না হয়ে থাকে তাহলে বাকি

শিক্ষা আমি দেব। তবে একটু আশ্বাস দিতে পারি, সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকানো আমার মতে ছেলেদের খুব বড় অপরাধ নয়। আর বে-আব্রু না তাকালে মেয়েরা সেটা অপছন্দও করে না। তুমি সেই মেয়ের দিকে কিভাবে তাকিয়েছিলে এখানে এসে তার মহড়া দিতে হবে—তবে বিচার করতে পারব। এরপর বাবার সম্পর্কে খুঁটিনাটি খবর। তার শরীরটা নাকি বেশ ভেঙেই পড়ছে।

শনিবারে দেশে যেতে পারের খবর বিস্তারিত শোনার পর রত্না হাঁ একেবারে। তারপর সে কি হাসি। হাসি আর থামতেই চায় না। শেষে বলল, বেচারি সুমিত্রা চৌধুরী —তোমার ঘরে যে বউ আছে তাকে সেটা বললেই না?

—বলার আর চান্স পেলাম কোথায়। সোমবারে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে বলব।

রত্না সাবধান করল, তাহলে খাওয়ার পরে বোলো, নইলে কপালে কি জুটবে কে জানে।

কিন্তু সোমবার নেমন্তন্ন খেতে এসে জগৎ মিত্রের আরারও দিশেহারা দশা। সুমিত্রা তার একগাদা বান্ধবীকে নেমন্তন্ন করেছে, ডজনখানেক বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছে, সেই সঙ্গে আর যাকে নেমন্তন্ন করেছে তাকে দেখে তো জগৎ-এর দস্তুরমতো রোমাঞ্চ। এক রেকর্ড কোম্পানীর হর্তা-কর্তা সেই ভদ্রলোক। এদিকে হারমোনিয়াম আর তবলার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল। এদিনও গুণে গুণে দশখানা গান হ'ল। রেকর্ড কোম্পানীর ভদ্রলোক প্রশংসা করতেই সুমিত্রা তাকে নিয়ে পড়ল।—মাত্র দু-খানা রেকর্ড কেন ওঁর? শুধু মুখে প্রশংসা করলেই হবে? কবে রেকর্ড করবেন বলুন, আমি নিয়ে যাব।

ভদ্রলোক দিন তারিখ বলার পর রেহাই পেলেন। আর তার পরেও মাঝে মাঝে রেকর্ড করবেন কথা দিলেন।

খাওয়া-দাওয়া সারা হতে এই রাতেও সুমিত্রা তাকে নিজের গাড়িতে পৌঁছে দিতে এলো। আগের দিনের থেকেও বেশি ঘন হয়ে বসে ফিক করে হেসে বলল, কেমন- -মিছিলে ওভাবে জব্দ করার পুরস্কার পেলেন তো? বছরে ক-খানা করে আপনার রেকর্ড করাই এবারে দেখবেন।

জগৎ মিত্র জিজ্ঞেস করল, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক?

—সম্পর্ক আবার কি, উনি চ্যাটার্জি আর আমরা চৌধুরী ক্রিশ্চিয়ান। বাবার সঙ্গে অল্পস্বল্প খাতির ছিল, বাবা নিজে ইন্টারেস্ট নিয়ে ওঁর বাড়িটা খুব কম খরচে করে দেবার পর থেকে আমাদের বাড়ির সঙ্গেই এখন দারুণ খাতির। উনি নিজের ক্ষমতায় ডবল খরচ করেও অত বড় বাড়ি করতে পারতেন না। বাবা বিরাট কন্ট্রাক্টর জানেন তো?

জগৎ বলল, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না।

—হুঁঃ। শুকনো ধন্যবাদ নিতে আমার বয়ে গেছে। আর শোনো, ওসব আপনি-টাপনি আমার ভালো লাগে না, ফ্রম নাও অন উই আর ফ্রেন্ডস—বুঝলে?

বোঝার চমকে জগৎ-এর ঘাম ছোটার দাখিল। গলির মুখে নামতে সুমিত্রা মনে করিয়ে দিল, রেকর্ড করার ডেট মনে আছে তো? ঠিক সময় ধরে গলির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি গাড়ি নিয়ে আসব।

জগৎ মাথা নাড়ল। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। আর ভিতরটাও কি-রকম মোহাচ্ছন্ন। গাড়িতে আজ অনেকবার কাঁধে কাঁধ ঠেকেছে, গায়ে গা ঠেকেছে। ও চলে যাবার পরেও একটা উষ্ণ স্পর্শ যেন তাকে ঘিরে আছে। সেই কারণে প্রচণ্ড অস্বস্তি। কিন্তু তারই তলায় কোথায় একটু লোভও। টের পাওয়া মাত্র নিজের ওপরেই রাগ। মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা অস্বীকার করেছে। রত্নাকে সে ভালবাসে—দারুণ ভালবাসে।

কিন্তু এবারে দেশে গিয়ে রত্নার অনেক জেরার জবাবে মুখ যদি বা একটু-আধটু খুলল মন খুলতে পারল না। দু-চার কথায় শুধু জানালো, নেমন্তন্ন খেতে গেছল, খুব আদরযত্ন পেয়েছে, অনেকগুলো গানও গাইতে হয়েছে।

এর বেশি আর কিছু বলল না। বলা সহজ নয়। রত্নার তাতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা ষোল আনা। তাছাড়া বাবার শরীরটা বেশি খারাপ বলে রত্না বারবার সে-প্রসঙ্গ তোলারও খুব সময় পেল না। বাবাকে শহরের ডাক্তার এনে দেখানো নিয়েই বেশি কথা হল। জগৎ একদিন কামাই করে ডাক্তার দেখিয়ে সোমবারের জায়গায় মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরল।

টিফিনে সুমিত্রার টেলিফোন। দেশে যাবার আগে ও প্রায় রোজই টেলিফোন করেছে। প্রথম দিনেই জগৎ বলে দিয়েছিল, ফোন করলে যেন টিফিনে করে, সেকশনাল হেড-এর ঘর তখন ফাঁকা থাকে।

—কাল অফিসে আসোনি কেন?

—দেশে বাবার অসুখ বেড়ে যেতে শহরের ডাক্তার এনে দেখাতে হয়েছে।

—এখন ভালো?

—ভালো খুব না।

—সেরে যাবে, ভের না। পরশু রেকর্ডিং তোমার মনে আছে তো?

—আছে।

—কি গাইবে ঠিক আছে?

—আছে।

—আচ্ছা, দুটো গানেরই এক লাইন করে শোনাও তো?

জগৎ আঁতকে উঠল, টেলিফোনে শোনার কি।

—আঃ শুধু সুরটা শোনাও না। ঘর তো ফাঁকা?

—হ্যাঁ, তবু এটা ঠিক হবে না...।

ওধার থেকে সুমিত্রা রেগেই গেল, দেখো, আমার মুখ দিয়ে একবার বেরিয়েছে যখন, রেহাই পাচ্ছ না—এক লাইন করে শোনাও!

অগত্যা খুব গলা চেপে এক লাইন করে শোনালো।

—ঠিক বুঝতে পারলাম না কতটা ভালো। আচ্ছা, পরশু আগে গাড়িতে বসে শুনব।

গাড়িতে বসে জোর করেই পুরো দুটো গান শুনল। তার আগে দু-দিকেরই জানলার কাচ তুলে দিয়েছিল জগৎ। তার পরেও চাপা গলায় গেয়েছে। গায়ে গা ঠেকিয়ে

বসে প্রায় মুখের কাছে কান এনে সুমিত্রা প্রথম গানটা শুনেছে। শেষ হতেই ধমক।—অমন গলা চেপে গাওয়ার কি হয়েছে—আচ্ছা নার্ভাস লোক তো। পরেরটা জোরে গাও।

দু-মাস কেটে গেল। জগৎ মিত্রের ভিতরটা সর্বদা অস্থির। এক মুহূর্তের শান্তি নেই। রাত্রে ঘুম নেই। দ্রুততালে সে একজনের দখলের মধ্যে চলে যাচ্ছে বুঝেও যেন অসহায়। সুমিত্রা প্রায় রোজই টেলিফোন করে, দুই-একদিন পরে পরে ঠিক ছুটির মুখে গাড়ি নিয়ে অফিসে আসে, বাড়িতে ধরে নিয়ে যায়, সিনেমায় নিয়ে যায়, নয় তো এমনিই কলরাতার রাস্তায় চষে বেড়ায়। তার চোখে জগৎ মিত্র এক দুর্লভ আবিষ্কার। গানের জগতে তাকে একেবারে সামনের সারির প্রথম দিকে এগিয়ে আনা যেন তারই গুরুদায়িত্ব। কিছুটা এগিয়ে আনতে পারলে আনন্দে আটখানা হয়। না পারলে ফুসে ওঠে। যা চায় তা হতেই হবে। যা চায় তা পেতেই হবে। এর মধ্যে কোনো মাঝপথ নেই। আপস নেই। সভায় বা রেডিওতে গাইতে গেলে সে নিজেই আগে থাকতে গাড়ি নিয়ে চলে আসে। রেকর্ড কোম্পানীর—সেই ভদ্রলোককে ধরে আবার দুটো গান রেকর্ড করিয়েছে। যতক্ষণ সুমিত্রা চৌধুরী কাছে থাকে, জগৎ মিত্রর মোহগ্রস্ত দশা। চোখের আড়াল হলে যন্ত্রণা, বিবেকের দংশন। হ্যাঁ, ভালো সে আজও রত্নাকেই বাসে। তার জায়গায় আর কাউকে ভাবতে পারে না। কতবার ভেবেছে, আর না, এবার সুমিত্রাকে বলবে সে বিবাহিত। কিন্তু সুমিত্রা কাছে এলেই সব ভণ্ডুল। বলি-বলি করেও বলতে পারে না। তখন সুমিত্রা যেন কাচের আবরণে একঝলক আগুনের শিখা। সেই কাচে পতঙ্গের মতো মাথা খুঁড়ে মরা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এই দু-মাসেও প্রতি শনিবার জগৎ বাড়ি এসেছে। বাবার অসুখটা বেশি বাড়াবাড়ির দিকে বলে রত্না একটু ব্যস্ত। জগৎও ব্যস্ত ভাব দেখাতেই চেষ্টা করে। তবু রত্না কিছু পরিবর্তন আর করছে, লক্ষ্য করছে তা-ও টের পায়। পাওয়ার কথাই। ভালো করে রত্নার দিকে তাকাতে পারে না, আগের মতো কথা বলতে পারে না। রাতে আগে ভাগে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। অবশ্য বাবাকে ঘুম পাড়িয়ে ওর ঘরে আসতে বেশ দেরিই হয়। কিন্তু তবু যে-ভাবে রাত কাটে সে-ভাবে কাটার কথা নয়।

গোড়ায় গোড়ায় রত্না জিজ্ঞেস করেছে তোমার কি হয়েছে বলো তো দিন দিন তুমি এ-রকম হয়ে যাচ্ছ কেন?

জগৎ মিত্র তাতেই বিরক্ত—অফিসে নানারকম ঝামেলা শুরু হয়েছে বলেছি না? এরপর শনিবার আসতে পারব কিনা তারও ঠিক নেই।

রত্না একদিন বলেছিল, ঝামেলা তো চাকরি ছেড়ে দাও না—অন্যদিকের রোজগার তো এখন ভালই হচ্ছে।

জগৎ আরো তেতে উঠেছিল।—যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না। বাবার অসুখ, খরচের অন্ত নেই—চাকরি ছেড়ে বসে থাকলেই হল।

রত্না এখন কিছু বলে না, কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ চোখে তাকে লক্ষ্য যে কবে হঠাৎ হঠাৎ সেটা টের পায়। জগৎ বেশির-ভাগ সময় অন্যমনস্ক থাকে তারপর হঠাৎ টের পেয়ে ধড়ফড় করে ওঠে।

কলকাতায় সেদিন। সুমিত্রা অফিসে এসে জগৎকে বাড়ি ধরে নিয়ে গেছে। বিকেল থেকে বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যেই গাড়ি নিয়ে এসেছে। তুলে নিয়ে গেছে। ওদের বাড়ি পৌঁছানোর পরেও অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে! বিকেলের জল-খাবারের পাট চুকতেই মা-কে বলে দিয়েছে রাতে বিরিয়ানি আর কষা চিকেন খাবে তারা। মুখের কথা খসলেই এখানে সেটা তামিল করা জলভাত। বৃষ্টির বিরাম নেই।

সন্ধ্যার পরে সুমিত্রার বাবাও আড্ডায় যোগ দিলেন। কথায় কথায় হঠাৎ তিনি মেয়েকে বললেন, তোরও তো একসময় বেশ মিষ্টি গলা ছিল, এখনো গুনগুন করে নিজের মনে গান করিস যখন ভালো লাগে—জগৎকে পেয়েছিস যখন পছন্দমতো দুই একখানা গান তুলে নে না।

সুমিত্রা লাফিয়ে উঠল—দি আইডিয়া। একটা গান তুলে নেবার কথা তো আমার অনেকবার মনে হয়েছে। জগৎকে ডাকল, চলে এসো, আজই চেষ্টা করা যাক—

তাকে ধরে নিয়ে নিজের ঘরে এলো। তারপর দরজা বন্ধ করল। সামনের জানালাটাও। বলল, যা গলার ছিরি আমার এখন, জানলেই আশপাশের বাড়ির লোক গলা বাড়াবে।

কাছে এসে দাঁড়ালো। খুব কাছে। কপট গম্ভীর।—কি মাইনে দিতে হবে?

জগৎ-এর অজানা অস্বস্তি।—মাইনে আবার কি, হারমোনিয়াম আনো—

—নাঃ, এমনিতে আমি কাউকে খাটাই না।

বলেই আচমকা দু-হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে আনল। তারপর পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে উষ্ণ ঘন নিবিড় চুমু খেল একটা।

—হল?

জগৎ তখনো তার বাহুবন্দী। ঠোঁট দুটো জ্বলে যাচ্ছে। তার মুখের অবস্থা দেখে সুমিত্রা খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল, তুমি একটা রামভীতু। এতদিন তোমার সঙ্গে যেভাবে মিশেছি, অন্য কেউ হলে ঢের আগেই হাত বাড়াতো। বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার চুমু। আবার হাসি। বলল, যতক্ষণ না তুমি খাচ্ছ ততক্ষণ আমি খেয়ে যাব।

জগৎ মিত্র আস্তে আস্তে তার হাত ছাড়িয়ে নিল। মাথা টলছে। শরীর জ্বলছে। বলল, সুমিত্রা একটা কথা তোমাকে অনেকবার বলতে চেষ্টা করেছি। আমি বিবাহিত। দেশে আমার বউ আছে।

সুমিত্রা ছিটকে তিনহাত পিছনে সরে গেল। স্তম্ভিত চোখে দেখল একটু। তারপর চেঁচিয়ে উঠল।—কি বললে? তুমি কি?

—বিবাহিত।

—স্কাউনড্রেল। জোচ্চোর। আমি তোমাকে জেল খাটাব! প্রথম দিনেই তুমি মা-কে বলেছিলে, দেশে কেবল তোমার বাবা আছেন।

—বাবার অসুখ, তাঁর জন্যেই প্রতি রবিবারে দেশে যেতে হয় বলেছিলাম।

—কিন্তু এত দিনেব মধ্যে তুমি বলাবই সময পেলে না?

এব জবাব কি দেবে—জগৎ মিত্র চুপ।

সুমিত্রা তাব খাটে বসল। বাগে সমস্ত মুখ লাল। দু-চোখে খানিক ভস্ম কবল সামনেব মানুষটাকে। তাবপব আচমকা আবাব হেসে উঠল। বলল, তুমি হাডবজ্জাত আব অতিমাত্রায লোভী। বাবা-মা শুনলে কি বলবে বল তো?

—তাঁদেব কাছে আমি ক্ষমা চেযে নিচ্ছি।

—থাক, তোমাকে আব ঘটা কবে কিছু কবতে হবে না। বিযে কবা বউকে কত যে ভালোবাসো আমাব সঙ্গে মেশা দেখেই বুঝেছি।... তোমাকে ক্রিশ্চিযান হযে বেজিস্ট্রি বিযে কবতে হবে। ও কি? আঁতকে উঠলে কেন—তোমাদেব হিন্দু বিযে একটা ছেড়ে পাঁচটা কবলেই বা আটকাচ্ছে কি—এখন পর্যন্ত তো আইনেব বাধা কিছু নেই। বোসো এখানে, আমি আসছি।

বেবিযে গেল।

জগৎ মিত্র স্তব্ধ। বাইবে মুষল ধাবে বৃষ্টি হচ্ছে। কলকাতা ভেসে গেল বুঝি।

মিনিট কুড়ি বাদে একেবাবে বাবা-মাকে নিযে সুমিত্রা ফিবল। তাঁবা গম্ভীব। ভদ্রলোক তাঁব মেযেকেই বললেন, বুঝলাম ওব কোনো দোষ নেই—কিন্তু তুই আব ক'টা দিন ঠাণ্ডা মাথায ভেবে নে না, এত তাড়া-হুড়ো কবাব কি আছে?

—আঃ বাবা, তোমাকে অত কবে বললাম কি? আমাব ভাবাব আব কিছু নেই —ওকে ছাড়া আমাব চলবে না—আমাকে ছাড়া ওব চলবে না—ব্যস। যত টাকা লাগে লাগুক, একমাস আগেব তাবিখে নোটিশ দিযে তুমি সাত দিনেব মধ্যে আমাদেব বেজিস্ট্রি বিযেব ব্যবস্থা কবে দাও। তুমি তো বললে টাকা খবচ কবলে হতে পাবে।

—তা পাবে, কিন্তু—

—আব কিন্তু-টিন্তু নেই। ডান।

বাতে এ বাড়িতেই থাকাব ব্যবস্থা হযেছে জগৎ মিত্রব। বাস্তায বেবুনোব উপায নেই। কলকাতা জলেব তলায। এত বৃষ্টি স্মবণীযকালেব মধ্যে আব হযেছে মনে পড়ে না। ডানলোপিলোব নবম শয্যায শুযে জগৎ ছটফট কবছে।—তাব চোখে ঘুম নেই। দোতলাব সব আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। নিঝুম। জগৎ মিত্রব সংকল্প স্থিব কাল সকালে উঠে ও কাউকে কিছু বুঝতে দেবে না।... যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকতে হবে। অফিসে গিযে বাবাব অসুখেব কথা লিখে লম্বা ছুটি নেবে। তাবপব বেলা সাড়ে এগাবোটাব ট্রেনেই দেশে চলে যাবে। দেশেব হদিস এবা জানে না। যাতে না পায সে ব্যবস্থাও কবে যাবে। পেলেও জগৎ নিপাত্তা হলেই সব বুঝতে পাববে। আব দেশ পর্যন্ত ধাওযা কববে না।

হঠাৎ বিষম চমকে উঠল জগৎ মিত্র। অন্ধকাবে তাব শয্যায বসল কেউ। নাবী দেহ। পবনে বাতেব বাস। তাকে ঠেলে পাশে শুযে পড়ল। উষ্ণ নবম দুই বাহু বেষ্টনে টেনে আনল। তাবপব অমোঘ অব্যর্থ বসাতলেব দিকে টেনে নিযে যেতে লাগল।

সকাল। দুপুর। বিকেল। জগৎ মিত্র মেসে ফিরল। একে একে দিন গড়াতে লাগল। শনিবার এলো। দেশে গেল না। অফিসে যাচ্ছেই না।

আট দিনের দিন রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেল।

তার দু-দিন বাদে বত্নাকে রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠালো একটা। আর কারো হাতে না পড়ে, তাই। আর অবশ্য যাতে পায়, তাই। কি ঘটেছে সংক্ষেপে লিখল। আর লিখল, বাকি জীবন কেবল অভিশাপ দিয়ে যাও। সেটা আমার প্রাপ্য। জগৎ নতুন শ্বশুরবাড়িতে আছে। সেই ঠিকানা দিল।

চারদিন বাদে বত্নার জবাব এলো। খুব ছোট চিঠি। তোমার বাবার শরীরের অবস্থা এখন আশংকাজনক। সময় হয়ে আসছে বোঝা যায়। তাকে কিছু বলার দরকার নেই। এ শনিবারও যদি দেশে না আস তাহলে পরের শনিবার পর্যন্ত টিকবেন কিনা বলা যায় না। এক সপ্তাহ না আসাতে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

জগৎ অফিসের চাকরি রিজাইন করেছে। সে করেনি, সুমিত্রা করিয়েছে। তবু শনিবার পর্যন্তই অপেক্ষা করল। শনিবার আরো অনেক দূরে হলে যেন ভালো হত।

বাবার অবস্থার কথা সুমিত্রাকে জানিয়ে শনিবার দেশে গেল। বাবা তার হাত দুটো ধরে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, আমার এই অবস্থা আর তুই পনের দিন পরে এলি। আমি যে তোকে দেখার জন্যেই প্রাণটা ধরে বসে আছি।

সত্যিই তাই। তিনদিনের মধ্যে ছেলের কলকাতায় ফেরা হলনা। তিনি চোখ বুজলেন। দাহ কাজ শেষ করে জগৎ সেদিনই কলকাতায় এলো। টাকা নিয়ে আবার সেদিনই রাতে ফিরল। এ ক'দিনের মধ্যে বত্নার সঙ্গে তার একটিও কথা হয়নি। সে শ্বশুরের ঘরে শ্বশুরের কাছেই থেকেছে। এরই মধ্যে দু-বেলার রান্না সারতে হয়েছে। জগৎ-এর খাবার তার ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। তার খাওয়ার সময়েও সামনে থাকেনি।

রাতে ফিরতে খুব ঠাণ্ডা মুখে বত্না সামনে এলো। বলল, গ্রামের লোককে জানিয়ে দিতে হবে বাবার কাজ কলকাতার কালীঘাটে হবে।

মনের অবস্থা যা-ই হোক জগৎ অবাকই হ'ল একটু।—কালীঘাটে হবে?

—হ্যাঁ। তা না হলে আমার কাজ করতে অসুবিধে।

—তুমি কাজ করবে।

বত্না ঠাণ্ডা দু-চোখ তার মুখের উপর তুলল।—আমি ছাড়া আর কে করবে?

ঘর ছেড়ে চলে গেল। কথাটা জগৎ-এর মাথায় ঢুকল। সে এখন ক্রিশ্চিয়ান। শাস্ত্রমতে বাবার কাজ করার অধিকার এই জন্যেই নেই। কিন্তু ছেলে থাকতে এখানে বসে পুত্রবধূ শ্বশুরের কাজ করছে দেখলে সকলে হাঁ হয়ে যাবে।

রাতে রান্নার প্রশ্ন নেই। কারণ ফলাহার জলাহার বিধি। বত্না দুধ আর ফল তার ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে গেল। তার দিকে তাকালো না বা একটি কথাও বলল না। জগৎ মিত্রর বুকের ভিতরটা একটা যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগল। একবার ইচ্ছে হল বত্নাকে জোর করে ধরে আনে, বলে কি অবস্থায় পড়ে তাকে এ কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু সেটা আরো হাস্যকর।

পরদিন সকালে বাবার ঘরে এসে রত্নাকে বলল, ব্যবস্থাপত্রর জন্য আমি তাহলে কলকাতায় চলে যাই?

রত্না জবাব দিল, হ্যাঁ। না গেলে আমার এখানে তিন রাত থাকতে অসুবিধে হবে—যিনি চলে গেছেন তাঁর জন্যে এখানে তিন রাত থাকা দরকার। ব্যবস্থা করার কিছু নেই, আমার বাবা কলকাতা চলে গেছেন, সেখানে মামারা ব্যবস্থা করবেন।

কলকাতায় রত্নার মামার বাড়ি। বড় অবস্থা তাঁদের। জগৎ এ-ও বুঝল তার শ্বশুরকে মেয়ে সব জানিয়েছে। এমন অসহায় অবস্থা বলেই জগৎ হঠাৎ বেগে গেল। —আমার বাবার শ্রাদ্ধের খরচ যোগাবেন তোমার বাবা আর মামারা?

ঠাণ্ডা দু-চোখ এবারে তার মুখের ওপর উঠে এলো। বলল, যা খরচ হবে বাবা তার হিসেব রাখবেন। কাজের পর তাঁকে দিলে সে টাকা যেন তিনি নেন আমি বলে দেব।

তেমনি রাগত মুখেই জগৎ আবার বলল, আমিই যখন তোমার আর কেউ না, আমার বাবার জন্য তুমি এত কষ্ট করতে যাবে কেন?

—সেটা আমার রুচি। আপত্তি থাকলে টাকা দেবার দরকার নেই।

এর আধঘণ্টার মধ্যে জগৎ কলকাতায় রওনা হল।

বাবার কাজের দিন কালীঘাটে এলো। কাজের ব্যবস্থা, দান-সামগ্রী সবই পরিমিত বটে, কিন্তু পরিচ্ছন্ন সুন্দর। জগৎ অদূরে দাঁড়িয়ে সমস্তক্ষণ কাজ দেখল। কেউ তার সঙ্গে একটি কথাও বলল না। শ্বশুর বা মামাশ্বশুর বা রত্না তার দিকে একবার তাকালোও না। পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়ে গেলেন, অনুষ্ঠান পালন করালেন। রত্না মন্ত্র পড়ছে, যা বলা হচ্ছে, তাই করছে। তার পরনে টকটকে লালপেড়ে গরদ। মাথার খোলা চুল পিঠ বেয়ে কোমর ছুঁয়ে আছে। কপালে সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর। জগৎ মিত্রর ভিতর থেকে একটা অব্যক্ত কান্না গুমরে উঠতে লাগল। দু'চোখ খরখরে শুকনো।

কাজ শেষ হল। জগৎ রত্নার এক মামাতো ভাইকে বলল, কত খরচ হল একটু জেনে দিতে হবে।

দু' মিনিটের মধ্যে সে ফিরে এসে দু' পাতার একটা হিসেব তার হাতে দিল। খরচের শুধু মোট অঙ্কটা দেখে নিয়ে জগৎ সে-টাকা রত্নার মামাতো ভাইয়ের হাতে দিয়ে চুপচাপ চলে গেল।

দেশে এলো একমাস বাদে। রত্নার ভরণপোষণের দায়িত্ব যখন আইনত আর ন্যায়ত তার, একটা ফয়সালা করতেই হবে। সে-জন্যেই আসা।

বাড়ি তালা বন্ধ। তাই হবে ভেবেছিল। শ্বশুরবাড়িতে এলো। শ্বশুর বাইরেই বসেছিলেন। ভিতরে ডাকলেন না বা বসতে বললেন না। গলা দিয়ে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলেন।—রত্না এখানে থাকে না।

দ্বিধা কাটিয়ে জগৎ জিগ্যেস করল, কোথায়...?

—জানার দরকার নেই।

জগৎ চলে এলো। অপমানে মুখ কালি। তার কেন আসা শ্বশুরকে সেটা শুনিয়ে আসতে পারত। তা-ও পারল না।

কলকাতা। জগৎ মিত্রর ষষ্ঠ অনুভূতি প্রখরই বলতে হবে। তার ধারণা, বত্না কলকাতায়। মামাবাড়িতে থেকে কলেজে পড়ছে। ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ভাবনা থাকলে সেটাই স্বাভাবিক।

এক ববিবারে সেখানে গেল। নীচে রত্নাব সেই মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। জিগ্যেস কবল, রত্না এখানে?

বিরস মুখে সে মামাতো ভাই মাথা নাড়ল। এখানেই।

—কোন কলেজে পড়ছে?

কোন কলেজে বলল।

—একবাব ডেকে দিতে হবে। তাব খরচপত্র চালানোব দাযিত্ব আমাব। সে-সম্পর্কে কথা বলব।

সে চলে গেল। মিনিট তিনেকেব মধ্যে ফিবেও এলো।—বত্না বলল, তোমাব কোনো দাযিত্ব নেই। তাই দেখা কবাবও দবকাব নেই।

দিন যায। জগৎ মিত্রব ভিতবটা দিনে দিনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। আব সুমিত্রাব ততো মোহ ভাঙছে। তাব ইচ্ছেয লোকটার ছবিতে গান গাওয়া, রেকর্ড কবা, সভায গাইতে যাওযা, সিনেমা-থিয়েটাব দেখা, ওঠা-বসা-চলা-ফেবায বাধা আসতে পাবে এ তাব কল্পনার বাইবে। কিন্তু ক্রমে সেইবকমই ব্যাপার দাঁড়াতে লাগল। ফলে একতরফা ঝগডাঝাঁটি আব শাসনও বাডতেই থাকল। সে-ও মেয়েই। মেয়েলি অনুভূতিতে সন্দেহের আঁচড় পড়তে লাগল। বিযেব পব থেকেই লোকটাকে অন্যরকম দেখছে, বদলে যেতে দেখছে। তাব সন্দেহ, এই লোকেব মন আব একদিকে পড়ে আছে। তাহলে সেটা আগেব বউ ছাড়া আব কাব দিকে হবে? নইলে বিয়ের পব থেকেই এমন হযে যাচ্ছে কেন? এই সন্দেহ মনে এলেই সুমিত্রা ক্ষিপ্ত হযে ওঠে। যা মুখে আসে তাই বলে। গালাগালি কবে। অন্যদিকে মুখে বা নেই। তার কানে তুলো, পিঠে কুলো। কিন্তু সে যেমন চলছে, তেমনই চলছে।

মোহ একেবাবেই ছুটে গেল, বা আচমকা জগৎ মিত্রই ছুটিযে দিল ন' মাসেব মাথায। সুমিত্রাব শাসন আব আগেব বউ নিযে ঠেস সেদিন মাত্রা ছাড়িযেছে। তাব ওপর দিযে জগৎ মিত্র হঠাৎ গর্জন কবে উঠল। বলল, তুমি আমাব সর্বনাশ কবেছ--বুঝলে? এত বড সর্বনাশ কেউ কাবো কবে না—যাব কাছ থেকে তুমি আমাকে ছিনিয়ে এনেছ তুমি তার পাযেব নখেব যোগ্যও নও—বুঝলে?

বোঝার সেখানেই শেষ। সুমিত্রার বাবা তাকে কেবল গলাধাক্কা দিযে বার কবতে বাকি বেখেছেন। আব শাসিযেছেন, বিযে ভাঙিয়ে ফেব বিয়ে কবাব জন্য তিনি তাকে জেল খাটাবেন—আব মেয়েব খোবপোষ আদায় করে তাকে ফতুব করবেন।

শেষ পর্যন্ত কিছুই করেন নি। মেয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে নাকচের ডিভোর্স স্যুট ফাইল করেছে। তাতে অনেক অত্যাচার, অসদাচরণের অভিযোগ। জগৎ মিত্র কনটেস্ট কবা দূরে থাক, কোর্টে পর্যন্ত যায় নি। তাবা একতরফা ডিক্রি পেয়েছে।

জগৎ মিত্র মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে।

আবো মাসখানেক অপেক্ষা কবে বত্নাকে একখানা চিঠি লিখেছে। তাব প্রাযশ্চিত্তেব কথা লিখেছে। মুক্তিব কথা লিখেছে আব একটিবাব দেখা কবাব অনুমতি ভিক্ষে কবেছে।

চিঠিব জবাব মেলে নি।

আবো পনেব দিন পবে তাকে কলেজে যাবাব পথে ধবেছে। বত্না আস্তে আস্তে ঘুবে দাঁডিযেছে। চোখে চোখ বেখে অনুচ্চকঠিন গলায বলেছে, আব কখনো এ-ভাবে থামালে বাস্তাব লোক ডাকতে হবে।

চলে গেছে।

একে একে বছব ঘুবেছে। একটা, দুটো কবে ছ'টা। প্রতিবাবেব পবীক্ষাব ফল বেকলে জগৎ মিত্র গেজেট দেখেছে। বত্না মিত্র আই-এ পাশ কবল, ইংবেজিতে ভালো অনার্স পেযে বি-এ পাশ কবল, তাবপব ইংবেজিতেই ভালোভাবে এম-এ পাশ কবল। এখন সে একটা নতুন বেসবকাবী মেযেকলেজে ইংবেজি পডায। জগৎ মিত্রব বযেস একত্রিশ—বত্নাব সাতাশ।

জগৎ মিত্র একটাই আশা বুকে ধবে নিযে বসে আছে। বত্নাব নামেব পবে এখনো মিত্র চলছে, মিত্র বাতিল কবে এখনো বাপেব পদবী বসুতে ফিবে যায নি। আব সেই যে বাস্তায দেখা হযেছিল তখনো সিঁথিতে খুব সূক্ষ্ম সিঁদুবেব আঁচড দেখেছিল। জগৎ মিত্র গান ছাডে নি। গান নিযে আছে। নাম ডাকও হযেছে। বেকর্ডেব সংখ্যা বেডেছে। বাডছে। বোজগাব ভালো। কিন্তু তাব গানেব ধাবা বদলেছে। যে গানেব স্পর্শ প্রাণেব গভীবে পৌঁছয সেই গানই শুধু গায। বেকর্ডে, বেডিওয, উৎসব-অনুষ্ঠানেও তাই। সিনেমায হালকা চটুল গানেব ডাক পডলে বাতিল কবে দেয।

এইবাব সে শেষ চেষ্টাব জন্য প্রস্তুত হল। বত্নাব কলেজে গেল। দাবোযানেব হাত দিযে একটা স্লিপ পাঠালো। স্লিপে শুধু নিজেব নাম। তাবপব অফিসঘবে বসে অপেক্ষা কবতে লাগল।

মিনিট পাঁচ-সাত বাদে হিন্দুস্তানী দাবোযান সেই স্লিপটাই তাব হাতে দিল। ভাজ খুলে দেখল, উল্টোদিকে লেখা, দেখা হবে না।

জগৎ মিত্র চলে এলো। তাব প্রতীক্ষাব শেষ। আশাবও।

পবেব টানা নয মাসেব মধ্যে জগৎ মিত্রব আব কেউ দেখা পেল না। উৎসব-অনুষ্ঠান, বেডিও, বেকর্ড, সিনেমা—সর্বত্র সে অনুপস্থিত। বেডিও-শ্রোতাব সন্ধিৎসু চিঠিব জবাবে সেখানকাব কর্মীবা বেতাবেই শ্রোতাদেব জানাচ্ছে, জগৎ মিত্র দীর্ঘদিন ধবে নিখোঁজ বলেই দীর্ঘদিন ধবে তাঁব গান বেতাবে শোনা যাচ্ছে না। সিনেমাব পত্র-পত্রিকাগুলোতেও জগৎ মিত্রকে নিযে কিছু জল্পনা-কল্পনা চলেছে।

ন'মাস বাদে একদিন কলকাতাব সব কাগজে বডবড হবফে খবব বেকলো সঙ্গীতশিল্পী জগৎ মিত্রব সন্ধান মিলেছে। দীর্ঘদিন ধবেই তাঁকে হিমালযেব দুব-দুর্গমেব নেশায পেযেছিল। চবৈবেতিব ডাক শুনে মুসাফিবেব মতো তিনি মাসেব পব মাস পাহাডে ঘুবেছিলেন। এবাবে যমুনোত্রী থেকে ফেবাব পথে তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগে গুরুতব আহত হন। আশংকাজনক অবস্থায় তিনি এখন দেবাদুন হাসপাতালে।

খবর মিথ্যে নয়। জগৎ মিত্র সব থেকে বেশি চোট পেয়েছিলেন মাথায়। দেরাদুনের ডাক্তাররা সেই কারণেই অবস্থা আশংকাজনক ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য দু'দিন বাদে তাঁরা ফাঁড়া কাটার কথাও বলেছেন।

রাতে ঘুমের ওষুধের ঘোরে জগৎ মিত্র বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। চোখ মেলে তাকাতেই মাথার পাশের চেয়ারে যাকে দেখল সে স্বপ্ন না সত্যি—হঠাৎ ভেবে পেল না।

রত্না। সে চোখ মেলে তাকাতে চেয়ারটা আরো একটু কাছে টেনে নিয়ে এলো।

দু'জনে দু'জনার দিকে চেয়ে আছে।

দ্বিতীয় রাসর এখানেই শেষ।

চেয়েই আছে।

মোহিনী সরকারের বলার ফাঁকে তাঁর গেলাসের শেষের হাফ শেষ। আর মহাদেব গাঙ্গুলির তৃতীয় গেলাসও শেষ। তিনি বললেন, আপনি তো খুব মন দিয়েই গল্পটা পড়েছেন দেখছি।

মোহিনী সরকার এখন একটু মেজাজে আছেন। ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে কি প্রমাণ হল?

—কিছু না। মহাদেব গাঙ্গুলির গম্ভীর দু'চোখ এবার বিভা সরকারের দিকে।—গল্পটা আপনার গাঁজাখুরি মনে হয়েছে?

একটু ইতস্তত করে বিভা সরকার জবাব দিলেন, উনি যে-রকম বলছেন, সে-রকম নয়। পড়তে তো আমার বেশ ভালোই লেগেছে।... তবে আপনার অন্য বইয়ের মতো অতটা বাস্তব নয়।

—কোন কোন জায়গা অবাস্তব?

বিভা সরকার একটু ফাঁপরে পড়লেন। আগ বাড়িয়ে জবাব দিলেন মোহিনী সরকার। বললেন, আপনি সত্যি বড় লেখক, কিন্তু এই গল্পের কোথায় অবাস্তব আপনার সত্যি চোখে পড়ছে না? এই গল্পের ভিতটাই তো অবাস্তব। বিবাহিত জগৎ মিত্রর ওভাবে এক মেয়ের পাল্লায় পড়া অবাস্তব, রত্নার মতো বউকে ছেড়ে তাকে বিয়ে করা অবাস্তব, সব থেকে বেশি অবাস্তব আপনার কলমের খোঁচায় রত্নাকে আই-এ, বি-এ, এম-এ ভালভাবে পাশ করিয়ে প্রোফেসারির চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া—সেদিক থেকে রবিঠাকুরের সাধারণ মেয়ের অসাধারণ হয়ে ওঠার কল্পনাকে আপনি হার মানিয়েছেন—তারপরে বিরহী নায়কের হিমালয় ভ্রমণ অবাস্তব, অ্যাকসিডেন্ট এত মামুলি বলেই অবাস্তব —মিলনও অবাস্তব। এ সবই লেখকের ইচ্ছেয় হয়েছে।

—বুঝলাম। গম্ভীর মুখে সামান্য মাথা নেড়ে মহাদেব গাঙ্গুলি সায় দিলেন।... মা গঙ্গার আশীর্বাদের অমোঘ ফল বুঝতে পারছি। নড়েচড়ে সোজা হলেন একটু। দু'চোখ সোজা নিজের স্ত্রীর মুখের ওপরে।—তুমি কি বলো?

অন্য দু'জনের এবার খেয়াল হল, সোমা গাঙ্গুলির সমস্ত মুখ টকটকে লাল। ওই মুখে কেউ যেন হালকা করে আবির গুলে দিয়েছে। আগেও মাঝে মাঝে ওই মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন দু'জনেই। তাই তাঁরা অবাকই একটু।

সোমা গাঙ্গুলি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ওদের দুজনের দিকে চেয়ে তেমনি আবক্ত মুখে বললেন, উপন্যাসের সব জায়গায় গায়ক আর গান বদলে লেখক আর লেখা করে নিন, রেকর্ড কোম্পানীর জায়গায় পাবলিশার করুন, ছবির গানের জায়গায় রেডিওর গল্প পড়া করুন—আর আর (মুখ আরো লাল) নায়ক-নায়িকার নাম দুটো শুধু বদলে নিন—তাহলে কিছুই অবাস্তব নয়—সবই ঘটেছে।

বলতে বলতে সোমা গাঙ্গুলি ঘর ছেড়ে দ্রুত বারান্দায় চলে এলেন।

মোহিনী সরকার আর বিভা সরকারের অবাক দৃষ্টি প্রথমে বারান্দার দিকে। তারপর হতভম্ব বিমূঢ় চোখে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল।

সদা-গম্ভীর মহাদেব গাঙ্গুলির ঠোঁটের ফাঁকে টিপ-টিপ হাসি।

একাকী জোনাকী

এই পরিণাম আমার জানা ছিল। সেটা কবে আসবে, কখন আসবে, কোন পথ ধরে আসবে বা শেষের আসর ঠিক এই রকমই জমে উঠবে কিনা আমার বিক্ষিপ্ত চিন্তার মধ্যে সেটা তেমন বড় হয়ে ওঠে নি। জীবনের শুরুতে কোনো ভ্রষ্টলগ্নে আমি কক্ষচ্যুত হয়েছিলাম। তখন থেকে নিজের গোচরে হোক বা অগোচরে হোক, একটা লক্ষ্যবর্তিকা আমার মনের তলায় উঁকি-ঝুঁকি দিত। মনে হত, ওই বাতিটা হাতে নিতে পারলে দস্যুর মতোই আবার সেই হারানো কক্ষের একান্ত নিভৃতে নিজের জায়গাটি অধিকার করে নেব।

ওই বাতি হাতে পাওয়াটাই লক্ষ্য, সেটাই পরিণাম। এই লক্ষ্য পরিণামকে বেষ্টন করে একটা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে কেবলই পাক খেয়ে চলেছিলাম। তাই ওই আলোর দিকে আমার হাত বাড়ানোটা এত বিসদৃশ, এমন অস্বাভাবিক। অন্ধ আবেগে সেটা ভয়াল নিষ্ঠুর কুটিল। আমার সত্তা দ্বিখণ্ডিত, সেই আক্রোশে নিজের মধ্যে আমি এক আত্মধ্বংসী ঘাতক পুষেছি, এক হিংস্র পশুকে লালন করেছি। ওই আলো দিয়ে আমার খণ্ডিত সত্তা কোনো আলো জ্বালতে চায় নি, কারো বুকের তলার অন্ধকার দূর করতে চায় নি। মশাল জ্বালতে চেয়েছে, আগুন জ্বালাতে চেয়েছে।

সেই মশালের আগুনে হিংস্র ক্ষমাশূন্য উল্লাসে নিজের তাণ্ডব নৃত্য কত দেখেছি, ঠিক নেই। শব্দশূন্য চিৎকারে প্রতিশোধের একটা জ্বলন্ত গোলা এক রমণীর বক্ষ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েছি—মা ইন্দুমতী, তুমিও দেখো, তোমার ছেলে কেমন জ্বলছে আর পুড়ছে, দেখো! দেখো দেখো দেখো!

আজ যখন ওই আলোর কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি, হাত বাড়ালেই ধরা যায় এত কাছে—তোমরা শিউরে উঠছ, ওই পরিণামের গহ্বর থেকে আমাকে টেনে ফেরাতে চাইছ। তোমাদের বেদনার্ত মুখ দেখে আমি অট্টহাসি হেসে যাব, ভেবেছিলাম। কিন্তু তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি অবাক হয়ে দেখেছি এ কোনো মশাল নয়, ক্ষতবিক্ষত জীবনের এ কোনো রক্তের আখরে লেখা মাশুলও নয়। এই পরিণামের মুখে পা

ফেলামাত্র সর্বগ্রাসী পঙ্কিলতাব সেই ঘূর্ণাবর্ত ছাযাব মতো মিলিযে গেছে। ভয়াল দুঃস্বপ্ন ঘুমের ঘোবে যেমন অন্তরাত্মা কাঁপিযে তোলে, কিন্তু চোখ মেলে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায, তেমনি। একটা স্বস্তিব নিঃশ্বাসে বুক ভরে ওঠে তখন। আমারও তাই হযেছে. তাই হচ্ছে। এই অস্তিত্ব যেন এক স্বস্তিব সমুদ্রেব ওপর হালকা ভেলাব মত ভাসছি। তার প্লাবনে পৃথিবী বিহ্বল বুঝি।

পবিণামেব এই আলোব বঙে আমাব চোখেব সামনে সমস্ত দুনিযাব বঙ বদলেব উৎসব শুরু হযেছে। আমাব এই জড দেহেব শিবায শিবায সেই অলক্ষ্য দক্ষশিল্পী তীব্র বেদনাব মীড টেনে চলেছে। তাই দেখে বাববাব তোমরা শিউবে উঠছ। কিন্তু বিশ্বাস কবো, এক আসন্ন প্রত্যাশাব নিবিডতায আমাব এই নিথব দেহেব সমস্ত শিরা উপশিরাব তলায তলায এক অদ্ভুত স্পন্দন চলছে। খণ্ডকালেব এই ছোট পিঞ্জবটার মধ্যে আব আমি কুলিযে উঠছি না দেখে তোমাদেব এমনি আতঙ্ক কেন? এত আকুলতা কেন?

নিজেব আনন্দে বিভোব, তাই তোমাদেব করুণ মুখগুলো আমি ঝাপসা দেখছি। মা ইন্দুমতী, তোমাব মুখখানা এমন পাথব কেন? এত সব সেরা অভিনয় কবাব পব একটা সাদামাটা অঙ্কে এসে এই কাণ্ড তোমাব। তুমি কি বুঝতে পারছ না, মবীচিকাতে প্রেতের নাচ শেষ কবে তোমাব সুমন অনেক অনেক ব্যবধান পেরিযে যেখানে ছিল ঠিক সেইখানেই ফিবে এসেছে? তুমি শিল্পী. আব ওই অলক্ষ্য শিল্পীর কাজ দেখে তুমি মুগ্ধ হতে পাবছ না? তাহলে তোমাব পাশে তাকাও, বাবাব মুখখানা দেখো, আব তাব পাশে নতুন মাযেব মুখখানাও। এবাবে পাবছ মুগ্ধ হতে? ওই শিল্পী বসিক কতো, বুঝতে পাবছ?

যশোদা, তুমিও এসে গেছ! কী কাণ্ড. ঘবে তোমাব গোপাল কাঁদছে না? আর শোভা মিতা তোমবাই বা খবব পেলে কি কবে? বেডিও আব খববেব কাগজগুলো সব দেশ থেকে তুলে দেওযা যায না!

দোহাই তোমাদেব, তোমবা আব যাই কবো, শোক কবো না! আমাব এই স্তব্ধ অনাবিল মুহূর্তগুলিকে শোকেব শেকল পবিও না! এই কপালে শোকেব তিলক কেটে দিযে তোমাদেব অতি সাধাবণ সুমনকে অসাধাবণ কবে তুলতে চেও না! মিনতি বাখো, শোক কবো না—শোক কবো না!

* * * *

চোখ বুজলে এমন কি চোখ চেযেও অনেক সময সাত বছবেব কালো-কোলো একটা মিষ্টি-মুখ ছেলেকে আমি দেখতে পাই। ওই ছেলেও চেযে চেযে দেখে আমাকে, কাবণ আমি তাকে অহবহই ডাকি। দুষ্টু-দুষ্টু ডাগব চোখ. এক-মাথা ঝাঁকডা চুল, ফোলা-ফোলা দুই গালে যেন টোকা দিলেই অভিমান ঝববে। আমি ওকে বলি, হ্যাঁ বে, তুই কি কোন দিন বড হবি নে, কাছে আসবি নে?

ওই ছেলেটা আমি নিজেই। ওর নাম সুমন।

ও আমাব ডাক শোনে, কথা শোনে না।

আমি ওকে বলি, দেখ সুমন, আসলে তো তুই আর আমি এক, তুই ছোট সুমন আমি বড সুমন। কিন্তু তুই আলাদা হযে গিয়ে আমার ভিতরটা আধখানা করে

বেখেছিস। তুই কাঁদিস, ককিযে উঠিস আব সেই যন্ত্রণায আমিও অস্থিব হযে উঠি। তুই নিজে অমনি ছোট হযে থেকে আমাকেও পঙ্গু কবে বাখিস কেন? তাব থেকে তুই আমাব কাছে চলে আয, দুজনে এক হযে যাই—তোবও মুক্তি, আমাবও মুক্তি।

ও গাল ফুলিযে চোখ পাকিযে বলে, আসলে নিজেব মধ্যে নিযে তুমি আমাকে মেবে ফেলতে চাও। তুমি তো একটা খুনে—দিন-বাত কেবল মাকে মেবে ফেলাব বুদ্ধি আঁটছ মাথায, যেই তাকে মাবাব জন্য হাত তোলো আমি আর্তনাদ কবে উঠি আব তখন তুমি হাত গুটিযে নাও। সেই জন্যেই নিজেব মধ্যে নিযে গিযে আমাকে মাবাব মতলব তোমাব।

কচি মুখেব ওই কথা শুনে আমাব তাজ্জব লাগে। বলিস কি বে। আমি তো শুধু মাঝে মাঝে নিজেকেই মাবতে চাই।

একই কথা। সেই মাবও শেষ পর্যন্ত মাযেব বুকে গিযে লাগবে, তুমি ভালই জানো। আমাব সঙ্গে তোমাব অনেক তফাত, আমি মাযেব জন্য কেদে মবছি, আব তুমি মাযেব ওপব কেবলই ফুঁসছ।

কিন্তু তোব ফোঁস-ফোসানি জমা কবে কবেই তো আমি এত বড হযেছি, আব আমাব এই হাল হযেছে। এখনো এই দুর্দশাই চলেছে। বোকাব-মতো নিজেও ভুগছিস, আমাকেও ভোগাচ্ছিস। তাব থেকে চলে আয আমাব কাছে আমাব মধ্যে থেকেও এভাবে আলাদা হযে থাকিস নে।

না না না। ও মাথা ঝাকিযে ক্ষোভটা আমাব দিকে ছুড়ে দেয। আমি আলাদা বলেই আমাকে তুমি কোলে নিযে ঘুবে বেড়াচ্ছ। আমাব জন্যে তুমি আধখানা হযে না থাকলে এতদিনে তুমি ক'টা খুন কবে বসতে ঠিক নেই। মাযেব কথা ছেড়ে দাও, আমি না থাকলে ওই যশোদা আব শোভা আব ওই মিতাকেই কি তুমি আস্ত বাখতে? মবে কালি মেবে যেত না ওবা এতদিনে?

আমি যখন ওকে আদব কবে ডাকি, ও আমাকে তখন এমনি কবেই নাস্তানাবুদ কবে। বললাম, তুই তো ওই ছোটটিই হযে আছিস, ওবা কে কেমন, বা আমাব কাছে কি চেযেছিল আব কোন মৃত্যুব স্বপ্নে বিভোব হযেছিল, তুই জানবি কি কবে?

ও মুখ মুচকে জবাব দিল জানাব দবকাব কি। মেযেছেলে দেখলেই তুমি তাব মধ্যে ভব-ভবতি মেযে দেখো আব অমনি অপমানেব আগুনে তাকে দগ্ধে মাবতে চাও। আব আমি তাদেব মধ্যে মা-কে খুঁজি, মা-কে খুঁজে বাব কবে তোমাব চোখে আঙুল দিযে দেখিযে দিলে তবে তুমি হাত গোটাও। শোভা-মিতাবা ভাবে, বাইবে তুমি যেমনই হও, ভিতবটা তোমাব কত সুন্দব দবদেব পাতে মোড়া। ওদেব ছেড়ে নিজেব পঁযতাল্লিশ বছবেব মাকে তুমি কোন মূর্তিতে দেখো এক এক সময জানো না? সেদিন থিযেটাব হলে গ্রীনরুমেব একগাদা মেযেব সামনে মাযেব গলা টিপে ধবাব জন্য তোমাব হাত নিশপিশ কবে ওঠেনি? সেদিনও আলাদা হযে তোমাকে না আটকালে কি হত?

ওব সঙ্গে তর্ক কবে লাভ নেই। আমাবই বুদ্ধি নিযে ও এঁচড়ে পেকেছে। না, হাত যতই নিশপিশ করুক, বক্ত যতই মাথায় উঠুক—কিছুই আমি কবতাম না। ওই খুদেটা আমাব ভিতব দেখতে পায বলে ভয পায।

হ্যাঁ, মনে আছে। নতুন চমক লাগানো নাটক 'চক্র' দেখতে আমিও গেছলাম। অনেক আগে থেকে চেষ্টা করে টিকিট সংগ্রহ করতে হয়েছে অন্যের মারফত। অপরের মারফত কারণ, সিনেমা বাজ্য আর থিয়েটার জগতের প্রায় সমস্ত কর্মকর্তারাই মায়ের দৌলতে আমাকে চেনে। এও আমার এক বড় রকমের দুর্ভাগ্য। দেখে ফেললে আর চিনে ফেললে সকলেই খাতির করে, ঘটা করে আপ্যায়ন জানায়।

'চক্র' নাটকে নামধন্যা নায়িকা বিপাশা দেবীর রঙ্গমঞ্চে দ্বিতীয় দফা এই বৃহৎ আবির্ভাব। প্রথম বার প্রায় এক বছর ধরে 'বিজয়িনী' নাটকে অভিনয় করে থিয়েটারের মালিকদের টাকার তহবিল ফাঁপিয়ে তুলেছে। সেটা ছিল ইতিহাসভিত্তিক আখ্যান। এটা সামাজিক।

মা ইন্দুমতী চিত্রজগতের যশস্বিনী নায়িকা বিপাশা দেবী। আজ অনেক বছর হয়ে গেল ওই নামের সঙ্গে দেবী যুক্ত। ব্যক্তিজীবনে বার কয়েক পদবী বদল হয়েছে কিন্তু শিল্পী-জীবনে দেবী স্থায়ী আসন নিয়েছে। গোড়ায় ছিল বিপাশা সরকার—ঘরে যখন ইন্দুমতী সরকার।

বাইশ থেকে উনচল্লিশ—এই দীর্ঘ আঠার বছর সে ছিল ছায়াচিত্র জগতের সম্রাজ্ঞীর মতো। উদ্ধত আত্মচেতন অনন্যাগোছের কেউ নয়। বরং উল্টো। মার্জিতরুচি, সরলবুদ্ধি, বিনয়নম্র, নির্ভরশীল আচরণ সকলের সঙ্গে। এটাই তার বড় আকর্ষণ, এতবড় সাফল্যের পিছনে এটুকুই বড় পুঁজি। আমি তাকে কাছ থেকে দেখেছি, দূর থেকে দেখেছি। তার কোন আচরণ অভিনয় আর কোনটা নয়, তা আজও আমার কাছে স্পষ্ট নয় খুব। বাঘা সমালোচকরা তার সম্পর্কে বলে থাকে, মহিলা কোনো সময় অভিনয় করে না বলেই, এত বড় অভিনেত্রী সে। এক বড় অভিনেত্রী সে। এক-একসময় মনে হয়, খুব অতিশয়োক্তি নয়। ছবিতে যেমন, ছবির বাইরেও তেমনি। শান্ত স্নিগ্ধ, ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু মৃদু হাসি, ডাগর সরল চাউনি—আবার প্রয়োজনে অটুট গম্ভীর তীক্ষ্ণ কঠিন অচপল অচঞ্চল। ছবিতে তার এই দুই রূপ, ঘরেও। অবশ্য আমি যে ঘরের কথা বলছি সেটা আমাদের ঘর- উনিশ বছর আগের আমাদের সেই ঘর। তারপরেও এ যাবত বহুবার তাকে দেখেছি, তার ঘরে দেখেছি, ঘরের বাইরেও দেখেছি। আমার ধারণা ওই রূপের রকমফের খুব একটা হয় নি। আর ভিতরে বাহরে ওই রূপ মিশে আছে। ওই দুটো রূপ তার ঘর ভেঙেছে আবার নতুন ঘরের হাতছানি আর আশ্বাসও জুগিয়ে এসেছে। তার থেকেও বড় কথা—ওই দুটো রূপই তার এতবড় প্রতিষ্ঠার মূল ভিত। তাই এমন এক সার্থক রূপের আজও খুব একটা রং-বদল হয়েছে বলে মনে হয় না।

এত বড় অভিনেত্রী ইদানীং রঙ্গমঞ্চের দিকে ঝুঁকেছে কেন, সে সম্পর্কেও আমার একটা সাদা-সাপটা ধারণা আছে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের দাগটা ক্যামেরায় ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। উনচাল্লিশ বছর পর্যন্ত প্রসাধন আর মেক-আপ-এর দৌলতে টেনেটুনে চালানো গেছে। চালানো গেছে বলতে নায়িকার ভূমিকা উতরে দেওয়া গেছে। তারপর আর সেটা সম্ভব হয়ে উঠছিল না, বয়সের ছাপ পড়ছিলই। ফলে এখন আর নায়িকা নয়, নায়িকাসদৃশার ভূমিকা তার। আজও রঙ্গ-অফিস আটিষ্ট হিসেবে বিপাশা

দেবীর নামটা তুচ্ছ নয়, কিন্তু প্রযোজক বা পরিচালকের তাগিদে গল্পের লেখককে তার কাহিনীতে নায়িকাসদৃশা দিদি বা বউদির ভূমিকা বুনে দিতে হয়। ছোট ছেলে বা মেয়ে বা মায়ের গুরুত্বপূর্ণ কোনো রোল থাকলেও সবার আগে তার ডাক পড়ে।

কিন্তু এ-দেশের ছবির গল্পে অক্ষত কুমারীকন্যার চাহিদা যতো, ততো আর কিছু নয়। ছবিতে প্রেমের কাহিনী রূপায়ণ একমাত্র বাণিজ্যিক বস্তু। সেই প্রেম কোনো বিধবার অথবা কোনো বিবাহিতা রমণীর (স্বামী-প্রেম নয়) হলে সেটা পরিত্যাজ্য। টাকা ঢেলে কোনো প্রযোজক ছবিতে সেই জটিল প্রেম সচল করার ঝুঁকি নেবে না। ছবির প্রেম নিতান্তই বিশুদ্ধ নিকষিত হেম হওয়া চাই।

ফলে যত নামজাদা অভিনেত্রীই হোক, ছবির বাজারে বিপাশা দেবীর চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই কমে আসছিল। কিন্তু শুধু সেই কারণেই কি মঞ্চের দিকে ঝুঁকেছে সে? আমার মনে হয় না। কারণ এই আকর্ষণের পিছনে আর্থিক অপ্রাচুর্য অথবা মোহ কিছু থাকার নয়। একটানা দশ বছর ছবির বাজারে সব থেকে চড়া দামের শিল্পী ছিল সে। শুনেছি, ওই ক'টা বছর ছবি পিছু খুব কম করে এক লক্ষ টাকা দেবার ক্ষমতা না থাকলে কোনো প্রযোজক তার দিকে এগোতেও সাহস করত না। মহিলার সঞ্চয়ের পরিমাণ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি, তবু ধারণা, ফেলে ছড়িয়ে পঁচিশ তিরিশ লক্ষ টাকার কম হবে না। এছাড়া নিজের বাড়ি-গাড়ি-সোনা-গয়না তো আছেই।

না টাকাটা বোধহয় কোনদিনই তার অভিনয়-জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু ছিল না। এ-দেশের ছবির বাজ্যে ওই শিল্পীর মাথায় যখন অনন্যার মুকুট ঝলমল করছে, বোম্বাই বা মাদ্রাজের ধনকুবের হিন্দী ছবির প্রযোজকরা তখন তার কাছে হামেশাই ছুটে এসেছে। সে-খবর কাগজে আর সিনেমার মাসিক সাপ্তাহিকে ছাপা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্তও কোনো হিন্দী ছবির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার খবর বেরোয় নি। যে স্বাক্ষরের রূপালি মূল্য বাংলা ছবির পাঁচ-সাত গুণ বেশি।

আর সেই সূত্রে সিনেমার মাসিক সাপ্তাহিকগুলোতে শিল্পীর মাথায় যে কতভাবে স্তুতি আর প্রশংসা বর্ষণ করা হয়েছে, ঠিক নেই। অত্যুৎসাহী গুণমুগ্ধ চিত্র সাক্ষাৎকারের বিবরণও ফলাও করে ছাপা হয়েছে।

প্রশ্ন. হিন্দী ছবিওয়ালারা এভাবে ডাকাডাকি করছে, আপনি যাচ্ছেন না কেন?

হিন্দী জানি নে।

সেটা কোনো সমস্যাই নয়, কত আর্টিস্ট তো দিব্যি শিখে-পড়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে।

জবাব, তাঁরা আমার থেকে ঢের বড় গুণী হবেন।

চিত্র সাংবাদিক (সহাস্যে) : এটা যে ঠিক বললেন না, এও আপনি নিশ্চয় জানেন?

জবাব (সহাস্যে) : নিশ্চয় জানি না। তবে মনে হয়, শিখে পড়ে ফুলের ওপর রচনা লেখা যায়, ফুল ফোটানো যায় না।

মুগ্ধ চিত্র সাংবাদিক : তাহলে এটা ধরে নিতে পারি, শিল্পী-জীবনে টাকাটা আপনার আদৌ বড় লক্ষ্য নয়, আপনার শিল্প প্রতিভা কোনরকম জোড়াতাপ্পির সঙ্গে আপোসে নারাজ?

স্মিত জবাব : ধবে নিযে ও-কথা কাগজে লিখে দিলে বেশ বাহবা পাব। কিন্তু আসলে সেটা ডাহা মিথ্যে—নতুন কোনো পবীক্ষাব মধ্যে ঝাঁপিযে পডতে চাই না ভযে।

চিত্র সাংবাদিক (সবিস্ময়ে) : এত দিনেব এত অভিজ্ঞতাব পবেও আপনাব ভয। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা।

বিশ্বাস না কবলে আমাব সুবিধে। (এই জবাবে মিষ্টি হাসিব আধিক্য ছিলই মনে হয)।

চিত্র সাংবাদিক (নাছোডবান্দা তবু) : কিন্তু ভয কেন?

সবল সুললিত জবাব আসলে তো আমি খুব একটা সাধাবণ মেযে। প্রতিভাব চটকদাব বোঝা যত আপনাবা মাথায চাপাচ্ছেন ভিতবে ভিতবে ততো ভয। তবু আপনাদেব দেওযা ওই সার্টিফিকেটেব প্রতি লোভ তো আমাব আছেই, তাই মনে হয, নতুন কিছুব মধ্যে গিযে ধবা পডে মবি কেন।

জবাব শুনে শুধু কি ওই চিত্র সাংবাদিক মুগ্ধ হযেছিল? না, পডে আমিও মুগ্ধ হযেছিলাম। আগে কত শত সহস্র জন মুগ্ধ হযেছিল, ঠিক নেই। বিপাশা দেবী, তোমাব অস্তিত্ব থেকে মা ইন্দুমতীকে সবাতে পাবলে আমিও যে তোমাব কত বড এক ভক্ত, জানো না। মানুষকে মুগ্ধ কবাব সহজাত কৌশল তোমাব স্বভাবেব সঙ্গে মিশে আছে। তাই ভাবতে অবাক লাগে, এ কৌশল তুমি একজনেব ওপব খাটালে না কেন, খাটাতে পাবলে না কেন? খাটাতে পাবলে না, না কি খাটাতে চাইলে না? সেই জন্যেই লোককে মুগ্ধ কবাব তোমাব এই সহজ কৌশলই আমাব অভিনয মনে হয।

কোনো বোঝাপডা হবে, হবেই, সেইদিন আমি বুঝে নেব, তুমি শিল্পী বড কি অভিনেত্রী বড। ঠিক এই গোছেব কথা শুনে শোভা গাঙ্গুলি একদিন বড অবাক হযেছিল, মনে আছে। বলেছিল, শিল্পী কি অভিনেত্রী নয, না কি অভিনেত্রী শিল্পী নয, দুইযে তফাত কি?

জবাব দেব কি, এই গোছেব বোকা বোকা প্রশ্নেব জবাব হয না, আপনা থেকে না বুঝলে বোঝানো যায। নিজেব বুকে একটা আঙুলেব টোকা মেবে বলেছিলাম, এইখানটায় একটু তফাত আছে।

তফাত বোঝাব আগ্রহে শোভা গাঙ্গুলি একটা স্থূল জাল ফেলতে চেষ্টা কবেছিল আমাব চোখেব সামনে। টেবিলে দুই কনুই ভব দিযে দু'হাতেব চেটোয দুই গাল বেখে আমাব দিকে একটু ঝুকে বসে বেশ নিবিষ্ট মাধুর্যে কথা কইছিল আব কথা শুনছিল। এবাবে বাঁ হাতটা গাল থেকে নামিযে চাঁপাব কলিব মতো মধ্যমা বাব দুই-তিন নিজেব বুকে ঠুকে আবাব জিজ্ঞাসা কবেছিল, অভিনেত্রীদেব কি এই জাযগাটা নেই।

বেচাবী শোভা গাঙ্গুলি। আমাব হাসি পেযেছিল অবশ্য, কিন্তু চাউনিটা বোধহয খবখবে হযে উঠেছিল। বলেছিলাম, আমাব মা হলে কি কবত জানো? গাল থেকে হাত দুটো নামিযে একটু নডেচডে বসাব ফাঁকে শাডিব আঁচলটা আব একটু ভালো কবে টেনেটুনে দিত তাবপব সাদামাটা হোমিওপ্যাথিক বিস্ময়ে মুখেব দিকে চেযে থাকত খানিক, তাবপব চোখেব পাতা দুটো শুধু একবাব নীচেব দিকে নামিযে ঠিক তোমাব মতো কবেই জিজ্ঞাসা কবত, অভিনেত্রীদেব কি ও-জাযগাটা নেই?

শোভা গাঙ্গুলির কান-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ওর রং ফর্সা। মায়ের তুলনায় ঢের বেশি সুশ্রী। ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য না করেই যেন বক্তব্যটা আর একটু নরম আর প্রাঞ্জল করে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম। চটকদার অভিনেত্রী আর জাতশিল্পীর মধ্যে এও একটা বড় তফাৎ, বুঝলে? চটকদার অভিনেত্রীর চমক বেশি, প্রকাশ বেশি, আর জাতশিল্পী যেটুকু অনাবৃত করে, তার থেকে যেন ঢেকে রাখে বেশি—উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতে লোভ জাগে।... তবে আমি যে তফাতের কথা বলছিলাম সেটা অন্য ব্যাপার। একটা ধরো ডালিয়া আর একটা রজনীগন্ধা।

যাক, কথা হচ্ছিল মায়ের মঞ্চাভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ আর তার লেটেস্ট অবদান চক্র' নাটক প্রসঙ্গে। আমি নিঃসংশয়—এ-ঝোঁক অর্থের তাগিদে নয়। টাকা তার প্রচুর আছে এবং আরো একশ' বছর বেচে থাকলেও ওতে টান ধরবে না। তাছাড়া ইচ্ছে করলে দিদি-বউদি অথবা কিশোর-কিশোরীর মায়ের বাছাই করা রোল-এ তাকে পাবার নামী পরিচালক প্রযোজকরা এখনো হামেশাই তার কাছে ছোটাছুটি করে। তাদের ডাকে সাড়া দিলে এখনো মঞ্চের বিশ তিরিশ গুণ বেশি রোজগার হতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ পরিচালক প্রযোজককেই সে ফিরিয়ে দিয়ে থাকে।

এতটা উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে মঞ্চে নেমে আসার দুটো কারণ বোধহয়। প্রথম এর মাদকতা ভিন্ন স্বাদের। কবির কাজ অভিনেতা অভিনেত্রী আর কলাকুশলীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ক্যামেরার আর শব্দ-যোজনার কারসাজিতে অনেক ফাক আর ফাকি ভরাট করে দেওয়া যায়। কিন্তু মঞ্চে সোজাসুজি রসপিপাসু খদ্দেরের যাচাই বাছাইয়ের মুখোমুখি এসে দাড়ানো। এখানে কোনো ফাকির কারবার নেই। গোটাগুটি নগদ বিদায়ের ব্যাপার। সে বিরূপ হলে তার অভিব্যক্তি মুখের ওপর ছুড়ে মেরে দেবে, খুশি হলে সরব উচ্ছ্বাসের অর্ঘ্যও পাঠাবে।

রিপাশা দেবীর মঞ্চপ্রীতির আড়ালে এটাই একমাত্র কারণ মনে হয় না। আসল কারণ, বয়েস যেমনই গড়াক, নিজের কাছে নিজে সে এখনো দ্বিতীয় রহিতা। তাই প্রথম সারিতে এখনো স্থান চাই তার। সে বিশ্বাস করে এই পঁয়তাল্লিশেও তার দেবার বস্তু ফুরিয়ে যায় নি। এই দেবার সংজ্ঞায় ভিতরের সম্পদ এখনো পচিশ তিরিশের মতো তাজা আছে। এখনো সে ফলভারে আনত, ক্যামেরার ভ্রূকুটিতে নিষ্ফলা হয়ে যেতে রাজি নয়। ক্যামেরায় বয়সের দাগ পড়ে, কিন্তু সুপটু প্রসাধনে হল-ভর্তি সারি সারি স্থূল চক্ষুগুলোতে তার দাগ পড়ে না। এই মরুভূমিতে সে যে রূপ নিয়ে এসে দাড়াবে, সে তাই। তার দেবার বস্তু নেবার জন্যেই সাগ্রহে বসে আছে সব, যতদিন 'দতে পারবে ততদিন বুক ভরে আর মন ভরে নিয়ে যাবে।

'বিজয়িনী' নাটকে তাই নিয়ে গেছে সব। এই পঁয়তাল্লিশেও সম্পূর্ণ বিজয়িনী হয়ে ফিরেছে সে। যে বিজয়িনীর কোনো বয়েস স্থূল হিসেবের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ নয়, যে বিজয়িনীর নিভৃতের অন্তঃপুরিকাটি শাশ্বত চিরযৌবনা।

সামাজিক 'চক্র' নাটকেও ওই বিজয়িনীকেই স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলার দ্বিতীয় অভিযান তার। ভিন্ন রূপ আর আরো একটু বিশ্বাসযোগ্য আঙ্গিকে ওই বিজয়িনীর সাক্ষর অপ্রতিহত রাখার অটুট অভিলাষ।

আমার বিবেচনায় বা বিচার বিশ্লেষণে চক্রের কাহিনী এমন কিছু বর্ণোজ্জ্বল নয়। বরং মামুলি আখ্যান বলা যেতে পারে। কিন্তু নাটক লোক-চক্ষুর সামনে মঞ্চস্থ হবার আগেই বিজ্ঞাপনের চটকে অভিনবত্বের ছাড়পত্র পেয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বামের আগে বামকাণ্ড রচনার মতো প্রচারের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। কাগজে সে সব চুটকি ব্যাপারগুলো ফলাও করে ছাপা হয়।... যেমন, শুধু ছায়াচিত্রের নয়, মঞ্চেরও অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী অভিনেত্রী দিনের পর দিন মাসের পর মাস নাট্যকারের সঙ্গে বসে নিজের ভূমিকা গঠনের কাজে বিপুল সহায়তা করেছেন। সংযোজন এবং পরিবর্জনের তুলাদণ্ড হাতে বসে আপন ভূমিকাটি আত্মিক সম্পদ ধরে তুলেছেন। অতএব অনন্যা শিল্পীর এ যে এক স্মরণীয় সৃষ্টি হয়ে থাকবে তাতে আর সংশয়ের অবকাশ কোথায়?

নাটকের কাহিনী তখনো অজ্ঞাত আমার। বিজ্ঞাপনের ওই চমকের জবাবে মার্কা মারা এক তেরছা চরিত্রের কাগজে স্বনামে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। লিখেছিলাম, আমাদের সাহিত্য আর নাটক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গগুণে আর সহৃদয় সহযোগিতায় কোন সার্থকতার দিকে গড়াতে চলেছে? যে নাট্যকার কোনো অভিনেত্রীর সঙ্গে বসে তার সহযোগিতায় সৃষ্টিপথে বিচরণ করেন, নাট্যসরস্বতী তাঁর ওপর কতটুকু নির্ভর করতে পারেন? আর নামী অভিনেতা অভিনেত্রীরাই বা এই সহযোগিতা দেবার স্পর্ধায় এগিয়ে আসেন কোন গুণে? কারা সাহিত্যের এই বন্ধ্যা যুগের কান্না শুনে গিরীশ ঘোষ কি আবার রমণীর রূপ ধরে পুনর্সম্ভবামি হয়েছেন?

বলা বাহুল্য, চিঠিখানা ওই তেরছামুখো চরিত্রের কাগজে ছাপা হয়েছিল। চিঠির গুণে নয়, ছাপা হয়েছে আমার গুণে। আমার সঙ্গে ওই অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী অভিনেত্রীর সম্পর্কটা কাগজের কর্মকর্তাদের জানা আছে বলে। ছাপা কাগজের এক কপি যে ডাকে ওই অভিনেত্রীর কাছেও চলে গেছে তাতেও কোনো সন্দেহ থাকলে ও চিঠি ছাপাই হত না।

নাটকের মূল কথা স্বল্পপরিসরে পংক্তিবদ্ধ করা যেতে পারে। গরিবের ঘরের এক ছেলে ডাক্তার হয়ে বসার পর এই কালের লোভের বশ হতে চলেছে। সেবার বদলে সে মৃত্যুবাণ হাতে নিয়েছে। যত তার পসার বাড়ছে, ততো তার লোভ বাড়ছে, আর কালো বাক্সটি প্রশস্ত হয়ে উঠছে। বাধা কোথাও নেই, বাধা শুধু তার ঘরে।

বাধা তার ঘরের অতি সাধারণ বিবাহিতা স্ত্রীটি। প্রথম অধ্যায়ে সে স্বামীর গরবে গরবিনী, অর্থাগমের প্রাচুর্যে সুহাসিনী। কিন্তু ক্রমে কাটার মতো একটা সংশয় বিঁধতে শুরু করেছে তার হৃদয় নামে কোমল বস্তুটির ওপর। আর তারপর যত দিন যাচ্ছে, সেই কাঁটা ছুরির ফলা হয়ে তার বুকের তলায় কাটাছেঁড়া করে চলেছে। স্বামীর লোভের ব্যাধি এতদূর গড়িয়েছে যে তাকে ফেরানোর সকল চেষ্টা ব্যর্থ। শেষে কোনো রোগিনীর মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আদালতে এক চাঞ্চল্যকর বিচারের অনুষ্ঠান। আসামী ওই ডাক্তার, আর প্রমাণসহ তার বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী তার স্ত্রী। দুনিয়ার একটি মাত্র ভালবাসার মানুষকে কঠিন সঙ্কল্পে শুচিশুদ্ধ করে তোলার সাদা নজির রেখে গেল যে রমণী, আর সে অতি সাধারণ নয়, বড় বিচিত্র।

বলা বাহুল্য, আজকেব দিনেব লোভ পাপ ব্যাভিচাব আব হানাহানিব ঝড়ো হাওযায এই গোছেব এক ভাবপ্রবণ নাটকেব সাফল্যেব সবটুকু অভিনয। কিন্তু মিথ্যে বলব না, আত্মস্থ অভিনযগুণে ওই বমণী দর্শকেব চোখে ক্রমশ বিচিত্র রূপিণীই হযে উঠেছিল। তাব প্রথম দিকেব হাসিখুশি আব স্বামীব প্রতি সবল বিশ্বাস আব নির্ভবতা পুরুষ মাত্রেবই লোভেব বস্তু যেন। তাব বোষ তাব ঘৃণা তাব বিদ্বেষ তাব নীবব যন্ত্রণাও শুদ্ধ অনুবাগ আব অব্যক্ত আকুতিব তাপে মহিমান্বিত। এই মহিমাব সামনে দাঁড়িযে পুরুষ মুগ্ধ হতে আব অবনত হতে বাধ্য।

আমি জানি, বঙ্গালযেব এত শত দর্শকেব মধ্যে আমাব মতো নির্মম-ক্রূব সমালোচনাব চক্ষু নিযে আব একজনও বসে নেই। অথচ আশ্চর্য, আমিও যেন অবিশ্বাস থেকে এক লোভনীয বিশ্বাসেব দুনিযাব দিকে পা বাড়িযেছি। ওই বমণী যেন অভিনেত্রী নয, যা ঘটছে তাব সবকিছুব সঙ্গে বুঝি তাব জীবনেব যোগ। সেই জীবন যত ছিন্নভিন্ন হযে যাচ্ছে, তাব চোখে মুখে আচাবে আচবণে বমণীসত্তাব ওই দুর্লভ দুর্লঙ্ঘ্য মহিমা ততো বেশি এঁটে বসছে। পুরুষকে ফিবতে হবে, সে না ফিবে যাবে কোথায?

তিন অঙ্কেব নাটক। দ্বিতীয অঙ্কেব শেষে দর্শকেব বিপুল কবতালি আব স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসেব ডালি নিযে দৃপ্ত সংহত নাযিকা মুগ্ধ দর্শকেব চোখেব আড়ালে চলে গেছে। ড্রপ সীন নেমেছে। সমস্ত আলো জ্বলে উঠছে।

আমাব ভিতবে ভিতবে সেই থেকে কী একটা যন্ত্রণা শুরু হযেছিল। নিভৃতেব কোন পাতাল থেকে একটা আক্রোশ ঠেলে উঠে শিবায শিবায ছড়িযে পড়েছিল। উঠলাম। বাইবে এলাম। তাবপব অনেকটা নিজেব অগোচবে যেন উইংস-এব দবজা দিযে পিছনেব অন্দবে চলে এলাম। ভিতব থেকে শব্দশূন্য অব্যক্ত গর্জন উঠছে একটা। —এই যদি সত্যি হয, পুরুষ যদি কল্পনাযও এ-ভাবে ফিবতে পাবে তাহলে যে-ঘবে আমি ছিলাম, সেই ঘব এভাবে ভেঙে গেল কেন? পুরুষ ফেবানোব এই সঙ্কল্প সেদিন তোমাব কোথায ছিল? সাত বছবেব একটা ছেলেকে হত্যা কবে আজ তুমি বমণীব মহিমা দেখাতে এসেছ? তোমাব এই মহিমা দেখে যাবা ভুলছে ভুলুক, আমি তোমাকে ক্ষমা কবব না, তোমাব ক্ষমা নেই—

পিছনে পাশাপাশি দুটো সাজঘব। একটা পুরুষদেব, অপবটা মেযেদেব।

আসুন আসুন, মা-কে খুঁজছেন বুঝি? মেযেদেব ঘবেব দবজাব কাছ থেকে আপ্যাযন জানালো যশোদা। ফিবে দাড়িযে ডাকল, মা, কে এসেছে দেখুন।

যশোদা তিন-চাব বছব যাবৎ চেনে আমাকে। দেখলে যতটা সম্ভব মুখে খুশিব ভাব ফোটায, কিন্তু ভিতবে ভিতবে একটু যেন বিব্রত বোধ করে। ডাকসাইটে অভিনেত্রীব স্নেহ কেড়েছে, তাকে ভালবাসে, মা বলে ডাকে। তাব কাছেই থাকে। আমাকে দেখলেই বোধহয মনে হয, ও আমাব জায়গা জুড়ে বসে আছে। বেশ মিষ্টি মেযে, মিষ্টি কথা-বার্তা। মিষ্টি মিষ্টি হাবভাব। কোথা থেকে কি-ভাবে এসে অতবড অভিনেত্রীব বুকেব কাছে একটু জাযগা কবে নিযেছে সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। শিল্পী হবাব সাধ যত ছিল সাধ্য ততো ছিল না। রূপ সাধাবণ, প্রতিভাও তাই। ছবিতে বা মঞ্চে

দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সারির শিল্পীর কাজ জোটে তার। নিজেই বলে, মায়ের আশ্রয় না পেলে কোথায় ভেসে যেতাম ঠিক নেই, কেউ একটা ঝিয়ের বোল দিয়েও জিগ্যেস করত না। এখন যেটুকু শিখেছি তাও মায়ের দয়াতেই।

বড় শিল্পীর সুপারিশে অনেকের ভাগ্য ফেরে, সেটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু যশোদার মাতৃভক্তি দেখলে আমার কেমন হাসি পায়। ওর এই ভক্তিটা অন্ধ অকৃত্রিম মনে হয় বলেই হয়তো। ওই মা ওর কাছে শুধু গুরু নয়, দেবীও।

কিন্তু সেদিন আমার হাসি পাচ্ছিল না।

ওর ডাক শুনে শিথিল চরণে দরজার কাছে এগিয়ে এলো যে রমণী, সে অনন্যা শিল্পী বিপাশা দেবী, কি চক্রের অন্তঃপুরসীমন্তিনী, কি আর কেউ—সেটুকুই যেন আগে যাচাইয়ের বিষয় আমার।

কি রে, তুই এসেছিস! নাটক দেখছিস নাকি?

এতক্ষণের নিভৃতের সেই গর্জনের অনুভূতিটা আমার দুটো হাতের মধ্যে এসে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল হঠাৎ।

এই হাত দুটো যা চাইছে এখন তাই যদি হয় রমণীর ওই নরম গলার ওপর যদি আস্তে আস্তে উঠে আসে, ধীর অব্যর্থ অমোঘ নিষ্পেষণে, ওই আত্মস্থ নরম দেহের প্রাণটুকু যদি এই দুটো হাতের মুঠোয় টেনে বার করে নিয়ে আসে—তাহলে কে যাবে? শিল্পী বিপাশা দেবী, না চক্রের অন্তঃপুরসীমন্তিনী, না কি আর কেউ?

মাথা নেড়েছিলাম। নাটক দেখছি।

নিজে না আসিস, একটা ফোন করেও তো জানালে পারতিস, দেখতে আসবি, আমি ব্যবস্থা করে রাখতুম।.. কেমন লাগছে?

খুব ভালো।

হুঁঃ, তোর ভালো আমি জানি না, কালই হয়তো কাগজে দেখব ভুল ফুটিয়ে চিঠি লিখেছিস।.. কোথায় বসেছিস, ঠিক মতো দেখতে শুনতে পাচ্ছিস তো?

মোটামুটি। দু'টাকার পেছনের দিকের সীট, কথা কিছু কিছু মিস হবেই।

চকিতে আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিল একবার। পরনের জামা কাপড় ধোপ দুরস্ত নয় তেমন। পলকের ভ্রূকুটি। আমার ঠাণ্ডা মূর্তিও হয়তো চোখে শুকনো শুকনো ঠেকল। খাবি কিছু?

হাত দুটোকে সংযত করার জন্যই পকেটে ঢোকালাম। ঠোঁটে হাসি টেনে আনার চেষ্টাটা সেদিন এমন শক্ত লাগছিল কেন, জানি না। তবু চেষ্টার কসুর করিনি। পিছনের আধখানা আড়ালে দাঁড়িয়ে যশোদাও আমাকে দেখছিল। আমার মধ্যে সর্বদাই ও যেন দেখার খোরাক পায় কিছু।

মাথা নাড়লাম, খাবার বাসনা নেই।

পরের অঙ্কের প্রথম ঘণ্টা বাজল। বিপাশা দেবী ঈষৎ ব্যস্ত গাম্ভীর্যে ঘর থেকে আধা-আধি বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকালো। ফলে আমার গায়ের সঙ্গে তার গা ঠেকল।

এই মুহূর্তে ওই স্পর্শটুকু আচমকা নিষ্ঠুরভাবে নিবিড় করে ফেলতে পারি, অবাধ্য হাত দুটোকে স্বাধীনতা দিতে পারি।... তারপর কে থাকবে? বিপাশা দেবী, না চক্রের

অন্তঃপুর-সীমন্তিনী, না আর কেউ? মা ইন্দুমতী থাকবে বোধহয়, একটা দুর্বার লোভ দমন করে হাত দুটো শক্ত করে পকেট দুটোর মধ্যে আটকে রাখলাম।

দু'দিক থেকে দুটো লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো একসঙ্গে। চক্রের এই নায়িকার হাতে তাদেরও দণ্ডমুণ্ডের চক্র যেন।

একে একেবারে প্রথম রো-তে বসিয়ে দিন তো।

লোক দুটোই মাঝখান থেকে আচমকা বিপাকে পড়ল যেন। মুখ কাঁচুমাচু করে একজন বলল, প্রথম দিনের প্রথম শো, হাউস একেবারে প্যাক্ট আপ

শোনামাত্র মুখে বিরক্তির আভাস। কিন্তু সেও অশোভন মাত্রায় নয়। -যা বললাম ব্যবস্থা করুন, দরকার হলে এক্সট্রা চেয়ার দিন। আমরা দিকে ঘুরল। ঈষৎ তপ্ত একটা নিঃশ্বাসের স্পর্শ মুখে এসে লাগল।

এদের সঙ্গে যা। শো-এর শেষে দেখা না করে পালাস না যেন।

ভিতরে ঢুকে গেল। দ্বিতীয় বেল বেজে উঠবে এক্ষুণি।

অসুবিধের কথা বলে ফেলে লোক দুটো আরো বেশি বিব্রত যেন। তাদের একজন সবিনয়ে ডাকল, আসুন স্যর—উইংস-এর বাইরে আসতে আসতে আবার বলল, কিছু মনে করবেন না স্যর, এক্সট্রা চেয়ার যে কত পড়ে গেছে, উনি তো জানেন না

বললাম, ব্যস্ত হবেন না, কিছু দরকার নেই।

না না না তা কি হয়। উনি আদেশ করেছেন যখন, কে আর কি বলবে, আপনি আসুন।

মুখ দেখে মনে হল, তার সঙ্গে সম্মানের আসনে গিয়ে না বসলেই বরং লোকটা বিপদে পড়বে। আলো নিভতে শুরু করেছে। শশব্যস্ত তৎপরতায় অনেকের অসন্তোষ উপেক্ষা করে একেবারে সামনের সারির দুই রো-র ফাঁকে চেয়ার পেতে বসিয়ে দিল আমাকে।

ড্রপ সীন ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় নাটক আবার জমে উঠল। আখ্যানের নায়ক নায়িকা এক অমোঘ পরিণতির দিকে বেগে ছুটেছে। নায়িকার বুকের তলায় এবার এক আপোসশূন্য নিষ্পত্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। ফলে দর্শকের চোখে আরো দৃপ্ত, আরো মহীয়সী হয়ে উঠেছে সে।

কিন্তু আমার ভিতরের সুরটা কেটে গেছে। দুই অঙ্কের সেই জমাট বাঁধা মানসিকতা থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। স্টেজের গা-ঘেঁষা চেয়ারে বসে আমিই শুধু উসখুস করছি।

ঠিক সেই মুহূর্তটাই আমি বেছে নিলাম। যে মুহূর্তে নায়িকা তার চরম ঘোষণাটি জ্বলন্ত আগুনের মতো ভ্রষ্ট নায়কের মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে স্টেজের একেবারে সামনে দর্শকদের মুখোমুখি এসে দাড়িয়েছে। তার পিছনে ভ্রষ্ট নায়কের স্তব্ধ ভয়াল মূর্তি, পাদপ্রদীপের সামনে পাষাণ-স্ফুলিঙ্গ রমণীর মূর্তি, তার সামনে দুরুদুরু বক্ষ মন্ত্রমুগ্ধ দর্শক। ঠিক ওই মুহূর্তটি বেছে নিয়েই আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। আশপাশ থেকে আর পিছন থেকে বিরক্তিসূচক চাপা শব্দ উঠল একটা। এ-ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে যা আশা করেছিলাম তাই অবধারিতভাবে ঘটল। পার্ট ভুলে, স্থান-কাল

ভুলে ওই অনন্যা নায়িকা বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। সম্ভব হলে সেও আমাকে বাধা দিত, বসতে বলতো।

কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নির্লিপ্ত মুখে আবছা অন্ধকার পেরিয়ে আমি দরজার দিকে এগোলাম।

পরদিনের কাগজে 'চক্র' নাটকের প্রথম দিনের প্রথম অভিনয় প্রসঙ্গে সাড়ম্বর প্রশংসা ছাপা হল। প্রশংসা অভিনেত্রী বিপাশা দেবীরই বেশি। কিন্তু তার মধ্যে দুটো কাগজ অন্তত লিখেছে, দ্বিতীয় অঙ্কের গোড়ার দিকে নাটকের সঙ্কটমুহূর্তে স্বনামধন্যা শিল্পীর অভিনয়ে স্বল্পক্ষণের জন্য অন্তত কিছু ত্রুটি দেখা গেছল। তখন দুই-একবার তাঁর পার্টও ভুল হয়েছিল, যা কখনো হয় না। অবশ্য পরের অভিনয়ে সেই ত্রুটিটুকু তিনি পুষিয়ে দিতে পেরেছেন।

* * * *

আমি কি জাতিস্মর? চোখ বুজে তন্ময় হলে পূর্বজন্মের দৃশ্য দেখতে পাই?

চোখ বুজে তন্ময় হওয়ার ধাতটা আমার ন'বছর বয়েস থেকেই। কত সময় মালতী মাসি ঠেলা মেরে সেই তন্ময়তা ভঙ্গ করেছে। মনে মনে মালতী মাসির ওপর রেগে আগুন হয়ে গেছি। অথচ মুখে কিছু বলতে পারি নি। সেইজন্যই রাগ হলে আমার কষ্ট আরো বেশি হত। আমার ধারণা নিছক একটা রাগারাগির ফলে একজনকে হারিয়েছি। সেটা বাবা আর মায়ের রাগারাগি। সেই থেকে জিনিসটাকে আমি বিলক্ষণ ভয় করি। বাবা যখন মালতী মাসিকে রাগের সুরে কিছু বলে তখনো ভিতরে ভিতরে আমার কেমন কাঁপুনি ধরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মালতী মাসির পিছনে তখন ঘুর ঘুর করি। স্কুলে বসেও সেদিন মালতী মাসির জন্য ভিতরটা উদ্বেগে অস্থির হয়ে পড়ে কেমন। কেবলই মনে হয়, বাড়ি ফিরে যদি দেখি, মালতী মাসিও আর নেই?

বিমনা হওয়ার দরুন মাষ্টারমশাইদের বকুনি খাই। বাড়ি ফিরে মালতী মাসিকে না দেখা পর্যন্ত সেই অস্থিরতায় বুকটা সর্বক্ষণ ধুকপুক করতে থাকে।

অথচ আশ্চর্য, রাগকে ভয় করি, রাগকে ঘৃণা করি, কিন্তু কারণে অকারণে রাগ বোধহয় আমারই সব থেকে বেশি হয়, বাবার ওপর রাগ। হঠাৎ একদিন রাত থেকে আর তারপর দিনের পর দিন ধরে যাকে আর বাড়িতে দেখলাম না তার ওপর রাগ, মালতী মাসির ওপর রাগ, নিজের ওপর রাগ, এক এক সময় দুনিয়ার সকলের ওপর আর সকল কিছুর ওপর রাগ। দিনের পর দিন ওই রাগের প্রকোপ আমার মধ্যে বেড়েই চলেছে, প্রকাশ না করে সেটা হজম করে ফেলতে চেষ্টা করার দরুন কষ্টটাও বেড়েই চলেছে। সেও আমার নিজস্ব একেবারে একলার কষ্ট, কেউ টের পায় না।

আমার অনেক কিছু জ্ঞান আর ধারণার গুরু মালতী মাসি। আমি তাকে সবজান্তা ভাবতাম। পূর্বজন্ম ইহকাল পরকালের সমাচার তার কাছ থেকেই জেনেছি। আমার মনের তলায় কত সময় কত রকমের উদ্ভট প্রশ্ন জাগত ঠিক নেই। শিশুকাল থেকে শহরের এক অভিজাত এলাকায় বাস আমাদের। ছবির মতো সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ি। আশপাশে যারা থাকে তারাও রীতিমতো সভ্যভব্য। এর মধ্যে কয়েক ঘর মাত্র বাঙালি, বেশির ভাগ বাসিন্দারা নানা রাজ্যের পয়সাঅলা মানুষ। তাই ঠিক বাড়ি বসে

সর্বসাধারণের বাস্তবরূপ বা বাস্তব জীবন-যাপনের চিত্র খুব বেশি দেখতে পেতাম না। মাঝে সাজে বেড়াতে বেরিয়ে বা স্কুলে যাওয়া আসার সময় যেটুকু দেখতাম, তাই এক এক ধরনের কৌতূহলের উদ্রেক করত।

মনে আছে, মায়ের সঙ্গে এক বিকেলে গাড়ি করে যাচ্ছিলাম কোথায়। পুলিশ হাত দেখানোর দরুন গাড়িটা থেমে গেছে। সামনে পর পর অনেকগুলো গাড়ি। চেয়ে দেখি ফুটপাথের ওপর শুয়ে আছে কতকগুলো নোংরা ছেলে মেয়ে আর বউ। আমার মতো বয়সের হদ্দ কুচ্ছিত ছেলেও আছে দুটো। আর কয়েকটা মানুষ খালি গা, পরনে নোংরা খাটো ধুতি, গাড়িগুলোর সামনে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চাইছে।

আমাদের গাড়ির সামনের বুড়ো মতো লোকটা মায়ের সামনে হাত পেতে করুণ সুরে পয়সা চাইতে লাগল, আর কত কি বলতে লাগল।

মা-গো, এই ছেলেমেয়েগুলোর দিকে চেয়ে দেখুন, সমস্ত দিন কিছু খায় নি মা, চার আনা পয়সা ওদের মুখ চেয়ে দিয়ে যান মা, খিদের জ্বালায় মরে যাচ্ছি মা-গো, মা মা-গো মা মা—

গাড়িটা চলতে শুরু করার পরেও লোকটা মা মা করে খানিক এসে তারপর থেমে গেল।

আমি অবাক বিস্ময়ে একবার ওই লোকটাকে দেখছিলাম আর একবার মা-কে দেখছিলাম। গম্ভীর বিরক্তিতে মা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল।

আমার ঠিক ছ'বছর বয়েস তখন। এরমধ্যে কত সময় মাকে কত কি দিতে দেখেছি লোককে, অথচ এত কাকুতি মিনতি শুনেও মা অমন নির্বাক থাকল কি করে, আমার কাছে সেটাই বিস্ময়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মা ওই লোকটা পয়সা চাইছিল কেন?

মা ছোট জবাব দিল, ভিক্ষে করছিল।

ভিক্ষে করছিল কেন?

খেতে পায় না বলে।

খেতে পায় না কেন?

খাবার কেনার পয়সা নেই বলে।

তোমার কাছে তো পয়সা আছে, অত করে চাইল, তুমি দিলে না কেন?

মা এবারে বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল, চুপ করে বসে থাকো।

খানিক বাদেই আবার আর এক কাণ্ড দেখলাম। তখনো ভিড়ে আমাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। পাশের ফুটপাথ ঘেঁষে কতকগুলো লোক আর একটা লোককে খাটে শুইয়ে বিকট স্বরে বলো হরি, হরি বোল— বলো-ও হরি, হরি বোল বলে চিৎকার করতে করতে চলেছে। মা-ও একবার তাকালো সেদিকে, তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আমি শুনেছিলাম, কেউ মরে গেলে তাকে ওভাবে খাটে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়, নিয়ে গিয়ে কি করা হয়, জানি না।

জিজ্ঞাসা করলাম, মা খাটের ওই লোকটা মরে গেছে?

হুঁ।

লোকটা মরে কোথায় যাচ্ছে?

হরি ঠাকুরের কাছে।

ওই লোকগুলো ওভাবে চেঁচাচ্ছে কেন?

হরিনাম শোনাচ্ছে।

হরিনাম এরকম বিচ্ছিরি কেন?

মায়ের আবার ধমক, চুপ করে থাকো।

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা গেল না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, যে মরে গেছে, ওই লোকেরা তাকে হরি ঠাকুরের কাছে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে?

হুঁ।

হরি ঠাকুর কোথায় থাকে?

স্বর্গে।

এরোপ্লেনে করে নিয়ে যাবে?

চুপ করবি তুই, না কি? কেবল বকর-বকর, বকর-বকর—

দু'কথার পর তিন কথাতেই মা অমনি করে ধমকে থামিয়ে দিত আমাকে। কিন্তু মালতী মাসি ঠিক উল্টো তার। প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়ে আমার হাজারো রকমের কৌতূহল মেটানোর ব্যাপারে তার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। বাবার সঙ্গে ঝগারাগি করে মা ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে মালতী মাসি প্রায়ই আমার ঘরে শোয়। বাবা টের পেলে রেগে যাবে সেই ভয়ে নিজের চৌকিটা এ-ঘরে নিয়ে আসে না, আমি ঘুমিয়ে পড়লে মেঝেতে শোয়। এক একদিন আবার নিজের ঘরে চলে যায়। মোট কথা ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমি তাকে কোনদিন ছাড়ি না। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে মালতী মাসির বুক ঘেঁষে শুয়ে গল্প শোনাটা আমার একটা নেশার মতো হয়ে উঠেছিল। এর ব্যতিক্রম হলে কিছুতে ঘুম আসত না, অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করতাম।

মানুষ মরে গেলে স্বর্গে হরি ঠাকুরের কাছে কি করে যায়, সেই কৌতূহল মালতী মাসিই মেটাতে চেষ্টা করেছে। শরীরের মধ্যে নাকি আত্মা থাকে, সে যায় হরি ঠাকুরের কাছে।

মড়া নিয়ে যাবার দৃশ্য আমি তার মধ্যে আগে দুই একটা দেখেছি। হরি বোল করতে করতে শরীরটাকে ওই লোকগুলো তাহলে কোথায় নিয়ে যায়?

কেন শ্মশানে, শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

আমি আঁতকে উঠি। পুড়িয়ে ফেলে, মানে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে? লাগে না?

মাসি হাসে। দূর পাগলা, প্রাণ না থাকলে আবার লাগবে কি।

কিছুই বোধগম্য হয় না, অস্বস্তি বাড়তে থাকে। মরে গেলে সব্বাইকে পুড়িয়ে ফেলা হয়?

পুড়িয়ে না ফেললে শরীরটা পচে গলে নষ্ট হয়ে যাবে না।

এই চিন্তাটাই মাথার মধ্যে অনেক দিন পর্যন্ত ঘুরপাক খেয়েছে আমার। মৃতদেহের এই শেষ গতি মনঃপুত হয়নি একটুও। পরিচিত মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বিশেষ করে রাতে বিছানায় গা ঠেকালে। মায়ের মুখ, বাবার মুখ, মালতী মাসির মুখ, স্কুলের ছেলেদের আর মাষ্টারদের মুখ, নিজের মুখও। সকলের জ্বলন্ত দেহ আমি

কল্পনায় দেখে আঁতকে উঠেছি, নিজেবটা আব মায়েবটা সব থেকে বেশি দেখেছি। দৃশ্যটা ঠেলে সবাতে চাই অথচ সবে না।

এই মালতী মাসিব কল্যাণেই ক্রমশ পূর্বজন্ম ইহকাল পবকাল সম্পর্কে আমাব বেশ জ্ঞান লাভ হযেছে। এই তিনকালেব যাবতীয় কিছু যেন চোখেব সামনে তাব। যেমন আমবা সব এক ধাব থেকে জন্মে জন্মে যাচ্ছি। এ পর্যন্ত যে কত ঘবে কতবার জন্মেছি তার ঠিক ঠিকানা নেই। পূর্বজন্মেব বৃত্তান্ত শুনতে মজাই লাগত। চোখেব সামনে যত লোক দেখছি তাদেব মধো কত জনে কোন জন্মের বাবা ছিল বা মা ছিল বা ভাই ছিল বা বোন ছিল তাব ঠিক আছে। অথচ এমনই মজা যে কেউ কাউকে চিনতেও পাবছি না।

হঠাৎ বুকেব তলায মোচডও পডেছিল একটা। সেই যে বাস্তাব ভিখিবিগুলো খাবাব জন্য পযসা চেযেছিল আব মা তাদেব দিক থেকে মুখ ফিবিযে ছিল, এমন যদি হয ওদেব মধ্যে কেউ একজন পূর্বজন্মে আমাব মতই মাযেব ছেলে ছিল, তাহলে? সঙ্গে সঙ্গে ভিতব থেকে কে যেন চিন্তাটাকে পূর্বজন্ম থেকে এই জন্মেই ঠেলে নিযে এলো। আমি যদি না খেযে অমনি যন্ত্রণা পেতে থাকি, মা কি কবে?... আ-হা এমন যদি হয, আমি না খেযে আছি আব মা সেটা জানতে পাবছে। আশ্চর্য মাযেব সেই ছটফটানি কল্পনায দেখে আমাব এমন আনন্দ হযেছিল কেন।

এ-জন্ম সম্পর্কে মালতী মাসিব বক্তব্য, ভালো হযে থাকতে হয, ভালো চিন্তা কবতে হয আব সর্বদা লোকেব উপকাব কবতে হয—তাহলেই পবেব জন্মে আব সুখেব অন্ত থাকবে না। শযতান লোকেবা মবে গিযে ভূত হয, তাবপব ভগবানেব কাছে সাঙ্ঘাতিক সব শাস্তি পায। কাউকে আগুনে পোডানো হয, কাউকে ফুটন্ত তেলে ভাজা হয়, কাউকে মলেব মধ্যে ডুবিযে বাখা হয আব কাউকে বা কবাত দিযে কাটা হয। শাস্তিব শেষে আবাব তাঁবা ইঁদুব বেডাল শেযাল কুকুব হযে জন্মায।

এ-জন্মেব সঙ্গে পবেব জন্মেব যোগ। তাই এ-জন্ম নিযেও আমাব দুর্ভাবনাব অন্ত ছিল না। নিজেব কোনো কাজেব মধ্যে তেমন ভালো কিছু চোখে পডত না, আব কিছু একটা অন্যায কবে বসলে তাবপব পবেব জন্মেব শাস্তিব কথা মনে হলে দস্তুব মতো ভাবনা ধরে যেত। কুকর্মেব কথা মাসিকে চুপিচুপি বলে জিজ্ঞাসা কবতাম, পবেব জন্মেব আগে খুব শাস্তি পাব, তাই না। মাসি সর্বজ্ঞেব মতই অম্লান বদনে অভয দিত তখন। বলত, দোষ কবে স্বীকাব কবলে আব পাপ থাকে না।

ফলে অন্যায কিছু কবলে (আমাব মতে হামেশাই কবতাম) কোনো এক ফাঁকে মালতী মাসিব কাছে অন্তত সেটা স্বীকাব কবতাম।

যাক, এই শিক্ষাগুণেই মাঝে মাঝে আমাব মনে হত পূর্বজন্মেব এক একটা দৃশ্য যেন আমি হঠাৎ দেখতে পাই। তন্ময হয়ে দেখি-ও। দেখি, ছোট্ট তিন বছবেব একটা ছেলেকে সামনে বসিয়ে মা আদর কবে তার চুল আঁচডে দিচ্ছে, সাজিযে দিচ্ছে, তাবপর আদব কবে চুমু খাচ্ছে, দুষ্টুমি কবলে বকছে আবাব আদব কবে বুকে টেনেও নিচ্ছে তক্ষুনি। আদবে আদরে সেই ছোট্ট ছেলেটা যেন ভরাট হযে আছে। এবকম কত কি স্বপ্ন দেখি।

মাসি শুনে হেসে বাঁচে না। বলে, পূর্বজন্ম কি বে, এ-সব তো এ-জন্মেরই কথা তোর। কি ভালই না বাসত তোকে, শুটিং-এর পর বাড়ি ফিরে মা তোর পাঁচ মিনিটও তোকে ছেড়ে থাকতে চাইতো না। সন্ধ্যা আর রাত্তিরেও তো হামেশা লোকজন আসত দেখা করতে, তাই তোকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েই যেত এক একদিন—বাবু মাঝে মাঝে সে-জন্য কম রাগ করত।

আমি লালায়িত হয়ে শুনতাম। বাবা কেন রাগ করত বুঝতাম না কিন্তু বাবার রাগের কথা শোনামাত্র তার ওপর কেমন একটা নির্মম প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করত। মায়ের আদরে আদরে আমার সেই ভরাট চিত্রটা এ-জন্মেরই ব্যাপার, এ যেন সহজে বিশ্বাস হত না। আবার অবিশ্বাসই বা করি কি করে। সেই মিষ্টি মিষ্টি মায়ের মুখখানা তো অবিকল এই জন্মের মায়ের মুখের মতই।

নদশ বছরের সেই ছোট ছেলেটার বুকের তলায় সে-কি যন্ত্রণা। দু'বছর আগে মা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। পূর্বজন্মের ভেবে যে চিত্রটা দেখতাম সেটা কত আর আগের? এত ভালোবাসত যে মা, সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল কেন? যেতে পারল কি করে?

কেন গেল, যেতে পারল কি করে, আমি জানি। মালতী মাসি মায়ের থেকেও কম করে তিন বছরের বড়। মনে হয় তার বুকের তলায়ও অনেক ক্ষোভ অনেক যন্ত্রণা অনেক বাসনা পুঞ্জীভূত ছিল। মা চলে যাবার পরেই তাকে আমি কাছে পেয়েছি, এত কাছে বোধহয় জীবনে আর কাউকে পাই নি। আমার তেরো বছর বয়সের সময়ও সে আমাকে হঠাৎ-হঠাৎ এক-একদিন বুকে টেনে নিয়ে এমন আদর করা শুরু করত যে আমার ভয়ানক লজ্জা করত। তেরো বছর বয়সে ওই মালতী মাসিকে আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়ে সরে যেতে হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত মালতী মাসির সব থেকে কাছের জীবিত প্রাণী আমি। বুঝি না বুঝি, ফাঁক পেলেই অনর্গল গল্প করত আমার সঙ্গে। বেশির ভাগই নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলত, মায়ের আর বাবার গল্প করত। পরে, অনেক পরে মনে হয়েছে, ওই রকম গল্প করে করে মাসি তার নিজের ক্ষোভ আর যন্ত্রণা হাল্কা করত। আর মনে হয়েছে, ধাপে ধাপে মা কি করে অত বড় আর্টিস্ট হয়ে উঠল, সেই গল্প যে করত তাও মাসির নিজের অপূর্ণ বাসনার একটা বিপরীত দিক, নইলে ওই বয়সের ছেলের কাছে মায়ের বড় হবার চিত্রটা অমন প্রত্যক্ষ গোচর করে তোলার কথা নয়। অনেক কিছুই বুঝতাম না তখন কিন্তু আমার শোনার আগ্রহ থেকে মাসির বলার আগ্রহ কিছুমাত্র কম মনে হয় নি।

তখন না বুঝলেও পরে বুঝেছি। পরে বলতে খুব পরে নয়। পনের বছর বয়সেই আমার ভাবনা চিন্তাগুলো অন্য ছেলেদের তুলনায় অনেক পরিণত আকার নিয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে সাত বছর বয়সে আমার সত্তার ওপর যে ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছিল, তারই যন্ত্রণার ফলে।

এদিকের ঘরে মা আর আমি শুই। ওদিকের বড় ঘরটায় বাবা থাকে। আমাদের ঘর থেকে বাবার ঘরে যেতে হলে বারান্দা দিয়ে ঘুরে যেতে হয়, কারণ মাঝের দরজাটা বরাবর বন্ধ থাকে। দিনের বেলায় কখনো-সখনো খোলা হয়, তাও বাবা বাড়ি না থাকলে।

ধু-ধু মনে পড়ে, কবে যেন সকলেই আমরা বাবার ওই বড় ঘরে শুতাম। বোধহয় বছর তিনেক আগে পর্যন্ত। মস্ত বড় খাটের একদিকে বাবা শুতো, মাঝে মা আর মায়ের পাশে আমি। আর মনে পড়ে মায়ের সঙ্গে বাবার প্রায়ই কি নিয়ে যেন ঝগড়াঝাঁটি কথা কাটাকাটি হত। মা কোনদিনই বেশি কথা বলা বা চেঁচামেচি করার লোক নয়। ঝগড়াঝাঁটি বাবার সঙ্গে মায়ের ওই এক রাতের আগেও প্রায়ই হয়েছে। আমি কখনো সভয়ে, কখনো বা সকৌতুকে লক্ষ্য করেছি, বাবা একধার থেকে বকাবকি রাগারাগি করে চলেছে, মা বেশির ভাগ সময় চুপ—আর তারপর এমন একটা দুটো কথা বলল যে বাবার রাগ মুহূর্তের মধ্যে একেবারে মাথায় উঠে গেল। তখন ডবল গর্জন বাবার। বাবার সেই তর্জন গর্জন দেখলে বা শুনলে ভেতরে ভেতরে ভয়ে কাঁপতুম আমি। মনে হত, বাবা বুঝি এই মেরেই বসল মা-কে। কিন্তু অবাক লাগত মায়ের মুখের দিকে তাকালে। তার চোখে মুখে ভয়-ডরের লেশমাত্র নেই। বাবার রাগারাগি চেঁচামিচির জবাবে বেশির ভাগ সময় খুব ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে শুধু তাকাতো এক-একবার। অবশ্য সামনে থেকে দেখতাম না, আড়াল থেকে দেখতাম। কারণ ওই ঝগড়ার সময় আমি কাছে থাকলে মা আমাকে ধমকে তাড়াতো। যাই হোক মায়ের মুখ দেখে এটুকু বেশ স্পষ্ট বুঝতাম বাবার এত রাগারাগি তর্জন গর্জনের মা একটুও পরোয়া করে না। মা এত জোর পায় কোথা থেকে ভেবে অবাক লাগত আমার।

ঠিক কবে থেকে আর কি উপলক্ষে আমি আর মা এই আলাদা ঘরে শুচ্ছি এখন আর একটুও মনে নেই। বাবার সঙ্গে বাবার ঘরে শুতে হয় না, এটা যেন একটা পরম শান্তির ব্যাপার আমার কাছে। মনে মনে ধারণা, বাবা কি সব বিচ্ছিরি জিনিস খায় আর মুখ দিয়ে গা দিয়ে বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোয়, আর বাবা তখন যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালিও করে, এই সব কারণেই মা আমাকে নিয়ে এই ঘরে সরে এসেছে। আর ওই জন্যেই দু'ঘরের মাঝের দরজাটা ওইরকম বন্ধ থাকে।

ঘুমুবার সময় মা-কে বিশেষ কাছে না পেলেও মাঝরাত্তিরে অনেক দিনই ঘুম ভেঙে যেত আমার। তখন আবছা অন্ধকারে মা-কে পাশে দেখতাম। এক একদিন উঠে বসে দু'চোখ রগড়ে সামনে ঝুঁকে মায়ের মুখখানা দেখতাম। নয়তো ঘুম জড়ানো চোখে সন্তর্পণে মাকে জড়িয়ে ধরে আবার ঘুমিয়ে পড়তাম। কিন্তু ওই করতে গিয়ে মায়ের ঘুম এক-একদিন ভেঙেও যেত। তখন পাশ ফিরে আমার দিকে শুতো, আলতো করে একখানা হাত আমার গায়ের ওপর ফেলে রাখত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার কেমন মনে হত, মা-ও যেন একটু একটু বদলাচ্ছে। মনে হত, কবে যেন মা বেশ জোরেই আমাকে বুকে চেপে শুয়ে থাকত। সে-রকম আর হয় না।

একদিনের কথা মনে আছে। ওই রকম ঘুম ভাঙতে উঠে বসে দেখে নিলাম, মা পাশে ঘুমুচ্ছে। সেদিন আমার একটু বাড়তি উদ্বেগের কারণ ছিল। সন্ধ্যার পরেই বাবা আর মা-তে তুমুল এক পশলা ঝগড়া হয়ে গেছে। সেদিন শুধু থমথমে মুখ নয়, মায়ের চোখ দুটোও যেন নিঃশব্দে জ্বলতে দেখেছি দরজার আড়াল থেকে। আর বাবাকে চিৎকার করে বলতে শুনেছি, ওই রকম করে চেয়ে থাকলে যাদের টনক

নড়ে তাদের কাছে যাও—আমার ওপর ওই কায়দা ফলাতে এলে চোখ দুটো কোনদিন আমি উপড়ে ফেলে দেব, জেনে রেখো। চোখের খেলা দেখাতে এসেছে আমাকে—

তারপর থেকে মাকে অনেকবার লক্ষ্য করেছি। ওই কঠিন মুখের দিকে তাকাতে আমারও কেমন ভয়-ভয় করেছে। খানিক বাদে মায়ের কাছে কারা আসতে আমিও যেন একটু স্বস্তি বোধ করেছি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মা মুখের ওপর আলতো করে একটু পাউডার পাফ বুলিয়ে আর নিজের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে নীচে নেমে গেল। আমার আশা, বাইরের লোকের সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করে মায়ের মেজাজ হয়তো ভালো হবে একটু।

তারপর ওই রেশি রাতে ঘুম ভাঙার আগে মায়ের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। আলো না জ্বেলে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে কোনরকম শব্দ না করেই বিছানায় উঠলাম আবার। তারপর উপুড় হয়ে মায়ের দিকে ঝুঁকলাম, রোজকার মতই ঠাণ্ডা ঘুমন্ত মুখ কিনা দেখব।

আরছা অন্ধকারে একটু চোখ বসতেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। মা ঘুমোয় নি, আমার দিকে চেয়ে আছে চুপচাপ।—কি দেখছিস?

লজ্জা পেয়ে আমি মায়ের বুকে মুখ গুঁজলাম। কেন যেন আশা হয়েছিল এভাবে ধরা পড়ার ফলে আমাকে একটু আদর করবে, নিবিড় করবে। কিন্তু মা তা করল না। আবার জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছিলি?

তোমাকে। তুমি আজকাল আর আমাকে আগের মতো ভালবাসো না।

শিথিল দেহ ছড়িয়ে মা শুয়ে আছে। তার একটা হাতও আমার পিঠের ওপর উঠে এলো না। বলল, রাত দুপুরে এখন আর ভালবাসতে হবে না, ঘুমো—

তার বুকের কাছ থেকে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসলাম একটু।—বাবার সঙ্গে তোমার এত ঝগড়া হয় কেন? বড় হলে বাবাকে আমি কেটে কুচিকুচি করে ফেলব।

অস্ফুট কঠিন সুরে মা ধমকে উঠল, তুই ঘুমুবি এখন?

সরে এলাম। মাকে কষ্ট দেয় আর গালাগালি করে বলে বাবার ওপরে অফুরন্ত রাগ ঘৃণা বিদ্বেষ। মন্ত্রগুণে শক্তি অর্জন করে মনে মনে বাবাকে যে কতদিন কতরকমের শাস্তি দিয়েছি, ঠিক নেই। কিন্তু কে জানে কেন, এই মুহূর্তে মায়ের ওপরেও আমার অভিমান কম নয়।

তারপর সেই একটা রাত। যে রাতে সাত বছরের একটা শিশু বিছানায় শুয়ে ভয়ে কাঁপছিল ঠক ঠক করে। তার ছোট বুকটা যেন ভেঙে দুমড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিল আর তার সত্তার ওপর গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল।

রাত কত হবে তখন জানি না। মালতী মাসি কখন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে উঠে গেছে টের পাই নি। আমি মায়ের কাছেই শুই বটে কিন্তু ঘুমুবার সময় মা-কে আরো কম পাই আজকাল। এক-একদিন রেশি রাত করে বাড়ি ফেরে, নয়তো লোকজন বাড়িতে আসে। এ-দিকে ঠিক ন'টা বাজলেই মালতী মাসি আমাকে চেপেচুপে ঘুম পাড়াবেই।

ঘুমুবাব আগে আজ গাযে কাঁটা দেওযা একটা দৈত্যেব গল্প ফেঁদেছিল মালতী মাসি। এক রাজার মেযেকে সাঁ সাঁ কবে বাতাস সাঁতরে নিজেব পুরীতে নিযে এসেছিল।

হঠাৎ একটা বিকট গর্জন কানে আসতে ভযানক চমকে উঠলাম আমি। নিঃসংশয দৈত্যটা এসেছে বাজাব মেয়েকে ধবে নিযে যেতে। কিন্তু অবাক লাগছে, আমি তো বিছানায় শুয়ে, ঘরে আলো জ্বলছে।

কি বললে? কি বললে তুমি?

আবার সেই গর্জন। ঘুমের শেষ বেগটুকুও কেটে গেল। মশাবিব ভিতব থেকে দু'চোখ টান কবে আমি সভযে দেখলাম দৈত্য নয়, বাবা, তাব হাতে বোতল একটা, বাগে বীভৎস দেখাচ্ছে বাবার সমস্ত মুখ। আব উল্টো দিকেব কোণেব আলমাবিটাব কাছে মা দাঁড়িয়ে, তাবও দু'চোখ যেন ধক ধক করে জ্বলছে।

বাবাব গর্জনেব জবাবে খুব চাপা অথচ অদ্ভুত কঠিন গলায মা বলল, চেচিও না, ছেলে ঘুমুচ্ছে। তুমি শযতান, তুমি পিশাচ।

সঙ্গে সঙ্গে হাতেব বোতলটা বাবা প্রচণ্ড জোবে মায়ের পাযেব দিকে ছুঁড়ে মাবল। বোতল ভাঙাব সেই ঝনঝন শব্দে সমস্ত ঘবটাই বুঝি কেঁপে উঠল। তাব ক'টা টুকবো মাযেব গায়ে পায়ে গিযে লাগল কিনা জানি না।

গল্পে শোনা সেই দৈত্যেব থেকেও ভযঙ্কব মুখ যেন বাবাব। গলা দিযে অস্ফুট আগুন ঝবাতে ঝবাতে মাযেব দিকে এগিযে আসতে লাগল। আমি শযতান... পিশাচ আব তুমি মস্ত সতী, কেমন?

মনে হল, বাঘেব মতো দুটো থাবা মাযেব দুই কাঁধে বসে গেল। তাবপবই দু' কাঁধ ধবে বিষম ঝাঁকুনি গোটা দুই তিন। মশাবিব ভিতব থেকে আমাব মনে হল, ওরকম ঝাঁকুনি দিযেই বাবা বুঝি মাকে মেবে ফেলবে। সম্ভব হলে আমি আর্তনাদ কবে উঠতাম। কিন্তু আমাব গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না।

ঝাঁকুনি খাবার পবেও মাযেব দু'চোখ জ্বলছে তেমনি। সেই জ্বলন্ত চোখ মশাবি ফুঁড়ে একবার আমাব দিকে ফিবল। সেই মুহূর্তে এক হ্যাচকা টানে মা দু'-তিন হাত সামনে সবে এলো, হাতটা বাবাব শক্ত হাতের মুঠোয ধরা না থাকলে মা ভাঙা কাচেব ওপবেই মুখ থুবড়ে পড়ত। টাল সামলাবাব আগেই খপ কবে মাযেব কোমবটা অন্য হাতে জড়িযে ধবে চোখেব পলকে বাবা আসবিক বলে দবজাব বাইবে টেনে নিযে গেল, মা এতটুকু বাধা দেবাবও ফুরসত পেল না। দু'জোড়া জুতোর চাপে ঘবে ছড়ানো কাচেব টুকবো মচমচ শব্দে গুঁড়িয়ে গেল।

আমি বিছানায উঠে বসলাম। বুকের ওপব যেন ঠক ঠক করে হাতুড়ি পিটছে কেউ। ঘেমে গেছি। ভয়ে ত্রাসে গলা শুকিযে কাঠ। আমি কি করব এখন? বাবা কি মাকে মেবে ফেলার জন্য নিয়ে গেল? মেবে ফেলছে? মাযেব আর্তনাদ কানে আসে কিনা শোনাব জন্য দু' কান উৎকর্ণ আমার। মাঝের দরজাটা ববাবরকার মতই বন্ধ। বারান্দা দিযে যাবাব দরজাটা খোলা। ছুটে গিয়ে মাকে উদ্ধাব কবে আনতে চেষ্টা করব? মাবলে বাবা না হয় দু'জনকেই মাববে।

মশারি টেনে সরিয়ে মাটিতে নামলাম। কি করব আমি? একটা টুঁ শব্দও কানে আসছে না কেন? মা-কে তাহলে শেষ করেই দিল? চিৎকার করে মালতী মাসিকে ডাকব?

উঃ! বারান্দার দরজার দিকে এগিয়েছিলাম, বেশ বড় একটা কাচের আধখানাই পায়ে বিঁধে গেল বোধহয়। কোনরকমে বিছানায় এসে বসলাম আবার। পায়ের তলা রক্তাক্ত। কি করব ভেবে না পেয়ে আমি হতভম্বের মতো বসে রইলাম।

খানিক বাদেই আমার পায়ের যন্ত্রণা মনেও থাকল না। পা বেয়ে রক্ত বিছানার ধপধপে চাদরটায় লাগছে তাও খেয়াল নেই। এক-একবার মায়ের বন্ধ দরজার দিকে তাকাচ্ছি আর এক-একবার বারান্দার খোলা দরজার দিকে। সমস্ত বাড়িটা যেন এক নিঝুম পুরী হয়ে গেছে। দৈত্যের মতই মাকে বাবা ধরে নিয়ে গেছে, দৈত্য রাজকন্যাকে প্রাণে মারে নি, কিন্তু বাবা.. বাবা কি করবে? বাবাকে এই মুহূর্তে দৈত্যের থেকে ভয়ানক মনে হয়েছিল আমার।

কতক্ষণ ওই রকম এসে বোবার মতো বসেছিলাম জানি না। পনের মিনিটও হতে পারে, আধঘন্টাও হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এক যুগ যেন। হঠাৎ সামনের আয়নার দিকে চোখ পড়তে মনে হল পিছনের জানলার ওধারে আবছা অন্ধকারে কেউ এসে দাড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘুরে তাকালাম। মালতী মাসি। গলা দিয়ে একটা অস্ফুট স্বর ডুকরে বেরুলো যেন।—মাসি শীগগির এসো।

মালতী মাসি বারান্দায় দরজার কাছে এসে দাড়িয়ে গেল। মেঝেময় কাচ ছড়ানো অবস্থাটা দেখল চেয়ে চেয়ে। বোতল ভাঙার শব্দ আগেই শুনেছিল নিশ্চয়। ইশারায় আসছে জানিয়ে চলে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই বারান্দার চপ্পল পায়ে গলিয়ে ফিরে এলো।

ইস, কি সর্বনাশ! করেছিস কী! তাড়াতাড়ি কাটা পা'টা নিজের হাটুর ওপর তুলে নিয়ে খুটিয়ে দেখল, কতটা জখম হয়েছে। রক্তাক্ত চাদরটার দিকেও তাকালো একবার।

আমি বলে উঠলাম, মাসি, বাবা মা-কে হিঁচড়ে টেনে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেল, এতক্ষণে মেরেই ফেলল বোধহয়, তুমি শীগগির গিয়ে দেখো।

মাসি থমকে তাকালো আমার দিকে। আমার উদ্বেগ আর ত্রাস দুই-ই অনুভব করল বোধহয়। কিন্তু অবাক। এতবড় সংবাদ শুনেও মাসি নির্বিকার, মায়ের কাছে ছুটে যাবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। উল্টে আমার ভয় দেখে তার ঠোঁটের ফাকে একটু হাসির মতো দেখা গেল কিনা ঠিক বুঝলাম না।

বিছানায় রক্ত না লাগে এই ভাবে পা'টা নামিয়ে রেখে মাসি ঘরের দুরবস্থাটা আর এক প্রস্থ দেখে নিল।

তারপর চটপট বেরিয়ে গিয়ে একটা ঝাঁটা আর জলের বালতি হাতে ফিরে এলো তক্ষুনি। আগে ঘরটা ঝাঁট দিয়ে ভাঙা কাচগুলো সব এক কোণে জড় করতে লাগল।

তাই দেখে আমার রাগ হয়ে গেল, বলে উঠলাম, তুমি যাচ্ছ না কেন? মায়ের কি হাল দেখে আসছ না কেন?

দ্রুত ঘর ঝাঁট দিতে দিতে মাসি জবাব দিল, তোর মায়ের কিছু হয় নি।

হয়েছে, নিশ্চয় হয়েছে। তুমি দেখো নি বাবা কিভাবে মাকে টেনে নিয়ে গেল! মা এখনো আসছে না কেন? বাবা নিশ্চয় মেরে ফেলেছে।

না রে না, আদর-টাদর করছে বোধহয়।

মাসির মুখ দেখা যাচ্ছে না, শব্দ না করে খুব তাড়াতাড়ি ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ করছে। এত বড় সঙ্কটের মুখে এ-কথা শুনে আমি তাজ্জব। বাবা মা-কে আদর করতে পারে এমন অসম্ভব কথাও আর যেন শুনি নি।

ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ করে ভাঙা কাচের স্তূপ এককোণে জমিয়ে রাখল। তারপর তেমনি চটপট হাতে বালতির ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে সমস্ত মেঝেটা মুছে ফেলল। নইলে কাচের কুচি পড়ে থাকতে পারে। শেষে জল-ন্যাতার বালতি বাইরে বার করে দিয়ে তুলো আর ডেটলের শিশি হাতে আমার সামনে মোড়া টেনে বসল।

শুশ্রূষা শুরু হবার আগেই আমি চমকে ফিরে তাকালাম। মা নিঃশব্দে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত মুখ বিবর্ণ কিন্তু থমথমে। শুকনো চুলের কয়েক গোছা একদিকের গালের সামনে চলে এসেছে।

খরখরে দু'চোখ ঘরের মেঝেতে বুলিয়ে নিল একবার। তারপর মালতী মাসির দিকে তাকালো। খসে পড়া শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়াতে জড়াতে আমার দিকে তাকালো। তারপর আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়াল।

মা-কে বাবা মেরে ফেলে নি। মস্ত নিশ্চিন্ত ব্যাপার এটা আমার কাছে। কিন্তু এই মুখ দেখেও আমার কেমন ভয় ভয় করছে। মনে হচ্ছে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বাবা যেন মারধর করেছে মা-কে।

ঝুঁকে আমার পায়ের ক্ষত দেখল। রক্তাক্ত চাদরটা দেখল। তারপর আচমকা ঠাস করে আমার গালে চড় বসিয়ে দিল একটা। এত জোরে যে আমি বিছানায় উল্টে পড়েই যাচ্ছিলাম। অস্ফুট কঠিন গলায় বলল, মাটিতে নামতে গেছলি কেন?

আমি জবাব দিলাম না। মুহূর্তের মধ্যে একটা অভিমান যেন শরীর বেয়ে উঠে চোখ বেয়ে নামতে চাইল। যে মায়ের জন্য এত দুর্ভাবনা এত ত্রাস আমার, তার কিনা এই ব্যবহার। কিন্তু মায়ের দিকে চেয়ে আমি কি দেখলাম। মুখে আর গলার কাছে কয়েকটা দাগের মতো, আর জামার কাঁধটা ছেঁড়া—কিন্তু আসলে আমার চমক লেগেছে মায়ের চাউনি দেখে। সাত বছরের শিশু সেই বাতের চাউনি বিশ্লেষণ করতে পারে নি, কিন্তু পরে পেরেছে। আরো পরে ওই আচমকা চড় মারার আসল হেতুও আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। সেই রাতে মায়ের চোখে আমি দগদগে ঘৃণা দেখেছিলাম। আমি ওই বাড়ির ছেলে তাই ঘৃণা—মায়ের চাউনি থেকে ঠিক ওই রকম ঘৃণা আমি বাবার দিকে একাধিক দিন ঠিকরে পড়তে দেখেছি।

ক্ষত জায়গা থেকে দু'দুটো বেঁধা কাচ মালতী মাসি টেনে তুলল। ভয়ানক যন্ত্রণা সত্ত্বেও আমি শক্ত হয়ে বসে রইলাম। ডেটল দিয়ে পরিষ্কার করার পর পা দুটো বেশ করে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হল। মা ততক্ষণ বিছানায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। হাতের সরঞ্জাম রেখে এসে আর একটা ধপধপে পরিষ্কার চাদর

নিয়ে মালতী মাসি চুপচাপ দাড়িয়ে রইল খানিক। সাহস করে মাকে উঠতে বলতে পারছে না।

মা আস্তে আস্তে ঘুরে তাকালো তার দিকে। চেয়েই রইল খানিক। তারপর চুপচাপ উঠে দাঁড়াল।

মালতী মাসি রক্তমাখা চাদরটা তুলে ফেলে হাতের চাদরটা চোখের পলকে যেন টানটান করে পেতে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। গুমরানো অভিমান সত্ত্বেও আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, মালতী মাসি একবারও মায়ের দিকে সোজাসুজি তাকালো না।

অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম হয় নি। ঘরের আলো নেভানো। মা অনেকক্ষণ বাদে তার জায়গায় এসে শুয়েছে। আমি ছটফট করছিলাম, এ-পাশ ও-পাশ করছিলাম। তখনো যদি মা কাছে এসে দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে টেনে নিত আমার অভিমান জল হয়ে যেত। মনের রাগ তখন শুধু বাবার ওপরেই বর্ষাতো।

কিন্তু মা তা করল না। স্থাণুর মতো বিছানায় পড়ে থাকল। তার নিঃশ্বাসের শব্দও কানে এলো না।

পরদিন।

সকাল থেকেও মায়ের ওই রকমই থমথমে মুখ। অভিমানের থেকে আমার বুকের তলার অজানা ভয়টাই যেন বেশি এখন। মাস্টার এসে দেড় ঘণ্টা আটকে রাখল আমাকে। বার বার বিমনা হবার ফলে পড়া বলতে না পেরে বার কয়েক ধমক খেলাম তার কাছে। মাস্টার চলে যাবার পরের রুটিন চান খাওয়া তারপর স্কুল। খুব আশা করতে লাগলাম মা যদি বলে কাটা পা নিয়ে আজ আর স্কুল যেতে হবে না। কিন্তু মা তা বলল না।

গাড়ির হর্ণ বেজে উঠতে একটা জমাট বাধা রাগ নিয়ে ব্যাগটা কাঁধে ফেলে আমি মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালাম। মা যেন শক্ত একখানা পাথরের মতো বিছানায় বসে।

দু'বছর হল আমার এই শাস্তি অর্থাৎ স্কুল শুরু হয়েছে। আর এই দু'বছর ধরেই গাড়িতে ওঠার আগে আমি মাকে আদর করি আর মা আমাকে আদর করে। একদিনও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

আমি মায়ের দিকে তাকালাম। মা-ও আমার দিকে চেয়ে আছে। কালকের মতো না হলেও এই চাউনিতেও যেন একটুও দরদ নেই। আমি গিয়ে আদর করলেও মা আমাকে ফিরে আদর করবে কিনা সন্দেহ।

রাগ আর অভিমান বুঝি একসঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আমার। এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে দুপদাপ পা ফেলে আমি নীচে নেমে চলে এলাম। গাড়িতে এসে উঠে শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করলাম। কিন্তু গোঁ সত্ত্বেও দোতলার বারান্দার দিকে একবার না তাকিয়ে পারা গেল না। গাড়ি চোখের আড়াল হবার আগে মা ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ে।

আজ আর ওখানে দাঁড়াবেও না ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু না, দাঁড়িয়েছে। আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমি সবোষে ঘাড় ফিবিযে নিলাম।

স্কুল থেকে ফিবে মা-কে বাড়িতে দেখব না জানা কথাই। বলতে গেলে বোজই শুটিং থাকে। ছ'টা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বাড়ি ফেবে। তবু গাড়ি থেকে নেমে সমস্ত বাড়িটা একবাব ঘুবে দেখে নিলাম। চাকব-বাকব দুটো ঘুমুচ্ছে, মালতী মাসিও ঘুমুচ্ছে।

বিকেল পর্যন্ত একটা অস্থিবতাব মধ্যে কাটিয়ে দিযে মাযেব জন্য উদগ্রীব হযে অপেক্ষা কবতে লাগলাম। বাগ আব অভিমানেব থেকেও ভিতবে ভিতবে আমাব অজানা ভযটাই যেন বেশি। কাল বাত থেকে যে-মুখ দেখেছি মাযেব অমন আব কখনো দেখি নি।

বিকেলে বাবা ফিবল। তখন পর্যন্তও তাব গম্ভীব আব নির্দয মুখ। খেলাধূলো ছেড়ে আমি ঘবে বসে আছি দেখে একবাব সামনে এসেছিল। আমি ঘৃণায় তাব দিক থেকে মুখ ফিবিযে নিযেছি। গতকালেব জন্য নয, বাবাকে আমি কোনদিনই বিশেষ পছন্দ কবি না।

তোব পাযে কি হযেছে?

কেটে গেছে।

কি কবে কাটল?

কাল বাতে তুমি বোতল আছড়ে ভেঙেছিলে, সেই কাচে।

বাবা ঘব ছেড়ে প্রস্থান কবল। মুখেব ওপব কিছু বলা গেল ভেবে আমি মনে মনে একটু খুশি হলাম।

বিকেল গেল, সন্ধ্যা পাব হল, বাত বাড়তে থাকল—মাযেব দেখা নেই। সন্ধ্যাব পবে আমাব একবর্ণও পড়া হল না। অস্থিব হযে আমি এ-ঘব ও-ঘব কবতে লাগলাম। স্টুডিওতে ফোন কবাব জন্য তিন বাব কবে আমি মালতী মাসিকে তাগিদ দিতে সে বিবক্ত হযে বলল, তোব মা কি এখনো স্টুডিওতে বসে আছে নাকি।

যত সময় যাচ্ছে, আমাব বুকেব ভিতবে যেন একটা কাঁপুনি ধবছে। কেবলই মনে হচ্ছে মা যদি আব না-ই আসে? মাযেব যে বকম ভযাবহ চোখ মুখ দেখেছি কাল বাত থেকে, সবই যেন সম্ভব। ওই সম্ভাবনাব চিন্তাটাকে যতবাব আমি নির্মূল কবতে চাইলাম ভিতব থেকে ততো যেন ওটা বুকেব ওপব চেপে বসছে। শেষে আব থাকতে না পেবে বাবাব ঘবেব দবজাব কাছে এসে দাড়ালাম। বাবা অনেকক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্য কবল না আমাকে, গেলাসে ওই বোতলেব জিনিস ঢেলে খাচ্ছে আব সিগাবেট টানছে।

মা এখনো বাড়ি ফেবে নি।

নিজেব গলাব স্বব কানে আসতে নিজেই যেন অপ্রস্তুত আমি। হঠাৎ যেন একটা ঝাঁঝ বেবিযে এলো গলা দিযে।

বাবা মুখ তুলে আমাব দিকে তাকালো। ঠিক যেন বুঝে উঠল না কি বলছি। —ভিতবে আয।

কযেক পা এগোতে একটা বিচ্ছিবি গন্ধ নাকে আসতে দাঁড়িযে গেলাম।

কি হযেছে?

মা এখনো ফেরে নি।

বাবা আমার দিকে চেয়েই রইল, তার মুখটা যেন হিংস্র হয়ে উঠতে লাগল। —ফেরে নি তো আমি কি করব?

আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

গেট আউট।

চলে এলাম। মনে হল, অবাধ্য হলে বাবা আমাকেও বোতল ছুঁড়ে মারতে পারে।

মালতী মাসি টিকটিক করতে থাকল বলেই খেয়ে নিলাম। নইলে মাকে আক্কেল দেবার জন্যেই খাবার ইচ্ছে ছিল না। এক সময় শুয়েও পড়লাম। মালতী মাসি আমাকে গল্প বলে ঘুম পাড়াতে এলো। রাগ করে আমি অন্য দিকে ফিরে শুয়ে রইলাম।

মালতী মাসি আর আমার কাছে ঘেষতে সাহস করল না। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। আমার সমস্ত জমাট বাধা রাগ আর অসহিষ্ণুতা আর ভয় জল হয়ে চোখ বেয়ে গড়াতে লাগল। সেই জলে বালিশ ভিজছে। আমি মনে মনে কেবল বলছি, মা তুমি শীগগির চলে এসো, আমি তোমার খুব ভালো ছেলে হব, আর কক্ষনো তোমাকে বিরক্ত করব না, আর বড় হয়ে বাবাকে খুব শাস্তি দেব।

...রাত কত তখন জানি না। মনে হয় মাঝ রাত্রি হবে। হঠাৎ ঘুম ভাঙতে অন্ধকারে বিষম চমকে উঠলাম। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে তার জায়গায় শুয়ে আছে। আমি চমকে উঠতে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে থাকল আমাকে।

আমিও তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে অভিমানহীন স্বরে বলে উঠলাম, অত রাত পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে, সমস্তক্ষণ আমি কষ্ট পেয়েছি জানো না।

মা আমাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে গালে মুখে চুমু খেল। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একটা ঝাঁকুনি খেলাম আমি।

স্নেহের ওই উষ্ণতাকে কেমন অপরিচিত মনে হল আমার। মায়ের গায়ের চেনা গন্ধও নাকে আসছে না।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। ঘরটা আজ অন্য দিনের তুলনায় বেশি অন্ধকার। ওদিকের দুটো জানলাই বন্ধ বোধহয়। অন্ধকার ফুঁড়ে দেখতে চেষ্টা করলাম কে শুয়ে আছে। ঠিক বোঝা গেল না। চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেছে, একটা তপ্ত আক্রোশ যেন মাথার দিকে ধাওয়া করেছে। মশারিটা হ্যাঁচকা টানের চোটে ছিঁড়েই গেল বোধ হয়। আমি ছিটকে বেরিয়ে এসে খট করে আলো জ্বালালাম।

মশারির ভিতর দিয়ে দেখি মায়ের জায়গায় মালতী মাসি কাঠ হয়ে শুয়ে আছে। আর সভয়ে আমার দিকেই চেয়ে আছে।

আমার ধারণা মালতী মাসি আমাকে তো ভালোবাসেই আমিও মালতী মাসিকে কম ভালোবাসি না। কিন্তু সেই রাতে সাত বছরের এক শিশুর মাথার মধ্যে কি যে আগুন জ্বলে উঠেছিল কেউ কল্পনা করতে পারবে না। দু'হাতে মশারিটা টেনে একেবারে ছিঁড়েই নিয়ে এলাম আমি।

তুমি এখানে কেন? কে তোমাকে মায়ের জায়গায় এসে শুতে বলেছে? বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও বলছি এ-ঘর থেকে।

মালতী মাসি শশব্যস্তে উঠে বসে দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে চেষ্টা করল। —সুমু লক্ষ্মী বাবা, এত রাতে এ-ভাবে চিৎকার করতে নেই, আয় ঘুমুবি আয়।

না না, আমি ঘুমুব না, রাগে কাঁপতে কাঁপতে আরো প্রবল চিৎকার করে উঠলাম আমি।—তুমি চলে যাও, তুমি আমার মায়ের জায়গায় কেন শুয়েছ? আমার মা কোথায়?

মালতী মাসি সভয়ে সামনের বন্ধ দরজার দিকে তাকালো একবার, তারপর খাট থেকে নেমে আমাকে ধরার জন্য এগিয়ে এসে বলল, লক্ষ্মী মাণিক, শুবি আয়, মা নিশ্চয় কোথাও শুটিং-এ গেছে, সকালেই ঠিক ফিরবে দেখিস—

আমি তিন পা পিছিয়ে গিয়ে তেমনি ক্ষিপ্ত রোষে চিৎকার করে উঠলাম, মিথ্যে কথা, তুমি মিথ্যেবাদী। মা কক্ষণো শুটিং-এ যায়নি, আমাকে না বলে মা কক্ষণো শুটিং-এ যায় না, তুমি চলে যাও এ-ঘর থেকে, আমার কাউকে দরকার নেই, কাউকে চাই না আমি।

বন্ধ দরজার ও-দিকে একটা শব্দ হতে দু'জনেই সেদিকে থমকে তাকালাম। দু'ঘরের মাঝের বন্ধ দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল। দরজাটা এদিক থেকে বন্ধ থাকে—কখন কে খুলে রেখেছে জানি না। ও-ঘরের অন্ধকার থেকে বাবা এ-ঘরে এসে দাঁড়াল। বোতলের ওই সব জিনিস খেলে বাবা খুব ঘুমোয় দেখেছি, কিন্তু আজ বাবার দু'চোখ লাল। আমার চিৎকারে ঘুম ভাঙা স্বাভাবিক, কিন্তু লাল চোখ দেখে মনে হল বাবাও অত রাত পর্যন্ত জেগেই আছে।

ঘরের মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে এসে প্রথমে বিছানার ওপর ছেঁড়া-খোঁড়া মশারিটার দিকে তাকালো, তারপর আমার দিকে ফিরতে গিয়ে আগে মালতী মাসির দিকে চোখ গেল। বাবাকে দেখামাত্র শুধু যে আগুনের ওপর ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা পড়েছে তাই নয়, চোখাচোখি হতে মাসিও হকচকিয়ে গেল কেমন। মাসির গায়ে জামা ছিল না, মনে হল ঘরডে গিয়ে মাসি শাড়ির আচলটা ভালো করে গায়ে জড়াতে লাগল।

বাবা এবার আমার দিকে ফিরল, কি হয়েছে?

আমি নির্বাক।

মশারিটা ওভাবে ছিঁড়ল কি করে? আর রাত করে এত চেচামিচি কিসের?

আমি ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইলাম। রাগে বাবার ফর্সা মুখ লাল হচ্ছে। মাসি ভয়ে ভয়ে বলল, মায়ের জন্যে কান্নাকাটি করছে—

বাবা আবার তার দিকে তাকাতে মালতী মাসি আবার থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

আঙুল তুলে বিছানা দেখিয়ে বাবা হুকুম করল, গো টু বেড।

আমি গোঁ ধরে দাঁড়িয়েই রইলাম। বাবা এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, গো টু বেড। ফের যদি এরকম বাদরামো আর চেঁচামিচি করতে দেখি তো চামড়া পিঠের ছাল তুলে দেব।

আমি বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপছে। কিন্তু বাবা তক্ষুনি ঘর ছেড়ে চলে গেল না দেখে আমি শুয়ে শুয়েই ঘাড় ফেরালাম একটু।... বাবা কি এবার মাসিকে বকবে নাকি। অমন করে চেয়ে আছে কেন? চুপচাপ দাঁড়িয়ে

মাসিব মাথা থেকে পা পর্যন্ত বাব দুই তিন তাকালো বাবা। না, বাবাব এই চাউনিটা একটু আগেব মতো বাগে ভবাট নয়, কেমন যেন ঘোলাটে ঘোলাটে। আব তাইতেই মাসি হঠাৎ যেন একেবাবে জডসড হযে দাঁডিযে আছে।

নিজেব অন্ধকাব ঘবেব দিকে ফিবে যেতে যেতে বাবা বলল, ও ঘুমোক. তুমি শুনে যেও তো একটু—কথা আছে।

আমি তাবপবেও অবাক চোখে কিছুক্ষণ মালতী মাসিকে দেখলাম। না, বাবাব গলাব স্ববে আব বাগেব লেশমাত্র নেই, তবু মাসি হঠাৎ এমন কাঠ হযে গেল কেন ভেবে পেলাম না। আমি ওই বকম বেযাদপি কবেছি বলে বাবা নিশ্চয মাসিকে নিজেব ঘবে ডেকে নিযে গিযে বকাবকি কববে না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ওঘবে মৃদু গম্ভীব গলা খাঁকাবিব শব্দ কানে আসতে মাসিব যেন হুঁস ফিবল। চমকেই উঠল একবাব। তাবপব আমাব দিকে তাকালো। বিছানাব কাছে এসে দাঁডাল। মাসিব এই মূর্তি দেখে আমাব যেন মাযা হল একটু।

ঘবেব আলোটা জ্বেলে বেখেই মাসি আস্তে আস্তে বাবাব অন্ধকাব ঘবেব দিকে এগিযে গেল।

আমি লাফ দিযে উঠে আলোটা নিভিযে দিযে আবাব শুযে পডলাম।

তখন বুঝিনি, এব ঢেব ঢেব পবে বুঝেছি মালতী মাসি আলো থেকে কোন অন্ধকাবেব মধ্যে ডুবে গেল।

এবপব একটানা আবো ছ'বছব মালতী মাসিব সঙ্গে এ-বাডিতে কাটিযেছি। তাব মধ্যে সাডে পাঁচ বছব ধবেই আমাব মনে হযেছে মাসি যেন সেই এক বাতেব পব থেকে বাতাবাতি অনেক বদলে গেছে। সে আমাকে আগেব থেকে আবো বেশি ভালোবেসেছে। দিনেব পব দিন মাযেব কত গল্প কবেছে ঠিক নেই। কিন্তু তবু আমাব মনে হযেছে, যে মা আব এলোই না এ-বাডিতে শুধু তাব ওপবেই যেন মাসিব স-বকম দবদ নেই।

মাযেব গল্প বলতে মালতী মাসি খুব সাধাবণ আর্টিস্ট থেকে এত বড অভিনেত্রী হযে ওঠাব গল্পই বেশি কবত। শুনতে ভালো লাগত, কিন্তু মাসিব অনেক কথাব তাৎপর্য আব ইংগিত বোধগম্য হত না। আমি বুঝি বা না বুঝি সে যেন অনেকটা নিজেব বলাব ঝোঁকে বলে যেত। বুদ্ধি বিবেচনা একটু পবিণত হযে উঠতে কিছুই আব অস্পষ্ট ছিল না অবশ্য, কিন্তু মাসি ততোদিনে আমাব জীবন থেকে বিদায নিযে নিজেব ভবিষ্যতেব পথ ধবেছে।

মালতী মাসিব মুখে যা শুনেছি, নিজেব চোখে যেটুকু দেখেছি, আব যা দেখি নি বা শুনি নি অথচ সম্ভাব্য সত্য বলে আমাব কল্পনায এসেছে—সেই সবকিছু মিলিযে এই সবকাব বাডিব জীবন-যাত্রাব একটা চিত্র আমাব চোখেব সামনে স্থিব হযে আছে। আমি এব ওপব কোনো মন্তব্য কবিনে, কবতে চাইনে—নির্লিপ্ত দর্শকেব মতো সেটা শুধু চেযে চেযে দেখি।

মা আমাব চোখে দুনিযাব সেবা রূপসী বটে (এখনো কি?), কিন্তু মাসিব মতে রূপেব বাজারে ওই রূপেব দাম নেই কিছু। গাযেব রং তো কালোই বলতে হবে। ঘষে-মেজে যেটুকু দাঁড়িযেছে তাকেও ফর্সা বললে বীতিমতো অত্যুক্তি হবে। আব নাক-চোখ-মুখেবও এমন কিছু বাড়তি বৈশিষ্ট্য নেই যা নিখাদ রূপেব পর্যাযে পড়তে পাবে। মাথাব চুলও কাঁধ পিঠেব আধা-আধি নামে নি। তবে লম্বাটে গড়ন, স্বাস্থ্য ভালো, আব হাসলে ঝকঝকে দাঁতেব সাবি দেখলে মনে হয যেন নিখুঁতভাবে সাজিযে বসানো।

মাসিব মতে মা চিবঋণী 'ক্যামেবা' নামে যন্ত্রটাব কাছে। অমন ক্যামেবামুখো ভাগা সচবাচব নাকি কাবো হয না। ওই যন্ত্রটাই মাকে রূপেব ছাড়পত্র দিযেছে। যখন যে-ভাবে যে ঢঙে ছবি তুলুক, তাই চোখে পড়াব মতো সুন্দব। ওই যন্ত্রটাব কল্যাণেই মা প্রায দু'যুগ ধবে তাব স্তাবক আব অনুবাগীদেব চোখে অনন্যাব আসনে বসে থাকতে পেবেছে। তবে মাযেব দুটো গুণেব কথাও মালতী মাসি একবাক্যে স্বীকাব কবেছে। এক, চোখেব ভাষা। তা এত নীবব অথচ এত স্বচ্ছ, গভীব আব স্পষ্ট যে, সেটাই নাকি মাযেব বিশেষ একটা রূপ। দুই, জোবালো আলো আব ক্যামেবাব সামনেও খুব সহজ আব স্থিব থাকতে পাবাব গুণ। ওই জন্যেই মাযেব অভিনয কোনো সময অভিনয বলে মনে হয না।

কিন্তু এই সব গুণেব কদব হযেছে ঢেব পবে। অনেক হতাশাব দিন গেছে। মাযেবা ছিল পাঁচ বোন আব তিন ভাই। মা সকলেব ছোট। দাদু অর্থাৎ মাযেব বাবা ছিল মার্চেন্ট অফিসেব নিচেব দিকেব কেবাণী। যে মাইনে পেত তাতে মাসেব বিশ দিনও টেনে-টুনে চলত না। তাই মাসিবা আব মামাবা অল্প বযস থেকেই যে-যাব ভবিষ্যতেব বাস্তা নিজেবাই বেছে নিযেছে। মামাদেব মধ্যে বড়জন স্কুলেব মাষ্টাব, দ্বিতীযজন ইনসিওবেন্সেব দালালী কবতে কবতে একবাব এক শাঁসালো পার্টিব মোটা টাকা মেবে অনেক দিন জেলখাটাব পব ফেবাবী হযেছে। এখন কোথায আছে বা কি কবছে, কেউ জানে না। ছোট মামা দেশব্রতী হিসেবে কিছু নাম কবেছে। নবম গবম লেকচাব দিযে বেড়ায, গোটাকতক ইউনিযনেব পাণ্ডাগিবি কবে, চাকবি বাকবি কবেনি কোনদিন অথচ বিযে থা কবেছে, ছেলে-পুলে আছে—আব তাব অবস্থাই মোটামুটি সচ্ছল একটু।

ওদিকে মাসিবাও অল্প বযস থেকেই যে যাব নিজেব নিজেব বাস্তা খুঁজে নিতে চেষ্টা কবেছে। বড মাসি কলেজে পড়তে পড়তে এক পযসাওযালা মাড়োযাবী ছেলেব ঘবণী হযে বসেছে। মেজ মাসিও সেই গোছেব কিছু চেষ্টা কবতে গিযে কোথায ভেসে গেছে, কেউ জানে না। ন'মাসি আব ছোট মাসি অন্য বোনেদেব তুলনাযও কুচ্ছিৎ দেখতে। তাদেব একজন প্রাইমাবি মেযে স্কুলেব মাষ্টাব, অন্যজনেব ধর্মে মতি। সে নামকবা সেবাযতনেব দীক্ষিতা কর্মী। তাব মাথাব চুল ছোট কবে ছাঁটা, গেরুযা ধুতি পবা, বাস্তব চাওযা-পাওযাব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন।

সকলেব ছোট মা, রুচিব দিক থেকে তাব বাবাব ধাত পেযেছিল। দাদু নাকি অ্যামেচাব পার্টি আব আপিসেব বাৎসবিক নাট্যানুষ্ঠানেব নামকবা কমিক অভিনেতা ছিল। আপিসেব সামান্য কেবানী বাপ হওযাব বাস্তব কমিকটা ভোলাব জন্যেই

অভিনযেব এই অঙ্গটি আঁকডে ধবেছিল কিনা কেউ বলতে পাববে না। মা যেবাবে স্কুল ফাইনাল পবীক্ষা দিল, সেবাবে 'আট' ছেলে মেয়েব বাপ ওই ধবনেব কমিক অভিনেতাব মৃত্যুব খবব আব ছবি কাগজেও বেরিয়েছিল, শুনেছি।

দাদু মাবা যাওযাব পব তাব বিধ্বস্ত সংসাবেব হালছাড়া দশা। স্কুল-মাষ্টাব বড মামা তাব বাপেব আমলেই পৃথক হযে গেছল। দেশব্রতী ছোট মামাব ভগ্ন-দশা তবীব হাল ধবাব আগ্রহ আগেও ছিল না, পবে সে আবো উদাসীন। বড মাসি কিছু কিছু সাহায্য কবত, আব ভবসা ন' মাসিব প্রাইমাবি স্কুলেব সামান্য বেতন। তাবও আনকোবা নতুন চাকবি তখন। তাদেব মাযেব অর্থাৎ আমাব দিদিমাব বুকেব ব্যামো লেগেই ছিল। কিন্তু বড মাসিব কৰুণা না হলে সময়ে একটু ওষুধও জুটত না।

টেনেটুনে স্কুল ফাইনাল পাশ কবে মা প্রায দু'বছব ঘবে বসে ছিল। ন' মাসি তখন তাব জন্যও স্কুলে চাকবিব চেষ্টা কবেছে, আব বোনেব নিজেব গবজেব অভাব দেখে বকাবকি কবেছে। ন' মাসি চাকবি জুটিযে দিতে পাবলে মা সেই চাকবি কবত হযতো কিন্তু আসলে ওই চাকবি মাযের দু'চোখেব বিষ।

সংসাব যখন একেবাবে অচলপ্রায মা তখন হঠাৎ একদিন সাহসে কোমব বেঁধে পাডাব অবিনাশ সবকাবেব সঙ্গে দেখা কবতে গেল। এখানকাব অ্যামেচাব নাটকেব সংস্থাটি তাবই হাতে গডা। মাযেব বাবা এই সংস্থাবই পাকাপোক্ত কমিক অভিনেতা ছিল, আব ওই ভদ্রলোক তখন সামান্য কবণিক বলে দাদুকে অবজ্ঞা কবত না, ববং ভালোবাসত। অ্যামেচাব ক্লাব হলেও কোনো সামান্য অবস্থাব শিল্পী কিছু কিছু টাকা পেত, বিশেষ কবে মেযে শিল্পীবা। বিনা টাকায মেযে-শিল্পী সংগ্রহ কবা খুব সহজ হত না। মালতী মাসি তখন ওই ক্লাবেব সবেতন শিল্পী একজন। তাব বাডি ঘবেব পবিচয আজও আমাব জানা নেই। অবিনাশ সবকাব এমনিতে রুক্ষ মেজাজী মানুষ, কিন্তু ভিতবটা দবদী। মা জানত, দবকাবেব সময ভদ্রলোক বাবাকে অনেকভাবে সাহায্য কবত।

মাযেব মুখে সে সংসাবেব দুববস্থাব কথা শুনল, আব মা যে স্কুলেব নাটকে অভিনয কবে দু'-তিন বাব মেডেল পেযেছে, তাও জানল।

সেই থেকে মাযেব অভিনয-জীবন শুরু। আব তাব সাযাহ্নে আবাব সেই মঞ্চেই পদার্পণ। খববেব কাগজে এই যোগাযোগেব খববও ফলাও কবে ছাপা হযেছিল।

মালতী মাসি বলত, পাডাব এক বস্তিতে থাকতুম, তোব মাযেব সঙ্গে আগে থেকেই একটু ভাব-সাব ছিল। আমাব কাছ থেকে ভবসা পেযেই অবিনাশ সবকাবেব সঙ্গে গিযে দেখা কবেছিল। আব তোব মা এসে ছ'মাসেব মধ্যেই কিনা আমাব জাযগাটি জুডে বসল! শুধু তাই, আপিস বা ক্লাব থেকে প্লে কবাব জন্যও আমাব বদলে তোব মাযেব ডাক পডতে লাগল। উপকাব কবতে গিযে আমি শেষে উপোস কবে মবি আব কি।

বছব খানেকেব মধ্যে শৌখিন নাটক মহলে মাযেব বেশ নাম হযে গেছল। নানা জাযগা থেকে ডাক আসত, আব টাকা-কডিও বেশ পেত। অবিনাশ সবকাবেব ক্লাবও তখন মাযেব দৌলতেই বেশ ফেঁপে উঠেছিল। সেই কাবণে মাযেব প্রতি সবকাব

মশাইযেব স্নেহ ভালবাসাও দিন দিন বাডছিল। মাযেব বেশ কডা গার্জেন হযে উঠেছিল সে। শহবেব বাইবে থেকে অথবা বেশি দূবেব কোনো অনুষ্ঠানে অভিনযেব ডাক এলে বেশি টাকা পাওযাব সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভদ্রলোক যাবাব অনুমতি দিত না। শহবেব মধ্যে হলেও মাকে একলা ছাডত না, হাতে সময থাকলে নিজে সঙ্গে যেত, নযতো বেশিব ভাগ সময নিজেব অনেক দিনেব বিশ্বস্ত চাকব হীবা সিংকে সঙ্গে দিত। সবকাব মশাইযেব অনুমতি ভিন্ন মাযেব কোথাও অভিনয কবাব উপায ছিল না। শুনেছি, ওই বুডো হীবা সিংও মাকে ভালবাসত খুব। কোথাও গেলে মাকে চোখে চোখে বাখত।

কিন্তু ওই হীবা সিংকে অবিনাশ সবকাব চাবুক নিযে তাডা কবেছিল একদিন। কাবণ, সেদিন সে জেনেছে, হীবা সিং তাব সঙ্গেই সব থেকে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা কবেছে। তাব ছেলেব সঙ্গে মাযেব ভাব-সাবেব ব্যাপাবটা অনেক দিন পর্যন্ত সকলেব চোখে গোপন ছিল তাব জন্যেই। বাবুব ছেলে যে নিজেব কাজকর্ম ফেলে মাযেব প্রত্যেকটা নাটক দেখতে ছোটে, আব ফেবাব সময়ে বাসে যাবাব জন্য ওব হাতে দু'-পাঁচ টাকা গুঁজে দিযে মাকে নিযে ট্যাক্সি কবে ফেবে—সেটা একমাত্র ও ছাডা আব কে জানত?

অবিনাশ সবকাবেব ছেলে বিজন সবকাব, সেই আমাব বাবা।

নাট্যবসিক অবিনাশ সবকাবেব নিজেব ছিল পৈতৃক আমলেব ডেকবেটিংযেব চালু ব্যবসা। নিজেব আমলে সেই ব্যবসা সে আবো অনেক বড কবে তুলেছিল। এই ব্যবসায তাদেব নাম ছিল। তাব অন্য দুই ছেলে বাপেব ব্যবসায যোগ দিযেছিল, কিন্তু বড ছেলে বিজন সবকাব উৎসবে অনুষ্ঠানে অন্য লোকেব ঘব বাডি সাজানো বা পেযালা প্লেট আব খাওযা-দাওযাব বাসন সববরাহ কবাটাকে সম্মানজনক ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ কবতে পাবে নি। সে লেখাপডা শিখে ইলেকট্রিক্যাল এনজিনিযাব হযেছে। কিন্তু বংশেব কেউ চাকবি কবায অভ্যস্ত নয, বিজন সবকাবও কোনো চাকবিতে বেশিদিন টিকে থাকতে পাবে নি।

তাব স্বপ্ন লাখ দেড দুই টাকা পেলে মস্ত একটা ইলেকট্রিক্যাল ওযার্কশপ খুলে বসবে। দিশি বিলেতি যন্ত্রপাতি সাজ সবঞ্জাম থাকবে, অনেক লোকজন কাজ কববে, ব্যবসা কাকে বলে বাবাকে দেখিযে দেবে। কিন্তু অনেক টানা হ্যাঁচডাব পব ভদ্রলোক ছেলেব হাতে মাত্র দশটি হাজাব টাকা গুনে দিযে বলেছিল, এই দিযে যা পাব কবো, এব বেশি আব এক কপর্দকও দেবাব ক্ষমতা নেই।

সেই দশ হাজাব টাকায বিজন সবকাব যে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল, তাব নিজেব চোখেই সেটা একটা খেলনাব মতো। এই হতাশাব দরুন তাব মেজাজ-পত্র ভালো ছিল না কোন দিন। আব ওই ক্ষোভেব দরুন বাডিব কাবো সঙ্গে তেমন বনিবনাও ছিল না।

সেই ছেলে এমন একটা কাণ্ড কবে বসতে পাবে, অবিনাশ সবকাবেব কল্পনাব বাইবে। কাবণ নিজেব ক্লাবেব কোনো অনুষ্ঠানে ছেলেকে কোনদিন দর্শকেব আসনে এসে বসতেও দেখেনি। সেই ছেলে যখন আচমকা ঘোষণা কবে বসল, মা-কে বিযে কববে, ভদ্রলোক স্তম্ভিত। ছেলেব উপার্জন কি জানে না, অতএব সঙ্কল্প শুনে তাব

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাছাড়া ভদ্রলোক যত বড় নাট্যকারই হোক, আর মায়ের কল্যাণে তার সংস্থাটির আয় পয় বেড়েছে বলে তাকে যত স্নেহই করুক, পাঁচ জায়গায় থিয়েটার করে পাঁচজনের প্রেমিকা সেজে টাকা রোজগার করে যে মেয়ে, তাকে একেবারে ঘরে বউ করে আনার প্রস্তাবটা সে ভাবতেও পারে না। হীরা সিংকে ডেকে জেরা করতে ব্যাপার কি করে এত দূর গড়ালো সেটা ফাঁস হয়ে গেল। তাকে ধরে মারতে বাকি রাখল প্রথম। বেচারা হীরা সিংয়ের দোষ কি, সে জানে, দাদাবাবু যখন বিয়েই করবে দিদিমণিকে, তখন আগে থেকে একটু আধটু মেলামেশা করলে কি আর এমন দোষ? এতকাল কলকাতায় থেকে কম তো দেখল না।

অবিনাশ সরকার ছেলেকে ডেকে জবাব দিল, বউ নিয়ে অন্যত্র বাস করার মুরোদ থাকলে বিয়ে করতে পারে, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

ছেলেও গোঁয়ার। তেমনি পাল্টা জবাব দিল, ঠিক আছে।

কিন্তু এই পর্যায়ে বেঁকে বসল আমার মা। সরকার মশাই পিতৃতুল্য তার, অসময়ে আশ্রয় দিয়েছে, সামান্য হলেও একলার চলে যাওয়ার মতো রোজগারের রাস্তা খুলে দিয়েছে। মায়ের আশা ছিল, সরকার মশাই প্রস্তাব শুনে খুশি হবে, তার ছেলেও সেই রকম আশ্বাসই দিয়েছিল। তার উগ্র মূর্তি দেখে মা হতভম্ব। মায়ের সঙ্গেও ভদ্রলোক যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছে। সকলের সামনে অকৃতজ্ঞ বলে গালাগাল করেছে।

বাবাকে ডেকে মা জানিয়ে দিয়েছে, এ বিয়ে হবে না,কারো অশান্তির কারণ সে হতে চায় না, তার জন্য কারো পরিত্যক্ত হবারও দরকার নেই।

আমার ধারণা—মায়ের আমি অবাঞ্ছিত সন্তান। অনেক পরে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছে। আট-ন' বছরের ছেলের কাছে মাসি হেসে হেসে গল্প করেছে, তোর বাবাকে ফিরিয়ে দেবার পর কি সঙ্কটই না গেছে তোর মায়ের। বাড়ি ছেড়ে আমার সঙ্গে আমার বস্তিঘরে এসে থেকেছে। আর তারপর আত্মহত্যা করার ফিকির খুঁজেছে। তোর মায়ের সেই চোখ-মুখ আর রকম সকম দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। একদিন এক পোঁটলা ঘুমের ওষুধ পেলাম তার বাক্স ঘেঁটে। সেই রাতেই সেগুলো নিয়ে সরকারমশাইকে দেখালাম, আর বললাম, এ বিয়ে না হলে ইন্দুমতীর বাঁচার উপায় থাকবে না। আমার মুখে সব শুনে সরকার মশাই পাথরের মতো বসে রইল খানিক। তারপর উঠে সোজা আমার বস্তিঘরে চলে এলো। মায়ের মাথায় হাত রেখে বলল, আমি তোমার ছেলে, ছেলের দোষ নিও না, আমি তোমাকে মা লক্ষ্মীর মতই আমার ঘরে নিয়ে যাব।... এর পাঁচ দিনের মধ্যে তোর বাপের সঙ্গে তোর মায়ের বিয়ে, আর বিয়ের ঠিক সাত মাসের মাথায় তুই এসে হাজির হলি।

বাবা-মায়ের বিয়ের গল্প শুনে আট-ন' বছরের এক অবোধ ছেলের মালতী মাসির প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। সঙ্কটের সময় সে-ই মাকে আশ্রয় দিয়েছে, আত্মহত্যার হাত থেকে মাকে রক্ষা করেছে, মা আত্মহত্যা করলে আমার কি দশা হত, আমি কেমন করে এই পৃথিবীর মুখ দেখতাম? অবিনাশ সরকারকে বলে বাবা-মায়ের বিয়েও সে-ই ঘটিয়ে দিয়েছে, মালতী মাসির থেকে ভালো আর আপনার জন দুনিয়ায় কে

আছে? কিন্তু পরে, অনেক পরে একটা চেতনার যন্ত্রণা আমার মাথায় কেটে কেটে বসেছে।... মায়েব সঙ্কটটা কি, কেন বাড়ি ছেড়ে তাকে মাসির সঙ্গে বস্তিঘরে এসে থাকতে হযেছিল, আর কেন-ই বা সে আত্মহত্যার ফিকির খুঁজছিল? সবেরই একটাই জবাব। আমি আসছিলাম বলে। আমিই মাযের তখন সঙ্কট বলে। আমি তখন অবাঞ্ছিত বলে। আমাকে নিয়েই মাযের যত সমস্যা।

তখন মনে হত, আমার সকলের থেকে বড শত্রু কেউ থাকে তো সে মালতী মাসি। এই দুঃসহ অস্তিত্বটা টানতে হচ্ছে শুধু তার জন্যেই।

মাসি বলত, তোর বাবা গোঁয়ার হলে কি হবে, তার চোখ ছিল। বিয়ের আগেই মাকে বলত, থিযেটার কবে কোনদিন কিছুই হবে না, একটা সিনেমায় একবাব নাম করতে পারলে টাকাও যেমন খ্যাতিও তেমনি। সিনেমায় নামতে চেষ্টা করো। তোর মায়েবও মনে মনে সেই আশা, ফিল্ম আর্টিস্ট হবে, কি করে সেটা হওযা যায় আমার সঙ্গে সেই পবামর্শ করত... তোর মায়ের ফটো খুব সুন্দর ওঠে, সেটা তোর বাবা আগেই জানত, বিযের কিছুদিন পবেই ভালো স্টুডিও থেকে সে তোব মাযেব একগাদা ফটো তুলে ফেলল। কত ঢংয়েব কত রকমের ছবি সব—

হ্যাঁ, সেই ছেলেবয়সে মা-খোয়ানোব ক্ষত বুকে চেপে সেই সব ছবি আমি নিজের চোখেই দেখেছি। বাবার কাছ থেকে চাবি সরিযে, মাযেব দেরাজ বা আলমারি থেকে সব জিনিসপত্র টেনে বার করে তছনছ কবে ফেললে কে নিষেধ করবে, কে ধমক লাগাবে? ওই কবতে গিযেই দেরাজ থেকে মাযের দু'-তিনটে ফটো অ্যালবাম বেরিযেছে। ওই অ্যালবাম আমাব আগেও চোখে পড়েছে কিন্তু মা কখনো সে-সব নেড়েচেড়ে দেখতে দেয় নি।

শিশুমনেব এক জমাট বাঁধা আক্রোশ নিযে সে-সব খুলে বসতাম। কিন্তু কখন যে মা-কে দেখাব মধ্যেই তন্ময় হয়ে যেতাম, টের পেতাম না। মা যে কত সুন্দব সেটা যেন আগে দেখি নি, আগে বুঝি নি। বাড়িতে এই মায়েবই হাসিমুখ দেখেছি, গম্ভীব মুখ দেখেছি, সুন্দব ভ্রূকুটিও দেখেছি, তবু ছবিতে ওই সব দেখে মনে হত, এমন আব কখনো দেখি নি।

এই সব ছবি বাছাই কবে বাবা নাকি সিনেমাব কর্তাদেব কাছে পাঠিয়ে দিত। ছবির সঙ্গে মাযের পবিচয় থাকত। অল্পস্বল্প নাম তো থিয়েটাবেব জন্যই হযেছিল, তাই ছবি দেখে ওই ছবিওয়ালাদের কারো কাবো আগ্রহ হল।

হলে কি হবে, সেই গোড়া থেকে তুই সোজা জ্বালিয়েছিস তোব মাকে! মালতী মাসি বলত, ও-সময চেষ্টা করার জন্য তোব বাবাব সঙ্গে ঝগডা পর্যন্ত হযে গেছে, তোর মা কারো সঙ্গে তখন দেখা করতেই বাজি নয।

অর্থাৎ আমি আসছি সেটাই অন্তরায তখন।

অ্যালবাম থেকে মায়ের ফটোগুলো খুলে সামনে ছডিযে রাখতাম, আব ভাবতে চেষ্টা করতাম, মা কোথাও যায় নি, নানান মূর্তিতে আমাব সামনেই আছে। ভাবতে না পারলে বলতাম, আমি আসার পরে আব তো তোমাকে বেশি জ্বালাতন করি নি, বিরক্ত করি নি। আগে যা হয়েছে তার জন্যে আমাব কি দোষ? তুমি আমাকে ফেলে

গেলে কেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে না কেন? আমি মা ছাড়া থাকতে পারি না, জানো না? তুমি ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারছ কি করে?

আমি জন্মাবার ছ'মাস বাদে বাবা আর মা একসঙ্গে আবার ছবির জগতে হানা দিয়েছে। মালতী মাসি বলে, সংসার তখন প্রায় অচল তোদের, তোর জন্য ঠিক একটু দুধ জোটানও শক্ত হয়ে উঠছিল।

এমন দুরবস্থায় পড়ার কারণ, দাদু অর্থাৎ বাবার বাবা সরকার মশাই হঠাৎ চোখ বুজেছে। তারপরেই ভাইদের মধ্যে অশান্তি। ছোট দুই ভাই বলেছে, দশ হাজার টাকা দিয়ে বাবা তাকে আলাদা ওয়ার্কশপ করে দিয়েছে অতএব ডেকোরেটিং-এর ব্যবসায় তার কোনো ভাগ নেই। বাবা ভয়ঙ্কর জেদী আর একরোখা মানুষ—ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া করে মা-কে নিয়ে আর আমাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়েই চলে এসেছে। তখন সস্তাগণ্ডার দিন, তাই পঞ্চাশ টাকায় দুটো ঘর ভাড়া পাওয়া গেছল। কিন্তু সেই পঞ্চাশ টাকাই বা আসে কোথা থেকে? মালতী মাসির অবশ্য খুব ইচ্ছে ছিল, মা আর মাসি দু'জনে মিলে সরকার মশাইয়ের থিয়েটারটা চালায়। থিয়েটার একেবারে বন্ধ হবার ফলে তারও তো চরম দুরবস্থা তখন।

রে-গতিক দেখে মায়ের অনিচ্ছা ছিল না খুব, কিন্তু বাবার তখন মা-কে সিনেমা-স্টার বানাবার ঝোঁক চেপেছে মাথায়—একবার নাম করে ফেলতে পারলে অঢেল টাকা। তখন নিজের মনের মতো একটা ইলেকট্রিক্যাল কারখানা জাঁকিয়ে তোলা জল-ভাত ব্যাপার। সেই ভবিষ্যতের আশায় ছোট যে ওয়ার্কশপটা ছিল তার মূলধন ভেঙে আর যন্ত্রপাতি বেচে কায়ক্লেশে সংসার চলছিল।

তোর মায়ের একখানা বরাত বটে, বুঝলি। সামনাসামনি দেখে খুশি না হলেও ফটো দেখে দুই-একজন সিনেমার লোক খুশি হয়েছিল। তোর বাপের মতো চোখ ছিল তাদেরও, প্রথম ছবিতে নায়িকার থেকেও কাগজে তোর মা বেশি প্রশংসা পেয়ে গেল। দ্বিতীয় ছবিতেও তাই। তৃতীয় ছবিতে সরাসরি নায়িকা হয়ে বসল একেবারে। একচোখা ঠাকুর মুখ তুলে তাকালে ওই রকম করেই তাকায়, সেই এক ছবিতে রাজার মাৎ।

তারপর? তারপর কি জানি, লাফিয়ে লাফিয়ে ভাগ্য ফিরতে লাগল আমাদের। যে-ভাগ্য লোকে স্বপ্নে কল্পনা করে থাকে, সেই রকমই ভাগ্য। আর তলায় তলায় দুর্ভাগ্যও সঞ্চিত হচ্ছিল কিছু, কিন্তু সেটা টাকার ঝকমকানির তলায় চাপা পড়েছিল।

মালতী মাসির প্রতি মা অকৃতজ্ঞ হয় নি। ভাগ্যের মোড় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিজের কাছে এনে রেখেছে। মালতী মাসি আমাদের দুঃখের ভাগীদার, সুখেরও। পরে মায়ের বড় হবার গতি যখন আরো দুর্বার ঊর্ধ্বমুখী, তখন ছোটখাট বোলে তাকে ঠেলে দিতে কার্পণ্য করেনি মা। কিন্তু মাসির কেন যেন আর দুপায়ে দাঁড়াবার মতো উৎসাহ বা উদ্দীপনা ছিল না। পরিতুষ্ট মুখে মাসি আমাকে বলত, সমস্ত জীবন নিজের ভাবনা ভেবেছি আর কাঁহাতক ভালো লাগে বল, সুখের ঘরে খেয়ে দেয়ে দিব্যি মুটিয়ে যেতে লাগলাম।

...সুখের ঘর! মা এই ঘর ছেড়ে চলে যাবার পরেও মাসি সুখের ঘর বলতে পেরেছিল কি কবে সেটা বিশ্লেষণ করার বয়স নয় আমার তখন। পরে মাসির বাক-চাতুরীর সেতু ধরেই আমাদের সুখের ঘরের রূপটা আমি চোখ বুজে কল্পনা কবতে পেরেছি।

...মাযেব সঙ্গে বাবার প্রকাশ্যে মনোমালিন্য শুরু হযেছিল আমার চাব বছর বয়সেব সময় থেকে। বাবা সেই জাতের মানুষ, যাবা নিজের স্বার্থের প্রযোজনে উদারতাব সুতোটা গড়গড কবে ছেড়ে দিযে বসে থাকতে পাবে। কিন্তু প্রযোজন ফুবোলে সে সুতো গুটোবে। আমাদেব সুখেব ঘবে বাবার তখন ওই সুতো গুটোবার মেজাজ। মা চডচড কবে খ্যাতির শিখবে উঠতে লেগেছে তখন। বছবে চার-পাঁচটা করে কন্ট্রাক্ট সই করছে। একটাব থেকে আর একটাব প্রাপ্তিব অঙ্ক বেড়ে চলেছে। এ-সব ব্যাপারে বাবার সিদ্ধান্ত চূডান্ত। টাকা পযসাব ব্যাপাবে পার্টির ফযসালা কবতে হবে বাবাব সঙ্গে। গোড়ায় গোডায় সঙ্কোচবশেই দেনা-পাওনাব হিসেব নিকেশ মা বাবার হাতে ছেড়ে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু পবে এই নিযেও খিটির-মিটির বাঁধতে লাগল। মা কারো প্রতি সদয হযে বা প্রযোজন বোধে কোথাও অল্প টাকায কাজ কবতে রাজি হলে বাবাব সঙ্গে দস্তুরমতো ঝগডা বেধে যেত। বাবাব ভিতবে ভিতবে তখন নানারকম সন্দেহের কাটাছেঁড়া শুরু হত। তা ছাডা পযসাওয়ালা সব পার্টি বাবাব এই আধিপত্য প্রীতিব চোখে দেখবে কেন? লেন-দেনেব ব্যাপাবেও তারা অনেকে সোজাসুজি মায়েব সঙ্গেই কথা-বার্তা কইতে চাইত। মা তাতে বাজি হলেই বাবা খাপ্পা।

প্রথম দিকে বাবা প্রায সর্বক্ষণ মাযেব সঙ্গে স্টুডিওতে থাকত। বিকেলে মাকে নিয়ে বাডি ফিরত। নিজেব মস্ত ফ্যাক্টরী করাব সঙ্কল্প একবকম ধামাচাপা। বাবা সঙ্গে থাকার দরুন গোড়ায় মায়েব সুবিধে হত, কিন্তু নতুন জগতেব যাবতীয় কিছু বুঝে সুঝে নিতে কত আব সময় লাগে? ফলে ক্রমশ বাবাব উপস্থিতি অস্বস্তির কারণ হযে উঠতে লাগল। আর কিছু না হোক, আডালে যে বাবাকে নিযে পাঁচজনে পাঁচ বকমেব বসিকতা কবে সেও মায়ের ভালো লাগত না। স্ত্রী অভিনয় কবছে আব স্বামী সাক্ষীগোপালেব মতো বসে তাকে পাহাবা দিচ্ছে, এ কাব ভালো লাগে? লোকে আডালে অন্তত হাসি ঠাট্টা করবেই।

বাবাকে মা সেটা বোঝাতে চেষ্টা কবেছে। বলেছে, এখন আর তোমাব বোজ এত সময নষ্ট কবাব দরকার কি, নিজের কাজকর্মে এবাবে একটু মন দাও না।

মা এ-কথা বললেই বাবার দু'চোখেব চাউনি ধাবালো হযে উঠত নাকি। টাকা পয়সা আদাযের ব্যাপাব না থাকলে নিজে থেকেই স্টুডিওয আসা কমাতে হল তাকে। আউটডোর শুটিং এর জন্য আগে যখন দু'-পাঁচ দিন বাইবে কাটাতে হত, বাবা সঙ্গে না থাকাতে মা অসহায় বোধ করত। কিন্তু মা পবে আভাসে ইঙ্গিতে বাবকয়েক আপত্তি জানিয়ে শেষে সরাসরি একদিন বলে দিল, তোমার আসার দবকাব নেই, এবার থেকে মালতীদিকে নিয়ে যাব।

মালতী মাসি হেসে হেসে গল্প করত, কুটকুট করে তোর বাবার সঙ্গে মা কি ঝগডাই না করত। আর তোর বাবা ফুঁসতে থাকত।

বাইবে যাবাব ব্যাপাবেও ছেঁটে দিতে চাওযাব ফলে বাবা বাগত গম্ভীব মুখে জিজ্ঞাসা কবেছিল, কেন, আমি সঙ্গে থাকলে তোমাব অসুবিধে হয?

একটু হয। ঠিক মতো কাজে মন দিতে পাবি না।

আগে তো পাবতে?

মা জবাব দিযেছিল, আগেব অভিনযেব মান ছাডিযে যেতেই চাই। তাছাডা নিজেব কাজকর্ম ছেডে সবসময স্ত্রীব সঙ্গে সঙ্গে ঘুবলে—লোকে বলে কি?

মা কথা কাটাকাটি কমই কবত, কিন্তু কি চায না চায, সেটা স্পষ্ট কবে বুঝিযে দিত।

মালতী মাসি অবশ্য এক এক সময মাযেব দিক টেনেও কথা বলত। তোব বাপেবও বুদ্ধিব দোষ, আগে তোব মাকে ফিল্মস্টাব বানাবাব জন্য ওই লাইনেব পযসাওযালা লোকদেব কতভাবেই না তোযাজ তোষামোদ কবেছে। তখন এত উদাব যে কোনো পার্টি থেকে তোব মা বাত বাবোটায কাবো গাডিতে বাডি ফিবলেও টুঁ শব্দটি কবে নি, আব যেই টাকাব বৃষ্টি শুরু হযেছে মাথায অমনি শেকলে বাধাব মতলব তোব মাকে—তাও কখনো হয।

মালতী মাসিব মুখে শুনেছি, চাব বছব বযসেব সময আমাব একটা বোন হযেছিল, সেই বোনকে আমি চোখে দেখি নি কখনো। মা দিনকযেক মাত্র বাডি ছিল না, বাইবে শুটিং থাকলেও তো দু'-পাঁচদিন কবে হামেশাই বাডি থাকে না, কোথায গেছল, আমি কি কবে জানব? .নার্সিং হোমে মবা বোন হযেছিল আমাব, সেখান থেকেই সব ঝামেলা চুকেবুকে গেছে। কিন্তু বোন আসাব ব্যাপাবেই নাকি বাবাব সঙ্গে মাযেব ঝগডা লেগেই থাকত। মাযেব জন্য তখন নাকি তিন-চাব মাস ধবে অনেকেব অনেক টাকা লোকসান হযেছে —কাবণ মা তো তখন আব কাজ কবতে পাবে নি, তিন-চাবটে ছবি আধা-আধি শেষ কবে ফেলে বাখতে হযেছিল। সেইজন্যেই নাকি বাবাব সঙ্গে মাযেব তখন অত ঝগডা।

মনে মনে আমি তখন নানাবকম কল্পনা কবতাম। ওই অদেখা বোনেব ওপব আমাব ভাবী মাযা পডে গেছল। সে নিশ্চয মাযেব ওপব বাগ কবে একেবাবে মবে জন্মেছে। মা আমাকেও চায নি, ওকেও চায নি। আমিও যদি ওই অদেখা বোনেব মতই মাযেব ওপব শোধ নিতে পাবতাম! মবে জন্মাতে পাবি নি, কিন্তু এখন যদি মবে যাই? লোকে মবে যায কি কবে, সেও তখন আমাব কাছে আবাব এক গবেষণাব বস্তু।

নার্সিং-হোম থেকে ফিবে এসেই মা আমাকে নিযে ঘব বদল কবেছে। বাগেব চোটে বাবা নাকি বাডিতেই ছিল না ক'দিন। আব তাবপব থেকেই বাডিতে বসে মাযেব চোখেব ওপব মদ খাওযা ধবেছে। কিন্তু শক্ত ধাতেব মা আমাব, ও-সবে পবোযা কবাব মেযে নয।

এই ঘব টিকবে না, বাবা তাব ঢেব আগে থেকেই বুঝেছিল। গোঁ ভবে যা-ই কবুক, বুদ্ধি নেই তাব, এ-কথা কেউ বলবে না। মাকে একটি কথাও না বলে খুব গোপনেই সে আবাব নিজেব ভবিষ্যৎ নির্বিঘ্ন কবে তুলতে চেযেছিল। মাযেব বোজগাবেব টাকা তখন মা আব বাবাব দু'জনেব নামে ব্যাঙ্কে জমা হত। ইচ্ছে কবলে দু'জনেব যে কোন একজন সেই টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে পাবত। তাছাডা সমস্ত টাকাই ব্যাঙ্কে

থাকত না, ইনকাম ট্যাক্সের হানাদারী ঠেকাবার জন্য অনেক কাঁচা টাকা ঘরেও মজুত থাকত। এতদিন পর্যন্ত ব্যাঙ্কের চেক-বই আর ঘরের টাকা সবই বাবার হেপাজতে ছিল। মালতী মাসির ধারণা, বাবার মস্ত এক ইলেকট্রিক্যাল কারখানা ফেঁদে বসার ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তার আগে ব্যাঙ্কে নগদ মিলিয়ে লাখ চারেক টাকা ছিল। কিন্তু টাকার খোঁজ পড়তে দেখা গেল, চারশ' টাকাও নেই।

জানাজানি হয়ে গেল এই বাড়ির জমিটা কেনার সময়। জমিটা দেখে মায়ের তো পছন্দ হয়েই ছিল, বাবারও অপছন্দ হয় নি। পাঁচ কাঠা জমি, এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা দাম।

মা বলল, কিনে ফেলো।

বাবা বলল, কিনব কোত্থেকে, টাকা নেই।

মা অবাক। টাকা নেই মানে?

মানেটা বোঝার পর মা স্তব্ধ একেবারে। মালতী মাসি পর্যন্ত দু'-তিনদিন তখন মায়ের সঙ্গে একটা কথা বলতেও সাহস করে নি।

পাঁচ-দিনের মধ্যেই শুধু মায়ের নামে এই জমি কেনা হয়েছে। তখন তো টাকার থলে নিয়ে মায়ের পিছনে লোক ঘুরছে। গোটা তিনেক ছবির আগাম বায়না নিতে সমস্যা মিটেছে। কিন্তু ঘরের সমস্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। বোকা তো মাও নয়, ওই অতবড় কারখানা চালু করতে বাবার বড় জোর লাখ দুই টাকা লেগেছে। বাকি সব টাকা সরিয়ে বাবা যে শুধু নিজের দখলে রেখেছে, সেটা বুঝতে বাকি থাকে নি। মা এরপর সমস্ত পার্টিকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রাপ্য টাকা শুধু তার হাতেই দিতে হবে আর কাউকে নয়। কন্ট্রাক্টর এসে এই জমিতে বাড়ি তোলার কাজে হাত দিয়েছে। তখনো মা একদিনের জন্যেও বাবার সাহায্য চায় নি। বাড়িও মায়ের নামে হয়েছে।

মালতী মাসির অনুপ্রাস আর ব্যঞ্জনা স্মরণ না করেও তার পর থেকে এই সরকারবাড়ির জীবন-যাত্রা আমি অনায়াসে কল্পনা করতে পারি। একসঙ্গে বিশ্বাস আর টাকার ওপর দখল খুইয়ে বাবা বেপরোয়ার মতো এরপর মায়ের ওপর দখল নেবার জন্য যে মরিয়া হয়ে উঠছিল, তার নজির তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি একদিন। বাবা এই মেজাজেরই লোক। তাছাড়া যে বস্তুটার দংশনে এ-যাবৎ বহু প্রেমিক-প্রেমিকার ঘর ভেঙেছে দুনিয়ায়, সেই ঈর্ষার কীট-দংশনই সর্বদাই তখন বাবার মগজেও কেটে বসছিল মনে হয়। সেই পয়সাওয়ালা ঈর্ষার মানুষ যারা, এ-বাড়িতে তাদেরও আমি অনেক দেখেছি।

আরো একটা সত্য আমার কাছে স্পষ্ট। বাবাকে মা ভয় করত। সমীহ করত না, শ্রদ্ধা করত না, শুধু ভয় করত। আর ঘৃণা করত। কত যে ঘৃণা করত, সেটা মায়ের দু'চোখে উপচেও উঠত সময় সময়। কিন্তু ঘৃণার দরুন মা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়নি, গেছে ভয়ে। নিজের বাড়ি, ভয় না করলে অনায়াসে বাবাকেই তো বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে পারত। আদালতে খুব সংগোপনে বাবা-মায়ের বিয়ে নাকচ হয়ে গেছে। কিন্তু এ-সব খবর গোপন থাকে না। বাবাকে ভয় না করলে এ ফয়সালাও মা এ-বাড়ির ওপর দখল রেখেই করতে পারত।

* * * *

মা চলে যাবার পব দিনকতক এক অব্যক্ত হাহাকারের মধ্যে কাটিয়েছি আমি। নানারকম ক্ষোভের আকারে সেটা প্রকাশ পেত। দিনগত সমস্ত ব্যাপাবে আমার রুদ্রমূর্তি। বাবা টের পেলে ঠাস ঠাস চড় বসিয়ে দিত গালে, তার শক্ত হাতের আঙুলের দাগ বসে যেত। মাযেব ওপর আমার রাগ, কিন্তু আরো ছেলেবেলা থেকে ওই বাবার ওপর আমাব বিদ্বেষ।

সেই মানসিক অবস্থার মধ্যেও একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছি। যে মালতী মাসি মা বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে পর্যন্তও বাবাব মুখোমুখি পড়ে গেলে ভয়ে চুপ মেবে থাকত, মা যেদিন থেকে আর বাড়ি ফিবল না, সেই বাতেও বাবা কথা শোনার জন্য তাকে ঘবে ডাকতে ভযে কাঠ হযে যেতে দেখেছি—সেই মাসি কিনা এরই মধ্যে দিব্যি সহজ হাসিমুখে বাবার ঘবে চলে যায, তাব সঙ্গে কথা-বার্তা বলে, এমন কি নাওযা-খাওযা বা স্কুলে যাওয়া নিযে আমি বেশি গোঁয়ার্তুমি করলে বাবাকে বলে দেবে বলে শাসাযও। সেদিনেব সেই অপবিণত মনও আমাকে বলে দিযেছে, মালতী মাসি যতই ভালবাসুক আমাকে, মা চলে গেছে বলে ওই মাসি আমাব মতো ব্যথা একটুও পায নি। বোজকার মতো তার পরেও সে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে গেছে, কিন্তু একদিনেব জন্যও মাযের ওই জায়াগাটা আমি তাকে দখল করতে দিই নি।

বাইবে আমাব উগ্র ভাবটা দিন পনেবোব মধ্যে কমে এলো। ভিতবে যে ফাঁকা যন্ত্রণাটা থিতিযে থাকল, সেটা কেউ দেখতে পায় না।....কি জন্যে স্কুলেব ছুটি ছিল সেদিন। দুপুবে মাসি চুপি চুপি আমাকে জিজ্ঞাসা কবল, এই, তোব মাযেব সঙ্গে দেখা করতে যাবি?

আমি চমকে উঠলাম। মা কোথায?

আছে এক জাযগায়। যাবি তো চল, তোব মাযেব আজ ছুটি। বিকেলে তোব বাবা আসাব আগেই চলে আসব আবাব। খবর্দাব, তোর বাবাকে একটি কথাও বলবি না!

আমি চুপচাপ খানিক মাসিব মুখখানা দেখে নিলাম। মা কোথায আছে আব আজ ছুটি, তুমি জানলে কি কবে?

একটু আগে তোব মা ফোন কবেছিল, আগেও দুই একদিন ফোনে তোব খবব নিয়েছিল।

আমি চেঁচিযে উঠলাম, আমাকে তুমি কিচ্ছু বলো নি কেন? কেন বলো নি? দাও, আমাকে ফোন নম্বব দাও।

আমার রাগ দেখে মাসি গায়ে পিঠে হাত বোলাতে এলো। ছিঃ বাগ কবতে হয় না, তোর মা যে তোকে ফোন নম্বর দিতে বারণ কবেছে।

একটা দগদগে ক্ষতেব ওপরে যেন আগুন ছিটিয়ে দিল কেউ। ঠিক আছে, আমি যাব না, মা-কে বলে দাও, সুমন মবে গেছে!

ছুটে চলে এসে নিজের বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম। একটু পরে মাসি আবাব গায়ে-পিঠে হাত বোলাতে এলো, আমি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা কবলাম।

লক্ষ্মী মাণিক, অমন করে না, মাসির মিছরি-ভেজানো গলা একেবারে, তোর মা যে তোকে ডেকেছে, তুই যাবি বলে আজ কোথাও বেরুচ্ছে না—না গেলে এমন রাগ করবে যে আর কোনদিন হয়তো তোর সঙ্গে দেখাই হবে না—চল, চটপট ঘুরে আসি, সন্ধ্যার আগেই আবার ফিরে আসতে হবে তো।

উঠে বসলাম। মুখ গুঁজে পড়ে থাকলেও চোখ দিয়ে আমার জল গড়াচ্ছিল না। ভিতরে যা-ই হতে থাকুক, ওই বয়স থেকেই চোখ আমার খরখরে শুকনো। রাগ পড়ে নি, কিন্তু মা-কে দেখবার জন্য ভিতরটা আমার লালায়িত।

ট্যাক্সি থেকে নেমে আমার হাত ধরে একটা মস্ত বড় বাড়িতে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকর আর একটা দারোয়ান গোছের লোক ছুটে এলো। আমাদের খুব খাতির দেখিয়ে দোতলায় নিয়ে গেল।

দোতলায় উঠেই দেখি, একটা ঘরের সামনে মা দাঁড়িয়ে। সেই মা—পিঠের ওপর খোলা চুল, পরনে সাধারণ একটা ফর্সা শাড়ি, বাড়িতে যেমন পরত।

বয়স আমার মাত্র সাত তখন, তবু মায়ের কি বেশ ব্যগ্র মুখ দেখেছিলাম আমি? মনে হয়, দেখেছিলাম। আর দেখেছিলাম বলেই আমার ভিতরের অভিমান অমন চাড়িয়ে উঠেছিল।

এসো মালতীদি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত ধরে মা আমাকে একটা মস্তবড় ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। আলনায় শাড়ি-টাড়ি দেখে বুঝলাম, এটাই মায়ের শোবার ঘর এখন। আমাকে বিছানায় বসিয়ে গা ঘেঁষে মা-ও বসল। মালতী মাসি আমাদের সামনেই একটা গদি-আঁটা মোড়া টেনে নিল।

দিব্যি হাসিমুখে মা জিজ্ঞাসা করল, আমার ওপর বুঝি খুব রাগ হয়েছে তোর।

আমি জবাব দিলাম না।

তোর মাসি বলছিল, তুই খুব লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গেছিস, একটুও দুষ্টুমি করিস না, সকলের কথা শুনিস—'

অভিমান ও রাগ বাড়ছে। কেন যে প্রতিবাদ করা একান্ত দরকার হল, জানি না। মাসি মিথ্যে কথা বলেছে।

ও মা, সে কি রে! মায়ের গলার স্বরে তখনো হাল্কা কৌতুক।

আগের থেকে আরো বেশি দুষ্টুমি করি, কারো কথা শুনি না।

মা আমার দিকে চেয়ে রইল, হাসিমাখা চাউনি, কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে যেন ভিতরটা দেখে নিচ্ছে। ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করিস তো?

না।

পড়াশুনা?

বই ছুঁইও না।

খুব খারাপ কথা, মা গম্ভীর একটু, পড়া না পারলে স্কুলে রকে না?

খু-ব। বাড়ির মাষ্টারমশাই সেদিন কানটা ছিঁড়ে নিচ্ছিল প্রায়।

কেন যে কথা ক'টা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কে জানে। বলার পর মনে হল, শুনে মা যেন একটু যন্ত্রণা বোধ করল। মা থাকতে বাড়ির মাষ্টার সত্যিই কোনদিন

আমাব গাযে হাত দেয নি। মাষ্টাবমশাযেব কাছে আমাব অপবাধেব প্রসঙ্গ অনুক্ত থাকল। তিনবাব কবে বলাব পবেও আমি যখন পড়ায মন দিচ্ছিলাম না, মাষ্টাবমশাই জোব কবে আমাব মাথাটা বইযেব দিকে ফিবিযে দিযেছিল, আব আমি তখন হঠাৎ বেগে গিযে বিকটভাবে তাকে ভেংচি কেটে উঠেছিলাম।

মা মালতী মাসিব দিকে তাকালো একবাব। চাপা গলায হুকুম কবল, গাযে হাত তুলতে বাবণ কবে দিও।

শোনামাত্র আমাব বাগ আবাব শযতানিব আকাবে চাড়া দিযে উঠল। আমাব ওপব গঞ্জনাটা মাযেব একটু যন্ত্রণাব কাবণ, সেটা আবো স্পষ্ট কবে বোঝা গেল। বললাম, মাষ্টাবমশাই কি এমন গাযে হাত তোলে, বাবাব এক-একটা চড খেযে প্রাযই মাথা ঘুবে পড়ে যেতে হয—

মাযেব চোখে-মুখে এবাবেব যন্ত্রণা দেখে আমি বীতিমতো আনন্দ পাচ্ছি। এই যন্ত্রণা বাগ হযে জমাট বাঁধছে। মাসিব দিকে তাকিযেছি আবাব।

মালতী মাসি যেন বেশ অস্বস্তি বোধ কবছে। মাযেব চোখ এড়িযে আমাব দিকে ফিবল, তুই বেশি বেশি বলিস না তো।

বেশি বেশি। সামান্য কথাযও কেন যে এত বাগ হচ্ছে আমাব, জানি না। প্রথম দিন চড খাবাব পব জল দিযে ঘষে আমাব গাল থেকে তুমি বাবাব আঙুলেব দাগ তুলতে চেষ্টা কবো নি, বাবাব চামাবেব হাত বলোনি? মাযেব দিকে ফিবলাম, মাসি তো এখন বাবাব দিক টেনে বলবেই, বাবাব সঙ্গে খুব যে এখন—

নিঃশব্দে কিছু একটা চকিত কাণ্ড হযে গেল, মনে হল। মাসি যেন ধড়ফড কবে উঠল, তাব কালো মুখখানা শুকিযে আমসি। আব মাও যেন স্বস্তি বোধ কবছে না একটুও। জোব কবেই যেন বিস্মিত দু'চোখ মাসিব দিকে ফেবালো।

মালতী মাসি খানিকটা আমতা আমতা কবে বলল, তুমি নেই, তাই আমাব কাছ থেকেই সর্বদা ওব ঘবোযা খবব নেয..

মৃদু-কঠিন স্ববে মা জিজ্ঞাসা কবল, কিন্তু ওকে হঠাৎ এত শাসন কবাব দবকাব হযে পড়ল কেন?

দিনকতক ভযানক দুষ্টুমি কবছিল আব অবাধ্য হযেছিল, খাওযা দাওযা কবছিল না, স্কুলে যাচ্ছিল না—

তুমি যে ফোনে বলতে, খুব ভালো হযে আছে ও, ওব জন্যে কিছু ভাবতে হবে না?

তেমনি বিব্রত মুখ কবে মাসি জবাব দিল, গোডায ক'টা দিন খুব অবাধ্যপনা কবছিল, এখন আব কবে না...অশান্তিব মধ্যে আব তোমাব ভাবনা বাড়াতে চাই নি বলে বলিনি।

জবাবদিহি শোনাব পবেও মাকে একটু তুষ্ট মনে হল না। বাগ সত্ত্বেও ভিতবে ভিতবে আমাব এক ধবনেব আনন্দ হচ্ছে।

মা আবাব আমাব দিকে ভালো কবে ঘুবে বসল। এত দুষ্টুমি কবিস কেন?

বেশ কবি।

আগে মুখের ওপর এমন কথা কখনো বলেছি কিনা, মনে পড়ে না। অবাধ্য হলে মায়ের দুই ভুরুর মাঝে যেমন বিরক্তির ভাঁজ পড়ত, আর চাউনির মধ্যে যেমন বকুনি মিশে থাকত—তেমনি দেখছি।

ফের এ-রকম শুনলে খুব রাগ করব।

পিছনে কিসের শব্দ হতে ঘুরে তাকালাম। একটা চাকর ছোট টেবিল পেতে দিল, আর একজনের হাতে মস্ত দুটো খাবারের ডিশ। আমার সাত বছর বয়সের মগজে তক্ষুনি আবার একটা দুষ্টুমির ছাপ পড়ে গেল। আমি জানি, এখন কি করলে মা আরো কষ্ট পাবে। কিন্তু তার আগে আমার কিছু বুঝে নেবার আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কি করে রাগ করবে, শুনবে কি করে?

তুই কখন কি করিস, না করিস, এখানে বসেই আমি খবর পাব।

তুমি আর বাড়ি যাবে না?

না।

আমাকে এখানে থাকতে দেবে?

মা যেন থতমত খেল একটু। তা কি হয়, ওটা আসলে তোরই নিজের বাড়ি, খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকবি, ভালো করে পড়াশুনা করে বড় হবি।

আমি কিচ্ছু হব না, কিচ্ছু না। যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াব, তুমি যত খুশি রাগ করো। ছিটকে উঠে দাঁড়ালাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে আরো কি যে হয়ে গেল, কে জানে—এক ধাক্কায় ছোট টেবিলের খাবার ভর্তি ডিশ দুটো উল্টে ফেলে দিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সোজা নিচে, তারপর গেটের বাইরে।

মালতী মাসিও পিছন পিছন ছুটে এসেছে। খপ করে একটা হাত ধরেছে আমার। হাত ছাড়াবার অজুহাতে আমি সরোষে ঘুরে দাঁড়িয়েছি।. মা দোতলার বারান্দায় রেলিং-য়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকেই চেয়ে আছে। ভেবেছিলাম, হাত নেড়ে আবার ডাকবে আমাকে। ডাকল না। শুধু চেয়েই রইল। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

বাড়ি ফেরার আগেই বোঝা গেল মাসি কত চটেছে আমার ওপর। সমস্ত পথ একটি কথাও বলল না। সন্ধ্যায় বাবার ঘরের দিকে যেতে দেখলাম তাকে। কি কথা হল, জানি না, তার খানিক বাদে বাবা আমার ঘরে এলো, আগে হলে ওই মুখ আর ওই চাউনি দেখে, ভয়ে কেঁপে উঠতাম আমি।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে আমার ভয় ডরের লেশমাত্র নেই।

মায়ের কাছে গিয়ে কি বলেছিস? আর অমন অভদ্রতা করে এসেছিস কেন?

আমি চুপ। বাবার দিকে চেয়ে আছি। আমাকে পিটতে এসেছে, তাও বেশ ভালই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার সব ভয় যেন ঘৃণা হয়ে কিলবিল করছে ভিতরে।

বাবার হাত দুটো পিছনে ছিল। সেই হাত সামনে আসতে দেখলাম, মুঠোর মধ্যে তার শৌখিন চাবুকটা। হ্যাঁচকা টানে আমাকে কাছে নিয়ে এলো।

তার পরেই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল একটা। চাবুকসুদ্ধু বাবার হাত উঠল, নেমেও এলো, তার আগেই আমি চোখ বুজে ফেলেছিলাম। কিন্তু ওটা আমার গায়ে না পড়ে শপাং করে আর কারো গায়ে পড়ল যেন। ভালো করে কিছু বোঝার আগেই মালতী

মাসি আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে সরে গেল। তারপর দু'হাতে আমাকে জাপটে আগলে রেখে বাবার দিকে ঘুরে তাকালো।

ছাড়ো বলছি। বাবা চাপা গর্জন করে উঠল।

আমি অবাক। মাসির দিকে চেয়ে আর মাসির কথা শুনে। এ কি সেই মাসি, ক'দিন আগেও যে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকত। মাসির কালো মুখও রাগে থমথম করছে। হাত ধরা অবস্থায় আমাকে পিছনে রেখে ঘুরে দাড়াল। বলল, ওর মা অনেক জেনেছে, এও জানতে বাকি থাকবে না।

বাবা চেঁচিয়ে উঠল, আই ডোন্ট কেয়ার, তুমি সরো।

মাসি সরল না, নড়ল না। পিছন না ফিরে আমাকে বলল, সুমন চলে যা এখান থেকে—

আমি যতো ত্যাঁদড়ই হই, বয়স তো মাত্র সাত। পালাবার ফাক পেলে কে আর সেধে মার খেতে চায়। পিছনের দরজার পর্দা ঠেলে প্রস্থান করলাম। পিছনের ঘরটা অন্ধকার। নিরাপদ ব্যবধানে এসে আমার পা আর নড়ল না। আলো না জ্বেলে ঘুরে দাঁড়ালাম।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দু'জনকেই দেখা যাচ্ছে। বাবা আর মালতী মাসি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে চাবুকের এক ঘা মাসির ওপর পড়েছে, এখন আবার কি হয়, কে জানে।

মাসির গলায় এই সুরও অদ্ভুত যেন।—হঠাৎ ওকে শাসন করার দরকার হল কেন?

বাবা ঝাঁঝিয়ে উঠল, তা দিয়ে তোমার কি দরকার?

দরকার আছে। তখন যা সব বললাম সেটা তোমাকে সাবধান করার জন্যে, ওকে শাসন করার জন্যে নয়। মা চলে যেতে ছেলেটা ভিতরে ভিতরে পুড়ছে, চাবুক নিয়ে ওর ওপর বিক্রম দেখাতে লজ্জা করা উচিত।

মাসির কথা শুনে আমার কান জুড়োলো বটে, কিন্তু আমি তাজ্জবও তেমনি। মালতী মাসি বাবাকে তুমি করে কথা বলছে!

সেই রাতেই আবার মাসিকে অদ্ভুত ভালো লেগেছে আমার। রাত্রিতে যখন আমাকে ঘুম পাড়াতে এলো, তার বুকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার লোভও ভিতরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল।

আসলে আমার সব দুষ্টুমি আর শয়তানির লক্ষ্য মা। অর্জুন যেমন আর একদিকে চেয়ে লক্ষ্যভেদ করেছিল, আমার সমস্ত আচরণও তেমনি যে পথেই ধাওয়া করুক, আসলে সেগুলো মায়ের বক্ষ ভেদ করতে চেয়েছিল।

দিন গেছে, মাস গেছে, একটা দুটো করে গোটা কয়েক বছর ঘুরেছে, কিন্তু আমার ভিতরটা ঠাণ্ডা হওয়ার বদলে সর্বদাই মাকে আঘাত করতে চেয়েছে। মা আমার খোঁজ খবর করে, আমার ভালো শুনলে খুশি হয়, মন্দ শুনলে দুঃখ পায়, এটা টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভালোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছেঁটে দিতে ইচ্ছে করেছে। আমি

কি কবলে মা কষ্ট পাবে, যন্ত্রণা পাবে, তাব নতুন নতুন বাস্তা বাব কবতে পাবাটাই যেন মস্ত কাজ।

পবেব পাঁচ-ছ' বছবেব মধ্যে মাযেব কাছে আবো অনেক বাব গেছি। মালতী মাসি যখনই বলে, চল তোব মাযেব ওখান থেকে ঘুবে আসি একটু, তক্ষুনি বুঝতে পাবি, মা আমাকে দেখতে চায়। মাসিব বেশি আগ্রহ দেখলে ভিতবেব হাজাব লোভ চেপে না গিযে মাযেব ইচ্ছেটাই যেন বববাদ কবে দিযেছি। মা যদি বলে ডাইনে যেতে আমি অবধাবিত বাঁযেব বাস্তা ধবব, যদি বলে উত্তবে হাঁটতে, আমাব পা দক্ষিণে ছোটাব জন্য সুডসুড কববে।

ভিতবেব এই পুঞ্জীভূত আক্রোশ থেকে কোনদিন মুক্তি পাব কিনা, জানি না।

এ-ক'বছবেব মধ্যে একে একে দুটো বাড়িতে বাস কবতে দেখেছি, মা-কে। সেই বাড়িতে অন্য পুরুষ মানুষও দেখেছি। ব্যাপাবটা বুঝতে আমাব একটুও সময লাগে নি। সেই দুটো বাড়িব দুই কর্তাই আমাকে আদব কবে কাছে টানতে চেযেছে। না, তাদেব সঙ্গে সামনাসামনি কোন বকম অভদ্র আচবণ কবতে পাবিনি। সেটা কবেছি মাযেব সঙ্গে। মা কখনো বিবক্ত হযেছে, কখনো বেগে গেছে, কখনো বা অসহায বোধ কবেছে। আমাব ব্যাপাবে মাযেব ভিতবেব প্রতিক্রিযা আমি মুখেব দিকে তাকালে অনুভব কবতে পাবি। বাবো-তেবো বছব মাত্র বযস তখন, আমাব খণ্ডিত সত্তাব বহির্মুখী অংশ ওই বযসটাকে অনেক ছাড়িযে গেছে।

একগাদা মন্দ ছেলে আমাব সঙ্গী-সাথী তখন। পাজি ছেলেদেব সঙ্গে মিশলে মা মন্দ বলে, বাবাও বাগ কবে। অতএব ওবাই প্রিয আমাব। তাছাড়া সঙ্গবদ্ধভাবে শযতানি কবাব মধ্যে এক ধবনেব বোমাঞ্চ আছে। তাবা আমাকে লুকিযে সিগাবেট খেতে শিখিযেছে, মেযেদেব বহস্যেব দিকে তির্যক দৃষ্টি হানতে শিখিযেছে। এদেব মধ্যে সব থেকে পাকা ছেলে জিতু, জিতেন পোদ্দাব। বযসে আমাব থেকে বছব তিনেকেব বড হবে, গাযে শক্তিও বাখে তেমনি। বছব দুই ফেল কবে আমাব সহপাঠী হযেছে। স্কুলেব মার্কামাবা ছেলে হযে উঠেছিল সে এবই মধ্যে। মিশনাবি স্কুল, তাই ফিবিঙ্গী বেস্টব সাহস কবে ওকে স্কুল থেকে তাড়াতে পেবেছে। এখন তাব পাড়াব স্কুলে ভর্তি হযে আবো মাতব্বব হযে উঠেছে। আমাদেব খুদে দলেব লিডাব সে-ই।

আমাব সঙ্গে খাতিব—কাবণ আমি ওকে সিনেমা দেখা, সিগাবেট আব চপ কাটলেট খাওযাব খবচ জুগিযে থাকি মাঝে মাঝে। কোনো একটা দবকাবেব অজুহাতে টাকা চাইলেই মাসি দেয। আমাব ধাবণা, ধাবণা কেন, আমি ঠিক জানি, মা তাব হাতে আমাব জন্যেই টাকা দেয। আমাব স্কুল-বই-খাতা-জামাকাপড ইত্যাদিব যাবতীয খবচ এখনো নিশ্চয মা দেয বলে বিশ্বাস।

সেই জিতু পোদ্দাব হঠাৎ সকলেব সামনে এক চোখ বুজে আমাকে ডাকল, এই শোন—

কাছে যেতে জিজ্ঞাসা কবল, তোব মা এখন কাব সঙ্গে থাকে রে?

শোনামাত্র আমাব মাথাব মধ্যে কি-যে হযে গেল, কে জানে। আমি পাগলেব মতো ঝাঁপিযে পড়লাম ওব ওপব, সঙ্গে সঙ্গে ঘুষি-চড-লাথি।

আচমকা আক্রান্ত হয়ে ও হকচকিয়ে গেছল। কিন্তু এমন মান্যগণ্য লিডার, স্তাবকদের সামনে এ-অপমান হজম করার পাত্র নয় সে। ওর বাবা পর্যন্ত এখন এ-ভাবে গায়ে হাত তুলতে সাহস করে না। সামলে নিয়েই এক ঘুষিতে আমাকে চিৎপাত করে ফেলল।

তারপর...

তারপর আমার মুখ আর মাথা মাটিতে থেঁতলে দিতে লাগল। আমার চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু হিংস্র জানোয়ারের মতো ও আমাকে একেবারে শেষ না করে ক্ষান্ত হবে না বুঝি। আমার নাক-মুখ বেয়ে ভাসছে।

কোন রকমে টলতে টলতে বাড়ি ফিরলাম যখন, আমাকে দেখে মাসি আর্তনাদ করে উঠল। তারপর আর আমার কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হতে দেখি, ডাক্তার আমার মাথায় আর কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। পাজি ছেলের সঙ্গে মারামারি করে এই দশা হয়েছে আমার সেটা বাবা নিজেই বুঝে নিয়েছে হয়তো। দাঁত কড়মড় করে বলে উঠেছে, শিক্ষা হয়েছে তো? বেশ হয়েছে, আর মিশতে যাবি ওই সব ছেলের সঙ্গে?

পারলে বাবা আমাকে ধরে আর একপ্রস্থ লাগায়।

জিতুর সঙ্গে মারামারির কারণটা মাসিকে বলেছি। জানি, মাসিকে বললেই মায়ের কানে যাবে। আমার সর্বব্যাপার সে মা-কে বলে থাকে। আমি চাই, মা-ও শুনুক। দিন কতক বাদে যখন মায়ের সঙ্গে দেখা, তখনো আমার মাথার আর কপালের দু'তিন জায়গায় পট্টি। মা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। কি হয়েছে বা কেন হয়েছে, একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না বলেই ভিতরে ভিতরে এক ধরনের নিষ্ঠুর আনন্দ আমার। মাসি বলেছে, কেন কি হয়েছে সবই বলেছে।...ও ক্ষত সারাবার জন্য পরে মস্ত সার্জন এসেছে, মাথার এক্সরে করা হয়েছে। এ-সব কার তাগিদে আর কার টাকায় হয়েছে, তা আমি এখন বুঝতে পারছি।

মা শুধু বলেছে, তুই ও-সব ছেলের সঙ্গে মিশিস কেন?

এটুকুর মধ্যেই আমার জন্য তার উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। তাইতে ও ক্রুর আনন্দ আমার, অঘটন এর থেকে বেশি হলেও অখুশি হতাম না বোধ হয়। ভালো মুখ করে বলেছি, কেন, জিতু তো বেশ ভালো ছেলে, যেমন সাহস তেমনি গায়ের জোর— আমারই খামোখা বিচ্ছিরি রাগ হয়ে গেল বলে ও-রকম হল।

মা চুপ। আর একটি কথাও বলে নি। মুখের দিকে চেয়ে আমার ভিতরের বয়সটা যে অনেক এগিয়ে গেছে, তাই যেন অনুভব করেছে।

ওই তেরো বছর বয়সেই বুকের তলায় আবার একটা আকস্মিক ক্ষত সৃষ্টি হল। আমি যদি ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারতাম, মাটিতে মাথা ঠুকতে পারতাম, তাহলে আবার হয়তো স্বাভাবিক হয়ে ওঠা সহজ হত। আমার খণ্ডিত সত্তা, যে ওই সাত বছর বয়সের মধ্যে আটকে আছে, সে তাই করছে। কিন্তু আমি তা পারি না। সেইজন্যেই আমার ক্ষোভের শেষ নেই, দুর্ভোগের অন্ত নেই।

মালতী মাসি চলে গেছে। আমি দ্বিতীয় বাব মা হাবিয়েছি।

কিছুদিন ধবেই খুব গম্ভীব দেখছিলাম তাকে। বেশ বিমনাও। মাঝে মাঝে আমাব দিকে কি-ভাবে যেন চেয়ে থাকত। দুটো চোখেব করুণ তৃষ্ণা আমাব শবীবটাকে যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত। বাতে ঘুম পাড়াতে এসে গল্প কবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি মনে হলে খুব আলতো কবে আমাকে বুকে চেপে বাখে, যাতে আমাব ঘুম না ভাঙে।

মাসি একদিন বলল, হ্যাঁ বে, যদি আমি আব না থাকি, তোব খুব কষ্ট হবে?

আমি ফিবে জিজ্ঞাসা কবলাম, কোথায যাবে?

যদি যাই কোথাও। ধব, যদি মবেই যাই—

সে তো আমিও না থাকতে পাবি, আমিও মবে যেতে পাবি।

বালাই ষাট। মাসি দু'হাতে আঁকড়ে ধবল আমাকে। আমি বাধা দিলাম না। সেটাই যেন তাব সুখেব ব্যাপাব কিছু।

জিজ্ঞেস কবলাম, তুমি ও-কথা বললে কেন?

এমনি।

এমনি কক্ষনো না, কি হযেছে তোমাব বলো? তুমি হঠাৎ ভযানক বদলে গেছ।

খানিক চুপ কবে থেকে বলল, মনটা একটু খাবাপ বে, তোব নতুন মা আসছে, তোব জন্যই ভাবনা হয।

আমি হতভম্ব খানিকক্ষণ। কথাটা বোঝাব মত বযস বা বুদ্ধি হযেছে। নতুন মা আসছে মানে বাবা আবাব বিযে কবছে। নাড়াচাড়া খাবাব মতই খবব বটে একটা। কিন্তু তাব জন্য মাসিব এত ভাবনাচিন্তাব কাবণ কি, সেটাই আমাব কাছে স্পষ্ট নয খুব। অথচ এখন যেন মনে হচ্ছে, দিন কতক ধবে মাসিব সঙ্গে বাবাব বাক্যালাপও বন্ধ।

বললাম, তাতে তোমাব কি, আব আমাব জন্যে তোমাব ভাবনাই বা হবে কেন?

মাসি জবাব দিল, তোব নতুন মা এসে আমাকে এ-বাড়িতে না থাকতে দিতে পাবে।

আমাব হাসি পেল, মাসি আমাকে কি ছেলেমানুষই ভাবে। বললাম, নতুন মা তাড়াবাব কে, আমবা বাবাব খাই, না পবি, না বাবাব বাড়িতে থাকি?

মাসি সচকিত হঠাৎ। এ-সব কথা তোকে কে বললে?

কে আবাব বলবে। তুমিই কত সময়ে গল্প কবেছ। মাযেব টাকা ভেঙে বাবাব ব্যবসা, বাড়িও মাযেব, আব তোমাব হাতে মা যে মাসে মাসে টাকা দেয, সেও আমি খুব ভালোই বুঝি।

মাসি হাঁসফাঁস কবে উঠল, কক্ষনো আমি তোব কাছে এ-সব গল্প কবি নি।

কিছু কিছু কবেছ, আব কিছুদিন আগে বাবাকে তুমি এই সব বলে শাসাচ্ছিলে, আমি নিজেব কানে শুনেছি। বাবা তখন মদ খাচ্ছিল—

মাসি চুপ একেবাবে।

আমি তাকে আশ্বস্ত কবাব জন্য বললাম, যেই আসুক, তোমাব কোনো ভাবনা নেই, কোন বকম অসুবিধে হলে তুমি মা-কে জানাবে, ব্যবস্থা যা কবাব মা-ই কববে।

না রে না, মাসি হঠাৎ বিকারের রোগীর মতো আমাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বলে উঠল, তোর মাকেও আর আমি মুখ দেখাতে পারব না। সব আমার পাপের ফল। সব আমার লোভের ফল। তোদের কত ক্ষতি আমি করেছি তোরা জানিস না। তোরা কিছু জানিস না।

আমি বিস্ময়ে বোবা খানিকক্ষণ। মাসি কাঁদছে, টের পাচ্ছি। উঠে আলো জ্বেলে তার মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করছে।

বহুক্ষণ বাদে আমি ঘুমিয়েছি মনে করে মাসি আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। এই প্রথম আমার মনে হল, শুধু এই একটা রাতের জন্য মাসি মায়ের জায়গা নিলে, মায়ের জায়গায় ঘুমিয়ে থাকলে, আমার তেমন খারাপ লাগত না। কিন্তু আমি তাকে ডাকতে পারি নি।

আজও বহুক্ষণ জেগে ছটফট করেছি। মাসি কি বলে গেল, বুঝতে চেষ্টা করেছি। যে সব ছেলেদের সঙ্গে আমি মিশি তাদের সঙ্গগুণে বাবার সঙ্গে মাসির মাঝের ক'টা বছর খাতিরের অর্থটা এখন আর একটু স্পষ্ট আমার কাছে। কিন্তু সে তো আমার মা-ও জানে, সেই প্রথমবারের দেখায় রাগের ঝোঁকে আমি ফাঁস করে দিয়েছিলাম। কিন্তু মা তো তার পরেও আমার যাবতীয় ব্যাপারে তাকেই বিশ্বাস করেছে, তার ওপরেই আমার সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চেষ্টা করছে।...তাহলে মাসি মা-কেও আর মুখ দেখাতে পারবে না, বলছে কেন? কোন পাপ আর কোন লোভের ফল বলছিল মাসি? আমার বা মায়ের এখনো কি জানতে বাকি।

দূরে কোথা থেকে একটা সানাইয়ের শব্দ ভেসে এলো কানে। আমি চমকে উঠলাম। ...স্কুল থেকে এসে পর্যন্ত বাবাকে দেখি নি। রাতেও দেখি নি। সন্ধ্যার পর বাবা তো বাইরে থাকে না বড়। নিজের ঘরে বসে মদ খায়।...আজ কোনো বিয়ের দিন নাকি?

উঠলাম। ঘরের আলো জ্বাললাম। বাবার আর আমার ঘরের মাঝের দরজা আবার আমিই বন্ধ রাখতুম। সেটা খুললাম। বাবার ঘর অন্ধকার। ভিতরে ঢুকে সুইচ টিপলাম।

ঘরে কেউ নেই।

কত রাতে ঘুমিয়েছিলাম, জানি না। সকালে উঠে মালতী মাসিকে কোথাও দেখলাম না। আমার বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। একটা চাকরকে জিজ্ঞেস করতে সে জানালো, খুব ভোরে উঠে মালতী মাসি ট্যাক্সি ডাকিয়ে কোথায় চলে গেছে। সঙ্গে তার স্যুটকেস আর ছোট একটা বিছানা ছিল।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে মা-কে দেখি নি। আজ ঘুম ভেঙে উঠে মালতী মাসিকে দেখলাম না।

আমার খণ্ডিত সত্তার সাত বছরের দিকটা ডুকরে কেঁদে উঠতে চাইল। আর তের বছরের আমি সুমন সরকার তার টুঁটি চেপে ধরলাম।

মায়ের টেলিফোন নম্বর আমার জানা ছিল। কিন্তু এতদিনের মধ্যে সেধে কখনো ফোন করি নি। আজ এই প্রথম একটু বেলা হতে মাকে টেলিফোনে ডাকলাম।

আমি সুমন। মাসি খুব ভোরে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

সে কি বে। মাযেব গলাব স্বেই বোঝা গেল, মাসি তাকেও গোপন কবেই গেছে, কোথায গেল?

জানি না। কাল বাতে আমাকে বলেছিল, তোব নতুন মা আসছে। বাবা কাল থেকে বাডি নেই, আজ নতুন মাকে নিযেই বাডি ফিববে বোধ হয।

ও-দিকেব সাডাশব্দ নেই, অর্থাৎ মা স্তব্ধ।

খানিকক্ষণ বাদে গলা শোনা গেল, গাডি পাঠাচ্ছি, তুই আয একবাব।

না।

টেলিফোনেব বিসিভাব নামিযে বাখলাম।

মালতী মাসিব গত বাতেব স্পর্শটা আমাকে ছেঁকে ধবে আছে, আব তাব কান্না-ভবাট কথাগুলো কানে লেগে আছে। আমি শুধু ভাবছি আব ভাবছি, ভাবছি। ভিতবেব যে অবুঝটা অব্যক্ত যাতনায ছটফট কবছে, তাকে আমল দিচ্ছি না। শুধু ভাবছি, মাসি কোন পাপ আব কোন লোভেব কথা বলল গত বাতে?

কোনো হদিস মেলে নি। পবে পবিণত বযসে একটা সম্ভাব্য সমাধান আমাব মাথায এসেছে। সেটাই সত্য বলে বিশ্বাস।

মাযেব সঙ্গে ছাডাছাডিব আগে বাবাব সন্দেহ আব ঈর্ষা বোগেব আকাব নিযেছিল। মা বাইবে শুটিং-এ গেলে মাসি সঙ্গে থাকত, স্টুডিওতেও যেত মাঝে মাঝে মাযেব সঙ্গে। মনে হয, বাবাব ওই সন্দেহ আব ঈর্ষা বোগেব বসদ মাসিই জুগিযেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, ধাবণাটা সত্যি হলেও মালতী মাসিব ওপব আমাব এতটুকু বাগ নেই, ক্ষোভ নেই। ববং অফুবন্ত মাযা তাব ওপব।... যেখানেই থাকুক, যদি থাকে আজও তাব বুকেব যন্ত্রণা জুডোক।

বলা বাহুল্য, শুরু থেকেই নতুন মা-টিকে আমি একটুও সুনজবে দেখি নি। এ-বাডিতে তাব প্রথম পদার্পণেব বাতেই তাকে তেবো বছবেব ছেলেব বিদ্রোহ মূর্তি দেখতে হযেছিল। সেই ছেলেব ভিতবেব বযস কত, সে জানবে কি কবে?

বিদ্রোহেব ফলও বাবা হাতে হাতেই দিযেছিল। কিন্তু সে আমাব গাযেব ধুলো।

সন্ধ্যাব ঠিক পবেই নতুন মানুষ সঙ্গে নিযে বাবা বাডি ফিবেছে। দোতলা থেকে দেখে আমি নিজেব ঘবে ঢুকে গেছি।

একটু বাদে হাসি-হাসি মুখে বাবা ঘবে ঢুকল। পিছনে সেই একজন। আমাব পডায অখণ্ড মনোযোগ। বাবাব গলাব এমন মোলাযেম স্বব আব শুনি নি, বলল, সুমন, দেখ কে এসেছে—তোব নতুন মা।

বই থেকে মুখ তুলে আমি ফিবে তাকালাম। নতুন মাযেব সঙ্গে চোখাচোখি হল। হাসি-মাখা বেশ সুন্দব মুখখানা। কিন্তু ও-সব দেখাব চোখ নয আমাব তখন। অবশ্য কি দেখছি, তাও জানি না।

তুমি ওব সঙ্গে কথা বলো। বাবা ঘব ছেডে চলে গেল।

নতুন মা হাসি-হাসি মুখে আমাব দিকে এগিযে এলো। চেযাব ঘেঁষে দাঁডাল। একটা সুঘ্রাণ নাকে এলো আমাব। গলায মোটা ফুলেব মালা আব সেন্টেব মিষ্টি গন্ধেব মিশেল।

তুমি সুমন?

আমি সামান্য মাথা নাড়লাম কি নাড়লাম না। দেখছি। বছর ছাব্বিশ সাতাশের বেশি বয়স হবে না, মায়ের এখন বত্রিশ। মায়ের থেকে স্বাস্থ্যও খারাপ। মায়ের থেকে ফর্সা আর বেশ সুশ্রীও, কিন্তু মায়ের মতো মিষ্টি মুখ নয়, চোখ তো নয়ই।

হঠাৎ নিজের ওপরেই কেমন রাগ হয়ে গেল আমার। একে দেখামাত্র মায়ের সঙ্গে তুলনা কেন?

তুমি আমাকে দেখে একটুও খুশি হও নি তো?

জবাব না দিয়ে আমি বইয়ের দিকে চোখ ফেরালাম। নতুন মা আরো একটু কাছে এলো। হাত বাড়িয়ে বইটা তুলে নিল, দেখল কি বই, তারপর আবার সেটা সামনে রাখল।

আমাদের সময় অ্যালজেব্রা পড়তে হত না, খাতায় কষতে হত, তোমাদের বুঝি মন দিয়ে অ্যালজেব্রা পড়তে হয়?

আমি আবার ফিরে তাকালাম। বললাম, পড়তে হয় না, আসলে আমার এখন তোমার সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছে নেই।

দু'চোখ আমার মুখের ওপর থমকে রইল একটু। তারপর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। তার দোষ নেই, সে আমাকে তের বছরের একটা ছেলেই ভেবেছিল শুধু।

মালতী মাসি নেই, মালতী মাসি আর এ-বাড়িতে কোনদিন আসবে না, আমার রাতে ঘুমুবার সময় আর কোনদিন পাশে থাকবে না— ভিতরের এই ক্ষুব্ধ যন্ত্রণাটা নতুন করে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

বাবা মনের আনন্দে নতুন মা-কে বাড়ি-ঘর দেখাচ্ছে। নীচের তলায় ঘুরে এলো, দোতলার সব ক'টা ঘরে চক্কর খেলো, ছাতেও ঘুরে এলো নতুন মা-কে নিয়ে। তারপর নিজের ঘরে ঢুকল। ঘণ্টা দুই কাটল সবসুদ্ধ।

কিন্তু এর মধ্যে বাবা একবারও মালতী মাসির খোঁজ করল না। বিয়ে করে বাবার কি এত আনন্দ হয়েছে যে মালতী মাসি বাড়ি নেই তা খেয়ালও করল না! এত বছর ধরে, মা যাবার আগের থেকেও এ-বাড়ির কর্তৃত্ব বলতে গেলে মালতী মাসির হাতে, সে বাড়ি নেই, বাবার চোখেও পড়ল না এতক্ষণে?

আমার মন বলছে, তা হতে পারে না। আমার মন বলছে, বাবা খুব ভালো করে জানে মাসি নেই, মাসি আর আসবে না। কি করে জানল? তাহলে বাবাই কি তাড়িয়েছে মাসিকে? বিয়ে করতে যাবার আগে বলে গেছে ফিরে এসে যেন এ-বাড়িতে তোমাকে আর না দেখি?

সেটা সম্ভব কি অসম্ভব জানি না। আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। সামনের আবছা অন্ধকার বারান্দায় এসে পায়চারি করতে লাগলাম- বাবার ঘরের দোর পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছি। উদ্দেশ্য, বাবার চোখে পড়ুক।

পড়ল। ডাকল, সুমন এ-দিকে আয়—

ঘরে ঢুকলাম। নতুন মা খাটের একদিকে বসে। আমার দিকে তাকালো কিন্তু কাছে ডাকতে সাহস করল না।

নতুন মাযেব সঙ্গে ভাব হযেছে তো? তোকে খুব ভালোবাসবে, দেখিস—

সে কথায কান না দিযে সোজা বাবাব দিকে তাকিযে আমি বললাম, মালতী মাসি খুব ভোবে বাড়ি থেকে চলে গেছে, আব ফেবে নি— ট্যাক্সিতে তাব বাক্স আব বিছানাও নিযে গেছে।

নতুন মা ঈষৎ বিস্ময়ে বাবাব দিকে তাকিযেছে। বাবাব মুখখানা দেখাব মতো তখন। গম্ভীব কিন্তু ভিতবে-ভিতবে যেন ধড়ফড় কবছে।

ঠিক আছে, খেযেদেযে শুযে পড়ো গে।

বেবিযে এসে নিজেব ঘবেব সামনে বাবান্দাব বেলিং ধবে দাঁড়ালাম। মাথাব মধ্যে তখনো কত আগুন জ্বলছে আমাব, কেউ কল্পনা কবতে পাববে না। একটু বাদে আবছা অন্ধকাব বাবান্দায ছাযা পড়ল। নতুন মা পাযে পাযে আমাব দিকেই এগিযে আসছে। আমাব পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। অস্ফুট মৃদু স্ববে জিজ্ঞাসা কবল, মাসি চলে গেছে বলে তোমাব খুব মন খাবাপ বুঝি?

আমি জবাব দিলাম না। সুযোগেব প্রতীক্ষায আছি। বাবাব সামনে যেটুকু বলে এসেছি, তা যেন কিছুই নয। সকলেব সুখ-শান্তি তছনছ কবে দেবাব মতো ভিতবটা গনগন কবছে আমাব।

তেমনি মৃদুস্ববে নতুন মা আবাব জিজ্ঞাসা কবল, মালতী মাসি কে? তোমাব নিজেব মাসি?

যে সুযোগেব অপেক্ষায ছিলাম সেটাই যেন এগিযে এসেছে। সাত বছবেব বযসে না বুঝে শুধু ক্ষোভেব মুখে মা-কে যেকথা বলেছিলাম, তোবো বছব বযসে নতুন মা-কে অনেকখানি বুঝেই সেই কথা বলে দিলাম।...তেবো বছব বযসটা ও বড় কবে দেখবে না, অবোধ ছেলেমানুষই ভাববে, কিন্তু ধাক্কাটা যেখানে লাগাব ঠিক গিযে লাগবে।

না, মাযেব বন্ধু। আমাব জন্মেব আগে থেকে এ-বাড়িতে থাকত। মা চলে যাবাব পব বাবাব সঙ্গে খুব ভাব হযেছিল কিন্তু তুমি আসবে বলে এখন বাবাই বোধ হয মাসিকে তাড়িযেছে বাড়ি থেকে।

হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে কে আমাকে টেনে নিল পিছন থেকে। নতুন মা-ও চমকে ঘুবে দাঁড়াল। বাবা। ঘাড় ধবে আমাকে ঘবেব মধ্যে এত জোবে ঠেলে দিল যে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম।

কিন্তু এ-অপমান গাযে একটুও লাগল না আমাব। সকাল থেকে আমাব মাথাব মধ্যে যে শযতান দাপাদাপি কবছিল, এতক্ষণে সে বুঝি একটু ঠাণ্ডা হযেছে।

দিন তিনেকেব মধ্যে আব এক ব্যাপাবেব সূত্রপাত। সে আমাব কাছে এক উপভোগ্য প্রহসন। সকালে মস্ত ঝকঝকে গাড়ি হাঁকিযে এক অপবিচিত ভদ্রলোক বাড়িতে হাজিব। আমি তখন নিচেব বসাব ঘবেই ছিলাম।

ভদ্রলোক এসে বাবাব খোঁজ কবল, বাবা আছে শুনে একটা কার্ড আমাব হাতে দিযে তাকে খবব দিতে বলল। আমি পা বাড়াবাব আগেই জিজ্ঞাসা কবল, তুমি সুমন সবকাব?

আমি মাথা নাড়লাম।

ঠিক আছে, বাবাকে খবর দাও।

যেতে যেতে কার্ডটা উল্টে দেখলাম, নামের নিচে লেখা আছে, 'অ্যাটর্নি'। একটু বাদে কার্ড হাতে বাবা অবাক মুখে নিচে নেমে এলো। আমারও হঠাৎ কৌতূহল কেমন .ভদ্রলোক আমার নাম জানল কি করে। আমিও বসার ঘরের পিছনে এসে দাঁড়ালাম।

তারপর উৎকর্ণ হয়ে ভদ্রলোকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুনলাম। সে বিপাশা দেবীর অ্যাটর্নি, এই বাড়ির যাবতীয় স্বত্ব বিপাশা দেবী আগামীকাল নাবালক সুমন সরকারের নামে দান-পত্র করে দিচ্ছেন। যতদিন না সুমন সরকার সাবালক হচ্ছে ততোদিন সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব বিপাশা দেবীর নিজের হাতেই রাখছেন।

এ-সব আমাকে বলার কারণ? বাবার গম্ভীর গলা।

অমায়িক সুরে ভদ্রলোক জবাব দিল, বিপাশা দেবী আপনাকে খবরটা জানিয়ে রাখতে বলেছেন, তাই।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

বাবা ঘর থেকে বেরুবার আগেই আমি ছুটে ওপরে চলে এলাম। বেশ উত্তেজনা বোধ করছি। খবরটা কোনো ফিকিরে নতুন মা-কে জানিয়ে দিতে পারলে বেশ হত। নতুন মা আবার তখন আমার ঘরে দাঁড়িয়েই সাগ্রহে দেয়ালে টাঙানো মায়ের ছবি দেখছে। তার এ আগ্রহ এরই মধ্যে আরো অনেকবার লক্ষ্য করেছি। আর তার মুখ দেখে আমি কল্পনা করে নিয়েছি, বাবার ওপর ভিতরে ভিতরে অন্তত এই নতুন মা সদয় নয়, সদয় হতে পারে না।

পরদিন বাড়ি আমার নামে রেজিস্ট্রি হবার কথা। হয়েছে নিশ্চয়। তার পরদিন আমি এলাম মায়ের কাছে। মা ডাকে নি, নিজে থেকে এসেছি। মায়ের দুর্বলতা আমার জানা হয়ে গেছে, সেটাই আমার মস্ত জোর—বাড়ি আমার নামে লিখে দিয়েছে বলেই আমি তাকে রেহাই দেব। অমন শর্মা সুমন সরকার নয়।

আমাকে দেখে মা খুশি আরার উতলাও একটু। মুখের দিকে চেয়ে মায়ের ভিতরটা আজকাল অনেক বেশি দেখতে পাই আমি।

কার সঙ্গে এলি, একলা নাকি?

মাথা নাড়লাম, তাই।

বাসে এলি?

ট্রামে।

একা এভাবে ট্রামে-বাসে আসবি না, যখন আসতে ইচ্ছে হবে, ফোন করে দিবি, গাড়ি যাবে। আর এরকম হঠাৎ আসতে ইচ্ছে হলে ট্যাক্সি নিবি।

ট্যাক্সির পয়সা পার কোথায়?

মা থমকালো একটু। মালতী মাসি নেই, নতুন করে মনে পড়ল বোধহয়। বলল, বাজে খরচ করবি না কথা দিলে তোর হাতে আমি কিছু টাকা দিয়ে রাখতে পারি।

ঠোঁট উল্টে জবাব দিলাম, তোমার টাকা নিতে যাচ্ছে কে।

বাগত মুখে মা বলল, বেইমান কোথাকাবেব।

এতকাল ধবে যে মাসিব মাবফত আমাব সব খবচ সে-ই চালিযে আসছিল, সে-কথা মুখে বললে না। একটু বাদে জিজ্ঞাসা কবল, বাড়িব খবব কি?

ভালই তো।

নতুন মা কেমন?

খুব চমৎকাব। হঠাৎ দশগুণ বাড়িযে বলাব ঝোঁক চাপল কেন, জানি না। আব পবীব মতো দেখতে একেবাবে।

আমাব ধাবণা—নতুন মাযেব সঙ্গে কোনকালেও দেখা হবে না। এই নির্জলা উচ্ছ্বাসেব মধ্যেও মাযেব চোখে যেন কিছু গলদ ধবা পড়ল। সন্দিগ্ধ সুবে জিজ্ঞাসা কবল, চমৎকাব বুঝলি কি কবে, তোকে আদব যত্ন কবে?

কবতে আসে। আমি পাত্তা দিই না।

মা আবাব খানিক চুপ কবে থেকে জিজ্ঞেস কবল, মাসি নেই, সময়মতো চান-খাওযা-দাওযা সব কবিস তো?

জবাব দেওযাব দবকাব বোধ কবলাম না। মাসি না থাকাব ক্ষতটা বুকেব তলায় এখনো দগদগ কবছে।

একটু ভেবে মা বলল, তোকে যদি খুব ভালো কোনো হস্টেলে বেখে দিই, থাকবি?

কেন?

কেন আবাব কি, ভালো হযে থাকবি, পড়াশুনা কববি।

আমাকে হস্টেলে বেখে বাবাকে ওই বাড়ি থেকে তাড়াবে?

মা সত্যিই অবাক।—তাড়াব কেন?

তাহলে বাড়ি আমাব নামে দানপত্র কবলে? বাবা এমন কি দোষ কবেছে, তাকে ছেড়ে এসে তুমি দু'-দ'বাব বিযে কবলে, বাবা তো শুধু একবাব কবেছে—

মনে হল, মা এই বুঝি আমাব গালে ঠাস কবে চড় বসিযে দিল একটা। তা কবল না, ঠাণ্ডা চোখ দুটো আমাব মুখেব ওপব চক্কব খেল এক প্রস্থ। তাব তেব বছবেব ছেলে অকালে কত পেকেছে, তাই যেন নতুন কবে অনুভব কবল। তাবপব গম্ভীব মুখে ঘব ছেড়ে চলে গেল।

একটু বাদে আবাব ফিববে জানি। ঝি বা চাকবেব হাতে থালা ভর্তি খাবাব থাকবে। আমি সামনে বসে খেলে মা খুশি হয, নির্নিমেষে দেখে চেযে চেযে।

আজ সে-সুযোগ দিলাম না। উঠে নিঃশব্দে বেবিযে এলাম গেট পাব হযে, ফিবে তাকালাম একবাব। ঠিকই অনুমান কবেছি, বাবান্দাব বেলিং-এ দাঁড়িযে—আমাব দিকেই চেযে আছে। গম্ভীব কিন্তু অসহায মুখ। ভেবেছিলাম, ডাকবে।

ডাকল না।

* * *

ঘৃণা, বিদ্বেষ বা প্রতিশোধেব নেশা আসলে বোধ হয নিজেবই অগোচবেব উন্মাদ দশা কিছু। নইলে বুকেব তলায ওই আগুন জ্বেলে বসলে সর্বক্ষণ নিজেকেই দগ্ধায কেন? প্রতিহিংসাব অন্তর্দৃষ্টি নেই। নখদন্ত মেলে সে ঝাঁপিযে পড়াব ছল খোঁজে আব তাবপব

অন্ধ আক্রোশে নিজেকেই ছিন্নভিন্ন করে। তোমার ঘৃণা, তোমার বিদ্বেষ, তোমার হিংসার শিকার তুমি নিজেই।

এখন বয়স আমার একুশ। চোদ্দ বছর ধরে বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মতই একটা আত্মহননের অমোঘ নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে, সেটা মাঝে মাঝে অনুভব করলেও তার থেকে অব্যাহতি নেই।

বাইরে আমি ঠিক তেমনিই আছি, কিন্তু ভিতরটা আরো অনেক গুণ উগ্র আর অশান্ত। একই বাড়িতে বাবা আর আমি দু'টি বিভিন্ন প্রবাসী প্রাণী বাস করছি যেন। সামনাসামনি পড়ে গেলেও একজন আর একজনের পাশ কাটিয়ে চলা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আরো চার-পাঁচ বছর আগে থেকেই বাবা অনুভব করেছে, আমি তার শাসনের আওতার বাইরে চলে গেছি। আর আমার দিক থেকে বাবার সঙ্গে সম্পর্ক শুধু টাকার। সঙ্গী-সাথীর কল্যাণে টাকার চাহিদা আমার কম নয়। নিঃশব্দে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে টাকার জোরটা একটা বড় জোর। দরকার হলেই নতুন মাকে জানিয়ে দিই, অত টাকা চাই। নতুন মা ভিতরে ভিতরে শঙ্কা বোধ করলেও মুখে কিছু বলে না। এনে দেয়। টাকা দিতে বাবার অসুবিধে হবার কথা নয় কারণ তার ব্যবসা পুরোদমে চলছে। এখন নতুন মায়ের জন্যেও আলাদা একটা গাড়ি কিনে দিয়েছে। কিন্তু ছেলের হুকুম মতো বাবার টাকা বার করে দিতে একটু আপত্তি বোধ হয়। মা আমার জন্য টাকা চাইতে গেলে তার চাপা তর্জন গর্জন একটু আধটু কানে আসে। কিন্তু আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে না বা ঘাঁটায় না কখনো। টাকা দিয়ে দেয়। কারণ আমার টাকা চাওয়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন জোরের দিকটা বাবা অনুভব করে বোধ হয়।

নতুন মা আমার জীবনে কোনো সমস্যা নয়। আমার কাছে অনেকখানি নিষ্প্রভ অস্তিত্ব তার। নতুন মা আমাকে ভালবাসে কি না জানি না, কারণ ভালবাসার তেমন সুযোগ তাকে কখনো দিই নি। সে আমাকে সমীহ করে, আমি কার ছেলে, সেটা ভোলে না কখনো। এখনো আমার মায়ের মস্ত অনুরাগিণী ভক্ত এই নতুন মা-টি। সুযোগ সুবিধে পেলেই মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে, আর যেতে আসতে মায়ের পায়ে ঢিপ ঢিপ প্রণাম করে। না, মালতী মাসিকে সরিয়ে সে এ-সংসারে এসেছে বলে আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। সঙ্গতভাবে চিন্তা করলে বরং মায়া হবার কথা।

নিতান্ত গরিব ঘরের বি-এ পাশ মেয়ে, তার বাপ বাবার কারখানায় সাধারণ চাকরি করত একটা। বাবার শ্বশুর হয়ে বসার পর থেকে অবশ্য কিছুটা অসাধারণ হয়েছে। ঘোড়া-রোগ ছিল ভদ্রলোকের, মাইনের টাকার অর্ধেকের বেশি রেসের মাঠে যেত, ফলে ধার-দেনায় মাথা বিকিয়েছিল। তার স্ত্রী চিঠি লিখে বাবাকে অনুরোধ করেছিল, মাইনের টাকা যেন স্বামীর হাতে না দেওয়া হয়। মাস-কাবারে এই নতুন মাকে পাঠিয়ে দিত বাপের মাইনের টাকা আনতে। আমার বাবার সামনে বাপ সই করত আর মেয়ে টাকা নিত। মাত্র মাস কয়েকের ওই যোগাযোগের পরেই বাবা ওই মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসেছে। নতুন মায়ের বাপের বাড়ির মানুষেরা সেই জন্য আমার বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ। মনে হয়, অবস্থার দিক বিবেচনা করলে নতুন মা-ও অকৃতজ্ঞ নয়। কিন্তু

কৃতজ্ঞতা আর প্রেমপ্রীতি ভিন্ন জিনিস। বাবাকে কোনো মেয়ের মনে ধরতে পারে, এ আমার বিশ্বাস হয় না। আমার মায়ের প্রতি নতুন মায়ের আকর্ষণটা বরং ঢের খাঁটি মনে হয়। আর মাও তাকে কিছুটা স্নেহ আর বিশ্বাস করতে পেরে খুশি। কারণ, আজও তার দায় আমি। আমাকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। আমার ব্যাপারে মা আগে মালতী মাসির ওপর নির্ভর করত, এখন নির্ভর করছে নতুন মায়ের ওপর। নির্ভর আর বিশ্বাস করতে যে পেরেছে, এ-টুকুই নতুন মায়ের সত্যিকারের গুণ বলতে হবে। এ-দিকে তার সচলতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমি বিচ্ছিন্ন সকলের কাছ থেকে। আমার খণ্ডিত সত্তা অশান্ত ক্ষোভে আজও ঠিক তেমনি করেই মাথা খুঁড়ে মরছে।

মা আবার একটা আলাদা বাড়ি করেছে। নিজস্ব বাড়ি। তার জীবনের তৃতীয় ভদ্রলোকটিকেও সরে যেতে হয়েছে। মা আমার বাবাকে বরদাস্ত করতে পারে নি, জানি। অপর দু'জনকে পারল না কেন, জানা নেই। মায়ে নিজের একান্ত রুচিবোধের ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে, মনে হয়, অন্য সকলের ক্ষেত্রে সেটাই শেষ পর্যন্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই চল্লিশ বছর বয়সেও মায়ের অভিনয়জীবনের জৌলুসে টান ধরে নি, ওই জগতে এখনো অনন্যা সে। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তার আর কোনো আগন্তুক আসবে বলে মনে হয় না। নতুন বাড়ি করার পর আমাকে অনেকবার অনুরোধ করেছে, এখানে চলে আয় না, তোতে আমাতে থাকি।

একদিন আমি হাসি-মুখে জবাব দিয়েছিলাম, অনেক দেরি করে ফেলেছ মা, অনেক দেরীতে ডাকলে। তোমাকে একটা মরা ছেলের মা হিসেবে দেখতেই আমার বেশি ভালো লাগে।

তারপর আর এই অনুরোধ করে নি।

গোটা তিনেক আয়া আর ঝি, আধ-বয়সী একটা চাকর, আর গেটে প্রহরারত একটা দরোয়ান নিয়ে মা তার নতুন বাড়িতে একলা থাকে এখন। না, একলা বলছি কেন, যশোদাও তো সেই থেকেই মায়ের সঙ্গে থাকে।

আমার সতের বছর বয়স থেকে মায়ের কাছে যশোদাকে দেখছি। ওর বছর বারো বয়স তখন। ফ্রক পরত। কিন্তু বয়সের তুলনায় বাড়ন্ত গড়ন বলে পনের বছরে পা দেবার আগেই শাড়ি ধরেছে। মাঝ বয়সে পরলোকগতা এক মাঝারি গোছের নামী অভিনেত্রীর মেয়ে যশোদা। মারা যাবার আগে মেয়েকে মায়ের হাতে সপে দিয়ে যায়। সেই থেকে মায়ের কাছেই আছে। বাড়িতে দু'জন মাষ্টার রেখে মা ওকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। আবার কয়েকটা ছবিতে ওকে ছোটখাট পার্ট করতেও দেখা গেছে। অনেকের ধারণা মায়ের কাছে আছে যখন, কালে-দিনে আর্টিস্ট হবে।

যশোদা মায়ের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছে, সে-ও আমার চক্ষুশূল। মেয়েটা গোড়া থেকেই তা বুঝতে পারতো বোধ হয়। তাই আমাকে একটু ভয়ের চোখে দেখত। মায়ের সঙ্গে আমার বেপরোয়া আচরণ আর কথাবার্তার ধরণ-ধারণ দেখে শুনেও দস্তুর

মতো সমীহ করত। আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখলেই ছুটে গিয়ে মাকে খবর দেয়, তারপর মায়ের পাশ ঘেঁষে বসে বড় বড় চোখ মেলে আমাকে দেখে।

এখন অবশ্য ভয়ের ভাবটা কেটেছে। দেখলে হাসি-মুখে গল্প করতে চায়, যখন তখন মায়ের অশান্তির কারণ ঘটাই বলে মৃদুমন্দ অনুযোগও করে। আমার ধারণা, যদি আমি ওই যশোদার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাই, মা তাতেও আপত্তি করবে না, বরং খুশি চিত্তে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে তখন ছেলে-বউ দু'জনকেই আগলে রাখবে।

আমাকে পাবার মায়ের এই নিভৃত আকাঙ্ক্ষা টের পেলেই আমার ভিতরটা যেন আরো হিংস্র আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে চায়।

এদিক থেকে স্বভাব আমার ভিতরে ভিতরে ঢের বেশি উগ্র আর নির্দয় হয়ে উঠেছে, মা যা চায়, আমি তা চাই না। মা চায়, আমি লেখাপড়া শিখে মস্ত একজন হয়ে উঠি। সেই জন্যেই বোধহয় বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কম আমার, হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার পর মা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন দিলি?

আমি নিস্পৃহ জবাব দিয়েছিলাম, ফেল করব, জানা কথাই তো।

আমারও তাই বাসনা ছিল। কিন্তু ফল বেরুতে দেখা গেল, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছি। আর তারপর মায়ের আনন্দ দেখে ভিতরে ভিতরে রাগে জ্বলেছি। লিখতে বসে পরীক্ষার খাতায় কেন হিজিবিজি কেটে এলাম না, সেই অনুশোচনা হয়েছে।

মায়ের বরাবর ভয়—পাছে অসৎ সঙ্গে মিশি। ফলে ওই অসৎ সঙ্গ-ই একমাত্র আশ্রয় যেন আমার। সেই জিতু পোদ্দার আর তার দলবল অন্তরঙ্গ-সাথী এখন। জিতু পোদ্দার আগের থেকেও অনেক দুরন্ত, অনেক দুঃসাহসী হয়েছে। দলবল নিয়ে হামলা করে নানা ভাবে টাকা রোজগার করা শুরু করেছে। ওরা দেখেছে, দু'চারটে বোমাপটকা, ছোরা-ছুরিতে বেশ কাজ হয়। স্রেফ হুমকি দিয়ে বা উড়ো চিঠি ছেড়েও অনেক সময় পকেটে ভালো টাকা আসে। ফলে ওদের সাহস বেড়েই চলেছে। আমি ওদের সঙ্গে মিশি শুধু উত্তেজনার লোভে। নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার মধ্যে বেশ একটা রোমাঞ্চ আছে। ওদের হাতে কারো নিগ্রহ বা নির্যাতন দেখলে কষ্ট হয় না, এমন নয়। আমি সামনে থাকলে, পায়ে-হাঁটা পথের মানুষদের ওপর ওকে হামলা করতে দেখলে বাধা দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু সুখের জোয়ারে ভাসছে এমন বাড়ি-গাড়ি-ওয়ালাদের হেনস্থা কেন যেন বেশ উপভোগ্য লাগে। অবশ্য ওদের টাকা রোজগারের কোনো পরিকল্পনার বা অভিযানের সঙ্গে আমার কোনরকম প্রত্যক্ষ যোগ নেই। আমাকে ভাগ দিতে হয় না বলে জিতু পোদ্দারের দল খুশি বই অখুশি নয়। আমার শুধু দূরে দাঁড়িয়ে দ্রষ্টার ভূমিকা। কখনো-সখনো দুই একটা প্ল্যান বাতলে দিই, এই পর্যন্ত।

ওরা অন্তরঙ্গ ভাবে বটে, কিন্তু আসলে ওদের থেকেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আমি। আমার আনন্দের দোসর নেই, ব্যথারও ভাগীদার নেই। এক একলার জগতে আমি নির্বাসিত। সেখানে টিপটিপ করে জ্বলছি আর নিভছি।

বি-এ ফাইন্যাল পরীক্ষার দিনকতক আগের এক সন্ধ্যায় মায়ের কাছে এলাম। মাঝে অনেক দিন আসি নি। মা টেলিফোনে নতুন মায়ের কাছে শুনেছে, বেশ মন

দিযে পডশুনা শুরু কবেছি। তাই আব আমাকে ডাকাডাকি কবে বিবক্ত কবে নি। আব আমাব মতিগতি ফিবল বলে মনে মনে হযতো খুশিও হযেছে।

অনার্স ছাডব-ছাডব কবেও ছাডি নি। তাই মন দিযেই পডাশুনা কবছিলাম বটে দিনকতক। কিছুই ভালো লাগে না বটে, কিন্তু অযোগ্যতাব ছাপ কপালে পডবে সেটা তেমন বাঞ্ছিত নয। ববং পাশ কবে ডিগ্রীব ছাডপত্র অনাযাসে ছিঁডে ফেলে দিতে পাবি।

হঠাৎ মনে হল, মা-কে অনেকদিন দেখিনি। না দেখা মানেই তাব দিনবাতেব চিন্তাব থেকে নিজেকে অনুপস্থিত বাখা। এই স্বস্তিটুকু তাকে দিতে আমাব বিশেষ আপত্তি।

গিযে দেখি, মা নেই, যশোদাও নেই। আযা জানালো, দু'জনে বেবিযেছে একটু, খানিকক্ষণেব মধ্যেই ফিববে। আমাকে বসিযে চা-কফি খাওযাবাব জন্য সে বীতিমতো তোযাজ তোষামোদ শুরু কবে দিল। অর্থাৎ আমি এসেও ফিবে গেছি শুনলে মাযেব ওব ওপবে বিরূপ হবাব সম্ভাবনা।

খানিকক্ষণেব মধ্যেই ফিবল বটে দু'জনে। যশোদা বেশ সাজগোজ কবে বেবিযেছিল, মাযেব সাজটা ববাববই চাপা গোছেব। যশোদা গোটাকতক শাডিব বাক্স বুকে কবে ঘবে ঢুকল। পিছনে মা।

ও মা, আপনি কতক্ষণ!

জবাব না দিযে ওকে দেখলাম একটু ভালো কবে। বেশ সুন্দবই দেখাচ্ছে। মা আডচোখে আমাব দেখাটা লক্ষ্য কবল। সে-জন্যে আমাব সঙ্কোচেব লেশ মাত্র নেই। যশোদা দস্তুব মতো মহিলা গোছেব হযে উঠেছে।

কোথায গেছলে?

মা নিযে মার্কেটে বেরুলো। খুব সুন্দব সুন্দব শাডি কিনে দিযেছে, দেখবেন?

আমি হাসলাম একটু। বললাম, তুমি ভাগ্যবতী দেখছি।

যশোদাব দু'চোখ আমাব জামা-কাপডেব ওপব থমকালো। পবনেব জামা বা কাপড ধোপদুবস্ত নয, জামাব কাঁধেব কাছটা ছেঁডাও একটু। পাশেব সোফায বসে মা-ও তাই লক্ষ্য কবছিল। বলল, চল, আবাব বেবোই একটু, গাডিটা তোলা হয নি এখনো—

মাযেব দিকে ফিবলাম।—জামা-কাপড কিনে দেবে?

মা জোব দিযে বলল, দেব তো, জামা-কাপডেব এ কি ছিবি তোব, নেই কিছু?

ঢেব আছে। সোফাব কাঁধে মাথা বেখে আবো গা ছেডে বসলাম আমি।

তাগিদ দিযে ফল হবে না বুঝেই মা আব আমাকে তোলাব চেষ্টা কবল না। তক্ষুণি আযা ডিশভর্তি খাবাব নিযে এলো। আমি এলে এটুকু ববাদ্দ, আযা ভালো কবেই জানে। মা যশোদাব দিকে তাকালো, তুই তো বিকেলে খাস নি কিছু এই সঙ্গে খেযে নে না?

যশোদা বলে উঠল, খেযে খেযে মুটিযে গেলাম, অত খা' খা' কবো না তো।

ওব দিকে ফিবলাম আবাব।...মেযেটা আজ চোখ টানছে। দেখতে ভালো লাগছে।

মা প্রসঙ্গ ঘোবালো। খুব মন দিযে লেখা-পডা কবছিস, শুনলাম?

জবাব নিষ্প্রয়োজন। খাবারের ডিশ খালি করার দিকে মন দিয়েছি। বেশ খিদে পেয়েছিল।

মা আবার বলল, ভালো করে পাশ করলে তোকে আমি বাইরে পাঠিয়ে দেব, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা—যেখানে তোর খুশি। সেখান থেকে ডিগ্রী-ফিগ্রী নিয়ে মস্ত মানুষ হয়ে ফিরবি, বাজি আছিস?

আমি মন দিয়ে পড়াশুনা করছি শুনেই মায়ের এত আনন্দ, এত আশা। উৎসুক আগ্রহে আমার দিকে চেয়ে জবাবের প্রতীক্ষা করছে। মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথায় সেই পরিচিত উষ্ণ বায়বিক স্রোতটা ওঠানামা করতে লাগল। দরকার হলে আমিও এখন একটু আধটু অভিনয় করতে পারি। তার আগ্রহে ইন্ধন জুগিয়ে সাগ্রহে বললাম, সত্যি বলছ, ঠিক পাঠাবে?

মা আরো খুশি—আমি তোকে মিথ্যে বলব নাকি? বলিস তো, তোকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে স্থিতি করে দিয়ে আসব।

যশোদা বলে উঠল, বা রে তাহলে আমি?

মনের আনন্দে মা তাকেও প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলল।—আচ্ছা, তোকেও নিয়ে যাব'খন।

যশোদা হেসে উঠল, তাহলেই সুমনদার পড়া হয়েছে—

মা বলল, কেন হবে না, আমরা কি ওর মতো দু'-তিন বছর থাকতে যাচ্ছি, মাস দুই থেকে দেখে-শুনে বেড়িয়ে আবার চলে আসব।

এরপর বিদেশে যাওয়ার জটলাটা তিনজনের মধ্যে জমে উঠল বেশ। মা-কে প্রস্তুত থাকতে বললাম, কারণ আমার পরীক্ষা এসেই গেছে প্রায়, আর ভালো ফলও ইচ্ছে করলেই করতে পারি।

মায়ের গাড়ি নিয়েই বাড়ি ফিরলাম। তার স্বস্তিভরা পরিতুষ্ট মুখখানা চোখে ভাসছে। মায়ের কি হয় জানি না, কিন্তু অভিনয় করতে গেলে আমার মাথার ভিতরে কেমন একটা দপদপানি শুরু হয়। আজ সেটা খুব বেশি হচ্ছে।

গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ি ঢুকলাম। বাবা এতক্ষণে মদের গেলাস আর বোতল নিয়ে বসে গেছে। আমার নতুন মা-কে দরকার।

টাকা দাও তো কিছু।

এ-সময়ে টাকা চাইতে নতুন মা অবাক একটু।—কত?

তিন শ' চার শ', যা পারো দাও।

হঠাৎ অত টাকা দিয়ে কি হবে?

দিনকতকের জন্য বাইরে যাব, দেরি করো না, শীগগির আনো।

নিজের ঘরে এসে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুটকেসটা গুছিয়ে নিলাম। মাথার দপদপানি বাড়ছে। কত সময় মনে হয়েছে, নিজেকে ধ্বংস করে দিলে মায়ের মুখখানা দেখতে কেমন হয়? এখনো সেই গোছেরই অনুভূতি।

টাকার জন্য এ-সময় নতুন মা বাবাকে বলবে না, জানা কথাই। কারণ মা যে আমার খরচের জন্য মাঝে মাঝে তার হাতে টাকা দেয় সে খবর রাখি। আমি নিজের

হাতে কিছু নেব না জানে বলেই ওই কবে। মা এখন নতুন মাকে আগের থেকেও বেশি অন্তরঙ্গজন ভাবে।

নতুন মা ঘরে এসে বলল, সত্যিই কি তুই যাবি নাকি? কোথায় যাবি, কি জন্যে যাবি?

আমি ধমকের স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, টাকা এনেছ?

থতমত খেয়ে নতুন মা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিল। —তিনশ টাকা আছে। ...কিন্তু কোথায় যাবি, কতদিনের জন্য চললি, বলবি তো?

গিয়ে চিঠি দেব। ভালো কথা, তুমি মাকে খানিক বাদে একটা ফোন করে দিও তো।

সুটকেস হাতে করে নেমে এসে গাড়িতে চেপে বসলাম।—হাওড়া স্টেশন।

কোথায় কতদূরে চলেছি, আমিও জানি না। টেলিফোন পাবার পর আমার অভিনেত্রী মায়ের মুখখানা কি রকম হবে দেখতে সেটাই কল্পনা করতে ভালো লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে অকারণে যশোদার ওপর রাগ হতে থাকল।...মায়ের যন্ত্রণার ওপর প্রলেপ দেবার জন্য একজন কেউ আছে মায়ের কাছে। ছেলে খুইয়ে মা মেয়ে পেয়েছে মনে হয়।

ফিরলাম প্রায় মাস দুই বাদে। বি-এ পরীক্ষা তার ঢের আগে চুকেবুকে গেছে। মায়ের বাসনায় বাদ সাধতে পারার আনন্দ কতদিন আর জিইয়ে রাখা যায়? আবার যেন দ্বিগুণ অবসাদের সমুদ্র।

ফিরে এসে মায়ের গম্ভীর মুখখানা দেখে অবশ্য তুষ্টিলাভ করেছিলাম। কোথায় গেছলাম, কেন গেছলাম, মা একটা কথাও জিজ্ঞাসা করল না। গাম্ভীর্যের আড়ালে তার হতাশাটুকুও অগোচর থাকল না আমার। শুধু জিজ্ঞাসা করল, পড়াশুনা এখানেই শেষ তাহলে?

হ্যাঁ, আর ভালো লাগে না।

আর আড়ালে অনুযোগের সুরে যশোদা বলল, আপনার মাথার ঠিক নেই, কি কাণ্ড যে করেন এক-একসময়...মাকে এ-ভাবে দুঃখ দেন কেন?

কি?

গলার স্বর শুনেই যশোদা ঘাবড়ে গেল। আর কিছু বলল না।

একভাবে দিন চলছিল। বছরখানেক বাদে আবার একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ পেলাম যেন। দু'টি মেয়ের পদার্পণ ঘটেছে আমার জীবনে। তাদের একজন মিতা বোস আর একজন শোভা গাঙ্গুলি। দু'জনেরই বছর কুড়ি হবে বয়স। তার মধ্যে মিতা বোস দস্তুরমতো সুশ্রী। চেহারায় আর সাজ-পোশাকে স্মার্টনেসের চটক আছে। ইউ, পি-তে তার দাদুর কাছে থেকে বি-এ পড়ত। ফেল করে কলকাতায় বাপের বাড়ি চলে এসেছে। আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে তিনখানা বাড়ির পর ওদের বাড়ি। মিতা বোসের বাবা মার্চেন্ট আপিসের বড় চাকুরে আর মা দস্তুরমতো আধুনিকা।

শোভা গাঙ্গুলিব চেহাবায বা চাল-চলনে মিতা বোসেব মতো চমক নেই বটে, কিন্তু ওই মেযেটাও বেশ সুশ্রী। ওদেব বাড়ি-ঘব আমি দেখি নি, মাইল দুই-তিন দূবে, শুনেছি। হাযাব সেকেণ্ডাবি পাশ কবাব পব আব পডাশুনাব সুযোগ হয নি। বাড়িব অবস্থা তেমন সুবিধেব নয বোধহয, কিন্তু সাদামাটা বেশবাসে ওই মেযেটাও মিতা বোসেব থেকে খাবাপ লাগে না আমাব।

শোভা গাঙ্গুলি জিতেন পোদ্দাবেব দলেব নতুন বিক্রুট—মনা গাঙ্গুলিব খুডতুতো বোন। মনা গাঙ্গুলি জিতুব পবেব দিকেব সেই সাধাবণ স্কুলেব সহপাঠী ছিল।

বেশ চৌকস ছেলে, আই-এস-সি পাশ কবাব পব কোন ফার্মে টেকনিসিযানেব ট্রেনিং-এ ছিল কিছুকাল। সেই ফার্ম লক আউট হযে যাবাব ফলে বাপ-কাকাব ব্যবসায ঢুকেছিল। সেটাও ফেল পডতে আব চাকবি-বাকবি না জোটাব ফলে জিতু পোদ্দাবেব দলে ভিডে গিযে এখন বহাল তবিযেতে আছে।

মাযেব সুপাবিশে খুডতুতো বোন শোভা গাঙ্গুলিকে সিনেমায ঢুকিযে দেবাব জন্য মনা গাঙ্গুলি আমাব পিছনে লেগে আছে। জিতু পোদ্দাবও আমাকে ওব হযে অনুবোধ কবেছে।

আব ঠিক ওই বাসনা নিযেই আপ-টু-ডেট মেযে মিতা বোস নিজে এসে আলাপটা এখন একটু ভাবেব দিকে টেনে নিযে যেতে চেষ্টা কবছে।

জিতু পোদ্দাব আব মনা গাঙ্গুলি শোভাকেও একদিন আমাদেব বাড়ি নিযে এলো। আব তাকেও মন্দ লাগল না আমাব। কথা দিলাম, চেষ্টা কবব, তবে লেগে থাকতে হবে—

মিতাকেও একই কথা বলেছিলাম। লেগে থাকাব অর্থটা ওবা ঠিকই বুঝে নিযেছে। মিতাব বাড়ি এক মিনিটেব পথ, সে সপ্তাহেব মধ্যে চাব পাঁচদিন আসে। দূবে থাকে বলে শোভা অত ঘন ঘন আসতে পাবে না, তবু সপ্তাহে দিন দুই অন্তত এসে ঘণ্টাখানেক ধবে বসে গল্প কবে চা খেযে যায।

এই দুই মেযেব আনাগোনা দেখে নতুন মাযেব চক্ষুস্থিব। তা দেখেও মজা লাগে আমাব। মাযেব কাছে নতুন মাযেব টেলিফোনে খবব জানানো সাবা। মা আমাকে জিজ্ঞাসা কবেছে, তোব কাছে নাকি দুটো মেযে খুব যাওযা আসা কবছে আজকাল?

মাথা নেডে সায দিযে ফিবে জিজ্ঞাসা কবি, কেন, তোমাব আপত্তি আছে?

আপত্তি কবলে কি ফল হবে মাযেব জানা হযে গেছে। জবাব দিযেছে, না, আমি তোব কে, যে আপত্তি হবে. ।

হেসে বললাম, বিশেষ উদ্দেশ্য নিযেই আসা যাওযা কবছে তাবা, শীগগিবই টেব পাবে।

টেব পেযেছে, একে একে দুজনকেই নিযে মাযেব কাছে এসেছি। মাযেব সামনে ভক্তি-শ্রদ্ধায অবনত দুজনেই। মিতা বোস তো পাযে মাথা ঠেকিযে প্রণাম কবে বসল। আমাব মার্জিতরুচি অভিনেত্রী মা—দু'জনেব সঙ্গেই সদয ব্যবহাব কবেছে, যত্ন কবেছে, কিন্তু কাজেব বেলায গম্ভীব মুখে বলেছে, বড শক্ত, দেখি কি কবতে পাবি।

মিতা বোস বলেছে, আপনাব স্নেহ পেলে আব কিছু চাই না, সব সহজ হযে যাবে।

শোভা গাঙ্গুলি কিছু বলে নি। দু' চোখে শুধু আশা জমাট বেঁধেছে।

পবে মা ধমকেব সুবে বলেছে, এ-সব কি আবম্ভ কবেছিস তুই, আমি কাবো জন্যে কিছু কবতে পাবব না।

আমি নির্লিপ্ত।—চেষ্টা কবে দেখো না, কালে-দিনে তোমাব থেকেও বড আর্টিস্ট হতে পাবে ওবা।

একদিন নয, শোভা গাঙ্গুলিকে পবেব ছ'ম্যাসেব মধ্যে দিন চাবেক আব মিতা বোসকে দিন দশেক মাযেব কাছে এনেছি। পবেব জনকে মাযেব সামনেই উসকে দিযেছি, ঠিক মত হামলা কবতে পাবছ না, হবে কি কবে। হামলায সাহায্য কবাব জন্য ওকে নিযে স্টুডিওতেও এসেছি।

ভিতবে ভিতবে মা ভযানক বিবক্ত। একলা পেযে ধমকে উঠেছে, আমি কিছু কবতে পাবব না, বলেছি না?

চেষ্টা কবো, কিছু না পাবো আশ্বাস দাও, তাছাডা হবে না-ই বা কেন, ওই মিতা বোস অন্তত ভালই পাববে মনে হয—

চাপা বিবক্তিতে মা ঝাঁঝিযে উঠল, আমাব দ্বাবা কি-চ্ছু হবে না, এবাবে এলে স্পষ্ট বলে দেব।

বলে দেখো তো...!

বললে তুই কি কববি, শুনি?

ধীবে-সুস্থে জবাব দিলাম, কিছু একটা কবব নিশ্চয, কি কবব সেটা পবেব বিবেচনা...কালই মিতা বোসকে নিযে আসছি আমি, বলে দিও।

আমাব বলাব মধ্যে এমন কিছু ঠাণ্ডা হুমকি ছিল যে মা শুধু মুখেব দিকে চেযেছিল চুপচাপ। পবদিন মিতা বোস আসতে মা তাকে ফটো সমেত স্টুডিও-তে দেখা কবতে বলেছে। দুই-একজন প্রডিউসাব আব ডাইবেক্টবেব সঙ্গে আলাপ কবিযে দেবে।

আনন্দে মিতা বোস হাওযায ভেসেছে। ট্যাক্সিতে আমাব পাশে ঘন হযে বসেছে। অসঙ্কোচে আমাব এক হাত ওব কাঁধে উঠে এসেছে। এই গোছেব প্রশ্রয ও আগেই দিযেছে। আজ দাবি বাডালেও আপত্তি কববে না, জানি।

বাত সাডে ন'টাব পব ওকে বাডিতে ছেডে দিয়ে আমি ফিবেছি। মাথাটা ঝিমঝিম কবছে কেমন। নিজেব ঘবে এসে আযনাব সামনে দাঁডাতেই ধাক্কা খেযেছি একটা। আমাব ঠোঁটে দগদগে লিপস্টিকেব দাগ। হঠাৎ বিপবীত প্রতিক্রিযায গা-টা ঘুলিযে উঠল কেমন। ওটা যেন বক্তেব দাগ।

আশ্চর্য, এবপব শোভা গাঙ্গুলিকে নিযে ববং বেডাবাব ঝোঁকটা বেডেছে আমাব। ও বড জোব মুখে একটু পাউডাব বুলোয। ওব গাযে-কাঁধে হাত দিলে কেমন শক্ত হযে ওঠে। নার্ভাস হয। আমাব তাই ভালো লাগে। ওকেও মাযেব কাছে নিযে গিযে বলেছি, ফোটো সমেত মাযেব সঙ্গে স্টুডিও-তে দেখা কবো, মা চুপ। আব শোভা

কেমন যেন অসহায় বোধ করেছে। ফেরার সময় ট্যাক্সিতে গা ঘেঁষে বসে নি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, স্টুডিও-তে গেলে আপনি সঙ্গে থাকবেন না?

আমার হাসি পেয়েছে, আবার ভালও লেগেছে। মিতা আমাকে 'তুমি' করে বলে, নাম ধরে ডাকে। কিন্তু এ-মেয়েটা অন্যরকম। তা বলে দু'জনের কারো ওপরই মায়া মমতা নেই আমার। ফিল্ম-আর্টিস্ট হতে চায় বলেই যেন আমার খেসারত আদায়ের অধিকার। আকর্ষণটা মিতা বোসের থেকে আপাতত শোভা গাঙ্গুলির প্রতি বেশি বলেই ওর ওপর মমতা আরো কম।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এক নিরিবিলি কোণে বসে দু'হাত বাড়িয়ে ওকে সজোরে কাছে টেনে আনতে ও ধরফড় করে উঠল একেবারে। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, না না, না না—

জোরে করেই দূরে বসল তারপর। ভয়ে শুকনো মুখ, কাঁপছেও মনে হল। আমার রাগ হয়ে গেল হঠাৎ, সশ্লেষে বলে উঠলাম, এত ভয় নিয়ে তুমি ফিল্ম-আর্টিস্ট হবার স্বপ্ন দেখো।

শোভা চুপ করে রইল অনেকক্ষণ, তারপর আশাহতের মতো বলল আমাকে দিয়ে সত্যিই কিছু হবে না, সুমনদা...আমি নিজেই তা বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি কি করব, ব্যবসা অচল হতে বাবার অত অসুখ...ছোট ভাইগুলো না খেয়ে মুখ শুকিয়ে ঘোরে, মাত্র হাযার সেকেণ্ডারি পাশ, কে চাকরি দেবে আমাকে—মনাদা আপনার কথা বলে ফিল্মলাইনের লোভ দেখালো, কিন্তু আপনার মায়ের সামনে গেলে পর্যন্ত আমার পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপে, পারব না, নিজেই বুঝতে পারি... পরে আবার মনে হয়, না পারলে সবাইকে তো উপোস করে মরতে হবে।

মেয়েটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি নির্বাক, হতভম্ব। আমার ভিতরের শয়তানটার গালে কে যেন ঠাস ঠাস করে দুটো চড় কষিয়ে দিল।

কি ভেবে আবার ওকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতে চললাম।

অন্ধকার গলির মধ্যে স্যাঁতসেঁতে জীর্ণ বাড়ি একটা। ঘরে হারিকেন জ্বলছে, টাকা দিতে না পারার দরুন ইলেকট্রিক বন্ধ বোধ হয়। দারিদ্র্যের এই দশা আমি কল্পনা করতে পারি না। শোভার আমাকে ভিতরে ঢোকারার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ঢুকে পড়লাম যখন কি আর করবে। প্রথমে মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, মনাদার বন্ধু, এঁরই মায়ের মারফত চাকরির চেষ্টা হচ্ছে—

শীর্ণমূর্তি মহিলা। ময়লা লালপেড়ে শাড়ি পরনে। গায়ে জামা নেই বলে ওটা ভালো করে জড়িয়ে নিল। তার কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের মস্ত টিপ একটা, সিঁথিতেও চওড়া করে সিঁদুর টানা। মুখের দিকে তাকালে ওই দুটো বস্তুই আগে চোখে পড়ে। আমার অস্তত পড়ছে। পাঁচ-ছ'টা রোগা রোগা ছেলে মেয়ে ঘরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাকে। ওরা শোভার নিজের আর খুড়তুতো ভাই-বোন।

শোভার কাকা রোজগারের ধান্ধায় বেরিয়েছে। ওর বাবাকে দেখলাম। শয্যাশায়ী লালচে মুখ, লালচে দেহ। শুনলাম ড্রাই ওয়াশিং-এর ব্যবসা ছিল। ফেল পড়ার পর থেকে ব্লাডপ্রেসারে শয্যাশায়ী। ব্যবসা ফেল পড়ার কারণ, দোকানে ছোটখাট ডাকাতি

হযে যায হঠাৎ। পাঁচ-ছ'হাজাব টাকাব মাল চুবি হবাব ফলে এই হাল। খদ্দেবরা গলায গামছা দিযে মালেব দাম আদায কবে নিযে গেছে। পাঁচ বছবেব লিজ ছিল বলেই দোকানঘবটাই শুধু তালাবন্ধ আছে এখনো। আঘাত পেযে ভদ্রলোকেব মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিযেছে একটু, হাজাব সাতেক টাকা হাতে পেলে ব্যবসা এবাবে কিভাবে চালু কবা যেতে পাবে, সেই হিসেব কষে, ভাইযেব সঙ্গে সেই পবামর্শ আগেব থেকেই সেবে বাখতে চায। কিন্তু আব সকলে জানে, সাত-আট হাজাব টাকা আকাশকুসুম স্বপ্ন তাদেব কাছে। ভদ্রলোক আমাব দু'হাত ধবে কাকুতি মিনতি কবে বলল, দেখো না বাবা, কেউ যদি দেয টাকাটা। আমি তাকে অর্ধেক অংশ লেখাপড়া কবে দেব, বাকি অর্ধেক আমাদেব দু' ভাইযেব থাকবে, তাকে কিছু কবতে হবে না, সে শুধু ঘবে বসে লাভেব অংশ পাবে।

জীবনযন্ত্রণাব একটা বদ্ধ গুমোট থেকে বেবিযে এলাম যেন। কিন্তু বাড়ি আসাব পবেই সেই যন্ত্রণাটা মগজে ঘুবপাক খেতে থাকল। বাবাব ঘবে উঁকি দিলাম একবাব। চেযাবে মাথা বেখে নেশাটা উপভোগ কবছে।

পবদিন সকালে সোজা তাব সামনে এসে দাড়ালাম। আমাব কিছু টাকা দবকাব।

বাবা বীতিমতো অবাক, কাবণ সামনাসামনি টাকা চাওযা এই প্রথম। কত?

আট হাজাব।

কত। নিজেব কানেব ওপব হঠাৎ যেন বিশ্বাস হাবালো বাবা।

আবো স্পষ্ট কবে বললাম, আট হাজাব।

বাবা হতভম্ব খানিক। আমাব আপাদমস্তক নিবীক্ষণ কবল একবাব। অত টাকা কি জন্যে দবকাব?

দবকাব আছে, টাকাটা আজই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনতে ভুলো না।

বাবা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল একেবাবে, কি দবকাব না বললে এক পযসাও পাবে না, বললেও পাবে কিনা সেটা আমি বিবেচনা কবে দেখব। মুখেব কথা খসলেই আট হাজাব টাকাব বৃষ্টি হযে যাবে, কেমন? আট টাকা বোজগাব কবে দেখেছ কখনো?

সবোষে অন্য দিকে মুখ ফিবিযে নিল। অর্থাৎ আব কোনো কথা নেই।

খুব ঠাণ্ডা স্ববে বললাম, আমাব দলেব ছেলেবা আমাব জন্যেই আজও তোমাব কাছে টাকাব দাবি কবে নি, তাবা চাইলে আট হাজাবেব ঢেব বেশিই চাইত। আমাব আপত্তি না থাকলে তাবা কম কবে হাজাব পঁচিশেক আদাযেব ব্যবস্থা কববে।

বাবা সত্রাসে ফিবে তাকালো আমাব দিকে। খববেব কাগজ সেও পড়ে। টাকা ওদেব দিতে হবে?

না, আমাব-ই দবকাব।

বাবা গর্জন কবে উঠল, আমাকে ভয দেখিযে টাকা আদায কবতে এসেছিস? তোদেব সক্কলকে পুলিশে দেব আমি।

চেষ্টা কবে দেখো!...টাকাটা আজই চাই। আজ ন'বছব হল আমাব বাড়িতে আছ, খুব কম হলেও মাসে সাড়ে সাতশ' টাকা ভাড়া হবে এব—এক বছবেই আমাব ন'হাজাব

টাকা পাওনা হয়। এই আট হাজার বাদে মাসে এরপর অন্তত পাঁচ শ' টাকার অর্ধেক আমার নামে কালই ব্যাঙ্কে-জমা করে দেবে।

নিজের ঘরে চলে এলাম। নতুন মা হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বিকেলে সে-ই আমাকে টাকা এনে দিল। বাবার আর আমার মুখ দেখতেও আপত্তি বোধ হয়।

*　　*　　*　　*

আট হাজার টাকা পেয়ে শোভা গাঙ্গুলির বাবা পাগলের মতো করতে লাগল। হাসছে কাঁদছে আর আমাকে বারবার জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করছে। শোভার মা, কাকা আর শোভা নিজেও বাকশক্তিরহিত যেন। আমার মাথায় কিছু গণ্ডগোল আছে কিনা তাই যেন সন্দেহ তাদের। শোভার বাবা বলছে, কেমন, বলেছিলাম না, ভগবান ঠিক আবার মুখ তুলে তাকাবে।

শোভার মায়ের কোটরাগত চোখে চাপা শঙ্কা। আমাকে আড়ালে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করল, তুমি অত টাকা দিচ্ছ কেন, বাবা?

হেসেই জবাব দিলাম, মনে করুন, শোভার কোনো দাদার কিছু টাকা আছে, সে দিয়েছে।

মহিলার দু'চোখ অস্বাভাবিক চকচক করতে লাগল।

শোভার কাকাও কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, টাকাটা ঠিক কি শর্তে দিলেন, বুঝলাম না...

বিরক্তিকর। মোলায়েম সুরেই জবাব দিতে হল, ছেলে-মেয়েগুলো আর শোভা লেখা-পড়া শিখে মানুষ হবে, এই শর্তে।

ভদ্রলোক হাঁ করে আমাকে দেখতে লাগল।

এই গুমোটের মধ্যে বাতাস টানতে কষ্ট হচ্ছিল। বেরিয়ে এলাম।

সুমনদা!

অন্ধকার গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। পিছন থেকে শোভা বেশ কাছে এসে বলল, আপনি কি অদ্ভুত মানুষ!

একটা তপ্ত নিঃশ্বাস আমার মুখে লাগল। ও এবার ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে স্টুডিওতে কবে যেতে হবে?

মাথাটা আমার খারাপ কিনা আমার নিজেরই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। জবাব না দিয়ে অন্ধকার গলির মধ্যে অত বড় মেয়ের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে এসেছি।

বাড়ি ফিরে নিজের অনুভূতিপ্রবণতার বহর দেখে নিজেরই হাসি পেয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বলেছি, সুমন সরকার তুমি একটা গাধা।

অথচ ভিতরে ভিতরে ঠিক তারপর থেকেই ঠাণ্ডা পরিবর্তন এসেছে একটা। আমার ক্রূর অভিলাষের আওতা থেকে শুধু শোভা নয়, মিতাও কেমন যেন মুক্তি পেয়ে গেছে। শোভা এখনো আসে মাঝে মাঝে। কৃতজ্ঞতায় ভরাট মুখ। অন্ধকার গলির সেই চড়টা যেন ওর যোগ্য পুরস্কার।

মিতা বোসের আরো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে আপত্তি নেই। মা ওকে দস্তুর মতো আশাই দিয়েছে। ওর কৃতজ্ঞতার ধরন-ধারণ অন্যরকম। লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য ও যেন যে কোনো মাশুল দিতে প্রস্তুত।...না, মাশুলও ঠিক নয় হয়তো, ও সানন্দে আশা করছে, ভবিষ্যতে ওর সঙ্গে কোনো বড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। চালাক মেয়ে, এখন একাই মায়ের সঙ্গে দেখা করে। আমার প্রতি মায়ের দুর্বলতাটুকু ও হয়তো আঁচ করতে পেরেছে। মনে মনে তাকেও আমি অব্যাহতি দিয়েছি। আমার ঠোঁটের সেই লিপস্টিকের দাগ আজও ভালো করে উঠল না, এমন একটা অসম্ভব অস্বস্তি বোধ করি মাঝে মাঝে।

সেদিন মিতা বলল, সুমন, তুমি আমাকে ঠিক আগের মতো পছন্দ করো না।

আমি অস্বীকার করি নি।—ঠিকই ধবেছ।

ও আহত মুখে জিজ্ঞাসা করল, কেন করো না?

আমি জবাব এড়াতে চেষ্টা করেছি।—তা ঠিক বলতে পারব না, হযতো আগের থেকে আমি একটু উদাব হযে পড়েছি।

ও পবিহাস ভেবে হেসেছে। কিন্তু ভিতবে ভিতবে আমি কেমন বিবক্ত বোধ করেছি।

দিন কাটে। নিজের অস্তিত্বটাই বোঝাব মতো মনে হয় এক এক সময়। ভাবি, আমি না জন্মালে এত বড় দুনিয়াটার কি ক্ষতি হত? মায়েব সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আগের থেকেও কমিয়ে দিয়েছি। তার ছবিগুলো কিন্তু খুঁটিযে দেখি: প্রায সমস্ত ছবিতেই বমণীর মাধুর্যেব দিকটা বিশেষভাবে প্রতিভাত। এই বিশেষত্ব যে গল্পে নেই, সেই ছবিতে মা অভিনয়ই করবে না। অথচ রমণী চবিত্রের এই বৃহৎ দিকটা দেখলেই ভিতরে ভিতবে এক অন্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকি আমি। মনে হয়, মা ওই রকমই মহৎ আব সুন্দর হতে পাবতো, তাব প্রতি ওপর-অলাব দাক্ষিণ্যের প্রসাদ আছে। কিন্তু মা তা হয নি।

যে উপলক্ষ নিয়ে আমি আচমকা পাগলেব মতো কাণ্ড করে বসলাম, সেও মায়ের নতুন একটা ছবি। ছবিটাব প্রশংসায সমস্ত কাগজগুলো পঞ্চমুখ। দিনেব পর দিন 'হাউস ফুল' যাচ্ছে। দেখব দেখব কবেও দেখা হযে ওঠে নি অনেক দিন। যশোদা কতবার বলেছে, শিল্পী কাকে বলে মায়ের এই ছবিতে দেখে আসুন।

টিকিট পেয়ে সেদিন হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলাম। ফলে মানসিক প্রস্তুতির অভাব ছিল। ছবিটা যতো দেখছি, শরীরের সমস্ত রক্তকণাগুলো যেন ফুটে ফুটে মাথার দিকে ধাওয়া করছে আমার। কাহিনীর বিষয়বস্তু এক মদ্যপ স্বামীর সংশ্রব ত্যাগ করে পাঁচ বছরের ছেলে নিয়ে নিরুদ্দেশ তার তেজস্বিনী মা। তার একমাত্র সঙ্কল্প—ছেলেকে বাপের মতো হতে দেবে না, তাকে সে নিজের আদর্শে মানুষ করবে। কিন্তু অন্তরায় তার বয়স, অন্তরায় তার রূপ যৌবন। আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত তেজে এই সব অন্তরায় সে প্রতিহত করতে পেরেছে। কিন্তু বিধাতার নির্মমতম পরীক্ষা সামনে তখনো। ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ল, তার জীবন সঙ্কট। হাসপাতালের যে বিরাট ডাক্তারটির ওপব প্রধান

নির্ভর, সেই মানুষটি এক প্রবল পুরুষ—রমণীব প্রতি যার সজাগ চুলচেরা দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি রমণীর মহিমা আবিষ্কার করতে জানে। নামজাদা সেই ডাক্তার পুরুষের মতই সবল হাত বাড়িযেছে ছেলেটির মায়ের দিকে।...একদিকে ছেলের জীবন, অন্যদিকে সত্তার সংঘাত। মহিলা এই মদ্যপ স্বামীকেই ভালবাসে, ছেলের ভিতব দিয়ে আদর্শের একটা সাদা নজির রেখে যেতে চায় তার কাছে। শেষ পর্যন্ত বিচিত্র সংঘাতেব মধ্যে দিয়ে আদর্শেরই জয, মহিলাব নিখাদ রমণীসত্তা এক শুচিশুভ্র দীপ্ত মাধুর্যে ভাস্বর —প্রবল পুরুষ সেই ডাক্তাবও অবনতমস্তক তার কাছে...সুস্থ ছেলের হাত ধবে সে যখন বিদায় নিযে হাসপাতাল থেকে চলে যাচ্ছে, নামজাদা সেই ডাক্তারেব দু'চোখ আনন্দে চিকচিক কবছে, সে তাব সহকারীকে বলছে, এমন মা-ও যে দেশে আছে, সে দেশেব দুর্ভাগ্য, কে বলে?

সেই ছবি দেখার পব সমস্ত বাত আব তাব পরদিন সমস্ত সকাল আমার মাথায দাউদাউ আগুন জ্বলেছে শুধু। দুপুবের দিকে অসহ্য লাগতে বাস্তায বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম। আশা কবছি, বাড়িতেই পাব মাকে, গত বাতে নতুন মা বলছিল, দিদিব জ্বর হযেছে একবার দেখে আসি, চল।

আমি কেন চলেছি, কৈফিযত নিতে? মায়েব সঙ্গে যে অদৃশ্য বন্ধনটুকু আছে, নির্মমভাবে সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে? নাকি জীবনেব এতবড মিথ্যেকে অভিনয কবে এমন সত্যের রূপ দিতে পেবেছে বলে কনগ্র্যাচুলেট করতে?

আমি জানি না, কেন যাচ্ছি। ভিতরটা কি যেন এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তিব আঘাত হানাব জন্য অস্থিব কঠিন।

দারোয়ান চেনে, সে সেলাম ঠুকল। দোতলার সিঁড়ির বারান্দার দূরেব কোণে আয়া দুটো তকতকে মেঝেতে পড়ে ঘুমুচ্ছে। নিঃশব্দে পর্দা সরিয়ে মায়েব ঘরে ঢুকলাম।

তারপরেই চিত্রার্পিতেব মতো দাঁড়িযে গেলাম।

পালঙ্কে শুযে মা ঘুমুচ্ছে। তাব একদিকেব কাঁধে মাথা বেখে বলতে গেলে প্রায বুকের ওপর শুযে যশোদা ঘুমুচ্ছে। ওর একটা হাত মাযেব বুকটা বেষ্টন কবে আছে। মাযের বুকে যশোদা আধাআধি উপুড হয়ে শুযে আছে।

অপলক চোখে দেখছিলাম। একটা ঝাঁকুনি খেযে সজাগ হলাম। ঝাঁকুনি নয, শযতানেব চাবুক, মগজের মধ্যে শযতানের কাটাছেঁড়া। শবীরের রক্ত এখন বুঝি চোখ দিয়ে ফেটে বেরিয়ে মুখেব দিকে গড়াবে। নিজেব রক্তেব নোনা স্বাদ আমি আগেই পাচ্ছি কেন?

যেমন এসেছিলাম তেমনি নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিযে এলাম। দারোয়ানটা এবই মধ্যে আমাকে চলে যেতে দেখে অবাক হল একটু।

না, আমাব মাথায় বুকে সর্বাঙ্গে এমন আগুন আর কখনো জ্বলে নি। এ-আগুন আমি নেভাতে চাইনে, এ-আগুনে আমি সব কিছু ধ্বংস করতে চাই।

অপ্রত্যাশিত সুযোগ মিলল। মাথা ঠাণ্ডা থাকলে ওপর-অলার এ-চক্রান্ত ধরতে পারতুম। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা আর বোধহয় এ-জীবনে হবে না।

ঘুবতে ঘুবতে জিতু পোদ্দাবেব আড্ডাব জাযগায এসেছি। তখন বিকেল। আমাকে দেখে ওবা আনন্দসূচক ধ্বনি ছাড়ল একটা। জিতু বলল, চাঁদুব যে দেখাই নেই আজকাল, বলি প্রেমে-টেমে পড়লে নাকি কাবো?

ঘবে তখন চাবজন ছিল ওবা। ওদেব কাছে আমাব এখন মান খুব। শোভা গাঙ্গুলিব বাপেব হাতে আট হাজাব টাকা দিযেছি। মনা গাঙ্গুলি সেটা এদেব কাছে গোপন বাখে নি। জিতু আড়ালে আমাকে বলেছিল, একটা মেযেব জন্য আট হাজাব—ওই টাকায যে অমন আটটা মেযে ঘাযেল কবা যেত, দোস্ত...।

এবপব থেকে আমাব টাকাব সম্বন্ধে ওবা নিজেদেব মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা কবেছে, বুঝতে পাবি। আমাকে দেখলেই সকলে ছেঁকে ধবে, ভালো-মন্দ একটু হযে যাক, বন্ধু—

ওদেব ভালো-মন্দ মানে মদ। জিতুব বাছাই দলকে অনেকদিন বাব-এ নিযে গেছি। ওদেব সঙ্গে আমিও গিলেছি। তবল পদার্থ বুকেব ভিতবটা জ্বালিযে দিযে জঠবে নেমেছে। এটা মন্দ লাগে না। একটা যন্ত্রণা দিযে আব একটা যন্ত্রণা ঘাযেল কবাব মতো। পবে আবো ভালো লাগে।

সেদিনও আপত্তি না কবে বাব-এ নিযে গেলাম। আমাব নিজেবই দবকাব ছিল।

ওদেব আনন্দ সবে জমাট বেঁধেছে তখন। জিতু হঠাৎ বলল, কাববাবে মন্দা পড়েছে এখন, শালাবা সেযানা হযে উঠেছে, দলে একটা মক্ষীবাণী থাকলে বেশ হত. টোপ ফেলে অনেক মক্কেল ঘাযেল কবা যেত, নিজেদেবও আনন্দে কাটত।

এটাই ওপবতলাব কাবসাজি। শযতানেব এই টোপ যে শুধু আমাব উদ্দেশেই ফেলা, কি কবে বুঝব। নেশা শুরুব মুখে মনেব মতো আলোচনাব বসদ পেযে ওবা উদ্দীপিত। হৈ-হৈ কবে সকলে গুরুব প্রস্তাবনাব তাবিফ কবল। সকলে একবাক্যে স্বীকাব কবল, সুশ্রী চালাক-চতুব একটি মক্ষীবাণী সংগ্রহ কবা গেলে কাববাব জামিযে তোলা যায বটে। কিন্তু আসল সমস্যা তেমন মক্ষীবাণী জোটানো যায কি কবে।

আমাব মগজেব মধ্যে অদ্ভুত দাপাদাপি শুরু হযে গেল তক্ষুণি। মাযেব ওই অভিনযেব পুবস্কাব দিতে হবে...একটাই পুবস্কাব তাব যোগ্য। যশোদাকে তাব বুক থেকে ছিনিযে নিতে হবে, ছিনিযে নিযে মাযেব বুক আবো খালি কবে দিতে হবে। এটুকু পাবলেই শুধু আমাব মাথাব আগুন বুকেব আগুন নিভবে। সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়োবে।

ঘোলাটে চোখে তাকালাম ওদেব দিকে। অপ্রত্যাশিত উক্তি শুনে ওদেব নেশা চটে যাবাব দাখিল।

আমি পাবি জুটিযে দিতে, কিন্তু তোমবা তাকে আগলে বাখতে পাববে? মক্ষীবাণী বানাতে পাববে?

এক নিঃশ্বাসে গেলাস খালি কবে জিতু পোদ্দাব বলল, জান কবুল, পাবলে সেদিন থেকে তুমিই আমাদেব গুরু। সত্যি পাববে, না মদেব ঝোকে বলছ?

আমি মাথা নাড়লাম। সত্যি পারব। তোদের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দেব।

জিতু পোদ্দারের তবু সংশয়, কেমন দেখতে?

তোমরা যা আশা করছ তার থেকে ভালো।

ওদের বুকের তলায় একটা উত্তেজনার ঝড় বইতে লাগল যেন। শুধু মনা গাঙ্গুলি হা করে দেখছে আমাকে। ভাবছে, হয়ত বোনের দুঃখে দরাজ হাতে আট হাজার টাকা দিয়ে ফেলতে পারে যে তার মুখে এই প্রস্তাব সম্ভব কি করে।

জিতু বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, হাতের মুঠোয় যদি তেমন মেয়ে পাই, দরকার হলে পিষে ফেলেও মক্ষীরাণী বানিয়ে ছাড়ব।

পরদিন সকালে জিতু পোদ্দার আর বাকি তিনজনের সঙ্গে বসে ঠাণ্ডা মাথায় সমস্ত ব্যবস্থার প্ল্যান হয়ে গেল।

দুটো নিস্তরঙ্গ নিথর দিন কেটে গেল।

তৃতীয় দিনে মা স্টুডিওয় গেছে, খবর পেলাম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি তার বাড়িতে হাজির। মেক আপ তুলে মায়ের বাড়ি ফিরতে সাড়ে ছ'টা।

যশোদা আমাকে দেখে একমুখ হেসে এগিয়ে এলো। আমার বরাদ্দ চা জলখাবার এসে গেল। ও এটা সেটা গল্প করতে লাগল।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। আমি প্রস্তাব করলাম, চলো একটু বেড়িয়ে আসা যাক, সঙ্গে গাড়ি আছে।

যশোদা অবাক আবার খুশিও। একটু বসুন না, মা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এসে যাবে।

তাহলে তুমি থাকো, আমি চললাম।

ওমা সে-কি, মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন না?

আমি রাগত মুখে বললাম, তুমি দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে আমার সঙ্গে বেরুবে কি না?

যশোদা ঘাবড়েই গেল। আমার খামখেয়ালী স্বভাব জানে। সমীহও করে। আমাকে খুশি রাখতে মায়ের থেকে কম চেষ্টা করে না সেও। তাড়াতাড়ি বলল, আচ্ছা আসছি, বসুন—

গাড়ি আমি চালাচ্ছি। ফাঁকা রাস্তায় গতির কাটা পঞ্চাশ মাইলের দাগ ছুঁয়েছে। পাশে যশোদা বসে। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি ওর কাছে বরাবরই একটা বিস্ময়—এমন গাড়ি চালাই, সেটাও। ও জানে না, স্কুলে পড়তেই মায়ের গাড়ি আমি কত চালিয়েছি। আর জোরে চালিয়ে মায়ের কত বকুনি খেয়েছি। কথা-বার্তা এতক্ষণ ওই বলছিল এক তরফা। তারপর ক্রমে ওর অস্বস্তি বাড়ছে, টের পাচ্ছি।

চলেছেন কোথায়?

সমুদ্রের হাওয়া খেতে।

অ্যাঁ, এতদূর! না না, আর একদিন যাব, ফিরুন, যেতেই রাত হয়ে যাবে, মা ভাববে।

আমাব সঙ্গে এসেছ, সকলেই জানে, কিছু ভাববে না।

যশোদাব মুখেব হাসি আগেই কমে গেছল। ক্রমে কথাও বন্ধ হল। ওর মুখ শুকিযে গেছে, সন্দিগ্ধ চাউনি।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছুলাম যখন সন্ধ্যা পাব হযে গেছে। একটা ভাঙা নির্জন বাগান বাড়িব খোলা ফটকেব মধ্যে গাড়ি ঢুকিযে দিলাম। যশোদা আঁতকে উঠল।—এ কোথায় আনলেন আমাকে?

আমি হাসলাম এবাবে। বেশ ভালো জাযগা।

ভাঙা গাড়ি-বাবান্দাব নিচে গাড়ি থামতে জিতু পোদ্দাবেব দল তিনটে বড বড টর্চ হাতে দৌড়ে এলো। আমি নেমে এসে এদিকেব দবজা খুলে যশোদাকে হাতে ধবে টেনে নামালাম। তাবপব জিতু পোদ্দাবেব দিকে ঠেলে দিলাম। এই নাও মক্ষীবাণী।

তিনটে টর্চই যশোদাব নির্বাক বিবর্ণ মুখেব ওপব জ্বলে উঠেছে। ওদেব চোখে মুখে চাপা উল্লাস। টর্চ নিভে গেল। জিতু খপ কবে যশোদাব একটা হাত ধবে ভিতবেব দিকে টানল, চলো গো সুন্দবী, কিছু ভয নেই।

পিছন ফিবে অন্ধকাবে আমাব দিকে চেযে যশোদা অস্ফুট আর্তনাদ কবে উঠল, সুমনদা!

আমাব কানেব ভিতবটা জ্বলে যেতে চাইল বটে কিন্তু জ্বলতে দিলুম না।

সামনে মস্ত ঘব। দবজা-জানালা বন্ধ, ভিতবে পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। পাশেব ঘব দুটোয হাবিকেন জ্বলছে টিমটিম কবে। যশোদাকে বড ঘবে টেনে এনে মাঝেব গদি-আঁটা মযলা ফবাসেব ওপব জোব কবে বসিযে দিল জিতু। তাবপব খুশিব আতিশয্যে আমাব পা ছুঁযে একটা প্রণাম কবল। দেখাদেখি বাকি তিনজনও।

ভযে কণ্টকিত যশোদা বিস্ফাবিত নেত্রে আমাকে দেখছে। আমাব মুখে শযতানেব হাসি দেখছে বোধহয।

বললাম, এতদিন একবকমেব অভিনয কবেছ, এখন মক্ষীবাণী হযে ঢেব বেশি বাস্তব অভিনয কববে, অত ঘাবডাবাব কি আছে?

যশোদা হঠাৎ ডুকবে কেঁদে উঠল, তাবপব চিৎকাব কবে বলতে লাগল, আমাকে মাযেব কাছে দিযে এসো সুমনদা, তোমাব পাযে পডি, আমাকে মাযেব কাছে দিযে এসো—

আমাব কান দুটো আবাব জ্বলে যেতে চাইছে বলেই ভিতবে ভিতবে আবো নৃশংস আমি। জিতু শক্ত হাতে ওব মুখ চেপে ধবে গলা বন্ধ কবে দিল। তাবপব কোমবে গোঁজা বিভলভাবটা টেনে বাব কবে দেখালো। অন্যহাতে ওব কাঁধ ধবে দুটো ঝাঁকুনি দিযে বলল, মেযেছেলে খুন কবাব সাধ নেই, কিন্তু দরকাব হলে বাধাও নেই—বুঝে-শুনে অবাধ্য হযো।

যশোদা আবাব নির্বাক, স্তব্ধ। এব পবেও ও শুধু আমাব দিকেই চেযে আছে কেন। বিবক্তিকব।

এতবড় সৌভাগ্য জিতু আর তার সঙ্গীরা কল্পনাও করতে পারে নি। লোলুপ চোখে ওরা যেন সর্বাঙ্গ জরিপ করছে মেয়েটার। পারলে এখনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে খায়। এই রাতেই ওরা সর্বনাশ করবে মেয়েটার, আমি ওকে রক্ষা করতে পারব না।

বিরক্তিকর। রক্ষা করার কথা ভাবতে যাচ্ছি কেন? রক্ষা করব বলে ধরে এনেছি! তবু হঠাৎই এক বিপরীত প্রতিক্রিয়া মাথার মধ্যে ওঠা-নামা করতে লাগল। তাড়াহুড়োর ব্যাপারটাই শয়তানের অনুকূল, মায়ের বুক খালি করবই আমি, কিন্তু তবু এদের হাতে মেয়েটাকে আজই সঁপে দিতে মন চাইল না। মাঝে একটু কিছু যেন ভাবার আছে। যা করার কাল করব, সঁপে দিতে হয় কাল দেব...আর সঁপে যদি দিতেই হয় তাহলে...

লুব্ধ চোখে তাকালাম যশোদার দিকে। আমন্ত্রণ পেয়ে শয়তান এবার আমাকেই ঠেলে দিতে চাইল ওর দিকে। কিন্তু ভিতর থেকে প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছে কে?

গম্ভীর মুখে জিতু পোদ্দারকে লক্ষ্য করে সকলের উদ্দেশেই বললাম, শোনো, আনন্দে আটখানা হবার সময় নয় এখন, আনন্দ পরে করো। আর একটুও দেরি না করে বাস ধরে যে যার বাড়ি চলে যাও!

ওরা সবিস্ময়ে একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল।—সে কি! কেন?

বললাম, একটু বুদ্ধি খরচ করলেই বুঝবে, কেন।...তোমাদের মক্ষীরাণীকে আমি বাড়ি থেকে নিয়ে বেরিয়েছি, সকলেই জানে, রাত বেশি হলে মা পুলিশে খবর দেবে, পুলিশ আমাকে না পেয়ে আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী সাথী অর্থাৎ তোমাদের খোঁজ করবে। সেই খোঁজ করার আগে তারা যেন তোমাদের প্রত্যেককে বাড়িতে পায়, খোঁজ নিতে এলে তাদের ভুল রাস্তা দেখিয়ে দেবে। বলবে, একটা মেয়েকে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে যেতে দেখেছ, কিংবা উত্তর কলকাতার দিকে।

ওরা হকচকিয়ে গেল কেমন। জিতুর সঙ্গীরাও ঘাবড়াল হয়তো একটু। কিন্তু জিতু পোদ্দার বলল, আমরা যদি সকলে মিলে তোমার মতই গা-ঢাকা দিয়ে থাকি?

ক'দিন থাকবে, খাবে কি? তাছাড়া আমার মায়ের কত টাকা তোমরা জানো না—দরকার হলে হাজারখানেক পুলিশ সমস্ত জায়গা চষে ফেলবে। আর দেরি করো না, চলে যাও, কাল বেশ বেলাবেলি এসো, পরের ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে।

জিতু জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এই মেয়েটাকে তোমার মায়ের কাছ থেকে ধরে এনেছ নাকি?

হ্যাঁ।

আমার বলার মধ্যে বা চোখে মুখে এমন কিছু ছিল, যা ওরা একটুও অবিশ্বাস করল না। তাছাড়া ঠিক যে ভাঁওতা দিয়েছি ওদের, তাও নয়। কেবল এই রাতটার মতো সরাতে চেয়েছি ওদের।

যাবার আগে জিতু আমার কানে কানে অশ্লীল প্রশ্ন করল একটা। আমি মাথা নাড়লাম, অর্থাৎ সেই রকমই ইচ্ছা।

জিতু মুখ দিয়ে কুৎসিত চুকচুক শব্দ করল। তারপর চোখ দিয়েই যশোদার সর্বাঙ্গ লেহন করে বাকি তিনজনকে নিয়ে চলে গেল।

এত ত্রাসেব মধ্যেও যশোদা যেন স্বস্তি বোধ কবল একটু। তাই দেখে আমাব আবো বাগ হযে গেল। মাথাব আগুন নিভবে ভেবেছিলাম কিন্তু আবো যেন দ্বিগুণ জ্বলছে। ঘবেব মধ্যে পাযচাবি কবছি আব কি-যে উল্টো-পাল্টা চিন্তা কবছি, বুঝতে পাবছি না।

সুমনদা।

ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম। সবোষে তাকালাম ওব দিকে। যশোদা প্রাণপণে সাহসে বুক বাঁধতে চেষ্টা কবছে, বুঝতে পাবছি। কিন্তু এটুকুও আমি তচনচ কবে দিতে চাই। অথচ পাবছি না কেন?

এদিকে এসো, বোসো।

সামনে এলাম। দাঁড়িযে বইলাম। নির্দয চোখে তাকালাম।

সুমনদা তুমি এত নিচে নেমে গেছ! আমি যে বিশ্বাস কবতে পাবছি না।

বিশ্বাস কবো। তাহলে যন্ত্রণা কমবে।

না না, বিশ্বাস কবব না, তুমি এ-কাজ কেন কবলে?

মাযেব বুক খালি কবাব জন্যে।

ও স্তব্ধ একটু। তাবপব আকুতিভবা সুবে বলল, সুমনদা তোমাব মা-কে আমি মা বলি, উনি আমাব কাছে মাযেব থেকেও বড—তাই তুমিও আমাব কাছে দাদাব থেকে বেশি কিছু।

কানে যেন গলানো সীসে ঢুকল এক প্রস্থ। সবোষে জবাব দিলাম, এটা অভিনযেব জাযগা নয, বুঝলে? ধূপ কবে বসে হ্যাঁচকা টানে ওকে বুকে টেনে আনলাম।

আমি কেমন দাদা, এই বাতেই টেব পাবে সেটা।

যশোদা আস্তে আস্তে ছাড়িযে নিল নিজেকে। কেন যে ছাড়লাম, কেন যে নৃশংস পাষণ্ড হযে উঠতে পাবছি না, আমাব সেই বাগ সেই যন্ত্রণা।

বসন একটু সম্বৃত কবে নিযে ও সোজা মুখেব দিকে চেযে বইল খানিক। আস্তে আস্তে বলল, সুমনদা, একটি ছেলেকে আমি ভালবাসি, মা বলেছে আসছে ফাল্গুনে তাব সঙ্গে আমাব বিযে দেবে. তুমি কি আমাদেব দু'জনকেই পাগল কবে দেবে? আমাকে দযা কবতে পাবো না?

কি হল আমাব। আষ্টে পৃষ্ঠে এত চাবুক চালাচ্ছে কে? ভালবাসা আবাব কি জিনিস? যশোদাব ওই ঠাণ্ডা চোখেব সামনে আমি বসে থাকতে পাবছি না কেন? এই কাণ্ড কবে বসে ওবা সব ঠিক থাকল, মাঝখান থেকে আমাব মাথাটাই শুধু গণ্ডগোল হযে গেল?

উঠলাম। ঘবেব মধ্যে আবাব পাযচাবি কবতে লাগলাম। মাথায জমাট বাঁধা আগুন ঠাণ্ডা হযে আসছে কোন যাদুমন্ত্রে? পাযচাবি কবছি আব মাঝে মাঝে ওব দিকে তাকাচ্ছি। যশোদা অপলক চোখে আমাব দিকেই চেযে আছে। ওব মুখখানা এত সুন্দব লাগছে কেন এখন? দাদাব মতই সামনে গিযে ওকে আদব কবতে ইচ্ছে কবছে কেন একটু?

কি কাণ্ড, ও নাকি একটা ছেলেকে ভালবাসে। ভালবাসা নামে আছে বোধহয কিছু। নইলে যশোদাব মুখখানা এত ভালো লাগছে কেন দেখতে?

আসছে ফাল্গুনে ওদেব বিযে হবে। ছেলেপুলে হবে।...যশোদাব ছেলেব নাম কি হবে, গোপাল? কি আশ্চর্য, মাথাটা কি সত্যিই খাবাপ হযে গেল আমাব।...যশোদাব গোপালেব মুখখানা আমি চোখেব সামনে এত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কি কবে? গোপাল হাসছে খলখল কবে, যশোদা হাসছে, ওদেব হাসিতে আমাব স্নাযুগুলো সব যেন ভবাট হযে যাচ্ছে।

* * *

অন্ধকাবে গাড়ি ছুটছে। যশোদা আমাব পাশে নির্বাক বসে। ওব দিকে তাকিযে এখন আমাব কেমন হাসি পাচ্ছে।

বাড়ি। আমাব মাযেব বাড়ি। বাত তখন একটা, কিন্তু বাড়িব সব আলো জ্বলছে। গেটেব সামনে গাড়ি থামতে যশোদা নেমেই ভিতবে ছুটল। আধা-আধি গিযেই থমকে ফিবল। আবাব আমাব দিকে আসছে। আমাকে নামিযে নিতে আসছে। দোতলাব বাবান্দায কাবা ছুটে এসে দাড়াল? মা আব তাব দুই আযা বোধ হয।

সুমনদা, নামো শীগগিব।

ওকে বিষম চমকে দিযে আমি গাড়ি হাঁকিযে চলে গেলাম।

কি এক অদ্ভুত অনুভূতিব মধ্যে কেটে গেল বাতটা। সকালে জিতু পোদ্দাবেব বাড়ি এলাম। আমাকে দেখে ও হা। মক্ষীবাণীকে ঘবে ফিবিযে দিযেছি শুনে ওব চাউনি ক্রুব হযে উঠল। পবে ওব দলবল আসতে তাবাও ক্রুদ্ধ। সকলেবই অবিশ্বাস।

ওদেব ঠাণ্ডা কবতে পাঁচশ' টাকা খেসাবত কবুল কবলাম আমি। চবিত্র জানি, দুনিযা টাকাব বশ।

কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত আব স্থিব থাকতে পাবলাম না। মা-কে নয, যশোদাকে দেখাব এত লোভ আব কখনো হযনি। বোকাব মত কাল পালিযে এলাম কেন? সমস্ত দিন এভাবে না কাটিযে দাদা তাব বোনেব কাছে গিযে হাজিব হলেই তো পাবতো। এতক্ষণ গেলাম না কেন?

গেট বন্ধ। গেটেব সামনে দাবোযান দাড়িযে। ঠাণ্ডা পালিশ কবা মুখ যেন তাব। যা বলল—তাব সাবমর্ম, মাইজি আমাকে আব বাড়িতে ঢুকতে দিতে নিষেধ কবেছে।

পাযেব নিচে মাটি এত দুলছে কেন? মাথাটাই বা এ-ভাবে ঘুবছে কেন? বড়বকমেব ভূমিকম্প-টম্প হচ্ছে কিছু?

* * *

জীবন কি? দুর্নিবীক্ষ্য কোনো অদৃষ্টকাবেব ছকে বাঁধা পবিকল্পনা কিছু? সেকবম কোনো শক্তিব অস্তিত্ব আমাব জানা নেই। এব থেকে আব এক দার্শনিক জীবন-সংজ্ঞা মনে বেখাপাত কবে... আমাদেব জীবন একখানা ডাযেবিব খাতা। এতে আমবা এক গল্প লিখতে চাই কিন্তু লিখে বসি আব এক গল্প। আমাদেব সব থেকে বিনীত মুহূর্ত সেইটি, যা লিখেছি আব যা লিখতে চেযেছিলাম, এই দুই-ই পাশাপাশি চোখেব সামনে বেখে শান্ত মনে বিচাব করতে পাবি।

আমাব সঙ্গে মেলে। আমাব এক গল্প লেখাব কথা, আব লিখে বসেছি অন্য। জনাবণ্যেব মধ্যে থেকেই জীবন সার্থক কবাব সমস্ত বসদ আমাব নাগালেব মধ্যে ছিল। অথচ জন্ম-মৃত্যুব মাঝখানেব এই আল বাঁধা ক্ষেতে আমি এক নিঃসঙ্গ পথিক নিজেব গডা অন্ধকাব সমুদ্রে ছোট এক জোনাকিব মতো আশা আব নিবাশায টিপ টিপ কবে জ্বলেছি আব নিভেছি।

ভবিতব্য অনেক সময আগে-ভাগে নাকি তাব ছাযা ফেলে। আজ দু'বছব ধবে সেই ছাযা আমি অহবহ দেখতে পাচ্ছি। সেটা নডছে দুলছে আব খুব ধীবে অথচ অব্যর্থ গতিতে কাছে এগিযে আসছে। আসছেই। আমাব নিঃসঙ্গ যাত্রা পবিণামেব এক স্থিব তটেব দিকে এগিযে আসছে আব আমি যেন নিশ্চিত জানি, এ-যাত্রাব মেযাদ শেষ হযে এসেছে।

কিন্তু কেমন কবে কোন পথ ধবে এ-শেষ হবে, আমাব কোন ধাবণা নেই। এ নিযে মাথাও ঘামাই নি। জীবনেব এই বিনীত মুহূর্তটিকে এ-সব ভাবনা দিযে অত ভাবাক্রান্ত কবতে চাই নে।

তিন বছবেব মধ্যে মাযেব সঙ্গে আব দেখা কবিনি। মাযেব সঙ্গে দেখা একবাব অবশ্য হযেছে যশোদাব বিযেব বাতে। মা ত্যাগ কবলেও ওই মেযেটা আমাকে ছাডতে পাবেনি। নিজে এসে আমাকে নেমন্তন্ন কবেছে, যাবাব জন্য ঝোলাঝুলি কবেছে। গেছি। বিযেব জন্য মস্ত একটা বাডি ভাডা কবা হযেছিল, সেই বাডিতে গেছি। পবেব বছব ওব একটা ছেলে হযেছে। যশোদাব গোপাল, গোপালকে ও বাডিতে এনে আমাকে দেখিযে গেছে। আমি ওদেব শুভ কামনা কবেছি। শুভ কামনাব সেই স্বাদও আগে কখনো টেব পাই নি।

আশ্চর্য, মাযেব দবজা আমাব সামনে বন্ধ হযে গেছে, সেই জন্যে আব আমাব একটুকু বাগ নেই ক্ষোভ নেই। শুধু একটুকু অভিমান যেন মনেব কোণে লেগে আছে। তাব বেশি কিছু নয।

আমি শুধু এই নিঃসঙ্গ যাত্রাব শেষ লগ্নেব প্রতীক্ষায বসে আছি। মন কেবলই বলছে, আব খুব দেবি নেই।

কিন্তু শেষেব সেই মুহূর্ত হঠাৎ যেন একটু আডম্বব কবেই এসেছে। কিন্তু এসেছে বড অনাযাসে। খববটা খুব জাঁকজমক কবে কাগজে বেবিযেছে বোধহয, কিন্তু আমাব মতে শেষ শেষই—কেমন কবে এলো তা নিযে অত ঘটা কেন?

জিতু পোদ্দাবেব দল এই তিন বছবে দ্বিগুণ বেপবোযা হযে উঠেছিল। প্রযোজনে অনাযাসে জীবন ছিনিযে নেবাব খেলায মেতে উঠেছিল ওবা। ওব প্রধান সাগবেদ মনা গাঙ্গুলি ও আবো দু'জন।

জিতু আব আমাব দু'জনেব জীবনেব খেলাই যে একসঙ্গে ঘনিয়ে এসেছে, আচমকা ঘটনাটা ঘটে যাবাব পাঁচ মিনিট আগেও কেউ জানতুম না...বাতে দক্ষিণেব এক নির্জন বাস্তায ওদেব চাবজনেব তিনজনকে একটা বন্ধ দোকানেব বকে বসে থাকতে দেখে আমাব কেমন সন্দেহ হযেছিল, ওদেব কিছু মতলব আছে। আমাকে দেখে জিতু বলেছিল, তুমি আবাব মবতে এ-সময এখানে কেন, পথ দেখো না।

আমি হেসে বললাম, বেলা চারটে থেকে আজ শুধু পথই দেখছি, এবারে বসি একটু।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার টো-টো করে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর খবর রাখে ওরা। এই নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে। কিন্তু আজ যেন সে-রকম মুড নেই ওদের।

যেখানে বসে আছি, সেই জায়গায় অনেকখানি জুড়ে আবছা অন্ধকার। আলো নেই। এক-একটা মোটর বা ট্রাক আসছে হেড লাইট জ্বেলে, সঙ্গে সঙ্গে ওদের তিন জোড়া চোখ যেন এক সঙ্গে সেদিকে ঝলসে উঠছে।

একটু বাদে দূরের আলোয় দেখলাম, মাঝারি গতিতে একটা বড ঝকঝকে মোটর আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের তিনজনের মধ্যে চোখের ইশারা খেলে গেল।...ওরা যে-কোনো মোটামুটি পছন্দসই শিকারের আশায় বসে ছিল। শহর কলকাতার দৈনন্দিন স্বাভাবিক ঘটনা। চোখের পলকে উঠে গেল ওরা, একজন একটা ভাঙা ঠেলা সামনে ধরতেই গাড়িটা থেমে গেল। গাড়িতে সামনে ড্রাইভার আর পিছনে মাঝবয়সী একটি মহিলা। দু'জনের হাতে ঝকঝকে ছোরা উঁচিয়ে উঠল, জিতু পোদ্দারের হাতে রিভলভার।

দশ হাত দূরে বসে নির্বাক মূর্তির মতো দেখছি আমি। দরজা খুলে সঙ্গী দু'জন ড্রাইভারকে আগলে রাখতে চাইল, আর রিভলভার হাতে জিতু পোদ্দার পিছনের দরজা খুলে মহিলাকে প্রায় আধা-আধি টেনে নামালো। সেই সঙ্গে চাপা গর্জন, নেমে এসে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে গায়ে যা আছে খুলে দিন, আর সঙ্গে যা আছে দিয়ে দিন...দেরি করলে এ-জীবনে আর গয়না পরার সুযোগ পাবেন না।

আমি বিস্ফারিত চোখে দেখছি, মহিলার এক গা গয়না...সে কিছুতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে না...আমি দেখছি, একরোখা ড্রাইভারটা জোর করে নেমে এসে দু'জনের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে ছোরার ঘায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—কিন্তু তখনো মনা গাঙ্গুলিকে আঁকড়ে ধরে আছে। এদিকে মহিলাকে প্রায় টেনে নামিয়েছে জিতু পোদ্দার —মহিলা ব্যাকুল ত্রাসে হঠাৎ আমাকে দেখে আর্তনাদ করে উঠল, বাঁচাও বাবা, বাঁচাও, মেরে ফেলল, বাঁচাও—

সঙ্গে সঙ্গে কি যে হয়ে গেল আমার মাথার মধ্যে, কি যে বিভ্রম ঘটল আমার চোখের তারায়—মুহূর্তের মধ্যে মহিলার মুখ মুছে গেল। মনে হল, আমার মায়ের মুখখানা স্পষ্ট দেখলাম, মনে হল, আমার মাকে টেনে নামাচ্ছে—মেরে ফেলছে।...মেরে ফেলবেই জানি, কারণ ওদের বিলম্ব সয় না, কোনরকম বাধা বরদাস্ত করে না।

চোখের পলকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো জিতু পোদ্দারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। এই বাধার জন্য ও একটুও প্রস্তুত ছিল না, ওর রিভলভার আমার হাতে, আচমকা আঘাতে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলালো। মহিলাকে ...না দিশেহারার মতো আমার মা-কেই আমি আবার গাড়ির মধ্যে ঠেলে ঢোকাতে চেষ্টা করলাম।

আঃ। পিঠে আমার বিঁধে গেল কি, সত্তা নিঙড়ানো যন্ত্রণা একটা। তারপরেই ঠিক ঘাড়ে আবার সেই আঘাত। মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম...মাথার ওপর আরারও জিতু পোদ্দারের ছোরা ঝলসে উঠেছে।

হাতের রিভলভার আমি সজ্ঞানে ছুঁড়েছি কিনা জানি না। জিতু পোদ্দারের ছোরা আর নামল না। আমার গা ঘেঁষেই ঢলে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর আরার

একটা উদ্যত ছোবা...সামনে মনা গাঙ্গুলিব মুখ...আবাবও আমাব হাতেব রিভলভাবেব শব্দ। মনা গাঙ্গুলি তিন পাক ঘুবে মাটিতে পড়ল। হ্যাঁ তখনো জ্ঞান আছে আমাব, জ্ঞান হাবাতে দিচ্ছি না...তৃতীয় লোকটা কোথায...মা-কে কি আমি বাঁচাতে পেবেছি ?

একটা গাড়ি থামাব শব্দ। লোকজন চেঁচামেচি। একটু বাদে আবো কাবা যেন ছুটে আসছে। উত্তেজিত স্ববে কি বলাবলি কবছে সব। বমণীব গলা কানে আসছে। কাবা আমাকে টেনে তুলতে চেষ্টা কবছে।...আমাব পাশেব লোকটা মবে গেছে বলছে...পবেব লোকটা নাকি উরুতে গুলি খেযে কাতবাচ্ছে...ড্রাইভাবটা জখম হযে অজ্ঞান হযে আছে ..মহিলা তাবস্ববে সকলকে বলছে কি...আমাকে ধবাধবি কবে গাড়িতে তুলল কারা... বমণীব নবম বুকে আমাব মাথা।

আঃ। মা নাকি।

এই পবিণাম আমাব জানাই ছিল। সেটা কবে আসবে, কখন আসবে, কোন পথ ধবে আসবে বা শেষেব আসব ঠিক এই বকমই জমে উঠবে কিনা আমাব চিন্তাব মধ্যে সেটা বড হযে ওঠেনি।...তোমবাও বড কবে দেখো না। শিউবে উঠো না।

পবিণামেব এই আলোব বঙে আমাব চোখেব সামনে সমস্ত দুনিযাব বঙবদলেব উৎসব শুরু হযেছে। আমাব এই জড দেহেব শিবায শিবায এক অলক্ষ্য দক্ষশিল্পী তীব্র বেদনাব মীড টেনে চলেছে। তাই দেখে বাব বাব তোমবা শিউবে উঠছ। কিন্তু বিশ্বাস কবো, এক আসন্ন প্রত্যাশাব নিবিডতায আমাব এই নিথব দেহেব শিবা উপশিবাব তলায তলায এক অদ্ভুত স্পন্দন চলেছে।

. .নিজেব আনন্দে বিভোব, তাই তোমাদেব করুণ মুখগুলো আমি ঝাপসা দেখছি। ...মা ইন্দুমতী, তোমাব মুখখানা এমন পাথব কেন ? এতসব সেবা অভিনয কবাব পব এমন একটা সাদামাটা অঙ্কে এসে এই কাণ্ড তোমাব ? তুমি কি বুঝতে পাবছ না, মবীচিকাব প্রেতেব নাচ শেষ কবে তোমাব সুমন অনেক অনেক ব্যবধান পেবিযে যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই ফিবে এসেছে ? তুমি শিল্পী, ওপবেব ওই অলক্ষ্য শিল্পীব কাজ দেখে তুমি মুগ্ধ হতে পাবছ না ? তাহলে তোমাব পাশে তাকাও, বাবাব মুখখানা দেখো, আব তাব পাশে নতুন মাযেব মুখখানাও। এবাব পাবছ মুগ্ধ হতে ? ওপবেব ওই শিল্পী বসিক কত, বুঝতে পাবছ ?

যশোদা, তুমিও এসে গেছ। কী কাণ্ড, ঘবে তোমাব গোপাল কাঁদছে না ? আব শোভা মিত্রা তোমবাই বা খবব পেলে কি কবে ? বেডিও আব খববেব কাগজগুলো সব দেশ থেকে তুলে দেওযা যায না।

দোহাই তোমাদেব, তোমবা আব যা-ই কবো, শোক কোবো না। শোকেব অহঙ্কাবে আমি অনেক ভুগেছি। আমাব এই স্তব্ধ অনাবিল মুহূর্তগুলিকে আব শোকেব শিকল পবিও না। এই কপালে শোকেব তিলক কেটে দিযে তোমাদেব অতি সাধাবণ সুমনকে অসাধাবণ কবে তুলতে চেও না। মিনতি বাখো, শোক কোবো না।

মা ইন্দুমতী, এ-ও সত্যিই অভিনযেব বেশি কিছু নয... শোক কোবো না।

মহাবিহার

বিদায় অনুষ্ঠানেও শীলাবতীর অভ্যস্ত সংযম আর গাম্ভীর্যের ব্যতিক্রম দেখল না কেউ। মেয়েরা তাঁকে ভক্তি করত এবং ভয় করত। শিক্ষয়িত্রীরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন এবং ভয় করতেন। এই চিরাচরিত ভক্তি শ্রদ্ধা ভয় কাটিয়ে শেষ বিদায়ের দিনেও কারো পক্ষে তাঁর খুব কাছে আসা হল না যেন। সকলের কাছে থেকেও শীলাবতী যেমন দূরে ছিলেন, তেমনি দূরেই থেকে গেলেন।

অল্প দু-চার কথায় স্কুলের উন্নতি কামনা করে সকলকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন।

কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেন শীলাবতী। তাঁর বয়স চুয়ান্ন। সরকারি বিধি অনুযায়ী আরো একবছর স্বচ্ছন্দে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে বহাল থাকতে পারতেন। সরকারি চাকরির মেয়াদ আরো তিন বছর, অর্থাৎ আটান্ন পর্যন্ত টানার জল্পনা-কল্পনা চলছে, এই একবছরের মধ্যে সেই নির্দেশও হয়ত এসে যেত। মোটমাট আরো চারটে বছর অনায়াসে স্কুলের সর্বে-সর্বা হয়ে থাকতে পারতেন শীলাবতী। এই দীর্ঘকাল ধরে যেমন ছিলেন।

কিন্তু স্বেচ্ছায়, বলতে গেলে, তদরির তদারক করেই অবসর গ্রহণ করলেন তিনি তাঁর স্বাস্থ্য টিকছে না। স্কুলের এতবড় দায়িত্বভার বহন করতে তিনি অক্ষম।

এই বয়সেও তাঁর শরীরের বাঁধুনি দেখলে স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে কেউ বলবে না। চুয়ান্নকে অনায়াসে চুয়াল্লিশ বলে চালানো যায়। অবশ্য, তাঁর হার্টের রোগ, বাইরে থেকে তাই অসুস্থতার ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায় না। আর রাতে যে ভালো ঘুম হয় না, সেটা বাড়ির দুই একজন পরিচারিকা ভিন্ন আর কেউ টের পায় না। স্কুলে যখন আসেন, তাঁর ধীর-শান্ত গাম্ভীর্যের আড়ালে সব ক্লান্তি ঢাকা পড়ে যায়।

শুভার্থীজনেরা পরামর্শ দিতে এসেছিলেন, একেবারে অবসর নেবার দরকার কি, লম্বা ছুটি নিয়ে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় চলে গেলেই তো হয়, এক বছর ছুটি ছাড়া আর কখনো কোনো ছুটিই তো শীলাবতী নেননি।

শীলাবতী মাথা নেড়েছেন। জীবনভোর তো শুধু চাকরিই করলেন। চাকরি আর নয়। এবারে বাধা-বন্ধনশূন্য ছুটি।

যে-মহিলা আজীবন বিরামশূন্য কর্তব্যের মধ্যে ডুবে রইলেন, আত্মীয় পরিজনবিহীন এই ছুটি তাঁর ক্ষতি করবে বলেই অনেকের ধারণা। সময় কাটবে কি করে, আদর্শপ্রাণা মহিলা কি নিয়ে থাকবেন এর পরে?

কিন্তু বিদায় নেবার পরমুহূর্ত থেকে কেউ তাঁকে দেখলে অবাক হতেন। টাঙ্গা করে একা বাড়ি ফিরছেন তিনি। সামনের আসনে বিদায়ী মালার বোঝা। শীলাবতী আপন মনে হাসছেন মৃদু মৃদু। কে তাকে কটা দিন হাসতে দেখেছে আপন মনে? ভালো লাগছে, হালকা লাগছে। চাকরি জীবনের সব আকর্ষণ, কর্তৃত্বের মোহ, কর্তব্যের শেকল—সব ওই কণ্ঠচ্যুত মালাগুলোর মতো জীবন থেকে খসে গেছে। এই মায়া কাটানোর জন্যে দীর্ঘকাল ধরে অনেক যুঝতে হয়েছে তাঁকে, অনেক বিনিদ্র রজনী

যাপন কবতে হযেছে। ওবা জানে না, জীবনে এই প্রথম সুখেব মুখ দেখতে চলেছেন শীলাবতী।

দেখতে দেখতে এই দিনটা কাটবে। এক ঘুমে এই বাত কাটবে। সকালেব ট্রেন ধববেন তিনি। তাবপব দেডশ মাইল পথ ফুবোতে আব কতক্ষণ? শীলাবতীব আনন্দে ভবপুব চোখেব সামনে দেডশ মাইল দূবেব সেই শান্ত স্নিগ্ধ মহাবিহাবেব পবিবেশটি ভেসে উঠল। বুদ্ধ তথাগতেব চবণস্পর্শে সোনা হযে আছে যেখানকাব মাটি, যেখানকাব বাতাসে মিশে আছে তাঁব সম্বোধিবাণী, যেখানকাব ধূলিমাটিতে, স্তূপে, তপোবনে, সংগ্রহশালায ছডিযে আছে তাঁব প্রব্রজিত মহিমাব কত স্মৃতি।

কিন্তু কোনো পুণ্যস্মৃতিব আকর্ষণে ওই মহাপবিনির্বাণ স্থানে মন উধাও হযনি শীলাবতীব। তিনি সেখানে যাচ্ছেন একজনকে গ্রহণ কববেন বলে, একজনকে কাছে টানবেন বলে। খুব কাছে, একেবাবে বুকেব কাছে। সেখানকাব বহু গাইডেব মধ্যে যে ছেলেটা একেবাবে স্বতন্ত্র, এতবাব দেখাশোনাব ফলে যে-ছেলেটা এখন তাঁকে দেখলেই 'মাদাব মাদাব' বলে কাছে ছুটে আসে। মুখ খুললে অনর্গল প্রাযশুদ্ধ ইংবেজী বলে, গাল-গপ্প ফেঁদে সাগ্রহে মহাবিহাবেব ধূলি-কণা পর্যন্ত চেনাতে চেষ্টা কবে তাঁকে, তাবপব বিদায নেবাব আগে মুখেব দিকে চেযে দুষ্টু-দুষ্টু হাসে, বলে—এতক্ষণ তোমাব সঙ্গে কাটালুম, এতসব দেখালুম, ইউ সুড অ্যাটলিস্ট গিভ মি এ ফাইভ-রুপি নোট মাদাব।

তাকে। তাকেই আনতে যাচ্ছেন শীলাবতী। নিজেব অগোচবে আপন মনে আবো বেশি হাসছেন তিনি। ছেলেটা যেন তাঁব সামনেই দাঁডিযে, হাসছে মুখ টিপে। প্রতিবাবেব মতোই দুষ্টুমি কবে বলছে—মাদাব আই অ্যাম বাহুল, বিমেম্বাব মি?

একবাশ ঝাঁকডা কোঁকডানো চুল, দেখলেই মন-পাখি ওগুলোব প্রতি উৎসুক হযে ওঠে। ফবসা বঙ অযত্নে তামাটে দেখায, জোডা ভুরু, টানা চোখেব স্বচ্ছদৃষ্টি সর্বদা চঞ্চল। ঠোঁটেব ফাঁকে এক টুকবো হাসি যেন লেগেই আছে, হাসলে আবো সুন্দব দেখায। বছব চব্বিশ হবে এখন বযস, হিসেবে ভুল হবাব কথা নয শীলাবতীব —কিন্তু দেখায যেন আঠাবো-উনিশ। খুব লম্বা নয একটু বোগা ধবনেব, ট্রাউজাবেব দুই পকেটে হাত ঢুকিযে সামনেব দিকে একটু ঝোঁক নিযে হাঁটে, আব মুখে অনর্গল খই ফোটে।

গেল বাবেব কথা মনে হতে আবো বেশি হাসি পেল শীলাবতীব। তিন দিন ছিলেন, তিন দিনই মহাবিহাবে গিযেছিলেন। স্কুলে পব পব কযেকদিন ছুটি থাকলেই গিযে থাকেন। গেল বাবেব তৃতীয দিনে বাহুল অন্য-দর্শক জুটিযে ফেলেছিল তিনি যাবাব আগেই। তাকে না পেযে চুপচাপ দাঁডিযে ছিলেন। অদূবেব কতগুলো ভগ্নস্তূপেব ফাঁক দিযে ছেলেটাই প্রথম দেখল তাঁকে। দেখে তাব দল ছেডে কাছে এগিযে এল। ঠোঁটেব ফাঁকে হাসি ঝবল—তুমি আসবে, কাল বলে যাওনি তো মাদাব, আই অ্যাম এনগেজড, হাউ-এভাব, আ-অ্যাম গিভিং ইউ এ গুড গাইড।

মুখেব দিকে চেযেছিলেন শীলাবতী, হেসেছিলেনও হযত একটু আব অল্প মাথা নেডেছিলেন। অর্থাৎ, তাতে হবে না।

ছেলেটা বিব্রত হয়েছিল, আবাব একটু খুশিও হযেছিল।

—ওযেট হিযাব, লেট মি সি।

একটু বাদে দর্শকদলটিকে অন্যেব হাতে গছিযে দিযে সে ফিবে এসেছিল।

—কাম অন মাদাব, আ-অ্যাম ফব ইউ নাও।

সেদিন শীলাবতী ইচ্ছে কবেই ছেলেটাকে জ্বালিযেছিলেন একটু। এখানে যত স্মৃতি ছডিযে আছে এক বছব ধবে তাব বিববণ শুনলেও ফুবাবে না। তাঁব প্রদর্শক যে-গল্পই ফেঁদে বসে, শীলাবতী বাধা দেন, বলেন—সত্যেব মধ্যে তুমি গল্প মেশাচ্ছ, আমি তো শুনেছি এটা এই, এটাব এই-এই ব্যাপাব—

বাব কযেক থমকে গিযে ছেলেটা ঈষৎ বিস্ময মেশানো কৌতূকে নিবীক্ষণ কবেছে তাঁকে।—আব ইউ এ হিস্টোবিযান, মাদাব?

ইতিহাসে বিশেষজ্ঞা তিনি, সেটা আগে কখনও প্রকাশ পাযনি। আগে কান পেতে তিনি ছেলেটাব কথাগুলো আস্বাদন কবেছেন শুধু, তাৎপর্য খোঁজেননি। সেদিনও প্রশ্নেব জবাব এডিযে হাসিমুখে বলেছিলেন—কেন, আমাব মতো দর্শককে বোঝাতে গিযে খুব সুবিধে লাগছে না বুঝি?

অপ্রতিভ না হযে ছেলেটা দিব্যি হেসেছিল, বলেছিল—তা কেন, তোমাদেব ওই শুকনো ইতিহাস আওডালে এখানে লোক আসা ছেডে দেবে আব আমাদেবও উপোস কবে মবতে হবে।

—তা বলে লোককে বানিযে বানিযে গল্প বলবে, সত্যি বলবে না?

বড বিচিত্র জবাব দিযেছিল ওই দুষ্টু ছেলেটা। এখনো কানে লেগে আছে। মুখেব দিকে চেযে মিটিমিটি হেসেছিল আব বলেছিল।—এই বানানো গল্পই আমবা সত্যি বলে বিশ্বাস কবি, আব লোকেবও বিশ্বাস কবতে ভালো লাগে মাদাব। ভগবানেব মহিমা বলাব মধ্যে আবাব মিথ্যা কি আছে! তাছাডা, তোমাব ওই ইতিহাস যাবা লিখেছে, তাবা সব নির্জলা সত্যি লিখে গেছে, তাই বা কি কবে জানলে?

এবপব শীলাবতী আব একটাও তর্ক তোলেননি।

আবাব হাসি পাচ্ছে। বিদাযেব আগে ছেলেটা মুখখানা গম্ভীব কবে তুলতে চেষ্টা কবে অসঙ্কোচে বলেছিল—তোমাব জন্য একটা বড দল হাতছাডা কবেছি মাদাব, দিস টাইম ইউ সুড গিভ মি এ টেন-রুপি নোট।

টাকা আদাযেব বেলায ছেলে লাজ-লজ্জাব ধাব ধাবে না। ফস ফস কবে বলে বসে। ছদ্ম বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলেছিলেন শীলাবতী।—পাঁচ থেকে একেবাবে দশ। কেন, অত টাকা দিযে কি হবে?

তক্ষুণি বুঝেছে পাবে। তাই জোব দিযে বলেছিল—তোমাদেব কাছে আবাব অত কি মাদাব। কিছু বেশি পেলে একটু ভালো থাকতে পাবি, একটু ভালো খেতে পাই, একটু ভালো পবতে পাবি—অথচ ও-কটা টাকা তোমাদেব কাছে কিছু নয।

শীলাবতী ওব হাতে একটা দশ টাকাব নোট গুঁজে দিযে তাড়াতাডি চলে এসেছিলেন। সেদিন বুকেব হাড-পাঁজব টনটনিযে উঠেছিল। আজ হাসছেন। আজ নিজেব সঙ্গে সব বোঝাপডা শেষ বলেই হাসতে পাবছেন। অস্ফুটস্ববে নিজেব মনেই

বলছেন কিছু। বলছেন, বক্তে লেগে আছে সুখেব স্বাদ, ভালো থাকতে খেতে পবতে চাইবে না কেন। দেখি, এবাব থেকে কত সুখে থাকতে পাবিস তুই, আব তোকে লোকেব কাছে হাত পেতে বেডাতে হবে না।

বাড়ি।

গাম্ভীর্যেব বর্ম-আঁটা কর্ত্রীব বদলে এইদিনে একখানা হাসিখুশি মুখ দেখবে, বাড়িব পবিচাবক-পবিচাবিকা ক'টিও আশা কবেনি হযত। আবো বিস্মিত হল, কর্ত্রী তাদেব ঘবে ডেকে এনে ভাবি সদয মুখে দু মাসেব কবে মাইনে আগাম দিযে বিদায দিলেন যখন। এই বাত পোহালে তাবা অন্য কাজ দেখে নেয যেন, তিনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন।

জিনিস-পত্র একবকম গোছগাছ কবাই ছিল। স্যুটকেসটা গুছিযে নিলেন। আব যা থাকল, সকালেই হযে যাবে। স্যুটকেস থেকে শীলাবতী তাঁব তরুণ গাইডেব ছবিটা বাব কবে টেবিলে বাখলেন। হাসছেন মুখ টিপে। গাইডই বটে। বাকি জীবনটা ওই ছেলেব সর্দাবীতে চলতে হবে। ছেলেটাও যেন তাই বুঝেই হাসছে তাঁব দিকে চেযে।

ছবিটা অনেকদিন আগে শীলাবতী নিজেব হাতে তুলেছিলেন। ওব পবিচয সম্বন্ধে একেবাবে নিঃসংশয হবাবও আগে। ওকে দেখে অনেক সম্ভব-অসম্ভব যখন মনেব মধ্যে ভিড কবে আসত, তখন। ওকে দেখলে কবেকাব কোন বিস্মৃত স্মৃতিব উৎসে যখন বান ডাকত, তখন। ওব মুখেব দিকে চেযে হাসলে বুকেব শুকনো হাডপাঁজবে যখন সুখেব প্রলেপ লাগত, তখন।

তিন বছব আগে এই ছবি যে তিনি তুলে এনেছিলেন সেটা শঙ্কব আচার্যও জানতেন না। যিনি অনেক প্রত্যাশীকে বাতিল কবে এই গাইড তাঁকে ঠিক কবে দিযেছিলেন। আব সে-সময়ে কিছু গোপন কবাব জন্য যিনি সন্তর্পণে এক ছদ্ম গাম্ভীর্যেব বিবরে নিজেকে প্রচ্ছন্ন বাখতে চেষ্টা কবেছিলেন।

ছবিটা তুলে এনে শীলাবতী এই ঘবেব এই টেবিলেই বেখেছিল। দেখে পবিচিতেবা জিজ্ঞাসা কবেছেন, এ কে ?. কেউ বা সমনোযোগে দেখে শুধিযেছেন, ছোট ভাই-টাই কেউ নাকি ? অনেকটা আপনাব মতোই মুখেব আদল—

না, তখনো শঙ্কব আচার্য তাঁকে বলেননি এ কে। কিন্তু মর্মস্থলেব অনুভূতি দিযে যা বোঝবাব শীলাবতী বুঝে নিযেছিলেন। অতিথি অভ্যাগতেব প্রশ্ন এবং মন্তব্য শুনলে আশায উদ্দীপনায তাঁব মুখ লাল হত। গাম্ভীর্যেব আড়াল নিতে হত তাঁকেও।

শীলাবতীব জীবনে দুটো ঝড গেছে। একটা ছোট, একটা বড। যাঁকে কেন্দ্র কবে ওই বড ঝড, তিনি শঙ্কব আচার্য।

যা হবাব কথা নয, শীলাবতীব জীবনে একে একে তাই হযেছে। তাই ঘটেছে। ব্লাডপ্রেসাবে কাবু দবিদ্র ইস্কুল মাস্টাবেব পনেব বছবেব বিধবা মেযে সসম্মানে এম. এ. পাশ কবে নিজেব দু পাযে ভব কবে একদিন সোজা হযে দাঁডাবে—সে আশা সেদিন সুদূব স্বপ্নেব মতো ছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন সত্য হল যখন, তখন এক মর্মান্তিক আঘাতে বুক ভেঙে গেল তাঁব। সেই ভাঙা বুক আব জোডা লাগেনি।

কিন্তু সে সব অনেক পরের কথা। তার অনেক আগে ভবিতব্যের কথা। মেয়ে সুশ্রী, চৌদ্দ বছরে বিয়ে দিয়েছিলেন। এক বছর না ঘুরতে ঝড়জলে নৌকাডুবি হয়ে তরতাজা জামাই খোয়ালেন তিনি। পনের বছরের মেয়ের বৈধব্য দেখলেন। তাও সহ্য করলেন।

গঙ্গার গর্ভে যাঁকে হারালেন, তাঁকে ভালো করে চেনা হয়নি শীলাবতীর। কিন্তু প্রায় পনের বছর বাদে এক বিচিত্র গোধূলিতে সেই গঙ্গার বুকেই যে একজনকে পেলেন, তাঁকে একেবারে ছেঁটে দিতে কোনোদিনই পারেননি শীলাবতী। আগেও না, পরেও না।

তিনি শঙ্কর আচার্য।

অবস্থাপন্ন, রক্ষণশীল উত্তরপ্রদেশীয় পরিবারের ছেলে। বাড়িতে বারো মাসে তের পার্বণের প্রচলন।

দূর সম্পর্কের আত্মীয় শীলাবতীদের। শীলাবতীর বাবা তাঁদেরই অনুগৃহীত ছিলেন। একই বাড়িতে এক বিচ্ছিন্ন অংশে থাকতেন। শীলাবতী বিধবা হবার পর সেই বাড়ির কৃতি সন্তান শঙ্কর আচার্যই একটা অবলম্বনের পথ দেখালেন। শঙ্কর আচার্য তখন বাইশ-তেইশ বছরের তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নবিশেষ। তাঁর আগ্রহে উৎসাহে উদ্দীপনায় হতাশার মধ্যে একটুকরো আলো দেখলেন দুঃখী পরিবারটি। শীলাবতীর পড়াশুনা চলতে লাগল।

আচার্যগৃহে একটা চাপা সংশয় দেখা গেল আরো সাত-আট বছর পরে। কুলের গৌরব অমন হীরের টুকরো ছেলে বিয়ে করতে চায় না কেন? শঙ্কর আচার্য তখন অধ্যাপনা করেন। ছোট এক ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু তিনি বিয়ের কথা কানেও তোলেন না। আরো তিন চার বছর বাদে বাড়ির লোকের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল। বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়সেও ছেলেকে বিয়েতে রাজি করানো গেল না।

চেষ্টা শীলাবতীও করেছেন। বলেছেন—ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে না। পাঁচজনে পাঁচ রকম ভাবছেন। তাঁর বিয়ে করা উচিত। তাঁর জীবনে শঙ্কর আচার্য বিধাতার পরম আশীর্বাদের মতোই এসেছেন, কেউ তাঁকে হেয় চোখে দেখলে তাঁর পরিতাপের সীমা থাকবে না।

শঙ্কর আচার্য এ-কথাও কানে তোলেননি। প্রথমে বলেছেন, ও-সব ঝামেলা পোষানোর সময় নেই তাঁর। পরে সরাসরি বলেছেন, তিনি পৈতৃক সম্পত্তির প্রত্যাশা রাখেন না, বিধবা বিবাহ করলে আপত্তি কি।

শুনে শীলাবতী কানে আঙুল দিয়েছেন। পরে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কথা তুললে শঙ্কর আচার্য ওই এক কথাই বলেন। শীলাবতীকে বেশি বিকল হতে দেখলে বলেন, একটা সমস্যাকে বড় করে তুলে লাভ কি, তার থেকে আমি যেমন আছি থাকতে দাও—বিয়ে না করলেও মানুষের দিন কাটে।

তা-ই কাটতে লাগল। এরও তিন বছর বাদে শীলাবতীর শেষ পরীক্ষা হয়ে গেল। আশাতীত ফলের ঘোষণা যেদিন কানে এল, কৃতজ্ঞতায় শীলাবতীর দুচোখ ছলছল করে উঠেছিল। এই সাফল্যের ষোল আনাই কার প্রাপ্য, এ তাঁর থেকে ভালো আর কে জানে?

সেইদিনই শঙ্কব আচার্য এক সময তাঁকে জানালেন, কিছু আলোচনা আছে। ব্যবস্থামতো এক জাযগায সাক্ষাৎ হল দুজনাব। তখনো সন্ধ্যা হযনি। কি ভেবে শঙ্কব আচার্য একটা নৌকো ভাড়া কবলেন। এই দুবেব এলাকায কেউ তাঁদেব চিনবে না। তাছাড়া একটু বাদেই দিনেব বিদাযী আলো নিশ্চিহ্ন হবে।

কিন্তু কথা কিছু হল না। মুখোমুখি দুজনে চুপচাপ বসে বইলেন। মাঝি তাব ইচ্ছেমতো নৌকা বেযে চলল।

অনেকক্ষণ বাদে শীলাবতী জিজ্ঞাসা কবলেন, কি বলবে?

শঙ্কব আচার্য হেসে বললেন—অনেক বলব, অনেক বোঝাব ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কিছুই বলাব নেই, কিছুই বোঝাবাব নেই। যা-ই বলি ঘুবে ফিবে সেটা এই ভেসে বেড়ানোব কথাই।

সমস্তক্ষণেব মধ্যে আব কথা হযনি। দুজনে মুখোমুখি বসেছিলেন—মাঝে বেশ খানিকটা ব্যবধান। দুজনে দুজনকে এক-একবাব দেখেছেন শুধু।

কিন্তু সেদিন আকাশে ষড়যন্ত্র ছিল। বাতাসে জাদুব মোহ ছিল। ভবা জ্যোৎস্নায থালাব মতো চাঁদেব বুকে সব-খোযানোব ইশাবা ছিল। সেই জ্যোৎস্না-ধোযা জলেব কলকাকলিতে সর্বনাশা কানাকানি ছিল।

শঙ্কব আচার্য হাত ধবে নৌকা থেকে নামালেন যখন, শীলাবতী তখনো আত্মবিস্মৃত, বিহ্বল। হাতেব স্পর্শেও সর্বাঙ্গ থব থব কেঁপে উঠল।

তাবপব বাত্রি। নিঝুম, নীবব বাত্রি। দবজায মৃদু শব্দ হল। শীলাবতী চমকে উঠলেন। দুই কান উৎকর্ণ। তিনি জানতেন কেউ আসবে। তিনি জানতেন বন্ধ দবজা খুলে দিতে হবে।

খুলে দিলেন।

এই বাতেব যৌবনঃবাস্তবেব আগন্তুককে ফেবাবাব সাধ্য তাঁব নেই। ফেবাবাব ইচ্ছেও নেই।

সেই বিহ্বলতাব মধ্যেই একে একে আবো অনেকগুলো বাত কেটে গেল। দিনেব অবসানে উন্মুক্ত দুটি হৃদযেব একটি প্রতীক্ষা। বাতেব প্রতীক্ষা।

এব পব শঙ্কব আচার্যই আত্মস্থ হলেন প্রথমে। তিনি ঘোষণা কবলেন শীলাবতীকে বিবাহ কববেন।

বনেদী বক্ষণশীল সংসাবে যেন বাজ পড়ল একটা। শঙ্কব আচার্যব বাবা নির্মম হযে উঠলেন। এদিকে তেমনি বজ্রাহত হযেছিলেন শীলাবতীব বাবা। তাব ওপব বুকে অপমানেব শেল বিদ্ধ হল। বৃদ্ধ প্রভু আচার্য বড়ো নির্মমভাবে তাঁকে শাসালেন, বিশ্বাসঘাতক বেইমান বললেন, সেই মুহূর্তে মেযে নিযে তাঁকে দূব হযে যেতে বললেন।

সেই মুহূর্তে না হোক, দুদিনেব মধ্যে শীলাবতীব বাবা বড়ো আঘাত নিযে এই জগৎ-সংসাব থেকেই দূব হযে গেলেন। ব্লাডপ্রেসাবেব বোগী, কটূক্তি শুনতে শুনতেই এক সময মাথা ঘুবে পড়ে গেলেন। মৃত্যুব দু ঘণ্টা আগে একখানা হাত তুলে কিছু যেন নিষেধ কবতে চেষ্টা কবেছিলেন শীলাবতীকে। সেটা আব কেউ না বুঝুক শীলাবতী বুঝেছিলেন।

একটা সামান্য চাকরি সংগ্রহ করে শীলাবতী বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন। কিন্তু শঙ্কর আচার্য পবিত্যাগ করতে চাননি তাঁকে। স্থির সঙ্কল্প নিয়েই এসেছিলেন। ত্যাজ্যপুত্র হবেন, এতবড় বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত হবেন—বাপেব এই ঘোষণারও পরোযা করেননি। কিন্তু শীলাবতী রাজি হননি। শান্ত, দৃঢ কণ্ঠে বলেছেন—তোমাকে আমি কোনোদিন চিনতে ভুল কবিনি, তবু এখানেই এর শেষ হোক।

তাঁকে বোঝানো সম্ভব হয়নি।

শেষ সেখানেই হল না। নিজের দেহের অভ্যন্তবেই নতুন বার্তার সূচনা উপলব্ধি কবলেন কিছুদিন যেতে না যেতে। আগন্তুক আসছে। শীলাবতী এইবার বিচলিত হলেন একটু। নতুন কবে মনস্থিব কবতে হল আবার। শঙ্কব আচার্যকে ডেকে পাঠালেন।

শুনে শঙ্কর আচার্য আব এক দফা মত বদলাতে চেষ্টা কবলেন শীলাবতীর। অনেক অনুরোধ কবলেন, অনেক অনুনয কবলেন, বাগ অভিমান পর্যন্ত কবলেন। কিন্তু বিযেতে রাজি করাতে পাবলেন না তাঁকে। শীলাবতীব এক কথা, যে আসছে তাব ব্যবস্থার ভাব শুধু তুমি নাও, নিযে আমাকে মুক্তি দাও। তোমাকেও আমি তার সঙ্গে জড়াতে বলছি না, তোমাব অর্থেব জোব আছে, অনেক বকম ব্যবস্থাই তোমাব পক্ষে সহজ।

যথাসময়ে সন্তান এসেছে। নির্মম শান্ত চিত্তে শীলাবতী আটদিনের ছেলেকে তাঁর হাতে তুলে দিযেছেন। বলেছেন,—তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তোমাব ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। তুমি যে ব্যবস্থা কববে তাই আমি ওব পক্ষে ভালো বলে ধরে নেব।

এব পব অনেকদিন আব শঙ্কব আচার্য তাঁর সঙ্গে দেখা কবেননি। তবু একদিন শীলাবতীব কানে খবব এল একটা। শঙ্কর আচার্যেব বাবা তাঁকে বিষয-আশয থেকে বঞ্চিত কবাব সিদ্ধান্ত করেছেন নাকি ! তাঁর বিশ্বাস, তাঁব অবর্তমানে ছেলে শীলাবতীকেই ঘবে এনে তুলবে। শীলাবতী ভেবেচিন্তে একটা চিঠি লিখলেন শঙ্কব আচার্যকে। লিখলেন, আমাকে যদি ভালোই বেসে থাক কোনোদিন, বোকামি করে এত বড শাস্তি তুমি আমার মাথায চাপিয়ে দিও না। আমাব কাজেব ব্রত পণ্ড কোবো না, কাউকে ঘরে এনে তাব প্রতি সুবিচাব করলে আমিই সব থেকে খুশি হব।

তারপর শঙ্কব আচার্য বিয়ে করেছেন, খববটা পাওযা মাত্র শীলাবতীব বুক থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গিযেছিল যেন।

দু বছর চাব বছব বাদে এক-একবাব দেখা হযেছে তাঁদেব। আশ্চর্যবকম সহজ হতে পেরেছেন দুজনেই। গোড়ায় একবার মাত্র ক্ষণিকেব জন্য এক শিশুব প্রসঙ্গে ঈষৎ কৌতূহল দেখা গিযেছিল শীলাবতীব। শঙ্কর আচার্য হাসিমুখে বলেছিলেন, জানতে চেও না। তাব পক্ষে যা ভালো তাই করেছি।

দশ বারো বছব-বাদে শীলাবতী হঠাৎ আর একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সত্যি আছে, না গেছে ?

—আছে। ভালোই আছে। কিন্তু আজ তোমাব দুর্বলতা দেখলে আমি রাগ করব।

শীলাবতী তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করেছেন। কঠিন তাডনায় নিজেকে কর্তব্যেব পথে টেনে নিয়ে গেছেন। অবকাশ কখনো চাননি। অবকাশ শত্রু।

বছর তিনেক আগের কথা। মহাবিহারে এসেছিলেন। সঙ্গে শঙ্কর আচার্য ছিলেন। এই বয়সে নির্লিপ্ত সহজ মেলামেশাটা আরো সহজ হয়েছে।

এত গাইডের মধ্যে শঙ্কর আচার্য খুঁজে পেতে ওই বাহুলকে বার করলেন। ছেলেটা তাঁকে খুব ভালো করে চেনে আর ভক্তিশ্রদ্ধাও করে মনে হল। হঠাৎ কি মনে হতে হৃৎপিণ্ডের রক্তচলাচল থেমে আসার উপক্রম শীলাবতীর। ছেলেটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অন্তস্থলে এমন একটা আলোড়ন উঠল কেন তাঁর। এই ঈষৎ চঞ্চল মিষ্টি কচিমুখখানা বড়ো কাছের, বড়ো আকাঙ্ক্ষার এক স্বপ্নের চেনা বলে মনে হল কেন তাঁর। শঙ্কর আচার্যের মুখের অভিব্যক্তি যেন অন্যরকম।

সম্ভাবনাটা সমূলে বাতিল করতে চেষ্টা করলেন শীলাবতী। অসম্ভবই ভাবলেন। কিন্তু ছেলেটাকে ভারি ভালো লাগল তাঁর। চটপটে, ছটফটে। মুখে হাসি লেগেই আছে —আর অনর্গল কথা।

সাহস করে গাইড প্রসঙ্গে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না শীলাবতী। যা ভাবছেন, সত্যি তো নয়ই, উল্টে যে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে, তা হয়ত আর গোপন করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু বাড়ি ফিরে একটা অস্বস্তিই বড়ো হয়ে উঠতে লাগল আবার। শঙ্কর আচার্য বেছে বেছে ওকেই ডাকলেন কেন? সকৌতুকে বার বার তাঁকেই দেখছিলেন কেন? কিছুকাল বাদে আর এক ছুটিতে শীলাবতী একাই এলেন মহাবিহারে। খুঁজে খুঁজে ওই গাইডকেই বার করলেন। দিব্যি আলাপ জমে উঠল সেবারে।

এরপর মাঝে মাঝেই আসতে লাগলেন তিনি। কয়েকদিনের ছুটি পেলেই আসেন। কি এক অদৃশ্য আকর্ষণ তাঁকে যেন টেনে আনে। ছেলেটা 'মাদার মাদার' বলে হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়ায়। শীলাবতী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সে ইংরেজি বলে কেন, মাতৃভাষা জানে না?

ছেলেটা হেসে বলেছিল, জানে। তবে ছেলেবেলা থেকে মিশনে মানুষ বলে ইংরেজি বলতেই সুবিধে হয়। আরো হেসে মন্তব্য করেছিল, তোমাদের মতো শিক্ষিত দর্শকদের কাছে তার কদরও বেশি হয় মাদার।

ধারণাটা ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে আসছিল শীলাবতীর। তাঁর ঘরে ওর ছবি দেখেও তো অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে, কে হয়। তারা তো কিছু কল্পনা করে নি, তারা মিল দেখে কি করে?

আর সহ্য করতে না পেরে শেষে শঙ্কর আচার্যকে চিঠি লিখলেন। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, তাঁর ধারণা সত্যি কি না।

দিনকয়েক বাদে জবাব এল, সত্যি।

এই কটা দিন অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়েছিলেন শীলাবতী। জবাব পাওয়ামাত্র দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুখের দিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। আত্মস্থ হওয়ার পর প্রথমেই ভয়ানক রাগ হল শঙ্কর আচার্যর ওপর। অন্যের কাছে হাত পেতে জীবিকা অর্জনের পথে ঠেলে দিয়েছেন বলে জীবনে আর যেন ক্ষমা করতে পারবেন না তাঁকে। অথচ মন বলছে, ওই পথে এসেছে বলেই ছেলেটার অমন সুন্দর অমলিন মুখ আজও। দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

রাতের ঘুম গেছে শীলাবতীর। আগের দিনের চেয়ে পরের দিন শরীর বেশি খারাপ মনে হয়েছে। কাজে মন দেওয়া শক্ত হয়েছে। জানার পর আর মহাবিহারে যাননি। সব বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে, সব পিছুটান গেছে। এইবার যাবেন।

মহাবিহারে পৌঁছুলেন যখন, প্রায় বিকেল। দুপুরে সামান্য বিশ্রামের সময় বলে ইচ্ছে করেই দেরিতে এলেন একটু।

খুঁজতে হল না। হাসিখুশি মুখে সাগ্রহে সে নিজেই এগিয়ে এল। বলল, এবারে তুমি অনেক দিন পরে এলে মাদাম।

শীলাবতীও হাসলেন।—হ্যাঁ, তুমি ভালো ছিলে?

—পা-ফেকটলি। বাট অয়্যাম ইউ অল রাইট মাদাম?—তার দৃষ্টিতে ঈষৎ সংশয়।

শীলাবতীর ইচ্ছে হল দু হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে আনেন। হাসিমুখে জবাব দিলেন—ভালোই তো ছিলাম—কেন, তুমি খারাপ দেখছ?

এ-প্রসঙ্গ বাতিল করে দিয়ে ছেলেটা তড়বড় করে বলল—এস, তোমাকে শোনাব বলেই এবারে অনেক নতুন কিছু স্টাডি করে রেখেছি।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে শীলাবতী বললেন—কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে আমার অন্য কিছু কথা ছিল বাহুল।

ছেলেটা হাসিমাখা কৌতুকে দুই-এক মুহূর্ত দেখল তাঁকে। তারপর চিরাচরিত চঞ্চল ব্যস্ততায় বলল—কথা পরে শুনব, ও দিকে আলো কমে আসছে, আগে তোমাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিই, নইলে টাকা আদায় করব কোন মুখে? দিস টাইম অলসো আই এক্সপেক্ট এ টেন-রুপি নোট।

শীলাবতী সতৃষ্ণচোখে চেয়ে আছেন তার দিকে। বললেন—তার থেকে অনেক বেশিই দেব।

—রিয়েলি? হাউ লাকি!—খুশির আতিশয্যে মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল, এসো শীগগির, এরপর কিছু দেখতে পাবে না, আরো আগে আসা উচিত ছিল—

অগত্যা নিরুপায় শীলাবতী অনুসরণ করলেন তাকে। সে পাথর দেখাচ্ছে, মূর্তি দেখাচ্ছে, স্তূপ দেখাচ্ছে, আর মন্তব্য জুড়ছে। কিন্তু শীলাবতীর কানে কিছুই যাচ্ছে না। তিনি শুধু দেখছেন তাকে। খেয়াল হলে মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন, অর্থাৎ মনোযোগ দিয়েই শুনছেন যেন তিনি। একবার শুধু তার কথা শুনে বুকের তলায় মোচড় পড়েছিল একটা। একদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রাহুল বলছিল, ওটা অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্যের স্তূপ—একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল একজন তপস্যার জোরে তথাগতকে পরিতুষ্ট করেছিলেন—ওটা তাঁর স্মৃতি।

ঈষৎ অসহিষ্ণু মুখে শীলাবতী বলেছিলেন—তা তো হল, আমার কথা শুনবে কখন?

হাসিমুখেই ছেলেটা নিশ্চিন্ত করেছিল তাঁকে—আমার সঙ্গে থাকলে কেউ তোমাকে যেতে বলবে না, ছ'টা বাজুক—এই দেখো, মৃগদাব তপোবন। এবারে কত বাড়ানো হয়েছে, আর এত হরিণও তুমি গেল বারে দেখনি—মৃগদাবের গল্প জানো তো?

শীলাবতী মাথা নাড়লেন, জানেন। ছেলে আবার মহা উৎসাহে স্তম্ভ আর মূর্তি আর সংগ্রহ-বিশ্লেষণে মেতে গেল।

ছ'টা বাজল। ছ'টা পর্যন্তই নির্দিষ্ট মেয়াদ এখানকার। বড় করে একটা দম ফেলল ছেলেটা। ঈষৎ শ্রান্ত। মিষ্টি করে হাসল তাঁর দিকে চেয়ে। বলল—আচ্ছা, এবারে এস গল্প করা যাক।

একটা বড় হলের ভেতর দিয়ে কোথায় নিয়ে চলল তাঁকে জানেন না। লোকজন চলে যাওয়ায় ফাঁকা পরিবেশ স্তব্ধ লাগছে।

তাঁকে নিয়ে গোটা হল পেরিয়ে আর একটা বড় হল ঘরে এল সে। সেই ঘরে প্রায় ছাদ-ছোঁয়া বুদ্ধের এক প্রকাণ্ড মর্মর মূর্তি। ছেলেটা সোজা সেই মূর্তির পায়ের কাছে বসে পড়ে সেই পায়েই বেশ আরাম করে ঠেস দিল। নরম করে একটু হেসে বলল—কাজ না থাকলে আমি এখানে বসে বিশ্রাম করি। ভালো লাগে। তুমি ওই শিলার ওপর বোস মাদার, তারপর বল কি কথা আছে—

শীলাবতী বসলেন। কি এক অস্বস্তি যেন তাঁকে পেয়ে বসছে। তবু সঙ্কোচ করলে চলবে না। মৃদু শান্ত মুখেই বললেন—তোমাকে আমি নিতে এসেছি, আমার সঙ্গে চল, আমার কাছেই থাকবে তুমি।

এটুকু মাত্র বলে নিজেই বিস্মিত তিনি। শোনামাত্র বিষম অবাক হবে ভেবেছিলেন, হতভম্ব হবে ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রাহুল হাসছে মিটিমিটি। তার মুখে চোখে অপ্রত্যাশিত কিছু শোনার চিহ্নমাত্র নেই। এমন সুন্দর হাসিও শীলাবতী আর যেন দেখেননি।

একটু অপেক্ষা করে খুব সহজ মুখে রাহুল বলল—মাদার, তুমি কে আমি জানি। গেল বারে মিস্টার আচার্য বলেছেন। আমার বাবা কে বলেননি, কিন্তু তোমাকে তিনি চিনিয়ে দিয়ে গেছেন। তুমি একদিন এই ইচ্ছে নিয়ে আসবে জেনেই হয়ত তিনি জানিয়ে রাখা দরকার মনে করেছিলেন—

আশায় আশঙ্কায় শীলাবতীর সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলি কাঁপছে থরথর করে। জীবনের চরম কথা অথবা পরম কথা—যা হোক একটা কিছু যেন তিনি শুনবেন এক্ষুনি।

বুদ্ধের মসৃণ পায়ের দিকটায় হাত বুলাতে বুলাতে খুব মিষ্টি করেই রাহুল আবার বলে গেল—দেখো মাদার, জন্মের পর থেকে এত বড় বঞ্চনারও এতটুকু দাগ লাগেনি যাঁর দয়ায়, এই বয়সে তাঁর পায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে আজ আর কতটুকু আশ্রয় তুমি আমাকে দিতে পারো বলো। তুমি কষ্ট পেও না, আমি খুব ভালো আছি। আমাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে তুমি নিরাশ্রয় করতে চেও না মাদার।

উঠল। শান্ত মুখে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

শূন্য ঘর।...সমুন্নত বিশাল-বক্ষ প্রসন্ননেত্র শিলাময় অমিতাভ মূর্তি।

সামনে চিত্রার্পিতা শীলাবতী।

অভিরতি

গাঁয়ের নামে নাম বউটিব।

পাহাড়ঘেঁষা রুক্ষ গ্রামটাব নাম 'ভবানী'। আর মহেশকরের ঘবের বউয়ের নাম 'ভবানীবাঈ'।

তা বিয়ের আগে নামেব মুখরক্ষা করেছিল বটে মেয়েটা। মাবাঠী রাজপুত দলবী ঘরেব মেযে। পোষ মানাতে গেলে ফোঁস কবে ওঠা স্বভাব। তার ওপব ছেলেবেলা থেকে মাথার ওপর কড়া অভিভাবক না থাকার ফলে অপবিণত বয়সের স্বাধীন ইচ্ছায বাধা-বিঘ্ন তেমন পড়ে নি। ভাই ফৌজে চাকবি করে। বছরে দু-বছরে কখনো-সখনো এসে দু-দশদিনের জন্য ঘুবে যায়। বাপ অন্ধ। বসন্ত হয়ে প্রথমে একটা চোখ গিয়েছিল, পরে দ্বিতীয়টারও দৃষ্টি গেছে। দাবিদ্র্যেব সংসাব সামাল দিতে দিতেই মাযের হিমসিম অবস্থা, মেয়েকে আগলাবে কখন?

ফলে সমযে বিযেও হয নি মেয়েটাব। ওদের ঘবে ছোট বয়সে বিয়ে হয়। তার ওপর চোখে পড়ার মতো চোখা রূপ নেই যে কেউ সেধে এসে ঘবে নিযে যাবে। মোটামুটি সুশ্রী হলেও দুবন্তপনা আব বেয়াড়াপনাব ফলে চেহারায় একটা পুরুষালি কাঠিন্য দিনকে দিন বেশি প্রাধান্য লাভ কবছিল। তাব জ্বালায অস্থির পড়শিনীদের অনেক সময মন্তব্য কবতে শোনা গেছে, ওটা মেয়ে না হযে ছেলে হলে অন্ধ বাপের কাজে লাগত, ও-মেযে নির্ঘাত হাত-পা ভেঙে বাপেব বোঝা হবে একদিন।

পারলে এমন মেয়ের হাত-পা হযত ভেঙেই দিত কেউ। হাত-পা অল্প-স্বল্প ভেঙে একটু শিক্ষা হোক এমন আশাও যে কেউ কবে না এ-কথাও হলপ করে বলা যায় না। ভোব হতে না হতে ছেলেমেযের দঙ্গল নিযে ভবানী হুড়মুড় করে একেবারে ওই পাহাডেব ডগায় গিযে উঠবে। পাহাডটাব আড়াল থেকে সূর্যোদয় হয বলেই ওটাব নাম সূবয পাহাড। সূর্যোদয় দেখে তাবা আবার দৌড়ঝাঁপ কবে নেমে আসে। এই ওঠা-নামার বেষাবেষিতে ছেলেরাও পেরে ওঠে না তার সঙ্গে। আব ওই মেয়ে জখম হওয়াব বদলে একটু আধটু জখম অন্যেব ছেলেমেয়েরাই হয়।

পাহাডের অনতিদূবে ছাতলি নদী। নামেই নদী, বারো মাস শুকনো নুড়িপাথরের হাড়-পাঁজব বার কবেই আছে। ওই শুকনো নদীতেই হুটোপুটি কবে সকলে, আর দৈবাৎ কখনো বেশি বর্ষা হলে বা বান ডাকলে আশেপাশেব বাসিন্দাবা প্রমাদ গোনে। ওই দস্যি মেয়েকে তখন রুখবে কে, সকাল-সন্ধ্যায চাববাব কবে সেই খরজলে ঝাঁপাঝাঁপি করবেই। করুক, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে ঘবের ছেলেমেয়েদেরও যে ঠেকানো-যায় না। একবাব তো একজনের মেযে ডুবতে ডুবতে বেঁচেছে, আর একবার একটা ছেলে পাথরে চোট খেয়ে পুরো একদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল।

এটা মৌজা গ্রাম, অর্থাৎ দোকান-পাট হাট-বাজার নেই। ভবানী রোজ কসবায যায় হাট-বাজার সওদাপত্র করতে। যেখানে ওসব আছে তার নাম 'কসবা'। তা সেখানেও নিত্য ঝগড়া করে আসে। যে দামে যে জিনিস পাওয়ার অভিলাষ তা আদায় না করে নড়বে না। দোকানীকে কটু কথা বলবে, সুবিধে বুঝে ভয়ও দেখাবে।

সকলেই তিক্ত বিবক্ত তাব ওপব।

এবপব আবো কিছু বযেস হতে মেযেটাব দুবন্তপনা অতটা প্রত্যক্ষগোচব না হোক, তাব বেযাডাপনাব আঁচ সকলেবই গাযে লাগে। মেযেব বিযে নিযে ওব বাপ-মাকে দুকথা শোনাতে গেলে, এমন কি দুটো সৎ পবামর্শ দিতে গেলেও ওই মেযেব বসনাব ঘাযে পালাবাব পথ মেলে না। অথচ, এ ব্যাপাবেও তাদেব তৎপব না হযে উপায কি? উঠতি বযেসেব ঘবেব ছেলেগুলো যে ওব আশেপাশেই ছোঁক ছোঁক কবে বেডায!

শেষে ওদেব এক-ঘবে কবাবই মতলব ফেঁদেছিল পাডাপডশীবা। এত বযেস পর্যন্ত অমন মেযে ঘবে পুষে বাখাটা অপবাধেবই সামিল। কত বুডো-হাবডা অন্ধ-খঞ্জ আছে, একজনেব হাতে গছিযে দিলেই তো হয।

বযস্ক মাতব্ববেবা কথাটা তুলল গাঁযেব পাটিল ও মোডল কেশবকবেব কাছে। কেশবকব প্রায বৃদ্ধ, কিন্তু বেশ সবল পুরুষ। মস্ত যোদ্ধাবংশেব সন্তান, তাকেও বীবপুরুষ জ্ঞানে মান্য-গণ্য কবে সকলে। তাদেব বীব-বংশেব অনেক কথা আজও উপকথা হযে আছে। এই গুণেই গাঁযেব পাটিল সে। গ্রামেব বিপবীত প্রান্তে থাকে। দূবে থাকলেও সুবয পাহাডেব ধাবেব এক দুর্বিনীত দুবন্ত মেযেব খবব তাব কানে আগেই এসেছিল।

এব বিহিত কবতে গিযেই এক তাজ্জব ব্যাপাব ঘটল। শুনে গ্রামবাসীবা অন্তত তাজ্জব বনে গেল। পাটিল কেশবকব নিজে এলো ভবানীব অন্ধ বাপেব সঙ্গে দেখা কবতে, সেই সঙ্গে তাব দৃপ্ত মেযেটাকেও দেখল। ডাকতে হয নি, বাপেব বিচাব হবে কথাটা কানে আসতে কোমবে হাত দিযে নিজেই সামনে এসে দাঁডিযেছিল।

তাবপব বৃদ্ধ মোডলকে আবো দুই-একদিন এসে মেযেব বাপেব সঙ্গে শলাপবামর্শ কবতে দেখা গেল। অন্ধ বাপ তাব দু-হাত ধবে আনন্দে গদগদ।

পাটিল একটা বিহিতেব মতোই বিহিত কবল বটে। শুনে প্রথমে হাঁ হযে গেল সবাই। কেশবকব নিজেব ছেলে মহেশকবেব সঙ্গে বিযে ঠিক কবেছে ভবানীব।

প্রথম বিস্ময কাটতে সকলেব হাডে হাতাস লাগল। মেযেটা মোক্ষম জব্দ হবে এইবাব।

ঈর্ষাব বদলে তাদেব এই আনন্দেবও বিশেষ একটা কাবণ আছে। মহেশকব বিপত্নীক। বছব দেডেক হল, ওব বউ বাণীবাঈ আত্মহত্যা কবেছে। বাণীবাঈযেব রূপ ছিল। সেই রূপেব জোবেই বোধহয দুর্দান্ত একবোখা মহেশকবকে সে বশ কবতে পেবেছিল। দুজনে দুজনকে ভালোবাসতও খুব। সেই বাণীবাঈ আত্মঘাতিনী হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ তাব নিন্দা কবে নি, ববং তাকে মহীযসী বলেছে। আত্মঘাতিনী হবাব কাবণ, ছেলেমানুষি কৌতূহল নিযে সে কার্তিক পূজো দেখে ফেলেছিল। সংস্কাব, সধবা স্ত্রীলোক কার্তিক পূজো দেখলে তাব অবশ্যম্ভাবী ফল বৈধব্য। বাণীবাঈ অতশত জানত না, পবে জানল। জেনে নিজেব হাতে বৈধব্যযোগ খণ্ডন কবে দিযে গেল।

মহেশকব ফৌজে চাকবি কবে তখন, বিদেশেই থাকে। বীব-বংশেব ছেলে বীবপুরুষই হয—অল্প সমযেব মধ্যেই সে হাবিলদাব হযেছিল। সুযোগ সুবিধে পেলেই এবাব বউকে নিযে আসবে ভাবছিল। তাব মধ্যে এই দুর্ঘটনা। শুনেই দেশে ছুটল সে। তাবপব চেষ্টাচবিত্র কবে চাকবিতে ইস্তফা দিযে বসল।.

সকলেই প্রায বউযেব নামে ধন্য ধন্য কবল তাব কাছে। এমন কি মহেশকবেব বাপ-মাও। কিন্তু দুই-একজন অতি নির্ভবযোগ্য পডশী-বন্ধু তাব কান বিষিযে দিযেছিল। তাবা আডালে জানালো বাণীবাঈ বৈধব্যযোগ খণ্ডন কবাব জন্য আত্মত্যাগ কবেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাব আগে কার্তিক পূজো দেখে ফেলাব অপবাধে শ্বশুব-শাশুডীব গঞ্জনাও বড কম ভোগ কবে নি। একমাত্র ছেলেব শঙ্কায তাবা বউযেব ওপব বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হযেছিল।

দুনিযায শুধু এই বাপেব মুখেব দিকে চোখ তুলে কখনও কথা বলে নি মহেশকব। এবপবেও বলল না। কিন্তু বাপেব সঙ্গে একটা নীবব বিচ্ছেদ সৃষ্টি হযে গেল।

আবাব বিযেব কথা শুনে ভিতবে ভিতবে ফুঁসে উঠল মহেশকব। বাধাব আভাস পেযে কেশবকব জানিযে দিল, বিযে না কবলে বাপেব সঙ্গে তাব কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অতএব মহেশকব বাধা দিল না। সে চাকবি কবে না, বর্ধিষ্ণু বাপেব সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেলে তাব চলবে না। এই সঙ্গে বন্ধুবান্ধবেব পবামর্শে শেষ পর্যন্ত সে আব আপত্তি কবল না। কিন্তু বাপেব সুনজবে পডে বাণীবাঈযেব জাযগা দখল কবতে যে মেযেটা আসছে—সব বাগ বিদ্বেষ গিযে পডল তাব ওপব।

এদিকে সকলেব হাড জুডলো, কাবণ তাবা ভাবল যোগ্যে যোগ্য মিলন হয়েছে। যেমন বেযাডা মেযে, তেমনি মুগুব জুটেছে। আক্কেল হযেছে।

মহেশকবকে এখনও ভযই কবে সকলে। ওই ছেলে ফৌজে চাকবি না কবলে, বা এভাবে প্রথম বউ না মবলে, তাব দাপটে গাঁযে টেকা দায হত বোধ কবি। যেমন বগচটা তেমনি একবোখা। তবে ফৌজী দলে ছিল বলে, আব নিজেকে বীবপুরুষ ভাবে বলে, আগেব সেই ছেলেমানুষি অত্যাচাবেব ঝোঁক গেছে। সমবযসীবা এখন তাকে তোযাজ কবে চলে—গাঁযেব খণ্ডোবাব সঙ্গে তাব তেজস্বিতাব তুলনা দেয। ঘোডায আসীন অসি-হস্তি খণ্ডোবা হলেন দেশবক্ষক দেবতা—মহাদেবেব অবতাব।

মদেব গেলাসেব ইযাব-বন্ধুবা ঠাট্টা কবল—স্বযং ভবানী আসছেন, এবাবে কাব দাপট বেশি দেখা যাক।...এবও তাৎপর্য আছে, ভবানী হলেন গ্রাম-বক্ষযিত্রী দেবী —প্রতি গ্রামেই ভবানী-মূর্তি আছে।

আশা সফল হল। বিযেব মাস না ঘুবতেই দেব-দেবীব খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল। একে তো কাব জাযগায এসে বসেছে নতুন বউ সেই হিসেব কবে চলে না, তাব ওপব চোখ বাঙাতে গেলে ফিবে যে-ভাবে তাকায, তা ববদাস্ত কবাব মানুষ নয মহেশকব। তাছাডা বাপ এনেছে বলে বাগ তো আছেই। ভ্রূকুটি গ্রাহ্য কবে না বলে হাত নিশপিশ অনেকদিন থেকেই কবছে, কিন্তু সেদিন মৃতা বাণীবাঈ সম্পর্কে কি একটা উক্তি কবে বসতে আব সহ্য হল না। হাতেব লোহাব মতো পাঁচটা আঙুল ভবানীবাঈযেব গালেব ওপব ফুটে উঠল।

হতভম্ব ভবানী অতিকষ্টে চোখেব জল সামলালো। দাঁতে কবে ঠোঁট কামড়ে খবচোখে মুখেব দিকে চেযে বইল।

মহেশকব শাসালো, এই মুখে ফেব ওই নাম আনবি তো মুখ একেবাবে ভেঙে দেব।

সেই থেকে শুরু। ভবানী ওই নাম মুখে এনেও মাব খেযেছে, আব স্বামীব দাপটেব ওপব দাপট কবেও মাব খেযেছে। বউ শাসন কবা একটা মনেব মতো কাজ হযেছে মহেশকবেব। আব ওই জেদী দুর্বিনীত মেযেকে শাসন কবাব ব্যাপাবে একটা সুবিধেও আছে। অত মাব খেযেও জোবে কাঁদে না, কাঁদেই না বলতে গেলে। আব শ্বশুবেব কাছে নালিশও কবে না। শ্বশুব বাড়ি না থাকলে সমান তালে রুখে ওঠে, ফলে আবো বেশি মাব খায। বাগে বিদ্বেষে ভবানীবাঈ এক-একসময স্বামীব লোকান্তবিত প্রিযা অর্থাৎ বাণীবাঈযেব উদ্দেশেও কটূক্তি কবে বসে। ফল কি হবে জেনেও কবে। অন্ধ আক্রোশে কিল-চড পড়তে থাকে তখন। ভবানীবও শক্ত সবল হাত আছে দুটো, যতক্ষণ সম্ভব যোঝে সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়তে হয। অমন অসুব শক্তিব সঙ্গে সে পাববে কেন।

কিন্তু হাল ছাড়লেও হাব মানে না। ফলে মহেশকবেব বউকে শাযেস্তা কবাব গোঁ আবো বাড়ে।

এই পুরুষেব বাতেব নিভৃত বাসনাব মুহূর্তগুলিও কেমন নির্মম হিংস্র মনে হয ভবানীব। মহেশকব জঠবে মদ ঢেলে বাসনাব তাপ জুড়তে চেষ্টা কবে প্রথম। এক-একসময বিফল হয যখন, তখনই শুধু কাছে আসে। আব আসে যখন, ভবানীব ওপব দিযে একটা বড বকমেব ধকল যায। নিষ্ঠুব জড পেষণেব মতো লাগে। মাযামমতাশূন্য পবপুরুষ কবলিত মনে হয নিজেকে।

বছব না ঘুবতে কেশবকব হঠাৎ চোখ বুজল। মহেশকবেব বউ শাসনেব স্বাধীনতা আব একটু বাড়ল। এই ক'বে আবো দুটো বছব কেটে গেল। স্বভাবেব ধাত বদলায নি কাবো। কিন্তু ভিতবে ভিতবে দুজনেই কিছুটা শ্রান্ত।

দোলেব দিন সেটা। এখানকাব যোদ্ধাবংশীযবা এই দিনে ঘটা কবে বীব-উৎসব কবে। মহেশকবেব বাড়িতেও এই বীব-উৎসব বহুকাল ধবে চলে আসছে। এ সবে মহেশকবেব উৎসাহ খুব। শিবপূজাতেও সে বীবেব মতো শোণিত-সুবাব অর্ঘ্য দেয। মদেব পাত্রে নিজেব বাহু কেটে অনেকটাই বক্ত দিযে ফেলে। প্রথমবাব তাব বক্ত দেওযা দেখে ভবানী ভিতবে ভিতবে একটু শঙ্কিত হযেছিল।

হোলিব সন্ধ্যায অতিথি-অভ্যাগতবা এসেছে মহেশকবেব বাড়িতে বীব-পূজায যোগ দিতে। একটু আগে মদ খেযে আগুনেব চাবদিকে নাচ-গান ক'বেছে সকলে। মেযে-পুরুষে আগুনেব চাবদিক ঘিবে বসেছে। এইবাব মৃত বীব ব্যক্তিদেব উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হবে, তাদেব যশেব কথা, খ্যাতিব কথা, বীবত্বেব কথা বলে এই উৎসবে আবাহন কবা হবে তাদেব। বিশ্বাস, তাদেব আত্মা আসে, এক-এক সময কোনো একটি আত্মা এসে ভবও কবে তাব পবিবাবেব বা অন্য কাবো ওপব। ভব হলে মহা আনন্দেব ব্যাপাব। যাব ওপব ভব হয, সে অজ্ঞান হযে যায। তাব মুখ দিযে মৃত আত্মা তখন কথা বলে।

সকাল থেকেই ভবানীর শরীরটা অসুস্থ ছিল। সেও ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে আছে, থেকে থেকে ঝিমুনি আসছে।

মৃত আত্মাব স্তুতি এবং আবাহনের মাঝামাঝি সময়ে দেখা গেল, সে হঠাৎ ঢলে পড়েছে! হাত-পা ছুঁড়ে কার সঙ্গে যেন যুঝতে চেষ্টা কবল একটু, তাব পরেই জ্ঞান হারালো।

হকচকিয়ে গেল সকলেই। মুখ চাওয়া-চাওয়ি কবতে লাগল। মৃত আত্মা রমণীব ওপরে ভব কবে এ-রকমটা শোনা নেই বড।

সহসা চমকে উঠল সকলে। ভবানীবাই আস্তে আস্তে উঠে বসেছে। তার চোখমুখ স্বাভাবিক নয খুব। উজ্জ্বল দুই চক্ষু মেলে সে চেয়ে আছে মহেশকরেব দিকে।

—আমি বাণীবাঈ এসেছি।

সকলে নির্বাক। মহেশকর বিমূঢ় বিভ্রান্ত। এ-বকম কণ্ঠস্ববও যেন কেউ শোনে নি আব।

তেমনি স্থিব স্পষ্ট স্ববে ভবানীবাঈযের মুখ দিয়ে বাণীবাঈ বলে যেতে লাগল, তাব স্বামী বীব, বীব স্বামীব ভালোবাসাব টানে সে কোথাও যেতে পারছে না; সর্বদা পাশে পাশে ঘুরছে। আজ সপত্নীব আশ্রযে সে স্বামীর কাছে এসেছে—এসেছে, কাবণ স্বামী সর্বদাই তাকে স্মবণ কবছে। এই আশ্রয় সে সহজে ছাডবে না, স্বামীর মন বুঝে দুঃখ-বেদনা বুঝে, সে মাঝে মাঝে আসবে।

ভবানীবাঈযেব দুচোখ আবাব ঘোলাটে হযে আসতে লাগল। মাথা আবাব ঢলে পড়ল।

ঘবেব মেযে-পুরুষেবা স্তব্ধ। মহেশকরেব মুখে বক্ত নেই।

সকলে যখন চলে গেছে, সেই রাতে স্ত্রীর শুশ্রূষায প্রথম বসেছে মহেশকর। পাখাব বাতাস কবেছে, গায়ে পিঠে হাত বুলিযে দিযেছে।

ভবানীবাঈ চোখ মেলে তাকালো তাব দিকে। মহেশকর মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল—কেমন আছিস?

ভবানীবাঈ জবাব দিল না। ক্লান্ত দুই চোখ বুজে এলো আবার।

পবের ছ-সাত মাসে সত্যিই বাব পাঁচেক বাণীবাঈযেব ভর হল ভবানীবাঈয়েব ওপর। এবারে ভব যখন হয, তখন আর বাইরেব লোক কেউ থাকে না, শুধু বাড়িব লোক থাকে। বাণীবাঈ কথা বলে মহেশকরেব সঙ্গে। মহেশকব চেযে থাকে। সব শোনে। কথা বলে না।

দেখতে দেখতে মহেশকবেব মধ্যে একটা বড বকমেব পরিবর্তন দেখা গেল। স্ত্রীকে অর্থাৎ ভবানীবাঈকে মার ধব কবা দূরে থাক, তাব ওপব বাগ পর্যন্ত কবে না। ভবানীবাঈ ইচ্ছে কবে দোষ করলেও না। স্ত্রীর দিকে তাকিযে হাসে, স্ত্রীকে আদর করতে আসে। ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে চায় না বেশিক্ষণ। তার মুখের রুক্ষ কঠিন ছাপটা ক্রমশই মুছে যাচ্ছে।

কিন্তু পরিবর্তন কিছু ভবানীবাঈয়েরও হয়েছে। বিপরীত পরিবর্তন। কারণে অকারণে তার মেজাজ চড়ে। মহেশকরের হাসি দেখলে তাব গা জ্বলে। আদর করতে

এলে তাকে ঠেলে সবিযে দিতে ইচ্ছে কবে। সে তো জানে এত আদব সোহাগ ভালোবাসা কাব উদ্দেশ্যে। সে তো উপলক্ষ মাত্র। শুধু সে কেন, মহেশকবেব এমন পবিবর্তনেব কাবণ বাইবেব লোকেবাও জানে। বাণীবাঈযেব ভব হবাব পবে সকল বৃত্তান্ত অন্যেবাই ভবানীবাঈকে সাগ্রহে শুনিযে যায়।

ভবানীবাঈযেব ভিতবে ভিতবে শুকনো টান ধবছে একটা। চোখ জ্বলে, মন জ্বলে, বুক জ্বলে। অসহ্য লাগে এক-একসময।

আশ্বিনেব দশেবাব দিন এলো।

এই দিনেব দিবাভাগে পুরুষেবা ঘোডা পূজা, অস্ত্র পূজা, শাস্ত্রগ্রন্থ পূজা কবে। মহেশকবেব এ-সব অনুষ্ঠানেও ত্রুটি নেই। সন্ধ্যায স্ত্রীবা কপালে নতুন সিঁদুব দিযে, মাথায আতপ চালেব ডালা বেখে স্বামীকে আবতি কবে। তাবপব তাকে আদব কবে বসিযে নাবকেল বাতাসা খেতে দেয। স্বামী রুপোব টাকা দেয স্ত্রীকে।

সন্ধ্যায মহেশকব ঘবে বসে আছে। কিছুব যেন প্রতীক্ষা কবছে সে। অদূবে মেঝেতে ভবানীবাঈ বসে। রুক্ষ, কঠিন মূর্তি। লোকটা বসে আছে বলেই তাব বাগ।

স্ত্রীব ভাবগতিক সুবিধেব না ঠেকলেও মহেশকব আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কবল —আমাকে ববণ কববি না, আবতি কববি না?

জবাবে ভবানীবাঈ শুধু দুই চোখে আগুন ছড়ালো এক পশলা।

মহেশকব আবাব বলল—এত ভালোবাসিস তুই আমাকে, আবতি কববি না? কব না—আমি রুপোব টাকা বেখেছি তোব জন্যে।

ভবানীবাঈ ঘোবালো চোখে তাকালো তাব দিকে, বুকেব আগুন মাথায উঠেছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল—আমি তোমাকে একটুও ভালোবাসি না, তোমাকে ভালোবাসে বাণীবাঈ।

বলতে বলতে হঠাৎ আবো ক্ষিপ্ত হযে উঠল সে, একেবাবে কাণ্ডজ্ঞান খুইযে বসল। দিশেহাবা ক্রোধে এতদিনেব সব জ্বালা যেন উদগিবণ কবতে লাগল। মহেশকবেব হাসিমুখ ঝলসে দিযে বলতে লাগল—আমি তোমাকে একটুও ভালোবাসি না, তুমি আকাট বোকা, তাই ভাবো বাণীবাঈ আসে তোমাব কাছে— তোমাব কাছে কেউ আসে না, আমাব ওপব কেউ কোনোদিন ভব কবে নি—কেউ ভব কবে না—সব আমি ইচ্ছে কবে কবি, তোমাব মতো বোকাকে ভোলাবাব জন্যে আমিই সব কবি—বুঝলে? আমি তোমাকে একটুও ভালোবাসি না, আমি তোমাকে ঘৃণা কবি, ঘৃণা কবি—

আত্মঘাতী স্পর্ধাভবে ভবানীবাঈ চেযে বইল তার দিকে।

এইবাব কি স্ত্রী-হত্যা ঘটে যাবে একটা?

কিন্তু পবমুহূর্তে ভবানীবাঈ হতভম্ব। ওই মুখে বিস্ময বিবাগ ক্রোধেব চিহ্নমাত্র নেই। মুখেব দিকে চেযে মহেশকব হাসছে। অনুবাগেব ভবপুব হাসি।

বলল—আমি জানি, আমাব কাছে কেউ কখনো আসে নি—আসে না। এই কবে শুধু তুই-ই আসিস। আমাকে যদি ভালোই না বাসবি তাহলে নিজেকে খুইযে বাণীবাঈ হযেও আমাকে পেতে চাস কেন তুই?

বাগ গেছে, ঘৃণা গেছে, ওই হাসিমুখের দিকে ভবানীবাঈ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে শুধু। দেখছে। চোখের কোণ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে, সর্বাঙ্গে কি এক অজ্ঞাত শিহরণ অনুভব করছে। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে ঘর ছেড়ে ভাঁড়ারের দিকে ছুটল সে—বরণ-ডালা সাজাতে হবে।

আজ ভবানীবাঈ স্বামীর আরতি করবে।

মান

দেয়ালের দিকে কচি আঙুল তুলে তিন বছরের ছেলে জিজ্ঞাসা করত—ও কে?

বিষ্ণুচরণ বলত, তোর মা। আর, ওই তুই, মায়ের দুধ খাচ্ছিস।

কচি ছেলেটা দৃষ্টু চোখে চেয়ে চেয়ে দেখত। করে মায়ের বুকের দুধ খেত মনে নেই, কিন্তু একটু স্মৃতির মতো কিছু যেন লেগে আছে। তাই ওই মস্ত ছবিটার মধ্যে মজার এক খোরাক পেত সে। স্তনভারের একটি তার মুখে গোঁজা, মুখের চারভাগের তিন ভাগ ওর আড়ালে পড়ে গেছে। বুকের কাপড়ের আধখানা সরিয়ে অন্যটিও তার কচি হাতের দখলে রেখেছে। অর্থাৎ ওটিও তারই সম্পত্তি।

অবোধ শিশুর এই কৌতূহলের আরো একটা কারণ থাকতে পারে। তিন বছর বয়সেই এই মাকে ত্রাসের চোখে দেখত। উঠতে বসতে কর্কশ ধমক, কিল চড়, আছাড়-ঝাঁকানি ছাড়া আদর-টাদর বড় একটা জোটে নি। সেই মা একদিন তাকে এমনি কোলে শুইয়ে দুধ খাওয়াতো, এও হয়ত শিশু-মনের কম বিস্ময় নয়।

বিষ্ণুচরণের তখন আজকের মতো ছবি-বাঁধাই আর ছবি-বিক্রির দোকান ছিল না। সে তখন এক নাম-করা ফোটো-স্টুডিওর খাস বেয়ারা ছিল। তার সততা কর্মতৎপরতা আর উপস্থিত-বুদ্ধির জন্য স্টুডিওর বিদেশী-মালিক পছন্দ করত তাকে, অন্যান্য কর্মচারী আর ফটোগ্রাফারেরাও ভালোবাসত। সকলের মাথার উপর তার মাথাটা আধহাত উঁচিয়ে থাকত বলে, স্টুডিওর অনেকে তাকে ডাকত 'লম্বাচরণ'।

বিষ্ণুচরণের চেহারাটা ভব্যসভ্য ছিল, থাকতও বেশ পরিচ্ছন্ন। সাহেবপাড়ায় স্টুডিও। কত সাহেব-মেম হোমরাচোমরা মেয়েপুরুষ ছবি তোলাতে বা ক্যামেরা কিনতে আসত ঠিক নেই। এর মধ্যে মলিন বেশ-বাস নিজের চোখেই বে-খাপ্পা লাগত বিষ্ণুচরণের, তাছাড়া মালিকও অখুশী হত। জামা-কাপড় কেনা বা সে-সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বাড়তি খরচটা সে মালিকের ওপর দিয়েই পুষিয়ে নিত।

বিষ্ণুচরণের ভিতরে ভিতরে একটা সহজাত কৌতূহলের উৎস ছিল। ফোটোগ্রাফাররা কেমন করে ছবি তোলে, সুন্দর সুন্দর মেয়ে-পুরুষেরা এমন হুবহু ছবির মধ্যে কি করে ধরা পড়ে—এই সব জানার প্রতি তার বিষম ঔৎসুক্য। হেড-ফোটোগ্রাফারের সঙ্গেই ছিল তার সব থেকে বেশি খাতির। ভদ্রলোক সত্যিকারের শিল্পী ছিল বলেই বিষ্ণুচরণের কৌতূহল প্রশ্রয় পেত। বিনিময়ে বিষ্ণুচরণও তার পাদমূলে অজস্র তৈল সিঞ্চন করত, সর্বদা তোয়াজ তোষামোদ করত তার। অসুখ-

বিসুখ হলে তাব বাড়ি গিয়ে খোঁজ-খবব নিত, এমনকি সেবা-শুশ্রূষাও কবত। তাব কাছ থেকেই বিষ্ণুচবণ গোপনে অনেক সুন্দবী মেযেব ছবিব কপি সংগ্রহ কবেছিল। আব এই ভদ্রলোকই তাব ছবি-তোলা শেখাব গুরু।

মালিকেব অগোচবে এবং অনুপস্থিতিতে স্টুডিওব দবজা বন্ধ কবে গোপনে তাব শিক্ষাব মহড়া শুরু হযেছিল। প্রথমে সস্তা ক্যামেবায হাত পাকিযেছিল সে। শিক্ষা-গুরুটি তাব মধ্যেও বোধ কবি একটা সুপ্ত শিল্পিসত্তা আবিষ্কাব কবেছিল। তাব তৎপবতা, বিচাব-বিবেচনা, সহজাত পবিমিতি বোধ, ইত্যাদি দেখে অনেক সময সে অবাক হযেছে। অবকাশ সময়ে গোপনে প্রায ঝোঁকেব বশেই ক্রমশ দামী দামী ক্যামেবায হাত দিতে দিযেছে তাকে।

কযেক বছব যেতে গুরু নিজেই তাকে পবামর্শ দিযেছে—এখানে বেযাবাগিবি না কবে কোনো ছোটখাটো ফোটোগ্রাফিব দোকানে ঢুকে পড, অনেকেব থেকেই ভালো ছবি তুলবে তুমি।

গুরুটি একাধিকবাব তাকে দিযে ফ্লাশ-বালবে কোনো প্রতিষ্ঠানেব অভ্যন্তবেব ছবি তুলিযে নিজেব বলে চালিযেও ধবা পড়ে নি।

কিন্তু বিষ্ণুচবণ এতবড স্টুডিও আব এই গুরু ছেড়ে নড়তে চায নি। এখানে থেকে উঁচু নজব হযে গেছে তাব। ক্যামেবা প্রাণেব জিনিস, চেষ্টাচবিত্র কবে গুরুব সাহায্যে ধাবে সস্তাব ক্যামেবা একটা অনাযাসে সে কিনতে পাবত, কিন্তু অতকাল আগেবও সেই দামী দামী ক্যামেবায হাত মক্স হওযাব ফলে সস্তাব ক্যামেবা তাব মনে ওঠে নি। ভগবান দিন যদি দেন কখনো, ওই দামী ক্যামেবাই একটা হবে তাব।

ইতিমধ্যে বিষ্ণুচবণ ঘবে বউ এনেছিল। তাদেব ঘবে বেশ সুন্দবী বউ বলতে হবে। মোটা-সোটা গোল-গাল গড়ন, ফবসা। বউযেব রূপ দেখে গুণেব দিকে তাকানোব কথা মনেও হয নি তাব। এই না-তাকানোব খেদ ঘোচবাব নয। যাই হোক, বিষ্ণুচবণ বিযে কবেছিল এবং যথাসময়ে ছেলে শম্ভুচবণেব আবির্ভাব ঘটেছিল।

ছেলেব যখন সাত-আটমাস বযেস, তখনই সেই অভিনব ব্যাপাবটা ঘটেছিল। স্টুডিওব মালিক দিন কযেকেব জন্য বাইবে গিযেছিল। ফলে বিষ্ণুচবণেব গুরু সর্বেসর্বা তখন। সে কাকুতি মিনতি কবে ধবেছিল গুরুকে, দুঘণ্টাব জন্য একটা ভালো ক্যামেবা দিতে হবে, দুঘণ্টার আগেই সে ফিবিযে দিতে চেষ্টা কববে—

—কাব ছবি তুলবি?

বিষ্ণুচবণ সলজ্জে জবাব দিযেছে—আজ্ঞে বউ-ছেলেব—

ক্যামেবা হাতে পেযে হাওযায উড়তে উড়তে বাড়ি এসেছে। বাড়ি বলতে ব্যাবাকেব মতো একটা একতলা দালানেব দেড়খানা ঘব। আশপাশেব ঘবেব বাসিন্দাবাও সব তাবই মতো স্বল্পবিত্তেব মানুষ।

দুপুব ভালো কবে গড়ায নি তখনো। ক্যামেবা হাতে বিষ্ণুচবণ ঘবে ঢুকে দেখে বউযেব ওই মূর্তি। মেঝেতে বসে আছে, মুখেব ঘুমেব দাগ ভালো কবে মিলায নি তখনো। আদুড গা। শাড়িব আঁচলটা বুকেব একদিক ঢেকে কাঁধে জড়িযে আছে—অন্যদিকটা অনাবৃত। ঈষৎ ঝুঁকে ছেলেব মুখে বুকেব আহাব যোগাচ্ছে। ছেলেব মুখেব

বেশীর ভাগ ঢাকা পড়ে গেছে, কাপড়ের তলা দিয়ে তাব একটা কচি হাত আহারের দ্বিতীয় সম্পদটি আগলে আছে।

দেখা মাত্র বিষ্ণুচবণের বউকে সাজগোজ কবিযে ছবি তোলাব জল্পনা-কল্পনা উবে গেল। ওদিকে কুসুমবালাও এ-সময়ে লোকটাকে দেখে অবাক হযেছে, আরো অবাক হয়েছে তার হাতেব অচেনা বস্তুটা দেখে। কিন্তু বিস্ময প্রকাশ কবার আগেই বিষ্ণুচরণ গম্ভীর মুখে বলল—চুপ। কথা বোলো না। নোড়ো না। ঠিক অমনি থাকো। কি মজা হয এক্ষুণি দেখো।

কিছু না বুঝেই কুসুমবালা অবাক চোখে চেযে ছিল তাব দিকে।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত যেতেই মজার চোটে সে আঁতকে উঠল প্রায। মুখের ওপর আচমকা ফ্ল্যাশ-বালব ঝলসে উঠেছে। বৃন্তচ্যুত ছেলেটাও কেঁদে উঠল। কিন্তু বিষ্ণুচরণের কাজ ততক্ষণে সারা। জীবনেব একটা পরম মুহূর্তকেই সে যেন ধবে ফেলেছে। দাঁত বাব কবে সে হাসতে লাগল। আব একটা ছবি তোলার কথাও মনে হল না তাব। হাসতে হাসতে, উডতে উডতে আবার স্টুডিওয ফিরে চলল।

সব অভিনব শিল্প-সৃষ্টিই এমনি আকস্মিক কিনা বলা যায় না। যে ছবি তুলল বিষ্ণুচবণ, সমস্ত জীবনেব সচেতন চেষ্টায অমন আব দ্বিতীযটি তুলতে পাববে কিনা ঠিক নেই। ছবি দেখে তাব গুরু অবাক। ছোট ছবি বড কবা হল, তাবপব আরো বড়। শেষেবটা দেড হাত প্রমাণ হল প্রায। গুরু বলল—এটা আমায় দাও, স্টুডিওব শো-কেসে বাখি—কেউ জানবে না।

বিষ্ণুচবণ বাজী হল না। ঘরেব পরিবাবেব ছবি যে...

রুচি আছে তার। বড় ছবিখানাব ওপর স্টুডিওব সব থেকে সেবা আর্টিস্টকে ধবে-পডে পাকা-রঙেব কাজ কবিয়ে নিল। কার ছবি বা কে তুলেছে ব্যক্ত না করে তাকে দিয়ে এই কাজ কবাতে বেশ কযেক টিন দামী সিগাবেট উপঢৌকন দিতে হল। কাজে হাত দিযে শিল্পেব টানেই যত্ন করে রঙের কাজটুকু করে দিয়েছিল শিল্পী। বিষ্ণুচরণ তখনো বাড়িতে কিছু বলে নি।

দামী ফ্রেমে ছবিটা একবাবে বাঁধিয়ে কাগজে মুড়ে ঘবে নিয়ে গিযে হাজিব হল একদিন। বউ তখন রান্নায ব্যস্ত। দেয়ালেও অনেক পেরেক লাগানই আছে।

জায়গা বেছে ছবিটা একেবাবে টাঙিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

ছবি দেখে কুসুমবালা প্রথমে হতভম্ব খানিকক্ষণ। তারপর তাব স্বভাবসুলভ বসনা খনখনিয়ে উঠেছিল।

—এই বস কবা হযেছিল সেই দিন, আঁ! আদুড গাযে পরিবাবকে সকলেব চোখেব সামনে টাঙিয়ে রাখাব সখ—বলি স্বভাব-চরিত্তির কি একেবাবে খেয়ে বসেছ? কি ঘেন্না, কি ঘেন্না, শীগগিব নামাও বলছি ওটা, নইলে আছড়ে ভাঙব আমি—

বউয়ের বচসায় সচরাচর চুপ করেই থাকে বিষ্ণুচরণ। অসীম ধৈর্য তার। বলতে গেলে মুখ বুজেই সহ্য করে। কিন্তু ক্বচিৎ কখনও সহ্যেব সীমা ছাডালে তখন একেবারে মারমুখী মূর্তি। তখন অতবড কুঁদুলে বউও ঘাবড়ে যায়। কিন্তু এই সামান্য কথায যে ওই মূর্তি দেখবে ভাবে নি।

বিষ্ণুচরণ ছবির দিকে দুপা এগিয়ে গেল, তারপর বউয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। অস্বাভাবিক রুক্ষ কঠিনস্বরে শাসালো—ওতে হাত দিবি তো তোর ওই হাত আমি দুমড়ে ভেঙে দেব।

রাগ হলেই 'তুমি' ছেড়ে 'তুই তুকারি' করে।

তবু সামলাতে না পেরে কুসুমবালা অস্ফুট ঝাঁঝে বলে উঠতে যাচ্ছিল—গলায় দড়িও—

—যা গলায় দড়ি তুই নিজে দে-গে যা, আমার হাড় জুড়োয় তাহলে।

দিনে দিনে তারপর ওই ছবি কুসুমবালার চোখেও সয়ে গেছে। আড়াল থেকে এক এক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ছবিটা দেখতেও দেখেছে বিষ্ণুচরণ। আর বছর তিনেক বয়েস না হতে ছেলেও ওটা চিনে ফেলেছে। ফেললেও বাপের কোলে উঠলেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করত—ও কে?

বিষ্ণুচরণের সংসার-সুখ বলতে কিছু ছিল না। দেখতে দেখতে একদিন সবই ছারখার হয়ে গেল। দুর্যোগ যেন হাঁ করে গিলতে এল তাকে। গিলেই ফেলল। তাকে আর তার সাড়ে তিন বছরের ছেলে শম্ভুচরণকে। বউ জন্মের শোধ নিল।

বউয়ের বুকে বিষ ছিল। মুখে বিষ ছিল। বিষে বিষে বিষ্ণুচরণের হাড় মাস কালি। কারণে অকারণে কোনো স্ত্রীলোকের এত রাগ সে বোধহয় আর দেখে নি। হয়ত রূপের জোরে আরো একটু সচ্ছল ঘরে পড়বে, এ-রকম আশা ছিল বউয়ের। তা না হলে বিষ্ণুচরণের অস্তিত্বটাই ওর চোখে এমন চক্ষুশূল হবে কেন। অবশ্য শুধু তার ওপর নয়, তপ্ত রসনার ঝাঁটা সে সকলের ওপরেই বুলোয়—ওর ভয়ে তার ঘরে একটা ফেরিঅলা পর্যন্ত আসে না।

অতি ক্ষুদ্র কারণে বিপর্যয় ঘটল একদিন। ঘটবে বলেই হয়ত বিষ্ণুচরণেরও কাঁধে শনি ভর করেছিল সেদিন।

কি কারণে তার তালা-বন্ধ ট্রাঙ্ক খুলে এক পাঁজা ছবি হাতে পেল বউ। যে ছবিগুলো সে তার গুরুর কাছে চেয়ে-চিন্তে সংগ্রহ করত। বেশির ভাগই নতুন বয়সের ছেলে-মেয়ের ছবি, বিচিত্র বেশ-বাসের অবাঙালী এবং বিদেশী মেয়ের ছবিও আছে অনেকগুলো। স্বামীর চরিত্রহীনতার এমন জলজ্যান্ত প্রমাণ আর বুঝি হয় না। তার ওপর বিষ্ণুচরণ ভুল করল বউয়ের হাত থেকে ছবিগুলো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে। তার ভয়, বউ ওগুলো নষ্ট করে ফেলবে।

ব্যস, তুমুল ব্যাপার শুরু হল। গলা ছেড়ে স্বামীর গুণকীর্তন বর্ণনা করতে লাগল কুসুমবালা, চরিত্রহীন লম্পট মাতাল বলে তারস্বরে গাল পাড়তে লাগল। আশপাশের বাসিন্দারা সব সচকিত হয়ে উঠল। তারাও কৌতূহলী হয়ে ভাবল, ঝুঁদুলি বউ হাতে নাতে এমন কিছুই ধরেছে, যার দরুন সাত-সকালে এই সম্ভাষণ আর এমন কুরুক্ষেত্র। তাদের উঁকিঝুঁকি দিতে দেখে কুসুমবালার স্বামী-ঝাঁটানোর ক্ষিপ্ত উদ্দীপনা ক্রমশ চড়তেই লাগল।

কতক্ষণ সহ্য করেছিল বিষ্ণুচরণ জানে না। উঠল হঠাৎ। মাথার মধ্যে দাউ-দাউ আগুন জ্বলছে।

হাতের পাঁচটা আঙুল আচমকা সাঁড়াশীর মতো বউয়েব গলায় বসে গেল। ঠেলতে ঠেলতে তাকে খুপবি ঘরটার মধ্যে নিয়ে ঢোকাল। বউয়ের দম বন্ধ, হাত ছাড়ানোর বিফল চেষ্টা—মুখ লাল।

বিষ্ণুচবণ এক ধাক্কায় দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল তাকে। দেয়ালের সঙ্গে লাগল ঠাস করে। বলল, ফের গলা খুলবি তো ওই গলা আমি চিরকালের জন্য বন্ধ কবে দেব।

বউ গলা আব খোলে নি। বিষ্ণুচবণ জামা গায চড়িয়ে তক্ষুণি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

বাগ পডতে ফিরল ঘণ্টাখানেক বাদে। কাজে বেরুতে দেবি হয়েই গেছে, চানটা করে না-খেযেই ছুটতে হবে।

বাড়ির কাছে এসে হতভম্ব। লোকে লোকারণ্য। চিৎকাব চেঁচামেচি। একটা অজ্ঞাত ভয বিদ্যুৎকষার মতো আঘাত কবল তাকে। তারপবেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল।

সেই খুপরি ঘবের দবজা ভেঙে কুসুমবালাকে বার কবতে হয়েছে। কুসুমবালাকে নয়, বীভৎস দগ্ধ একটা নারীদেহকে। সর্বাঙ্গে কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন দিযেছে কুসুমবালা। তখনো প্রাণ আছে, তখনো আর্ত-যাতনায় প্রাণান্তকর ছটফট করছে।

হাসপাতালে দুদিন বেঁচে ছিল। বেহুঁস অবস্থায ভুল বকেছে। এই পবিণামের সমস্ত আক্রোশ সে স্বামীব মাথায় ঢেলে দিযে গেছে।

বিষ্ণুচবণেব চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পডে নি। কাঁদার অবকাশও সে পায় নি। একটা মৃত্যু তাকেও নিঃসীম মৃত্যুব দিকেই টেনেছে। পুলিশের টানা-হেঁচডায একটানা দেডমাস দেহেব বক্ত শুকিযেছে, বাতেব ঘুম গেছে। দুধেব ছেলেটাকে পাশেব ঘবেব একজন আশ্রয় দিযেছে বটে, কিন্তু তাব কান্না সে-যেন কোর্ট আর থানায দাঁড়িযেও শুনেছে।

দেড মাস বাদে মুক্তি পেল। মুক্তিব বোঝা টেনে টেনে কোনো বকমে বাড়ি এল। প্রথমেই চোখে পডল দেযালে টাঙানো কুসুমবালাব সেই মস্ত বাঁধানো ছবিটা। একটানে দেয়াল থেকে ছিঁড়ে নিযে এল সেটা। আছড়ে ভাঙতে গিযেও ভাঙতে পাবল না। ওটা শুধু কুসুমবালাই নয়, তাবও ভিতবেব একটা সৃষ্টি। কিন্তু ছবিটাব দিকে আব তাকাতে পাবল না, যে আগুনে কুসুমবালা মবেছে তাব থেকে বেশি আগুন ওব বুকে সে জ্বেলে বেখে গেছে।

ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা একটা বড কাগজে প্যাক কবে ঘবেব কোণে চোখেব আডালে রেখে দিল। পরে ঘব থেকে সবাবে। দেযালেব গায়ে চৌকো কালো দাগ পডে আছে একটা। গামছা ভিজিযে ঘষে দাগটা তুলে ফেলল। তাবপব ছেলে শম্ভুচরণকে নিযে এল।

গোড়ায গোডায ছেলে কয়েকদিন আঙুল দিয়ে শূন্য দেযালটা দেখিয়ে ছবির খোঁজ করেছে, তারপর ভুলে গেছে।

দুর্যোগ একা আসে না। আসেও নি। স্টুডিওতে গিয়ে শোনে তাব ফোটোগ্রাফার গুরু বড় কাজ নিয়ে বাইরে কোথায় চলে গেছে। সেই সুযোগে ঈর্ষা যাবা কবত,

তাবা মালিককে জানিযেছে প্রশ্রয পেযে বিষ্ণুচবণ কি-ভাবে দামী দামী ক্যামেবা নিযে ঘাঁটাঘাটি কবত। ফলে মালিকও আব তাকে নেয নি।

দুই-একটা ছোটখাটো দোকানে বিষ্ণুচবণ ফোটোগ্রাফাব হতে চেষ্টা কবেছিল। কিন্তু নিজেই অবাক হযে দেখল, মূর্খ হযেও ভিতবেব আগ্রহেব তাডনায যেটুকু শিখেছিল পেশাদাবীব পবীক্ষায তাব সবটাই অচল। কাঁপা হাতে দুই একটা ছবি যা তুলে তাবপব আব কোনো প্রত্যাশা নিযে নিজেই দাঁডায নি।

প্রায বিশ বছব কেটে গেছে তাবপব।

বড বাস্তাব ফুটপাথেব গা-ঘেঁষা ছবি-বাঁধাই আব ছবি-বিক্রিব দোকান বিষ্ণুচবণেব আগে ফুটপাথে ঘুবে আব বসেই ছবি, বঙিন ক্যালেণ্ডাব, ম্যাপ ইত্যাদি বিক্রি কবত তাবপব দেড-হাত প্রমাণ বসাব জাযগা পেযেছিল একটা, পেযেই ছবি বাধাইযেব কাজ শুরু কবেছিল।

এখন মাঝাবি সাইজেব দোকান-ঘব হযেছে একটা। ঘব ভবতি ছবি ঠাসা—ছবিব ছোটখাটো গুদাম একটা। সাবি সাবি তাকে থাকে-থাকে ছবি—আব এত ছবি টাঙানো যে দেযাল দেখাই যায না। দেশ-বিদেশেব মনীষীদেব ছবি, বাজপুরুষদেব ছবি, বাজনীতিজ্ঞদেব ছবি, ধর্মাত্মাদেব ছবি, পৌবাণিক ছবি, যৌবনোজ্জ্বল চিত্রতাবকাদেব ছবি, দেব-দেবীব ছবি, স্বর্গেব ছবি, নবকেব ছবি, কল্পিত যৌবনাভিসাবিকাদেব ছবি —নেই এমন ছবি নেই।

ছবি বাঁধাইযেব জন্য স্বল্প বেতনে কাবিগব বাখতে হযেছে একজন। সাবাক্ষণ মুখ গুঁজে বসে সে ছবিব মাপে ফ্রেম ঠিক কবে, বোর্ড কাটে, কাচ কাটে, হাতুডি দিযে ঠুক ঠুক কবে। অবকাশ সমযে ছেলে শম্ভুচবণ নিজেও ছবি বাঁধে—বাঁধাইযেব কাজ সেও শিখেছে।

সম্প্রতি বাপ আব ছেলেব একটাই বাসনা সর্বদা বুকেব তলায শিখাব মতো জ্বলছে। পাশেব চিলতে খুপবিটা খালি হযেছে, সেটা পেযে গেলে দোকানটা মনেব মতো কবে সাজানো চলে। এই স্বল্প পবিসবে খদ্দেব নডতে চডতে পাবে না, অনেক খদ্দেব ফিবেও যায। ওই জাযগাটুকুব মালিকেব পাযে তেল দিযে দিযে হন্যে হযেছে বাপ ছেলে। ওই চিলতে খুপবিব জন্য সাডে সাতশ টাকা সেলামী হেঁকে বসে আছে সে—এক কপর্দকও নামাবে না। কাযক্লেশে ঘবেব জিনিস বেচে সাড়ে তিনশ টাকা সংগ্রহ কবে তাব হাতে-পাযে ধবেছে বিষ্ণুচবণ—বাকি টাকাটা মাসে মাসে ভাডাব সঙ্গে মিটিযে দেবে কথা দিযেছে। কিন্তু মালিক কর্ণপাতও কবে নি।

বাকি চাবশ টাকা ধাব পাবাবও অনেক চেষ্টা কবেছে বাপ-ছেলে মিলে, কিন্তু তাদেব ধাব দেবে কে?

তবু বিষ্ণুচবণ আশা ছাডে নি এখনো, মালিকেব আডালে অশ্লীল কটূ-কাটব্য কবে। তাব এই মস্ত ঢ্যাঙা শুকনো পাকানো দেহেব কোথাও কমনীযতাব লেশমাত্র নেই। ছেলেকেই শুনিযে বলে, ওটা না পেলে শালাকে খুন কবব আমি।

শম্ভুচবণেব বয়স এখন তেইশ। বাপেব মতো লম্বা নয আদৌ। সুশ্রী সভ্যভব্য।

তার ওপর অনেক মেহনত করে আব দোকানে খেটেও তৃতীয় বিভাগে একটা পাস দিয়েছে। অর্থাৎ রীতিমতো শিক্ষিত সে। ফলে বাপেব সঙ্গে আদৌ বনে না তার। এক ধবনের সততার আদর্শ কেমন করে যে ছেলের ভিতরে দানা বেঁধেছে, সেটা আশ্চর্য। ওদিকে বাপ ঠিক উল্টো। সততার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। মুখেব দিকে তাকিযেই খদ্দেবেব মন আর পকেট ওজন কবতে পাবে যেন। সুবিধে বুঝে দরও হাঁকে। খদ্দেব চালাক না হলে বাতকে দিন বানায, নকলকে মৌলিক বলে চালায়। অল্পবযসী মেযেবা আসে ছবি কিনতে, সভ্য-ভব্য ছেলেব দিকে আড়ে আড়ে তাকায় বিষ্ণুচবণ। ছেলে সবিনয়ে দব বলাব আগেই একটা দব হেঁকে বসে সে। বলে—ওই ছবিব ওই দাম...মাযেবা বাজাব ঘুবে দেখে আসুন, তফাৎ বুঝবেন।—তাবপরই সেই ছবিব প্রসঙ্গে মিথ্যে আজগুবি গল্প ফেঁদে বসে। শম্ভুচরণ অস্বস্তি বোধ কবে।

শুধু এই নয়। খদ্দেব বুঝে নিবিবিলিতে গুদামেব কোণাঘুপচি থেকে এমন সব ছবি বাব কবে বাবা, যা দেখলে শম্ভুচবণের কান লাল হয। অশ্লীল, নগ্ন ছবি। কোথা থেকে যে এসব সংগ্রহ কবে ভেবে পায না। আব এই সব ছবিই চড়া দামে বিকোয। এক একটাব অবিশ্বাস্য দামও মেলে। এই সব কারণে, ছেলে কোনোদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখে নি বাপকে।

সেদিন এই বাপ-ছেলেব বিধাতা একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হযেছিলেন বোধ করি। নইলে এ বকম হবে কেন!

বাত ন'টা বাজে। দোকান বন্ধ কবাব উদ্যোগ কবছিল তারা। পাঁচ-ছ'টি বিদেশী শ্বেতাঙ্গ খদ্দেব এসে ঢুকল। বযেস কাবো বেশী নয়। শাঁসালো টুরিস্ট সম্ভবত। খাঁটি দেশীয় নিদর্শন সংগ্রহেব আশায এসেছে। দুই-একজনেব মুখ থেকে মদের গন্ধও নাকে আসছিল।

বিষ্ণুচরণ লাফিয়ে উঠল—আইযে আইযে সাব—

এদেব থেকে প্রিয় আব বোধ হয় কেউ নয বিষ্ণুচবণের। গেল যুদ্ধে এদের মতো দিলদরিয়া খদ্দেবেব কল্যাণেই তাব দোকানঘর হযেছে।

তাবা মিটি মিটি হাসে আব ছবি দেখে। কিন্তু লাস্যময়ী অপ্সবা থেকে হাস্যময়ী চিত্রতাবকা পর্যন্ত কারো ছবি পছন্দ হয না তাদেব। মাথা নাড়ে আর বলে, দিশি জিনিস দেখাও।

এবারে গোপন সংগ্রহের দিকে হাত দিল বিষ্ণুচবণ। নির্ভেজাল জিনিসই বাব কবল। একটা চোখে লাগাতে পাবলে দব যা হাঁকবে সে-ই জানে। ঘাড় বাঁকিযে সেই সব ছবিব দিকে তাকিয়ে শম্ভুচরণেব মুখ লাল। কুৎসিৎ সব ছবি।

কিন্তু যে দেশেব লোক এই খদ্দেবরা, তাদের চোখে এসব ছবি কিছুই নয়। তা ছাড়া এ জিনিসও ঠিক চায় না তারা।

বিষ্ণুচরণের রোখ চেপেছে। কয়েকটা অর্ধনগ্ন আদিবাসীর বড় ছবি শিল্পী দিয়ে আঁকিযে এবং বাঁধিযে কোনো এক থাকে লুকিয়ে-রেখেছিল। খুঁজে খুঁজে একটা বড় ফ্রেম টেনে বার করল। একটানে ওপরেব কাগজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল।

তাব পবেই তড়িৎস্পৃষ্টেব মতো কাঠ একেবাবে। বিমূঢ় হতভম্ভ।

শ্বেতাঙ্গ খদ্দেববা বাঁধানো ছবিটা তাব হাত থেকে টেনে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদেব চোখে-মুখে আগ্রহ দেখা গেল। এই ধবনেব দিশি জিনিসই তাবা চেযেছিল যেন। ফ্রেমেব ওপবে কিছু ধূলো জমেছিল নিজেবাই কমালে কবে মুছে দিল। ছবিব তাজা বঙ ফুটে বেরুলো। ওটা হাতে হাতে ঘুবল তাদেব। ভাবি পছন্দ হযেছে। খাঁটি দিশি জিনিস —আদুড গাযে শাড়ি জড়িযে সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী গৃহস্থবধূ বুকেব দুধ খাওযাচ্ছে ছেলেকে —কচি শিশুব অন্য হাতে খাদ্য আগলানো দেখেও খুশীতে আটখানা তাবা।

একজন জিজ্ঞাসা কবল, দাম কত?

অনুভূতিশূন্য মূর্তিব মতো ছবিটা হাতে নিল বিষ্ণুচবণ। দেখল ফ্রেমটায ছাতা পড়েছে শুধু, নইলে এতকাল আগেব ছবি ঠিক তেমনি জীবন্ত এখনো। বিমূঢ় নেত্রে ছেলেব দিকে তাকালো একবাব। ছেলেও বাপেব হঠাৎ এই মূর্তি দেখে অবাক হযেছে।

বিষ্ণুচবণ দেখছে। বউ চেযে আছে তাব দিকে। তাব চোখে যেন ভর্ৎসনা। সে যেন ফিস ফিস কবে বলছে—ছিঃ আমি না-হয অন্যাযই কবেছি একটা, তা বলে নিজেব পবিবাবকে বেচে দেবে?

ক্রেতাবা অসহিষ্ণু হচ্ছে। বিষ্ণুচবণ একটা উদ্গত অনুভূতি সামলে নিযে বিড়বিড় কবে জানালো, এ ছবি বিক্রিব না।

লোকটা দাঁও মাবতে চায ভেবে একবাবেই চড়া দাম হাঁকল একজন।

বিষ্ণুচবণ মাথা নাড়ল।

তাবা আবো দাম বাড়ালো।

আবো।

বিষ্ণুচবণ মাথা নাড়ল।

আবো খানিকটা দামাদামি কবে তাবা বাগতভাবে হুড়মুড় কবে নেমে গিযেও তখুনি আবাব ফিবে এল। যে লোকটা বেশি মদ খেযেছিল সে বিষ্ণুচবণেব মুখেব সামনে ধবধবে পাঁচটা আঙুল তুলে বলল, দেখো পাঁচশো রুপযা দেগা, উইল ইউ সেল?

বিষ্ণুচবণেব মাথাটা ঘুবে উঠল। চোখেব সামনে তাব বড় দোকান ভাসছে— পাশেব চিলতে খুপবি পেযেছে। শুধু তাব চোখে নয, ছেলেব চোখেও তাই ভাসছে।

...ছিঃ, আমি না হয অন্যাযই কবেছি একটা, তা বলে নিজেব পবিবাবকে বেচে দেব?...

বিষ্ণুচবণ মাথা নাড়ল। হঠাৎ বেগে গিযে জোবেই ঝাঁঝিযে উঠল—এ ছবি বিক্রিব নয।

তাবা চলে গেল। ছেলে বিমূঢ় বিস্ময়ে চেযে আছে তাব দিকে। এক ঝটকায ছবিটা হাতে নিযেই বিষ্ণুচবণ দোকান থেকে বেবিযে গেল।

দোকান বন্ধ কবে শম্ভুচবণ ঘবে ফিবল। দেখল ছবিটা দেযালে টাঙিযে বাপ তাব সামনে দাঁড়িযে আছে চুপচাপ। ছেলেও ভিতবে এসে দাঁড়াল। পিছন থেকে দেখল ছবিটা। গোটা মুখ থমথমে গম্ভীব। তেইশ বছবেব ছেলে জিজ্ঞাসা কবল, ও কে?

বিষ্ণুচরণ আস্তে আস্তে ফিবল তার দিকে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচক কবছে। বলল—তোর মা। আর, ওই তুই—মায়েব দুধ খাচ্ছিস।

দুজনেই নির্বাক।

ছেলেব থেকে বাপ অনেক লম্বা। মুখ তুলে মুখ দেখতে হয়। আজ এই বাপেব মাথাটাই হঠাৎ এত উঁচুতে মনে হল শম্ভুচবণেব যে ঘাড উঁচিযেও ভালো কবে দেখা যায না।

সম্পাদক

কলকাতা থেকে ট্রেনে উনিশ মাইল মাত্র পথ। শহবেব এত কাছে এমন অজপাডাগাঁও আছে জানতাম না। অবশ্য তখনো পর্যন্ত এসে পৌঁছুই নি আমবা। ট্রেনে বসে গাঁযেব কথা শুনছিলাম। বক্তা শ্রীবিলাসবাবু। ট্রেনেব ঝাঁকানিতে ঝিমুনি আসছিল। তাই দেখে আমাদেব চলনদার শ্রীবিলাসবাবু পানসিক্ত ঠোঁটে একটু সঙ্কোচেব হাসি মিশিযে বলল, আপনাদেব কষ্ট হবে, এখনো দেড ঘণ্টাব পথ।

আমাদের কষ্ট হবে, এই কথাই ঘুবিযে-ফিবিযে নানাভাবে অনেকবাব বলেছে শ্রীবিলাসবাবু। অথচ তাবই অনেক দিনেব কব-জোডেব আকুতিতে আমাদেব পা বাডানো। কিন্তু আবো দেড ঘণ্টাব পথ শুনে অবাক হলাম। আধ ঘণ্টা হল ট্রেন ছেডেছে, কিছুটা পথ এসেছিও। উনিশ মাইলেব বাকিটুকু যেতে আরো দেড ঘণ্টা লাগবে কেন।

জিজ্ঞাসা কবলাম, কেন, দেড ঘণ্টা লাগবে কেন আরো?

জবাবে শ্রীবিলাসবাবু ভযে ভযে একবাব কোণেব জানালাব দিকে তাকালো। ওই কোণে ঠেস দিযে স্থূলবপু ভবনাথবাবু বসে। আজকেব অনুষ্ঠানেব তিনিই সভাপতি। তাঁকে নিযে যাবার জন্যেই শ্রীবিলাসবাবুব এতদিনেব এত তোডজোড, এত কাকুতিমিনতি।

জানালা-ঘেঁষা কোণটায পিঠ আব মাথা ঠেকিযে ভবনাথবাবু চোখ বুজে বসে আছেন। খুব সম্ভব ঘুমুচ্ছেন।

তবু গলাব স্বর আব একটু খাটো কবে শ্রীবিলাসবাবু অপবাধীব মতো ঢোক গিলে বলল, ইয়ে, আপনার গিযে তাই তো প্রায লাগবে, ধামুযা থেকে দেড ক্রোশটাক তো আবাব গরুব গাডিতে যেতে হবে—তা আজ্ঞে আমি আপনাদেব জন্যে খুব তেজি বলদেব গরুব গাডি ঠিক কবে এযেছি, কিছু কমও লাগতে পাবে।

এইবাব আমি বেশ ভযে ভয়ে ওই কোণেব দিকে তাকালাম। ভবনাথবাবু ঘুমিযেই পডেছেন, আপাতত কিছু কানে যায নি হয়ত। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে তাঁর মুখের দিকে তাকানো শক্ত হবে। আমাবই বিশেষ সুপারিশে তাঁর আসা। একটু দমে গিযে বললাম, গরুব গাডির কথা আগে বলেন নি তো?

এই অসুবিধেব কথাটাও বলে ফেলাব পব শ্রীবিলাসবাবুব সঙ্কোচ গেছে। এই বকমই বীতি তাব। একবার ব্যক্ত কবে ফেলার পব, ওটুকু অসুবিধে কিছুই না, বলে

নিজেই আবার উড়িয়ে দেয়। বলল—তা আজ্ঞে ও তো প্রায় সবাই জানে—কিন্তু আপনাদের একটুও খারাপ লাগবে না, শহুরে মানুষ গরুর গাড়িটাড়িতে তো চড়েন না—ভালোই লাগবে।

অতএব সেই ভালো লাগার জন্যও মনে মনে প্রস্তুত হতে চেষ্টা করলাম।

গাঁয়ের প্রসঙ্গ ছেড়ে শ্রীবিলাসবাবু হঠাৎ একসময় সবিনয়ে নিবেদন করল, এবারে আপনারা সেই মহিলাটিকে একটি দেখবেন কিন্তু, আপনারা বিদ্বান পণ্ডিত লোক কি ব্যাপার ভালো বুঝবেন—

আমি অবাক—কোন মহিলা?

এ-রকম বিস্মৃতি শ্রীবিলাসবাবুর ভালো লাগল না বোধ হয়, ঈষৎ আহত বিস্ময়ে সে-ও ফিরে তাকালো আমার দিকে। তারপর স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করল—সেই যে কনকদেবীর কথা বলেছিলাম আপনাদের, কবিতা বলেন—

মনে পড়ল। সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে এক গ্রাম্য মহিলার প্রসঙ্গ শ্রীবিলাসবাবু দুই-একবার উত্থাপন করেছিল বটে। কিন্তু তার বলার আগ্রহের সঙ্গে আমাদের শোনার আগ্রহের তেমন যোগ ঘটে নি বলে সবিস্তারে কিছু জানা হয় নি। শুধু এইটুকু মনে আছে, মহিলা লিখতে পড়তে জানেন না; অক্ষরপরিচয়ও নেই, অথচ তাঁর মুখে অনর্গল কাব্য ঝরে। শোনার মতোই কাব্য, গাঁয়ের লোকেরা শুনে অবাক হয়।

বললাম—তা তাঁকে কি দেখব?

শ্রীবিলাসবাবু জবাব দিল—আমাদের শুনতে ভালো লাগে, এই পর্যন্ত—আমরা কতটুকু আর বুঝি বলুন। আপনারা হলেন গিয়ে জহুরী, একনজর দেখলে বা দুলাইন শুনলেই কোন দরের জিনিস, ঠিক বুঝে নেবেন।

অক্ষরজ্ঞানবর্জিত মহিলার কবিতার পাল্লায়ও পড়তে হবে জেনে বিরক্তির বদলে অসহায় বোধ করতে লাগলাম। ট্রেনে যখন উঠে বসেছি, নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছুবার আগে নামার প্রশ্ন নেই। কিন্তু ফেরার সময়, আর ফেরার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত আমার ওপর দিয়ে দস্তুরমত একটা ধকল যাবে। অদূরের জানালায় তন্দ্রামগ্ন ভদ্রলোককে যেমন নিরীহ দেখাচ্ছে, আদৌ তেমনটি নন তিনি। তাঁর বসনার পাল্লায় পড়লে অনেক হোমরাচোমরা ব্যক্তিও চুপসে যান। একটু আগে ভাবছিলাম, পরের দুর্ভোগ যা হয় হোক, আজকের সভাস্থলে মান বাঁচলে বাঁচোয়া। কিন্তু নিরক্ষরা রমণীর কাব্যাঘাতের সম্ভাবনায় সেই আশাও দূরে সরতে লাগল। মুখের ওপর সেখানে কি যে বলে বসবেন ভবনাথবাবু, ঠিক নেই। যাদের এ অভিজ্ঞতা আছে, ভাবতে গেলে তাদের অন্তত গায়ে জ্বর আসার কথা।

শ্রীবিলাসবাবুকে সময়ে সতর্ক করে রাখা উচিত। কিন্তু সে অবকাশ মেলাও ভার। সাগ্রহে কনকদেবী প্রসঙ্গ বিস্তারে মন দিয়েছেন তিনি। যা বলে গেলেন তার সার কথা, গাঁয়ের এক মানী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যা কনকদেবী। পণ্ডিতের কথকতায় নাম ছিল খুব, শোনার জন্য পাঁচ গাঁয়ের লোক ভিড় করে আসত। ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিন বছরের মধ্যে একটি মাত্র সন্তান কোলে সেই মেয়ে বিধবা হতে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি কিছুটা ম্লান হয়েছিল। বিধবা হওয়ার পর থেকে

ছেলে নিয়ে কন্যাটি বাপের কাছেই থাকতেন। বাপের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছলই ছিল, জমি-জমাও মন্দ রেখে যান নি। বাপ চোখ বুজতে পুঁজি ভাঙ্গিয়ে, আর কিছু কিছু জমি বিক্রি করে ছেলেকে মানুষ করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন কনকদেবী। বড় আশা ছিল ছেলেটা মানুষের মতো মানুষ হবে। কিন্তু তা হল না। ছেলে উল্টে বিপথে পা বাড়ালো। তার মতি ফেরানোর জন্য মায়ের সেই বুক চাপড়ে কান্না, গোঁ ধরে একটানা দু-তিনদিন নিরম্বু উপোস করা—এ-সব শ্রীবিলাসবাবুরাই স্বচক্ষে দেখেছে, শুনেছে। ছেলে এখন উড়িষ্যায় কোন কারখানায় চাকরি করে। বিয়ে-থা করেছে, ছেলে-পুলে হয়েছে—কিন্তু ভুলেও একবার মায়ের খোঁজ নেয় না, মাকে দেখতে আসে না। ছেলের ব্যবহার মায়ের বুকে শেলের মতো বিঁধত, পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন দিনরাত। কনকদেবী শ্রীবিলাসবাবুর থেকে বয়সে খুব বেশি বড় হবেন না, তবু শ্রীবিলাসবাবু তাঁকে মাসী বলে ডাকে। তার ছেলে সত্যবিলাস দিদিমা ডাকে। ছেলেটা খুব ছেলেবেলা থেকেই এই দিদিমার নেওটা। তাকে ভোলাবার জন্য আর খুব সম্ভব নিজের শোক ভোলবার জন্যেই কনকদেবী অনেক সময় মুখে মুখে ছড়া পাঁচালি বলে যেতেন। ছেলে যত হাঁ করে শুনত, তাঁর মুখে মুখে কাব্য-কাহিনী বানানোর ঝোঁকও তত বাড়ত। ছেলে বড় হতে তার বন্ধুবান্ধবেরাও কাব্যের শ্রোতা হয়ে পড়ল। এইভাবেই ব্যাপারটা রটে গেল। মুখে মুখে অজস্র কাব্যকাহিনী রচনা করেন তিনি, ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ীরা দল বেঁধে এসে শুনতে বসে। শোনে আর অবাক হয়। শ্রীবিলাসবাবুর ছেলে এখন ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। সে দিদিমার একটা কাব্যের খাতা করেছে। দিদিমা কাব্য বলে, আর সে লেখে। কনকদেবী অক্ষর চেনেন না, কিন্তু কোন পাতায় কোন কবিতা লেখা আছে, একবার চোখ বুলিয়েই তা বলে দিতে পারেন। ওই খাতাখানাই এখন প্রাণ তাঁর। সত্যবিলাস বা লিখতে জানে এমন কেউ তাঁর ঘরে এলেই আদর যত্ন করে জলটল খাইয়ে মহিলা খানিকটা কবিতা লিখিয়ে নেন।

এখন যে সামান্য একটু জমি আছে, শ্রীবিলাসবাবুদের চেষ্টায় তারই চাষের সামান্য আয়ে কায়ক্লেশে কোনোরকমে দিন চলে কনকদেবীর। কিন্তু এই কষ্টের জন্য এতটুকু তাপ-উত্তাপ বা খেদ নেই তাঁর। দিনান্তে কাউকে ধরে দু-চার লাইন কবিতা লেখাতে পারলেই খুশী তিনি, আর কিছু চান না।

—আপনারা, বিশেষ করে ভবনাথবাবুর মতো এমন একজন নামজাদা ব্যক্তি গাঁয়ে আসছেন শোনার পর থেকে ভেতরে ভেতরে খুব একটা উত্তেজনা চলছে ভদ্রমহিলার।

উত্তেজনার কারণ সভয়ে অনুমান করতে পারছি। তবু জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

—আপনারা আসছেন শুনেই উনি খাতাটা আপনাদের একবার দেখাবার জন্যে ধরেছেন যে। —শ্রীবিলাসবাবু মাথা চুলকে বলল—আমি কথা দিয়েছি চেষ্টা করব। সেই থেকেই তাঁর কখনো আনন্দ, কখনো ভয়। যখন ভাবেন আপনারা ভালো বলবেন, তখন খুশীতে ভরপুর, আবার যখন মনে হয় আপনাদের ভালো নাও লাগতে পারে, তখন ভয়ানক মুষড়ে পড়েন। —শ্রীবিলাসবাবু নিজের মন্তব্য যোগ করল, আমরা অবশ্য তেমন বুঝি নে, তবু মনে হয় আপনাদের ভালোই লাগবে, আর সত্যি ভালো লাগলে কিছু সুবিধেও হতে পারে।

ভদ্রমহিলা অর্থাৎ কনকদেবীর প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও মনে মনে শ্রীবিলাসবাবুর মুণ্ডপাত করলাম। তার দিকে তাকিয়েই বোঝা গেছে, আমাদের যে ভালো লাগবেই এ-আশ্বাস সে মহিলাটিকে দিয়েছে, আর ভালো লাগলে যে দু-একটা কবিতা ছাপার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে সে কথাও নিঃসন্দেহে বলেছে।

নির্লিপ্ত গম্ভীর মুখে প্রস্তাবটা গোড়াতেই ছেঁটে দিতে চেষ্টা করলাম।

—একদিনে এ-সব হবে-টবে না, অন্য একদিন দেখা যাবে, আজই এ-সব নিয়ে ওঁকে বলতে গেলে উনি অসন্তুষ্ট হবেন।

উনি অর্থাৎ ভবনাথবাবু। শ্রীবিলাসবাবু ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখল একবার। জানালার কোণে ঠেস দিয়ে তেমনি তন্দ্রামগ্ন। আবার আমার দিকে ফিরে মুখখানা করুণ করে ফেলল শ্রীবিলাসবাবু, যেন তারই কবি-মূল্য যাচাইয়ের প্রস্তাবটা নাকচ করা হল। সানুনয়ে বলল, ভদ্রমহিলা বড় আশা নিয়ে বসে আছেন স্যর, আপনারা এটুকু অনুগ্রহ না করলে ভারি হতাশ হবেন।

বিরক্তি গোপন করার জন্যেই বাইরের দিকে চোখ ফেরালাম। আমার বিরক্তি এবং অস্বস্তির কারণ শ্রীবিলাসবাবুর সঠিক বোঝার কথা নয়। এক নামী সাপ্তাহিক পত্রের ডাকসাইটে সম্পাদক ভবনাথবাবু। নিক্তির ওজনে লেখা বিচার করেন। লেখা ছাপার জন্যে কেউ সুপারিশ করতে এলে সেই লেখা না পড়েই বাতিল করেন। একান্ত পরিচিতজনেরাও এই রসকষশূন্য প্রায়বৃদ্ধ সম্পাদকটিকে রীতিমত সমীহ করে চলে। কিন্তু সম্পাদক হিসেবে যত না নাম তাঁর, তার থেকেও বেশি সুনাম অথবা দুর্নাম, কঠিন সমালোচক হিসেবে। অনেক নামী সাহিত্যিকের লেখা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখেছি। আমরা লেখা না দিলে ঠাস ঠাস কথা শোনান, আবার দিলেও কপালে কি আছে ভেবে শঙ্কায় ভিতরটা ভরে ওঠে।

আমাদের ধারণা এ-দেশের মেয়েদের লেখার ব্যাপারে ভদ্রলোকের এক ধরনের অ্যালার্জি আছে। মনে হয়, মেয়েরা লিখবে সাহিত্য করবে, এটা বোধ হয় তাঁর পছন্দ নয়। শুধু সংসার আর ঘর-করনা নিয়ে থাকুক তারা, মনে মনে এ-ই চান হয়ত। তার নির্মম বিচারের ফলে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে মেয়েদের লেখাই বেশি জমে। লেখা কেন ছাপা হল না জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেন, লেখা হলে ছাপা হত।

ভদ্রলোক সবথেকে বেশি রেগে যান কোনো মহিলা লেখা নিয়ে নিজে তার দপ্তরে হাজির হলে। স্বল্প দুই-এক কথায় তাঁকে জানিয়ে দেন, ট্রাম-বাসের পয়সা খরচা করে না এসে, ডাকে পাঠিয়ে দিলেই তো হত।

একবার একজন আমতা আমতা করে বলেছিলেন—ডাকে পাঠালে লেখা অনেক সময় ঠিক জায়গামত পৌঁছয় না।

ভবনাথবাবু জবাব দিয়েছিলেন—নিজে নিয়ে এলেও জায়গামত পৌঁছয় না।

তিন-চারদিন আগেও এমনি একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। উত্তর-তিরিশ এক সুশ্রী মহিলা লেখা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে, লেখাটা তখনই পড়ে দেখা হোক। লেখাটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ভবনাথবাবু জবাব দিলেন, পরে খবর পাবেন।

মহিলা চলে যেতে উল্টে-পাল্টে দেখতে গিয়ে লেখাটা পড়েই ফেললাম। সত্যি ভালো লেখা। আমার বিচারে অন্তত ভালো। দিন তিনেক পরে দেখলাম, ভবনাথবাবু সেই লেখাটা পড়ছেন। সব লেখা যেমন খুঁটিয়ে পড়েন এটাও তেমনি পড়লেন, তারপর পাশের আর কতকগুলো লেখার সঙ্গে সেটা রেখে দিলেন।

কিন্তু আরো তিন-চারদিন না যেতেই ভদ্রমহিলা আবার এসে হাজির। প্রত্যাশাভরা হাসি হাসি মুখ, সযত্ন বেশবাস, সুচারু প্রসাধন। ভবনাথবাবুর সামনে বসে ঈষৎ আব্দারের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার লেখাটা পড়লেন?

জবাবে ভবনাথবাবু মুখ তুলে দুই-এক মুহূর্ত দেখলেন, তারপর পাশের রচনাগুলোর মধ্যে থেকে তাঁর লেখাটা বার করে দিয়ে বললেন, নিয়ে যান।

মহিলার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।—মনোনীত হল না বুঝি?

অন্য লেখা পড়তে পড়তে ভবনাথবাবু মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ, হল না।

শুকনো মুখে মহিলা আবেদন জানালেন—ত্রুটিগুলো যদি একটু বলে দিতেন—

ভবনাথবাবু আবার মুখ তুললেন। খানিক নিরীক্ষণ করে জবাব দিলেন—সেটা বলা একটু শক্ত।

যে-রকম নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে বললেন কথা ক'টা, মহিলা হকচকিয়ে গিয়ে লেখাটি তুলে নিয়ে নীরবে প্রস্থান করে বাঁচলেন।

আমার বিশ্বাস লেখাটা ছাপা হবে বলেই ওখানে ছিল। মহিলা আবার তদবির করতে না এলে ওটা ছাপা হত।

এমন কি, অতটা সচেতন বেশবাস, সুচারু প্রসাধন না করে এলে, বা ও-রকম হাসিমুখে তার আবির্ভাব না ঘটলেও হয়ত ছাপা হত।

সভাপতিত্ব করতে ডেকে এনে এ-হেন লোককে অক্ষরজ্ঞানবর্জিত রমণীর কবিতা শোনানো বা কবিতা ছাপার সুপারিশের নামে গায়ে জ্বর আসবে না তো কি?

গাঁয়ে নতুন পাঠাগার উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য ভবনাথবাবুর আগমন। কোথাও আসেন না বড়। শ্রীবিলাসবাবুর ধড়-পাকড়ে পড়ে আমি বিশেষভাবে আবেদন জানাতে তবে রাজী হয়েছেন। পাঁচখানা গ্রামের উদ্যোক্তারা অনেক জল্পনা-পরিকল্পনার পরে এই সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করতে চলেছে। সমস্ত এলাকায় আর দ্বিতীয় লাইব্রেরি নেই। এর জন্যে ঘরে ঘরে চাঁদা তোলা হয়েছে, একজন জমি দিয়েছেন, আর পাঁচজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক মিলে ঘর তুলে দিয়েছেন। বেশ কিছু টাকার বইও কেনা হয়েছে। এতবড় ব্যাপারটা অনুষ্ঠানশূন্যভাবে শুরু করতে কারো মন ওঠে না। গ্রামবাসীদের এত উৎসাহের কথা শুনেই ভবনাথবাবু শেষপর্যন্ত আসতে আপত্তি করেন নি।

শ্রীবিলাসবাবু গাঁয়ের ওই উদ্যোক্তাদের একজন। অনেক মাথা ঘামিয়ে আমার সঙ্গে একটা আত্মীয়তার যোগ আবিষ্কার করেছে সে। অবশ্য তার সঙ্গে জানাশুনা অনেক দিনের। কিন্তু সম্প্রতি তার আত্মীয়তা বজায় রাখার নিষ্ঠা দেখলে সম্পর্কটা দূরের কেউ বলবে না। গাঁয়ে লাইব্রেরি করার উৎসাহ এবং উদ্দীপনার পিছনে তার ছোটখাটো রকমের একটু স্বার্থও আছে। ওই গাঁয়ে তার বইয়ের দোকান। এতদিন

শুধু ইস্কুল-বই বিক্রির ওপর নির্ভর করতে হত। লাইব্রেরি হলে গল্প-উপন্যাস মাসিকপত্র সাপ্তাহিকপত্রও তার মারফতই কেনা হবে জানা কথাই।

এখন প্রস্তাব শুনে আমার চক্ষুস্থির।

যথাসময়ে ট্রেন ধামুয়া স্টেশনে পৌঁছুলো। আরো জনাকতক লোক আমাদের নিতে এসেছে। সকলেরই ব্যস্তসমস্ত ভাব, সশ্রদ্ধ চাউনি। এদের সামনে শ্রীবিলাসবাবুকে দেখে মনে হল, সে যেন দিগ্বিজয় করে ফিরেছে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুবার সময় ভবনাথবাবুর উদ্দেশে মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম —এখন আবার গরুর গাড়িতে উঠতে হবে শুনছি।

হৃষ্ট মুখে ভবনাথবাবু জবাব দিলেন, এখানে তুমি ট্রাম-বাস পাবে ভেবে এসেছিলে নাকি। এককালে কত গরুর গাড়িতে চড়েছি—।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ছেলেরা আর শ্রীবিলাসবাবু টেনে-টুনে ভবনাথবাবুকে গাড়িতে তুলল। মোটা শরীর ভবনাথবাবুর, এটুকু ধকলেই অল্প অল্প হাঁপ ধরেছে —কিন্তু তাঁকে এত খুশী আর বোধহয় দেখি নি। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে গরুর গাড়ি চলেছে, দুদিকে ধানী-জমি, মাঠ, গাছ-গাছড়া, ঝোপঝাড়। ভবনাথবাবু আমাকে গাছপালা চেনাচ্ছেন, আর শহুরে মানুষ বলে টিকা-টিপ্পনী কাটছেন।

—ওগুলো কিসের ঝোপ বলো তো? বনতুলসী—নাম শুনেছ, না তাও শোন নি? আর ওগুলো? শহুরে সাহিত্যিক জানবে কি করে—ওগুলো আটিশ্বরী।—শেষে আকন্দের জঙ্গল চিনতে পারলুম না দেখে প্রায় রেগেই গেলেন তিনি, বললেন তোমাদের শহুরে সাহিত্যিকদের ধরে ধরে কিছুকালের জন্য বনবাসের মতো গ্রামবাসে পাঠানো উচিত।

মোটরকথা আমাকে জব্দ করতে করতে বেশ আনন্দের মধ্যেই তিনি গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলেন। আমিও হাসছিলাম বটে কিন্তু বিকেলের কথা ভেবে শঙ্কার ছায়াটাকে মন থেকে সরানো যাচ্ছিল না।

গ্রামবাসীদের সরল অনাড়ম্বর প্রীতি-অভ্যর্থনা মনে লেগে থাকার মতো। দুপুরে খানিক বিশ্রামের পর সভার কাজ শুরু হল। শীতকাল, অসুবিধে কিছু নেই। ভবনাথবাবু বক্তৃতা করলেন। তাঁর সাদা-মাটা আন্তরিক বক্তৃতা শুনে এই সাধারণ লোকেরা ভারি খুশী।

অনুষ্ঠান শেষ হল।

আমাদের ফেরার গাড়ি সেই রাত আটটায়। তার ওপর শোনা গেল, তিন-চার ক্রোশ দূরের কোনো এক ভদ্রলোকের দুটো সাইকেল-রিকশ সংগ্রহ করা গেছে—তাই ফেরার সময় গরুর গাড়ির মতো অত সময়ও লাগবে না। এখান থেকে সাতটায় বেরুলেও আমরা হেসে-খেলে পৌঁছুবো।

অতএব আপাতত ঘণ্টা দুই-আড়াইয়ের অখণ্ড অবকাশ।

কিন্তু এ অবকাশ আমি চাই নি। ভবনাথবাবুর বক্তৃতার ফাঁকেও আমার দুচোখ নিজের অজ্ঞাতে অক্ষরজ্ঞান-শূন্য সেই কবি-মহিলাকে খুঁজেছে। কিন্তু ভবনাথবাবুর পাশে মঞ্চে বসে ঠিক ঠাওর করতে পারি নি।

সভা শেষে লাইব্রেরি-ঘরে এসে আবার বসলাম আমরা। শীতেব বিকেল শেষ হতে না হতে সন্ধ্যে। শুধু শ্রীবিলাসবাবু নয়, অন্যান্য মাতব্বররাও সাগ্রহে কনকদেবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করল। মহিলাব মুখে মুখে কবিতা বানানো তাদের কাছে মস্ত বিস্ময়। প্রশংসার ছলে সেই বিস্ময় জ্ঞাপন কবল তারা, কবিতাগুলো একবাব দেখাব জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো।

ভবনাথবাবু বললেন—বেশ তো নিয়ে আসুন না, মহিলাটিকেও আসতে বলুন, দুই-একটা কবিতা শোনা যাবে।

তক্ষুনি লোক ছুটল।

আমার অস্বস্তি বাড়ছে। কবিতা প্রসঙ্গে অত স্তুতিব বদলে এবা যদি মহিলাটির বেদনাকরুণ জীবনেব আখ্যানটুকু শোনাতো, তাতে বরং কাজ হত। স্বভাবকঠোব সম্পাদকের মনটা হযত বা নবম থাকত। কিন্তু এবা জনে জনে শুধু মহিলাব আশ্চর্য ক্ষমতার কথাই পঞ্চমুখে বলে গেল।

দশ মিনিটের মধ্যেই কনকদেবী এলেন। না, এঁকে সভায দেখি নি বটে। সাধাবণ আটপৌরে বিধবার বেশবাস। তামাটে গাযেব রঙ, এককালে বেশ ফবসা ছিলেন মনে হয। বযস পঞ্চাশেব ওধাবে, চাপা উদ্দীপনায মুখখানি ঈষৎ আবক্ত। হাতে একখানি কালো মোটা বাঁধানো খাতা।

ভবনাথবাবুব পাযের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। তাবপব খাতাখানা তাঁর পাযেব কাছেই বাখলেন।

আমাব মনে হল, আত্মজ সন্তানকে পবম নির্ভয়ে গুরুপাযে সমর্পণ কবে দিলেন।

—বসুন মা, বসুন—। ভবনাথবাবু গম্ভীব। সভযে তাঁব মুখে সম্পাদকেব সেই চিবাচবিত গাম্ভীর্য দেখছি আমি।

তিনি খাতাটা তুলে নিলেন। একটি একটি করে পাতা উল্টে দেখে যেতে লাগলেন। সকলে উন্মুখ। তাঁর একটি কথা, একটি মন্তব্যের ওপর যেন অনেক কিছু নির্ভর কবছে।

অনেকক্ষণ ধরে দেখে তিনি একটিও কথা না বলে খাতাটা শুধু আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

সেটা নেবাব ফাঁকে মহিলার দিকে চোখ পড়ল। মনে হল, দুই চোখে এমন অধীর প্রতীক্ষা, এমন নীরব প্রত্যাশা, আমি আব দেখি নি।

পাতাগুলো শুধু উল্টেই গেলাম, পড়া হল না। আঁকা-বাঁকা কাঁচা ছাঁদেব লেখা, খাতা বোঝাই কবিতা। কংসেব অত্যাচার, দেবকীব মনোবেদনা, শ্রীকৃষ্ণেব জন্ম, বেহুলাব শোক, গান্ধারীর বিলাপ, সাবিত্রীর সঙ্কল্প, লব-কুশের বীরত্ব—এমনি অজস্র প্রসঙ্গে এক পাতা দু পাতা করে এক-একটা কবিতা।

মুখ তুলতেই ভবনাথবাবু আবার হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিয়ে নিলেন। অস্ফুট স্ববে বললেন—আশ্চর্য!—তারপর একটা পাতাব ওপর চোখ বুলিয়ে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি অক্ষর চেনেন না, অথচ কোন পাতায় কোন কবিতা আছে দেখলে বলে যেতে পারেন?

কনকদেবী যেন জীবনেব সব থেকে বড সংশযটা উত্তীর্ণ হযেছেন। অদ্ভুত কমনীয দেখাচ্ছে মুখখানা। প্রত্যযভবা দু'চোখ মেলে তাকালেন তাঁব দিকে, তাবপব মাথা নাডলেন।...পাবেন।

—আচ্ছা, এই কবিতাটা বলুন তো শুনি।

ঈষৎ ঝুঁকে পাতাটা ভালো কবে দেখতে চেষ্টা কবলেন কনক দেবী। ভবনাথবাবু খাতাটা এগিযে দিলেন।

কিন্তু তাব আগেই কবিতাটা হযত চেনা হযে গেছে। আবাব যথাপূর্ব স্থিব হযে মহিলা মাথা নুইযে বসে বইলেন একটু। সংকোচ কাটিযে ওঠাব চেষ্টাও হতে পাবে। ঘবসুদ্ধ সকলে উৎকর্ণ। আমিও।

টানা সুবেব আবৃত্তি কানে এল। মৃদু কণ্ঠ ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল:

'প্রহ্লাদ কহে, আমাব অন্তর্যামী যিনি
সর্বত্র বিবাজেন তিনি।
শূন্যে জলে স্থলে সমুদ্রে পর্বতে
তিনি বিনা কিছু নাই নিখিলে ভবেতে।
তাবে যদি চাহ পিতা অশ্রুজলে ভাসি
তোমাবে দিবেন দেখা মৃদু মৃদু হাসি।
দর্পভবে চাহ যদি দেখিবাবে তাবে
দর্পহাবী রূপে তিনি আসিবেন দ্বাবে।
ভক্তসখা রূপে যদি নাও তাবে ববি
দেখিবে সম্মুখে তোমাব দাঁডাযে শ্রীহবি।'

ভাষা ভাব ছন্দ মিলেব কথা কিছু মনে হল না, অনুচ্চ বমণীকণ্ঠেব একটুখানি মূর্ত আবেগ যেন কানে লেগে থাকল। ঘবেব জোডা জোডা মুগ্ধ চোখ এবাবে ভবনাথবাবুব মুখখানাকে ছেঁকে ধবল। তাদেব উক্তি যে একবর্ণও মিথ্যে নয, তাই যেন প্রমাণ হযে গেল।

ভবনাথবাবুও বিস্মযেব ঘোব কাটিযে উঠলেন বোধহয। কবিকে দেখলেন একটু। কনকদেবী অধোবদন।

ভবনাথবাবু বললেন—এই খাতায নেই এ-বকম একটা কবিতা বলুন শুনি—

অর্থাৎ, এইখানে বসে মুখে মুখে কবিতা বানানোব আশ্চর্য ক্ষমতাটুকুও যাচাই না কবে নডবেন না তিনি। কনকদেবী আবাব মুখ তুললেন। আশায আশ্বাসে তামাটে মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। প্রথমবাবেব পবীক্ষায উত্তীর্ণ হযে তাঁব আস্থা বেডেছে, আব এবাবেও যে উত্তীর্ণ হবেন, তাতেও কোনো সংশয নেই।

চোখ বুজে ভাবলেন খানিক। নিশ্চল মূর্তিব মতো দেখাচ্ছে। ঘবেব মধ্যে আবাবও একটা স্তব্ধতা ভবাট হযে উঠেছে। যাবা চেযে আছে কবিব দিকে, দেখলে মনে হবে পবীক্ষা তাদেবই। বেশ একটু সময নিযে কনকদেবী চোখ মেলে তাকালেন। তিনি প্রস্তুত।

আগের বারের মতোই একটা আবেগ ঘরের মধ্যে পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এবারের এই আবেগ জ্বালাভরা, বেদনাভরা, দরদভরা। একটা তীব্র অনুভূতি যেন কবির মুখে শিখা হয়ে জ্বলছে।

'...কবজোড়ে নতশিরে লভিবারে সাজা
মুনির সমুখে আসি দাড়াইল রাজা।
পুত্রশোকে মুনি কান্দে, কান্দে মুনিজায়া
কেমনে বাঁচিবে তারা—প্রাণ বিনা কায়া।
সহসা শোকানলে জ্বলি মুনি কহেন রাজারে
শব্দভেদী বান হানি শুধু হিংসা করিবারে
পানরত গজভ্রমে বধিলে সিন্ধুরে
রাঙাইলে সরযূর নীরে।
হারায়ে প্রাণের ধন
এই প্রাণ মোর দিব বিসর্জন।
তোমা পরে রাজা এই অভিশাপ
তুমিও ত্যাজিবে দেহ লভি পুত্রশোক-তাপ।
অবাক বিষণ্ণ রাজা কাঁপে থর-থর
নিঃসন্তানেরে একি অভিশাপ দিলা মুনিবর।
মুনি বরে অভিশাপ সত্য যদি হয়
সন্তান গেহে তবে আসিবে নিশ্চয়।'

অনেকক্ষণ বাদে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন ভবনাথবাবু। সমাধি-ভঙ্গ হল যেন। কবিতা প্রসঙ্গে কোনোরকম আলোচনা করলেন না, ভালো-মন্দ একটি কথাও বললেন না। কিন্তু যে কথা বললেন, শুনে শুধু আমারই বিস্ময়ের শেষ নেই।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ভবনাথবাবু, তারপর বললেন—আপনার এই খাতাটা আমাকে দেবেন? আপনার তো এটা কোনো কাজে লাগবে না, আমি দেখি যদি কিছু করতে পারি।

এক ঝুড়ি প্রশংসার থেকেও এই ক'টা কথার মূল্য বেশি। ঘরের সবক'টি লোকের মনে যেন এক নীরব খুশীর তরঙ্গ বয়ে গেল। তৃপ্তিতে কৃতজ্ঞতায় কনকদেবী একটি কথাও বলতে পারলেন না। ভবনাথবাবুর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে আস্তে আস্তে উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। কবিতার খাতা ভবনাথবাবুর হাতে।

যথাসময়ে আমরা আবার স্টেশনে পৌঁছুলাম। শ্রীবিলাসবাবু এবং আর একজন আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। শ্রীবিলাসবাবু আনন্দে ডগমগ, ট্রেন ছাড়ার আগে আমার কানে কানে আর একবার বলল, খাতাটার কথা ওঁকে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেবেন কিন্তু, আমি পরে খবর নেব।

গাড়ি ছাড়তে ভবনাথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—শ্রীবিলাস কি বলে গেল?

—ওই খাতাটার কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে বলল।

ইতিমধ্যে কবি বা কবিতা প্রসঙ্গে আর একটি কথাও হয় নি। এখনো কিছু না বলে ভবনাথবাবু বাইরের অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারলুম না, ভেতরটা থেকে থেকে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। উষ্ণ হয়ে উঠছে।

সাদাসিধে ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম—খাতাটা চেয়ে নিয়ে এলেন কেন, সত্যিই কবিতা ছাপবেন নাকি?

ঈষৎ বিস্ময় মেশানো গাম্ভীর্যে আমার দিকে ফিরলেন তিনি।—এ কবিতা ছাপব কি করে?

—তাহলে নিয়ে এলেন কেন? ভদ্রমহিলা আশা করে থাকবেন, শ্রীবিলাসবাবুও তাগিদ দিতে ছাড়বে না।

নির্লিপ্ত মুখে ভবনাথবাবু জবাব দিলেন—কিছুদিন বাদে খাতাটা হারিয়ে যেতে দোষ কি?

আমি হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত।

এতকাল ভদ্রলোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। কিন্তু সামান্য চক্ষুলজ্জা বাঁচানোর জন্য তিনি এই কাণ্ড করে এলেন মনে হতে সব যেন এক মুহূর্তে যেতে বসল। নিজের অগোচরে প্রায় রূঢ়কণ্ঠেই বলে উঠলাম, ভদ্রমহিলার সব কথা জানলে এভাবে তাঁকে আপনি—

থেমে গেলাম। কেন, বা কি দেখে থামলাম জানি না।

ভবনাথবাবু বললেন, আসার সময় শ্রীবিলাস তোমাকে বলছিল, শুনছিলাম—

আবারও বিস্ময়। অর্থাৎ, আসার সময় ট্রেনে তিনি আদৌ ঘুমোন নি। কনকদেবীর বৃত্তান্ত সব শুনেছেন।

আমি বিমূঢ় মুখে অপেক্ষা করছি। ভবনাথবাবু বাইরের অন্ধকার দেখছেন। শেষে আমার নীরব প্রতীক্ষা অনুভব করেই যেন মুখ ফেরালেন। বললেন—শুনেছি বলেই খাতাটা নিলাম। না নিলে আজ হোক, কাল হোক, মেয়েটির এই কবিতার আশ্রয়টুকুও যেত। আমার হাত দিয়ে খাতাটা খোয়া গেছে শুনলে ভয়ানক দুঃখ পাবে, পাঁচজনের কাছে দুঃখের কথা বলবে, মনে মনে হয়ত আমাকে ঠিক বিশ্বাসও করবে না। . তবু তাতে সান্ত্বনা থাকবে, নিজের কাছে তার কবিতার দাম কমবে না। বরং বাড়বে। আবার নতুন খাতা হবে। আশ্রয়টা হয়ত আরো পাকাপোক্ত হবে।

ট্রেন ছুটছে।

দূরে দূরে এক-একটা ল্যাম্প-পোস্টের আর কুঁড়েঘরের আলো চোখে পড়ছে। অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে ওগুলোও যেন এক অজ্ঞাত অখ্যাত কবি-রমণীর মুখের মতো। আঁধারে মেশে না।

ভবনাথবাবু জানলায় ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসে আছেন। সৌম্য, গম্ভীর। থেকে থেকে আমি তাঁকেও দেখছি। মনে হচ্ছে, এত কাছ থেকে আর বুঝি তাঁকে কোনোদিন দেখি নি।

নাগরী

জানালাব তলাব পাট দুটো বন্ধ কবে দিযে সেখানে বসে বসে মালা ভাবছিল, পুরুষেব কি হৃদয বলে বস্তু নেই?

মামাব কথাগুলো মালা শুনেছে। এক মামী ছাড়া আব কাবো শোনাব কথা নয। মামীকেই বাইবে দবজাব আড়ালে পবদাব এধাবে দাঁড়িযে বলছিল। মালাও শুনছিল। তাব শোনাব তাগিদ ছিল। তাব হাতে মামাব জন্যে এক পেযালা দুধ ছিল। কেউ দেখে ফেললেও কিছু ভাবত না।

বেশী কিছু কথা নয। মামা বেশী কথা বলে না। ও-বাড়িতে গিযেছিল। ছেলেব সঙ্গেই কথা হযেছে। ছেলে দু-চাব কথায তাকে বিদায কবেছে। তাব জ্যাঠামশাইযেব অনুপস্থিতিতে তদবিবে গিযেছিল বলেও প্রচ্ছন্ন বিবক্তি প্রকাশ কবেছে। স্পষ্ট জানিযে দিযেছে, জ্যাঠামশাইযেব বিবেচনাব ওপব আব কাবো কোনো কথা নেই। কিছু অনুবোধ কবাব থাকলে তাঁকেই বলা দবকাব।

মামা তবু আশা ছাডতে পাবে নি, তবু চলে আসতে পাবে নি। বলেছে—তাঁব কাছেই তো যাব বাবা, তবু তুমি মেযেটিকে একবাব দেখো না—।

মামাব শেষ আশা, তাকে ডেকে এনে সামনাসামনি একবাব দেখাতে পাবলে আব তাবপব ঘবেব অবস্থাটা খোলাখুলি ব্যক্ত কবতে পাবলে হযত শুভ সম্ভাবনাটা একেবাবে ভেস্তে নাও যেতে পাবে।

ছেলে কিন্তু সাফ জবাব দিযেছে, তাব দবকাব নেই। সে স্পষ্টই বিবক্ত হযেছে। ঘব থেকে চলে যেতে বলতে পাবে নি। গম্ভীব মুখে নিজেব কাজ নিযে বসেছে। সেটুকুই যথেষ্ট ইঙ্গিত। মামা চলে এসেছে।

মামা অপমানিত বোধ কবেছে। যেটুকু কবেছে, দায উদ্ধাবেব আশাতেই কবেছে। আব মামীব তাডায কবেছে। এতদিন এই চেষ্টা কবছিল না বলে মনে মনে মালাই ক্ষুণ্ন হযেছিল মামাব ওপব। তাব স্থিব বিশ্বাস ছিল আসল লোকটাব কাছে গিযে পডলে তাব জ্যাঠামশাইযেব হিসেবনিকেশ সব শূন্যে মিলিযে যাবে। টাকা চাইলেই আকাশ থেকে টাকা পডে না, সেটা সে অন্তত বুঝবে। আজ সকালেও মনে মনে মামা-মামীব বুদ্ধিব তাবিফ কবছিল সে। তাবা যে ওই জ্যাঠামশাইটিব অনুপস্থিতিব প্রতীক্ষায ছিল, আগে বোঝে নি। কাল বাতে নমিদি কথায কথায বলে গেছে, বাবা মক্কেলেব কাজে চাব-পাঁচদিনেব জন্যে বাইবে গেছেন। ...মামা একদিনও সময নষ্ট না কবে আজই গেছে।

বাগে দুঃখে চোখে জল আসাব উপক্রম মালাব। দাঁতেব চাপে নীচেব ঠোঁটটা কেটে বসাব উপক্রম। হতাশাব প্রথম ধাক্কায আগে মামাব অপমানটাই বুকে বিঁধেছে। এভাবে চেষ্টা কবাব ফলে মামাকে প্যাঁচালো লোক ভেবেছে ওবা। কিন্তু মামাব মতো লোক যে হয না, সেটা তাব থেকে আব কে বেশী জানে।

বে-সবকাবী কলেজেব অধ্যাপক বিমলেন্দুবাবু।...বিমলেন্দু বসু। বযেস হযেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ লো-প্রেসাবে ভুগছেন। খাটুনি বেশী বলেই হযত। কলেজেব পুবনো

মাস্টার, মাইনে মন্দ নয় একেবারে। কিন্তু এ-বাজারে কিছুই নয়। তাঁর নিজের সংসারটিও ছোট নয় একেবারে। তার ওপর দু'বছর হল চারটে ভাগ্নে-ভাগ্নী আশ্রিত। কলেজের খাটুনি, বাড়িতেও দুবেলা ছেলেরা আলাদা মাইনে দিয়ে পড়তে আসে। তার ওপর ফাঁক পেলেই নিজের পড়াশোনা। মালা এক-একসময় অবাক হয়ে ভাবে, মামার রক্তচাপ তো বাড়ার কথা, মাথায় সর্বক্ষণ রক্ত উঠে থাকার কথা।

মালার বাবা এক মফঃস্বল ইস্কুলের সহকারী হেডমাস্টার। কড়া নীতিবাগীশ, সাদাসিধে বেশবাস, মাথার চুল কদম-ছাঁট। তাঁর নীতির দাপটে ইস্কুলের ছেলেরা ভয়ে জড়সড়—বাড়িতে ছেলে-মেয়েরাও। দুই ছেলে দুই মেয়ে। মেয়ে দু'টি বড়। মফঃস্বল ইস্কুলের সহকারী হেডমাস্টারের মাইনে সেই রকমই। মাসের শেষে সংসারের প্রায় অচলাবস্থা হত। সেই কারণেও মেজাজ সব সময় চড়া থাকত ভদ্রলোকের। তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ মালার মা যতদিন বেচে ছিলেন ততদিনই তাঁকে সংসার চালাতে না-জানার খোঁচা খেতে হয়েছে। বছর তিনেক হল ভদ্রমহিলা চোখ বুজেছেন।

আর বছর দেড়েক হল নীতিবাগীশ লোকটি সংসার চালনায় পটু নতুন ঘরনী এনেছেন। নতুন কর্ত্রী এসে অনটনের সংসারে ওই ছেলেমেয়েগুলোকে বাড়তি আপদ ভিন্ন আর কিছু ভাবেন নি। অমন বয়সের একজনের ঘরে আসার ফলে একটু বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম তাঁর পাওনা বলেই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু চার-চারটে মুখ সামনে হাঁ করে আছে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য জুটবে কোথা থেকে? অতএব তাঁরও মেজাজের সমাচার খুব কুশল ছিল না।

ছেলেমেয়েগুলোর দুরবস্থার কথা তাদের মামা বিমলেন্দুবাবু প্রথম শুনেছিলেন এক বন্ধুর মুখে। ভগ্নীপতির আবার বিয়ে করার খবরটাই মস্ত ধাক্কা তাঁর। বোনটাকে ভালোবাসতেন তিনি—অনেক ছোট তাঁর থেকে। তারপর যে-খবর শুনলেন, যদিও সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয় খুব, কিন্তু তার আংশিক সত্য হলেও স্থির থাকা কঠিন।

বিমলেন্দুবাবুর অস্থিরতা লক্ষ্য করে তাঁর স্ত্রী-ই একদিন জোরজার করে তাকে দেখতে পাঠালেন। সৎমা এলেই পাঁচজনে পাঁচরকম সন্দেহের চোখে দেখে, তিলকে তাল করে।

বিমলেন্দুবাবু গেলেন, আর বেড়ার নাম করে ভাগ্নে-ভাগ্নীদের একেবারে সঙ্গে করে ফিরলেন। তাঁর স্ত্রী আড়ালে যেটুকু শুনলেন তাতেই তার চোখে জল আসার উপক্রম। শুধু বললেন—নিয়ে এসে ভালো করেছ, এমন নির্লজ্জও মানুষ হয়।

দু'বছর হল মালারা এসেছে এখানে। ষোল বছরে এসেছিল, এখন তার বয়েস আঠার। নিরাশ হবার মতো বয়েস নয় একটুও। গলির ওধারে ওই মস্ত দালানের ওই ঘরের লোকটা তাকে বাতিল করে দিলেও না। দু'বছর ধরে এই কোণের জানালার এখানটাই প্রধান আশ্রয় মালার। বারান্দার রেলিংয়ে গিয়ে দাঁড়ালেই বাঁয়ের দালানের পাজামা-পরনে ছেলেটার যেন রাস্তা দেখার দরকার হয়ে পড়ে। আর কোণঘেঁষা ডাইনের বাড়িটার ফেস্তা দিয়ে কাপড়-পরা সঙ্গীতজ্ঞ পুরুষটিও চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মালাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গান ভাঁজতে থাকে। অন্ধকার রাত না হলে মালার বারান্দায় দাঁড়ানো হয় না। আর রাতেও দেখা যাক না যাক, সে দাঁড়িয়ে আছে অনুভব করলেই দু'দিক থেকে দু'জনের আবির্ভাব ঘটে।

অতএব ঘরের কোণের জানালাটাই ভরসা মালার। সেখানে বসেই পড়ে বা বোনে, বা যা হোক কিছু করে। কখনো কপাট খোলা থাকে জানালা দুটোর, কখনো বা নিজের সুবিধেমতো একটু আধটু। সবটা খোলা থাকে যখন গলির ওধারের ও-ঘরের বাসিন্দাটি অনুপস্থিত। জানালার এই কোণটি থেকে নীচের ওই ঘরটার ভিতরসুদ্ধ দেখা যায়। ওটা ঘর ঠিক নয়, বড় একটা হলঘরের মতো। ঘরের মধ্যে কাজের কত রকম সরঞ্জাম, কত রকমের ছবি। হলঘরের ভিতর দিয়ে যে ঘরটার আভাস, সেটা শোবার ঘর।

এই হলঘরটা রহস্যের মতো লাগে মালার। দু'বছর ধরেই তাই লাগছে। সেখানে ঘরের মালিক যখন কর্মনিবিষ্ট, মালার এই কোণের জানালাটা তখন অল্প ফাঁক থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে অবাক বিস্ময়ে দেখে মালা। অত নিবিষ্টচিত্তেও কাজ করতে পারে কেউ! সমস্ত দুনিয়াটা যেন অনুপস্থিত লোকটার কাছে। উপস্থিত শুধু ওই মস্ত ফ্রেমটা, আর তাতে আঁটা ক্যানভাসটা, আর পাশের রঙ-তুলি আর জলের বাটি। কখন নতুন ক্যানভাসে রঙ ছোঁয়ানো হল, আর কবে সেটা শেষ হল, মালা তার পুঙ্খানুপুঙ্খ জানে। কিন্তু কি শেষ হল, সেটা জানার উপায় নেই। জানার জন্যে ছটফটানিরও শেষ নেই। ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে দেখে আসে। লোকটার মুখের তৃপ্তি দেখে বা বিরক্তি দেখে শুধু বুঝতে পারে, কোনটা মনের মতো হল, আর কোনটা হল না।

ইচ্ছে করলেই মালা ওই ঘরে ঢুকতে পারে, ইচ্ছে করলেই দেখতে পারে। নমিদি তো কতদিন তাকে যাবার কথা বলেছে। এই বয়সেই এত লজ্জা দেখে রাগ পর্যন্ত করেছে। কিন্তু বাজ্যের সংকোচ মালার। আর ওই ঘরে ঢোকা! বাবা রে বাবা! নমিদি বলেছে, যখন তখন গৌতমদার ঘরে ঢুকলে তাকে সুদ্ধু নাকি রাগ করে ঘর থেকে বার করে দেয়। আঁকা-টাকার গল্প উঠলে তার গৌতমদার প্রশংসায় নমিদি পঞ্চমুখ। তার মতে অমন শিল্পী আর আছে কিনা সন্দেহ। নমিদির থেকে মাত্র তিন বছরের বড় খুড়তুতো দাদাটি। ওই বাড়িটার অর্ধেক মালিক। নমিদি এম এ. পড়ে। তার এই দাদা বি. এস-সি. ডিস্টিংশনে পাস করে আঁকার কলেজে ঢুকেছিল। সেখানেও আগাগোড়া ফার্স্ট। এই বয়সেই এখন সেই আঁকার কলেজে মাস্টারি করে। অবসর সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজের কাজ করে।

মামীর সঙ্গে খুব ভাব নমিদির। প্রায়ই গল্প করতে আসে। মালা যায় না বলে মামীকে অনুযোগ করাতে মামী অনেক দিন ঠেলে পাঠাতে চেষ্টা করেছেন তাকে। সে-চেষ্টার পিছনে মামীর একটু আশাও ছিল। মালা শেষে নমিদিকে বলেছিল—পরীক্ষাটা হয়ে গেলে যাবে।...নমিদি হেসে ফেলেছিল—এখান থেকে লাফালে আমাদের ঘরে গিয়ে পড়বে—পরীক্ষার জন্য যেতে পারছ না?

পরীক্ষা, অর্থাৎ স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। মামাই তোড়জোড় করে ওর পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছিলেন আর অন্য ভাইবোনগুলোকে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিলেন। ওর পরীক্ষার পর নমিদিরাই দু-তিন মাসের জন্য কোথায় যেন গিয়েছিল। কিন্তু মালা তারপর যাবে কি, লজ্জায় মুখ লুকোতে পারলে বাঁচে—সে থার্ড ডিভিশনে পাস করেছে।

পাস করার পরেও তাকে কলেজে ভর্তি করানো যায় নি। তার লজ্জাই বেশী। মামা আরারও বাড়িতে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু পড়াশোনা মালার কমই

হয। সামনে বই খোলা থাকে, এই পর্যন্ত। চোখ থাকে আধ-পাটখোলা জানালাব ভিতব দিযে গলিব ওধাবেব ওই বড ঘবটাব দিকে। খুব ক্লান্ত লাগলে লোকটা তুলি-টুলি ফেলে হাত-পা ছডিযে সিগাবেট টানতে থাকে। আব সিগাবেট একবাব ধবল তো একেবাবে দুটো তিনটে খাবে। মালা শুনেছিল বেশী সিগাবেট খেলে গলায ও বুকে অনেক সময ব্যামো হয। মালা ভুরু কোঁচকায, কেন, কি দবকাব অত সিগাবেট খাবাব।

জানালাটা যে সব সময একেবাবে মাপমতো বন্ধ থাকে তা নয। এক-আধ সময হযত খোলাই থেকে যায অনেকটা। কাজে মন দিলে কোনোদিকে তো আব তাকাবে না লোকটা—তাই সব সময সতর্ক থাকাব প্রযোজন হয না মালাব। ফলে এক-একদিন দেখা হযে যায, চোখোচোখি হয। তখনো খুব যে খেযাল কবে দেখে ওকে, মনে হয না। মালা অবশ্য জানালাটা ঠেলেই দেয। নমিদিব মুখে নাম শুনেছে, গৌতম। গৌতমই বটে। মালাব এক-একদিন ইচ্ছে হয, স্কুল ফাইন্যালেব ইতিহাস বইটা এনে 'গৌতমেব ধ্যান' অধ্যাযটা চেঁচিযে চেঁচিযে পডে। তাবপব উদ্ভট ইচ্ছেটাব কথা ভেবে নিজেব মনেই হেসে বাঁচে না।

একদিন মালাব দুই চক্ষু বিস্ফাবিত। জানালা বন্ধ কবতেও ভুল হযে গেল। একি কাণ্ড। ছোট ছেলেব মতো একতাল কাদামাটি ছানাছানি কবছে লোকটা। তাই দিযে কিছু একটা গডতে চেষ্টা কবছে, আবাব তালগোল পাকিযে দিচ্ছে। প্রায ঘণ্টাখানেক ধবে কাদাব তালটাকে কিছু একটা আদলে আনাব চেষ্টায হাল ছেডে শেষে জানালাব কাছে এসে দাঁডাল। মালাব তখনো খেযাল নেই, সে হাঁ কবে দাঁডিযেই আছে। লোকটাব মুখে হাসিব আভাস দেখে খেযাল হযেছে, হুডমুডিযে ছুটে পালিযেছে সেখান থেকে।

মামী একদিন নমিদিব কাছে ভাগ্নীব বিযেব ভাবনাটা প্রকাশ কবে ফেললেন। মালা কাছেই ছিল। নমিদিব মন্তব্য কানে এল—ওব জন্যে আপনাব ভাবনা কি, ওই চেহাবাব মেযে ক'টা হয, যে দেখবে সেই লুফে নেবে।—এবপব আব একদিন মনেব বাসনাটা নমিদিব কাছে প্রকাশই কবে ফেললেন মামী। বললেন, দুবাশা তো বটেই, তবু ভাগ্নীব ওই চেহাবাটুকুব জন্যেই ভবসা কবে প্রস্তাবটা কবা। গৌতম সোনাব টুকবো ছেলে, এমন ভাগ্য তাঁদেব হবাব নয, তবু নমি যদি তাঁদেব মুখ চেযে একটু চেষ্টাচবিত্র কবে, যদি তাব বাবাকে একটু বলে কযে দেখে।

রূপেব যতই প্রশংসা করুক, এই আশা তাবা কবতে পাবে সেটা নমিদি ভাবে নি বোধহয। দূব থেকে তাব মুখ দেখে সেই বকমই মনে হযেছিল মালাব। তবে কথা দিযেছিল, বলে দেখব।

বলেছিল। কিছুদিনেব মধ্যেই ভাইপোব জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে মেযে দেখে গেলেন নমিব মা-বাবা। মেযে যে তাদেব পছন্দ হযেছে সেটা সেখানেই তাঁবা নির্দ্বিধায বলে গেলেন। মেযে মোটামুটি তাঁবা নিজেদেব ঘবে বসেই অনেকদিন ধবে দেখে আসছেন। সুখেব ঘবে রূপেব বাসা, কিন্তু এই ঘবে এই রূপ এল কেমন কবে, তাই বোধ হয মনে মনে অবাক হযে ভাবতেন তাঁবা।

বিমলেন্দুবাবুকে কথাবার্তা বলাব জন্য বাডিতে আসতে বলা হল। মস্ত আশা নিযে তিনি গেলেন। কিন্তু তাবপব মুখ অন্ধকাব। আলোচনাব ছলে মোটামুটি একটা

ফর্দ পেশ করলেন নমির বাবা। সেই ফর্দ বিমলেন্দুবাবু তাঁর নিজের দুটো মেয়ের বিয়েতেও মেটাতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তার ওপর নগদ তিন হাজার এক টাকা পণ। দায়দায়িত্ব সবই জ্যাঠার যখন, ছেলেটা কোনোদিন না ভাবে জ্যাঠা তার পাওয়া-থোয়ার ব্যাপারে উদাসীন ছিল।

বিমলেন্দুবাবুর মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। লো-প্রেসার কি হাই-প্রেসার বুঝছিলেন না। একটু সুস্থির হয়ে প্রথমে মেয়ের বাপের বাড়ির, পরে নিজের বাড়ির সংসারের চিত্রটা তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন—আপনাদের দয়ার ওপর নির্ভর—

নমির বাবা নিরাসক্ত মুখে জবাব দিয়েছেন—তাহলে আর কি হবে।

তবু একটু অনুনয় করতে যাচ্ছিলেন বিমলেন্দুবাবু, কিন্তু ভদ্রলোক সেটা পছন্দ করেন নি। বলেছেন—এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি—

না, কথা আর বাড়ে নি। তারপর মামীর তাড়নায় পড়ে এই শেষ চেষ্টাটা করেছিলেন বিমলেন্দু। ছেলেকে একবার এনে দেখানোর চেষ্টা। তারও এই ফল।

জানালা থেকে উঠে বাইরের বারান্দার রেলিংয়ে এসে দাঁড়াল মালা। এদিকের পাজামা-পরা লোকটা আর ওদিকের গায়ক গুটি-গুটি এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে টের পেল। দুদিকের দুজোড়া চোখ তাকে গিলছে, তাও উপলব্ধি করল। কিন্তু মালা আজ এই প্রথম দাঁড়িয়েই রইল। নির্লিপ্ত, উদাসীন। জগৎটাই যেন মৃত মূর্ছাতুর হয়ে পড়ে আছে তার সামনে।

এর মাস সাতেক বাদে এ-সংসারের সব থেকে অভিনব বিয়োগান্ত নাটকটা সুসম্পন্ন হয়ে গেল। মামা চোখ বুজলেন। লো-প্রেসারের স্ট্রোক। তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। জ্ঞান আর হয়ই নি। মামী ডাক ছেড়ে কেঁদেছিলেন। মালা কাদতে পারে নি। কাদবে কেমন করে, কান্না শোনার কান কি ওই বিশাল বিস্তৃত মহাকাশে কোথাও আছে?

এ-কাহিনীর শেষ অধ্যায়ের সূচনা দশ বছর বাদে।

শহরের অভিজাত অঞ্চলে হয়ত সব থেকেই অভিজাত আদর-কায়দার হোটেল ওটা। এখানে পকেটের বসদের হিসের কষে কেউ ঢোকে না। হিসের জিনিসটাই অচল এখানে। এখানকার রাতের অঢেল যৌবন। এখানকার আলোর কণায় কণায় যৌবনের নেশা। বাঙালী মাদ্রাজী পার্শী শিখ নেটিভ-সাহেব খাস-সাহেব—সকল জাতের সকল বর্ণের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানুষদের অবসর-বিনোদনের বা শ্রান্তি-ক্লান্তি মোচনের জায়গা এটি। অর্থকৌলীন্যে যিনি যত বেশী মেজাজী কুলীন, তাঁর তত সহজ আনাগোনা এখানে।

আইন? কানুন? সে-সবের কড়াকড়ি ছোট জায়গার জন্যে। বড় জায়গার স্পেশ্যাল পরোয়ানা। প্রয়োজন দেখাও, টাকা ঢালো—পরোয়ানা মিলবে। হোটেল কর্তৃপক্ষ রাতের মিয়াদ ভোরের দিকে টেনে নেবার জন্যে পরোয়ানা সংগ্রহে পিছ-পা নয়, টাকা ঢালতে গরবাজী নয়। কারণ তারা ঘরের টাকা ঢালছে না।

গৌতম দত্তর ছোট গাড়িটা হোটেলের সামনের ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল যখন, রাত তখন দশটার ওধারে। নিজেই ড্রাইভ করে। না, সে নিয়মিত আগন্তুক নয় এখানকার। যা সে খুঁজছে, একজন বন্ধু তার হদিস দিয়েছিল। বলেছিল, দেখ গে, পছন্দ হবে হয়ত, যদি বাজী করাতে পার—

আজ নিয়ে পর পর এই তিন দিন আসছে সে। দুদিনই দেখা পেয়েছে, আজও পাবে হয়ত। পছন্দ হয়েছে। যতটা চেয়েছিল তার থেকেও বেশী পছন্দ। কিন্তু আলাপ করা হয়নি। প্রস্তাব করা হয়নি। চেয়ে চেয়ে দেখেছে শুধু।

এখানকার ক্ষণ-সহচরীদের একজন। বাঙালী মেয়ে। বাঙালী মেয়ে বোধহয় এই একজনই আসে এখানে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আছে, পার্শী আছে—সুন্দরীও বটে। সুন্দরী না হলে এখানে ঠাঁই মেলে না। শুধু রূপ থাকলে হবে না, বেশবাস, আচার-আচরণ, কথাবার্তায় সূক্ষ্ম মার্জিত রুচিবোধ থাকা চাই। তা-ই আছে সকলের। কিন্তু আর কারো দিকে চোখ পড়ে নি গৌতম দত্তর। ওই একটি মেয়ে ছাড়া। আশ্চর্য, এমন মেয়েও আসে এখানে।

গৌতম দত্ত নামজাদা শিল্পী। তার ছবি, তার মডেলিংয়ের আলাদা মর্যাদা। কিন্তু সম্প্রতি মডেলই খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। মনের মতো মডেল। যে মডেল পেলে আন্তর্জাতিক সমঝদারদেরও টনক নড়বে। অনেকবার অনেক মডেল নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু তেমন মন ওঠে না। শিল্পী নিজে মুগ্ধ না হলে, মুগ্ধ করবে কাকে? মন না ভরলে, গড়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা। এজন্যে টাকা খরচ করতেও প্রস্তুত সে।

আগের দু'দিন যেখানে বসেছিল আজও সেই কোণটাই বেছে নিয়ে বসল। বিয়ারের অর্ডার দিল। এখান থেকেই মেয়েটিকে দেখেছে দু'দিন। আজও দেখছে। মুখখানা গত দু'দিনের মতোই চেনা-চেনা লাগছে। একজন ফিটফাট শিখ তরুণের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইছে মেয়েটি। আর এক-আধবার ঘাড় ফিরিয়ে ওকেও দেখছে। আগের দু'দিনও দেখেছিল।

গৌতম দত্ত অল্প অল্প বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে, চোখ দুটো তার অদূরের নারীতনুতে আটকে আছে। গত দু'দিনের মতোই বিশ্লেষণ করে দেখছে—নাক, মুখ, চোখ, ঠোঁটের বক্রাভাস, চিবুক, গলা। তারপর বক্ষাভাস—মার্জিত চোখে যতটুকু সয় ততটুকুই স্পষ্ট, ততটুকুই সুন্দর। তারপর কটিদেশ। তারপর আরো নীচে, আরো নীচে—একেবারে পা পর্যন্ত।

আজই প্রস্তাব করবে গৌতম দত্ত।

শিখ তরুণটির পানাহারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হাসিমুখে উঠল মেয়েটি। আগের দু'দিনও প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করতে দেখেছে। চাহিদা বজায় রাখার এটাই বোধহয় রীতি।

অনেক পুরুষেরই পরিচিতসুলভ ব্যবহার মেয়েটির সঙ্গে। কেউ হেসে অভ্যর্থনা জানায়, কেউ বা অভিবাদনে। মেয়েটি হেসে কারো সামনে দু-পাঁচ মিনিট বসে, কারো সামনে দাঁড়িয়ে দু-চারটে কথা বলে। আবার এগোয়। হোটেল কর্তৃপক্ষ যেন এখানকার মাননীয় অতিথিবর্গের সুখ-সুবিধের ভার তার ওপরেই অর্পণ করেছে। কারো হাসিমুখের আমন্ত্রণ দেখলেই হাসে, কাছে এসে খোঁজখবর করে।

দুটো টেবিলের ওধার দিয়ে যেতে যেতে আবারও দৃষ্টি বিনিময়। গৌতম দত্ত হাসল। যেমন করে ওরা হাসে। তাব থেকেও ভালো করে। কাছে আসাব অনুরোধের মতো হাসি।

মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। হাসি মিলিয়ে আসছিল। সেটা খেয়াল হতেই হাসিব জবাব দিল। সুন্দর সুচারু হাসি। তারপর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

—বসুন না।

গৌতম দত্ত শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা জানাল।

বসল। মুখোমুখি গৌতম দত্তও। আবারও মনে হল, মুখখানা চেনা-চেনা।

—আপনাকে কিছু দিতে বলি?

—না না, ধন্যবাদ, আপনি খান। আপনাকে নতুন দেখছি ক'দিন ধবে, নাকি আগে অন্য সময়ে আসতেন?

—না, এই তিনদিন এলাম।—গৌতম দত্ত থমকালো একটু, তাবপব বলে ফেলল —তিনদিনই আপনাব জন্যে আসছি।

—খুব ভাগ্য!—মেয়েটি হাসল। কিন্তু মনে হল এ-বকম কথা শুনে সে অভ্যস্ত।

গৌতম দত্ত দ্বিধা জানে না, কাজ বোঝে। হাতে এমন সময়ও নেই যে ভণিতা করে সময় কাটাতে পারে—অনেকেব অনেক জোড়া চোখ এই টেবিলে। মেয়েটিও এব মধ্যে ঘড়ি দেখেছে একবার। এই এক হাতেব মধ্যে তাকে দেখে গৌতম দত্ত কাজেব ফযসালাটা কবে নেবাব জন্য ভিতবে ভিতরে বেপবোযা হযে উঠেছে। বলল, —আমাব একটু বিশেষ আলোচনা ছিল আপনাব সঙ্গে, একটা দবকাবী প্রোপোজ্যাল, কিন্তু এটা ঠিক সিবিযাস আলোচনাব আবহাওযা নয, আমাব সঙ্গে গাড়ি আছে, আপনি যদি দযা কবে খানিকক্ষণের জন্যে আমার সঙ্গে আসেন।

এবারে মেয়েটির থমকাবাব পালা। টানা টানা চোখ দু'টি গৌতম দত্তব চোখেব গভীবে। জবাব দিল না চট করে।

গৌতম দত্তব বলাব মধ্যে এবাবে প্রচ্ছন্ন অনুনযেব সুব।—আপনি বিশ্বাস করুন, সত্যি খুব দরকাবী আলোচনা, আপনাব কোনো ভয নেই, আমি আবার আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিযে যাব।

—না, ভয আব কি, চলুন।—অল্প কবে হাসল মেয়েটি।

গৌতম দত্তব মনে হল, এই হাসিটুকুও এঁকে বাখার মতো সুন্দর।

রিয়াবেব গ্লাস থাকল পড়ে। গ্লাসে একটা নোট চাপা দিযে উৎফুল্ল চাপা আনন্দে সসঙ্গিনী নীচে নেমে এল। মোটবে উঠল। গাড়ি মাঠেব ধার দিযে একটা নির্জন রাস্তা ধবে চলল। গৌতম দত্ত কি ভাবে কথাটা পাড়বে ভেবে নিচ্ছিল...সঙ্গিনী পাশেব গদিতে গা ছেড়ে দিযেছে।

এবাবে একটু ভণিতা করা যেতে পাবে। গৌতম দত্ত বলল—আচ্ছা আপনাকে যেন কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

অস্ফুট হাসিব শব্দ।—বিলিতী ক্যালেন্ডারে দেখে থাকবেন।

কিন্তু কোনো ক্যালেন্ডারে গৌতম দত্ত দেখেছে বলে মনে পড়ল না। দেখলে এ-মুখ মনে থাকার কথা।

মেয়েটি হালকা গাম্ভীর্যে বলল—আপনাকে তো এসব দিকে আনাড়ী মনে হয়, অচেনা কাউকে এভাবে গাড়িতে ডেকে তুলবেন না, বিপদ হতে পারে। কত রকম যে থাকে—

—না, ইয়ে—আমার অন্য কথা ছিল—

—সে তো শুনলাম। নমিদি কেমন আছে? কোথায় বিয়ে হল—ছেলেপুলে কী?

গৌতম দত্ত হতভম্ব।—আপনি নমিকে চেনেন?

—ওমা, চিনব না কেন? কতদিন পাশাপাশি কাটালাম, দিনরাত ঘরে বসে আপনার কত ছবি-আঁকা দেখতাম।

গৌতম দত্তর প্রায় মনে পড়ল বুঝি এবার, বিয়ের কথাও উঠেছিল পাশের বাড়ির কার সঙ্গে যেন—এই নাকি। কি কাণ্ড। হলে তো হয়েছিল আর কি। কিন্তু তার আশাও বাড়ল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল—তোমার—আই মিন আপনার নামটি কী?

—নাম মালা—অস্ফুট মিষ্টি হাসি তেমনি—নামে কি চিনবেন, দিনরাত চোখ-কান বন্ধ করে কাজ করতেন আপনি।

প্রশংসার কথাই। গৌতম দত্ত মনে মনে খুশী হল। স্তুতি অনেক জোটে, কিন্তু যার কাছে স্বার্থ তার স্তুতিটা বেশী কাম্য। স্টিয়ারিং হাতে থাকায় ঘাড় ফিরিয়ে ভালো করে দেখার সুবিধে হচ্ছিল না। বলল—তখন নিজের খেয়ালে আঁকতুম, শিল্পী হিসেবে এখন একটু-আধটু চেনে অনেকেই—

মালা সায় দিল।—চিনবে জানতুম।—তা দরকারী আলোচনাটা কি আপনার, মডেল চাই?

গৌতম দত্ত অবাকই হচ্ছে মনে মনে। এই চেহারার এমন এক মেয়ে তার বাড়ির পাশে থাকত, অথচ ভালো করে সে লক্ষ্যও করে নি কোনোদিন।...বছর দশেক হয়ে গেল বোধহয়, বয়েস তো তাহলে আটাশ-উনত্রিশের কম নয়—অথচ এত কাছ থেকেও সে বাইশ-তেইশের বেশি ভাবে নি। কারণ থাক আর না থাক, গৌতম দত্ত এই জন্যেও বোধহয় আরো খুশী মনে মনে। কিন্তু পেশাগত আলোচনার মুখে আগ্রহটা খুব বেশী দেখানো উচিত নয়।

মাথা নাড়ল। বলল—হ্যাঁ, একের পর এক দেখে যাচ্ছি, তুমি—মানে আপনি রাজী হলে—

—'তুমি' 'আপনি'তে বড় গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। একটা ঠিক করুন। 'তুমি'ও বলতে পারেন, আপত্তি করব না—

আপত্তি করবে না। সুতরাং তার আসা সার্থক, সেটা গৌতম দত্ত ধরেই নিয়েছে। বলল—তুমি রাজী হলে সেটল করে ফেলি।

মালা ভাবনায় পড়ল যেন একটু।—আমার কি সময় হবে—

লাগোয়া বাড়ির পড়শিনী ছিল একদিন, সেই কারণে গৌতম দত্তর যেন দাবিই আছে। জোর দিয়ে বলল—এ একটা মস্ত কাজ। আমার অনেক নতুন আইডিয়া আছে, অনেক প্ল্যানও আছে—আমার বিশ্বাস বিদেশেও কম কদর হবে না, আর মডেল হিসেবে তোমারও নাম ছড়াবে—এ রকম যোগাযোগ সব সময় ঠিক হয় না।

অর্থাৎ যোগাযোগটা মালার দিক থেকেও সৌভাগ্যসূচক। মালাও সেটা বুঝল যেন, বলল—লোভ হচ্ছে। আচ্ছা, এবারে গাড়ি ফেরান, যেতে যেতে কথা বলি।

গৌতম দত্ত গাড়ি ফেরাল। অন্তর তুষ্টিতে ভরপুর। লোভের আরো একটু ইন্ধন যোগাল। বলল, এক আধ বছরের মধ্যে হয়ত বাইরেও যাব আমরা—

মালা চুপচাপ ভাবল একটু। বলল—আপনার মডেল মানে তো—ক্যালেন্ডার-ট্যালেন্ডারে যে রকম সিটিং দিই, সে রকম নয় বোধহয়?

গৌতম দত্ত মাথা নাড়ল।—না সে রকম নয়। রিয়েল মডেল বলতে যা বোঝায়, মানে—

বলাটা সহজ হচ্ছিল না। মালা হেসে থামিয়ে দিল।—থাক, বুঝেছি। আচ্ছা, কি রকম কি ব্যবস্থা হবে বলুন—

—তুমি বললেই ভালো হয়, কি রকম দরকার—

—দরকার তো কম নয়।—হাসি-হাসি মুখখানা হিসেবে মগ্ন একটু।—তা দিনে কাজ, না রাত্রিতে?

—দিনের বেলায়ও দরকার হতে পারে, তবে রাত্রিতেই কাজ করি—

হিসের ভুলে মালা সকৌতুকে ঘাড় ফেরাল তার দিকে।

—রিয়েল মডেল নিয়ে রাত্রিতে কাজ করলে আপনার স্ত্রী রাগ করেন না? বিয়ে করেছেন তো?

কাজের প্রসঙ্গে এই মেয়েলী কথা ভালো লাগল না গৌতম দত্তর। এককথায় দুটো জবাব সারল।—তিনি জানেন এটা পেশা আমার।

মালা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, সেটা ঠিক কথা। জিজ্ঞাসা করল—কতদিনের কাজ আপনার?

—কাজ অনেকদিনের, এক বছরের না হয় তিন বছরেরই কন্ট্রাক্ট করে নিতে রাজী আছি আমি। তারপরেও কাজ শেষ হবে না, কন্ট্রাক্ট আবার রিনিউ হবে।

মালা খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল যেন। মনে মনে আবার একটু হিসের করে নিয়ে বলল—দিনে কম হলেও দেড়শ টাকা—মাসে ধরুন সাড়ে চার হাজার টাকা রোজগার আমার, বেশীও হয়—

গৌতম দত্ত আঁতকে উঠল একেবারে। গাড়িটা সুদ্ধু নড়েচড়ে গেল একটু। মনের মতো মডেল পেলে সে মোটা টাকা খরচ করতে প্রস্তুত—সেই মোটা টাকার অঙ্কটা খুব বেশী হলে হাজার টাকা মাসে। এই একটা অঙ্ক শুনে রাজ্যের হতাশা যেন গ্রাস করতে এল তাকে। নিজেকে খানিকটা বঞ্চিত করে আর পৈতৃক সম্পত্তির জোরে টেনেটুনে বড় জোর দেড় হাজারে উঠতে পারে। সেও এই ঝোঁকে, এই মডেলের জন্যে।

শুকনো মুখে বলল—আমি অত পেরে উঠব কেন, এতবড় কাজের দিকটা ভেবে আর শিল্পীর দিকটা ভেবেই তুমি যদি অনুগ্রহ করে রাজী হও—

চরম হতাশার মুহূর্তেও একটুখানি আশার আলো দেখছিল কি গৌতম দত্ত? সামনের দিকে নজর রাখা ভুলে পার্শ্ববর্তিনীর দিকেই চাইছে ফিরে ফিরে। আবেদনের ফলে একটু ভাবছেই মনে হল।

মালা বলল—মুশকিলে ফেললেন। আচ্ছা, মোটামুটি ওই চার হাজার পর্যন্ত পাবি, তার নীচে আর পাবি না।

গৌতম দত্তর সময় লাগল আত্মস্থ হতে। গাড়ি হোটেলের কাছাকাছি এসে গেছে। অস্ফুট স্বরে বলল—না, সেও আমার সাধ্যের বাইরে।

মালা তক্ষুণি সান্ত্বনার সুরে বলল—তাতে কি, কমে কি আর পাওয়া যায় না? আমার সঙ্গেই তো কত সময় কত জনের দেখা হয়, আর তারা সব দেখতেও ভালোই। আপনার স্টুডিও এখনো বাড়িতেই তো? সুবিধেমতো কাউকে পেলে আপনার ঠিকানা দিয়ে দের'খন।

গৌতম দত্ত নিরুত্তর।

গাড়ি হোটেলের সামনে দাঁড়াল। মালা নেমে এসে স্মিতমুখে দুহাত জুড়ে নমস্কার জানাল।—বেড়িয়ে বেশ লাগছে, অনেক ধন্যবাদ। চলি।

ফুটপাথ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করল গৌতম দত্ত। সিগারেট ধরাল। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিল।

হোটেলের সিড়ি পর্যন্ত টকটকিয়ে এসে মালা দাড়িয়ে পড়ল। দোতলার দিকে তাকাল একবার। আজ আর ইচ্ছে করছে না দোতলায় উঠতে। চল্লিশ-পঞ্চাশটা টাকা লোকসান কম করে। হোকগে। মনটা ভালো লাগছে খুব। শিথিল চরণে আবার বাইরে এসে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল সে।

এই স্পীডে গৌতম দত্ত গাড়ি চালায় না কখনো। ঘণ্টায় বিশ মাইলও হবে কিনা সন্দেহ। তার জীবনেরই খানিকটা গতি কমে গেছে যেন।

অবসাদগ্রস্তের মতো গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছিল গৌতম দত্ত, মেয়েদের কি হৃদয় বলে কোনো বস্তু নেই?

ঝড়

খুব বেশি দিনের কথা নয়।

একদিনের মাত্র কয়েক ঘণ্টার প্রচণ্ড ঝড়ে শহর কলকাতার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় গাছগুলো শিকড় উপড়ে পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। পরদিন দেখে মনে হয়েছে যুদ্ধ-হত এক-একটা অতিকায় দানব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে অভিযোগ জানাচ্ছে। ভাঙা ডাল, ছেঁড়া তার আর উড়ন্ত টিনের চাল সরিয়ে চলাচলের পথ সুগম করতে এক সপ্তাহ লেগেছিল।

কিন্তু আমি সেদিনের কথাই বলছি। সেই প্রলয়-সন্ধ্যার কথা।

কাক চিল পটাপট মাটিতে আছাড় খেয়ে মরেছে। গাছ আর ভাঙা বাড়ি চাপা পড়ে অনেক লোক হতাহত হয়েছে। ট্রাম-বাস বন্ধ হওয়ায় বহু মেয়ে-পুরুষ পথে

আটকে গেছে, আর ঘরে ফিবতে পাববে কিনা, সেই ত্রাস চোখ ঠেলে উঠেছে। যারা ভাগ্যক্রমে আগেই ঘবে পৌঁছে গিয়েছিল তারা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছে।

কিন্তু সেই সন্ধ্যাটাকে আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখি নি। কিছু শুনেছি, কিছু অনুমান করেছি। বাড়িতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সকলে দুটো করে চোখ কপালে তুলে নিরীক্ষণ করেছে আমি সেই লোক কি না, আমাব হাত-পাগুলো সব যথাযথ আছে কি না। আশঙ্কা কাটতে মা-ই প্রথম মুখব্যাদান কবেছেন— তুই এব মধ্যে এলি কি কবে, বিপদ-আপদ হয নি তো? এদিকে যে কাণ্ড, ঠাকুর বক্ষা করেছেন—

দুই এক কথায় সকলকে আশ্বস্ত কবে কাণ্ড শোনার দিকে মন দিতে চেষ্টা কবেছি। নিজেকে ভুলতে হলে, নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে হলে, অন্যেব কথা মন দিয়ে শোনাব মতো ওষুধ আব নেই। কিন্তু সে পারা বড় শক্ত। আমারও সহজ হচ্ছিল না।

ঝড় থেমে গেছে, তাই এবা ঝড়ের গল্প করতে পারছে। কার কত বড ফাঁড়া গেল তাব রোমাঞ্চকর বিবরণ কানে আসছে। বিপদ হতে পারত বই কি, খুব বিপদ হতে পাবত।

কিন্তু আমাব বুকেব ঝড এখনো থামে নি। দেহের সবগুলো স্নায়ুতে টান ধবে আছে। ওদের কথা শুনতে শুনতে সেগুলিকেই শিথিল কবার চেষ্টা। সহজ হওয়াব চেষ্টা।

আমি তখন আকাশে ছিলাম।

একটা মালবাহী প্লেনে। যাব পাইলট ক্যাপ্টেন সিং। যোগীন সিং। আব একটু বিস্তৃত কবে বলা দবকাব। কলকাতা থেকে কুচবিহাব ট্রেনে প্রায দুদিনেব পথ, প্লেনে দেড ঘণ্টাব। খববেব কাগজেব কাজে প্রাযই তখন এদিকে আসতে হত। এই সূত্রে যোগীন সিংয়েব সঙ্গে আলাপ। মাসে চাববাবও প্লেনে যাতাযাত কবেছি। তাছাড়া দুই একবাব আসাম বা বাগডোগবা থেকে ফেবার সময়ও যোগীন সিংয়ের প্লেন পেয়ে গেছি। ছোট একটা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রধান পাইলট যোগীন সিং। গোডার জীবনে তিন বছর মিলিটারীতে ছিল। সেই সূবাদে ক্যাপ্টেন। মিলিটারীব ওপবঅলাদের সঙ্গে বনিবনা না হওযাতে পার্মানেন্ট কমিশন পায নি বা নেয নি। প্রথম শর্তেব মিয়াদ ফুবোতেই ছেড়ে এসেছে।

বনিবনা না হওযাবই কথা। তার মেজাজেব ওপব মেজাজ দেখানোর লোক থাকলে যোগীন সিংযের সেখানে টিকে থাকার কথা নয। তাব মতো পাইলট নিয়মিত সার্ভিসেব অনেক বড বড প্রতিষ্ঠানেও অনাযাসে মোটা মাইনেব কাজ জোটাতে পাবত। মাসে দু-দশ বাব ইংল্যাণ্ড আমেবিকা কবতে পারত। কিন্তু সে কাজ করতে হলে নিয়মের বশ হতে হয, মেজাজও কিছুটা খাটো করতে হয।

যোগীন সিংয়েব সঙ্গে চেনা-যাত্রী হিসেবে আমার আলাপ বটে, কিন্তু হৃদ্যতার আরো একটু কারণ ছিল। বছব তিন চার আগে খবরেব কাগজে একটা ফ্রী-ফাইটেব ছবি ছাপা হয়েছিল সেটা আজ আর কাবো মনে নেই বোধহয়। কলকাতার বাইরেব এক অভিজাত হোটেলে বয়সের গবমে আর টাকার গরমে তিনটি ধনী সন্তান নিজেদের ভাষায় এক বিদেশী তরুণী মহিলার উদ্দেশে তবল টিকা-টিপ্পনী কাটছিল। মহিলা ভাষা

না বুঝলেও তাকে নিয়েই কিছু হচ্ছে বুঝে ক্রুদ্ধ এবং আবক্ত হয়ে উঠছিলেন। যোগীন সিং মদ খাচ্ছিল আর ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। উঠে গিয়ে প্রতিবাদ করতে ধনীর দুলালের তিনজনেই একসঙ্গে রুখে উঠল এবং মাতাল বলে কটূক্তি করে উঠল। একে তিনজন তারা, তায় স্বাস্থ্যও কারো খারাপ নয়। যোগীন সিং আর কিছু না বলে নিজের টেবিলে এসে মদের গেলাস খালি করল, তারপর উঠে চুপচাপ বাইরে চলে এল।

একটু বাদে চায়ের পাট শেষ করে আমি বাইরে এসে দেখি, যোগীন সিং নির্লিপ্ত মুখে হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতে নিস্পৃহ উক্তি করল—হ্যালো।

আমিও বললাম, হ্যালো।

আলাপ তখনো এর বেশি নয়। এরোড্রোম থেকে বেরিয়ে অনেক সময় এক হোটেলে এসে উঠলেও, লোকটাকে অত মদ খেতে দেখে, আমি তেমন বেশি কাছে ঘেঁষি না। কিন্তু সেদিন আমার সাংবাদিক চোখে কি যেন একটা সম্ভাবনার অস্বস্তি দেখা দিল। ট্যাক্সি ধরার অছিলায় আমিও দাঁড়ালাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। ভিতরের মহিলাটি আগেই চলে গিয়েছিলেন। লোক তিনটিও একটু পরেই বেরুল। তারপর ফুটপাথের ওপরেই খণ্ড যুদ্ধ। দুজনের নাক মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল—তারা ফুটপাথে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তৃতীয় জন প্রাণ বাঁচিয়ে মোটরে উঠে চম্পট দিয়েছে।

আমি কিছুই করি নি। শুধু দাঁড়িয়ে দেখেছি, আর ঠিক যে মুহূর্তটির ছবি তোলা দরকার, সেই মুহূর্তের একটা ছবি তুলেছি। তারপর ঘটনার বিবরণ লিখে কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি।

এই থেকেই হৃদ্যতা। পরে যোগীন সিং হাসতে হাসতে বলেছে, তার উপকার করেছি আমি। সে অনেক জায়গা থেকে অনেক সাবাস পেয়েছে বলে নয়। লোকগুলোর টাকার জোর আছে, তারা কেস করত, অন্যভাবেও জব্দ করার চেষ্টা করত। কিন্তু খবরের কাগজে এভাবে ফলাও করে সব প্রকাশ হয়ে পড়াতে নিজেরাই গা ঢাকা দিয়ে আছে। খবরের কাগজ তার জোরালো সাক্ষীর কাজ করেছে।

আমি প্রীত হয়েছিলাম। কিন্তু এও জানি, যোগীন সিং কারো উপকারের পরোয়া না রেখেই যা করার করেছিল।

এরপর বাইরের এরোড্রোম থেকে বেরিয়ে সে যখন যে হোটেলে উঠেছে, আমাকেও সেখানেই টেনে নিয়ে গেছে। আমি বসে বসে তাকে অনেক মদ খেতে দেখেছি, কিন্তু মাতাল হতে দেখি নি। তাকে দেখলে বা কথাবার্তা বললে পাঞ্জাবী বলবে না কেউ। দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই, আমাদের মতোই পরিষ্কার বাংলা বলে। ছেলেবেলা থেকে বাংলাদেশেই মানুষ।

যাক, বর্তমানের কথা বলি। কুচবিহার থেকে আমার ফেরার তাড়া ছিল। কিন্তু দু'দিনের আগে প্লেনে সীট পাব, সে আশা ছিল না। ইতিমধ্যে যোগীন সিংয়ের প্লেন দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। সে আবার পরদিনই বিকেলে প্লেন নিয়ে ফিরছে জেনে, তাকে ধরলাম, নিয়ে যেতে হবে। যোগীন সিংও তক্ষুনি রাজী। তার এক টেলিফোনে

ফেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। কারো আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না, যোগীন সিং বলেছে যখন, মালেব ওপর বসিয়ে নিয়ে গেলেও নিয়ে যাবেই জানি।

পরদিন। দুপুব থেকে আকাশের অবস্থা ঘোরালো। কাগজেও ঝড়েব আভাস দিয়েছে। শাঁ শাঁ কবে বাতাস বইছে, থমথমে মেঘের গুরু গুরু ডাকটা অন্যবকম।

যোগীন সিংকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ওয়েদাব, যাবে কি কবে?

সে নির্ভাবনায জবাব দিল, যেতে হবে। অ্যাপযেন্টমেন্ট আছে।

অবাক হযে জিজ্ঞাসা করলাম— কোথায় অ্যাপযেন্টমেন্ট, কলকাতায?

মাথা নাড়লে। হাসলও একটু।

এ ধরনেব হাসি আমি চিনি। বললাম—তাহলে তো বেশ জটিল অ্যাপয়েন্টমেন্ট মনে হচ্ছে, সময়ে না গেলে নিশ্চয কোনো লেডিব বিবাগ ভাজন হবাব ভয় আছে?

যোগীন সিং আবো হেসে আরো বেশি মাথা ঝাঁকালে। আমাব শোনাব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সদাব্যস্ত যোগীন সিংয়ের প্রণয কথা ফেঁদে বসার মেজাজ ছিল না। টুকটাক দু-চার কথা মাত্র জানা গেল। মহিলাব নাম যশোধরা। ক্রিশ্চিয়ান। মস্ত ব্যবসাযীব মেযে ছিল, কিন্তু তাদের বড অবস্থাব সময় যোগীন সিং ও-মেয়েব পাত্তা পায় নি। বাপের ব্যবসা লাটে উঠতে খানিকটা সুবিধে হযেছে। তখনো যোগীন সিংযেব টান দেখে —না, টান আবো বাডতে দেখে, যশোধবা বুঝেছে যোগীন সিংযেব লোভ তাব বাবাব টাকাব ওপব নয, লোভ তারই ওপব। সে অনেক ব্যাপাব—

যোগীন সিং হাসি মুখে স্বীকাব কবেছে, অ্যাপযেন্টমেন্ট ফেল করলে রক্ষা নেই সেটা সত্যি কথাই। মেয়েব যেমন মেজাজ তেমনি অভিমান, একবাব অ্যাপযেন্টমেন্ট ফেল কবাব ফলে সে কি কাণ্ড।

যোগীন সিং অন্যমনস্ক হযে পডল। কাণ্ডবিস্তারে আগ্রহ দেখা গেল না। একটু বাদেই গা-ঝাডা দিযে উঠে ব্যস্ত পাযে কোথায চলে গেল। কিছু হযত মনে পডে থাকবে।

যথা সময়ে এযাব অফিসে এসে হতাশ হলাম। এই আবহাওযায প্লেন ছাড়বে মনে হয না। ঝোডো বাতাস ক্রমে বাড়ছে, আকাশেব অবস্থা ভযাবহ। এ সময কুচবিহাব থেকে ওই একটাই প্লেন ছাডার কথা। ছোট বে-সবকাবী প্রতিষ্ঠানেব মালবাহী প্লেন। ছাড়বে কি ছাডবে না এ নিযে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। তবু ক্যাপ্টেন যোগীন সিং আসতে অফিস থেকে তাকে জানানো হল, সব জাযগাবই ওযেদাব বিপোর্ট খারাপ —টেক অফ করা, ঠিক হবে না।

যোগীন সিং কান দিলে না, নিঃশঙ্ক জবাব দিল—ও কিছু না, উপর দিয়ে চলে যাব।

আমাব ভয় ধবল একটু। এক ফাঁকে তাকে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম—এব মধ্যেই তুমি যাবে?

—তুমি থেকে যাও না, কাল যেও!

নিজেব কাজে চলে গেল। দ্বিধা কাটিয়ে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা কবলাম। প্লেন যাবে, যোগীন সিং যাবে, এত মালপত্র যাবে, সঙ্গে যাত্রীও যাবে আরো—এর

মধ্যে নিজেব প্রাণটাব জন্য এত ভাবতে লজ্জা কবল। তাছাড়া সত্যিই বিপদেব সম্ভাবনা থাকলে যোগীন সিংই বা বওনা হতে চাইবে কেন?

প্লেন উঠল। আমবা চাবজন মাত্র যাত্রী। এ ছাড়া পাইলট, কো-পাইলট এবং দু-চাবজন ক্রু। কিছুক্ষণেব মধ্যেই আমাদেব, অর্থাৎ যাত্রীদেব অবস্থা সঙিন। মালবাহী প্লেনেব বসাব আসনেব ব্যবস্থা প্যাসেঞ্জাব প্লেনেব মতো নয। মালেব সঙ্গে খানিকটা মালেব মতো হযেই আসা। তবে কোমবে বাঁধাব বেল্ট গোছেব কিছু আছে। সামনেই মুহুর্মুহু লাল আলো জ্বলছে, ফ্যাসন ইওব বেল্ট—বেল্ট বেঁধে বসুন। কিন্তু ওই বেল্ট বাঁধা সত্ত্বেও স্থিব হযে বসে থাকা অসম্ভব।

বাইবে ঝড কতটা হচ্ছে টেব পাচ্ছি না। কিন্তু ঝাঁকানি দোলানিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঘড়ি দেখলাম। সময অনুযাযী আমবা কলকাতাব ওপবে এসে পড়েছি। কিন্তু কিছুক্ষণেব মধ্যেই ভয আব ত্রাসে শরীবেব বক্ত হিম হযে এল। অনেক উঁচু দিযে প্লেনটা চক্রাকাবে ঘুবছে। নীচে নামাব এক একটা চেষ্টাব মুখে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড—আমবা কে কোথায হুমড়ি খেযে পড়ছি ঠিক নেই। মনে হচ্ছে ঝডেব মুখে কুটোব মতো এখুনি সব নিঃশেষ হযে যাবে।

চোখেব সামনে মৃত্যু দেখছি আমবা। মৃত্যু প্রতীক্ষা কবছি। এবই মধ্যে ঝডেব তাণ্ডব এডিযে কোনোমতে প্লেন সম্ভবত অনেক উঁচুতে উঠে স্থিব হল একটু। ভিতবে সকলে চিৎকাব কবে বলাবলি কবতে লাগল, প্লেন আবাব ফিবিযে নিযে যাওযা হোক, যেখান থেকে এসেছি সেইখানে, অথবা যে-কোনো দূব দূবান্তে যেখানে ঝড নেই। আমিও একমত, কিন্তু জানাব কাকে?

জানাবাব সুযোগ হল। কি কাবণে মিনিট দুইযেব জন্য কো-পাইলটেব হাতে প্লেন ছেড়ে একবাব ভিতবে এল ক্যাপ্টেন সিং। মনে হল, ভগবান আমাদেব আবজি শোনাবাব জন্যেই তাকে ভিতবে পাঠালেন। বিপদ সম্বন্ধে আমবা বেশি বুঝি, কি সে বেশি বোঝে সেই জ্ঞানও তখন আমাদেব নেই। শুধু বাচতে চাই, বাচাব আকুতি।

অন্য যাত্রীবা তাকে দেখেই চেচামেচি কবে উঠল। তাবা আশ্বাস চায, বাচাব আশ্বাস। প্লেন ফিবিযে নিযে যেতে বলল তাবা। কিন্তু অনুভূতিশূন্য পালিশ-কবা মূর্তি যোগীন সিংযেব। কাবো কথাব জবাব দিলে না। ভিতবেব একটা ছোট্ট খুপবিব মধ্যে গিয়ে ঢুকল, আব দু' মিনিট বাদেই বেবিযে এল।

এইবাব তাকে দেখা মাত্র আমাব ত্রাস আবো বেড়ে গেল। কাবণ আমাব মনে হল, ওখানে গিযে সে গলায খানিকটা মদ ঢেলে এলো। সত্যি মিথ্যে জানি না। কিন্তু আমাব তাই মনে হল, বিশ্বাস হল। বাগে ক্ষোভে আব ভযে দেহ অবশ। মনে হল, এক বদ্ধ পাগলেব পাল্লায পডেছি আমবা। এই দুর্যোগ থেকে আব অব্যাহতি নেই প্রাণেব আশা নেই।

যোগীন সিং ভিতবে চলে গেল। কোথা দিযে কোথায উডছি জানি না, তবে প্লেনেব দাপাদাপি অপেক্ষাকৃত কম। ভাবতে চেষ্টা কবলাম, হযত আমাব অনুমান মিথ্যা, যোগীন সিং হযত কোনো কাজেই ওই খুপবিব মধ্যে ঢুকেছিল। ডিউটিব সময মদ খাবেই বা কোন সাহসে। আশা কবতে ভালো লাগল, আমবা হযত কোনো নিবাপদ

স্থানেই ফিবে চলেছি। তখন সন্ধ্যা পাব হযে গেছে। কোন দিকে চলেছি কিছু ঠাওব কবা যাচ্ছে না।

অকস্মাৎ মিনিট কযেকেব জন্য সাক্ষাৎ মৃত্যুব বিববেব মধ্যেই যেন ঢুকে পড়লাম আমবা। দেহেব সব বক্ত প্রবল বেগে শিবশিব কবে উঠতে, বুঝলাম শাঁ-শাঁ কবে নীচেব দিকে নামছে প্লেন। ঝড়েব সামান্য একটু বিবতিব অপেক্ষায় ছিল যোগীন সিং। তাবপবেই সব বোঝাবুঝিব বাইবে আমবা।

দশ মিনিট গেছে, কি দশ ঘণ্টা গেছে, কি অনন্তকাল গেছে—কিছুই জানি না। একসময় সচেতন হযে দেখলাম প্লেন থেমে আছে, আব আমবা বেঁচে আছি। সেটা এমনই বিস্ময যে চট কবে বিশ্বাস হয না।

দবজা খোলা হতে বাইবেব দিকে চেযে আবো বিস্ময। এবোড্রোমেই নেমেছি আমবা। ঝোড়ো হাওযায তখনো দু'পাযেব ওপব ভব কবে দাড়ানো শক্ত। এই বিপদ দেখেই ছোট একটা গাড়ি এসে আমাদেব প্লেনেব চত্বব থেকে তুলে নিযে অফিসে এনে ছেড়ে দিল।

সর্বাঙ্গ অবসন্ন। শান্তি। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে জীবনেব আলোয ফিবে আসাব শান্তি। অঘোবে ঘুমিযে পড়াব মতো শান্তি।

কিন্তু যাব কী কবে? এ প্যাসেঞ্জাব প্লেন নয যে কোম্পানিব গাড়ি কবে তাদেব এযাব অফিস পর্যন্ত অন্তত পৌঁছে দেবে। এদিকে প্লেন চলাচল সব বন্ধ, অন্য কোনো কোম্পানীব গাড়িও যাতাযাত কবছে না। বাসও নেই। নির্জীবেব মতো এবোড্রোমেব বেস্তোবাঁয ঢুকে এক কাপ কড়া কফি নিযে বসলাম। প্রাণে যখন বেঁচেছি, সমস্ত বাত এখানে কেটে গেলেও খুব আপত্তি নেই।

—হ্যালো।

যোগীন সিং। মুখ লাল, কিন্তু ঠোঁটেব কোণে হাসিব আভাসও একটু। যে লোকেব খপ্পবে পড়ে প্রাণ যেতে বসেছিল, তাকে দেখেই আবাব অন্য আশা জাগল। যোগীন সিংযেব ছোট গাড়ি আছে একটা। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কবলাম, তোমাব অ্যাপযেন্টমেন্ট সাউথে, না এদিকেই?

—সাউথে। কেন?

—আমাকে যতটা সম্ভব এগিযে দাও না, যাব কি কবে?

ঘড়ি দেখল। তাবপব পিঠ চাপড়ে বলল—কাম অন—

একটি কেবিনেব দিকে এগোল সে। কফিব পেযালা তুলে নিযে আমিও তাব সঙ্গে কেবিনে গিযে ঢুকলাম। যোগীন সিং দুজনেব খাবাবেব অর্ডাব দিল। খাবাব না আসা পর্যন্ত চুপচাপ বসে বইল। কিছু ভাবছে মনে হল।

খাবাব আসতে পবদা টেনে দিযে কিট থেকে মদেব বোতল বাব কবল। আমি অবাক। প্রেযসী সন্নিধানে যাবাব আগেও এ বস্তু গলাধঃকবণ কবতে পাবে ভাবি নি।

খেতে খেতে ঈষৎ ব্যঙ্গস্বরে বলল, দুর্যোগে ওখানকাব নিষেধ সত্ত্বেও প্লেন ছেড়েছি বলে আমাব বিরুদ্ধে স্টেপ নেওযা হবে শুনছি। ইডিযেটস।

ঈষৎ বক্রিম দেখালো মুখ। যে বিপর্যযেব মধ্যে পডেছিলাম তা আব স্মবণ কবতে ইচ্ছে কবে না। তবু বললাম—এভাবে প্লেন না ছেডে আব একটু দেখে নিলেও তো পাবতে।

—দেখতে গেলে আব প্লেন নিয়ে ওঠাই যেত না, সে আমি আকাশেব অবস্থা দেখেই বুঝেছিলাম। সে জন্যে পাঁচ মিনিট আগেই প্লেন স্টার্ট দিযেছিলাম।

অর্থাৎ সব জেনেশুনেই সে প্লেন ছেডেছে। এ বকম লোককে কিই বা বলি।

যোগীন সিং নিবিষ্ট মনে আহাব কবছে। আব মদ খাচ্ছে। যেভাবে খাচ্ছে, মনে হল ধীবে সুস্থে গোটা বোতলটাই শেষ কববে।

বললাম—এসে যখন এই বিপদ দেখলে তখনই বা প্লেন ফেবালে না কেন? সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হতে পাবত—

বিবক্তিব সুবে পাল্টা প্রশ্ন কবল, ফিবব বলে প্লেন ছেডেছিলাম? তোমাকে তো বলেছি আজ না এলেই নয়।

অর্থাৎ তাব অ্যাপযেন্টমেন্ট আছে। এক বমণী তাব জন্য অপেক্ষা কবছে, বা কববে। এদিকে নিশ্চিন্ত মনে সে পানাহাবে মগ্ন। আমি হতভম্ভ। এই দুর্যোগে অ্যাপযেন্টমেন্ট না বাখতে পাবলে এক পাগল ভিন্ন আব কেউ বাগ কবে না। বিশেষ কবে যে লোককে আকাশ-পথে উডে আসতে হবে।

কিছু শোনাব জন্যেই টিপ্পনীব সুবে বলতে ছাডলাম না, এইদিনে না যেতে পাবলেও কি তিনি বুঝতেন না?

মাথা নাডল। বুঝত না। বলল, বড অবুঝ মেযে, বোঝাবুঝিব মধ্যে নেই। একবাব এই অ্যাপযেন্টমেন্ট ফেল কবে যে দুর্ভোগ হযেছে, সে যদি জানতে— পডবি তো পড, আজ আবাব সেই দিন, সেই তাবিখ।

ভিতবে ভিতবে উৎসুক হযে উঠেছি। কুচবিহাবেও একবাব বলেছিল, অ্যাপযেন্টমেন্ট না বাখতে পাবলে বক্ষা নেই, মেযেব যেমন মেজাজ তেমনি অভিমান—একবাব সময়মতো যেতে না পাবাব ফলে কি কাণ্ডই না হযেছিল। প্রাণেব মাযা তুচ্ছ কবে সেই আসাই এলো বটে। কিন্তু এসে এখানে বসে মদ গিলছে। সত্যি কথা বলতে কি, যে মেযে যোগীন সিংযেব মতো বেপবোযা লোককে এভাবে নাকে দডি বেঁধে টেনে আনতে পাবে, তাকে একটিবাব দেখতে ইচ্ছেও হচ্ছিল খুব।

জিজ্ঞাসা কবলাম, তা এসেও তুমি এখানে দেবি কবছ কেন?

সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, সাডে আটটায যাবাব কথা।

এমনভাবে বলল, কেন ওই সময়েব দু-দশ মিনিট আগেও যাওযাব কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এমনও হতে পাবে, নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কোনো সময়ে ওদেব সাক্ষাৎ হওযাব কথা। হযত ঠিক সময়ে বমণীটি অভিসাবে আসবেন।

ঘডি দেখলাম। সাতটা বাজতে তখনো পাঁচ মিনিট বাকি। জিজ্ঞাসা কবলাম—কথা না বাখতে পেবে একবাব খুব মুশকিলে পডেছিলে বুঝি?

—খুব। আজকেব এই দিনেই—

মদ খাচ্ছে বলেই হযত ওব চোখেব পাতা ভাবি ঠেকছিল। আব মদ খাচ্ছিল বলেই হযত সেই মুশকিলেব কথা সহজে জানা গেছে। কিন্তু মোটামুটি শোনাব পবেও সেই মুশকিলটা এমন প্রাণ তুচ্ছ কবে ছুটে আসাব মতো মনে হয নি আমাব। যোগীন সিংযেব মতে যশোধবাব ব্যবসায়ী বাবা লোকটা আদৌ সুবিধেব নয। মেযেকে টোপ কবে মস্ত পযসাঅলা জামাই গাঁথবাব মতলব ছিল তাব। ওই কবে শেযাব-বাজাবেব ঘা সাবাবে ভেবেছিল। কিন্তু মেযেব জন্যেই তা হচ্ছিল না। মেযে ওদিকে বাপেব কাছে একজন মস্ত মানুষ বানিযে বেখেছে যোগীন সিংকে। মস্ত টাকাব মানুষ নয —মানুষেব মতো মস্ত মানুষ। তাব এক গোঁ তাকে ছাড়া কাউকে বিযে কববে না।

নিরুপায হযে বাপ তখন সামনাসামনি যোগীন সিংযেব সঙ্গে একবাব কথাবার্তা কযে বুঝে শুনে নিতে বাজি হযেছিল। সেও অনেক দিন অনেক চেষ্টাব পব মেযে বাপকে এই সাক্ষাৎকাবে বাজি কবাতে পেবেছিল। দিনক্ষণ ঠিক হল। কিন্তু এমন কাণ্ড, বলতে গেলে একবকম অকাবণেই যোগীন সিং আসতে দেবী কবল। এমন কিছু দেবী নয, মিনিট বাবো-চোদ্দ। ঘোডেল বাপ ঘডি ধবে ঠিক দশটি মিনিট অপেক্ষা কবে বাডি থেকে বেবিযে চলে গেল। যোগীন সিং গিযে দেখে যশোধবাও নেই। ব্যাপাবটা শুনল তাব মাযেব কাছে। বাপ বেবিযে যাওযাব পব বাগে জ্বলতে জ্বলতে মেযেও গাডি নিযে বেবিযে গেছে।

সম্ভব অসম্ভব অনেক জাযগায যোগীন সিং খুঁজে বেডাল তাকে। আব বাপটাকে মনে মনে ধবে আছডালো বাবকতক। ঘণ্টাখানেক বাদে নিজেব বাডিতে এলো দেখতে, যশোধবা সেখানে অপেক্ষা কবছে কি না। এসে শুনল, টেলিফোনে খবব এসেছে যশোধবা হাসপাতালে আছে। বাগে আব অভিমানে মেযে এমন গাডি চালিযেছে যে সবাসবি অ্যাকসিডেন্ট।

হাসপাতালেও এই মেযে সহজে মুখ ফিবিযে তাকায নি তাব দিকে। যোগীন সিং অনেক ক্ষমা চেযে, অনেক নাক-কান মলে জীবনে আব কোনোদিন অ্যাপযেন্টমেন্ট ফেল কববে না প্রতিজ্ঞা কবে তবে তাব মুখে হাসি ফোটাতে পেবেছিল।

মনে মনে বললাম, যেভাবে এসেছ জানতে পাবলে আজও একবাব নাক-কান মলে তোমাকে আবাব কিছু প্রতিজ্ঞা কবতে হবে।

জিজ্ঞাসা কবতে যাচ্ছিলাম, অত মদ যে খাচ্ছে তাই বা ওব প্রেযসী ববদাস্ত কববে কি কবে। কিন্তু তাব আগে ঘডিব দিকে চোখ পডতে সচকিত হলাম, সাতটা পযত্রিশ। এখন না উঠলে সে সাডে আটটায পৌঁছবে কি কবে? ঘডিব দিকে তাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবতে একটুও তাডা দেখা গেল না। অস্ফুট জবাব দিল, সময আছে। অন্যমনস্কেব মতো আবাবও কিছু ভাবছে মনে হল।

আবো ঠিক দশ মিনিট কাটল এইভাবে, আমি উসখুস কবছি, অবাকও হচ্ছি। মদেব নেশায সমযেব গণ্ডগোল হযে গেল?

পৌনে আটটা।

—এসো।

বোতলে আরো খানিকটা আছে, সেখানেই পড়ে থাকল। বড় বড় পা ফেলে গাড়িতে এসে উঠল। পাশে আমি। পিছনে দেখলাম এক গোছা ফুল রয়েছে। এই দিনে ফুল কোথা থেকে সংগ্রহ হল ভেবে পেলাম না।

গাড়ি ছুটেছে।

হেড লাইটে রাস্তার অবস্থা দেখে আমার দুই চক্ষু স্থির। ঝোড়ো বাতাস আর নেই, বৃষ্টি পড়ছে। ভাঙা ডাল আর গাছের পাতায় সমস্ত রাস্তা ঢেকে গেছে। কোথাও মস্ত মস্ত টিনের চালা পড়ে আছে—তার ওপর দিয়েই মড় মড় শব্দে গাড়ি পার হতে টের পাচ্ছি বস্তুটা কি।

এ-রকম রাস্তায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দমদম এরোড্রাম থেকে দক্ষিণ কলকাতায় পৌঁছানোর সংকল্প শুনলেও লোকে পাগল বলবে। কিন্তু গাড়ির স্পীড দেখে আমার অস্বস্তি হচ্ছে। অস্বস্তি বাড়ছে।

এক সময় স্বাভাবিক ভাবেই বলতে চেষ্টা করলাম, যে রাস্তা, তোমার সাড়ে আটটায় পৌঁছনোর প্রশ্নই ওঠে না—

জবাব দিল না। কিন্তু গাড়িতে স্পীড আরো বেড়ে গেল।

রাজ্যের ভয় আমাকে গ্রাস করতে এলো। এবারে মনে হল, আমি যথার্থই এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। একবার প্রাণে বেঁচেছি, এবারে আর রক্ষা নেই। প্রায় এক বোতল মদ গিলে গাড়ি চালাচ্ছে। কি করছে একটুও হুঁশ নেই নিশ্চয়। ক্ষোভে দুঃখে নিজেরই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল। একবার ওভাবে বেঁচে, আর চোখের সামনে অত মদ খেতে দেখেও কেন আমি যেচে সঙ্গে এলাম। মৃত্যু না ঘনালে এমন মতি হবে কেন আমার?

বাধা পেয়ে গাড়ি এক-একবার বিষম লাফিয়ে উঠছে। সামনে মস্ত মস্ত এক-একটা ডাল, বা হয়ত একটা আস্ত গাছই পড়ে আছে। স্পীড না কমিয়ে খেলনার মতোই অপরিসর ফাঁক দিয়ে গাড়িটা পার করে আনছে যোগীন সিং।

শ্যামবাজার পেরিয়ে সার্কুলার রোড ধরে নক্ষত্রবেগে গাড়ি ছুটেছে। রাস্তায় জনমানব নেই, পুলিশ নেই, অন্তত আমি কিছুই দেখছি না। আমি শুধু দেখছি, সামনে মৃত্যু। মৃত্যু হাঁ করে আছে।

ডাক ছেড়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে আমার। দুহাতে তাকে জাপটে ধরে থামাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তার দিকে চেয়ে কিছুই করতে পারছি না। পাথরের মূর্তির মতো বসে গাড়ি চালাচ্ছে সে। ওকে বাধা দেওয়ার থেকেও যেন মৃত্যুর গহ্বরে গিয়ে ঢোকা সহজ।

আমি তারই প্রতীক্ষা করছি। চকিতে একবার মনে হলো লোকটা বোধহয় আত্মঘাতী হতে চায়। এই জন্যই অমন দুর্যোগে অনায়াসে প্লেন ছাড়তে পেরেছে, আর এই জন্যেই এই গাড়ি নিয়ে এমন পাগলা ছোটা ছুটেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অ্যাকসিডেন্ট হল না। গাড়ির গতি কমল। রাস্তার পাশে হঠাৎ এক জায়গায় ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। ঘড়িতে সাড়ে আটটা।

আমারও হুঁশ ফিবল যেন। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি পার্ক স্ট্রীটের এক জায়গায় এসেছি। তারপব হঠাৎ এক ধাক্কা খেয়ে বিমূঢ় আমি। ফুলের গোছা নিয়ে যোগীন সিং এখানে কোথায় নামছে। আমাব শবীরের বক্ত এবারে দ্বিগুণ শিবশির করে পা বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

এপাশে সাদা দেয়াল-ঘেবা বিস্তৃত সমাধি-ভূমি। দুর্যোগেব অন্ধকারেও এখানকার সমাহিত সাদাটে পবিবেশ চোখে পড়ে।

নিজেব অগোচরেই মুখ দিযে কথা বেরুল, এখানে কোথায় যাচ্ছ?

ফুল হাতে যোগীন সিং থমকে দাঁড়াল একটু। শান্ত গভীব দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকালো। হঠাৎ আমাব মনে হল, দুই চোখে কত জল জমাট বেঁধে আছে ঠিক নেই। ঝবছে না, শুধু চকচক কবছে—

বিড়বিড় কবে বলল—এখানেই তো, হাসপাতাল থেকে সোজা নিযে এসেছিলাম তাকে, এখানেই আছে। বসো, বেশি দেবি হবে না—

শ্রান্ত পা দুটো টেনে টেনে সমাধিস্থানেব দিকে এগিয়ে গেল সে।

আমি নির্বাক, নিস্পন্দ।

মন পবনের নাও

নিকুঞ্জবিহাবীবাবুব একটা গল্প ছাপা হযেছে। সেও কোনো হেঁজিপেঁজি কাগজে নয়। দস্তুবমতো নামজাদা এক সাপ্তাহিক-পত্রে। অদূবে ঘাড় গোঁজ কবে তাঁব স্ত্রীটি বসে আছে। নিকুঞ্জবিহাবীবাবু সেইদিকে চেযে মিটিমিটি হাসছেন। লজ্জায় সঙ্কোচে আনন্দে বিড়ম্বনায় স্ত্রী সুধাবাণী মাটিব সঙ্গে মিশতে পাবলে বাঁচে।

এখন পর্যন্ত সুধাবাণীব সঙ্গে নিকুঞ্জবিহাবীব একটি কথাও হয় নি। গত দশ-বাবো দিন দু'জনাব কথাবার্তা বন্ধ। তাব আগে বড় মর্মান্তিক কথা বলেছিলেন নিকুঞ্জবিহাবীবাবু। বলেছিলেন—তোমাব জন্য হয় আমাকে পাগল হতে হবে, নযতো জঙ্গলে পালাতে হবে। আব এতই যদি অযোগ্য ভাবো, তাহলে কোর্টে ডাইভোর্সেব জন্য দবখাস্ত কবে দাও।

কথাগুলো শেলেব মতো বিঁধেছিল সুধাবাণীব। নয় বছবেব বিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে এরকম শক্ত কথা আব কখনো বলেন নি নিকুঞ্জবিহাবীবাবু।

এই কথার পরে কথাবার্তা বন্ধ।

সুধাবাণীব বয়েস এখন আঠাশ। ছেলেবেলায় সকলেই তাকে বেশ সুশ্রী বলত। এখনো বলে। একটা মাত্র ছেলে। স্বাস্থ্যেব বাঁধুনি এখনও ঢিলে হয় নি। ঢলঢলে কাঁচাভাবটুকু এখনো আছে। এবই দাক্ষিণ্যে একটা লোকেব ওপব সুধারাণীর অনেক আধিপত্য খাটে বলেই বিশ্বাস। এবং দিনকে দিন তাব এই আধিপত্য বাড়ছিল।

ব্যাপাবটা আরো অনেক আগে থেকে বলা দরকাব। সুধাবাণীব বযেস যখন এগাবো-বাবো, তখন থেকে। তখন থেকেই পোড়ারমুখি ইন্দিবা তার শত্রু।

খুব সাদামাটা বুদ্ধির মেয়ে ছিল সুধারাণী। কোনো প্যাঁচ-ঘোঁচ বুঝত না। উঠতে বসতে বাড়ির লোক বোকা বলত তাকে। এই খেদে ইস্কুলে তার চালাক হবার একটু চেষ্টা ছিল। বিশেষ করে ইন্দিরার কাছে। ইন্দিরার রূপ কোনাদিন তার থেকে বেশী ছিল বলে সে মনে করে না। কিন্তু চাল-চলন আচার-আচরণে সবাই সেরা রূপসী ভাবত তাকে। এমনকি সুধারাণী নিজেও তাই ভাবত। ওই বয়সেই ইন্দিরা অনেক জানত, অনেক বুঝত, অনেক বিচিত্র কথা বলত, আর অনেক রকম ভ্রূ ভঙ্গিতে হাসতে পারত। মোট কথা সুধারাণীর ভিতরে ভিতরে তখন থেকেই একটা ইন্দিরা-কমপ্লেক্স দানা পাকিয়ে উঠেছিল।

ওই বয়সেই কি জন্দই না হয়েছিল একবার ইন্দিরার কাছে। মনে পড়লে এখনো লজ্জা পায় সুধারাণী। ইন্দিরা তখন থেকেই ছেলেদের আচার-আচরণ কিছুটা বুঝতে শিখেছিল। আভাসে ঠারে-ঠোরে অনেক কথা বলত সে। এমনি একটা প্রসঙ্গে চুপিচুপি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল—সত্যি করে বল তো, তুই কারো প্রেমে পড়েছিস?

শুনে সুধারাণী বাইরে ইন্দিরার মতোই মুখ টিপে হেসেছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। আসলে প্রেমে-পড়া ব্যাপারটা ঠিক যে কি, ভালো করে জানে না। অথচ প্রশ্নের ধরন-ধারণ কেমন যেন নিগূঢ়। প্রেম বলতে বাড়িতে মাস্টার মশাইয়ের কাছে ভগবানের বিশ্বপ্রেম সম্পর্কে ছোটদের একটা কবিতা পড়েছিল সে—মাস্টারমশাই বুঝিয়েছিলেন, ভগবান এত বড় যে অতি ছোট অতি ক্ষুদ্রকেও তিনি অবহেলা করেন না।

কিন্তু ভাববার সময় নেই, ইন্দিরা জবাবের প্রতীক্ষা করছে। সুধারাণী সমঝদারের মতো তক্ষুণি মুচকি হেসে মাথা নেড়েছিল।

—কার সঙ্গে রে? কার সঙ্গে? বল না! আমি কাউকে বলব না।—ইন্দিরার উৎসুক চাপা আগ্রহ দেখে ভিতরে ভিতরে সুধারাণী ফাঁপরে পড়েছিল। কাউকে বলবে কি বলবে না এই সংশয়ের ফাঁকে সে একটু ভেবে নেবার সুযোগ পেয়েছিল। প্রেমে পড়তে হলে দ্বিতীয় একজন লোক দরকার, আর যতদূর মনে হয় পুরুষমানুষই হওয়া দরকার। আর, সেই পুরুষমানুষ খুব বড় কেউ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

—মাস্টার মশাইয়ের—

শোনামাত্র ইন্দিরা একেবারে হাঁ। সুধারাণীর মাস্টার মশাইকে ইন্দিরাও জানে। ওদের বয়েস বারো, আর তিনি বাষট্টি।

সুধারাণীর কল্পনায় ভগবানের পরেই মাস্টার মশাই বড়। কিন্তু ইন্দিরার চোখমুখ দেখেই মনে হল তার জবাবটা বেখাপ্পা গোছের হয়েছে। তাই আরো জোর দিয়ে বলল—মাস্টার মশাই যে কত বড়, তুই ভালো করে জানিস না তো—

—সে কী রে। একটা বুড়ে-হাবড়া, তুই ফাজলামো কচ্ছিস—

ইন্দিরার কি মনে পড়ে গিয়েছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো করে বলেছিল —কেন শিব ঠাকুরও তো বুড়ো-হাবড়া, নামেরও মিল আছে—শিবশঙ্কর।

ইন্দিরা পেটে হাত চেপে হাসার উপক্রম করতেই সুধারাণী বুঝেছিল কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি ইন্দিবার একটু আগেব সংশয়োক্তি আঁকড়ে ধরল।

—আচ্ছা বোকা তুই, ঠাট্টাও বুঝিস না!

সেই ইন্দিরা কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়তে কলেজের থার্ড ইয়াব ফোর্থ ইযাবের ছেলেগুলোবও মুণ্ড ঘুবিযে দিযেছিল। সুধাবাণী তখন নিঃসন্দেহ, রূপ ইন্দিবাব থেকে তাব কম নয। কিন্তু ইন্দিবার চটকেব কাছে কলেজের সব মেযেই প্রায নিষ্প্রভ।

ওই সমযেই সুধাবাণীকে একটা রোগে ধরল। ইন্দিবা তখন এক উঠতি তরুণ লেখকের প্রেমে পডেছে। যাব গল্প-উপন্যাস তাবা ছাপাব অক্ষবে পডেছে। অনেক বড বড কাগজ যাব লেখাব সমালোচনা কবছে, টীকা-টিপ্পনী কাটছে। যে তরুণ লেখককে একবাব চোখেব দেখা দেখতে পেলেও চক্ষু সার্থক হত, বক্ত-মাংসেব সেই মানুষটাবই কিনা প্রেমে পডেছে ইন্দিবা। তাব সঙ্গে বেড়ায, সিনেমা দেখে, তাব লেখা চিঠি ওদেব দেখায়। সেই সব চিঠিও এক একটা জীবন্ত কাব্যেব মতো। ভাগ্য আব কাকে বলে।

সুধাবাণীব তখন মনে হত, প্রেমিক লেখক না হলে জীবনই বৃথা। যে দু-চাবজন ছেলে অন্তবঙ্গ হযে ওঠার আগ্রহে তাব আশে-পাশে ঘুরঘুব কবত, সুধাবাণী তাদেব প্রতি কঠিন হয়ে উঠল। ওদেব একটাও না লেখক, না কবি। বেস্টুবেন্টে বসে শুধু চপ-কাটলেট সাবডাতে ওস্তাদ সব। তখন থেকেই এক তরুণ লিপি-যাদুকবেব মূর্তি মনেব তলায় লালন কবতে লাগল সে।

কিন্তু ইতিমধ্যে বাডিব লোকেবা যেন ষডযন্ত্র কবেই একজনেব সঙ্গে বিয়েব সম্বন্ধ পাকা কবে ফেলল তাব। মা বাবা খুশী, ভালো জামাই সংগ্রহ কবেছেন তাঁবা। বব কোন এক বড সাহেবেব পি-এ। ভালো মাইনে। কিন্তু ভাবী ববেব নাম শুনেই দুই চক্ষু কপালে উঠল সুধারাণীব—নিকুঞ্জবিহাবী। কোথায় ইন্দিবাব মৃণাল বসু, আব কোথায তার নিকুঞ্জবিহারী। শুধু এই নামেব ধাক্কা সামলাতেই দিন কযেক সময লাগল সুধাবাণীর। তারপর যুক্তি দিয়ে আশাব আলো টানতে চেষ্টা কবল সে। বড বড স্মবণীয লেখক বা কবিদের নাম মনে করতে চেষ্টা কবল—বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, প্যাবীচাঁদ, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শবৎচন্দ্র, তাবাশঙ্কব—নাম হিসেবে এগুলো এমন কি মিষ্টি নাম। অথচ এখন তো মনে হয ওধু ওই নামেই মানায় ওঁদেব। আসলে নাম কিছু নয, গুণই সব। পি-এ যখন—সমস্ত দিন লেখালেখিই করতে হয। লেখার অভ্যাস থাকলে গল্প-কবিতাই বা লিখতে পাববে না কেন?

সুতরাং বিয়ে হযে গেল। প্রথম দর্শনে স্বামীটিকে মোটামুটি মন্দ পছন্দ হল না সুধাবাণীর। বেশ চোখা সপ্রতিভ চেহাবা। বাসরের প্রথম সঙ্কোচ কাটতে সুধাবাণী ঈষৎ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, তুমি লেখো?

নিকুঞ্জবিহাবী অবাক। —না তো, কি লিখব?

—এই গল্প, কবিতা—যা হোক?

নিকুঞ্জবিহারী চালাক মানুষ। বাসরে স্ত্রীকে নিরাশ করতে মন সরল না। বললেন —এক কালে কলেজে থাকতে লিখতাম-টিকতাম, এখন আর অভ্যেস নেই—কেন তোমার বুঝি ওসব খুব ভালো লাগে?

—খু-উব। অভ্যেস করলেই আবার লিখতে পারবে, তাছাড়া অফিসে তো কত কি লিখতেই হয় তোমাকে। একেবারে অভ্যেস নেই বলতে পারো না। কলেজের ম্যাগাজিনে তোমার লেখা ছাপা হত?

নিরুপায় নিকুঞ্জবিহারীকে মাথা নাড়তে হয়।—হত।

সুধারাণীর মুখে খুশী ধরে না।

পি-এর চাকরির দরুনই হোক, বা যে জন্যেই হোক, লোককে খুশী রাখার চেষ্টাটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে নিকুঞ্জবিহারীর। এরপর দিনে দিনে স্ত্রীর স্বপ্নের দিকটা চিন্তা করেই অফিসে বা রাতের নিরিবিলিতে একটু আধটু লিখতে চেষ্টা করেছেন তিনি। প্রথমে কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলেন। তারপর গল্প। তারপর প্রবন্ধ। সবই স্ত্রীকে দেখিয়েছেন। আর সুধারাণীর সবই অদ্ভুত ভালো লেগেছে। স্বামীকে না বলেই সেই সব লেখা সে ডাকটিকিট দিয়ে একে একে মাসিকে সাপ্তাহিকে পাঠিয়ে দিয়েছে—দিয়ে দুরু দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করেছে। বলা বাহুল্য সে-সব লেখাই আবার একে একে তার কাছে ফেরত এসেছে।

মান বাঁচাবার জন্য নিকুঞ্জবিহারী বলেছেন—এটা কোটারীর যুগ, দলে না মিশলে বা পেছনে লোক না থাকলে, না পড়েই মাসিক সাপ্তাহিকের সম্পাদকরা তা ফিরিয়ে দিয়ে থাকেন।

সুধারাণী বিশ্বাস করেছে আর সেই সব অদেখা সম্পাদকদের ওপর মনে মনে জ্বলেছে।

এই করেই একে একে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। কিন্তু সুধারাণী এখনও আশা ছাড়ে নি। আর সেই আশার তাগিদে এখনো মাঝে-সাজে নিকুঞ্জবিহারীকে কিছু না কিছু লিখতে হয়।

সুধারাণী যে এখনো আশা ছাড়তে পারে নি, তার একটা বিশেষ কারণ আছে। ইন্দিরার সঙ্গে এখনও মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। সেই লেখকের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছে। তাই দেখা হলে লেখার প্রসঙ্গ ওঠেই। বিয়ের পর অনেকদিন বাদে যখন প্রথম দেখা হয়, সুধারাণী তখনই তাকে ফিস-ফিস করে বলেছিল—এরও লেখার রোগ আছে রে!

ইন্দিরা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—তাই নাকি, কোন কোন কাগজে লেখেন, নাম-টাম দেখি না—

ঢোক গিলে সুধারাণীকে বলতে হয়েছিল—সে-কথা আর বলিস না, আমি ছেড়ে বন্ধুবান্ধবরাও বলে, অত সুন্দর লেখা ছাপাও না কেন? তা ওর এক কথা, লেখার আনন্দের জন্যেই লিখি, ছেপে কি হবে—

সুধারাণীর ধারণা, ইন্দিরা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অবিশ্বাস করেছে এবং ঠোঁট বাঁকিয়েছে। অতএব স্বামীকে লেখক বানাবার ঝোঁক সুধারাণীর এখনো কাটে নি।

স্ত্রীর এত আগ্রহ দেখে তলায় তলায় স্বামীরও বাসনা, দুই একটা লেখা অন্তত ছাপা হোক, মান-মর্যাদা বাঁচুক। তাছাড়া একটা লেখা ছাপা হয়ে গেলে স্ত্রীর কাছ থেকে যে উষ্ণ সমাদর লাভ হবে, তাও লোভনীয়।

চেষ্টা-চরিত্র করে একটা খবরের কাগজের রবিবাসরীয় সাহিত্যপত্রে শেষ পর্যন্ত একটা লেখা অনুমোদন করিয়ে ছাড়লেন তিনি। শুক্রবারের কাগজে রবিবারের লেখক সূচীর চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন বেরোয়। সেই বিজ্ঞাপনে নিকুঞ্জবিহারীর নাম বেরুলো—রবিবারে তাঁর অমুক নামে একটা সারগর্ভ রচনা থাকবে।

সুধারাণীর এতকালের আশা সফল। বাড়িতে সেই রাতে যেন নন্দনকাননের বাতাস বইল।

কিন্তু রবিবার হতেই মুখ একেবারে আমসি সুধারাণীর। লেখাটা বেরোয় নি। সম্পাদক লিখেছেন—'যান্ত্রিক গোলযোগ বশতঃ নির্ধারিত সব লেখা এ সপ্তাহে প্রকাশ করা সম্ভব হল না।'

স্ত্রীর মুখ দেখেই বেশী রকম আঘাত পেলেন নিকুঞ্জবিহারীবাবু। তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিছু একটা কারণে এরারে আটকে গেছে, লেখা মনোনীত হয়েছে যখন সামনের বারে নিশ্চয় বেরুবে।

কিন্তু শুনে কিছুমাত্র আশ্বস্ত হল না সুধারাণী। তার সমস্ত মুখ বিবর্ণ পাংশু। একসময় সচকিত হয়ে দ্রুত উঠে চলে গেল সে।

সোম মঙ্গল দুটো দিন কাজের চাপে অবকাশ মেলে নি নিকুঞ্জবিহারীর। বুধবার স্ত্রীর এই ক'দিনের শুকনো মূর্তি স্মরণ করেই উক্ত কাগজের সাহিত্য-সম্পাদকের দপ্তরে হানা দিলেন তিনি, লেখাটা আগামী সপ্তাহে বেরুচ্ছে কি না, সেই খবর নিতে।

গম্ভীর মুখে সম্পাদক বললেন—ভেবেছিলাম বেরুবে। কিন্তু বেরুবে না, আপনার লেখা ফেরত নিয়ে যান।

নিকুঞ্জবিহারী বিমঢ়।—কেন?

সম্পাদক তিনখানা পোস্টকার্ড তার চোখের সামনে তুলে ধরলেন। বললেন—আপনার লেখা না বেরুতেই সেই লেখা সম্পর্কে পাঠকের কাছ থেকে তিনখানা প্রশংসাপত্র এসেছে—লেখা ছাপা হলে কি কাণ্ড হবে ঠিক কি!

হতভম্ব নিকুঞ্জবিহারী ভাবা-চাকা খেয়ে উঠে এলেন শেষ পর্যন্ত। ট্রামে বাড়ি ফেরার অবকাশে মাথা কিছুটা সাফ হল।

প্রথমেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি করেছ?

সুধারাণী ঢোক গিলে অস্ফুট জবাব দিল।—কেন, আমি তো আবার তাদের চিঠি লিখে বারণ করে দিয়েছি।

তার দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিকুঞ্জবিহারী ঘরে চলে গেলেন।

সুধারাণী বুঝল যে ভয় করেছিল, তাই ঘটে গেছে। শুক্রবারের বিজ্ঞাপন দেখেই খুব অন্তরঙ্গ আত্মীয়-পরিজনদের পাঁচ-ছ'জনকে টেলিফোন করেছিল সে, আর কলকাতার বাইরে পাঁচ-ছ'খানা চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল, তারা যেন রবিবার পেরুলেই অমুক কাগজে অমুক লেখার বিশেষ প্রশংসা করে সম্পাদককে চিঠি দেয়। বাইরে

সেই কাগজ যদি নাও পায়, তাহলেও যেন চিঠি অবশ্যই সম্পাদককে পাঠায়—বিশেষ কারণ আছে পরে জানাবে।

এইভাবেই স্বামীর লেখার প্রতি সম্পাদকের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল সুধারাণী। তাই রবিবারে সেই লেখা না বেরুতে মাথায় বাজ পড়েছিল তার। টেলিফোন যাদের করেছিল তাদের আবার টেলিফোনে নিষেধ করেছে। আর চিঠি যাদের লিখেছিল, মরিয়া হয়ে তাদেরও আবার নিষেধ করে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু বিভ্রাট যা হবার তা হয়েই গেছে।

সুধারাণী যেন আসামী। একটু ঠাণ্ডা মাথায় নিকুঞ্জবিহারী প্রশ্ন করে করে সব বার করে নিলেন। তারপর রাগের মাথায় ওই কথা বললেন। বললেন—তোমার জন্যে হয় আমাকে পাগল হতে হবে, নয়তো জঙ্গলে পালাতে হবে। এতই যদি অযোগ্য ভাবো, তাহলে কোর্টে ডাইভোর্সের জন্য দরখাস্ত করে দাও।

সুধারাণী দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে চোখের জল সামলাতে চেষ্টা করেছে। তারপর থেকে এই দশ-বারোদিন বাক্যালাপ বন্ধ।

কিন্তু নিকুঞ্জবিহারীর মাথা সত্যিই ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডা মাথায় স্ত্রীর অগোচরে একটা গল্প লিখলেন তিনি। স্ত্রীর স্বপ্ন থেকে শুরু করে লেখা ছাপানোর এই বিভ্রাটের গল্প। লিখে এক নামী সাপ্তাহিকের সম্পাদকের হাতে দিয়ে এলেন।

গল্পটা সম্পাদকের এত পছন্দ হয়ে যাবে নিকুঞ্জবিহারীবাবুও আশা করেন নি। পরের সপ্তাহেই সেটা ছাপা হয়ে গেল এবং ডাকে কাগজ এল।

আড়াল থেকে স্ত্রীকে রুদ্ধশ্বাসে সেই লেখা পড়তে দেখেছেন তিনি। পড়া হতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিকুঞ্জবিহারীবাবু তাঁর দিকে চেয়ে হাসছেন মিটিমিটি।

আর, লজ্জায় সঙ্কোচে আনন্দে বিড়ম্বনায় সুধারাণী মাটির সঙ্গে মিশতে পারলে বাঁচে।

বীতশোক

চকিত উত্তেজনা ঘোরালো হয়ে উঠতে পারত। সুবেশা, চোখে ঘোর-লাগানো রমণীর অপমানে পথ-চলতি খদ্দেরের রোষ আরো লোক টেনে আনতে পারত। জনতার মেজাজ চড়লে ছোট দোকানের ছোট্ট আশা নির্মূল হতে পারত। তবু, কোনো পরিণাম না ভেবেই এই কাণ্ড করে বসল সদানন্দ।

পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে একাগ্র মনোযোগে শৌখিন বেসাতির সামগ্রী সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছিল সে। আট-দশজন ফুটপাথের খদ্দের জিনিস দেখছে, যাচাই বাছাই করছে জেনেও ফিরে তাকায় নি। যেন দোকান গোছানোটাই আপাতত বড় কাজ। এমন কি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এই খদ্দেররা বা উৎসুক দর্শকরা সচেতন ছিল না।

হঠাৎ হকচকিযে গিযে তাবা ওই সতেবো আঠাবো বছবেব জোযান ছেলেটাব কাণ্ডকাবখানা দেখছিল, আব কটূভাষণ শুনছিল। আব উদগ্র বিস্ময়ে অতি আধুনিকাটিব শুকনো বিডম্বিত মুখখানি পর্যবেক্ষণ কবছিল। মেযেটাব আসল চেহাবা বুঝে নিতে চেষ্টা কবছিল তাবা।

ফুটপাথ বিপনীব মালিক সদানন্দব দিকে কাবো চোখ ছিল না। মাত্র কযেক মুহূর্তেব মধ্যে এই দ্বিতীয নাটকেব জন্যেও কেউ প্রস্তুত ছিল না।

ঘুবে দাঁড়িযে সদানন্দ আচমকা গর্জনে ছেলেব টুঁটি কামড়ে ছিঁড়তে এল যেন। কৌতূহলী ক্রেতা আব দর্শকবা আঁতকে উঠল একেবাবে। জোযান ছেলেটা হতভম্ব। এমন কি, যাকে কেন্দ্র কবে এই পবিস্থিতি. সেই সুবেশা প্রসাধনপটিযসী তন্বী-সদৃশাটিও বিমূঢ় হঠাৎ।

ছেলেকে যেন ছিঁড়েই ফেলবে সদানন্দ, গর্জে উঠে ছেলেব দিকে ঝুঁকতে চেষ্টা কবল সে।—চোপ! পাজী বদমাস অভদ্র ইতব কোথাকাব, আজ তোকে আমি খুন কবব! সবে আয বলছি এদিকে. লোকেব সঙ্গে ভদ্র ব্যবহাব কবতে পর্যন্ত শেখো নি উল্লুক কোথাকাব, সবে যা ওদিকে। নইলে আজ তোকে—

তাবপব খদ্দেবেব ঘাড়ে পড়াব ভযেই হযত উদ্যত ঘুসিটা নামিযে নিল। হতভম্ব ছেলেটাও কুঁকড়ে গিযে নিজেব অগোচবে কোণেব দিক ঘেঁষে বাপেব নাগালেব বাইবে সবে দাঁড়াল। চুপসে গেলেও তাব বিস্ময়েব ঘোব কাটে নি।

দু'হাত জুড়ে সদানন্দ কাকুতি মিনতি কবে বলল—অপবাধ নেবেন না মা-লক্ষ্মী, ছেলেব বাপেব দিকে চেযে ওকে ক্ষমা কবুন। এই পাঁচ টাকাব নোটটা আপনিই দিযেছিলেন তো... দিযে আপনি অন্য জিনিস দেখছিলেন দেখে আমি একটু এদিকে বাস্ত হযে পড়েছিলাম, ওই পাজীটা না দেখেই...ইযে, তাহলে পার্সটাব দাম হল গিযে দু'টাকা বাবো আনা, আপনি ফেবত পাবেন গিযে দু'টাকা চাব আনা..

বলতে বলতে তাড়াতাড়ি কাঠেব বাক্সটা খুলে একটা দু'টাকাব নোট আব খুচবো চাব আনা পযসা মেযেটিব হাতে দিযে আবাব হাত জোড় কবল।—দোষ নেবেন না মা লক্ষ্মী. আপনাবও খেযাল ছিল না, আমিও ওদিকে জিনিস সামলাচ্ছিলাম...পাজী ছেলেটাব কাণ্ডজ্ঞান নেই, এবাবেব মতো ক্ষমা কবুন।

মা-লক্ষ্মী ক্ষমা কবলেও সমবেত উৎসুক দর্শকবা হযত অত সহজে ক্ষমা কবত না. যদি না প্রসাধনবিলাসিনীটি অমন বিমূঢ় চোখে মলিন অথচ কমনীযদর্শন প্রৌঢটিব দিকে ফ্যালফ্যাল কবে খানিক চেযে থেকে ফেবত টাকা ও খুচবো পযসা ভ্যানিটি ব্যাগে পুবতে পুবতে দ্রুত প্রস্থান কবত সেখান থেকে। আব. যদি না ছেলেব অপবাধেব দরুন অতটাই আন্তবিকতা ফুটে উঠত প্রৌঢ সদানন্দব মুখে। উৎসুক দর্শকদেব মধ্যে দুই-একজন মন্তব্য কবতে ছাড়ল না তবু। ছেলেটাব দিকে চেযে বলল—খদ্দেবেব সঙ্গে বিশেষ কবে মহিলাব সঙ্গে এবকম ব্যবহাব কবলে মাবেব চোটে হাড় গোড় গুঁড়োবে কোন দিন, দোকান কবাও বেবিযে যাবে।...

আব একজন বলল—মেযেটা ভালো তাই, নইলে থাপ্পড়েব চোটে দাঁত নড়ে যেত।

ছেলেটি সভয়ে বোবার মতো দাঁড়িয়েই আছে, সদানন্দর দুই হাত তখনো উত্তেজনাপিপাসু সমবেতদের উদ্দেশে যুক্ত। ফলে আর গণ্ডগোলের আশা ছেড়ে তারা একে একে চলে গেল।

রাত বাড়ছে। সাদাটে আলোর ছটায় মহানগরীর অভিজাত যৌবন বাড়ছে। নতুন খদ্দের আসছে, যাচ্ছে। বাঙালীর থেকে অবাঙালীর আনাগোনা বেশী এদিকটায়। যেতে আসতে তারা থমকে দাঁড়াচ্ছে। শৌখিন সিগারেট কেস দেখছে, পার্স দেখছে, ঘড়ির ব্যাণ্ড দেখছে, গগলস দেখছে। শো-কেসে আর সামনের খোলা কেসে এ-রকম হরেক সখের সামগ্রী সাজানো আছে। এখানে কেনার থেকে দেখার লোকই বেশি। কিন্তু কিছু বিক্রী হলে অন্য জায়গা থেকে চড়া দামেই বিকোয়। কেউ দাঁড়িয়ে দেখছে, কেউ কিছু হাতে নিয়ে পরখ করছে, আর কেউ বা দাম জিজ্ঞাসা করছে। কিনছেও কেউ কেউ। দোকান আপাতত সদানন্দ একাই চালাচ্ছে। থমথমে মুখ। ছেলের দিকে একবারও তাকায় নি এতক্ষণের মধ্যে।

ছেলে বিষ্ণু ওধারের টুলটায় চুপচাপ বসে আছে সেই থেকে। তার দোকানের দিকে চোখ নেই, কে কি দেখছে বা নিচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য নেই, সে শুধু বাপের দিকেই চেয়ে আছে। ঘুরে ফিরে বাপকেই দেখছে।

বাপের সেই আচমকা গর্জনে সে ঘাবড়ে গিয়েছিল, তারপর জনতার রাগের ফলাফল ভেবে সে ভয়ও পেয়েছিল। কিন্তু সব সত্ত্বেও কি যেন ভোজবাজীর ব্যাপার ঘটে গেছে একটা। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে দুর্বোধ্য এখনো।

অনেকদিন শিকারীর মতো ওত পেতে থেকে আজ মেয়েটাকে ধরেছিল বিষ্ণু। তার স্থির বিশ্বাস ছিল হাতেনাতেই ধরেছে, গেল বারের মতো এই দিনেও সে দাম না দিয়েই জিনিস ব্যাগে পুরে চলে যাচ্ছে। বাবা অবশ্য বলে, গেল বারেও দাম দিয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুর সন্দেহ যায় নি। গেল বারের সেই দিনে খদ্দেরের ভিড় একটু বেশি ছিল। দু-চারটে চলনসই রকমের সুশ্রী মেয়ে এসে দাঁড়ালেই দু-দশজন পুরুষও এসে দাঁড়ায়, সেটা বিষ্ণু লক্ষ্য করেছে। সেদিনও তাই হয়েছিল। ওই মেয়েটা কলম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। একটা কলম মোটামুটি পছন্দ হয়েছিল। একটু বাদে বিষ্ণু দেখে সেই মেয়েটাও নেই, কলমটাও নেই। বিষ্ণু তপ্তমুখে তক্ষুণি বাপকে বলল—ওই মেয়েটা কলমের দাম দিয়ে গেল না?

সাধারণ স্থলে উল্টে বকুনি খাবার কথা বিষ্ণুর। কিন্তু শোনামাত্র বাবা কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—কোন কলমের দাম?...ও, দিয়েছে বোধ হয়।...হ্যাঁ দিয়েছে।

কিন্তু বিষ্ণুর সংশয় যায় নি। তার ধারণা মেয়েটা অত্যন্ত খারাপ, প্রায়ই তাকে এক একটা লোকের সঙ্গে কেমন ধরনের সাজগোজ করে ঘোরাফেরা করতে দেখে। অত রঙ-করা ঠোঁটের হাসি বিশ্রী দেখায়। দশহাত দূরের ওই যাদুলালের আইসক্রিম সোডা লিমনেড আর সিগারেটের দোকানে স-সঙ্গী প্রায়ই রাত ন'টা দশটার সময়েও দেখা যায় তাকে। দু'জনেই সোডা লিমনেড খায়, কিন্তু সঙ্গী কি খায় এক নজর তাকিয়েই বিষ্ণু বুঝতে পারে। যাদুলালের দোকানে শৌখিন অবাঙালী খদ্দেরের ভিড় বেশি কেন,

বিষ্ণু তা খুব ভালো করেই জানে। সোডা লিমনেডের বোতলে অন্য মালও রাখে সে। খদ্দের বুঝে রাব করে দেয়। ওই রকম লোক যার সঙ্গী, সে আর কেমন মেয়ে হবে? এই বিরূপ ধারণা থেকেই বিষ্ণুর বিশ্বাস, কলমটা খোয়াই গেছে, দাম না দিয়েই মেয়েটা কলম নিয়ে সরে পড়েছে। বাবার খেয়াল নেই, তাই বলছে দাম দিয়ে গেছে।

আজ আবার সেই মেয়ে যখন মেয়েদের শৌখিন পার্সগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছিল —বিষ্ণু তখন থেকেই মনে মনে প্রস্তুত। সে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাবা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অন্য কাজ করতে লাগল বলে বিষ্ণুর মনোযোগ অত প্রখর। কিন্তু চেয়ে ছিল আর একদিকে, এই শোন প্রতীক্ষা বুঝতে দিতে সে রাজী নয়। তারপর মেয়েটা পা বাড়াবার উপক্রম করতেই এক লাফে উঠে এসে সরাসরি হাত চেপে ধরেছিল তার।

—দাম না দিয়ে ব্যাগ নিয়ে চলে যাচ্ছেন যে? দু'টাকা বারো আনা দাম ওটার, অমনি নেবার জন্যে নয়—

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার পুরু প্রসাধন-খচিত মুখও বিবর্ণ। বিড়ম্বনার ভাব কাটাতে চেষ্টা করে শুকনো ব্যস্ততায় বলল—দাম দিই নি বুঝি, ভুল হয়ে গেছে—

তাড়াতাড়ি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দাম দেবার জন্যে তার মধ্যে হাত পুরে দিল। কিন্তু শূন্য হাতটাই উঠে এল আবার। এবারের বিস্ময় আরো শুকনো, আরো শঙ্কামিশ্রিত। এই যাঃ, নোটটা...আশ্চর্য, নোটটা তো—

—নোটটা হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে। সেদিন আমাদের চার টাকা দামের কলমটাও অমনি খোয়া গেছে আপনার হাতে, ওসব চালাকি রেখে দামটা গুনে দিয়ে যান—

অন্যান্য খদ্দেররা উৎসুক হয়ে উঠেছিল। আর দু-পাঁচজন দাঁড়িয়েও গিয়েছিল। এরই মধ্যে বাবার ওই আচমকা গর্জন, আর ওই মূর্তি—

রাত হয়েছে, আর একটু বাদে দোকান বন্ধ করে ঘরে ফিরবে তারা। সদানন্দ এতক্ষণ বাদে ছেলের দিকে তাকালো হঠাৎ। মোলায়েম করে জিজ্ঞাসা করল—কি রে রাগ হয়েছে খুব?

বাবাকে আজ বেশ কিছুদিন ধরেই বিমর্ষ, চিন্তাচ্ছন্ন দেখছে সে। ঘণ্টা আড়াই আগে আজ ওই ব্যাপার ঘটে না গেলে তার মুখের নিবিড় বেদনার ছায়াটাই হয়ত বিষ্ণু আগে লক্ষ্য করত। ওধারের টুল থেকে সে বাবার দিকে থমকে চেয়ে রইল একটু, তারপর ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল—মেয়েটা টাকা দিয়েছিল?

সদানন্দ মাথা নাড়ল।...দেয় নি।

কিন্তু এই উত্তরটুকুই যে সব নয়, খেয়াল করল না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল একটু। খানিক বাদে সচকিত হল। ছেলে তেমনি স্থির চোখে দেখছে তাকে। তার মনে পাঁচ রকমের প্রশ্ন উদয় হতে পারে, সেটা খেয়াল হল। এ-রকম একটা মেয়ের জন্য এই দরদ স্বাভাবিক নয়।

একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল—তোর একটা বোন ছিল তোর থেকে পাঁচ বছরের বড়। তোর মনে নেই, তোর মাত্র দু' বছর বয়েস তখন।...এই মেয়েটাকে দেখার পর থেকে আমার কেবলই মনে হয়, মেয়েটা থাকলে এ রকমটাই হয়ত দেখতে হত...

মা-বাবার মনে কিছু একটা দুর্ঘটনার চাপা ব্যথা আছে, তার আভাস ক্বচিৎ কখনো ছেলে পায়। তবে জীবন ধারণের সতেরো ঝঞ্ঝাটে থাকে বলে খেয়াল করে না। রাগ বা অভিমান ভুলে বিষ্ণু উদগ্রীব মুখে জিজ্ঞাসা করল—সে কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব বদলালো সদানন্দর। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—মরে গেছে।

একটু বাদে আবার অন্যমনস্কের মতো বলল—তোর মাকে এ সব বলিস না কিছু, বড় ভালোবাসত, মনে পড়লে খুব মন খারাপ হবে।

বাপের কথা শুনে বিষ্ণু মনে মনে নিশ্চিন্ত হল। বোন ছিল শুনে সে-ই কিনা ভেবে ঘাবড়ে গিয়েছিল। মরা মেয়েকে মনে পড়ার দরুন কতবড় বিপদে ফেলার ব্যবস্থা করছিল ওকে, সে-কথা ভেবে ভিতরে ভিতরে উষ্ণও হয়ে উঠল একটু। তবু এই নিয়ে আর আঘাত দিতে মন সরল না। বিষ্ণুর সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল ওই মেয়েটার ওপর, যে মেয়েটা দু-দুবার ঠকিয়ে গেল তাদের। সব-জায়গায় এ-ই করে বেড়ায় নিশ্চয়। বাপের অসাক্ষাতে কোনোদিন রাগে পেলে দেখে নেবে। বয়েস হলে লোকের জ্ঞানগম্যিও কমে যায় বোধ হয়, চুরি করতে দেখেও করেকার কোন মরা মেয়ের শোক উথলে ওঠে।

বাপ ছেলে দুজনে ঘরের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে। সামনের রাস্তাটা পার হবার মুখে এক সঙ্গে দু'জনারই পা যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল হঠাৎ।

রাস্তার একটু আড়ালে একটা দেয়ালের ধার ঘেঁষে সেই মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। একা। তাদের দেখে দু'পা এগিয়েও থমকে দাঁড়াল। বিষ্ণুর মনে হল তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। মনে হল, বাবার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে একা পেলে কাছে আসত, বলত কিছু।

তার জামাটা ধরে একটা টান দিয়ে রুক্ষস্বরে সদানন্দ বলল—দাঁড়ালি কেন, চল—

হন হন করে রাস্তাটা পার হয়ে গেল সে। দ্রুত পা চালিয়ে তবে বিষ্ণু বাপের নাগাল পেল।

ছেলেকে গোটাগুটি সত্য বলে নি সদানন্দ। মেয়ে সত্যিই মরে গেছে কিনা জানে না। সকলের অগোচরে স্ত্রী অনেক সময় গজগজ করেছে, কতকাল আর ওই পোড়ারমুখির জ্বালা বুকে চেপে বসে থাকবে, আর কতকাল ভাববে?

সদানন্দ কখনো চুপ, কখনো বলেছে—ও মরে গেছে শুনলে আর ভাবতাম না, জ্বালাও জুড়তো...

একটানা ষোলটা বছরের ঘাত-প্রতিঘাত গেছে এই জীবনের ওপর দিয়ে, তবু ক্ষতটা মনে হয় সেদিনের। একেবারে তাজা। সংসারের দুঃখে-দারিদ্র্যে স্ত্রী বরং অনেকটা ভুলেছে, কিন্তু সদানন্দ ভুলতে পারে নি। ছেলের কাছে যাই বলুক, সাত বছরের সেই দুরন্ত সুশ্রী মেয়েটা আসলে চোখের মণি ছিল তারই।

ওই মেয়েরও আগে ছেলে ছিল আর একটা। তারপব মেয়ে। মেয়ে হওয়াব পর স্ত্রীব স্বাস্থ্য ভেঙেছিল। পাঁচ বছর বাদে বিষ্ণু এসেছে। আর তার দু'বছর যেতে কোলে আব এক ছেলে এসেছে। এই তিন ছেলে আব এক মেয়ে নিয়ে সেই সচ্ছলতাব দিনেও হিমসিম অবস্থা। মোটামুটি লেখাপড়া শিখেছিল সদানন্দ, পদ্মা-পারেব একটা ছোট ব্যাঙ্কে কেরানীব চাকবি কবত। বেতন সামান্য। তবু ভদ্রঘবের ছেলে সদানন্দ, ভদ্রবংশেব সন্তান।

স্ত্রীর এক নিঃসন্তান বড় ভাই থাকত লাহোবে। তাদেব তুলনায বেশ অবস্থাপন্ন। দেশে কিছু হল না দেখে বিদেশে গিযে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল। খুব ছোট থেকে বড হযেছে। সে একবাব পদ্মা পেবিযে এসে মাস খানেকেব জন্য বোনের অতিথি হল। মামাব সঙ্গে ওই সাত বছবেব মেয়ের ভাবি ভাব হয়ে গেল। মিষ্টিমুখ মেযেটা সকলেবই চোখে পডত। মামাবও মন টানলো। বোনেব অবস্থা দেখে নিজেই প্রস্তাব দিল, মেযেটাকে সে নিযে যেতে পাবে, মামীব কাছে মানুষ হবে, লেখাপডা শিখবে। বছরে একবাব করে না-হয বাবা-মাযেব কাছে আসবে। আব তাহলে ভালো বিযে-থাও হবে মেযেব।

স্ত্রী তক্ষুণি মেযে দেবাব জন্য ব্যগ্র হযে উঠল। নিজেদের তো এমনিতেই দিন চলে না। মেযেব উজ্জ্বল ভবিষ্যতেব লোভ সে কিছুতেই সামলাতে পাবল না। তাছাডা নিঃসন্তান অবস্থাপন্ন বড ভাইয়ের সঙ্গে এ-রকম একটা যোগাযোগ স্থাপিত হলে আখেবে অনেক দিকে সুবিধে হতে পাবে।

কিন্তু সদানন্দ খুঁতখুঁত কবেছিল। বড ছেলেটাকে এমনকি দু'বছবের ছেলেটাকে নিতে চাইলেও হযত তাতে অত মন খাবাপ হত না। কিন্তু স্ত্রীব ভয়েই শেষ পর্যন্ত বাধ সাধতে পারল না সে।

ওবা বওনা হবার দিন সকালেই বাডি থেকে পালাল। ফিবে আসতে স্ত্রীও মন খাবাপ করে জানালো, যাবাব আগে মেযেটা নাকি হাপুস নযনে কেঁদেছে আর বাবাকে খুঁজেছে।

এব তিন মাসেব মধ্যে মাত্র কযেকদিনেব জ্বরে বড ছেলেটা চোখ বুজল। আব ছ'মাসেব মধ্যে সমস্ত দেশের শান্তি লণ্ডভণ্ড হযে গেল। দেশ বিভাগেব ফলে দেশেব অগণিত মানুষেব হৃৎপিণ্ড টুকরো টুকবো হযে গেল। সমস্ত পবিবাবটিকে টেনে হিঁচডে সদানন্দ যখন কলকাতায এনে ফেলল, তখনো যেন বিকাবেব ঘোর কাটে নি। তখনো মনে হয়েছে কিছু একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে, এই নাডীছেঁডা দুর্বিপাকেব সবটাই সত্যি নয।

স্নাযুগুলো বশে আনতে অনেক সময় লেগেছে। এব ওপর জীবনধারণের বসদেব চিন্তা কবতে হয়েছে। আর, এবই মধ্যে এক একটা খবব কানে এসেছে। শুধু পূর্ববঙ্গে নয অনেক জাযগাতেই মবণযজ্ঞের নবকোৎসব হয়ে গেছে। পাঞ্জাবে—লাহোবেও হযেছে।

সম্বন্ধীর কাছে একে একে অনেকগুলো চিঠি লিখেছে সে, অনেক ভাবে খবব নিতেও চেষ্টা কবেছে। কিন্তু তাবা যেন দুনিয়া থেকেই মুছে গেছে। একটানা ষোল বছবে তাদের একটা খবরও পায় নি।

দোকানের ওই অভিজাত এলাকায মেয়েটাকে সে বিষ্ণুর আগেই দেখেছিল। মেযেব সাত বছব বয়েসেব সঙ্গে আবো ষোলটা বছব যোগ করে তাকে চেনার কথা নয।

সদানন্দ চেনে নি। এমন কি প্রথম দর্শনে বাঙালী মেয়ে বলেই মনে হয় নি তার। তাছাড়া, অবাঙালী সঙ্গীর সঙ্গেই ঘোরাফেরা করতে দেখছে তাকে। কিন্তু ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দ চমকে উঠেছিল কেন? পদ্মাপারের সাত বছরের একটা মেয়ের স্মৃতি বুকের তলায় আকুলি-বিকুলি করে উঠেছিল কেন?

আশ্চর্য! সদানন্দ জানে না কেন।

এখনো একটুও নিঃসংশয় নয়, হয়ত একটা উদ্ভট কল্পনা নিয়েই আছে সে। তবু মোহগ্রস্তের মতো নিজের অগোচরে ওই মেয়ের অনুসরণ করেছে, তার পিছু পিছু ঘুরেছে; ওর অসুন্দর জীবনযাত্রার চিত্রটি কল্পনা করে এক অস্বাভাবিক বেদনায় শ্বাস রুদ্ধ হয়েছে। তারপর কতবার সঙ্গীর সঙ্গে ওই মেয়ে পাশের সোডা-লিমনেডের দোকানে এসে দাঁড়িয়েছে, তার এখানেও এসেছে, দাম না দিয়ে কলম নিয়ে চলে গেছে, আর মানিব্যাগ নিতে গিয়ে ধরা পড়েছে। নিজের সঙ্গে অনেক যুঝেছে সদানন্দ, যুঝেছে আর ভাবতে চেষ্টা করেছে, সবই তার আজগুবী কল্পনা, নিছক মিথ্যে।

দুপুরের মধ্যে মেয়েটা অনেকবার দোকানের পাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করে গেল। আজ আর অত প্রসাধন নেই। মুখে চোখ-তাতানো সাজসজ্জা নেই। কি এক অমোঘ আকর্ষণেই মেয়েটা যেন বার বার এই ফুটপাথ দিয়ে আসা-যাওয়া করছে। আর, প্রতিবারই খুব ভালো করে লক্ষ্য করছে সদানন্দকে। কিন্তু ভরসা করে কাছে আসছে না, আসতে পারছে না।

সদানন্দ সমস্ত মুখ থমথমে গম্ভীর। তার গালের একটা দিক ওই মেয়েটার দৃষ্টির ঘায়ে কটকট করে উঠছে—যেখানে পুরনো পোড়ার বড় ক্ষতচিহ্ন রয়েছে একটা। সাত বছরের মেয়ে সর্দারি করে বাপের তামাকের জ্বলন্ত কলকেয় ফুঁ দিতে নিয়ে এসেছিল। সদানন্দ শুয়েছিল তখন। গরম সামলাতে না পারার দরুন সেই আগুনসুদ্ধ কলকে বাপের গালের ওপর পড়েছিল। একটা মস্ত অঘটনই ঘটে যেতে পারত। মা মেয়েটাকে মেরে একেবারে আধমরা করেছিল সেদিন।

ছেলে বিষ্ণু সকাল থেকে বারকতক মেয়েটাকে লক্ষ্য করেছে, আর আড়ে আড়ে বাপকে দেখছে। আজও মেয়েটার ওপর মনে মনে জ্বলছে সে।

দুপুরে সদানন্দ উঠে বড় রাস্তার ওধারের পুকুরটার দিকে চলল। রোজই দুপুরে সেখানে গিয়ে গাছের ছায়ায় খানিক বসে জিরোয়। মাছ-ধরা দেখে, কখনো বা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়।

বাধা পড়ল। মেয়েটা আজও যেন তার প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। এখনো খায় নি বোধ হয়। মুখ শুকনো। কিন্তু শুকনো মুখেও কি এক আশার তাড়না স্পষ্ট যেন। সদানন্দ দাড়িয়ে গেল, পায়ে পায়ে মেয়েটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

সামনে এসে দ্বিধা কাটিয়ে মেয়েটা বলল—আপনি কাল আমাকে বাঁচালেন কেন? আমি তো সত্যি পার্সটা চুরি করেছিলাম...

সদানন্দর জানা দরকার, সদানন্দর বোঝা দরকার কতখানি উদ্ভট কল্পনায় ডুবে আছে সে। মেয়েটাকে খুব ভালো করেই দেখল। দেখে আঁতকে উঠল। ঘষা মোছা প্রসাধনের আড়ালে যেন এক আর্তনারী সম্বল খুঁজছে—আশ্বাস চাইছে। মুখে

বলল—আমার একটা ছোট মেয়ে ছিল, মনে হয়েছে, বড় হলে সে তোমার মতোই হত—এই জন্যে।

মেয়েটার দুই চোখে শুকনো মুখে আগ্রহের আলো জ্বলে উঠল যেন। গালের ক্ষতচিহ্নটার দিকে চেয়ে কি এক বিস্মৃতির পর্দা আকুল আগ্রহে ছিঁড়েখুঁড়ে সরাতে চেষ্টা করছে সে। জিজ্ঞাসা করল—মেয়েটা কোথায়? হারিয়ে গেছে?

সদানন্দর না জানলেই নয়, সংশয় না ঘুচলেই নয়। মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, তাই।

—কোথায় ছিল সে? কোথা থেকে হারিয়েছে?

সদানন্দর মনে হল, এমন মর্মছেঁড়া আকুতি সে আর দেখে নি। মনে হল, জীবনের সব সম্বল, সব আশা খুইয়ে এক মুমূর্ষু নারী যেন শেষ আশায় দুহাত বাড়িয়ে তাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে। সদানন্দ নীরব। দেখছে।

—কি নাম ছিল তার? তার নাম কি...তার নাম কি...

আবার কি যেন স্মরণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টায় চোখমুখ কুঁচকে গেল তার। তারপরেই উদ্ভাসিত হঠাৎ—তার নাম কি ঝুমুর?

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সদানন্দ। আত্মস্থ হল। দিশা ফিরল। কঠিন বাস্তবের ওপর দুই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত মুখে মাথা নাড়ল। নাম ঝুমুর ছিল না। ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলল—তুমি এ-রকম করছ কেন? আমার মেয়ে তো মরে গেছে—অনেক কাল আগেই মরে গেছে, বুঝলে?

মুহূর্তের মধ্যে সব আশা আর সব আগ্রহের অবসান হয়ে গেল। নিঃসাড় বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে মেয়েটা চেয়ে আছে তার দিকে। সদানন্দ আর অপেক্ষা করল না। কোথায় যাচ্ছিল ভুলে গেছে। দোকানেই ফিরে এল আবার।

তারপরেও মেয়েটা বার কয়েক এখান দিয়ে যাতায়াত করেছে। খুব সচেতন ভাবে নয়। চেয়ে চেয়ে দেখেছে। তাও আত্মবিস্মৃতের মতোই। তার যেন এখনো কিছু বুঝতে বাকি, জানতে বাকি।

রাত্রি।

আর একটু বাদেই দোকান গুটোবে তারা। বিষ্ণু সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিল, কারণ দোকান বলতে গেলে আজ একাই চালাতে হয়েছে তাকে। এই ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকেও বাবার মুখের দিকে চেয়ে কেমন শঙ্কা বোধ করেছে। বাবার এমন অন্যমনস্ক গাম্ভীর্য আর যেন দেখে নি সে।

হঠাৎ রাস্তার ওধারে অদূরের পুকুরটার দিকে একটা গণ্ডগোল উঠল। লোকজন দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি করতে লাগল। বড় রকমের উত্তেজনার কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে ওইখানটায়। ভিড় বাড়ছে, পুলিশও দৌড়চ্ছে দেখা গেল।

বিষ্ণুও ছুটল কি ব্যাপার দেখতে। বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে ফিরে এল আবার। দু'চোখ কপালে তুলে বলল—বাবা, সেই বদমায়েস—ইয়ে, সেই মেয়েটা জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে, তার লাশ তোলা হয়েছে দেখে এলাম—

আবো কি বলতে গিযে বিষ্ণু বাপেব মুখেব দিকে চেযে থমকে গেল হঠাৎ।

সদানন্দ অন্যদিকে চোখ বেখে পাথবেব মূর্তিব মতো বসে আছে।

একজন মিসেস নন্দী

মুখ না তুলেও ডক্টব বসু টেব পেলেন আব একজন কেউ ঘবে এলেন।

ছোট মেযেটাব হাতসুদ্ধু একটা আঙুল তাঁব এক হাতেব থাবাব মধ্যে। অন্য হাতে গ্লাস-স্লাইডে আঙুলেব বক্ত লাগিযে নিচ্ছেন। মুখও চলছে। ছোট মেযেটিকে ভোলাবাব জন্যে অনেক হাসিব কথা বলছেন। কিন্তু আঙুলে আচমকা পিনেব খোঁচা খেযে আব বক্ত দেখে মেযেটা ভবসা কবে হাসতে পাবছে না। ডক্টব বসু আব একটা গ্লাস-স্লাইডে ঘষে ঘষে এই স্লাইডেব বক্তটা শুকিযে নিযে জোডা-স্লাইড দুটো সামনেব চামডাব বাক্সেব খুপবিতে বাখলেন। তাবপব আগন্তুক দাঁডিযেই আছে মনে হতে ঘাড ফেবালেন।

একজন মহিলা। বছব ত্রিশ-বত্রিশ হবে বযেস।

এখানে অবাবিত-দ্বাব সকলেব। পুরুষ আসে, মহিলা আসে—যাব প্রযোজন সে-ই আসে। বক্ত ইত্যাদি পবীক্ষা কবানোব চার্জ এখানে কিছু বেশি। এই বেশিটুকু দেবাব যাঁদেব সংগতি আছে, বা কিছু বেশি দিযেও যাঁবা সততাব ওপবে নির্ভব কবেন —তাঁবাই আসেন। বোগেব ব্যাপাবে এ-বকম লোকেব সংখ্যাই বেশি।

ডক্টব বসুব চকিত-বিভ্রান্ত, প্রায-বিমূঢ় অভিব্যক্তিটুকু মহিলাব পদার্পণেব দরুন নয। তাঁব সামনেই তো আব এক মহিলা বসে। যে ছোট মেযেটাব বক্ত নিচ্ছেন, তাব মা। ডক্টব বসুব পবিবর্তন এই একজনকে দেখেই।

—বসুন।

ঈষৎ ব্যগ্রমুখে মহিলা বলতে গেলেন—আমাব বিশেষ একটু—

—বসুন।

অর্থাৎ হাতেব কাজ শেষ না কবে তাঁব শোনাব অবকাশ নেই। ডক্টব বসু বাশভাবী মানুষ। কম কথা বলেন। এক কাজেব ফাঁকে আব এক কাজেব কথা শুনে নেওযাব অভ্যেস নেই। কিন্তু যেভাবে বললেন, নিজেব কানেই বিসদৃশ লাগল। কণ্ঠস্বব ঈষৎ অসহিষ্ণু কড শোনাল। এমন কি, বাচ্চা মেযেটিব মাও একবাব ফিবে নবাগতাকে দেখলেন।

বিব্রত মুখে মহিলা একটা চেযাবে বসে পডলেন।

ধীবে-সুস্থে হাতেব কাজ সাবতে লাগলেন ডক্টব বসু। তিন জোডা স্লাইডে বক্ত লাগানো, দুটো সরু টিউবে বক্ত টেনে আবকে মেশানো—এসব কাজে এমনই অভ্যস্ত যে চোখ বুজে কবতে পাবেন। অত গম্ভীব নিবিষ্টতায সম্পন্ন কবাব মতো কিছুই নয। আসলে মনটা তাঁব এই কাজেব দিকে নেইও। সুশ্রী বমণীটিকে দেখাব সঙ্গে সঙ্গে

তাঁর অন্দরমহলে দুর্বোধ্য আলোড়ন শুরু হয়েছে একটা। তিনি কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছেন। কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

কোনো একদিনের কোনো এক পুঞ্জীভূত বিরূপতার উৎসে হঠাৎ নাড়া পড়েছে যেন। অথচ এই উৎসটার সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না আদৌ। এ-রকম বীত-রাগের হেতু নিজেই জানেন না। নিজের অগোচরে স্মৃতির আয়নায় কোনো একখানি মুখ ধরা আছে হয়ত। কিন্তু ধরা যে আছে সেটা অনুভব করলেন এই সুযৌবনা রমণীটিকে এক-নজর দেখে। দেখামাত্র একটা বিমুখ প্রতিক্রিয়া অনুভব করলেন। অথচ আশ্চর্য, কাজের ফাঁকে নিজের নিভৃতে বিচরণ করেও তিনি ওই স্মৃতি-তটে পৌঁছুতে পারলেন না। কিছুই মনে করতে পারলেন না ডক্টর বসু।

ঘুরে বসে আর একবার সুন্দর মুখখানা দেখার ইচ্ছে। সুন্দর কিন্তু সুবাঞ্ছিতা নয়। ঘুরে বসলেন না। দেখার অবকাশ এক্ষুণি মিলবে। কিন্তু কার সঙ্গে কাকে মেলাবেন মনে না পড়লে দেখে কি করবেন? মনে পড়ছে না।

হাতের কাজ সারলেন। সরঞ্জামগুলো চামড়ার বাক্সয় গুছিয়ে রাখলেন। ছোট মেয়েটার মায়ের কাছ থেকে ফী নিলেন। পেশেন্টের বাড়ি যেতে হলে ডবল চার্জ, এখানে এলে অর্ধেক। তাঁকে বললেন, রিকেলে লোক পাঠিয়ে রিপোর্ট নিয়ে যেতে। মেয়ের হাত ধরে মা চলে গেলেন।

ডক্টর বসু ঘুরে বসলেন।

...সেই রকমই দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী।...গৌর তনু, রূপসী...সেই রকমই ঢলঢলে মুখ। সেই রকম বাঁকা সিঁথি।

কিন্তু কোন রকম? কার মতো?

—হ্যাঁ, বলুন।

সুন্দর মুখখানি ভারি শুকনো, ক্লান্ত, উৎকণ্ঠাভরা। এই রূপের আড়ালে অনেকদিনের একটা দুশ্চিন্তা যেন থিতিয়ে বেঁধে আছে। স্বল্প প্রতীক্ষার দরুন ঈষৎ অধীরও। বললেন—আপনাকে দয়া করে এক্ষুণি একবার আমার বাড়িতে আসতে হবে, আমার ছেলেটির—

—বাড়ি কোথায়?—কথার মাঝেই বাধা পড়ল।

—বেশি দূর নয়, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে—

ডক্টর বসু চেয়ে আছেন। লক্ষ্য করছেন। বাঁকা সিঁথির ফাঁকে সিঁদুরের আঁচড়, কমনীয় ভুরু, টানা চোখ। বললেন—গাড়ি একটা আমারও আছে, আপনি বাড়ির ঠিকানা বলে যান, যাব—

মহিলা থতমত খেলেন একটু। এ-রকম গম্ভীর নির্লিপ্ততার কারণ খুঁজে পেলেন না। ঠিকানা দিলেন। তারপর সানুনয় অনুরোধ করলেন—কেসটা খুব আরজেন্ট ডাক্তারবাবু, আপনার ব্লাড-রিপোর্টের ওপর আমার ছেলের প্রাণ নির্ভর করছে।

বলতে বলতে টানা চোখের কোণদুটো একবার কেঁপে উঠল বুঝি। সামলে নিয়ে বললেন—বড় ডাক্তার বিশেষ করে আপনাকে দিয়ে ব্লাড করানোর কথা বলে দিয়েছেন—

ডক্টর বসু প্যাথলজিস্ট। রোগীর চিকিৎসা করেন না। রোগের বীজাণুর হদিস দেন। কিন্তু এই কাতরোক্তি শুনেই হোক বা তাঁকে আর একটু বসিয়ে, আরো একটু লক্ষ্য করে কোনো ভুলে-যাওয়া স্মৃতির দরজা খোলার তাড়নাতেই হোক, জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে?

মহিলা সাগ্রহে জানালেন কি হয়েছে। জানিয়ে যেন ভরসা পেতে চাইলেন। কিন্তু ডক্টর বসু যা শুনলেন সত্যি হলে ভয়ের ব্যাপার। সাত বছরের ছেলে। রক্তের শ্বেত-কণিকা অসম্ভব রকম বেড়ে যাচ্ছে। লিউকিমিয়া। এই রোগ হলে বাঁচেই না বলতে গেলে। আগে অন্যত্র ব্লাড করানো হয়েছিল। সেখানকার ওই রিপোর্ট ছিল। আজ আবার একজন ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। তিনি একটু সংশয় প্রকাশ করেছেন, ওই রোগ নাও হতে পারে। অবিলম্বে তিনি আর একবার রক্ত-পরীক্ষা করাতে বলেছেন। আর বিশেষ করে ডক্টর বসুরই নাম করেছেন।

ডক্টর বসু শুনলেন। মায়ের ব্যাকুলতা দেখলেন। সুন্দর মুখে একমাত্র ছেলের মৃত্যুর ছায়া কাঁপছে। ডক্টর বসুর মনে হল তবু মেয়েটি যুঝছে—ছেলে বাঁচবে না বিশ্বাস করতে চাইছে না, মুখের ওপর ওই ছায়াটাকে বসতে দিতে চাইছে না।

কিন্তু তবু এই আকৃতি যেন মর্মস্থলে পৌঁছুচ্ছে না ডক্টর বসুর। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, তিরিশ-বত্রিশের এই স্থিরযৌবনে দোলা লাগলে, এই সুন্দর মুখে হাসি ঝরলে, ওই টানা বিষণ্ণ চোখের গভীরে কটাক্ষের বিদ্যুৎ ঝলসালে কার সঙ্গে যেন মিলবে। যার স্মৃতি বাঞ্ছিত নয় আদৌ, যার স্মৃতি একরাশ বাষ্পীয় ক্ষোভের মতো অবচেতন মনের তলায় জমাট বেঁধে আছে।

কিন্তু কার স্মৃতি? ভেবে না পেয়ে ডক্টর বসু নিজেই অবাক।

—আপনি যান, আমি যাচ্ছি।

মহিলা এবারে হয়ত অন্যরকম আশা করেছিলেন। ভেবেছিলেন তাঁর সঙ্গেই আসবেন। আবার অনুরোধের ভরসা না পেয়ে কাতর মিনতি-ভরা চোখে তাকালেন শুধু।

—আপনি যান, আমার দেরি হবে না।

চলে গেলেন। গেট পর্যন্ত দেখা গেল। ডক্টর বসু দেখলেন। এই রমণীর চলা-ফেরা, গাড়িতে ওঠা—মাধুর্য-ভরাই বটে। কিন্তু ডক্টর বসু তা দেখলেন না। মায়ের বিষণ্ণ করুণ মাধুর্য দেখলেন। আর, কি এক মস্ত মিলের মধ্যে ঠিক ততবড়ই একটা বিপরীত অমিল দেখলেন।

ডক্টর বসু মানুষটা বাইরে রুক্ষ হলেও নির্দয় নন আদৌ। বরং উলটো। তাঁর কাজের নিষ্ঠা আর একাগ্রতা সুবিদিত বলেই বড় বড় ডাক্তাররা তাঁর কাছে কেস পাঠান, তাঁর রিপোর্টের ওপর অসংশয়ে নির্ভর করেন। যা শুনলেন, হাতের সব কাজ ফেলে তাঁর তক্ষুণি ছোটার কথা, তবু উঠতে একটু দেরিই হল।

ডক্টর বসু ভাবছেন। ভাবা ঠিক নয়, অতীত হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। নিজের এমন অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার দরুন নিজেই হতভম্ব তিনি। ছেলেবেলায় অবশ্য খুবই আবেগপ্রবণ ছিলেন। একটু কিছু হলেই ভিতরে ভিতরে চাপা অভিমানে গজরাতেন। বাবাকে মনেও

পড়ে না। শুধু মা ছিল। এই মাকে ঘিরেই যত মান-অভিমান। অথচ দু-দণ্ড ওই মা চোখের আড়াল হলে অন্ধকার দেখতেন চোখে।

বিগত দিনেব পরিচিত মুখগুলো মনে কবতে চেষ্টা কবলেন ডক্টর বসু। কিন্তু এই মুখ মনে পড়ছে না। তাঁব পবিচিতের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়, তাদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ নেই বললেই চলে। দিবারাত্র কাজে ডুবে থাকেন, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেবাব ফুবসতও মেলে না। অনভ্যাসেব দরুন এখন অবকাশ পেলেও যান না কোথাও।

কোনো পেশেণ্টেব বাড়িতে কেউ তাঁব সঙ্গে দুর্ব্যবহার কবেছিল কিনা ভাবতে চেষ্টা কবলেন। দু-দশটা বাড়ি থেকে বোজই কল আসে। গিয়ে বক্ত নিয়ে আসতে হয। কিন্তু এই ঠিকানায কখনো গেছেন বলে মনে পডল না।

এ-ধবনেব স্থূল ব্যাপাব কিছু নয, ডক্টর বসু নিজেই ভালো জানেন। সামান্য ঝগডা-বিবাদে বা কাবো দুর্ব্যবহারে এ-বকম প্রতিক্রিয়া তাঁর হয় না। নিজেব যে চাপা আবেগটাকে তিনি খুব ভালো কবে চেনেন, সেটাই কোনো কারণে আঘাত খেযে জখম হযেছিল। অন্যথায এ-রকম হতে পাবে না। কিন্তু ও-ভাবে আঘাত দেওয়া দূরে থাক, ওই মেযেও তো জীবনে তাঁকে এই প্রথম দেখল মনে হয। অথচ এমন বিরূপতাব মূলে এই মেযেব সঙ্গেই যে নিবিড যোগ কোথাও আছে, ডক্টব বসুর তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

ঘডিব দিকে চোখ পডতে সচকিত হলেন। আবো আগেই ওঠা উচিত ছিল। তাডাতাডি গাডি বাব করলেন।

বাডিব নম্বব মিলিযে গাডি থেকে নামতে প্রথমেই দোতলাব দিকে চোখ গেল। বাবান্দাব বেলিংযে ঝুঁকে মহিলা দাঁডিযে আছেন। তাঁবই প্রতীক্ষায উদগ্রীব মনে হল। চোখাচোখি হতে ওপবে উঠে আসতে ইঙ্গিত কবলেন তিনি। নিজেও বেলিং থেকে সবে গেলেন।

বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীব মিশেল অভিজাত এলাকা এটা। ছবিব মতো ছোট বাড়ি। বাডিব গাযে শুধু নম্বব ছাডা কাবো নামেব চিহ্ন নেই। ভিতবে ঢুকেও মালিকেব রুচিব পরিচয মেলে। বসাব ঘবেব ভিতব দিয়েই ঢুকলেন তিনি। পবিপাটি করে সাজানো। সুপরিচিত শৌখিন আসবাবপত্র। দেওযালে অজ্ঞাত শিল্পীব দুই-একটা হালকা রঙিন ছবি। মেঝেতে পুরু নরম কার্পেট।

ডক্টর বসু এগিযে যাবাব আগে তাঁকে নিয়ে যাবাব জন্য মহিলাটি নিজেই তবতর করে সিঁডি ধবে নিচে নেমে এলেন। তাঁব আগে আবো একটি মাঝবয়সী রমণী সামনে এসে দাঁডিযেছিল। খুব সম্ভব পবিচাবিকা। কর্ত্রীকে দেখে সে সসম্ভ্রমে সবে দাঁডাল।

—আসুন ডাক্তারবাবু।

মহিলা আগে আগে ওপবে উঠতে লাগলেন। ডক্টর বসু তাঁর দুই সিঁড়ি পিছনে। আবাবও তাঁকে দেখামাত্র সেই অস্বস্তি, সেই বিরূপ অভিব্যক্তি। মনের এই অবস্থাটা যেন তাঁর দখলেব বাইরে। কোনো সুশ্রী মহিলার বাঁকা সিঁথি দেখলে এই রকম হয কিনা চিন্তা করে নিলেন। তক্ষুণি নিজেই আবার বাতিল কবলেন চিন্তাটা। সিঁড়ি দিয়ে এভাবে

নেমে আসা, ধীর পায়ে এভাবে ওঠা—এও যেন অচেনা নয়, অথচ তিনি চিনতে পারছেন না। তাঁর চোখে এই তনুমাধুর্যও যেন অপরাধ।

ডক্টব বসু নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলেন। ভদ্রমহিলা ছেলের অসুখে চিন্তাগ্রস্ত, কাতর। আর তিনি কর্তব্যেব ডাকে এসেছেন—এ-কথাই ভাবতে চেষ্টা কবলেন। ওপরে উঠেও আবো জনা-দুই মেয়েছেলের মুখই দেখলেন, কোনো পুরুষেব মুখ দেখা গেল না।

চারদিক খোলা একটা পরিচ্ছন্ন ঘবেব মাঝামাঝি পুরু গদির খাটে বোগী শয়ান। সাত বছবেব ফুটফুটে ছেলে। রোগের ধকলে বিবর্ণ, কিন্তু তাও সুন্দর। শিযবেব কাছে নার্স দাঁড়িয়ে।

ব্যাগ বেখে ডক্টর বসু তাব সামনে বসলেন। চোখেব কোল টেনে পবীক্ষা কবলেন, আঙুলেব ডগা টিপে দেখলেন। একটুখানি আশ্বাসেব আশায তাব মা সশঙ্ক নেত্রে চেযে আছেন অনুভব কবলেন। যে-মনটা তখনো খোঁজায মগ্ন, তাকে ডক্টব বসু জোর করেই যেন এবাবে কাজেব দিকে ফেবালেন।

ব্যাগ খুলে ধীরে-সুস্থে কর্তব্য সম্পন্ন করলেন। বক্ত নেওযা হল। ডক্টব বসু উঠে দাঁড়ালেন। এবারে মহিলাব সঙ্গে চোখোচোখি হতে মৃদু গম্ভীব স্ববে জিজ্ঞাসা কবে বসলেন—আপনার নাম?

যেন রিপোর্ট লেখাব জন্যই নামটা জানা দবকার।

—মিসেস নন্দী।

মিস্টাব নন্দী কে বা কোথায থাকেন জিজ্ঞাসা কবাটা আব বিপোর্টেব সঙ্গে সংযুক্ত মনে হবে না। তাই জিজ্ঞাসা কবা হল না, নইলে জানাব ইচ্ছে ছিল।

মহিলা বিনীত অনুবোধ করলেন—ডাক্তারবাবু রিপোর্টটা যদি একটু তাড়াতাড়ি পাওয়া যায—যাবে না?

মাযের এই কাতবতা আর উদ্বেগে তো ভেজাল নেই, তবু যেন কি দেখতে চেষ্টা কবছেন ডক্টব বসু।

—তিনটে সাড়ে-তিনটেয লোক পাঠাবেন।

—আমি নিজেই যাব, ওটা নিয়ে তক্ষুণি আবাব—

বলতে বলতে ফীয়েব কথা মনে পড়ল। তক্ষুণি প্রায় ছুটেই ওধাবেব কোণের একটা টেবিলের ড্রযাব খুলে কযেকটা নোট হাতে ফিবে এলেন।—কত দিতে হবে আমি তো—

ডক্টর বসু জানালেন কত দিতে হবে। টাকা নিযে বেবিয়ে এলেন। বাবান্দা, সিঁড়ি, সেই বসাব ঘব, বাস্তা, নিজেব গাড়ি। গাড়িতে স্টার্ট দিযে আব একবাব দোতলাব বারান্দার দিকে তাকালেন। কেউ নেই। ডক্টব বসু নিজেব ওপবেই বিলক্ষণ বিরক্ত। হযত কিছুই না, নিছক একটা কাল্পনিক আবেগের ধকল চলছে সেই থেকে। আব, কিছু হলেও এ-রকম আবেগপ্রবণতা ডাক্তারের অন্তত থাকা উচিত নয়।

বাড়ি ফিবে ল্যাববেটাবিতে ঢুকলেন। এই কাজটাই আগে সারবেন। কাজ নিযে বসলেন। তন্ময় হলেন। যত পরীক্ষা করছেন, মায়ের মুখ সরে গিয়ে ছেলেটার মুখই

চোখেব সামনে স্পষ্ট হযে উঠতে লাগল। বুকের ভিতবটা কেমন খচখচ করছে ডক্টর বসুর।

শেষ হল। তার পবেও চুপচাপ বসে বইলেন খানিক। তাবপব রিপোর্ট লেখায় মনোযোগী হলেন। হাতে লেখেন না, ছাপা ফর্মে একবাবে টাইপ করে ফেলেন। টাইপ শেষ হল। খামও টাইপ হযে গেল।...মায়েব মুখখানাই চোখে ভাসল এবার।

সঙ্গে সঙ্গে কোন মন্ত্রবলে চোখেব সামনে থেকে একটা কালো পর্দা সরে গেল যেন। আশ্চর্য, এতক্ষণ এত হাতড়েও যাব হদিস মেলে নি, এক মুহূর্তে তাই যেন দিনেব আলোব মতো স্বচ্ছ স্পষ্ট হযে উঠল। একটা ঘটনাস্রোত যেন পর পর চোখের সামনে দেখতে পেলেন ডক্টব বসু। খুব অভিনব ঘটনাও কিছু নয, উলটে মামুলিই বলা চলে। কিন্তু যৌবনস্বরূপিণী বমণীব হিংস্র নির্মম প্রভাবটুকুই বোধ করি ওই ঘটনাব অন্তবালে বুকেব তলায দুর্ঘটনাব মতো চেপে বসেছিল ডক্টব বসুব। অবচেতন মন থেকে এতকালেও সেটা যায নি।

দৃশ্যগুলো একে একে আবাব চোখেব সামনে দেখতে পাচ্ছেন যেন।...একটি মেযে, ওই মিসেস নন্দী, সেদিন কি তাব পবিচয় সেটা আজ আব মনে নেই—জীবন-বাস্তবে আর যৌবন-বাস্তবে এক পুরুষকে সে চেযেছিল। চাইতে গিযে চাওযা আব পাওযার মধ্যে কিছু ফাবাক আছে, সেই প্রথম অনুভব কবেছিল। একটা কটাক্ষে, একটুখানি ভ্রূভঙ্গিতে, ঠোঁটেব এক টুকবো বিলোল হাসিতে যে দুনিযা জয কবতে পারে, এই পবাজয আগুন হযে তাব বুকেব তলায ধিকি ধিকি জ্বলছিল। যাকে পেল না তার সুখেব ঘবে আগুন ধবাবার জন্য সেই জ্বালা সে সন্তর্পণে পুষেছে। তারপব আগুন ধরিযেছে। কামনাব নগ্ন পঙ্কিলতার মধ্যে সে একদিন সেই ভাগ্যহত পুরুষকে টেনে নামিযেছে, নামিযে তাবপব জাহান্নমেব পথে ঠেলে দিযেছে। পুরুষেব অসহায স্ত্রীটি ছেলে-কোলে কবে তার কাছে এসে নতজানু হযে স্বামীকে ভিক্ষা চেযেছে—ভিক্ষা মেলে নি। সুন্দবী বমণীব হিংসা, মাতৃত্বেব সঙ্গেও তাব আপোষ নেই।

সত্যি ঘটনা নয, অবাস্তব বাংলা ছবি একটা।

কিন্তু এক যুগ আগে এই ছবি দেখেই ভিতবে ভিতবে ভযানক অস্বস্তি আব গ্লানি বোধ কবেছিলেন ডক্টব বসু, তাব ভিন্ন কাবণ। বমণীব মাতৃত্ববোধশূন্য এই অসুন্দবেব দিকটা এত দর্শকের মধ্যে শুধু তাঁকেই হযত বিশেষভাবে আঘাত কবেছিল।

একটু বেশি বযসে বিযে কবেছিলেন তিনি। সিনেমা-টিনেমা বড দেখেন না, কিন্তু নতুন বউ নিযে দৈবক্রমে সেদিন এই ছবিটাই দেখতে এসেছিলেন। আব দেখাব পবে মনে হযেছিল, এটা যেন তাব জীবনেই একটা কালো ছাযা বিস্তাব কবতে এগিযে আসছে।

প্রেম নয, একটি মেযেকে মনে ধবেছিল। ভিন্ন বর্ণেব, ভিন্ন গোত্রের মেয়ে। সুশ্রী, সপ্রতিভ, মিষ্টি মেযে। সেও তাঁকে অপছন্দ কবত না। কিন্তু মা বেঁকে বসেছিলেন। মা-ছেলে দু'জনাবই অভিমান বড কম নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলে আর বিযেই করে না দেখে মা-ই প্রথম ভেঙে পডলেন একদিন। কেঁদে ফেলে বললেন—তোর যাকে খুশি নিয়ে আয, ঘর সংসাব কর, আমি আব বাধা দেব না, বউ এলে আমাকে কাশী পাঠিযে দিস।

ডক্টর বসু তারপর বউ ঘরে এনেছেন। নিজের যাকে খুশি তাকে নয়, মায়ের যাকে খুশি তাকে। মা পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—তোদের জীবন খুব সুখের হবে দেখিস।

ডক্টর বসু বিশ্বাস করেছিলেন, মায়ের কথার থেকে বড় কিছু নেই। অ-সুখেরও নয় তাঁর সংসার।

কিন্তু সেদিন ওই ছবি দেখে একটা বড় রকমের নাড়া-চাড়া খেয়েছিলেন ডক্টর বসু। বিয়েতে সেই মেয়েও এসেছিল, হাসিমুখে উপহার দিয়েছে, অভিনন্দন জানিয়েছে, নেমন্তন্ন খেয়ে গেছে। ততটা তো এগোন নি ডক্টর বসু, কোনোরকম দাগ পড়ার কথা নয়। তবু সেই মেয়ের চোখ-দুটো এক-একবার যেন বেশি চকচকিয়ে উঠছিল মনে হয়েছে। ক'দিনের মধ্যে এই ছবির প্রতিক্রিয়া। যাকে একদিন মনে ধরেছিল তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন ডক্টর বসু। সেই শ্রদ্ধার মেয়েকে ছবির এই মেয়ে কেমন করে যেন গ্রাস করেছিল। ভীতি-বিহ্বল চোখেই ছবিটা দেখেছিলেন। শেষে ছেলে নিয়ে এসে ভিক্ষা চাওয়া সত্ত্বেও যখন আর এক রমণীর মাতৃত্ববোধ বড় হয়ে উঠল না, সেদৃশ্য আর যেন সহ্য করে উঠতে পারছিলেন না ডক্টর বসু।

অভিনেত্রীটি অর্থাৎ আজকের মিসেস নন্দী এই ধরনের ভূমিকায় সুপরিচিতা সেই আর্টিস্টই হবেন বোধ করি। কারণ, ছবি শেষ হতে অনেকের, বিশেষ করে স্বল্প মাসুলের দর্শকদের, অনেকরকম চটুল বসালো মন্তব্য শোনা গিয়েছিল। ছবির কষ্ট-কল্পিত আবেদনের থেকেও ছলা-কলাময়ী রমণী-যৌবনের সেই নির্মম স্থূল দিকটার আকর্ষণ যাদের কাছে অনেক বেশি।

ছবিটা দেখার পর থেকে ডক্টর বসু সেই মনে-ধরা মেয়েটির সঙ্গে কোনো যোগাযোগই আর রাখেন নি।

সাড়ে-তিনটের দু-পাঁচ মিনিট আগেই মিসেস নন্দী রিপোর্ট নিতে এলেন। শুকনো উদগ্রীব মুখ, আশায় আশঙ্কায় চাপা অস্থিরতা সুস্পষ্ট।

ডক্টর বসু নিঃশব্দে রিপোর্টের খামটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

খামটা হাতে নিলেন তিনি। চোখে কাতর প্রশ্ন, কি শুনবেন সেই শঙ্কায় সাহস করে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাও করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু চুপচাপ ফিরে যেতেও পারলেন না শেষ পর্যন্ত।

—কি দেখলেন?

আগের সেই প্রতিক্রিয়া আর অনুভব করছেন না ডক্টর বসু। বরং একটু বিচলিত বোধ করছেন।

—তেমন ভালো মনে হল না, আপনার ডাক্তারবাবুকে দেখান, তিনি বুঝবেন।

এক নিমেষে সমস্ত আশা যেন নির্মূল হয়ে গেল। স্থাণুর মতো মহিলা দাঁড়িয়ে রইলেন খানিক। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। নিঃশব্দ কান্না। নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গাড়িটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত ডক্টর বসু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন।

প্রায় বছরখানেক পরে।

ডক্টর বসু বাংলা ছবি দেখতে এসেছেন আবার একটা।

কতকাল বাদে সিনেমা দেখছেন ঠিক নেই। হঠাৎ আসেন নি, অবকাশ বিনোদনের জন্যেও নয়, কাগজে এক রমণীমূর্তির বিজ্ঞাপন আর নাম চোখে পড়তে এসেছেন।

বহুকাল আগের সেই গোছেরই একটা ভূমিকা। তবে এই ছবিতে কিছুটা আত্মত্যাগের মিশেল আছে। হাস্যলাস্যময়ী এক রমণী নিজের যৌবনের অস্ত্রে এক প্রবল প্রমত্ত পুরুষকে বশীভূত করে তার কোপ থেকে এক সাধারণ মানুষকে রক্ষা করছে। ওই সামান্য মানুষটিই একদা তার অনুরাগের পাত্র ছিল।

ছবির প্রগলভ মুহূর্তগুলিতে অনেক হাসাহাসি, স্থূল মন্তব্য, কটূক্তি এমন কি সামনের দিক থেকে শিসও শোনা গেছে। কিন্তু ডক্টর বসু নির্বিকার চিত্তে দেখে গেছেন, দেখার পরে তেমনি নির্বিকার মুখেই প্রেক্ষাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এরারেও চটুল উক্তি কানে এসেছে দুই-একটা। কে একজন তার তরুণ সঙ্গীকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলছে—কেমন রঙ-ঢঙ দেখলি—একখানা পার্ট দেখালে বটে।

সঙ্গী পালটা উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করল—তার থেকেও চোখের ভাষা দেখেছিস?—মাইরি, যেন কটকট করে।

ডক্টর বসু নির্লিপ্ত মুখে নিজের গাড়িতে এসে উঠলেন। তিনি কিছুই দেখেন নি। আর দেখে থাকলেও এরই মধ্যে সব মুছে গেছে। তাঁর চোখে শুধু একটা দৃশ্যই লেগে আছে। সে-দৃশ্য তাঁরই বাড়ির নিচের একটা ঘরের। ছেলের ব্লাড-রিপোর্ট হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এক রমণী ঝরঝর করে কাঁদছে।

সেই মুখের সঙ্গে সকলের মায়ের মুখই খানিকটা করে মেলে বোধ করি।

রানীদিন

ক্যালেণ্ডারে আজকের তারিখটার দিকে তাকাতেই প্রায় উনিশ বছর আগের ঠিক এই তারিখটাই আমার চোখের সামনে এগিয়ে এলো। সাত সাগর রাতাসে টপকে ইংলণ্ডের রাণীর পদার্পণ ঘটেছে ভাবতে, উনিশ বছর আগের এই তারিখে তিনি কলকাতায়।

সেই দিনটিকে কেন্দ্র করে একটি পরিবারের যে মানসিক ছবিটি তুলে ধরতে চলেছি, পাঠক জেনে রাখুন বিশেষ কারণে তাঁদের সঠিক নাম ক'টি এখানে বদলাতে হয়েছে।

সেদিন আকাশ নির্মেঘ ছিল। কলকাতার রাতাসে রোমাঞ্চ ঠাসা ছিল। আবালবৃদ্ধবনিতার বুকের তলায় রূপকথার শিহরণ লেগেছিল। যাই যাই করেও বিদায়ী

শীত হঠাৎ আবার থমকে দাঁড়িয়ে নতুন উদ্দীপনায় তার শেষ পুঁজি উজাড় করে দিচ্ছিল। হয়ত পুঁজি ছিলই না, আগামী শীতের থেকে কিছুটা ধার করে খরচা করছিল।

আমি ভাবছিলাম দেশটা অতিথি-পরায়ণ বটে। এই দেশেরই পুরাণের পুণ্য পাখিরা সপরিবারে ক্ষুধার্ত অতিথির সেবায় আগুনে দেহ দান করেছিল। পুরাণ-মাহাত্ম্য কল্কির বহু ধ্বংসযজ্ঞেও লুপ্ত হয়ে যায়নি একেবারে। সেই অতিথি-পরায়ণতার ঐতিহ্যের শীর্ণতর আর সূক্ষ্মতর ধারা যুগের পর যুগ পেরিয়ে তলায় তলায় তরতরিয়ে বইছে। রাণী এসে গেছেন সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে। রূপকথার রাণী নয়, স্বপ্নের রাণী নয়—রক্ত মাংসের তরতাজা রাণী। এই রাণীর জঠরের ক্ষুধা ভারাটাও বিদ্যাসাগরীয় গদ্য গোছের। এই রাণীর চোখের ক্ষুধা। অতিথিপরায়ণ দেশ তাঁর চোখের সামনে গোটা মনটি বিছিয়ে দিয়েছে। শুধু মানুষ কেন, তাই আকাশও সেদিন অত তকতকে নীল ছিল, বাতাসও রোমাঞ্চভারে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, আর বিদায়ী শীতও অতিথি-সম্বর্ধনার দায়িত্বে চকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

ক'দিন আগে থেকেই সাজ সাজ রব। বুড়ী কলকাতার কতক অঙ্গ রং পালিশ আলোর বন্যায় নতুন-যৌবনে ঝলমলিয়ে উঠেছে। রক্ষা, সকল অঙ্গে চোখ ফেরাবার মত সময় নেই রাণীর। মন্ত্রীদের আর মন্ত্রণা দপ্তরের মাথাওয়ালাদের ক'দিন ধরেই আহার নিদ্রা ঘুচে গেছে—ভাবনায় ভাবনায় মাথার ঘিলু তাঁদের টগবগিয়ে ফুটছে। তাঁদের বউয়েরা ছেলেমেয়েরা অসুখের কথা বলতে এসে বা বাজার-খরচের তাগিদ দিতে এসে ধমক খেয়ে মরেছে। স্বামীদের মনে হয়েছে, কাণ্ডজ্ঞানহীনতারও একটা সীমা থাকা দরকার।

পুলিস দপ্তরের সকল স্তরের সকল পর্যায়ের কর্মচারীর দিশেহারা ব্যস্ততায় নাড়ী-ছাড়া ভাব একেবারে। দমদম এরোড্রোম থেকে গভর্নরের বাড়ি পর্যন্ত আট মাইল পথের শান্তিরক্ষার মহড়া দিতে দিতে গলদঘর্ম তারা। লাঠির ঘায়ে কিছু একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটিয়ে শান্তি স্থাপন করা বরং সহজ, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে লাঠি হাতে থাকবে অথচ কারো পিঠ দুরমুশনো চলবে না—দেখলে রাণী কি ভাববেন! এদিকে শান্তির খুঁটি নড়চড় হলেই তো সোজা নিজের ঘাড়ে কোপ। ভাবনা কম? ভাবনায় ভাবনায় মস্তিষ্ক বিকল হবার উপক্রম। গল্প শুনছিলাম, কোন একজন মাঝারী অফিসারকে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করতে অন্যমনস্কতায় তিনি তাঁর ঠাকুরদার নাম বলে দিয়েছিলেন।

খবরের কাগজের দপ্তরে আর এক এলাহী কাণ্ড। তুলো থেকে সূক্ষ্মতম সুতো বার করার মতো রাণীর বংশপঞ্জী আর দিনপঞ্জী থেকে সেখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিস্ময়ের খোরাক আহরণ করে খবরের হরপে সাজানোর ধুম পড়ে গেছে। রাণীর রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য, আয়, ব্যয়, বিলাস, ব্যসন, আহার, নিদ্রা, অনুচর সহচরী—সব খবর আর সকলের খবর ইস্কুলের তিনবার ফেল-করা ছেলেটাও গড়গড়িয়ে বলে দেবে। পরীক্ষার খাতায় রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ আর দ্বারকানাথের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে ছেলে বাপ-ঠাকুরদা ওলটপালট করে ফেলেছে, তার মুখেও রাণীর ছেলেপুলে স্বামী আর বাপ-ঠাকুরদার নির্ভুল সমাচার শোনা গেছে।

—ভেবে দেখো, একশ হাজারে এক লক্ষ আর একশ লক্ষয় এক কোটি—

আলোচনায় আব উদ্দীপনায় ট্রাম-বাস সরগরম। অল্পবয়সী একজন বাঁয়ে ঘেঁষা নব্যপন্থী ঝাঁঝালো তর্কের সুবে বাণী সমাগমে দেশের খরচ বোঝাচ্ছিল তার সহযাত্রীকে। —গোটা দেশের এই উপোসের মুখে রাণী নিযে আসার আড়ম্বরে এক কোটি টাকা খরচ ভারতবর্ষের—ভাবতে পারো?

--এক কোটি কি মশাই! দু চোখ কপালে তুলে ঘাড বেঁকিয়ে ফোঁস করে উঠলেন সামনেব সীটের এক যাত্রী।—একুশ কোটি বলুন! এক কোটি তো মশাই গভর্নমেন্টেব আডমোডা ভাঙতেই বেবিযে যায়!... রাণী আসা একুশ কোটিব ধাক্কা, বুঝলেন?

ট্রামেব সকলেব চোখ বক্তাব মুখের ওপর। আর, আচমকা বিডম্বনায় এক কোটিওয়ালা হাবুডুবু। ক্ষীণ প্রতিবাদ, খববেব কাগজে এক কোটি দেখেছিলাম যেন...

—ছাপাব ভুলে তাহলে এক-এব বাঁযে 'দুই'টা পডে গেছে। একুশ কোটিওযালার নিঃসংশয মন্তব্য।

—আপনাবও কিন্তু একটু ভুল হল মশাই। পাশেব আসন থেকে গুরুগম্ভীব প্রতিবাদ ছাডলেন মাঝ-বযেসী আর একজন ভদ্রলোক। বাণী আসাব ব্যাপাবে গোটা ভাবতবর্ষ থেকে আসলে খরচা হচ্ছে ছাব্বিশ কোটি ; একুশ কোটি নয়—নেট এক্সপেনডিচাব টুযেন্টিসিক্স ক্রোবস—প্রমাণ চান, চলুন যে-কোনো কাগজেব অফিসে।

এক কোটি, একুশ কোটি আব ছাব্বিশ কোটিব বিতণ্ডার মধ্যে কণ্ডাক্টাব এগাবো নযা পয়সাব টিকিট কাটাব প্রত্যাশায় হাত বাডিযে সেই থেকে ঠায় দাঁড়িযে।

বুড়োবা অর্ধশতাব্দীগত স্মৃতি বোমন্থন কবে একবাবের রাজা আসাব গল্প ফেঁদে বসেছেন। প্রৌঢাবা ট্রাঙ্ক থেকে তিন যুগ আগেব বেনাবসী বার কবে সঙ্গোপনে রোদে দিয়ে ঝেডে মুছে বাখছেন। এই হিড়িকে ছেলেপুলেব জন্যে নতুন এক প্রস্থ প্যান্ট জামা জুতো কবিযে নেবার জন্যে উঠে পডে লেগেছেন মধ্যবিত্ত ঘবণীরা। পুবনো গযনা ভেঙে নতুন কবে গডিয়েছেন অনেকে। গিন্নিবা বাণী দেখতে যাবেন শুনে অনেক প্রৌঢ চোখ কপালে তুলেছেন, আব অনেক তরুণ ঠাট্টা-ঠিসারা করেছেন। অফিস থেকে সোজা বেরিযে ও-কাজটি একেবারে সেবে বাড়ি ফেবাব বাসনা তাঁদের, এব মধ্যে ছেলেপুলে গিন্নিবা বেবিযে পডলে খানিকটা দুর্ভাবনাব কথাই।

সেই দিন। রাণী দিন। দিনটাব এব থেকে ভালো নাম আব সঠিক নাম কিছু হতে পারে না। সকাল থেকে গোটা শহর উত্তব কলকাতার পথে ভেঙে পড়েছে। শুধু কলকাতা শহর কেন, মফঃস্বল শহবেবও আধা-আধি। কি কবে কোন কোন পথ দিয়ে তাবা গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে সঠিক করে কেউ বলতে পারবে না। আমি অন্তত পাবব না।

আমিও গিযেছিলাম। প্রথমে নিস্পৃহভাবে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, জনতা দেখতে যাচ্ছি, ভিড দেখতে যাচ্ছি, লোকেব হুজুগ দেখতে যাচ্ছি। লেখার কাজে লাগবে। কিন্তু সেটা সত্যের অপলাপ। আসলে আমিও রাণী দেখতেই যাচ্ছি। বাণী তরুণী, বাণী রূপসী, রাণীর কুবেবের ঐশ্বর্য, সব থেকে বড় কথা—এ রাণী রাণীই, বাজার স্ত্রী হিসেবে রাণী নয়—একেবারে সর্বপ্রধানা, স্বয়ং-সম্পূর্ণা বাণী। রাজা হলে যেতাম কিনা সন্দেহ, রাণী বলে যাচ্ছি। মনেব তলায় রূপকথার রাজ্যে যে-রাণীর অবস্থান সেই বাণী, সেই রকম রাণী।

বাস থেকে নামতে হয়েছে গন্তব্য স্থানের বেশ খানিকটা দূরে। যেখানে দু-দশটা চাপা দিয়েও আর বাস চলার পথ ছিল না—সেইখানে। তারপর পাযে পাযে কখন একসময় জনতার সমুদ্রে মিশে গেছি খেয়াল নেই।

না, মানুষ দেখে এমন বিস্ময় জীবনে আর কখনো অনুভব কবিনি। বাণী আসতে তখনো অনেক দেরি, এই ভিডেব মধ্যেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একে ঠেলে ওকে ফেলে কখনো-বা ভিডেব চাপে শূন্যে উঠে প্রায় আধ মাইল পথ আমি বিচবণ করেছি আর সেই বিস্ময় উপলব্ধি করেছি। সময় লেগেছিল ঘডি ধবে তিন ঘণ্টা।

কি দেখেছি? মারামাবি, হুডোহুড়ি, কথা-কাটাকাটি, পুলিসেব তর্জন গর্জন? না, এব একটাও না। লক্ষ লক্ষ মেযে-পুরুষেব এক তারে বাঁধা একটি মাত্র প্রতীক্ষার রূপ দেখেছি, রূপ উপলব্ধি কবেছি। একটা মাবামাবি হাতাহাতিও আমাব চোখে পড়েনি। পুলিসকে নিজের পেটেব কাছে লাঠি শুইয়ে জনতা ঠেকানো ছাডা একবারও লাঠি উঁচোতে দেখিনি। ট্রামে বাসে মেযেদেব গাযে গা লাগলে যেখানে সোবগোল পডে যায়—সেখানে ভিডেব চাপে চিডে চ্যাপটা হযেও অশোভন আচরণেব একটিও বামাহুঙ্কার অথবা পুরুষগর্জন কানে আসেনি! কে যে কাকে ঠেলছে সেই দিকেই চোখ নেই কাবো। আব, পকেটমাববা কি এই ভিড়েও বাণিজ্যেব লোভে আসেনি বলতে চান? এসেছিল নিশ্চয, কিন্তু পকেটমাব বলে তাদের কি হৃদয নেই, না সেই হৃদয়ে বাণীব আসন নেই? পরদিন তন্ন তন্ন করে আমি খববের কাগজ খুঁজেছি, কিন্তু বাণীদিনেব সেই জন-সমুদ্রে একটি পকেটমাবেব বিপোর্টও আমার চোখে পডেনি। বাণী দেখাব আগ্রহে তাবাও পেশা ভুলেছিল মনে হয।

যাক, রাস্তাব দু'পাশে লক্ষ লক্ষ লোকের একতাল মানুষ, আব দু'-পাশেব বাড়ির একতলা দোতলা তিনতলাব বেলিং-এ আব ছাতের আলসেতে চোখ-ধাঁধানো বসন-ভূষণে মোডা চাপ চাপ মেযেছেলে। কাবো কাবো ধাবণা, মাথা-পিছু দু'টাকা কবে আদায করে ওই দু'ধাবেব বাডিব অনেক মালিক অনেক টাকা কামিযেছে সেদিন।

আমি দেখছিলাম, আব আত্মাটাকে একদিকেব ফুটপাতেব জনতার ঢেউযে ছেডে দিযে আত্মবিস্মৃত হযে পডছিলাম।

হঠাৎই বিষম একটা ধাক্কা। না, ভিডেব ধাক্কা নয়। আত্মগত ধাক্কা।

আমাব সামনেব দু'হাতের মধ্যে যে-লোকটি সকলের মাথাব উপর দিয়ে আধ হাত গলা বাডিযে সামনেব ফাঁকা বাস্তাটাই একবার দেখে নেওযাব জন্যে কসরৎ কবছে, তাকে আমি চিনি। আব, কলকাতা ছেডে গোটা বাংলাদেশেব লোক এখানে ভেঙে পডলেও ওই একজনেব এখানে আসাব কথা নয।

আমার বহুদিনেব পবিচিত চাটুজ্জে বাডিব বডদা—মণিদা।

পরস্পরের দেখা হযে গেলে কে অপ্রস্তুত হবে না ভেবেই আমি তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টোদিকেব ভিডে ভেসে পডলাম। আধ ঘণ্টার চেষ্টায় বেশ খানিকটা তফাতে আসা গেল। তাব পরেই একটা বন্ধ দোকানেব উঁচু ধাপেব দিকে চোখ যেতেই আবাব ধাক্কা! চোখের দোষ নেই, বেশ একটি সুশ্রী মেযে ভিড় বাঁচিযে দোকানের বন্ধ দরজায় পিঠ ঠেকিযে দাঁডিযে ছিল।

কিন্তু আমি চমকে উঠেছি, কারণ ওই মেয়েও চাটুজ্জে বাড়ির একজন। বড়দা অন্যথায় মণিদাব ছোট বোন জযন্তী। আমার সঙ্গে ওই বাড়ির আত্মীযতাব সুতোটায় প্যাঁচঘোঁচ অনেক। মাসতুতো বোনের শ্বশুরবাড়িব সম্পর্কটাকে কোনোভাবেই কাছের সম্পর্ক বলা চলে না। কিন্তু সর্বদা যাওয়া-আসার ফলে সম্পর্কটা কাছেরই হয়ে গেছে।

এবারে আব নিঃশব্দে আড়াল হওয়া গেল না। চেষ্টা-চরিত্র করে, আব, অনেকেব ভ্রূকুটি উপেক্ষা কবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

দেখার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তী একদফা থতমত খেয়ে উঠল। ভিড় ঠেলে উঁচু ধাপটা থেকে নেমে আসতে আসতে সামলে নিল একটু। কাছে এসে হাসতে চেষ্টা কবে কৈফিয়তেব সুরে বলল, কাণ্ড দেখুন লোকেব, এমন আটকে গেছি যে নড়াচডাব উপায নেই।

জয়ন্তী ইস্কুলে মেযে পড়ায, উক্তিটা যে ছেলেমানুষেব মতো হযে গেল নিজেই বুঝেছে। ওদেব বাড়ি যেতে হলে এতটা আসতে হয না. আটকে যাওযাবও প্রশ্ন ওঠে না। প্রসঙ্গ এড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, যাচ্ছিলেন কোথায়?

বললাম, কোথাও না, এখানেই এসেছি।

জযন্তী আবাবও ঢোক গিলল। ভিড়ের মধ্যে কযেক পা এগিযে বলল, চলুন, বাড়িব দিকে যাই... কিন্তু বেরুবেন কি কবে?

একটা জায়গা দেখে দাঁড়াই চলো, এসেছি যখন দেখেই যাই।

জযন্তী থমকে গিয়ে মুখেব দিকে তাকালো। অপ্রতিভ হাসিব আভাস, একটু অসহিষ্ণুও।—বাড়ি গিযে আবাব হডবডিয়ে বলে দেবেন না তো?

—না।... তাছাডা ওদিকে মণিদাও সকলেব মাথাব ওপব দিযে ঘাড উঁচিযে দেখাব চেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছে দেখলাম।

শুনে জযন্তী ঘুবে দাঁডালো একেবারে।—বডদা? কই?

এখান থেকে দেখবে কি করে! আছে...। চলো, ওদিকে চলো—

বিস্ময কাটিযে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে আবাব সামনের দিকে এগলো সে। একটা অপবাধপ্রবণতাব অনুভূতি জোব কবেই বিলুপ্ত কবার চেষ্টা। বলে উঠল, আসবে না কেন, এব সঙ্গে অন্য কিছুব সম্পর্ক কি?

আমার নীববতাটুকুই সাযের মতো। দু' চোখ আপাতত দু'জনেব মতো একটু জাযগা আবিষ্কাবেব চেষ্টায মগ্ন।

এবারে একটু পূর্ব কথা বলে নেওয়া দরকার। জয়ন্তীব ওপবে তিনটি দাদা—ও-ই সকলের ছোট। ওদেব বাবা বিপ্লবী হবিশ চ্যাটার্জীব আপন বড় ভাই। ইংরেজ শাসনে যে হরিশ চ্যাটার্জীর প্রায় তিরিশ বছব আগে ফাঁসি হযে গেছে। জযন্তী ছেড়ে জযন্তীর ছোডদাও জন্মায় নি তখনো। তাহলেও সেই কাকাব আত্মাহুতির এক নিবিড স্পর্শেব মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে ওই বাডিব সবক'টি ছেলে মেয়ে। কাকীমা আছেন, তাঁর বয়েস পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। ওই বাড়ির তিনিই শুচিশুভ্র আদর্শ। ভাই বোন সকলেরই ওই কাকীমা-অন্ত-প্রাণ. তাঁরই প্রভাবে মানুষ ওরা। কাকীমা পূজা-আহ্নিক করেন, সেই ঘরে দেবতার পাশেই বিপ্লবী স্বামীব ফোটো। বোজই মালা দেওযা হয় ফোটোতে।

জয়ন্তীরা ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুর প্রণাম যত না করে, কাকার ফোটোতে প্রণাম করে তার থেকে বেশী। কাকীমাও বলতে গেলে দিবারাত্রি ওই ঠাকুরঘরেই থাকেন, ঠাকুরঘরের মেঝেতে শোন।

হরিশ চ্যাটার্জীর ফাঁসির পর ও-বাড়িতে কোনো বিলিতি সামগ্রী ঢোকা দূরের কথা, বিলিতি বাতাসটুকু পর্যন্ত ঢুকতে পায়নি। আজও না। সেবারে কাকীমার অত বড় অসুখটাতেও এক ফোঁটা বিদেশী ওষুধ চলেনি। কাকীমা বলেছেন, মরবই তো একদিন তাতে কি, কিন্তু তোরা মারিস না।

মনের জোরে কাকীমা কবিরাজী চিকিৎসাতেই সেরে উঠেছিলেন।

রাণীর আসার ব্যাপারে আমি ওই এক বাড়িতেই শুধু আলোচনা শুনিনি। সকলকেই নিস্পৃহ, নিরাসক্ত দেখেছি। ঠিক তাও নয়, উল্টে যেন সকলের মনের তলায় এক ধরনের গাম্ভীর্য থিতনো দেখেছি।

রাণী এলেন। রাণী চলে গেলেন। জনতার অভ্যর্থনার উল্লাস আকাশে গিয়ে ঠেকল। শৃঙ্খলাবদ্ধ জনতা বাঁধভাঙা বন্যার মতোই তারপর আলোড়িত হয়ে উঠল। তার ভিতর দিয়ে পথ করার চেষ্টাও বিপজ্জনক।

রাণীদর্শনতৃপ্ত একটু-আধটু আলোচনা কানে আসছে। রাণীর রূপের ব্যাখ্যা, পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস, তিনটি ছেলেমেয়ের মা—অথচ দেখে মনে হয় বাইশ বছরেরটি—না জানলে বিবাহিত কিনা বোঝা শক্ত—রাণীর পরনে কি ছিল, কোন দিকে তাকিয়েছিলেন রাণী, কার চোখে চোখ পড়েছে, এই ভিড় আর এই অভ্যর্থনা দেখে রাণীর কতটা খুশি হওয়া সম্ভব, রাণীর স্বামী ওই ফিলিপ ভদ্রলোক বেচারী না ভাগ্যবান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরো ঘণ্টাখানেক পরে পাশাপাশি জয়ন্তীদের বাড়ির দিকে চলেছি। একটু সহজ হবার জন্যেই বোধহয় জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করল, কেমন দেখলেন?

বললাম, তোমার থেকে সুন্দর নয় ভাবতে চেষ্টা করছি।

আ-হা, একটু খুশি হয়ে ও মন্তব্য করল, আমি ওর তুলনায় পেত্নী।

কিন্তু আমাদের হালকা হবার চেষ্টা ব্যর্থ। বাড়ির কাছাকাছি যে দু'জন ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তারা জয়ন্তীর মেজদা আর ছোড়দা। এক নজর তাকিয়েই বোঝা গেল, তারাও যেখান থেকে আসছে, আমরাও সেখান থেকেই। কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। জয়ন্তীর ছোড়দা শুধু চোখের ইশারায় পিছনের দিকটা দেখিয়ে দিল। আমরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে মণিদাও। ওদের বড়দা।

তার শুকনো মুখে অপ্রতিভ হাসির আভাস। কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সেও রাণী প্রসঙ্গ তুলল না, বা কিছু জিজ্ঞাসা করল না। শুধু দৃষ্টি বিনিময়েই চার ভাইবোনের মধ্যে একটা নীরব প্যাক্ট হয়ে গেল যেন। তারপর ভাইদের আমার দিকে চোখ পড়তেই জয়ন্তী তেমনি নিঃশব্দ ইশারায় আশ্বস্ত করল, এ-দিক ঠিক আছে।

দোতলায় উঠেই সিঁড়ির পাশে কাকীমার পুজোর ঘর। সন্ধ্যার মুখ তখন। মুখ হাত ধুয়ে কাকীমা এ-সময়টা আধঘণ্টা খানেকের জন্য বৈকালিক জপে বসেন। আজও বসেছেন।

কাকীমা সকলকে একে একে তাঁর ঘরটা অতিক্রম করতে দেখলেন। আমার দিকে চোখ পড়তে প্রসন্ন আহ্বান জানালেন, এসো, খবর ভালো তো?

আমি ঘাড় নাড়লাম। নিজের অগোচরে কাকীমার স্বামীর ফোটোখানার দিকে চোখ গেল। ফোটোর গলায় প্রতিদিনের মতই টাটকা মালা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, জয়ন্তী আর তার দাদারাও অদূরে দাঁড়িয়ে গেছে। সশঙ্ক, অপরাধী দৃষ্টি।

খুব সাদাসিধেভাবেই কাকীমা জিজ্ঞাসা করলেন, রাণী দেখে এলে বুঝি?

এমন বিড়ম্বনায় জীবনে পড়িনি বোধহয়। আমি যে রাণী দেখে এলাম সে কি আমার মুখে লেখা ছিল? কিন্তু এই ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়ালে সত্যি জবাব যা সেটা আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। নিজের অগোচরেই বলে ফেললাম, হ্যাঁ—। তারপর শুকনো হাসি, আমার তো লেখা-টেখার ব্যাপারে দেখতেই হবে।

তেমনি সহজ সরল কৌতূহলে কাকীমা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখলে?

হঠাৎ কি যে হল কে জানে। অকারণ জোর আর অকারণ উৎসাহভরে বলে ফেললাম, চমৎকার, এত সুন্দর আগে ভাবিনি।

তাই নাকি! কাকীমার প্রসন্ন বিস্ময়। তারপর ভাশুরঝি আর ভাশুরপোদের নির্বাক মুখের দিকে চোখ পড়ল।—ওরা কিছু বলছে না যে, ওদের ভালো লাগেনি বুঝি?

বোন আর ভাইয়েরা বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। ধরা পড়ে হঠাৎ কাকীমার ওপরেই যেন সব রাগ গিয়ে পড়ল জয়ন্তীর। এক পা এগিয়ে এসে তরল উদ্দীপনায় বলে উঠল, খুব ভালো লেগেছে কাকীমা, কত সুন্দর ভাবতেও পারবে না, দেখলে চোখ ফেরানো যায় না, একসঙ্গে যেন লক্ষ্মী সরস্বতী।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে তার ছোড়দা তেমনি ছদ্ম আগ্রহে যোগ দিল, খবরের কাগজের ছবিতে যেমন দেখো তার থেকে অনেক সুন্দর—কাগজে কিছুই ওঠে না।

আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কাকীমার মুখের ওপর। কিন্তু সেই মুখে কৃত্রিমতার আভাসও চোখে পড়ল না। সহজ সরল কৌতূহল। দেখে সকলে খুশি হয়েছে তাইতেই খুশি যেন। প্রসন্ন মন্তব্য, হবারই কথা, সুন্দরের সৃষ্টি ওরা শুনেছি—আ-হা, বেঁচে থাক—

জয়ন্তীকে বললেন, মুখ হাত ধুয়ে ওদের খেতে দে, নিজেও খেয়ে নে—খিদেয় মুখ চোখ বসে গেছে সব।

জপে মন ফেরানোর জন্যে ঘুরে বসলেন।

আমরা নির্বাক। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। ইংরেজ রাজদুহিতার উদ্দেশে কাকীমার ওই সাদাসিধে আশীর্বাদটুকু আমাদের কানের ভিতর দিয়ে বুকের কোথায় গিয়ে পৌঁছুল হঠাৎ ঠাওর করে উঠতে পারছি না।

নিজের অগোচরে আরো একবার তাকালাম।... অমন মাতৃত্বমণ্ডিত মুখ আর যেন দেখিনি আমি।

আজও থেকে থেকে মনে হয়, ভারতবর্ষ দেখতে এসে রাণী ভারতবর্ষের জনতা দেখে গেলেন শুধু, আর ভারতবর্ষের ভূগোল-পথে বিচরণ করে গেলেন। ভারতবর্ষ দেখতে পেলেন না।

ফল

ট্রেনে ওঠা মাত্র লোকটার দিকে চোখ গেল তার দুটো কারণ। প্রথম, তার ছ' জনকা স্লিপার বার্থ-এর খুপরিটা আমার জানলার ধারের বিজার্ভ বেঞ্চের নাক বরাবর। দ্বিতীয় কারণ, বাস্তসমস্ত পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তার অসহিষ্ণু চিৎকার চেঁচামেচি। জিনিসপত্র গোছগাছ করা আর শয্যা বিছানোর দ্রুত চেষ্টার ফাঁকে বউটা অজ্ঞাত অপরাধে বার দুই ধমক খেল, আর ছেলে-মেয়ে ক'টা বার তিনেক তাড়া খেল। আমার ধারণা, এর সবটুকুই ট্রেনে ওঠার উত্তেজনার দরুন।

মিনিট দশেকের মধ্যে শোয়া এবং বসার পরিপাটি ব্যবস্থা করে আধময়লা রুমাল বার করে ঘাম মুছতে মুছতে লোকটা নিজেই আগে বসে পড়ল। তারপর কর্কশ গলা যথাসম্ভব মোলায়েম করে আহ্বান জানালো, কই গো, বোসো না।... এই ছেলে-মেয়েগুলো, তোরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, এখন বসতে পারিস না?

হুকুম পেয়ে হুড়মুড় করে প্রথমে ছেলে-মেয়ে চারটে যে-যার পছন্দমতো জায়গা দখল করল। দুটো ছেলে দুটো মেয়ে। তাদের বয়েস বারো থেকে ছয়ের মধ্যে। তাদেরও চোখে মুখে ট্রেনে ওঠার উত্তেজনার ছাপ। বউটির মুখ দেখা গেল না ভালো করে, ভুরুর নিচে পর্যন্ত ঘোমটা টানা। একটু রোগা ধরনের। যতটুকু দেখা গেল গায়ের রঙ ফরসাই মনে হল। বসার আদেশ পেয়ে সেও এগিয়ে গিয়ে ওধারের জানলার কাছে গুটিসুটি হয়ে বসল। লোকটি আবার উঠে দাঁড়িয়ে সমনোযোগে দ্বিতীয় দফা জিনিসপত্র পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

লোকটির বয়েস বছর ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ হবে। সঠিক অনুমান করা শক্ত, কারণ সমস্ত মুখে বসন্তের দাগ। দাগগুলো বেশ গভীর আর সংখ্যায় অগুণতি। পরনে কালো চওড়া পাড়ের ধুতি, গায়ে প্রায় হাঁটুছোঁয়া কোঁচকানো সিল্কের পাঞ্জাবি, মাথার চুল বেশ পাট করে আঁচড়ানো।

আমার বেঞ্চে দুটি তরুণ সাহিত্যিক বসেছিল। তারা আমাকে তুলে দিতে এসেছে। আমার প্রতি তাদের সবিনয় হাব-ভাব দেখে হোক বা যে-কারণেই হোক লোকটি আমাকেও বার দুই পর্যবেক্ষণ করে নিল। তারপর ও-দিক ফেরা রমণীটির উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ল, পান খাবে নাকি গো?

জবাবে তার মাথা দু'পাশে নড়ল একটু। অর্থাৎ খাবে না।

—এনে তো রাখি। এই তোরা চুপচাপ বসে থাকবি, খবরদার জায়গা ছেড়ে উঠবি না।

শেষের অনুশাসন ছেলে-মেয়েগুলোর উদ্দেশে। পান আনতে গেল। একটু বাদে আমি ঘড়ি দেখলাম। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে। তরুণ সাহিত্যিক দু'জন বিদায় নিয়ে নেমে যেতেই ঘণ্টা পড়ল। লোকটা তখনো উঠল না দেখে বউটির চকিত মুখখানা একবার এদিকে ঘুরল, তারপর একটা ছেলেকে সরিয়ে সে জানলার দিকে ঝুঁকল।

ট্রেন ছাড়ার আগেই লোকটা নির্বিঘ্নে উঠল আবার। হাতে পানের ঠোঙা। তারপরেই আমি অবাক। এক-গাল হেসে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।—পান খাবেন সার?

সৌজন্যের খাতিরে হেসে মাথা নাড়লাম, খাই নে।

তাড়াতাড়ি সিল্কের জামার পকেটে হাত ঢোকালো।—সিগারেট?

আবারও মাথা নাড়লাম। তাও চলে না।

পরক্ষণে 'সার' থেকে একেবারে 'মশাই'য়ে অবতরণ।—পান না সিগারেট না, আপনি কেমনতর সাহিত্যিক মশাই! সঙ্গে সঙ্গে এক-গাল হাসি। আপনার পরিচয় আপনার সঙ্গের ওই ছেলে দু'টির কাছ থেকে জেনে গেছি... একজন মহাশয় ব্যক্তির সঙ্গে চলেছি, বড় সৌভাগ্য আমার।

বলেই বেশ একটু উত্তেজনা-মেশানো আনন্দ নিয়ে খুপরির মধ্যে ঢুকে গেল। বউয়ের হাতে পানের ঠোঙা চালান করল। ফাঁকে চাপা গলায় কি বলল ট্রেনের ঘড়ঘড় শব্দে শোনা গেল না। বউটি সন্তর্পণে এদিকে একবার মুখ ফেরালো।

লোকটা তক্ষুণি আমার বেঞ্চ-এর সামনে ফিরে এলো আবার। বসন্তের দাগভরা মুখ খুশিতে ভরাট তেমনি।

—আপনাদের মত গুণীজনের সঙ্গে দুটো কথা বলার সৌভাগ্য হল, বড় আনন্দ পেলাম। বসি একটু, আপনি বিরক্ত হবেন না তো?

—না না, বসুন। আপনি যাবেন কোথায়?

—বেনারস। পাশে বেশ জাঁকিয়ে বসল। জন্ম বয়সের কম্ম, কোথাও তো বেরুনো হয় না... সেই কবে বসন্ত হয়ে পটল তুলব-তুলব করছি, বউটা তখন বাবা বিশ্বনাথের চরণে মাথা খুঁড়েছিল, এত বছর বাদে বাবা টেনেছেন—পড়লাম দুর্গা বলে বেরিয়ে। ...তা আপনি তো লক্ষ্ণৌ চলেছেন শুনলাম?

—হ্যাঁ।

উৎসুক দু' চোখে আমাকে পর্যবেক্ষণ করল একটু।—হ্যাঁ মশাই, আমি শুনেছিলাম, আজকালকার সাহিত্যিকরা কলম ধরলেই পয়সা, অঢেল রোজগার করে এক-একজনে... আপনার তো তার ওপর একগাদা বই-পত্র, আমার বউ পাড়ার লাইব্রেরি থেকে এনে এনে পড়ে, ভালো লাগলে আমাকে গল্প শোনায়—আপনি ফার্স্ট ক্লাসে না গিয়ে আমাদের মত স্লিপারে চলেছেন যে?

বললাম, আমার এতেই সুবিধে হয়, তাছাড়া আপনাদের মত দু-পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হয়।

—তাই বলুন, আলাপ পরিচয় না হলে লিখবেন কি করে! কিন্তু... থাক, নিন্দে করব না। ঘুরে খুপরির দিকে তাকালো।—এই তোরা ফল খা না—শুনছ! ওদের ফল বার করে দাও, আর এখানেও পাঠাও।

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই বাপের হুকুম পেয়ে ছেলেরা বেঞ্চির তলা থেকে যে বিশাল ঝুড়িটা টেনে বার করল তার কাপড়ের ঢাকনা সরাতে আমার চক্ষুস্থির। অতবড় ঝুড়িটা ফলে ঠাসা। বড় বড় আপেল, ন্যাশপাতি, বেদানা, আঙুর, কলা, খেজুর, আরো কত কি। বাসি বা শুকনো নয়, লোভনীয় রকমের তাজা। একসঙ্গে বিরাট ঝুড়ি ভরতি এমন ভালো ভালো ফল নিয়ে বেরুতে আর কাউকে দেখি নি।

ছেলে-মেয়েরা যে-যার খুশিমত ফল তুলে খেতে লাগল। এর মধ্যে বউটিকে কিছু বাছা ফল তুলে নিয়ে বেশ করে ধুয়ে দুটো ডিশে সাজাবার উদ্যোগ করতে দেখে আমি তাকে শুনিয়েই বললাম, ওঁকে বারণ করুন, অসময়ে আমি কিছু খাব না।

—ফলের আবার সময় অসময় কি। আপনি খাবেন, ওই ফলের ভাগ্যি। দাও গো, তুমি দাও!

উঠে গিয়ে নিজেই ফলের ডিশ দুটো নিয়ে এলো। আমি সত্রাসে আবারও বাধা দিলাম, এত ফল কেউ খেতে পারে।

—খুব পারে, গল্প করতে করতে খান, দেখবেন ফুরিয়ে গেছে, হেঁজিপেঁজি ফল তো নয়! বলতে বলতে নিজে আডাইশ' গ্রামের একটা আপেল তুলে নিয়ে কামড় বসালো।

অগত্যা ফলাহারে মন দিয়ে আমি বললাম, আপনার নামটি জানা হল না এখনো।

—আমার নাম রামতারণ, রামতারণ ঘোষ। সাগ্রহে আমার দিকে ঝুঁকল একটু। —এককালে আমি দেড় মাসের জন্য পারলিশার হয়েছিলাম, বুঝলেন, দেড় মাসে হাজার টাকা লোকসান। তার আগে কলেজ স্ট্রীটে জুতোর দোকান ছিল, সেই জুতোর দোকান তুলে দিয়ে রাতারাতি পারলিশার—টেকে কখনো।

আমি হতভম্ব। জুতোর দোকান থেকে পারলিশার।

আপেল চিবুতে চিবুতে সলজ্জ জবাব দিল, আর বলেন কেন, কপালে ভোগান্তি থাকলে খণ্ডাবে কে।... যাক সে কথা। আপনাদের মতো দু-একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার খুব আলাপ করার ইচ্ছে ছিল অন্য কারণে।

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালাম। রামতারণ ঘোষ চট করে একবার ঘুরে খুপরির দিকে তাকালো। তার বউ বাইরের দিকে ফিরে বসে আছে। আরো ঘন হয়ে বসে একটু গলা খাটো করে সে বলল, আচ্ছা মশাই, আপনারা যে এত ঝুড়ি-ঝুড়ি প্রেমের গল্প লেখেন, এমন সব মেয়ের কথা লেখেন যা পড়ে রাতে ভালো ঘুম হতে চায় না—তার মধ্যে কোথাও সত্যি কিছু আছে, নাকি সব ফানুস?

ভিতরে একটু নড়বড়ে অবস্থা আমার। জিজ্ঞেস করলাম, কেন বলুন তো? আপনি নিজে বুঝি কখনো প্রেমে পড়েছিলেন?

সচকিত।—ঐ যাঃ, আপনি ঠিক ধরেছেন। কিন্তু আমার প্রেম তো আকাশে উঠে ফানুসের মত ফটাস করে ফেটে গেল, শুধু ফেটে গেল না, আগুন ধরে গেল —কিন্তু আপনাদের প্রেমের গল্পে সে-রকম বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড তো একটাও ঘটতে দেখি না।

প্রশ্ন চাপা দিয়ে তার ফানুস-ফাটা প্রেমের কাহিনী শোনার লোভ আমার। জবাব দিলাম, ও গল্পে অনেক ভেজাল অনেক জোড়াতাপ্পি থাকে... আপত্তি না থাকলে আপনার ব্যাপারটা শুনতে ইচ্ছে করছে।

বসন্ত-গুটির ছোপ-ধরা মুখে এবারে সত্যিকারের লজ্জার কারুকার্য দেখলাম। বলল, আমার প্রাণান্ত দশাই হয়েছিল, কিন্তু শুনলে আপনি ভয়ানক হাসবেন।

আমি মাথা নেড়ে আশ্বাস দিলাম, হাসব না। শেষে দেখা গেল আমাব শোনাব আগ্রহ থেকে তাব বলাব আগ্রহ কম নয়। বাত প্রায় সাড়ে-ন'টা পর্যন্ত দু'-তিন দফায় সে আমাকে যে বাস্তব কাহিনীটা শোনালো তাব বহু শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব বাদ দিলেও সেটা বর্ণশূন্য মনে হবে না বোধহয়। কিন্তু কাহিনীটি এমন যে সেটুকুও হুবহু তাব নিজেব ভাষায় ব্যক্ত কবলে বর্ণবৈচিত্র্য আবো বাড়বে বলেই বিশ্বাস।

'বুঝলেন মশাই, আমি যাকে বলে আসল প্রেমে পড়েছিলাম সেই উনিশ বছব বয়সে। মল্লিকা দত্তব বয়েস তখন বছব ষোল। তাব আগে একটা প্রেমভাব চলছিল আমাব বছব দুই-তিন ধবে—মল্লিকা যখন স্কার্ট-ফ্রক পবে বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেত —তখন থেকে। ঠিক সেই সময় আমি আমাদেব ভাঙাচোবা বাড়িব সামনেব গলিব মুখে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আমাব ঠাকমাব যখন শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত, আব বাড়িব লোকেব সঙ্গে আমি হাপুস নয়নে কাঁদছি—তখনো ঘড়িতে ঠিক সাড়ে ন'টা বাজতে চোখ মুছতে মুছতে গলিব মুখে ছুটে না এসে পাবিনি। ও বেণী দুলিয়ে চলে যেতে ঘবে ফিবে এসে সকলেব সঙ্গে মড়া-কান্না কেঁদেছিলাম।

'হঠাৎ একদিন দেখি ও ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধবেছে। আব তখনি আমাব মুণ্ডু ঘুবে গেল। ষোল-ছোঁয়া একটা কাঁচা সুব যেন ওব সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওদেব বাড়ি আমাদেব গলিব সামনেব যে বাস্তাটা ঘুবে নাচেব ঢঙে বেঁকে গেছে—সেই বাস্তাব শেষেব মাথায়। আমাদেব গলিব মুখ থেকে মিনিট পাঁচেকেব পথ। স্কুল যেদিন বন্ধ থাকত সেদিন কম কবে বাব পঞ্চাশেক আমি ওদেব বাড়িব সামনে দিয়ে যাতায়াত কবতাম।

'মল্লিকাকে ভালবাসাব পব থেকেই আমাব জীবনে একটা ম্যাজিক হয়ে গেল। কুড়ি বছব বয়সে সেবাবে আমি থার্ড ডিভিশনে স্কুল ফাইন্যাল পাস কবে ফেললাম। তাব আগে মশাই চাব-চাববাব ঘোল খেয়েছি, বুঝলেন—সেবাবে পাস। অবশ্য মল্লিকা দত্তও সেবাব স্কুল ফাইন্যাল দিচ্ছে জানতুম, তাই সেই প্রথম ভগবানেব কাছে প্রার্থনা কবেছিলাম যেন পাস কবি। সেই পাস কবলাম, আমি থার্ড ডিভিশন, মল্লিকা সেকেণ্ড ডিভিশন।

'ভিতবে ভিতবে আমাব একটা ভূমিকম্পেব মত পবিবর্তন হয়ে গেল। আমি প্রতিজ্ঞা কবলাম, এবাব থেকে ভয়ঙ্কব বকমেব ভালো ছেলে হব। বিছানায় চিৎপাত হয়ে কল্পনায় দেখতাম, মল্লিকাকে আমি পড়াচ্ছি, সাহায্য কবছি—আব মল্লিকা আমাব দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে।

'কিন্তু বাদ সাধল আমাব বাবা। হাটেব ব্যামো ধবিয়ে বসল। চিঠি কবে আমায় হুকুম কবল, আব বিদ্যে কাজ নেই, ঢেব হয়েছে—কাল থেকে গিয়ে দোকানে বোসো।

'ভাবুন একবাব আমাব অবস্থাখানা। কোথায় আকাশে সাতবানো প্রেম আব কোথায় কলেজ স্ট্রীটেব ঘুপচিব মধ্যে জুতোব দোকান। বিশ্বাস কবুন, আত্মহত্যা কবাব জন্য ক'বাব যে আমি বাড়িব ভাঙা কার্নিসেব কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, ঠিক নেই।

'সেই জুতোব দোকান নিযেই পডতে হল। সকালে বেবোই, বাতে ফিবি। চাব মাসেব মধ্যে কতগুলো অঘটন ঘটল। প্রথম, মল্লিকাব বাবা বাডি বদল কবল। আমাব মাথায পব-পব দু'বাব আকাশ ভাঙল। সর্ববক্ষা, আমাব তিনটে দিদিব বিযে বাবা আগেই দিযে গেছল। আমি তখন মাযেব সবেধন নীলমণি।

'এবও মাস আষ্টেক বাদে আমাব হৃৎপিণ্ডটা বেদম জোবে লাফিযে উঠল একদিন। মল্লিকা আমাব দোকানে এক দুপুবে জুতো কিনতে এলো। আমাব বুকেব মধ্যে তখন এই ট্রেন ঝাঁকানিব মত ঝাঁকানি, বুঝলেন। হ্যাঁ, নিজেব হাতে জুতো পবালাম তাকে —কত জোডা যে পবালাম ঠিক নেই। যত অপছন্দ ততো খুশি আমি, বাব বাব ওই সুন্দব দুটো পাযে হাত ছোঁযাতে পাবছি। আপনাদেব কোনো গল্পেব কোনো প্রেমিক এভাবে নাযিকাব পাযে হাত দিযেছে কোনোদিন?

'জুতো পছন্দ কবিযে শেষে কেউ শুনতে না পায এমন কবে জিজ্ঞাসা কবলাম, চিনতে পাবলেন? জবাবে সে হাঁ কবে মুখেব দিকে চেযে বইল। আমি তখন নিজেব বাডিব ঠিকানা বললাম, ও কোন বাডিতে থাকত বললাম, ওব নাম বললাম, ওব বাবাব নাম বললাম। গলিব মুখে আমাকে দাঁডিযে থাকতে দেখে যেমন মিটিমিটি হাসত, তেমনি হাসতে লাগল মল্লিকা। আমি ধবে নিলাম চিনতে পেবেছে, এবং আগে পাবেনি বলেই লজ্জা পাচ্ছে। যে দামে সে জুতো নিযে চলে গেল, দেখে দোকানেব কর্মচাবীবা হাঁ। আমাব পব পব তিন বাত ঘুম হল না।

'এব পবেব দেখা ওই কলেজ স্ট্রীটে, আডাই বছব বাদে। আমাব মা তখন স্বর্গে গেছে। আব আমি একটা বড দাঁওযে নডবডে জুতোব দোকান বেচে দেবাব মওকা খুঁজছি। বেচতে পাবলে কি কবব তখনো ঠিক কবে উঠতে পাবিনি। পাশেব বইযেব দোকানেব ছোকবা মালিকটিব সঙ্গে দাঁডিযে গল্প কবছিলাম। হঠাৎ আমাব সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি। দেখি বইপত্র বুকে চেপে মল্লিকা দত্ত বইযেব দোকানগুলো দেখতে দেখতে চলেছে। আমাব আলাপী ছোকবাটি তাকে দেখিযে যে টিপ্পনী কাটল শুনে আমাব ভেতবটা কি-বকম যেন হযে গেল। বইযেব দোকানেব ছোকবা হেসে হেসে যা জানালো তাব সাবমর্ম, ওই মেযেটিব নাম মল্লিকা দত্ত, এম এ পডে। নানা কাগজে তাব কিছু কবিতা ছাপা হযেছে। এখন কবিতাব বই ছাপাব বাই চেপেছে মাথায। সেই সব ছাপা কবিতা আব বাঁধানো একখানা কবিতা ভবতি খাতা নিযে সমস্ত পাবলিশাবেব দোবে দোবে ঘোবে। তাব দোকানেও নাকি দু'দিন এসে কবিতাব বই ছাপাব জন্য ঝকাঝকি কবে গেছে।

'ভিতবে আমাব তখন কি-যে হচ্ছিল আমিই জানি। মল্লিকাকে তখনো দেখা যাচ্ছিল। আমাব দু' চোখ জুডিযে যাচ্ছিল আব সেই সঙ্গে আধা-গোচব একটা সংকল্পে বুকেব ধুকপুকুনি বাডছিল। এব ঠিক চাব দিনেব মধ্যে 'দাঁওযে'ব অনেক কম টাকায জুতোব দোকান বেচে দিলাম। দেনাপত্র চুকিযে হাতে পেযেছিলাম মাত্র সাডে পাঁচ হাজাব। কলেজ স্ট্রীটে তখন জলেব দবে ঘব পাওযা শক্ত নয। চল্লিশ টাকায সেদিনই একটা খুপবিঘব ভাডা নিলাম। আব তাব সাত দিনেব মধ্যে আমার কাঠেব ব্যাক, কাচেব ব্যাক, সামনেব কাউন্টাব, ঝকঝকে সাইন বোর্ড বেডি। আমি তখন কল্প-ভাবতী

বুক-সেলার অ্যান্ড পাবলিশারের একমাত্র মালিক। দোকানের সামান্য আসবাবপত্রের জন্য আমার সেদিনে খরচ পড়েছিল চারশ' নব্বুই টাকা, বাজার থেকে চালু বই কমিশনে দোকান সাজাতে আরো খরচা হয়েছিল ছ'শ' চল্লিশ টাকা। তাছাড়া পাখা লাইট ইলেকট্রিক ইত্যাদির দরুন আরো বেরিয়ে গেছল ধরুন একশ পঁচিশ টাকা। তখন পর্যন্ত মোট খরচ দাড়ালো গিয়ে তাহলে বারো শ' পঁচানব্বুই টাকা। কিন্তু আমার উদ্দীপনা তখন এত প্রবল যে অচিরে আমি বাংলা দেশের সব থেকে বড় পাবলিশার হয়ে বসবই তাতে একটুও সন্দেহ নেই।

'কুড়ি টাকা মাইনের সদ্য নিযুক্ত ছোকরা চাকরটার হাতে দোকান ছেড়ে দিয়ে আমি গেলাম য়ুনিভার্সিটির দোরে ধরনা দিতে। প্রথম দিন দেখা হল না, দ্বিতীয় দিনে বেলা বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে পায়ের সুতো যখন ছেঁড়ে ছেঁড়ে, তখন দেখা। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলাম। হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিনতে পারছেন?' বলা বাহুল্য, চিনতে পারল না। আড়াই বছর আগের জুতোর দোকানের সাক্ষাৎ ভুলে মেরে দিয়েছে দেখে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সেই গলির বাড়ির কথা আর ওদের পুরনো বাড়ির কথা বললাম। তখনো নিস্পৃহ। তার পরেই যে কথা বললাম, তার প্রতিক্রিয়া দেখে নিজেই আমি মুগ্ধ। বললাম, অনেক কাগজে আপনার কবিতা পড়ি, আর সেই থেকে অনেক সময় ভেবেছি একবার দেখা হলে ভালো হত, নতুন পাবলিশার তো আমি... সেই থোড়-বড়ি-খাড়া ছেড়ে নতুন কিছু করতে চাই। তা আসুন না একদিন আমার দোকানে, এই কাছেই...।

'মল্লিকার সমস্ত মুখখানা উত্তেজনায় বাঙিয়ে উঠল। বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পাচ্ছে না। এবারে আমাকে চিনতেও পেরেছে মনে হল। বলল, আজ গেলে হয় না, কবিতাগুলো আমার সঙ্গেই ছিল..

'পরম সমাদরে আমি তক্ষুনি তাকে দোকানে নিয়ে এলাম। চপ-কাটলেট আনালাম। তারপর কারা-জগতে নেমে কখন যে রাত হয়ে গেল, দু'জনার কারোই হুঁশ নেই। এরপর টানা একটা মাস স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেল আমার। আমি মল্লিকার বাড়ি যাই, মল্লিকা দোকানে আসে রোজ। তার কবিতার রাশি আমার হেপাজতে— তার অনেকগুলো কবিতা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। কেউ যদি তখন বলত রবি ঠাকুর ওর থেকে ভালো কবিতা লিখেছে, আমার সহ্য হত কি না সন্দেহ। রোজ আমরা প্ল্যান করি কিভাবে ছাপা হবে, কত অভিনব সজ্জা-বিন্যাস সম্ভব। কবিতার বইয়ের দরাজ অঙ্কের বয়েলটি আমি আগাম দিয়ে ফেললাম লেখিকাকে। দুনিয়ার পরম প্রীতিবদ্ধ যেন শুধু আমরা দু'টি প্রাণী। এই রোমাঞ্চ ভোলবার নয়।

'একটা তর-তাজা গাছকে আচমকা বাজ পড়ে ঝলসে যেতে দেখেছেন? দেখেননি? কল্পনা করুন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে একেবারে জ্বলে পুড়ে ঝলসে গেলাম আমি। পর-পর দু'দিন মল্লিকার দেখা পেলাম না, তৃতীয় দিনে যখন তার বাড়ি যাব ভাবছি, ডাকে একটা বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি পেলাম। মল্লিকার বিয়ে। আমি জ্বলে জ্বলে পুড়ে পুড়ে করবের তলার মানুষের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম।

'তিন দিনের মধ্যে আবার সব বেচেটেচে দিয়ে আমি মোটমাট হাজার খানেক টাকা লোকসান খেলাম। মল্লিকার কবিতার খাতাপত্র বেজিস্ট্রি করে তার বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম।'

এই পর্যন্ত বলে রামতারণ ঘোষ উঠে তার খুপরিতে ঢুকে ঝুড়ি থেকে দুটো আপেল তুলে নিয়ে আবার এসে বসল। একটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, শুকিয়ে গেছে, খান।

আমি ব্যস্ত হয়ে মাথা নাড়লাম—এত রাতে আর না। আর একবার অনুরোধ করে সে নিজের আপেলে কামড় বসালো। আমার ধারণা তার গল্প বলা শেষ হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এখন আপনি কি করছেন?

—ফলের স্টল। ট্রাম-রাস্তার ধারে চার মাথার ওপর দোকান... বেশ ভালই চলছে। হঠাৎ বন্ধ করে চলে এসেছি, কয়েকটা দিন লোকসান খেতে হবে।... বসন্তে যাই-যাই অবস্থা হয়েছিল যখন, আমার স্ত্রী বাবা বিশ্বনাথের কাছে মানত করে বসেছিল তো। সেও আট বছর হয়ে গেল, কত আর দেবি করব—বেরিয়ে পড়লাম।... তারপর গল্পটা শুনুন—

আমি নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলাম।

'—সময়ে বিয়ে করলাম বটে, কিন্তু মল্লিকার স্মৃতি আমার মধ্যে ছড়িয়ে থাকল। কোথায় মল্লিকা আর কোথায় এই বউ! মোট কথা দুটো ছেলেপুলে হবার পরেও বউকে আমি ভালো চোখে দেখতাম না। বউকে এক-এক সময় মল্লিকা ভাবতে চেষ্টা করে আরো খারাপ লাগত।

'. বছর আটেক আগের কথা। বসন্ত রোগে একেবারে যমের মুখ থেকে ফিরে এলাম ছ'মাস বাদে আবার ফলের স্টলের দরজা খুলেছি। হাতে তখন একটা পয়সা নেই আমার চালু দোকান,অনেকে জানে বলেই গলাকাটা সুদে ধার দিয়েছে। আগের মতো ফলের স্টক বাড়াতে হলে মূলধন তো চাই।

'একদিন বসে আছি, টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা নাড়াচাড়া খেয়ে আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম। আমার স্টলে মল্লিকা ফল কিনতে এসেছে। সঙ্গে একটি লোক, বোধ হয় দেওর-টেওর হবে। মাঝে চোদ্দ-পনের বছর কেটে গেছে, তবু তাকে দেখা-মাত্র চিনলাম। সেই মল্লিকা নয়, তবু সেই মল্লিকাই যেন। কিন্তু মল্লিকা আমার মুখের দিকে তাকায়নি, সাগ্রহে আপেল দেখছে। একেবারে অসময়ের আপেল, একমাত্র আমার স্টলে ছাড়া এ তল্লাটে আর কারো কাছে নেই। নিতান্ত অসুখ-বিসুখের দায়ে না পড়লে ও-সময়ে কেউ আপেল কেনে না। মুখ দেখে মনে হল, মল্লিকাও সেই গোছের দায়েই পড়েছে। আপেল পছন্দ হতে মল্লিকা আমার দিকে তাকালো। চোদ্দ-পনের বছর বাদে চার চোখের মিলন। চিনতে পারা দূরে থাক, আমার বসন্তের দাগে-ছাওয়া মুখ দেখে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব।

'"কত করে?"

'সম্ভব হলে বা আগের দিন হলে আমি হয়ত বিনে পয়সায় জোর করে আপেল গছিয়ে দিতুম। আ-হা, সেই মল্লিকার কোনো ছেলে হয়ত অসুখে ভুগছে। কিন্তু আমারও

তো সেই অবস্থা। অসময়ের আপেল, আট টাকা করে কেনা আমার, দশ টাকায় বেচি। তবু কেনা দামই বললাম।—আট টাকা কিলো।

'সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকার মুখে প্রচণ্ড বিরক্তি।—"কম হবে না?"

'বুঝুন আমার অবস্থা। আমি জবাব দিতে পারলাম না। শুধু মাথা নেড়ে অক্ষমতা জানালাম। বাগে গজ-গজ করতে করতে মল্লিকা চার টাকা দিয়ে পাঁচশ আপেল কিনল। তার আগে তিনবার করে ওজন দেখল। আপেল নিয়ে দাম দেবার সময়ে তার আঙুলে আমার আঙুল ঠেকল। তখনো কেমন বিহ্বল অবস্থা আমার। ফলের ঠোঙা নিয়ে তারা এগলো। নিজের অগোচরে তাদের পিছনে আমিও তিন-চার পা এগিয়েছি। তারপরেই কাঠ আমি। মল্লিকার ঝাঝালো গলা, পাশের লোককে বলছে, "পাঁচশ আপেল চার টাকা, এই সব গলা-কাটা লোকগুলোকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে চারকে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া দরকার।" '

আমি নির্বাক। একটু চুপ করে থেকে রামতারণ ঘোষ বলল, আট বছর আগে সেই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে মল্লিকা-জ্বর ছাড়ল আমার। আর তার পর থেকে নিজের স্ত্রীটিকেই অন্যরকম লাগতে শুরু করল। বসন্তের দাগে-ভরা চোখে-মুখে সলজ্জ হাসি। —নিজের এই পরিবারটিকেই বেশ লাগে মশাই এখন, বুঝলেন।

বলতে বলতে জানলার পাশে ও-দিক ফেরা বউয়ের দিকে তাকালো সে।

আমার মনে হল এমন সপ্রেম দৃষ্টি আর বুঝি দেখিনি।

আপস

এটা গল্প ঠিক নয়, মনস্তত্ত্বগত হিউম্যান রিহেবিলিটেশন বা মানবিক প্রচারণের একটা অতিবাস্তব নজির বলা যেতে পারে। পল্লব গুপ্ত বয়সে আমার থেকে ঢের ছোট হলেও বন্ধুস্থানীয়। দাদা বলে ডাকে কিন্তু জিভ ছুটলে মনে-মুখে লাগাম নেই। এক এক সময় ওর কথা শুনলে আমারই কানের ডগার রং বদলায়। কিন্তু ও ছেলের এতটুকু সংকোচের বালাই নেই।

এক-একজন থাকে যার স্বভাব-চরিত্রের অবাঞ্ছিত দিকগুলোও বেশ অনায়াসে বরদাস্ত করা যায়, অন্যায় করে বেড়ালেও খুব অসহ্যরকমের অন্যায় মনে হয় না সেগুলো—দোষের ব্যাপারগুলো জানা থাকলেও তার সঙ্গ-সান্নিধ্য ভাল লাগে। পল্লব গুপ্ত সেই গোত্রের একজন।

পৈতৃক অবস্থা ভাল, নিজে মস্ত ফার্মের মোটা মাইনের পাবলিক রিলেশনস অফিসার। অনেকের মতে, এই চাকরিটাই ওকে আরো তরল-মতি করে তুলেছে। পকেটে সর্বদা দামী সিগার মজুত, হাতেও একটা জ্বলছেই। বড় বড় পার্টিকে বশে আনার দায় তার, সেই কারণে ওর কোম্পানির অঢেল খরচা করতেও দ্বিধা নেই —আর তাদের চিত্তবিনোদনের এই সব খরচাই হয়ে থাকে পল্লব গুপ্তর মারফত। পি. আর. ও.—পাবলিক রিলেশনস অফিসার, অতএব সে-ই হোস্ট। ফলে, বড় বড়

ড্রিঙ্ক পার্টিতে সকলের কাছে নিজেকে ইনটারেস্টিং করে তোলাটা চাকরির অঙ্গ। আর তার ফলে দস্তুরমত পানাসক্ত যে হয়ে পড়ছে এও নিজেই স্বীকার করে। নিজেই এক-এক সময় বলে, এ-শালার চাকরি থেকে কোনো একদিন বিটায়ার করার পর অবস্থাখানা যা হবে আমার, স্বভাব-চরিত্র একেবারে খেয়ে দিলে। কিন্তু এ নিয়ে ও সত্যি এতটুকু দুশ্চিন্তায় পড়েছে এ কোনদিন মনে হত না। পৈতৃক সম্পত্তি যা আছে তাতেও দুই-এক পুরুষ চোখ বুজে জাহান্নমে যেতে পারে।

পল্লব গুপ্তর স্বভাব-চরিত্রের আরো একটা দুর্বল দিক আছে। সেটা সুরূপা রমণী সংক্রান্ত। দিলখোলা হাসি-খুশি মিষ্টি চেহারার ছেলেটার মেয়েমহলেও বেশ কদর। এই ব্যাপারে বারকয়েক বিপাকে পড়তে পড়তে কোনরকমে পিছলে বেরিয়ে এসেছে। তবু মেয়েদের নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে আনন্দে কাটানোর নেশাটা ছাড়তে পারেনি। একবার এক উঠতি ফিল্ম-আর্টিস্টের পিছনে এমন মেতে গেল যে চাকরি-বাকরি শিকেয় ওঠার দাখিল। আমরাও ধরেই নিলাম ওই ফিল্ম-আর্টিস্টই ওর গলায় ঝুলল। শেষে একদিন ও এসে নিজে থেকেই বলল, বাপের পুণ্যিতে খুব কাটান দিয়ে এলাম দাদা —বারোটা বেজে গেছল আর কি।

কৌতূহল চেপে জিজ্ঞাসা করেছি, এত কি ভয়ের ব্যাপার ছিল?

—আর বলেন কেন দাদা, এমন বুদ্ধু বনে গেলাম না যে নিজেকেই বামছাগল বলে গালাগাল না দিয়ে পারলাম না। আচ্ছা দাদা, আপনার কাছেও তো এনেছিলাম একদিন, নিজেই দেখেছেন—এমন নরম-সরম মিষ্টি হারভাব দেখলে কোন শালা না ধরে নেবে অক্ষত কুমারীটি একেবারে—আরও ভেবেছিলাম বারো ভূতে দেবে এমন একটা মেয়েকে লুটে-পুটে শেষ করে, তার আগে নিজেই পাকা-পাকি দখল নিয়ে বসি। অনেকটা এগিয়েও ছিলাম বেশ, শেষে বলে কিনা: তোমাকে ছাড়া আর আমার চলছে না—এবারে ডিভোর্স স্যুট ফাইল করা যাক একটা, খরচপত্র যা লাগে তুমিই দেবে কিন্তু বাপু। শেষে জেরায় এগিয়ে আমি তো চিত্তির—শুধু বিবাহিতা নয়, দু'দুটো মেয়ে আছে মহিলার।

—তারপর?

—তারপর আর কি, আমি বললাম, তার ডিভোর্স সহজ হলেও আমার ডিভোর্স সহজ হবে না, আমার গৃহিণীটি আশ-বঁটি নিয়ে তাড়া করবে দুজনকেই। আমিও বিবাহিত শুনে সে প্রথমে লজ্জিত, তারপর ঠক-প্রবঞ্চক বাস্কেল-টাস্কেল বলে বিদায় দিল আমাকে। আমি মনে মনে গঙ্গার চান সেরে সোজা আপনার এখানে, কারণ আপনি প্রকারান্তরে এগোতে বারণই করেছিলেন আমাকে।

কেন বারণ করেছিলাম সঠিক বলতে পারব না, ফিল্ম-আর্টিস্টকে নিয়ে ওর সংসারযাত্রা খুব সুনির্বিঘ্ন হবে মনে হয়নি সম্ভবত। কিন্তু ছেলেটার উপস্থিত-বুদ্ধি দেখে খুশি হয়েছি। ধাক্কা খেয়ে তক্ষুনি নিজেকেও বিবাহিত বলে চালিয়ে দিয়ে এসেছে। কিন্তু ওই গোছের আরো ছোট-খাটো দুই-একটা ধাক্কা খাবার পরেও ও-যে রমণীসঙ্গবিরহিত জীবন যাপন করছে, এমন নয়। এখনো অনেক সময় অনেক রকম মেয়ের সঙ্গে ওকে মেলামেশা করতে দেখা যায়। আর অম্লানবদনে নিজের এমন

সব কীর্তির কথা বলে যে সাধারণস্থলে কান গরম হবার কথা। কিন্তু পল্লব গুপ্তর বলার ঢংটাই এমন যে না শুনে পারা যায় না—শোনার পর ধমক-ধামকের প্রশ্ন।

এ-হেন পল্লব গুপ্ত একদিন এসে মুখ বেজার করে বলল, এবারে সত্যিই একটা যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে গেলাম দাদা, কি যে করি—

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার—কোনো মেয়ে?

—তাছাড়া আর কি।

—আবার ফেঁসেছ?

—ফেঁসে যাবার জন্য এবারে তো আমি হাঁ করে আছি, কিন্তু সে-ভাগ্য হবে কি হবে না সেই চিন্তাতেই তো এত যন্ত্রণা। আচ্ছা দাদা, এর নামই কি প্রেম?

জবাব না দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটা কে, আবার কোনো ফিল্ম-আর্টিস্ট?

—না না, সে-রকম কিছু নয়—সোজাসুজি এক ভাল মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে—বলেই ফেলি আপনাকে, আমার মাসির ভাশুরের মেয়ে। সেই চৌদ্দ বছর বয়সে দেখেছিলাম মেয়েটাকে, ভাল করে ফিরেও তাকাইনি—তখন বিশ বছর বয়েস আমার, আঠেরো-বিশের শাড়ি-পরা সেই সব ডরকা ইয়ের মেয়ে ভিন্ন কারো দিকে তাকাতামই না। কিন্তু সেই চৌদ্দ বছরের মেয়ে যে বাইশ বছর বয়সে এ-রকম হয় তখন কি ছাই একবারও মনে হয়েছে। বিশ্বাস করবেন না দাদা, পাশ ঘেঁষে চলে গেলেও মনে হয় গায়ে এক ঝলক গরম বাতাসের ছেঁকা লাগল। আর চোখে চোখ রেখে হেসে হেসে কথা বলে যখন, উঃ! এক গেলাস জল খাওয়ান দাদা—

হাসি চেপে জল এনে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কতদিন এই দশা চলেছে তোমার?

—টানা দু'মাস হয়ে গেল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে দাদা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। মাথার মধ্যে বুকের মধ্যে চোখের মধ্যে কেবল ওই মঞ্জরী সেনই ঘুরপাক খাচ্ছে দিবারাত্র।

—তোমাকে সে-রকম পাত্তা দিচ্ছে না?

—একেবারে দিচ্ছে না বললেও ঠিক হবে না। হাজার হোক বাপের বিষয়ের সুপুত্তুর হয়ে বসেছি, ভাল চাকরি করি, নিজের একটা ঝকঝকে গাড়িও আছে—সকলের চোখে আমার দাম যে কিছু আছে সেটা ও মেয়েও বোঝে। কিন্তু ওই চেহারাপত্তর নিয়ে সে এই বাইশ বছর পর্যন্ত নিজেকে আগলে বসে আছে বলে তো বিশ্বাস হয় না—দখলদারির জন্যে কে হাঁ করে আছে জানতে পারলে তবে তো ডুয়েল-টুয়েল লড়তে পারি—সেটাই যে কিছু আঁচ করতে পারছি না। মাসির মুখে শুনেছি, এম. এ. পাস না করে বিয়ে করবে না ঘোষণা করেছিল নাকি—কিন্তু আসলে সেটা কাউকে কিছু সময় দেবার ছল কিনা কে জানে—এবারে এম. এ. পাস করেছে শুনে আমার বুকের প্যালপিটেশানে ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছে।... ভাল কথা, মঞ্জরীর সঙ্গে কাল কিছু সাহিত্য-আলোচনা হয়েছিল। সেই করে ইংরেজিতে এম. এ. পাস করেছিলাম, এতদিনে সব গুলে খেয়ে বসে আছি! আর বাংলা সাহিত্যের দৌড় বঙ্কিম আর শরৎ পর্যন্ত,

তাও বঙ্কিমের নায়িকার সঙ্গে শরৎবাবুর নায়িকা গুলিয়ে গেছে—কিন্তু মঞ্জরী দেখলাম আধুনিক সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, আপনার নামও দু-চারবার করল, কি ছাই লিখেছেন খানকতক বই বার করুন তো, প্রেসটিজটা বাঁচাই—

ওর পাল্লায় পড়লে আমারই প্রেসটিজের দফারফা হবার সম্ভাবনা। কিন্তু আলমারির বইয়ের কলেবর দেখে পল্লব আঁতকে উঠল।—এ আমার পড়ার সময় হবে কখন। তার থেকে বরং দু-চারখানা বইয়ের পাঁচ-সাত লাইনের মধ্যে জিস্ট বলে দিন তাই দিয়েই সামলে নেব।

অব্যাহতি পাবার আশায় বললাম, তার থেকে তুমি বরং কিছু জানান না দিয়ে মঞ্জরী সেনকে এখানে একদিন ধরে নিয়ে এসো, সে তার ইচ্ছেমত বই বেছে নেবে'খন, আর সাহিত্যিকদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে এও ধরেই নেবে।

ও বলল, মতলবটা ভালই দিয়েছেন। দেখা যাক।

যাবার আগে মঞ্জরী সেন সম্পর্কে আরো একটু খবর দিল পল্লব গুপ্ত। সমবয়সী মাসতুতো ভাই বলেছে, মঞ্জরী সে-রকম কোন ছেলেকে ধরে বসে আছে বলে মনে হয় না। তবে একটা ছেলে—তার নাম অনিমেষ সরকার, সে এখনো প্রায়ই ওদের বাড়িতে আসে। আগে মঞ্জরীদের পাড়াতেই থাকত সেই লোক, ভাড়া না পেয়ে বাড়িওলা কেস করে তাদের উঠিয়েছে। লোকটা রাজনীতি করত, জেল-টেলও খেটেছে। মঞ্জরী নাকি আদর্শ নিয়ে খুব মাথা ঘামায়, তাই তার কাছে এই লোকটির কদর। তাকে নিয়ে মঞ্জরীর ভবিষ্যৎ কোন পরিকল্পনা আছে কিনা সেটা অবশ্য মাসতুতো ভাই সঠিক বলতে পারল না। ওদের বাড়ি গিয়ে সেই অনিমেষ সরকারকে মঞ্জরীর সঙ্গে কথা বলতেও দেখেছে পল্লব—একদিন নয়, দুদিন দেখেছে। আর তারপর থেকে গুপ্তা লাগিয়ে খতম করা যায় কিনা সে-কথাও ভাবছে।

সব মিলিয়ে বোঝা গেল মঞ্জরী সেন নামে একটা মেয়ের জন্য পল্লব গুপ্তর এখন আহার-নিদ্রা ঘুচতে বসেছে।

সত্যিই মঞ্জরীকে একদিন বাড়ি নিয়ে এলো সে। আর আমারও ভালই লাগল। রূপসী না হোক বেশ সুন্দরীই বটে। আর সমস্ত মুখে ভারী একটা লাবণ্য মাখা। আমি পল্লবের প্রশংসা করলাম খুব, আর খানকতক বইয়ে তার নাম লিখে দিলাম। পরদিনই পল্লব লাফাতে লাফাতে এসে হাজির।

—দাদা, কাল আমার প্রেসটিজ যে কি বেড়ে গেছে ভাবতেই পারবেন না—বেরিয়ে এসে আমাকে চোখ রাঙালো, এ-রকম একজন লোকের সঙ্গে এত খাতির আমাকে কক্ষনো বলেননি পর্যন্ত। দাদা, আপনি যে এ-রকম একজন লোক সে তো আমিও এই প্রথম শুনছি।

আমার হাসিই পাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, অনিমেষ সরকারের খবর কি?

হেসে হেসে পল্লব বলল, অনিমেষ সরকারের?—তার খবরও মাসতুতো ভাইয়ের মুখে যা শুনলাম আশাপ্রদ। আমার বরাত-গুণে লোকটা নিতান্ত গরীব—আর এরই মধ্যে নাকি কতগুলো ছোট ছোট ভাই-বোন রেখে তার বাবা মারা গেছে—বাবার বদলে অনিমেষ সরকার গেলে আরো একটু খুশি হওয়া যেত। তবে আর একটা ভাল খবর

শুনলাম, মঞ্জরীর মা নাকি সাংঘাতিক গরীব ঘরের মেয়ে ছিল, রূপের জোরে সুখের ঘরে এসেছে। তাই মেয়ের কোন গরীব ছেলের সঙ্গে চেনা-জানা আছে শুনলেও নাকি ত্রাস তার। এই কারণেই অনিমেষ সরকারকে মা দুচক্ষে দেখতে পারে না আর মাসতুতো ভাই বলে মঞ্জরীও গরীবানা চালে থেকে অভ্যস্ত নয়—যতই আদর্শ আদর্শ করুক।

এরপর পল্লব গুপ্ত আবার একদিন এসে আনন্দের আতিশয্যে আমাকে ধরে দুটো ঝাঁকানি দিল। তারপর বিয়ের নেমন্তন্ন-পত্র হাতে দিল। বলল এ যে এত সহজ ব্যাপার হবে ভাবতেও পারিনি দাদা—ওদের লক্ষ্যও যে আমি এ কি ছাই আগে বুঝেছি। তাহলে নির্লিপ্ত থেকে নিজের আর একটু কদর বাড়ানো যেত।

কিন্তু ওদের বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই আমার কেমন মনে হল সমাচার খুব কুশল নয়। গণ্ডগোলের সূত্রপাত মঞ্জরীর দিক থেকে। দিলদরিয়া পল্লব গুপ্তর কেমন হাসফাঁস দশা একটু। গম্ভীর মুখে মঞ্জরী একদিন আমাকে স্পষ্টই বলল, প্রথম দিন আপনি বাড়িয়ে বলেছিলেন দাদা, ওর অনেক খারাপ অভ্যাস আছে।

আমি আমতা আমতা করে বলেছি, কেন, এ রকম খোলামেলা চরিত্র—

বাধা দিয়ে ঈষৎ ঝাঝালো সুরে মঞ্জরী বলল, চরিত্রেরও গলদ আছে।

বেচারা পল্লব জানালা দিয়ে মনোযোগ সহকারে রাস্তা দেখছে।

আরো মাস ছয় বাদে মনে হল গণ্ডগোলটা বেশ পাকিয়ে উঠেছে। পল্লবের সর্বদাই বিষণ্ন অথবা বিরক্ত মুখ। একদিন ঘরে টেনে বসিয়ে জেরা শুরু করলাম, কি ব্যাপার সব খোলাখুলি বলো তো?

ও বলল, আমার বিরুদ্ধে অনেক মারাত্মক অভিযোগ, এ রকম জানলে ও নাকি আমার ছায়াও মাড়াত না।

—কি অভিযোগ?

—প্রথম, আমার কোন রকম আদর্শের বালাই নেই।

—তারপর?

—দ্বিতীয়, সিগার।

—সিগার কি?

—আমি সিগার খাই, আমার সমস্ত গায়ে নাকি চুরুটের গন্ধ। চুমু খেতে গেলে ধাক্কা মেরে ঠেলে সরায়। ডেটল দিয়ে মুখ কুলকুচি করে আর গায়ে সেন্ট মেখে তবে কাছে আসতে হয়—ততক্ষণে আমার চুমু খাওয়ার তেষ্টা চলে যায়।

ওর খোলাখুলি বলার নমুনা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। পল্লব বলে চলল, তৃতীয় অভিযোগ, ড্রিঙ্ক করা। যত ভাল জিনিসই খাই ও ঠিক টের পায় আর তারপর কুরুক্ষেত্র। চতুর্থ অভিযোগও ওর কাছে তেমনি মারাত্মক—আমি মেয়েদের পিছনে ছোটাছুটি করি। আমার আগের চালচলন কিছু কিছু জেনে ফেলেছে, তাছাড়া বাড়িতে অনেক মেয়ের টেলিফোন আসে—

বললাম, একটু সামলে-সুমলে চললেই তো পারো।

ও বেগে গিযে বলল, সব ছেড়ে-ছুড়ে পবমহংস হযে বসে থাকব? আমি তো মঞ্জবীকে শাসিযেছি, এ-বকম কবলে চাকবি-বাকবি ছেড়ে বিষয-আশয বিলি কবে দিযে যেদিকে দু'চোখ যায চলে যাব—তাতেও ঘাবড়ায না।

আবো মাস তিনেক বাদে একদিন দু'জনেই এসে হাজিব আমাব বাড়িতে। সেদিন আবাব ভিন্ন মূর্তি দুজনেবই। পল্লব গুপ্ত আগেব মতোই হাসিখুশি আব মঞ্জবীও যেন আগেব সেই লাবণ্যময়ী মিষ্টি মেযেটি। ওদেব কথাবার্তা থেকেও বোঝা গেল মাঝেব একটা বছবেব সমস্ত অশান্তি আব মনোমালিন্য অপগত। এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা কবলাম, কি হে, কিছু একটা ম্যাজিক-ট্যাজিক হযে গেছে মনে হচ্ছে?

খুশিতে ডগমগ পল্লব বলল, ম্যাজিক বলে ম্যাজিক—একেবাবে নিদাকণ ম্যাজিক দাদা।

—কি কবে হল?

—সেই অনিমেষ সবকাবেব কল্যাণে।

শুনে আমি অবাক।

তাবপব মঞ্জবীকে ও-ঘবে আমাব স্ত্রীব সঙ্গে গল্প কবতে বসিযে দিযে ও মনেব আনন্দে যে ফিবিস্তি দিল, তাতে আমি আবো অবাক। মঞ্জবী ওব সঙ্গে আপোস কবেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যাব পবে পর্যন্ত গোটা ছয সিগাব চলতে পাবে, ড্রিঙ্ক একেবাবে ছাড়তে হবে না, বড পার্টি হলে মাত্রা বেখে খেতে হবে, আব মেযেদেব সঙ্গে হৈ-হুল্লোড কবে বেড়ানোতেও আপত্তি নেই, তবে মঞ্জবীব অনুপস্থিতিতে সেটা কবা চলবে না —যেখানে যাবে সে-ও সেখানে উপস্থিত থাকবে।

বলা বাহুল্য, পল্লব গুপ্ত সানন্দে বাজী। ম্যাজিকেব ব্যাপাবটা সংক্ষেপে এই বকম :

...সেদিনও মেজাজপত্র বিগড়েই ছিল পল্লব গুপ্তব। তিন দিনেব মধ্যে মঞ্জবী কাছে আসেনি, ওকেও কাছে ঘেঁষতে দেযনি। সামনা-সামনি বাগও কবতে পাবে না পল্লব, কাবণ সে বাগলে মঞ্জবী ডবল বাগে—আব তখন আবো বেশি আক্কেল দিতে চেষ্টা কবে।

বিকেলে ওই বকম মেজাজ খাবাপ নিযেই বেবিযে পড়েছিল। হঠাৎ ফুটপাথেব পাশে একেবাবে একটা হ্যাগার্ড মার্কা লোককে দেখে গাড়ি থামাল। জামা-কাপড আব ওই মূর্তি দেখলে কেউ তাকে ভদ্রলোক ভাববে না। তাব ওপব একগাল দাড়ি, মাথাব রুক্ষ চুল ঘাড আব কান বেযে নেমেছে। গালেব হাড উঁচিযে আছে, দু চোখ গর্তয। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনিমেষ সবকাবকে চিনতে পাবল পল্লব গুপ্ত। বিযেব আগে দু-দুটো দিন মঞ্জবীব ঘবে বসা দেখেছে—এ মুখ ভোলাব কথা নয তাব।

কিন্তু অনিমেষ সবকাব পল্লব গুপ্তকে দেখেও নি, চেনেও না। গাড়ি থেকে নেমে কাছে এসে জিজ্ঞাসা কবল, আপনি এখানে এভাবে দাঁড়িযে?

কোটবেব দুই চোখ তুলে লোকটা তাকালো, বুভুক্ষু চাউনি।—আপনি...?

—আমাকে চিনবেন না, আমি আপনাকে চিনি। আদর্শ মানুষ ছিলেন, এক সময দেশেব কাজে ঝাঁপিযে পড়েছিলেন।

লোকটার সেই ক্ষুধার্ত চোখ দুটো জ্বলে উঠল একবার। বিড়বিড় করে বলল, আদর্শ আর দেশের কাজ কোথায় আমাকে এনেছে দেখতেই পাচ্ছেন।... চেনেন যদি একটু উপকার করতে পারেন?

—বলুন?

—গোটা দশেক টাকা দিতে পারেন—ভাই-বোনদের নিয়ে তিন দিন ধরে উপোস চলছে!

পল্লব গুপ্ত চকিতে ভেবে নিল কি। তারপর বলল, আসুন আমার সঙ্গে, দশ টাকার পাঁচ গুণ দেব—

লোকটা হতভম্বের মতো তার গাড়িতে উঠল। তাকে নিয়ে পল্লব গুপ্ত সটান বাড়ি। অকারণে হর্ন বাজিয়ে যা আশা করেছিল তাই হল। মঞ্জরী দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। পাশ থেকে অনিমেষ সরকার তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

পল্লব গাড়ি থেকে নামল, গলা একটু চড়িয়েই ডাকল, আসুন অনিমেষবাবু—। অনিমেষ সরকার যথার্থই হকচকিয়ে গিয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে তার সঙ্গে ঘরে এসে বসল।

পল্লব গুপ্ত চট করে বাইরে এলো একবার। যা ভেবেছে তাই। অবাক বিস্ময়ে মঞ্জরী সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে আসছে। পল্লব তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেল। বলল, তোমার সেই আদর্শ পুরুষ অনিমেষ সরকার কিছু আশা নিয়ে আমার কাছে এসেছে, তুমি এক্ষুণি ঘরে ঢুকো না।

মঞ্জরী হতভম্ব। যাকে দেখেছে ওপর থেকে সে অনিমেষ সরকার কি তার কঙ্কাল ভেবে পেল না। আর এই রকম বেশবাস...

পল্লব বসার ঘরে ফিরে এলো আবার। দরজার ওধারে শ্রীমতীর অবস্থান স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়েছে। প্রতিটি কথাও ঠিকই কানে যাবে।

—তারপর অনিমেষবাবু, এটা তাহলে আপনি সত্যি কথাই বলছেন—আপনার আদর্শই আজ আপনাকে এই অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে?

ক্লান্ত স্বরে উত্তেজনা ফুটিয়ে অনিমেষ সরকার জবাব দিল, চুলোয় যাক আদর্শ —পেটের জ্বালায় সবসুদ্ধ মরলাম—এর থেকে যদি মিস্ত্রীগিরিও শিখতাম—

পল্লব বলল, কিন্তু আপনি দশ টাকা চেয়েছেন, ওতে আপনার ক'দিন চলবে? তিনদিন ধরে তো উপোস চলেছে বলছেন—

—দু'দিন চললে দু'দিনই বাঁচলাম। খিদের জ্বালা যে কি আপনি বুঝবেন না।

—তাই তো... ইয়ে, আমার কাছে খুব ভাল বিলিতি হুইস্কি আছে, খাবেন একটু?

—ওসব আমি কিছু খাই নে মশাই, দুটো বেলা ডাল-ভাত খাবার মতো আমাকে কিছু দিন দয়া করে।

পল্লব গুপ্ত ওদ্বিকের দরজার দিকে তাকালো একবার। তারপর পকেট থেকে সিগার-কেস বার করল।—আচ্ছা, ভাল চুরুট খান একটা!

—চুরুট আমি খাই নে, আমার যা দরকার তাই দিয়ে দিন সার—

—ও, পল্লব গুপ্ত ব্যস্ত, কি করে যে আপনাকে আনন্দ দেব একটু, আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না, আমার ভাল ভাল কিছু মেয়ের সঙ্গে ইয়ে মানে অন্তরঙ্গতা আছে —চলুন না যাই, সময়টা ভাল কাটবে।

ক্রুদ্ধ অনিমেষ সরকার উঠে দাঁড়াল। বলে উঠল, একজন ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে আপনি রসিকতা করছেন কিনা বুঝতে পারছি না—এসব অভ্যেসও আমার নেই— এখন আমার দরকার শুধু কিছু খাবার—দশটা টাকা চেয়েছিলাম, অন্তত পাঁচটা টাকা দিয়ে আজকের মতো বাঁচান আমাকে।

এবারে পল্লব গুপ্ত ধীরে-সুস্থে মানি-ব্যাগ বার করল পকেট থেকে। অনিমেষ সরকার এদিকে ফিরে আছে, ওদিকের দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে নির্বাক বিস্ময়ে মঞ্জরী দেখছে তাকে।

পল্লব গুপ্ত বলল, দশ টাকার পাঁচ গুণ দেব বলেছিলাম, তাই দিচ্ছি। এই নিন পঞ্চাশ টাকা—

লোকটা পাগল কিনা অনিমেষ সরকার ভেবে পেল না। লোভে দু'চোখ চকচক করে উঠল তার। ছোঁ মেরে টাকা ক'টা নিয়ে সামনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

বিবর্ণ পাংশু মুখে মঞ্জরী সামনে এসে দাঁড়াল।—কি ব্যাপার? এঁকে কোত্থেকে ধরে আনলে?

—রাস্তা থেকে। উপোসের জ্বালায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিল।.. দশ টাকা চেয়েছিল, পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিলাম।

একটা বড় রকমের ধাক্কা সামলে নিল মঞ্জরী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তার জন্যে এঁকে বাড়িতে ধরে নিয়ে এলে কেন, টাকা তো পকেটেই ছিল?

পল্লব গুপ্ত জবাব দিল, এনেছি তোমার জন্যে। ড্রিঙ্ক করে না, সিগার খায় না, মেয়েদের পিছনে ছোটে না—এ-রকম আদর্শ ব্যক্তির হাল কি হয় সেটা তোমাকে দেখাবার জন্যে।... আমাকেও তুমি এই অবস্থার দিকেই ঠেলে দিচ্ছ।

মঞ্জরী হাঁ করে চেয়ে রইল খানিক, তারপর ছুটে চলে গেল।

একমুখ হেসে পল্লব গুপ্ত সিগার-কেস বার করে দামী সিগার ধরাল একটা। বলল, তারপর এই আপোস।

হিসেবের বাইরে

সকাল সাতটাও নয় তখন। বাইরের বাঁধানো দাওয়ায় গরম চাদর মুড়ি দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলাম। একটু আগে এখানে বসেই প্রাথমিক চায়ের পর্ব শেষ হয়েছে। শীতের সকাল কুয়াশায় ঢাকা। রোদের ছিটেফোঁটাও নেই এখন পর্যন্ত। তাছাড়া কলকাতা থেকে এখানকার এই খোলামেলা জায়গায় শীতও বেশি। নিউ ব্যারাকপুরের লোকালয় ছাড়িয়ে একটু নিরিবিলিতে বন্ধুর এই বাড়ি। না শহর না গ্রাম। বন্ধুর আমন্ত্রণে দু'দিনের

অবকাশ কাটাতে এখানে আসা। একই আপিসে পাশাপাশি চাকরি করি। তবে চাকরিতে বন্ধুটি আমার থেকে কিছুটা পদস্থ। তার ওপর অফিস ইউনিয়নের হোমরা-চোমরা একজন। সকলেই মান্যগণ্য করে। এমন কি মালিকরাও তাঁকে একটু-আধটু সমীহ করে। কলকাতা থেকে একটু দূরে থাকার বাসনায় এইখানে জমি কিনে বছরখানেক আগে এই ছিমছাম ছোট বাড়িটি করেছেন ভদ্রলোক। এখান থেকেই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন এখন। দিনের কাজকম চুকিয়ে একবার বাড়ি এসে বসতে পারলেই কি-যে মহাশান্তি সেকথা অজস্রবার শুনিয়েছেন। আর, একবার এসে দেখে যাবার তাগিদও বহুবার দিয়েছেন। গত সন্ধ্যায় আপিস ফেরত দু'জনে এক সঙ্গেই চলে এসেছি। আগামী কালটা দু'জনেই ছুটি নিয়েছি। তার পরদিন রবিবার। অতএব প্রাণখোলা আড্ডার ঢালা অবকাশ।

শীতের সকালে কলকাতায় সাড়ে সাতটা-আটটার আগে লেপের তলা থেকে বেরুতে পারি না। কিন্তু এখানে ছ'টা না বাজতে কেউ যেন ঠেলে তুলে দিল। তার বেশ খানিক আগে থেকেই পাখির কিচির-মিচির কানে আসছিল। ভোরের আলোয় তারা যেন মিষ্টি আলাপের আসর বসিয়েছে। এখানে কুয়াশা মাখা সকাল কলকাতার মতো নয়। ধোয়ার গন্ধের লেশমাত্র নেই। লেপের মায়া ছেড়ে উঠে পড়েছিলাম। ঘরের পিছনের দিকের জানলার সামনে চুপচাপ খানিক দাঁড়িয়েছিলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে ধানী জমি। কুয়াশায় ভালো চোখ চলে না, তবু মনে হল ওই জমিটার পাশ দিয়ে সরু পায়ে হাঁটা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার শেষ কোথায় গিয়ে মিশেছে তা আর আদৌ ঠাওর হচ্ছিল না।

বাইরের দাওয়ায় বন্ধুর সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছি। তিনি রাত থাকতে ওঠেন, সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। এরই মধ্যে তার সব কিছু সারা। মুখ হাত ধুয়ে তার পাশে এসে বসলাম। তিনি হেসে বললেন, এত ঘুমোও কি করে বাপু! তুমি উঠবে-উঠবে করে গিন্নি সেই কখন চায়ের জল চড়িয়ে বসে আছে।

বললাম, আজ তো তবু ঢের আগে উঠেছি, সাড়ে ছ'টাও নয় এখন—

দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা এসে গেল। সর্ব ব্যাপারে আমার এই বন্ধুটির হিসেবের বাই আছে। হিসেবের ভিতর দিয়ে সব-কিছুরই একটা পাকা চিত্র ছকে ফেলার ঝোঁক। চা খেতে খেতে যখন শুনলেন কলকাতায় সাড়ে সাতটার আগে আমার ঘুমই ভাঙে না, ছুটির অবকাশে তক্ষুনি একটা হিসেব মাথায় ঢুকে গেছে তাঁর। এগারোটায় শুয়ে সাড়ে সাতটায় ওঠা মানে কম করে আট-সাড়ে আট ঘণ্টার ঘুম—অন্ত ঘণ্টাই ধরা যাক। তাহলে এক মাসে অর্থাৎ তিরিশ দিনে দু'শ' চল্লিশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটে—বছরে হল গিয়ে দু'শ' চল্লিশ ইনটু বারো—হল গিয়ে দু হাজার আটশ' আশী ঘণ্টা। তাহলে ধরো মোট যদি পঁচাত্তর বছর বাঁচো তাহলে—

আমি ভাবলাম এই হিসেবটা আর মুখে মুখে এগোচ্ছে না। কিন্তু তিনি বলে উঠলেন, ধ্যেৎ ছাই আমি বোকার মতো এভাবে হিসেব করছি কেন—আট ঘণ্টা ঘুমনো মানে দিনের চব্বিশ ঘণ্টার তিন ভাগের এক ভাগ ঘুমনো—তাহলে পঁচাত্তর বছরের তিন ভাগের এক ভাগ হল গিয়ে পঁচিশ বছর—সোজা হিসেব। তাহলে দেখো পঁচাত্তর বছরের মধ্যে পঁচিশটা বছর তুমি স্রেফ মরার মতো ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলে।

হেসেই বললাম, থামো এখন তোমার হিসেবের কলে পড়ে আমার মাথা ঝিমঝিম করছে—এক্ষুনি না আবার ঘুম পেয়ে যায়।

হাসতে লাগলেন বন্ধুও। বললেন, না, এই হিসেবের ফল ঠিক উল্টো—সর্বব্যাপারে মিতাচারী হবার মহৌষধ। দেখো, আগে আমি সিগারেট খেতাম কম করে দিনে দশটা। পঁচাত্তর বছরের জীবনে হিসেব করে দেখলাম দু লক্ষ সত্তর হাজার সিগারেট খেতে হবে—ব্যস সিগারেটের নেশা খতম। পান খাওয়াও এই হিসেব করেই কমিয়ে ফেলেছি—

শুনতে মজা লাগছিল বেশ। চোখ টিপে গলা খাটো করে বললাম, তোমার যৌবনকালের গার্হস্থ্য ধর্মেও এই হিসেব মাথায় ছিল না তো?

বন্ধুর ছেলে মাত্র একটি, মেয়ে নেই। হা-হা শব্দে হেসে উঠে হাঁক দিলেন, ওগো শুনছ—।

সচকিত হয়ে বললাম, আমি কিন্তু উঠে পালাব তাহলে—

কিন্তু হাক শুনে তাঁর গৃহিণী এসেই গেছেন। অগত্যা হাসি সামলে বন্ধু বললেন, চায়ের পেয়ালাগুলো নিয়ে যেতে বলো—

এই সাত সকালে দাওয়ায় বসে কিছু বঙ্গরস চলছে, তাঁর গৃহিণী সেটা আঁচ করে হালকা সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের দু'জনের দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেলেন।

হাসি গোপন করার চেষ্টায় আমি সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কুয়াশা অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে। তার ওপর রোদ ঝিকমিক করছে। হঠাৎ অদূরে একটা দৃশ্য দেখে আমার দু' চোখ সেদিকে আটকালো। সামনের ওই রাস্তাটা ধরে শ্লথ পায়ে একটি রমণী এগিয়ে আসছে। পা ফেলে ফেলে তার এগিয়ে আসার ধরনটা যেন কেমন। দূর থেকে চেহারাপত্র ভালো ঠাওর করা গেল না। তবে বেশ মজবুত স্বাস্থ্যের মেয়ে এটুকু বোঝা যাচ্ছে। পরনে খয়রী রংয়ের একটা খাটো ডুরে শাড়ি। কিন্তু মেয়েটা এভাবে পা ফেলে ফেলে আসছে কেন।

বন্ধুর উপস্থিতি ভুলে সেদিকেই চেয়ে ছিলাম। আরো কাছে আসতে পরিষ্কার দেখলাম। বেশবাস দেখে বোঝা যায় খেটে-খাওয়া দুঃস্থ গরিব ঘরের বৌ। কিন্তু সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্য। আধফর্সা মুখখানাও বেশ সুশ্রী। মাথায় খাটো ঘোমটা। বয়েস বত্রিশ তেত্রিশ হতে পারে। ঢিমে তালে এলোমেলো পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে। আর যেভাবে আসছে, মনে হল মাথা ঘুরে পড়েও যেতে পারে।

যে কোনো কারণে রমণীটি বেশি-রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছে ভেবে উতলা চোখে আমি বন্ধুর দিকে ফিরে তাকালাম। দেখি বন্ধু আমাকেই দেখছেন আর মিটিমিটি হাসছেন। চোখাচোখি হতে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা দেখার রোগ না লেখকের রোগ?

বললাম, মেয়েটাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে, কিভাবে পা ফেলছে আর টুলতে টুলতে আসছে দেখছ না?

—ওটা রস-সিক্ত পদক্ষেপ আর রসের টুলুনি। মেয়েটার পিছনে যে আসছে তাকেও দেখো।

বন্ধুর কথা শুনে যেমন অবাক আমি, ওই মেয়েটার পিছনে গজ বিশেক পিছনে পিছনে যে আসছে তাকে দেখেও তেমনি অবাক। বছর চৌদ্দর একটি ছেলে। পরনে হাফ প্যান্ট, গায়ে ছেঁড়া শার্ট। আদর-যত্ন পেলে ওই কচি মুখটাও সুশ্রী দেখাত হয়তো। আমি অবাক এই কারণে যে ওই ছেলেটাও সামনের রমণীটির মতোই টলতে টলতে ঢুলতে ঢুলতে পথ ভেঙে এগিয়ে আসছে।

সবিস্ময়ে আবার বন্ধুর দিকেই ফিরলাম আমি।—এই সাত সকালে দুটোতেই মদ গিলে ঘরে ফিরছে নাকি? কে ওরা—মা আর ছেলে?

বন্ধু জবাব দিল, তাই। তুমি আর ড্যাব ড্যাব করে ওদিকে তাকিয়ে থেকো না। ওই বস্তিতও নতুন মানুষ দেখে তোমার দিকে মন দিয়েছে দেখছি—রসিক জন ভেবেছে বোধহয়।

রাস্তাটা বেঁকে বাড়িটার পাশ ঘেঁষেই সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। মেয়েটা অপলক চোখে সত্যি আমাকে দেখতে দেখতেই, বাড়িটা পার হল। অস্বস্তি তার পরেও। বাড়ি ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতে যেতেও ঘাড় ফিরিয়ে আমাকেই দেখছে। তার পরের বিস্ময় অভাবনীয়। দাঁড়িয়েই গেল এবং ঘুরে এদিকেই চেয়ে রইল। এদিকে বলতে বন্ধুর দিকে নয়, শুধু আমার দিকে। মাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ছেলেটাও মায়ের কাছাকাছি গিয়ে ঘুরে তাকালো।

ব্যাপার কি না বুঝে আমি বন্ধুর দিকে তাকালাম। মেয়েটার এরকম দুঃসাহস দেখে বন্ধুও কিছুটা অবাক আর কিছুটা বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করে ওদের দিকে চেয়ে আছেন।

পায়ে পায়ে মেয়েটা এবার আমাদের এই দাওয়ার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মদের ঝোঁকে আবার কি কাণ্ড বাধায় আমার সেই অস্বস্তি। বন্ধুও হকচকিয়ে গিয়ে থাকবেন।

পায়ে পায়ে মেয়েটা এসে একেবারে দাওয়া ঘেঁষে দাঁড়াল। অপলক চাউনি আমারই মুখের ওপর। নেশার ঘোর কেটে গিয়ে তারও যেন কিছু বিস্ময়ের কারণ ঘটেছে। অভাবের ছাপ এটে বসা কমনীয় মুখ। উসকো-খুসকো ঈষৎ কোঁকড়া লালচে চুল। খাটো করে শাড়ি পরা সত্ত্বেও গড়ন শরীরের সবটুকুর পক্ষে ওই ছোট শাড়ি আদৌ যথেষ্ট নয়। বছর তিরিশ-বত্রিশের বেশি বয়েস মনে হয় না। মাথার ছোট ঘোমটাটাও এর মধ্যে খসে গেছে। আমি কেমন বিমূঢ় হঠাৎ। এই গোছের একখানা মুখ আমি কি কোথাও কখনো দেখেছি? একেবারে অচেনা লাগছে না কেন?

পাশ থেকে বন্ধু প্রায় খেঁকিয়েই উঠলেন, কি চাই এখানে?

ধমক খেয়ে মেয়েটার বিস্ময়ের ঘোর কাটল যেন। এবার বন্ধুর দিকে তাকালো। তার ভয়লেশশূন্য সাদাসাপটা কথা শুনে আমি হতভম্ব।—তাড়া দেন কেন বাবু, আমি কি চুরি করতে এয়েছি? পরক্ষণে আমার দিকে ফিরতে ঢুল্ ঢুল্ চোখে আগ্রহ যেন উপচে উঠল। জিজ্ঞাসা করল, কলকাতার মুখুজ্জে বাড়ির সেজবাবু না?

আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই। এবারে অবাক বোধ হয় বন্ধুটিও। নিজের অগোচরে মাথা নেড়েছিলাম কিনা খেয়াল নেই। নিজের বাড়িতে আমি সেজবাবুই বটে।

চোখের পলকে মেয়েটা এবার দাওয়ায় উঠে এলো। তার পরেই উপুড় হয়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম। আমি বাধা দেবারও সময় পেলাম না। প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াল। বাড়ির মালিকের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে ঘাড় ফিরিয়ে ছেলের উদ্দেশ্যে হাঁক দিল, ভুলু, শীগগির আয়!

ছেলেটারও হয়তো নেশা ছুটে গেছে। সে হন্তদন্ত হয়ে কাছে আসতেই বলে উঠল, দেবতার দেখা পেয়ে গেলি আজ, গড় কর শীগগির, গড় কর।

ছেলেটাও কিছু না বুঝেই তাড়াতাড়ি প্রণাম সেরে উঠল। আমি তখনও আঁতিপাতি করে খুঁজছি কে হতে পারে এরা।

মেয়েটার চোখে মুখে আনন্দ ঠিকরে পড়ছে, আপনি এখানে সেজবাবু! বেড়াতে এয়েছেন?

—হ্যাঁ, আমার এই বন্ধুর বাড়ি এটা।

—বাড়ির সকলে ভালো আছেন? সেজ-মা ভালো আছেন?

সেজ-মা বলতে আমার স্ত্রী। আমি বললাম, সব ভালো, কিন্তু তোমার নাম কি বলো তো?

সে বলে উঠল, ও-মা, এখনো এই পোড়ারমুখিকে চিনতেই পারলেন না সেজবাবু! আমি আপনাদের বাড়ির সেই কমলা দাসীর মেয়ে সরস্বতী।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে থেকে বিস্মৃতির পর্দাটা সরে গেল। এবার তাকাতেই মনে হল ষোল বছরের আধফর্সা কোকড়া কচি-কাঁচা মিষ্টি মুখের সঙ্গে আরো সতেরটা বছর গুঁড়লে একরকমই হতে পারে বটে। মগজে একরাশ স্মৃতি একসঙ্গে ভিড় করে আসছে। আবার একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়াও দেখা দিল সঙ্গে সঙ্গে। কিছুটা নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে বললাম, এবারে চিনেছি। কেষ্টর খবর কি?

—ঘরে আছে। অষ্ট পহর ঘরেই থাকতে হয়, ঘর থেকে বেরুনোর উপায় নেই। সাগ্রহে আঙুল তুলে মেঠো রাস্তাটা দেখিয়ে বলল, ওই মাঠ ছাড়ালেই বস্তি এলাকায় আমাদের ঘর—মাঠ ভেঙে গেলে কাছেই—আপনি এখানে দিন কয়েক থাকবেন সেজবাবু?

মুখে বলতে সাহস করল না বটে, কিন্তু এমন করে বলল যে পারলে এক্ষুনি ও আমাকে ওদের ঘর দেখাতে টেনে নিয়ে যায়।

বন্ধুর বিরক্তি-ছাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আরো গম্ভীর। বললাম, না, পরও ভোরে চলে যাব। তারপর প্রায় রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, তুই এভাবে হেঁটে আসছিলি কেন—সকালেই মদ গিলেছিস আর ছেলেটাকেও খাইয়েছিস?

সরস্বতী থতমত খেল একদফা। দেখতে দেখতে সমস্ত মুখটাই বিষাদে ছেয়ে গেল। বলল, আপনি 'নেদায়' হলে ভগবান আমাকে আরো কত মারবেন ঠিক নেই, আপনার কথা আমরা এখনো বলি, আপনি দয়া রাখবেন সেজবাবু! বিষ না খেয়ে আমাদের পেটে ভাত জোটে না যে, কি করব...

বলতে বলতে একটা উদ্গত কান্না ভিতরে ঠেলে দিয়ে ছেলের হাত ধরে তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে নেমে গেল। তারপর হনহন করে পথ চলল।

শেষের এই কথাগুলো শুনে কেন যেন আমার বুকের তলায় মোচড় দিয়ে উঠল। কি ব্যাপার আমি ভেবে পেলাম না। ওর স্বামী কেষ্ট ঘোষের ঘর ছেড়ে বেরুনোর উপায় নেই কেন? বিষ না খেলে পেটের ভাত জোটে না বলার মানে কি? মদ গিলে আগে বিবেকের গলা টিপে মেরে তারপর নিজের দেহ বেচে স্বামী পুত্রের ভাত জোটাতে হচ্ছে? তাহলে ছেলেটা সঙ্গে যাবে কেন? ছেলেটাও মদ গিলবে কেন?

বন্ধুর বিরস মুখের দিকে চেয়ে বললাম, মেয়েটা ভারী মিষ্টি আর ভালো ছিল এক সময়—

বন্ধু বাধা দিয়ে উঠলেন, এক সময় বলতে সেই সতের বছর আগে তো? এর মাঝে আর দেখেছ?

মাথা নাড়লাম। দেখিনি।

তাহলে এখন আর ভালোটালো বিচার করতে বোসো না। তবে এখনো অনেক লোকে ওকে মিষ্টি দেখে। ওই মেয়ে এই দাওয়ায় উঠে কথা বলছিল দেখে ক'টা লোক অবাক হয়ে এদিকে চাইতে চাইতে চলে গেল তুমি খেয়াল করোনি। ওর সুনাম কেমন বুঝছ?

সরস্বতীর এ-বাড়ির দাওয়ায় উঠে কথা বলাটা বন্ধুর একটুকুও পছন্দ হয়নি বোঝা গেল। আবার বললেন, তোমার ওই ভালো মেয়ে এখন ছেলে নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় কলকাতা যায় চোলাই মদ বিক্রী করতে আর সকালে ফেরে। বুঝলে? কাপড়ের নীচে ওদের কোমরে চোলাই মদ পাচার করার ব্লাডার বাঁধা থাকে। যা বেচতে পারল বেচল, বাকিটা মা আর ছেলে মিলে যে সাবড়ে দেয় সে তো ওদের নিজের চোখে দেখেই বুঝতে পারলে। এই করে ঘরের পঙ্গু স্বামীর আর ছেলের ভাত জোটায় বুঝলাম, তা বলে নিজেরা খায় কেন। তাছাড়া তোমার ওই ভালো মেয়ের পিছনে অনেক লোক লেগে আছে, তার মধ্যে পয়সাওলা লোকেরও অভাব নেই শুনেছি। ওই বস্তি এলাকায় ওর কিছু পিয়ারের লোকও আছে—কারো সঙ্গে বনিবনা না হলে ওদের লেলিয়ে দেয়, দু-চারজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মারপিটের খবরও আমার কানে এসেছে।

শুনে আমার কান মন দুই-ই বিষিয়ে গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে সতের বছর আগের একটা ঘটনাও বার বার মনে আসতে লাগল। ফলে ভিতরটা আরো বেশি ভারাক্রান্ত হয়েই থাকল।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে বেলা একটা। ভারী খাওয়ার ফলে বন্ধু তাঁর ঘরে একটু গড়াগড়ি করে নিতে গেলেন। আমাকেও তাই করতে বললেন।

গড়াগড়ি করতে গিয়ে হিসের ভুলে বন্ধু ঘুমিয়েই পড়েছিলেন নিশ্চয়। কারণ তাঁর আবার এ-ঘরে পদার্পণ ঘটল বেলা তখন চারটে। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই তিনি হা একেবারে।

আমি আমার শয্যাতেই বসে আছি। আমার সামনে মেঝেতে বসে আছে সরস্বতী। এখন তার সঙ্গে ছেলেও নেই।

গৃহস্বামীর হতচকিত অবস্থা দেখে সরস্বতী বিব্রত মুখে তার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

আমি ওকে উদ্দেশ্য করে হালকা সুরেই বললাম, বাড়ির মালিক ঘুমুচ্ছিলেন বলেই তুই এক ঘণ্টা ধরে এখানে বসে যেতে পারলি। যা পালা এখন, সাড়ে পাঁচটা নাগাত তোর ছেলেকে পাঠিয়ে দিস—কেষ্টকে দেখে আসতে যাব'খন।

সরস্বতীর ঠাণ্ডা মুখে খুশির ছোঁয়া লাগল। কিন্তু সাহস করে সেটুকু প্রকাশ করতে পারল না। আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বন্ধু আমার দিকে চেয়ে আছেন, আমাকেই দেখছেন। মাথার বিকৃতি কি আর কিছু তাই ভাবছেন। আমাকে হাসতে দেখে তাঁর পিত্তি জ্বলে গেল বোধ হয়। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, আমার সকালের এত কথা তোমার কানে গেল না? তুমি ওর বাড়ি যাবে?

—শুনলেই তো। মাথা ঠাণ্ডা করে বোসো। ঘুরে এসে তোমার হিসেবের বাইরে তোমাকে যদি কিছু না শোনাতে পারি তো আজ রাতেই আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ো।

বলার ধরনের ব্যতিক্রমটুকু কানে লেগেছে।—এখনি বলো শুনি, এক ঘণ্টা ধরে মেয়েটা তোমাকে কি এমন বলে গেল যে তুমি গলে জল হয়ে গেলে?

বললাম, এখন না, আগে ঘুরে আসি।

ঘুরে এলাম। এ-সব জায়গায় শীতকালের সাড়ে সাতটা মানে রাতই। ঘরে পা দিয়েই মনে হল বন্ধু আর বন্ধু-পত্নী দুজনেই আমার জন্যে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। আমি যে ঘরে আছি সেই ঘরেই বসে ছিলেন তাঁরা। বন্ধু-পত্নী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আগে এক পেয়ালা চা খাওয়াই আপনাকে।

বাধা দিলাম, কিছু দরকার নেই, বসুন, এর মধ্যে দু' পেয়ালা হয়ে গেছে।

বন্ধু বলে উঠলেন, কোথায় হল, তোমার ওই সরস্বতীর ওখানেই?

—হ্যাঁ। শয্যায় বসে তার দিকে ফিরলাম।—যা বলব সে যদি তোমার হিসেবের বাইরে হয়, আমার একটা অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে, আর সে অনুরোধ রাখাটা তোমার একটুও সাধের বাইরে নয়—বউদি আপনি সাক্ষী।

বন্ধু বললেন, ভণিতা ভালই হয়েছে এখন ব্যাপারখানা কি শুনি।

এরপর যে চিত্রটা ওদের গোচরে এনেছিলাম, পাঠকের সামনেও সেটুকুই তুলে ধরছি।

সরস্বতীর মায়ের নাম কমলা দাসী। আমাদের বাড়ির ঝি ছিল। বারো বছরের মেয়ে সরস্বতীকে নিয়ে সকালে আর বিকেলে আমাদের বাড়ি কাজ করতে আসত। কমলার বয়েস তখন বেশি হলে সাতাশ-আটাশ। স্বামী নেই, শুনেছি বছর দেড় দুই আগে বিধবা হয়েছে। আমাদের বাড়ির বউরা কাজে-কর্মে খুব একটা খুঁত ধরতে পারত না তার, তবু ওর ওপর তেমন খুশি ছিল না। বলত ওর স্বভাব চরিত্র সুবিধের নয়, কবে কার সঙ্গে কোন রাস্তায় নাকি ওকে দেখা গেছে একাধিক দিন। পরে বউরা তাকে জিজ্ঞাসা করতেও নাকি বলেছে আমার অমুক সম্পর্কের আত্মীয়। তাছাড়া চাল-চলনও ভালো নয়। বাড়ির ঠাকুরটার সঙ্গে নাকি ঠারে ঠোরে কথা বলে, ফাঁক পেলে হাসাহাসি করে, যার দরুন ঠাকুরটা ওকে দু' বেলাই বেশি-বেশি চা-রুটি দেয় ইত্যাদি।

মেয়েদের এ-সব কথায় আমি বড় একটা কান দিইনি। ভেবেছি, ওদের শ্রেণীর মেয়েদের তুলনায় কমলা দাসীর চেহারাপত্রের চটক বেশি, আর মোটামুটি সুশ্রী আর স্বাস্থ্যবতী বলেই মেয়েদের ওই গোছের সন্দেহ। তাছাড়া কান না দেবার আরো কারণ, ওর মেয়েটা সত্যিই স্নেহের পাত্রী হয়ে উঠেছিল আমার। সুন্দরী না হোক ভারী মিষ্টি দেখতে, না ফর্সা না কালো, মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল, বড় টানা-টানা দুটো চোখ। মুখ বুজে মায়ের কাজে সাহায্য করত, তারপর ফাঁক পেলেই দোতলায় চলে আসত। সকালে আমি নিজের মেয়ে আর ভাইঝিদের পড়াতাম, সন্ধ্যায় তাদের গল্প শোনাতাম। এই দু বেলার আসরে ওর উপস্থিত থাকা চাই-ই। ওর এত আগ্রহ দেখে ওকেও ছাত্রী করে নিলাম। বাড়িতে থাকতে বিনা বেতনের প্রাইমারি স্কুলে পড়ত। আবার ভর্তি করে দিলাম। খুশিতে কৃতজ্ঞতায় মেয়েটা যেন আমার কেনা হয়ে গেল।

চার বছর বাদে সরস্বতীর মা কমলা মেয়ে ফেলে সত্যি কার সঙ্গে উধাও হয়ে গেল। বাড়ির মেয়েরা তখন সরস্বতীকেও বিদায় দিল। ও তখন ষোল বছরের মেয়ে, বাড়ন্ত গড়ন। মেয়েদের বিশ্বাস ওরও স্বভাবচরিত্র মায়ের মতোই হবে। কারণ পাড়ার ভদ্র ঘরের একটা বখাটে ছেলের সঙ্গে ওর ভাবসাব দেখা যাচ্ছে। আর ওদের বস্তির কতগুলো ছোকরাও নাকি বাড়ির আশপাশে সর্বদা ঘুরঘুর করে। ভদ্রঘরের ওই ছেলেটা আস্কারা পায় বলে ওদের নাকি সরস্বতীর ওপর ভয়ানক রাগ। সেই ভদ্রঘরের ছোকরাকে আমি চিনি। নাম কৃষ্ণ ঘোষ, সকলে কেষ্ট বলে ডাকে। লেখাপড়ায় স্কুলের বেড়া পার হতে পারেনি। তখন শ্যামনগর না কোথায় একটা কাগজের কলে ঢুকেছে। হাতে কিছু পয়সা আসতেই বিড়ি ছেড়ে সিগারেট ধরেছে।

বিদায় দেবার তিন-চার দিনের মধ্যেই আলুথালু অবস্থায় এক সন্ধ্যায় সরস্বতী এসে আমার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। কান্না আর থামেই না। শেষে যা বলল তার মর্ম, বস্তির তিনটে জোয়ান ছেলে জোর করে ওকে নিয়ে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছে, যে পাতানো মাসির কাছে থাকে এখন তাকে টাকা দিয়ে বশ করেছে, আর সরস্বতীকে শাসিয়েছে এতটুকু অবাধ্য হলে তাকে একেবারে খুন করে ফেলা হবে। সে তিন-চারটে দিন মাত্র এ বাড়িতে আমার আশ্রয়ে থাকতে চায়, তারপর আর কোনো ভাবনা নেই। ভাবনা না থাকার কারণ শুনেও তাজ্জব আমি। কেষ্ট ঘোষ তার কাজের জায়গায় ঘর খুঁজছে, তিন-চার দিনের মধ্যেই পাওয়ার আশা। তারপরেই তাকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ঘরে তুলবে।

মেয়েটার কান্না দেখে আর কথা শুনে মাথা হল। কিন্তু কেষ্ট ঘোষকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। রাতে তাকে ডেকে পাঠালাম। আমি অবাক, ছেলেটাও কাঁদছে, সেই সঙ্গে কাকুতি-মিনতি, তিন-চারটে দিন ওকে আশ্রয় দিন দয়া করে, আমি এর মধ্যে ব্যবস্থা করছি। ভালো কায়েতের ছেলে, সরস্বতীকে বিয়ে করে নিজেদের ঘরে তোলা চলবে না—বাড়ি থেকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াবে জানা কথা। তাই ক'টা দিন সময় দরকার।

আমি কঠিন গলায় ওকে বললাম, এরপর ওকে ফেলে আবার একদিন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবি তো?

কেষ্ট কালীর দিব্যি কাটল, মরা বাপেব নামে শপথ করল।

সরস্বতীকেও বললাম, আর তুই তোর মায়েব মতো হবি না তো?

ও আমার পায়ে মাথা বেখে বলল, ওকে কখনো ছেড়ে গেলে আমার যেন কুষ্ঠ হয়—আমার ছেলে হলে আমি যেন তার মরা মুখ দেখি!

চার-পাঁচটা দিন সরস্বতীকে আগলে বাখার মধ্যে বিপদ ছিল। ক'টা গুণ্ডা ছেলে সর্বদা বাড়িব আশপাশে ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু আমি থানা-পুলিশেব ভয় দেখাতে গণ্ডগোল পাকাতে সাহস কবেনি।

পাঁচ দিনের মধ্যেই কেষ্ট বিয়ে করে সবস্বতীকে তার কাজেব জাযগায় নিয়ে গেছে। আমি ওকে একটা ভালো শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম।

দু' বছবের মধ্যে সবস্বতীব কোলে ছেলে এসেছে। গবিব হলেও আনন্দেব হাট বসে গেছে তখন। কেষ্টব মতিগতি অনেক ভালো হয়েছে, সে তখন প্রাণপণে বেশি উপার্জনেব বাস্তা খুঁজছে।

ছেলেটার সাত বছব বয়সেব সময় বজ্রাঘাত হয়ে গেল। কলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে কেষ্টব একটা পা একেবারে ছেঁচে গেল, একটা হাতও ভযানক জখম হল। পা-টা কেটে বাদ দিতে হল, হাতেরও খানিকটা। কলের মালিক সব-কিছু কেষ্টব দোষে হয়েছে বলে প্রমাণ কবতে চাইল। অনেক চেষ্টাব পব ক্ষতিপূবণ যেটুকু পেল তাই দিয়ে এখানকাব এই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু কবা গেছে।

...তারপব সংসার অচল। মাসের পব মাস একবেলা আধ পেটা খেয়ে থেকেছে। সবস্বতী ভদ্রলোকেব বাড়ি ঝিগিবি কবতে চাইলে কাজ মেলে। কিন্তু সব বাড়িতেই দেখা গেছে ওকে নিয়ে কিছু না কিছু গণ্ডগোল বাধছে। ওর দিকে কাবো না কাবো চোখ পড়েছে। সে-বকম লোক বাড়িতে না থাকলেও পাড়ায় আছে। পঙ্গু কেষ্টবও সন্দেহ হত সরস্বতী বুঝি ওকে ছেড়ে চলে যাবে। সবস্বতী সেই আগেব কথাই বলেছে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তোমাকে ছেড়ে গেলে ছেলেব মবা মুখ দেখতে হবে আমাকে।

অভাবে না খেয়ে মব-মব দশার সময চোলাই মদ বিক্রিব বাস্তা ধবেছে। মদ চোলাই যাবা কবে তাদেব অনেক টাকা। সবস্বতী, তার ছেলে আব এমনি অনেকেব মাবফত সে-সব কলকাতায় বা অন্যত্র চালান হয, বিক্রি হয। ওবা তাব অংশ পায। পুলিসেব হুজ্জোত হলে মালিক সামাল দেয, তখন সংসাব চালায।

সবস্বতীর আব তাব ছেলের কলকাতার খদ্দেব কযেকটি মাঝাবি নামী বাব। চোলাই মদ তাদেব কাছে বিক্রি কবে। তাবা ভালো মদের সঙ্গে সেগুলো মিশেল দেয়। প্রথম দুই-এক দফা খাঁটি মদ পেটে পড়াব পব খদ্দেব আব ভেজাল ধরতে পারে না।

কিন্তু চোলাই মদ মেশানোব বিপদ আছে। যদি বিষাক্ত হয? যদি খেযে লোক মরে যায়? সেই কাবণেই মা আর ছেলেকে জিনিস যাচাই হিসেবে প্রত্যেক দফার মাল ওদেব সামনে খেযে দেখাতে হয়। খাওয়ার পর রাত বাবোটা একটা পর্যন্ত ভিতরের কোথাও পড়ে থাকতে হয। মাল বিষাক্ত নয়, এ-ভাবে যাচাই হবার পব টাকা মেলে। সেই নিষুতি রাতে মা-ছেলে কোন রকমে হেঁটে শিয়ালদা আসে। সেখান থেকে ভোবেব প্রথম ট্রেন ধবে ঘবে ফেরে। এত সবেব পরেও অনেক ভদ্রঘবেব নেকড়েবা ওব

পিছনে লাগতে ছাড়ে না। ওর কোমবে সর্বদা একটা ধাবালো ছোরা গোঁজা থাকে। আত্মবক্ষাব জন্যেই বস্তি এলাকাব একদল ছেলে জুটিযেছে, যারা ওর থেকে সস্তায় চোলাই মদ পায, খাবাব-টাবাবও পায়। তারা ওকে দিদি বলে ডাকে। কেউ পিছনে লাগলে বা বেশি জ্বালাতন করলে সরস্বতী ওদেব লেলিযে দেয।

আমাকে দেখে কেষ্ট ফুলে ফুলে কেঁদেছে। আর সবস্বতী পায়েব ওপব থেকে মাথা তোলেই না। কেবল বলে, ভগবান আপনাকে পাঠিযেছেন সেজবাবু, আমার ছেলেটাব যা-হোক একটা ভালো কাজেব ব্যবস্থা কবে দেন, সেই টাকায় আমবা একবেলা খেযে থাকব—তা না হলে ছেলেটা আমাদেব লিভাব পচেই মরে যাবে। এখনই মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা হয।

আমি বন্ধুকে বললাম, এবার যদি সব কিছু তোমাব হিসেবেব বাইবে মনে হয় তো সবস্বতীব ছেলেটাব জন্য তুমি কিছু করবে। ইউনিযনেব মস্ত মাতব্বব তুমি, ইচ্ছে কবলেই কর্তাদেব বলে তুমি ওকে একটা বেযাবাব কাজে ঢুকিযে দিতে পাবো। ছেলেকে নিযে আমি ওকে কাল সকালে তোমার এখানে আসতে বুলেছি।... আব, ঘরে বসেও সবস্বতী কি কবে কিছু রোজগাব কবতে পাবে সে-কথাও .ভাবব বলে তাকে কথা দিযে এসেছি।

বন্ধু নির্বাক। স্তব্ধ। তাঁব স্ত্রীব চোখে জল।

সাধিকা

ভব দুপুবে সত্যিই আমাকে অত দূরেব মহাশ্মশানেব দিকে পা বাড়ানোব জন্য প্রস্তুত হতে দেখে সুবসিক শ্রী মুখোপাধ্যায ফাঁপবে পড়লেন যেন। অনেকটা নিজেব ওপরেই দোষাবোপ কবে বললেন, পাগলকে সাঁকো নাডতে নিষেধ কবে মুশকিলে পডা গেল দেখি। তাছাড়া আজও সে ব্যাটা বেঁচে আছে কিনা ঠিক কি, কতকাল আব ও-পথ মাডাইওনি দেখিওনি ওকে—

ঝোলাটা কাঁধে ফেলতে ফেলতে বললাম, লেটেস্ট খববটা আমিই আপনাকে দিতে পাবব তাহলে, দেখে আসি—

শ্রী মুখোপাধ্যাযেব অনুবাগী পাশেব প্রৌঢ ভদ্রলোকটি আমাব কানে কানে বললেন, কাঁধে আবার ঝোলা কেন, বাধু ভৃঙ্গীব হৃদয জয করাব কিছু বসদটসদও সঙ্গে নিলেন নাকি?

হেসে জবাব দিলাম, না, ওটা আমার পর্যটন-সঙ্গী...তবে আগে জানলে ভাবতাম।

সাদা কথায় ঝোলাতে সুরাব বোতল-টোতল কিছু আছে কিনা সেই ঠাট্টা করেছেন তিনি। শ্রী মুখোপাধ্যায়ও সেটা বুঝেছেন, কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে আমার খেয়ালটা নাকচ কবতে চাইলেন তিনি। বললেন, আবে বাবা সে কি এখানে, যেতে-আসতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, কি ফ্যাসাদে পড়ো ঠিক আছে, যে দিন-কাল পড়েছে—

এই স্থানে আমার পদার্পণও এক আকস্মিক খেয়ালের ব্যাপার বললে অত্যুক্তি হবে না। এসেছিলাম শান্তিনিকেতনেব পৌষ উৎসবে। বয়সের দোষে চোখের প্রসাদ আর নিভৃতেব বর্ণবৈচিত্র্য কতটা খোয়া গেছে জানি না, বহুবারের দেখা এই উৎসবের সবটাই ছকে বাঁধা আনুষ্ঠানিক মনে হচ্ছিল। আসল কথা, কবি-গুরুব চিবকিশোব রসের কাবিগবটি যে কারণেই হোক আমাব মধ্যে যে একেবারে অনুপস্থিত সেটাই অনুভব করছিলাম। দু'দিনেই হাঁপ ধবে গেছল, অথচ হাতে ঢালা অবকাশ।

ঝোলা কাঁধে বেরিযে পড়েছিলাম। স্টেশনে এসে এই লাইনেব একেবারে শেষ মাথাব এক জায়গাব টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসেছি। সেখানে আমাব এক আত্মীয থাকেন, দিনকতক তাঁব কাছে কাটিযে আসা যাবে।

কিন্তু টিকিট যেখানকাবই কাটি, সেটাই যে গন্তব্যস্থান হবে তাব কি মানে। মোটকথা আমাব গন্তব্যস্থান আমি নিজেই জানতুম না। দিগন্তছোঁযা ধানকাটা শুকনো মাঠ আব শীতেব শুকনো খাল-বিল দেখতে দেখতে দু'চোখ ক্লান্ত। দিবানিদ্রাব অভোস নেই তবু ঝিমুনি এসে গেছল।

শীতেব ছোট বেলা পড-পড তখন। এক জাযগায ট্রেনটা থামতে চোখ মেলে আর তাবপব জানলায ঝুঁকে স্টেশনেব নামটা দেখে নিতে গেলাম।

যোগাযোগ বলতে হবে। সেই মুহূর্তে আমাব গন্তব্যস্থল বদলে গেল। স্টেশনেব নামটাই হঠাৎ যেন আমাকে ঘাড ধবে টেনে নামাতে চাইল। ট্রেন বডজোব এক মিনিট দাঁডাবে, তাব মধ্যে আধ মিনিট কাবাব। ঝোলাটা টেনে নিযে ব্যস্ত সমস্তভাবে দবজাব দিকে এগোলাম। পাশেব যে বযস্ক ভদ্রলোকটিব সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আগেও গল্প কবছিলাম, আমাব কাণ্ড দেখে তিনি হাঁ। কাবণ আমাব গন্তব্যস্থান কোথায সহযাত্রীব স্বভাবগত কৌতূহলে আগেই তিনি জেনে নিযেছিলেন। কিন্তু তাব বিস্ময নিবসনেব আব সময় ছিল না। গাড়ি থেকে লাফিযে নামতেই জানলা দিযে ঝুঁকে তিনি চেঁচিযে উঠলেন, ও মশাই আপনি এখানে নামলেন যে?

জবাবদিহি কবলাম, এখানে একজনেব কথা মনে পডে গেল তাই—

এতক্ষণ কোনো পাগলেব পাল্লায পডেছিলেন কিনা ভদ্রলোকেব দুই গোল চোখে সেই সংশয। ওদিকে গাডি ততক্ষণে আবাব নডেছে। ভদ্রলোক তখনো জানলায ঝুঁকে আছেন। তাঁর মুখখানা দেখে কৌতুক বোধ কবেছিলাম বলেই সেই মুখ দৃষ্টিব আড়াল না হওযা পর্যন্ত আমি দাঁডিযেই বইলাম।

প্ল্যাটফরম ততক্ষণে ফাঁকা। অল্প কযেকজন লোক মাত্র নামা-ওঠা কবেছে। আমি যখন বেরুলাম টিকিটটা নেবার জন্য গেটে চেকাবও দাঁডিযে নেই।

স্টেশন থেকে নেমে মাটিতে পা ফেলাব সঙ্গে সঙ্গে গোটাচারেক সাইকেল-বিকশা একসঙ্গে যেন তেডে এলো আমাব দিকে। মিলিত গলায ডাকাডাকি বেযাবিষি। সেই মুহূর্তেব মধ্যেই মনস্থিব কবে ওদেব সকলের উদ্দেশেই মাথা নেড়ে সামনেব নাক-ববাবব একটি মাত্র সোজা বাস্তায পা বাড়ালাম। দু'দিকে ধানী জমিব মাঝখান দিয়ে লাল মাটিব উঁচু রাস্তা কম কবে মাইলখানেক প্রায সোজাই চলে গেছে। পথ হাবাবাব বা ভুলচুক করাব সম্ভাবনা নেই। তাবপব গাঁযে পা দিলে যাকেই জিজ্ঞাসা করব সেই

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির হদিস বাতলে দেবে। এক বছরও হয়নি শ্রী মুখোপাধ্যায় নিজেই আমাকে বলেছিলেন, স্টেশন থেকে সাইকেল রিকশয় উঠে আমার নাম কোরো, সে সোজা আমার বাড়িতে দরজায় এনে নামিয়ে দেবে তোমাকে। আর গাঁয়ে পা দিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবে সে-ই বলে দেবে।

বলা বাহুল্য যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির বাড়িতে ধূমকেতুর মতো আমি গিয়ে হাজির হতে চলেছি, ট্রেন থেকে স্টেশনের নাম দেখামাত্র এই শ্রী মুখোপাধ্যায়ের হাসি-খুশি মুখখানাই আমার মনে পড়েছে। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের নামটা অনুক্ত রাখার কারণ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আর তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের তালিকায় অন্তত ওটা সুপরিচিত নাম। তাঁর অনেক রচনা স্নাতক-পাঠ্য। তাছাড়া তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ বলতে কোনো খটমট বস্তু তাঁর গবেষণার বিষয় নয়, উল্টে বরং রসতত্ত্বের কারবারী হিসেবে তাঁর সুনাম আছে। মোট কথা বিদগ্ধ জনের কাছে তিনি জ্ঞানী এবং গুণী হিসেবে শুধু সুপরিচিত নয়, বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রও। তাই কাহিনীর মধ্যে সরাসরি তাঁর নামটা টেনে আনতে আপত্তি। আপত্তি আমার থেকেও তাঁর বেশি। আসার আগে হাসিমাখা সস্নেহ অনুযোগে বলেছিলেন, বাড়ি গিয়ে এরপর কি করবে বুঝতেই পারছি, যাই করো তাই করো তোমাদের ওই গাঁজার চমকের মধ্যে আমার হাতেই যেন কল্কেটি চাপিয়ে দিও না।

শ্রী মুখোপাধ্যায় এই বর্ধিষ্ণু গাঁয়ের এক বক্ষণশীল নামী পরিবারের মানুষ। তাঁর পিতৃপুরুষেরা নিষ্ঠাসহকারে ধর্মচর্চা করেছেন আবার নিষ্ঠাসহকারে নিজেদের জমিজমাও রক্ষা করে গেছেন। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের আমলে সেই ভিটেমাটি জমি-জমার পরিধি আরো বেড়েছে।

বছর দুই আগেও কলকাতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মাসে দুই একবার আসতেনই। নিজের বইপত্রের তদারকে আসতে হত, তত্ত্বতথ্যের গ্রন্থাদি ঘাঁটাঘাঁটির তাগিদেও আসার দরকার হত। তাছাড়া স্নেহবদ্ধ বহু শুভার্থীজনের তাগিদ তো ছিলই। বয়সের দরুন যাতায়াত ক্রমশ কমেছে। বছরখানেক হল আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। আমি তাঁর দীর্ঘদিনের স্নেহের পাত্র। ওরকম খাঁটি স্নেহ এই যুগে বিরল। চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। শেষ চিঠিতে তিনি লিখেছেন, দেহ-যন্ত্র ঢিলে-ঢালা হয়ে এসেছে, আর ছোটাছুটি পোষায় না, তাছাড়া যে দিন পড়েছে মনের অবস্থাও সর্বদা বিষ-বিষ। তোমাদের দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু নিজে না ছুটলে তো তোমাদের দেখা পাওয়া ভার।

এই চিঠিও মাস ছয়েক আগের।

...স্টেশনের নামটা চোখে পড়া মাত্র এই মানুষই দু'খানা অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে আমাকে যেন হিড়হিড় করে টেনে নামিয়েছেন।

দেয়াল-ঘেরা অনেকটা জমির মধ্যে দালান-কোঠা। টিনের গেট সরিয়ে ভিতরে ঢুকলে মাঝের রাস্তাটা চক্রাকারে বেঁকে দালানের সিঁড়ির মুখে ঠেকেছে। এই পথটুকুতে আলো নেই বটে ; তবু চাঁদের আলোয় বোঝা যায় রাস্তার একদিকে ফুলের বাগান অন্যদিকে সবজি অথবা ফলের ক্ষেত। টিনের গেট সরানোর সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে গোলাপের গন্ধের ছড়াছড়ি।

আমাকে দেখামাত্র বৃদ্ধের মুখের সেই বিস্ময় আর খুশির কারুকার্য ভুলব না। চোখের সামনে দেখেও তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

শ্রী মুখোপাধ্যায়কে এত কাছে আর এমন ঢালা অবকাশের মধ্যে আর কখনো পাইনি। নিঃসঙ্গ জীবনে আমি যেন তাঁর পরম লোভনীয় কেউ একজন। তাঁর গৃহিণী সর্বদা পুজো আর্চা নিয়ে থাকেন আর তিনি নিজের পুঁথিপত্র নিয়ে। তাঁদের দুটি ছেলেই কৃতী এবং বাইরে হোমরাচোমরা চাকুরে। এখানে তাঁর জ্ঞাতিরাই আছে জনাকতক, আর আশপাশে বয়স্ক ভক্ত আছে কিছু। এখানে আসার পরদিন সকালেই নিজের হাতে তিনি আমার বাড়িতে চিঠি লিখে জানান দিয়েছেন আমি এখানে আছি এবং দিন-কতক থাকব।

প্রথম দিন কয়েক একলা আমাকে কোথাও যেতে দেননি ভদ্রলোক। নিজে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছেন আর দূরে বেড়াবার ইচ্ছে দেখলে সাইকেল রিক্সা ডাকিয়ে আগের ভাগে তিনি ওতে চেপে বসেছেন। নিজেই আবার কৈফিয়ত করেছেন, তুমি অচেনা মানুষ, দিন-কাল ভালো নয় হে

তাঁর ভয়টা অনুমান করতে পারি। খবরের কাগজে ইদানীং এ অঞ্চলের আপদ-বিপদ সম্পর্কে কিছু লেখালিখি চলেছে কলকাতা থাকতেই লক্ষ্য করেছি।

সন্ধ্যে না হতে বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। তখন ঘরে বসে কেবল গল্প আর গল্প। গোড়ায় গোড়ায় রাত বারোটা একটাও বেজে গেছে। আমি বলেছি, আপনার শরীর খারাপ হবে যে, শুতে যান—

উনি বলেন, হুঁঃ তোমাদের আজকালকার ছেলে ছোকরার শরীর পেয়েছ।

সন্ধ্যার আসরে গৃহস্বামীর জনাকতক ভক্ত এসে যোগ দেন। একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার। এখানকার মানুষদের সুখ সুবিধে আপদ বিপদের কথাই বেশি হয়। বর্তমানের নানা সমস্যা আর সেই সমস্যার দুর্নিরীক্ষ্য সমাধান নিয়ে মাথা ঘামান। আমি নীরব শ্রোতা।

খাওয়া-দাওয়ার পর সেদিন দু'জনে মুখোমুখি গল্প করতে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, দিনকালের হাওয়া তো এই, আপনার যে এত জমি-জমা, লোকের চোখ টাটায় না?

শ্রী মুখোপাধ্যায় হেসে জবাব দিলেন, টাটানোটাই তো স্বাভাবিক, তবে আমি শুরু থেকেই কিছুটা ভাগ করে ভোগ করে আসছি বলে এখনো অনেকে সদয় আমার ওপর। এটুকুও বেশি দিন থাকবে না, আর খারাপ দিন আসছেই তার কোন ভুল নেই।

—আপনার ভয় করে না?

—ভয় করে কি লাভ, তবে অস্বস্তি হয় বটে..এত বছরের লোভের সংস্কার চট করে কাটিয়ে ওঠা তো সহজ কথা নয় রে ভাই, তা যা খারাপ ভাবনা একটু থেকেই যায়।

কারো প্রতি অভিযোগ নেই, নিজে সব ছেড়েছুড়ে দিতে পারছেন না সেটাই যেন সমস্যা। একটু বাদে অনেকটা নিজের মনেই তিনি যে কথাগুলো বললেন কান পেতে শোনার মতই। বললেন, ইংরেজ শাসন ফুরোবার ঢের আগে থেকেই এ-দেশের

মানুষ তাব নীচেব মানুষেব ওপব অত্যাচাব চালিযে এসেছে। আব পঁচিশ বছবেব. এই স্বাধীনতাব পবেও তাব বকমফেব হযনি। নীচেব মানুষ আব কতকাল নীচে পড়ে মাব খাবে বে ভাই...এখন আমবা হায হায কবলে কি হবে, যা হবাব তাই হচ্ছে।

কথায কথায নিজেব দেখা কিছু কিছু অত্যাচাবেব গল্প কবলেন তিনি, প্রতিশোধেব নেশা কেমন বক্তে এসে যায সেটাই বক্তব্য।

এই প্রসঙ্গে হঠাৎ এমন একটা গল্প মনে পডল তাঁব যাব সামান্য কাঠামোটা শুনে আমি নডেচডে সোজা হযে বসলাম। গল্পে গল্পে তখন অবশ্য আমবা দিন-কালেব সমস্যাব প্রসঙ্গ থেকে অনেকটাই সবে এসেছিলাম। গল্পই কবছিলাম আব গল্পই কবছিলাম আব গল্পই শুনছিলাম। এবই মধ্যে তাঁব ওই শোনা ঘটনাটা মনে পডে গেল। শোনা ঘটনাব পবিণামটা যে যথার্থ, তাতে কাবো সংশয নেই। কাবণ শেষেব ওই মর্মান্তিক ঘটনাব সেই বঙ্গমঞ্চ এখান থেকে মাত্র মাইল কযেক দূবেব মহাশ্মশান। ...দীর্ঘকাল আগেব সেই ব্যাপাবটা শোনাব পব বিভ্রান্ত হতচকিত হযে গেছল এখানকাব মানুষ। পবে বুকেব তলায কাঁপুনি ধবেছিল সকলেব। সে-দিনেব অনেক বৃদ্ধ আজও বেঁচে আছে, বোমহর্ষক একটা দৃশ্য অনেকে চাক্ষুষ দেখেও এসেছে। তাই ব্যাপাবটা পুবনো হযনি আজও...মহাশ্মশানেব কাপালিক বাবাব আসন শূন্য পডে আছে এখনো, মাথা ঘামাক আব না ঘামাক এ-গল্প অন্তত এখানকাব ছেলে-ছোকবাবাও জানে।

দু'যে দু'যে যোগ কবলে যেমন চাব হয, মহাশ্মশানেব ঘটনা যাঁবা দেখেছেন বা শুনেছেন তাঁবা একটা সহজ যোগসাধন কবেছেন আব তাবপব তেমনি সহজ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু শ্রী মুখোপাধ্যায় তাঁদেব থেকে একটু বেশি জেনেছিলেন, একটু বেশি বুঝেও ছিলেন। কাবণ সেই তরুণ বযসে ওই মহাশ্মশানে তিনি প্রাযই যেতেন আব তাব ফলে সেখানকাব একটি বিশেষ লোকেব সঙ্গে তাঁব হৃদ্যতা হযেছিল।

...সেই লোকেব নাম বাধু ভৃঙ্গী। শ্মশানে বাস তাব. শবদাহ কবা তাব কাজ। ওই মহাশ্মশানে আব শবদাহ হয না দীর্ঘ দিন হযে গেছে। কিন্তু বাধু ভৃঙ্গী আজও স্থান ত্যাগ কবেনি. সেখানেই ডেবা বেধে আছে। সমস্ত ঘটনাব একমাত্র সাক্ষী সে। আজও লোকটা সেই দিনেব মতই স্মৃতিব যন্ত্রণায স্তব্ধ শোকাহত কিনা শ্রী মুখোপাধ্যায জানেন না।

...সেদিনেব সেই ঘটনা আগুনেব মতো এখানে ছডিযে পডতে উনিও মহাশ্মশানে ছুটে গেছলেন। অবশ্য গাঁযে ছিলেন না বলে তাব যেতে একটু দেবি হযেছিল, তাঁব পৌঁছুতে দুপুব গডিযে বিকেল হযেছিল।...কিন্তু লোকটা ওই বাধু ভৃঙ্গী তাব সেই পাথবেব মতো বিশাল কুচকুচে কালো শবীবটা টান কবে, কোমবে দুই হাত বেখে তাব বাবাব ডেবা আব মাযেব ডেবাব মাঝেব অশ্বত্থ গাছটাব দিকে ঘাড উঁচিযে চেযে হা-হা-হা-হা শব্দে হাসছিল। অন্তবাত্মা কেঁপে ওঠে এমন হাসি। ওব সেই হাসি নাকি সকালে আবো বেশি শোনা গেছে। সকলে ধবে নিযেছিল লোকটা পাগল হয়ে গেল।

...শ্রী মুখোপাধ্যায ওকে হাসতে যেমন দেখেছেন, দুই এক দিনেব মধ্যে আবাব স্তব্ধও হতে দেখেছেন তিনি। ওব মুখ থেকেই অসংলগ্ন এমন কিছু কিছু উক্তি শুনেছেন

তিনি যে সমস্ত ব্যাপারটার কার্যকারণ তিনি অন্যভাবে দেখতে চেষ্টা করেছেন। আর তার ফলে, প্রতিশোধের নেশা রক্তে মিশলে প্রাণপাত চেষ্টা করেও তার থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় কিনা সেই সংশয় আজও কাটেনি তাঁর।

মোটামুটি ঘটনাটা শুনে আমিও স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম খানিক। কি ভেবে হঠাৎ উনি মন্তব্য করলেন, অনুমান যা-ই করি না কেন, আমার এখনো কিছু জানতে বাকি বুঝলে...ওই বাধু ব্যাটার সঙ্গেও কোনো একটা মেয়ে-টেয়ের লটঘট ব্যাপার ছিল কিছু বুঝলে...কিন্তু ওই সাংঘাতিক ঘটনার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক সেটা আজও জানি না।

উৎসুক মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, এ-রকম ভাবছেন কেন?

—লোকটাকে কঠিন পাথর বনে যেতে দেখে একদিন সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিলাম, তুই তো মরদ আছিস রে, শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়া—। ও বিড়বিড় করে জবাব দিল, শক্ত তো আছি, কিন্তুক ভাবছি..। জিজ্ঞেস করলাম, কি ভাবছিস? ও ঘোলাটে চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত পলক পড়ে না, শেষে তেমনি বিড়বিড় করে বলল, মুন্নিকে আখুন কুথা পাই? আমি অবাক হয়ে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, মুন্নি কে? যত শুধোই একটা যন্ত্রণা যেন ওর সেই গোল গোল কালো চোখ দিয়ে ঠেলে বেরুতে থাকে—তারপর বেগে গিয়ে আমাকে তেড়ে মারতে এলো প্রায়। যে ক'দিন মুন্নির কথা জিজ্ঞেস করেছি, ও ক্ষেপে উঠেছে, যাচ্ছেতাই গালাগালি করে আমাকে তাড়াতে চেয়েছে। শেষে শাসিয়েই দিল, ফের ওর কাছে এসে ঝামেলা করলে ও চেলা-কাঠ দিয়ে মেরে আমাকে জন্মের মতো ঠাণ্ডা করে দেবে।. এর পরেও গেছি অবশ্য, শেষ গেছি বছর দশেক আগে, তখন অনেক ঠাণ্ডা মানুষ, গোড়ায় ভালো করে চিনতেই পারেনি, তারপর বলেছে, বাবার আসনটা খালি পড়ে থাকল, কেউ আলো না, কেউ বসল না, উ আসন খালিই থাকল রে বাবু...।

এ পথে পা বাড়াতে পেরেছি আরও দিন চারেক পরে। আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে বাড়ীর কর্তাটি শেষে সঙ্গে লোক দিতে চাইলেন। কিন্তু আমার তাতে প্রবল আপত্তি। এতদিনে আমি এপারে অনেকটা পরিচিতি লাভ করেছি। তাছাড়া যে এলাকাটি আমার লক্ষ্য সেই জনমানবশূন্যস্থানে লোক-বসতির জটিল মানসিকতার কোনো ঢেউ গড়ায়নি। অতএব শ্রী মুখোপাধ্যায়ের যে দুশ্চিন্তার খুব একটা কারণ নেই সেটা তিনি নিজেও জানেন।

চলেছি...।

নির্জন পথে নিঃসঙ্গ চলার একটা আকর্ষণ আছে। দুই চোখ ভরাট করে করে চলার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারার আনন্দ আমার অনেকখানি রক্তে। এক কথায় সব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে থেকেও 'আমি' নামে ছোট গণ্ডীর মানুষটাকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম যে-দিকে চোখ যায়, যতদূর চোখ যায় কেবল ধান ক্ষেত আর ধান ক্ষেত। চারদিক থেকে যেন দিগন্ত ছুঁয়ে আছে। ধান কেটে নেওয়ার ফলে ধূ-ধূ বিক্ত দশা। তারই ভিতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পায়ে চলা সরু পথ ধরে চলেছি।

শীতকাল না হলে আলাদা-গোখবার ভয়ে অনেক ঘোরা-রাস্তা ধরতে হত। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট ঝোপ ঝাড় জঙ্গল। ধান ক্ষেতের সবুজের মিতালী খুইয়ে ওগুলো যেন নিঃসঙ্গ হয়ে আছে। উত্তর দিকে সরু একটা নদী। নদীটা হেজে মজে গেছে। শুনেছি বর্ষায় জল এলে এই নদীই চারদিকের চাষের জমি ভাসিয়ে দেয়। চাষীরা নাকি উপকারী বন্ধুর মতো ভাবে এই নদীটাকে। এটা আছে বলেই এখানে চাষ আবাদ আছে।

শুকনো নদী হেঁটে পার হলাম। মহাশ্মশানে পা পড়ল।

এই শ্মশানের পরিধি ভিতরে বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে। শবদাহ তো সর্বদাই নদীর ধারে হয়ে থাকে, শ্মশান ভিতরের দিকে বিস্তৃত হল কেমন করে?

...হল, কারণ এক মহাতান্ত্রিক সাধকের পদার্পণ ঘটেছিল এখানে। তিনি জনসমাগমের ধারে কাছে থাকতে চাননি। ভিতরের দিকে চলে গিয়ে মনের মত নির্জন সাধনার জায়গা বেছে নিয়েছিলেন। লোকে বলাবলি করেছে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরে মহাতান্ত্রিক নাকি তার সাধনার স্থান খুঁজে পেয়েছেন। হাজার বছরের পুরনো এই মহাশ্মশান। কিছুকাল আগে পর্যন্ত এইখানেই বহু দূরের মানুষেরও দাহ-কর্ম সম্পন্ন হত। এখন গাঁয়ের লাগোয়া শ্মশান হয়েছে, এখানে আর শবদাহ হয় না।

কিন্তু আজও মহাশ্মশান বলতে এটাই।

নদীর ধার ছেড়ে খানিকটা ভিতরের দিক ধরে এগিয়ে চলেছি। কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। এমন কি একটা শেয়াল কুকুরও চোখে পড়ল না। তাই আপন অস্তিত্ব এখানে যেন বড় বে-খাপ্পা রকমের সচেতন।

অনেকটা এগোবার পর একটা ছোট্ট জীর্ণ মন্দিরের কাঠামো চোখে পড়ল। আর ঠিক তখনি আমার সমস্ত তন্ময়তা একাগ্র হয়ে উঠল।...মন্দিরের থেকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে দুটো পর্ণকুটীরের ধ্বংসাবশেষ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ধ্বংসাবশেষ বলতে কতগুলো করে পোকায়-খাওয়া কাঠের থাম আর মাটির ভিত। মাথার ওপর চালা নেই একটারও। এতকালের ঝড়ে জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

...দুটো কুটীরের মাঝে চল্লিশ গজের মতো ফারাক। ওই দুটো ঘরের কাঠামোর মাঝে আজও সেই অশ্বত্থ গাছটা দাঁড়িয়ে—যেটার দিকে তাকিয়ে বাধু ভৃঙ্গী অট্টহাসি হেসে লোকের হাড়-পাঁজরে কাপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল।

ওই দিকেই আরো কম করে একশ গজ তফাতে আর একটা কুটীর। সেই তৃতীয় কুটীরও জীর্ণ কিন্তু এ-দুটোর মতো ভগ্নদশা নয়। মাথার ওপর চাল আছে। আমার মন বলে দিল ওটাই লক্ষ্য। ওখানে বাধু ভৃঙ্গী থাকে।...আগেও থাকত, এখনো থাকে।

কিন্তু এখানে আসার পর আমার যেন তাড়া নেই আর। হাতে যেন অঢেল সময়। স্থান মাহাত্ম্য কিনা জানি না।...একদিন এখানে লোক এসে আর নড়তে চাইত না। অনেকে রাতের পর রাত হত্যা দিয়ে পড়েও থাকত। পায়ে পায়ে আমি ওই ভগ্নজীর্ণ মন্দিরের সামনে এসে দাড়ালাম। কিন্তু মন্দির বা মন্দিরের বিগ্রহ আমার চোখ টানছে না। উৎসুক চোখে খানিক দূরের বাঁধানো বেদীটার দিকে তাকালাম। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম।...না বেদীর ওপর বাঘের বা হরিণের কোনো চামড়ার আসন বিছানো নেই। থাকার কথাও নয়।

কাবণ ওই বেদীটাই আসন। মহাতান্ত্রিক সাধকেব সহস্রমুণ্ডীব আসন।

...আচ্ছা, সোজা গিযে যদি ওটাব ওপব বসে পডি? কি হবে? কি বিপর্যয় ঘটবে? ...ভিতবটা কি সত্যিই জ্বলে যাবে? পুডে যাবে? জ্বলতে জ্বলতে পুডতে পুডতে সত্যিই কি মবণ ছোটা ছুটতে হবে আমাকেও?

যাক, আমি এখানে নাটক কবতে আসিনি, চোখেব ভোজ আব মনেব ভোজেব এক অলক্ষ্য আমন্ত্রণ আমাকে এখানে টেনে এনেছে।

.. সেই মহাতান্ত্রিক সাধক এইখানেই প্রথম সাধনায বসেছিলেন। লোকে দূব থেকে দেখত তাঁকে, কাছে আসাব সাহস ছিল না। প্রাণেব দাযে কেউ যদি কাছে আসত চোখেব আগুনে তিনি জ্যান্ত ভস্ম কবতে চাইতেন তাকে। তাতেও কাজ না হলে চিমটে নিযে তাডা কবতেন। সে-বকম দবকাব কমই হত, ভক্তব প্রাণ তাব আগেই খাঁচা-ছাডা হত প্রায। কিন্তু মাঝেমধ্যে মহাতান্ত্রিক নিজেই আসতেন নদীব ধাবে শবদাহ দেখতেন, সকৌতুকে মৃতেব আত্মীয পবিজনদেব কান্নাকাটি দেখতেন। একবাব এক অভাবিত কাণ্ড ঘটে গেল। মাযেব একমাত্র সন্তান বছব দশেকেব এক ছেলে মাবা গেছে। সেই ছেলেব মা পাগলিনীব মতো ছুটে এসেছে। কেউ তাকে ধবে বাখতে পাবছে না। শ্মশানে এসেও সে ছেলেকে আঁকডে ধবে আছে, কিছুতে নিতে দেবে না। আত্মীয পবিজনেবা নিরুপায হযেই দেহ ছিনিযে নেবাব উপক্রম কবছে।

অনতিদূবে মহাতান্ত্রিক দাডিযে দেখছিলেন। হঠাৎ চিৎকাব কবতে কবতে ছুটে এলেন। আত্মীয পবিজনদেব ধাক্কা মেবে সবিযে দিলেন। তাবপব গর্জন, ছেলেটাব দেহে প্রাণ আছে এখনো, পাষণ্ডবা তাকে চিতায দিতে যাচ্ছিস। তোবা যা, তোবা চিতায উঠগে যা।

...আধ ঘণ্টাব মধ্যেই সকলে দেখল সেই ছেলেব দেহে প্রাণ আছে বটে। এই ঘটনাব সাক্ষী কেউ নেই, কাবণ এই মহাশ্মশানে মহাতান্ত্রিকেব পদার্পণ দেডশ' বছব আগেব কথা কি তাবও বেশি কেউ বলতে পাবে না। কিন্তু সদ্যদেখা কিছুব মতই ওই সাধুব কথা আব তাব অলৌকিক ক্রিযাকলাপেব কথা আজও তাজা আছে।

যাক, তাবপব থেকেই সাধুব নির্জন বাস ঘুচে গেল প্রায। তাব বুকেব তলায যে স্নেহমাযা মমতাব ফল্গুধাবা বইছে এটা গ্রামবাসীবা টেব পেযে গেল। এবপব জ্বলন্ত চেলাকাঠ নিযে তাডা কবেও ভক্ত হটানো যেত না।

তাদেব ভিড বাডতেই থাকল, ভক্তি বাডতেই থাকল। দূব দূবান্তে সাধুব মাহাত্ম্যেব কথা ছডাতে থাকল। অলৌকিক উপাযে সাধু মানুষেব ব্যাধি দূব কবছেন, দুর্দৈব খণ্ডন কবছেন। সাধুব কৃপায বাজা মেযেমানুষও সন্তানবতী হযেছে। জমির অজন্মা ঘুচে গিযে ফসলেব জোযাব এসেছে—এমন কত তাজ্জব কাণ্ড। সাধু মুশকিলআসান।

মুগ্ধ ভক্তেব সংখ্যা বাডছেই, বাডছেই। তাবা সাধাবণ লোক, কাছেব দূবেব দশ গাঁযেব মানুষ। তাদেব উৎসাহে বিপুল টাকা সংগ্রহ হল, শ্মশানে ওই কালীমন্দিব প্রতিষ্ঠা হল। আব প্রতিষ্ঠা হল মহাতান্ত্রিকেব ওই সহস্র মুণ্ডীব আসন। তাঁব বাসেব পর্ণকুটীবও তৈবি কবে দিল তাবা। বছব ঘুবেছে অনেকগুলো। মহাতান্ত্রিক ওই সহস্রমুণ্ডীব আসনে বসেই দেহবক্ষা কবেছেন।

এবপব শ্মশান থাকল, মন্দিব থাকল, ভক্তদেব আনাগোনাও অব্যাহত থাকল কিছুকাল। কিন্তু বাবাব সহস্রমুণ্ডীব আসন শূন্য। আব সেই শূন্যতা সমস্ত মানুষেব বুকেব তলায়। কে বসবে ওই আসনে? বিভিন্ন জাযগা থেকে সাধু সন্ন্যাসীবা এসেছে, লোভে পড়ে বাবাব আসনে বসেছে। কিন্তু দু'দিনও টিকতে পাবেনি। আসন ছেড়ে উঠে পাগলেব মতো যেন মবণ ছোটা ছুটেছে তাবা। আব আর্তনাদ—জ্বলে গেলাম, জ্বলে গেলাম—পুড়ে গেলাম। সেই সব সাধুদেব গাঁযেব কোথাও দেখা যেত না আব।

যুগেব পব যুগ কেটে যাচ্ছে। আসন তেমনি ফাকা। ওটা এমনি ভীতিব কাবণ হযেছে যে আব কোনো সাধু তেজ দেখিযে ওতে বসতে চেষ্টা কবে না। খুব স্বাভাবিকভাবেই গাঁযেব মানুষেবা ওই সিদ্ধাসনেব কথা ভুলতে বসেছে।

হঠাৎ কাছে দূবেব সব গাঁযে বিষম চমক একদিন। সেই চমকেব সাক্ষী শ্রী মুখোপাধ্যায, তাব সমসাময়িক আবো অনেক বৃদ্ধ। কাতাবে কাতাবে লোক ছুটল মহাশ্মশানেব দিকে।

এত যুগ পবে মহাতান্ত্রিকেব সেই সিদ্ধাসনে এসে বসেছে এক তরুণ সাধক। খুব বেশি হলে বছব উনিশ কুড়ি হবে বযেস। একে একে তিনদিন অনাহাবে ওই তন্ত্রাসনে ধ্যানমগ্ন হযে আছে। মাথা বিগডোযনি এতটুকু, কোনোবকম তাপ উত্তাপেব চিহ্ন মাত্র নেই।

সেই তরুণ তান্ত্রিককে প্রথম আবিষ্কাব কবেছে বাধু চণ্ডাল। তাব শ্রেণীব মধ্যে সে তখন ডাকসাইটে যুবক। শ্মশানে শবদাহ কবে বটে কিন্তু স্বজাতীযদেব সঙ্গে থাকে না। দূবেব ওই পর্ণকুটীবে বাস তাব। আড়ালে সকলে বলাবলি কবে, স্বভাব চবিত্র ভালো না, বাতে মাঝে মাঝে মেযে নিযে আসে আব ভযানক নেশা কবে বলে স্বজনেব সঙ্গে থাকে না। সামনে কেউ কিছু বলে না কাবণ, লোকটাব স্বভাব যেমন দুর্দান্ত তেমনি উগ্র।

অমাবস্যাব গভীব বাত্রিতে সেই প্রথম ওই তরুণ তান্ত্রিককে সহস্রমুণ্ডীব আসনে তপোমগ্ন দেখেছে। নেশাব ঘোবে কিছু দেখেছে কিনা নিজেবই সেই সন্দেহ হযেছিল। পবপব তিনদিন তিনবাত ওই আসনে দেখেছে ওই বালক সাধুকে। ওই তিনদিন বাধু তাব কাছ থেকে নড়েইনি বলতে গেলে। কাজেও যাযনি। কাণ্ড দেখে বুকেব ভিতবে তোলপাড শুরু হযেছে তাব। নতুন বাবাকে একবাব চোখ খুলে তাকাতে পর্যন্ত দেখেনি।

তাবপব সে-ই অপবকে জানান দিযেছে। দেখতে দেখতে নতুন বাবাব কথা সর্বত্র ছড়িযে পড়েছে।

গাঁযেব মানুষ নতুন বাবা বলেই ডেকেছে সেই কিশোব তান্ত্রিককে। শ্রী মুখোপাধ্যাযও স্বচক্ষে দেখেছেন তাকে। ভযানক কৃশ দেহ, অথচ তাই থেকে সত্যিই যেন আগুনেব ছটা বেরুচ্ছে। একমাথা ঝাকড়া চুল। বযেস কুড়িব মধ্যে মনে হযেছে। কিন্তু তাবই মধ্যে বটনা শুরু হযে গেছে, বযসেব গাছ-পাথব নেই নতুন বাবাব —কাবণ সহস্রমুণ্ডীব সেই মহাতান্ত্রিকই নব দেহ ধাবণ কবে মানুষেব কল্যাণেব জন্য আবাব ওই আসনে এসে বসেছেন।

তাকে দেখে ভিতরটা খচখচ করেছিল শ্রী মুখোপাধ্যায়ের। অমন একটি নিষ্পাপ কচি মুখ আর বুঝি দেখেননি।..এ কোথা থেকে এলো এই ভীষণ শ্মশানে? কোথায় ছিল, কোন মায়ের বুক খালি করে এই পথে ছুটে বেরিয়েছে?

জবাব পাননি।

নতুন উত্তেজনায় দিন কাটতে লাগল। দিনের পর দিন মহাতান্ত্রিকের সহস্রমুণ্ডীর সিদ্ধাসনে নতুন বাবা সাধনায় নিবিষ্টচিত্তে বিকারশূন্য। একটি কথা বলে না, কারো দিকে তাকায় না। প্রায় অনাহারী।

ভক্ত-মানুষদের আনন্দ ধরে না। কত যুগের শূন্যতা ভরাট হয়ে গেছে। আপদে বিপদে তারা ছুটে যেতে পারবে কারো কাছে, কৃপার আশায় ধর্ণা দিতে পারবে। মহাতান্ত্রিকের সেই পর্ণকুটীরের স্থানেই নতুন বাবার কুটীর তৈরি করে দিল তারা। ভেট আসতে লাগল থরে থরে। ভক্তের সংখ্যা দলে দলে বাড়তে থাকল। নানা উৎসবে শ্মশান মেতে উঠল।

কিন্তু এত উৎসাহের এত মূলে যে নতুন বাবা তার কিন্তু কোন দিকে হুস নেই। অপার্থিব সাধনায় নিয়ত মগ্ন। সহস্রমুণ্ডীর আসনে উপবিষ্ট দিন-রাতের বেশির ভাগ সময়। ভেট ফেলে ছড়িয়ে একাকার করে। নিতান্ত খেয়াল হলে কিছু মুখে দেয়। আর নিতান্তই খেয়াল হলে কুটীরে এসে রাত্রি যাপন করে। নয়তো আসনে কাটায়, অথবা শ্মশানেই গড়াগড়ি দেয়।

এই নতুন বাবার প্রথম কৃপাধন্য বাধু-চণ্ডাল। ওকেই প্রথম চোখ মেলে দেখেছিল, আর ওঁর সঙ্গেই প্রথম বাক্যালাপ। প্রায়ই আর নিজের ডেরায় যেত না বাধু। সমস্ত রাত কাছাকাছি বসে থাকত। নির্নিমেষে দেখত। ঘুমিয়ে পড়লে চমকে জেগে উঠে আবার দেখত। ওর ধারণা নতুন বাবা ছদ্মবেশী মহাদেব ছাড়া আর কেউ নয়।

এমনি একটা রাতের তখন তিন প্রহর হবে বোধহয়। বাধু দেখে নতুন বাবা ওর দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে। শিউরে উঠে বাধু দুই হাত জোড় করল।

বাধু অবাক, নতুন বাবা হাসছে ওর দিকে চেয়ে।

—না খেয়ে এখানে পড়ে আছিস কেন?

সেই কণ্ঠস্বর কানে যেতে বাধুর সর্বাঙ্গে শিহরণ। জবাব দিয়ে বসল, তুমি তো ক'দিনের মধ্যে খাওনি।

নতুন বাবা আরো হাসল, বলল, তুই ব্যাটা পাজীর শিরোমণি। বলে সামনের ছড়ানো খাবার তুলে নিয়ে ওর হাতে দিল, নে খা—।

নিজেও খেল।

আনন্দে আত্মহারা বাধু বলেছে, তোমাকে আমি ঠিক চিনলাম গো, তুমি মহাদেও।

আবার সেই হাসি। – তা চিনবি না, তুই যে আমার নন্দীভৃঙ্গীর একজন...তুই ভৃঙ্গী।

সেই থেকে বাধু চণ্ডাল বাধু ভৃঙ্গী। আর তারপর থেকে ও যেন নতুন বাবাকে খাওয়াবার একটা ফিকিরও পেয়ে গেল। বাবা দু'দিন না খেলেই ও নিজেও না খেয়ে বসে থাকে। বাবা রেগে যায় আবার হাসেও। সেই হাসি দেখলে মনে হয় তিন বছরের একটা কচি ছেলে হাসছে।

তাকে শ্মশানের মাটিতে গড়াতে দেখলে কুটীরে নিয়ে যাবার জন্য বাধুর ভিতরটা ছটফট করতে থাকে। কিন্তু খাওয়াবার মতো সে-রকম কোনো বুদ্ধি মাথায় আসে না।

ছ'মাসের মধ্যে মহাশ্মশানে দ্বিতীয় চমক আবার।

দ্বিধা-দ্বিপ্রহর সেদিন। মাথার ওপর সূর্যটা আগুনের গোলার মতো জ্বলছে। পা ফেলা যায় না শ্মশানের মাটি এমন তপ্ত। শ্মশান খাঁ-খাঁ করছে, বোদ চড়ার আগে ভক্তরা বিদায় নিয়ে গেছে। সকাল থেকে সেদিন আর নতুন বাবাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখেনি কেউ। সহস্রমুণ্ডীর আসনে গত রাত্রি থেকে সমাসীন, তপোমগ্ন।

হঠাৎ নিজের কুটীরে বসে বাধুর মনে হল ওই নির্জন দুপুরে ধ্যান-নিবিষ্ট বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ। বাধু দিনমানেই ডেরায় লুকিয়ে মদ খাচ্ছিল। এখন এ জিনিসটা লবিসে চুবিয়ে খেতে হয়—বাবা টের পেলেই ধমক-ধামক করে। বাধু অবশ্য বলে, মহাদেওর ভৃঙ্গী নেশা করলে দোষ কি। প্রসন্ন থাকলে বাবা সেই কথা শুনে হাসে।

দু'চোখ ভাল করে রগড়ে নিয়ে দেখতে লাগল বাধু ভৃঙ্গী। ঠিক দেখছে না মদের ঘোরে দেখছে? কারণ বাবার সামনে এক রমণীকে দেখছে সে। এক পিঠ খোলা চুল কোমরের নীচে নেমে গেছে। পরনে থান। সোনার বরণ দুই হাত কোমরে।

রমণী অবশ্য অনেক আসে কিন্তু এই নির্জনে একলা কে আসবে? পাগল-টাগল নাকি।

নেশার পাত্র রেখে বাধু ছুটে এলো। তারপর হতভম্ব সে। রমণীই বটে। কিন্তু এমন রূপসী রমণী কি সে আর দেখেছে? তার সর্বঅঙ্গ যেন আগুনের লাল হল্কা নিয়ে তৈরি। রমণী বাবাকে দেখছে। দেখছেই দেখছেই দেখছেই। তার চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে সর্বঅঙ্গ দিয়ে যেন আগুনের তাপ ঝরছে।

অদূরে দাড়িয়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাকে দেখছে বাধু ভৃঙ্গী।

হঠাৎ এতবড় শ্মশানের স্তব্ধতা খানখান করে রমণী হেসে উঠল। খিল খিল হাসি। এমন রক্ত জল করা বেদম হাসিও বাধু আর দেখেনি বা শোনেনি। হাসছে তো হাসছেই। দুই হাত কোমরে তখনো। হাসির দমকে সেই অবস্থায় তার অঙ্গ বেঁকে চুরে যাচ্ছে।

বাধু ভাবল, এ পাগলিনী। নইলে কাঠফাটা রোদে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে কেউ হাসতে পারে না।

কিন্তু পরক্ষণে তার কথা শুনে বাধু বিষম চমকেই উঠল বুঝি। রমণী হাসছে তেমনি আর বার বার করে বলছে, আমি চিনেছি ঠিক চিনেছি, তুমি আমাকে ফাঁকি দেবে ভেবেছ? আমাকে?

আবার সেই হাসি।

বাধু নিস্পন্দ। কিন্তু যাকে দেখে রমণীর এর্ত হাসি এত উল্লাস, সেই নতুন বাবা তেমনি স্থির নিশ্চল ধ্যানমগ্ন। একবারও চোখ মেলে তাকায়নি, হাসিতে বা কথার এতটুকু রেশ কানে ঢোকেনি।

এই ব্যতিক্রমটা বমণীবও চোখে পডল যেন, মুখেব হাসি মেলাযনি, আবাব ভুরু কুঁচকে দেখতে লাগল বাবাকে। তাবপব বিডবিড কবে বলতে লাগল, চিনেছি, ঠিক চিনেছি, ঠিক ঠিক ঠিক—

বাধুব নেশা ছুটে গেছে ততক্ষণে। বুকেব ভিতবটা ঢিপ ঢিপ কবছে।

বমণীব চোখে এবাব হাসিব আগুন ঝবল। বলল, হাঁ মহাদেও—আব তুই বুঝি তাব চেলা?

সভযে মাথা নাডল বাধু। বলল, আমি ভৃঙ্গী।

আবাব এক পশলা হাসি। হাসিব শেষে বাবাব দিকে ফিবল। বাবা তেমনি তপোনিবিষ্ট। বমণী ভুরু কুঁচকে এবাবে একটু বিস্ময়ভবেই দেখতে লাগল তাকে।

নতুন বাবাকে চিনেছে শুনেই আব পাগল-টাগল ভাবাব সাহস নেই বাধুব। সভযে জিজ্ঞাসা কবল, তুমি কে আছ গো মা?

—আমি? আমি কে দেখেও চিনতে পাবছিস না হাঁদা কোথাকাবেব। জ্বল-জ্বল মুখখানা বাবাব দিকে যেবালো আবাব।—হ্যা বে, তোব মহাদেওব চোখ-কান সব আছে তো, না-কি খেযে বসে আছে?

বাধু হাঁ কবে চেযে বইল তাব দিকে।

বিকেলেব মধ্যে এক গাঁ ছেডে তিন গাঁযে বটে গেল ব্যাপাবটা। তাবপব আবো দূবে দূবে। দলে দলে লোক ছুটল মহাশ্মশানেব দিকে। এই বিচিত্র বমণীব আগুনেব মত রূপ দেখে নির্বাক, তাব উচ্ছল হাসি দেখে ত্রস্ত, কথা শুনে হতভম্ব। তাকে দেখাব আগে সাধাবণ মানুষেব ঔৎসুক্য একবকম, আবাব দেখাব পবে অন্যবকম। দেখাব পবে বসালো মন্তব্য কবতে বা জটিল কিছু ভাবতে ভয।

বাবাব বিশেষ স্নেহেব পাত্র হিসেবে বাধু ভৃঙ্গীব তখন ভক্তদর্শকদেব কাছে বিশেষ প্রতিপত্তি। বাবাব সঙ্গ নিযে আছে অতএব তাব মতামত ফেলনা নয। তাব মন্তব্য নতুন শ্মশানচাবিণী কোনো মহাযোগিনী না হযে যায না। নইলে এসেই বাবাকে চেনে কি কবে, অমন কবে হাসে কি কবে, অমন সব কথা বলে কি কবে?...এই ওই বাবাব খেলা কি ওপব থেকে বাবাব বাবাব খেলা কে জানে! মাযেব দিকে তাকালে আমাব তো হাডে কাঁপুনি ধবে গো বাবুবা।

তিন দিনেব মধ্যেও ওই অদ্ভুত বমণী যখন মহাশ্মশান ছেডে নডল না সকলে ধবেই নিল এখানে থাকবে বলেই এসেছে। নতুন বাবা তাকে দেখে একটুও অবাক হযনি, তাব সম্পর্কে ভালো-মন্দ কোন কথাই বলেনি, তাকে থাকতেও বলেনি তাডিযেও দেযনি। নতুন বাবা নির্বিকাব। দু'দুটো বাত যুবতী বমণীকে শ্মশানে খোলা আকাশেব নীচে কাটাতে দেখে তৃতীয বাতেব দ্বিতীয যামে নতুন বাবা আঙ্গুলেব ইশাবায বাধুকে নিজেব পর্ণকুটীব দেখিযে দিযেছে অর্থাৎ একে ওইখানে গিযে থাকতে বলো।

বাবাব ইঙ্গিত বুঝে মা-টি নাকি তাব মুখেব ওপবেই সেই প্রথম দিনেব মতো খিল খিল কবে হেসে উঠেছিল। তাবপব সত্যিই বিনা দ্বিধায বাবাব কুটীবে গেছে বাধুব সঙ্গে। বাধুব জ্বালানী কাঠেব আলোয সকৌতুকে ঘবটা দেখেছে, তাবপব বলেছে, খাসা ঘব, আমাব জন্যেও এমনি একটা ঘব তুলে দিস তো। তাবপব বলেছে, যা

পালা এখন, দু'বাত্তির না ঘুমিয়ে আমার বেজায় ঘুম পেয়েছিল সেটা তোর মহাদেও বাবা বুঝেছে দেখছি।

এই বিচিত্র রমণী যে মহাসাধিকা কোনো তাতে আর কারো সন্দেহ থাকল না। নইলে এই বয়সে এমন রূপ যৌবন নিয়ে সমস্ত ভয়-ডর বিসর্জন দিয়ে এভাবে কেউ শ্মশানবাসিনী হতে পারে?

গাঁয়ের মানুষেরা তাঁর নাম দিয়েছে রামাসাধিকা। শুনে এই রমণী নিজেই হেসে বাঁচে না। বলে, রামা তো বটে কিন্তু সাধিকা আবার কি রে মুখপোড়ারা।

ভক্তরা তোড়জোড় করে অশ্বত্থ গাছটার ওপাশে রামাসাধিকার পর্ণকুটীর তুলে দিয়েছে। সেই কুটীর দেখে সাধিকার আনন্দ ধরে না।

যত দিন গেছে একটা ধারণা বাধ্য বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। বাবার সেবার তরেই সাধিকা-মা এখানে এসে শ্মশানবাসিনী হয়েছে। হয়তো এই সেবাটাই তার আসল সাধনা। বাবা যেন ছোট ছেলে একটা। তার ওপর মায়ের হম্বি-তম্বি ধমক-ধামক পর্যন্ত চলে। অবশ্য বাবা যখন সহস্রমুণ্ডীর আসনে বসে একেবারে পাথর হয়ে থাকে, তখন ওই মা'টি কি-চ্ছু বলে না, কোনরকম ব্যাঘাত ঘটায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাবার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে, কখনো কখনো আবার আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। যোগিনীর তখন যেন এক ভয়ংকর রকমের স্তব্ধ রূপ। কিন্তু বাবা যখন ধ্যানমগ্ন নয়, তখনই মায়ের ইচ্ছে মতো সেবাশাসন চলে তার ওপর। খাবার সাজিয়ে তাকে টেনে এনে খেতে বসায়, এক এক রাতে হিড়হিড় করে কুটীরে টেনে খড়ের বিছানায় শুইয়ে দেয়। যা মুখে আসে তাই বলে বকাবকি করে।

কিন্তু বাবা সেই রবাররকার মতো শান্ত প্রসন্ন নির্লিপ্ত।

..শ্রী মুখোপাধ্যায় রামাসাধিকাকে এই মহাশ্মশানে প্রথম পদার্পণের পরেও দেখেছেন আবার বছর পাঁচেক বাদেও দেখেছেন। আর তার মাঝেও বার কয়েক দেখেছেন। না তার রূপ সম্পর্কে কেউ অতিশয়োক্তি করেনি। কিন্তু শ্রী মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব ধারণা রমণীটি অপ্রকৃতিস্থ। বাধ্য সঙ্গে কথা বলে বলে ধারণার অনুকূলে তিনি কিছু রসদও সংগ্রহ করেছিলেন। তাছাড়া, সে-রকম কোনো মানসিক বিপর্যয় না ঘটলে এই বয়সের আর এই রূপের বিপদ নিয়ে আত্মীয় পরিজনের আওতা ছেড়ে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে না। প্রথম যখন দেখেছিলেন তাকে, তখন বছর চব্বিশ বয়েস মনে হয়েছিল। অর্থাৎ নতুন বাবার থেকেও বছর চারেকের বড় হবে। পাঁচ বছর বাদে সেই শীর্ণ কৃশ নতুন বাবার শিখা-দীপ্ত অবয়বে ভরা যৌবনের স্পষ্ট রূপান্তর দেখেছেন—যদিও তখন সে আগের থেকেও কঠিন তপোনিবিষ্ট, আগের থেকেও বেশি শান্ত প্রসন্ন নির্লিপ্ত। কিন্তু শ্রী মুখোপাধ্যায়ের অবাক লেগেছিল পাঁচ বছর বাদেও সেই রূপসী সাধিকাকে দেখে। তার যেন একটা দিনও বয়স বাড়েনি, সেই জ্বলন্ত যৌবন কি-যেন এক জাদুর শেকলে বাধা পড়ে গেছে। বরং চোখের বিভ্রম কিনা শ্রী মুখোপাধ্যায় জানেন না, পাঁচ বছর বাদে রামাসাধিকাকে যেন ওই নতুন বাবার থেকেও বয়সে ছোট মনে হয়েছে একটু। আর শ্রী মুখোপাধ্যায় আমাকে বলেছেন, সাধিকার স্থির রূপই দেখেছেন বটে তিনি—কিন্তু তাঁর ধারণা সেই রূপ ভয়ংকর অস্থিরও হয়ে উঠতে

পাবে, আব তাব আলো কবা রূপেব শিখাই দেখেছেন বটে তিনি—তবু মনে হয়েছে ওই শিখা কখনো বুঝি দাউ দাউ কবে জ্বলে উঠতেও পাবে। অবশ্য, গোড়া থেকেই বমণীটিকে অপ্রকৃতিস্থ বলে ধবে নিয়েছিলেন বলেই এই গোছেব ধাবণা তাঁব মনে আসাটা বিচিত্র নয়, এ-কথাও স্বীকাব কবেছেন।

লোকটা বাইবেব কাঁচা মাটিব দাওযাব একটা কাঠেব থামে ঠেস দিযে বসেছিল। খালি গা, কুচকুচে কালো বঙ, পবনে হাঁটুব ওপব তোলা বিবর্ণ খাটো ধুতি। মাথাব ঝাঁকড়া চুল এখনো কালোব দিক ঘেষা। তেলজলেব অভাবে লালচে দেখাচ্ছিল। দাড়িব বোঝা গাল বেযে বুকে এসে ঠেকেছে। সেই দাড়ি অবশ্য কাঁচা পাকাব মিশেল। সোজা হযে বসে মুখ তুলে আমাব দিকে তাকালো যখন, দেখলাম চুল-দাড়িতে একাকাব মূর্তি একখানা।

বললাম, একটু জল খাওয়াতে পাবো বাধু, অনেক পথ বোদে হেঁটে বড় তেষ্টা পেযে গেছে।

পবিচিতেব মতো নাম ধবে কথা বলতে শুনে ও ফ্যালফ্যাল কবে চেযে বইল খানিক। ছোট্ট চোখ, কিন্তু লক্ষ্য কবলাম চাউনিতে যেন জবাব ছোযা লাগেনি খুব বেশি।

কোন কথা না বলে উঠল। বিশাল একটা কাঠামোয প্রাণবস্তু সক্রিয হতে সময লাগল একটু। দাঁড়াবাব পব বোঝা গেল দাওযায ঝুঁকে বসেছিল না, ওব ওই অতবড দেহটাই সামনেব দিকে বেঁকে গেছে একটু। বযসেব ভাবে আব হযতো বা অনশনে অর্ধাশনে মোটা মোটা হাড়েব ওপব কালো চামড়া ঝুলে পড়েছে।

এগোতে গিযেও দাঁড়াল আবাব। বলল, আমি জেতে চণ্ডাল—

ঝোলাটা কাধ থেকে নামাতে নামাতে আমি দাওযাব ওপব বসে পড়লাম। হেসে বললাম, তুমি মহাশ্মশানেব শ্মশানবন্ধু, তোমাব আবাব জাত কি গো! জল দাও, তৃষ্ণায ছাতি ফেটে গেল।

ও তাড়াতাড়ি ভিতবে চলে গেল। একটু বাদে ওব গাযেব বঙেব মতই একটা কুচকুচে কালো পাথবেব গেলাসে জল আব শালপাতায একটা বড বাতাসা এনে সামনে বাখল। কোথাকাব জল, কি জল, খাওযা উচিত কিনা পথে বেরুলে এ-সব নিযে আমাব খুঁতখুঁতুনি নেই। কালো পাথবেব গেলাস হাতে নিযে খুশি মুখে বললাম, বাঃ, তুমি পাথবেব গেলাসে জল খাও নাকি, কোথায পেলে?

—আমি খাই না, ওটা ঘবে ছেল। বলতে বলতে শতখানেক গজ দূবেব ওই দুটো কুটিবেব ধ্বংসাবশেষেব দিকে দৃষ্টি ঘুবে গেল ওব। আমাব মনে হল, কযেক নিমেষেব জন্য বিমনাও হযে গেল। তাবপব চোখ ফিরিযে আস্তে আস্তে আমাব দিকে তাকালো আবাব।—জল খেযে নাও, কোথা পেলাম উ খোঁজে কাজ কি?

জল, বাতাসা খেযে স্বস্তিব নিশ্বাস ফেললাম।—তুমি বোসো বাধু, দাঁড়িযে কেন?

আমাব মুখেব ওপব ওব ছোট ছোট চোখ দুটো নড়েচড়ে বেড়াতে লাগল। ওই থামে ঠেস দিযেই মুখোমুখি বসল আবাব।—আমাব নাম তোমাকে কে বলে দেল?

শ্রী মুখোপাধ্যাযেব নাম বলে দিলাম। জিজ্ঞাসা কবলাম, চিনলে?

ও চুল-দাড়ি বোঝাই মাথা নাড়ল। চিনল না।

গাঁযেব নাম কবতেও চিনল না, চেহাবাব বর্ণনা দিতেও না। হঠাৎ ওকে একটা বে-পবোযা ধাক্কা দেবাব মতলব এলো আমাব। বললাম, তোমাব কাছে সে প্রাযই আসতো গো, তুমি তাকে খুব মান্যি কবতে, তাব কাছে সেই নতুন বাবা আব বামাসাধিকাব গল্প কবতে—আব তাঁকেই শুধু একদিন তোমাব মুন্নিব কথা বলেছিলে, জিজ্ঞেস কবেছিলে, মুন্নিকে এখন কোথায় পাই?. মনে পড়ছে?

দু'চোখেব জবা ঠেলে ঠেলে ও আমাকে দেখতে লাগল। সন্দিগ্ধ, কুটিল চাউনি। স্পষ্টই বোঝা গেল শ্রী মুখোপাধ্যাযকে এবাবে চিনেছে। কিন্তু ওই কালো মুখ সদয নয একটুও।—তুমি উ ঠাকুবেব ছাওযালি বটে?

—ছেলে নয, ছেলেব মতো, আব ছেলেব থেকেও বেশি। কলকাতায থাকি, ওঁব কাছে এসেছি। তোমাব গল্প শুনে তোমাকে না দেখে থাকা গেল না—

ছোট ছোট দুই চোখ চিকচিক কবছে, কিছুটা বিস্ময়ে সংশযে।

—তুমি এত পথ আলে আমাকে দেখতে?

হাসিমুখে বিশ্বাসযোগ্যভাবে মাথা নাড়লাম। কিন্তু বাধুব মুখভাব ক্রমে যেন বিবক্তিতে ছেযে যেতে থাকল। ও যেন বুঝেছে আমি ওব শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছি।

জিজ্ঞেস কবলাম, তোমাব বযস কত হল বাধু?

বিড়বিড় কবে জবাব দিল, কে জানে, দু'তিন কুড়ি হবে—

আমাব হাসি পেযে গেল, দু' কুড়ি আব তিন কুড়ি ওব কাছে কাছাকাছি ব্যাপাব। শ্রী মুখোপাধ্যাযেব থেকে কিছু ছোট হলেও ওব বযেস সাড়ে তিন কুড়ি অর্থাৎ সত্তবেব কম নয।

আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কবে ও দূবেব ধান ক্ষেতেব দিকে চেযে বইল। মনে মনে ও আমাকে এখন বিদেয কবতেই চাইছে। আমি নাছোড়বান্দাব মতো বললাম, এতদূব থেকে এলাম তোমাকে দেখতে, তোমাব কথা শুনতে, আব তুমি মুখ ফিবিযে বইলে?

—দেখা তো হ'ল...

—কিন্তু কথা তো হল না।

আবাব সেই বিবক্তি, আব চোখেব তাবায সংশয।—আমি কি ভদ্দবলোক যে তোমাব সঙতে হুড়হুড় কবে কথাটি ক'ব—

জবাব দিলাম, ভদ্রলোকেব কথা শুনতে হলে তো সেখানেই যেতাম, এই বোদে এত পথ তেতেপুড়ে তোমাব কাছে আসব কেন?

এবাবে গলাব স্ববও কর্কশ ওব।—তুমি কে বটে? ইখেনে কেন আসলে?

আমিও গলাব স্বব একটু চড়িযে জবাব দিলাম, এক্ষুণি তো শুনলে কে—আব কেন এসেছি সেটা না বুঝলে তুমি বেগে যাচ্ছ কেন?

ছোট ছোট দু'চোখ পাকিয়ে ও চেয়ে রইল। ওর চোখে চোখ রেখে আমি একটু জোরেই হেসে বললাম, দেখো বাধু, মুখুজ্জেমশাইকে মানে সেই ঠাকুরকে তুমি চেলা-কাঠ নিয়ে তাড়া করেছিলে শুনেছি, কিন্তু তুমি বাগই করো আর যাই করো এখন তোমার সে-বয়েস আছে না সেই জোর আছে?

নেই যে, সেই খেদও ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠছে। তাই গলার সুর নরম করে বললাম, তবে সত্যিই যদি তুমি মনে ব্যথা পাও তো সে আলাদা কথা, বলো—চলে যাই।...কিন্তু সত্যিই বড় লোভ নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম বাধু ভৃঙ্গী, ভেবেছিলাম এখন তো তোমারও বয়েস হয়েছে, মনের কথা মনের মধ্যে পুষে রেখে কত কাল ধরে একটা যন্ত্রণা ভোগ করছ—কিন্তু এখন এ-বয়সে তোমার আর লজ্জা-ভয় নেই, রাগ-ঘৃণা নেই—এখন তুমিই হয়তো সব কথা বলে ওই যন্ত্রণা হাল্কা করার জন্য কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। আমি তোমার সেই লোক হতে এসেছিলাম বাধু ভৃঙ্গী...এখন দেখছি ওই যন্ত্রণা বুকে চেপে মরে ভূত হয়ে এখানেই তুমি ঘুরঘুর করবে।

না, এবারে আর রাগ নয়, বিরক্তি নয়, কি একটা ভয় যেন জমাট বাঁধতে থাকল ওর ওই ছোট ছোট চোখে। একটু বাদে বিড়বিড় করে শুধালো, বুক হাল্কা না হলে মুক্তি হয় না বাবু?

ওর ভয় দেখে কেন যেন আমার কষ্ট হল। ও-রকম না বললেই ভালো হত যেন। অভয় দেবার মতো করেই জবাব দিলাম, ও একটা কথার কথা বললাম, কি করে মুক্তি হয় আমিই কি জানি?...তবে শেষ বয়সে লোকে সব কিছুর মায়া কাটিয়ে হাল্কা হতে চেষ্টা করে শুনি, তোমারই বা আর কিসের সংকোচ। তাছাড়া এত বছর ধরে এ-ভাবে কাটিয়ে তুমি তো একটা খাঁটি মানুষ হয়েই গেছ—ক'জন পারে এতকাল এ-ভাবে কাটাতে।

বুড়ো বাধু ভৃঙ্গী যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল আস্তে আস্তে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে দাড়ি ভরতি থুতনিটা ঘষতে লাগল। ও যেন অনেক দূরের কিছু দেখছে আর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। বলল, না গো বাবু, আমি একটো শয়তান আমি একটো ডাকু...বাবার আসনে আর কেউ বসল না, মুক্তির লেগে আমি শুধু বসেই থাকলাম...কেউ আসল না রে বাবু।

—ওই বসে থেকে থেকেই তোমার মুক্তি হয়ে গেছে বাধু, ভগবানের মতো মানুষ না থাকুক, ভগবান তো আছেন—তিনিই তো সব দেখলেন সব বুঝলেন, মানুষ না-ই বা এলো।

কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করল। নির্বোধ অথচ ব্যাকুল চাউনি। শেষে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তুক উ আসনের তাহলে কি হবে?

সান্ত্বনা দেবার মতো করে জবাব দিলাম, সময় হলে ভগবান পাঠাবেন কাউকে, বেঁচে যদি থাকি তখন না হয় তাঁকে এসে তোমার কথা বলে যাব...একটা লোক কতকাল ওই আসনের মালিকের আশায় শ্মশান আগলে বসেছিল সেই কথা—

নিজেই হেসে ফেললাম। ওরও কালো বিমর্ষ মুখে এবারে যেন একটু হাসির আভাস দেখা গেল। মন্তব্য করল তুমি বেশ লোক বাবু...।

খানিকক্ষণের জন্য আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে এলাম। এখানে ওর খাওয়া-দাওয়া সংগ্রহ কোথা থেকে, খাবার জল পায় কোথায়, বর্ষার সময় জায়গাটার কি অবস্থা দাঁড়ায়, দারুণ শীতের সময়েই বা এই খোলা জায়গায় কি করে কাটায়, গাঁয়ের লোকালয়ে কখনো যায় কিনা, ইত্যাদি খুঁটিনাটি ব্যাপারে দস্তুরমতো আগ্রহ দেখালাম।

বাধু ভঙ্গী টুকটাক জবাব দিতে লাগল। এই আলাপের মধ্যেই ও যেন একটু একটু করে সহজ হতে লাগল।

আলাপের মোড় ফিরিয়ে উৎসুক আগ্রহে প্রায় আচমকা জিজ্ঞাসা করে বসলাম, আচ্ছা বাধু, মুখুজ্জেমশায়ের কাছে শুনেছি তোমাদের সেই বামাসাধিকার নাকি এমন রূপ ছিল যে চোখ ফেরানো যেত না, সত্যি নাকি?

ওর দু'চোখ যেন আমার মুখের ওপর হোঁচট খেল একপ্রস্থ। কৃতকৃত করে চেয়ে রইল, কিন্তু আগের মতো বিরক্ত নয়।

—দেখো বাধু, এখন তুমি দিব্যি বুড়ো হয়েছো, আর তোমাদের সেই সাধিকা মা বেঁচে থাকলেও এতদিনে সে থুত্থুড়ি বুড়ি হয়ে যেত—আর হেসে হেসে নাতির বয়সী ছেলেদের কাছে নিজেই হয়তো নিজের রূপের কথা গল্প করত। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখনো যেন তুমি তোমার সেই বয়সের মধ্যেই আটকে আছ।

শুনল মন দিয়ে, মাথা নেড়ে সায় দিল।—তাই হইনছে গো বাবু, ওই কালের মধ্যেই আটকে গেলম, তুমি আমাকে টেনে বার করতে লেগেছ...।

টেনে বার করছি সেটা যেন ওর মন্দ লাগছে না এখন। আমার সাগ্রহ প্রতীক্ষাটুকু ও ঠিকই অনুভব করল বোধহয়। আস্তে আস্তে জবাব দিল, সে কেমন রূপ তুমি ভাবতে পারবে না গো বাবু..দূরে নদীর ধারে যখন চিতা জ্বলত আমি মায়ের মুখের পানে চেয়ে চেয়ে দেখতম, আমার চোখে মায়ের রূপের আগ চিতার আগুনের পানা লাগত, কিন্তুক চিতার আগুনের মতো গিলতে আসত না—হেসে হেসে মা সেই আগুন যেন জলে ভিজিয়ে দেত গো বাবু!

ওর বক্তব্য বোঝা গেল। উপমাটুকু অদ্ভুত ভালো লাগল কানে। হাসিভেজানো রূপের আগুনের উপমা আর কখনো শুনিনি।

দ্বিধা কাটিয়ে পাপ কবুল করার মতো করেই একটু বাদে বাধু ভঙ্গী আবার বলল, আমি একটো শয়তান দুশমন ছিলম..খুব খারাপ ছিলম...খুব খারাপ ছিলম, উ মায়ের দিকে আমার চোখ লাগত, কামি ভুলতম, দিশা ফিরলে তখন শয়তানের টুঁটি ছিঁড়তে লাগতম আর নিজের চোখ তুলে আনার জন্যি ঘরপানে ছুটে যেতম...কিন্তুক চোখ গেলে মা-কে দেখতি পারনি, বাবার সেবা করতে পারনি, তখুন তো জেবন যাবে। শেষে কেবল মা-মা মা-মা করতে লাগলম, আর মায়ের কাছে আলে ছোট বাচ্চার পানা কেবল মা-মা মা-মা করতম।

আমি কান পেতে শুনছি। সর্বক্ষণ কথায় কথায় ওই মা-মা শুনে সাধিকা নাকি এক-একসময় রেগে গিয়ে ভেঙচি কাটত, বলত, কেবল মা-মা করে কান ঝালাপালা করিস কেন, মা-কি তোর মরেছে—সামনে দেখতে পাচ্ছিস না।

ওর মুখ দেখে নাকি সেই রাগের মুখেই আবার হাসি ঝরত। বলত, কি রকাত আমার, সব খুইয়ে শেষে কিনা এক চণ্ডাল ছেলে...।

বাধুর মোট বক্তব্য, মায়ের এমনই রূপ যে বহুদিন কেবল মা-মা করে বিবেকের চাবুক হেনে তবে তার পাপ চক্ষু ঠাণ্ডা করতে হয়েছে। অথচ প্রথম দেখার দিন থেকেই ওই মা-কে সে যেমন ভয় করত তেমনি ভক্তি শ্রদ্ধা করত।

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের ভয়ে সেদিন আর দেরি না করে উঠে পড়তে হয়েছে। এরপর হয়তো শ্মশানেই লোক পাঠিয়ে বসবেন তিনি। বাধুকে বলেছি, কাল আবার আসব।

আপত্তি তো করেইনি, মুখে যেন একটু নীরব আগ্রহ দেখেছিলাম ওর। পরদিন এসেছি। তার পরের দিনও। কাধের ঝোলাতে ওর জন্যে কিছু খাবার এনেছিলাম। সেগুলো দেখে খুশি যেন ওর মুখ বেয়ে দাড়ি চুঁইয়ে পড়েছে। কতকাল ও ভালো খাবার চোখেও দেখেনি মনে হতে ভিতরটা আমার কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠেছিল।

তৃতীয় দিন আরো বেশি খাবারের সঙ্গে চাল-ডাল তরি-তরিকারিও এনেছিলাম একটা মুটের মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে। সেই সব দেখে তো ওর ছোট চোখ জোড়া গোল একেবারে। পয়সা দিয়ে মুটে বিদেয় করে দেখি ওর সেই চোখে জল টল-টল করছে। হাত ধরে আমাকে দাওয়ায় বসিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, তুমি কেতো ভালো গো বাবু, কেতো ভালো.

বললাম, থাম তো বাপু, তুমি নিজে যে কতো ভালো তুমি নিজেও জানো না

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা যেন বিগড়ে গেল। ছোট চোখ ঘোরালো করে তাকালো আমার দিকে। তারপর ধমকেই উঠল যেন, তোমাকে বললম না আমি ভালো না—আমি শয়তান আমি, দুশমন—উ এক কথা আর কেতো বার বলব?

—আচ্ছা বাবা হয়েছে, আমার তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা, অমন শয়তান একটা করে সকলের মধ্যেই থাকে সে তুমি না বুঝলে আর কি করা যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে ওই তপ্ত কালো মুখই বিষণ্ন আবার। আমার ওপর ও-ভাবে ঝাঁঝিয়ে ওঠার দরুন হতে পারে আবার কোনো স্মৃতির দংশনের জন্যেও হতে পারে। একটু বাদে ঝাঁকড়া চুল-দাড়ি বোঝাই মাথা-মুখ ডাইনে-বাঁয়ে নেড়ে ক্লান্ত সুরে বলল, না গো বাবু না, তুমি জানো না আমি খুব খারাপ দুশমন..আমার লেগেই মহাশ্মশান খালি হইন গেল, আমার লেগে উ হামার মুণ্ডার আসন খালি হইন গেল, আর আমার লেগে মা সবকুছুতে আগ লাগায়ে দেল—

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছি। যে প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, বুঝতে পারলে ওই বৃদ্ধের বুকে নতুন করে আঘাত পড়বে একটা জেনেও সেই মুহূর্তে অন্তত অকরুণ আমি।—তুমি ঠিক বলছ যা হয়েছে সব তোমার জন্যে? আর কারো কারণ নেই? তুমি তোমার ওই মায়ের নামে শপথ করে বলতে পারো?

বাধু ভঙ্গী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল খানিক। আচমকা এই প্রশ্নটা বোধের অতীত যেন।

আরো স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার জন্যে সব গেছে, সব নষ্ট হয়েছে —সেটা তোমার ঢের ঢের পরের চিন্তা, নাকি সেই ভয়ংকর দিনেও তোমার এই কথাই মনে হয়েছিল, এই অনুশোচনা হয়েছিল?

এবার যেন একটু অস্বস্তিবোধ করছে ও। আমি কিন্তু তেমনিই অকরুণ।—তোমার জন্যেই যদি সব নষ্ট হয়ে থাকে তো সেই দিন ওই অশ্বত্থ গাছের দিকে চেয়ে কেবল গলা ফাটিয়ে হেসেই চলেছিলে কেন? আর কেন তারপর তোমার মুন্নির জন্যে হাহাকার করে উঠেছিলে?

বাধু ভঙ্গী স্থাণুর মতো বসে। অসহায় দৃষ্টি। দীর্ঘ দিনের একটা শোক আর অনুশোচনার আশ্রয় থেকেও যেন ওকে টেনে বার করে আনা হল।

আবার সেই একই প্রশ্ন করলাম আমি, এবারে ভেবে বলো—যা হয়েছে সব তোমার জন্যেই হয়েছে? আর কোনো কারণ নেই? এ-কথা তুমি তোমার ওই মায়ের নামে শপথ করে বলতে পারো?

অনেকক্ষণ বাদে বাধু ভঙ্গী আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে। বলতে পারে না। মর্মছেঁড়া সত্যি করুণ করার মতো করে যা বলল তার সারমর্ম, ওই নয়া বাবার ওপর বামাসাধিকা প্রতিশোধ নিয়েছে, পুরনো হিংসার মোকাবিলা করেছে...বাধু সেটা আগে বুঝতে পারেনি, সব শেষ হয়ে যাবার পরে বুঝেছে। কিন্তু তবু সব কিছুর জন্য বাধু নিজেকে দায়ী করে কারণ সমস্ত সর্বনাশের সে উপলক্ষ—ওর আর মুন্নির জন্যই শেষ পর্যন্ত সাধিকার শিরার রক্তে পুরনো হিংসার আগুন জ্বলল...নইলে সাধিকা সেটা ভুলতে চেষ্টা করেছিল, ভুলতে চেয়েছিল, নয়া বাবার সেবা করে হিংসা ক্ষয় করতে চেয়েছিল, ক্ষয় করছিল।

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের মুখে শোনা কাহিনীর কাঠামোর সঙ্গে এবারে মিলছে। প্রতিশোধের নেশা কেমন করে রক্তের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে সেই আলোচনার প্রসঙ্গ থেকেই তার এই কাহিনীর সূত্রপাত। কাহিনীটা নিজের কাছেই অসম্পূর্ণ মনে হয়েছিল শ্রী মুখোপাধ্যায়ের। কারণ সেখানে বাধু ভঙ্গীর ভূমিকাটি অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু রোমহর্ষক সেই সংঘাতে বাধুর সেই ভূমিকা প্রায় অবিচ্ছেদ্য বলা যেতে পারে।

...বাধু ভঙ্গীকে যুক্ত করে শ্রী মুখোপাধ্যায়ের কাহিনীর চিত্রটি এবারে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে।

...মহাশ্মশানের সেই মুখর দিনে নতুন বাবা আশপাশের দশ গাঁয়ের মানুষের হৃদয় মন জয় করে বসেছিল বললেও বেশি বলা হবে না। ওই বয়সের অমন নির্লোভ স্থিতধী তাপস আর বুঝি দেখেনি কেউ। আর এক বছর যেতে অমন তাপসের কিনা গার্জেন হয়ে বসল বামাসাধিকা। তার কি শক্তি কম? গাঁয়ের মানুষেরা আদ্যাশক্তির জাগ্রত অংশ ভাবত তাকে। সব থেকে বেশি ভাবত বাধু নিজে।

শ্মশানগত ভক্তদের কাছে বামাসাধিকা মায়ের মতই সরল তরল, অন্য দিকে অগ্নিস্তব্ধ তেজের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। বাধুর এক-একসময় মনে হত ওই মায়ের কল্যাণেই হয়ত সমস্ত দেশের মানুষ একদিন এই মহাশ্মশানে এসে নয়া বাবার পায়ে ধন্না দেবে। মায়ের এমনি তেজ এমনি আকর্ষণীয় শক্তি।

ভাবেব আবেগে কথায কথায বাধু মা-কে একদিন সে-কথা বলেও ফেলেছিল। শুনে বামাসাধিকা হেসে বাঁচে না। বলেছিল, তোব মহাদেও বাবা তো ওই অশ্বত্থ গাছটাব মতো একটা কাঠেব গুঁড়ি—গাছটা তবু ডালপালা ছড়ায ছাযা দেয, তোব বাবাব কাছে এসে ধন্না দিযে কে কি পাবে?

বাধু বাগ কবে পাল্টা জবাব দিযেছিল, যাব ভাগ্যে আছে সে পাবে—তুমি পাচ্ছ কি পাচ্ছ না?

ও-কথা শুনেও মাযেব সে-কি হাসি। তাবপব বলেছিল, আমি পেতে এসেছি তোকে কে বলল বে?

শুনে বাধু থতমত খেযেছিল। মনে হযেছিল সাধিকা মা হযতো বাবাকে প্রতিষ্ঠা কবে দিযে যেতেই এসেছে এখানে।

কিন্তু বাবাকে কাঠেব গুঁড়ি বললেও তাব ওপব বামাসাধিকাব প্রতিপত্তি কিন্তু দিব্যি বাড়ছিল। নযা বাবা সহস্রমুণ্ডীব আসনে সাধনায বসে থাকে যতক্ষণ, ততক্ষণ অবশ্য কাঠেব গুঁড়িই বসে। নিশ্চল দেহটা শুধু আসনে বসে থাকে, তিনি যে কোথায চলে যান কে জানে। কিন্তু অন্য সময বাবাব ওপব মাযেব শাসন আব হম্বিতম্বি লেগেই আছে। বযসে অবশ্য নযা বাবা মাযেব থেকে চাব বছবেব ছোট কিন্তু অমন মহাযোগীকে কে আব বযেস দিযে বিচাব কবে? কিন্তু মাযেব কাছে বাবা যেন ছোট্ট ছেলে একটা, যেমন কবে খুশি নাড়বে-চাড়বে খাওযাবে বসাবে ঘুম পাড়াবে। কথাব অবাধ্য হলে বাগে আব তেজে বাবাকে যেন ভস্ম কবে ফেলবে একেবাবে। মাযেব সেই বাগ আব সেই তেজ আব সেই ধক-ধকে চাউনি দেখে বাধুব কতদিন যে হৃৎকম্প হযেছে ঠিক নেই। আব কি নিযে যে মা হঠাৎ বাবাব ওপব বেগে যেত বাধু বেশিবভাগ সময তাও ঠাওব কবে উঠতে পাবত না।

..বাবা যখন তাব আসনে ধ্যানে বসে তখন মাযেব মুখ সেলাই একেবাবে। এক-একদিন এমন কবে চেযে থাকত দূবে বসে যে বাধুব অবাক লাগত। কত দিন দেখেছে, মাযেব চোখে পলক পড়ে না, চেযেই আছে চেযেই আছে। সে এক অদ্ভুত চাউনি।

বাধু কতদিন জিজ্ঞেস কবেছে, বাবাব দিকে চেযে চেযে তুমি কি দেখ?

মা বেশিবভাগ দিনই হেসেছে, কিন্তু একদিন জবাব দিযেছিল, বলেছিল, দেখে দেখে নিজেব বুকেব তলায আগুন নেভাই বে—নেভাতে চেষ্টা কবি কিন্তু সে কি সহজে নেভে বে।

বাধু চমকে উঠেছিল। অস্বস্তিব একশেষ তাবপব।...মা কোন আগুনেব কথা বলছে? বাসনাব আগুন? তক্ষুনি সবোষে নিজেব কান মলেছে নাক মলেছে বাধু। হযতো ভগবান দেখাব বাসনা মাযেব, তাকে না দেখতে পেযে মাযেব বুক জ্বলছে —তাই মানুষেব মধ্যে ভগবানকে দেখে মা জ্বালা জুড়োয। তাই হবে, তাছাড়া আব কি হতে পাবে।

একবাতে বাধুব জ্বব হযেছিল বেশ। এই শবীবে জ্বরজ্বালা হত না বড, তাই একটু কাহিল হযে পড়েছিল। ঘব ছেড়ে বেবোযনি। বাত্রিতে বামাসাধিকা এলো ওকে দেখতে। মাথায গাযে পিঠে হাত বুলিযে দিল। বাধুব মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ দেবী এসে ওব জ্বালা যন্ত্রণা দূব কবে দিচ্ছে।

একটু বাত হতে বামাসাধিকা চঞ্চল হযে উঠল। বলল, যাই, এতক্ষণে আসনে বসে গেছে বোধহয...।

বাবা আসনে বসলেই মাযেব সেখানে ওঠা চাই, বসে বসে অমনি অপলক চোখে তাকে দেখা চাই।

বাধু সেই পুবনো আব্দাব ধবল, তুমি কি দেখো মা, বলো না?

মা বিবক্ত মুখ কবে জবাব দিল, বলেছি না দেখি না, নিজেকে ভুলি।

—কি ভোলো? বাধুব এত আগ্রহ কাবণ তাবও বুকেব তলায অনেক পাপ আব অনেক যন্ত্রণা।...মুন্নি ওকে বাবাব কাছ থেকে কেড়ে নেবে বলে শাসিযেছে। কিন্তু মা-কে তো সে-সব বলা যায না।

মা জবাব দেযনি। বাবা আসনে বসে গেছে, তাব আব সময নেই। কিন্তু আধ ঘণ্টাব মধ্যেই আবাব ফিবে এলো। বলল, আজ আসনে বসবে না, তাই তোব কাছেই চলে এলাম।

কিন্তু বাধুব মনে হল মাযেব মুখখানা বাগে গনগন কবছে। বাগলে অত ফর্সা মুখেব আলতা-গোলা বঙ হযে যায। বাধু নিঃসংশয, নিশ্চয বাবাব সঙ্গে ঝগড়া কবে এসেছে। বাবা তো ঝগড়া কবাব মানুষ নয, মা বকা-ঝকা কবলেও কেবল হাসে।

মা হঠাৎ তপ্ত মুখে জিজ্ঞেস কবে বসল, হ্যাঁ বে, পাজীব পা-ঝাড়া—কে একটা খাবাপ মেযেমানুষ নাকি তোব মাথাটা চিবিযে খাচ্ছে?

শোনামাত্র বাধুব দিশেহাবা অবস্থা। মাটি দু'ফাক হলে তাব মধ্যে ঢুকে বাঁচে। কিন্তু একটু বাদে ভিতবে ভিতবে অবাক ও। মা কি এই নিযে বাবাব সঙ্গে ঝগড়া কবে এলো নাকি।

বাধু অন্য দিকে মুখ ফিবিযে আছে, কিন্তু বুকেব ভিতবটা ঠকঠক কবে কাঁপছে ওব।

সেই বকম ঝাঝে মা আবাব শুধিযেছে, বজ্জাত মেযেটাব সোযামী আছে না?

মুখ না ফিবিযেই বাধু ভযে ভযে মাথা নেড়েছে।—ছেল, অখুন নাই—গেল বাবে সাপে কেটেছে।

—ও, নিশ্চিন্ত হযে শযতানী এখন বুঝি তোব কাঁধে ভব কবেছে।

মা যত তপ্ত সুবেই কথা বলুক, বাধুব কেমন বদ্ধ ধাবণা নযা বাবাব সঙ্গে মা ওব হযে ঝগড়া কবে এসেছে। মবিযা হযেই বলে বসল, মুন্নিব বাপেব অত্যাচাবে আব সোযামীব অত্যাচাবে ওদেব দু'জনেব এই হাল হযেছে—বাপটা শযতান আব সোযামীটাও শযতান ছিল, অবশ্য মুন্নিও পাজী খুব সেটা ও অস্বীকাব কবে না, কিন্তু ওব মবদটা অমন বদমাস না হলেও কথা ছিল, ওকে সাপে না কাটলে ও বাধুব হাতেই মবত একদিন।...মুন্নিকে ও একদিন বাঘ দিযে খাওযাবাব জন্য বাতে জঙ্গলে ছেড়ে দিযে এসেছিল। বাপটা তিনবাব বিযে কবেছে, কিন্তু মুন্নিকে ধবে ঠেঙাষ এখনো, ও অমন বাপেব কাছে থাকবে কেন? বাধুব বক্তব্য অমন অত্যাচাব মা কল্পনাও কবতে পাববে না।

অত্যাচারের ওপর একটু বেশি জোর দিয়ে বলার বিশেষ একটা কারণ আছে। কেউ কারো ওপর অত্যাচার করেছে শুনলেই মায়ের মেজাজ বিগড়ে যায়, চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে আগুন ছোটে। কত লোক তো কত রকমের আরজি আর সমস্যা নিয়ে আসে এখানে। অত্যাচারী বাপের হাত থেকে স্বামীর হাত থেকে শাশুড়ীর হাত থেকে অব্যাহতি লাভের আশায়ও কত মেয়ে বউ ছুটে আসে এখানে। মা তুকতাকের ধার দিয়েও যায় না—সেই সব অত্যাচারীদের লোক দিয়ে ডেকে পাঠায়, মা ডাকলে না এসে পারে কি করে, ছুটেই আসতে হয়। তারপর মায়ের সেই মূর্তি দেখে আর শাসানি শুনে তাদের মরণদশা যেন একেবারে—যোগিনীর কোপ থেকে বাচার আশায় মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদে, নাকে খত দেয় আর ক্ষমা চায়।

অত্যাচারের কথা শুনে সেদিন কিন্তু মায়ের মুখে ওই গোছের কোপ দেখা গেল না। বরং যেন বিমনা হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর অনেকটা নিজের মনেই বলল, মা স্বচক্ষে যেমন অত্যাচার দেখেছে তেমনও বোধহয় কেউ দেখেনি।

শোনার আগ্রহে বাধু উন্মুখ তক্ষুনি।

মেজাজ ভালো থাকলে মা অনেক সময় ওর সঙ্গে অনেক রকমের গল্প করত। কত দেশ ঘুরেছে, কত জায়গায় কত লোকের কত রকমের কাণ্ডকারখানা দেখেছে এই সব। আজও চট করেই মায়ের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে গেল কি করে জানে না। খেয়ালের বশে বেশ সহজ মুখেই একটা অত্যাচারের গল্প বলে গেল।

শোনার পর বাধু স্তব্ধ।

এই কাহিনী শ্রী মুখোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন। সব নিঃশেষ হয়ে যাবার পর এই চিত্রটা তিনিও বাধুর কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন।

...বছর সতেরর একটি বউ। তার রূপের খ্যাতি গ্রাম ছাড়িয়ে শহরেরও অনেক জায়গায় পৌঁছেছিল। গরিব বাপের মেয়ে, কিন্তু অমন মেয়ে ঘরে নেবার জন্য অনেক বড়লোকের দূত ওই গরিব বাপের কাছে আনাগোনা করত। কিন্তু বাপের পছন্দ তারই মতো গরিব ঘরের এক দুর্দান্ত ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই বাপের ভারী পছন্দ ওই ছেলেকে।

..সেই ছেলের সঙ্গেই রূপসী মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে গেল না, বিপদের আঁচ পেয়ে সেই দুরন্ত ছেলে ওই মেয়েকে যেন ছিনিয়ে নিয়ে বিয়ে করে বসল।

সেই বিয়েই কাল হল।

মেয়ের সংসারে সেই দুরন্ত স্বামী আর তার বিধবা মা। বিত্ত না থাকলেও সুখের সংসারই হবার কথা। হয়েওছিল।

কিন্তু যে-ভূস্বামী দু'টির প্রজা ওই ছেলে আর তার মা—তারা নির্দয়, নৃশংস মানুষ। সেই ভূস্বামীরা দুই ভাই—প্রজাদের তারা দণ্ডমুণ্ডের মালিক। দু'জনেই অত্যাচারী, তবে বড় ভাই আরো বেশি। ছোট ভাই তার পাপের ফল হাতে-নাতে পেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তার একটি কন্দর্প-কান্তি ছেলে—বছর তেরো সবে বয়েস—জঙ্গলের ধারের কোন এক সাধু তাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডেকে নেয়—তারপর তিন দিনের মধ্যে

আর সেই ছেলের পাত্তা নেই। ওর বাপ ছেলের শোকে পাগলের মতো হয়ে গেল। তিন দিন বাদে ছেলে ফিরল—কিন্তু একেবারে আর এক ছেলে যেন। এর আগে থেকেই অবশ্য ছেলেটার অন্যরকম মতি-গতি ছিল, বংশের অন্য ছেলেদের থেকে একেবারে ভিন্ন ধাতের—কোথাও পূজা-আর্চা-যজ্ঞ-টজ্ঞ দেখলেই স্থানকাল ভুলে একেবারে নিবিষ্ট হয়ে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে দেখত। সেই ছেলে ফিরে এসে বাপ-মাকেও ভালো করে চেনে না—বিড়বিড় করে অষ্টপ্রহর কি নাম করে, হাসে কাঁদে, সর্বদাই কি যেন খোঁজে আর বাড়ির আবহাওয়া থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়। সকলে ধরে নিয়েছে অমন সোনার চাঁদ ছেলেটাকে সাধু পাগল করে দিয়েছে। বাপ চিকিৎসা করে হন্যে হয়েও ছেলেকে সারিয়ে তুলতে পারেনি।

অন্যদিকে বড় ভাই অর্থাৎ ভূস্বামীরও এক ছেলে আর গোটাকতক মেয়ে। বাইশ বছর বয়েস না পেরুতে ছেলেটা লম্পট হয়ে উঠল। তার বাপ ওই রূপসী মেয়ের বাপের কাছে ছেলের জন্য তার মেয়েকে চেয়ে বসল। কোথায় অমন ঘরে মেয়ে দিতে পেরে গরীব বাপ আকাশের চাদ হাতে পাবে, তার বদলে দ্বিধা দেখে বড় ভূস্বামীর ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠল। স্পষ্ট শাসিয়ে গেল তার ছেলের হাতে মেয়ে না দিলে বিপদ হবে।

মেয়ের বাপ সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখল। কিন্তু তার পছন্দের সেই দুঃসাহসী ছেলে রুখে উঠল। ঠিক দু'দিন বাদে বিয়ের তারিখ ছিল। সে মেয়ের বাপকে জানিয়ে দিল ওই দিনই বিয়ে হবে—কোনো ব্যবস্থার দরকার নেই, মেয়েকে শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে দিলেই হবে।

জনাকতক বন্ধু আর পুরুত নিয়ে সে যথাসময়ে উপস্থিত। বাধ্য হয়েই মেয়ের বাপ তার হাতে মেয়ে সপে দিল।

খবরটা কানে যাওয়া মাত্র বড় ভূস্বামীর রক্তে যেন আগুন লাগল। মেয়ের বাপ তার অবাধ্য হয়নি শুধু, তার সব থেকে চক্ষুশূল এক ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ঘায়ের ওপর নুনের ছিটে যেন এটা। ওই ছেলে এরই মধ্যে বারকয়েক তার প্রজা ক্ষেপিয়েছে। এখন কিনা এতবড় শত্রুতা!

মেয়ের বাপকে ছেড়ে আসল কাটা উচ্ছেদে মনোযোগী হলো সে। মেয়ের বাপ তো চুনো-পুঁটি, যখন খুশি শেষ করে দিতে পারে।

প্রথম এক-দফা ওই ছেলের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা রুজু করে তাকে নাজেহাল করা হল। তারপরে তাকে ডেকে সোজা শাসিয়ে দেওয়া হল, জমির মালিক যে-ভাবেই হোক তার জমি দখল করবেই, বাড়াবাড়ি না করে যে যেন এই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

জবাবে সেই ছেলে ফুঁসে উঠল। মুখের ওপর অপমানকর কথা শুনিয়ে দিল তাকে।

সোজাসুজি সংঘাত শুরু হল সেই থেকে। দিন বদলের হাওয়া বইতে শুরু করেছে তখন। দেশের বহু জায়গায় ভূস্বামীদের অস্তিত্ব বিলোপের জিগির উঠেছে। সাধারণ মানুষও দল পাকিয়ে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহ করছে—তাদের অত্যাচারের প্রতিবাদে

মুখর হয়ে উঠছে।...ওই দুঃসাহসী ছেলেও সেই সময় গাঁয়ের বহু তরুণকে বড় ভূস্বামীটির বিরুদ্ধে দস্তুরমতো তাতিয়ে তুলছিল। তার যে-কোনো কাজ অন্যায় মনে করলে দল বেঁধে সব রুখে উঠতে শুরু করেছে।

বড় ভূস্বামীর সহ্যের সীমা ছাড়ালো। বিয়ের ছ'মাস না যেতে সেই অসীম সাহসী ছেলেকে শুধু গ্রাম ছেড়ে নয়, দুনিয়া ছেড়েই চলে যেতে হল। বড় নৃশংস মৃত্যু। এক সাঁঝের আঁধারে জংলা ভূমির ধারে মৃত্যু ঘাপটি মেরে বসেছিল, জানত না। সেই পথ দিয়েই আসছিল, বাড়ি মাত্র তিন মিনিটের পথ। আচমকা দু' তিনটে লোহার ডাণ্ডার আঘাতে কপাল মাথা ফেটে চৌচির।

কিন্তু সেই অবস্থাতেও ছেলে তীরের মতো ছুটে বাড়ির দাওয়ায় এসে আছড়ে পড়েছে। দাওয়া রক্তে ভেসে গেছে. মরার আগে সেই ছেলে শুধু চিৎকার করে বলেছে, এর শোধ নিও, ক্ষমা কোরো না।

বিধবা মা আর্তনাদ করে উঠেছেন, পাগলের মতো হাতে করেই ছেলের রক্ত মুছে দিতে চেয়েছেন, তারপর সেই রক্তাক্ত হাতে নিজের বুক চাপড়েছেন, ক্ষিপ্ত আক্রোশে পাথর-মূর্তি কচি বউটাকে টেনে এনে তার কপালে সেই রক্তাক্ত হাত দিয়ে আঘাত করেছেন, আর সজোরে চিৎকার করেছেন, শুনলি—ও কি বলে গেল শুনলি? আমার কপাল ভেঙেছে তোর কপাল ভেঙেছে—এর প্রতিশোধ আমরা নেব নেব নেব—ওদের সব রক্ত শুষে নেব, ওদের সর্বনাশ করব। আয় আয় শীগগির।

উন্মাদিনীর মতো কপালে রক্তমাখা বউয়ের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে পথে বেরিয়েছেন। কেউ তাদের বাধা দিতে পারেনি। সোজা সেই ভূস্বামীদের বাড়ির অন্দরে ঢুকে পড়েছেন।

ঘরে সেই দুই ভাই-ই ছিল, আর সেই ছোট ভাইয়ের সেই চাদ-পানা ছেলে, সাধু যাকে অকালে ধর্মের পথে এগিয়ে দিয়ে পাগল করেছে বলে সকলের বিশ্বাস। আরো ছিল কেউ কেউ।

—কোথায়, কোথায় সেই শয়তান আমি একবার দেখে যাই। উন্মাদিনী বিধবা মা বউয়ের হাত ধরে সকলকে স্তব্ধ বিমূঢ় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। দু' ভাইকে একসঙ্গে দেখে হিংস্র উল্লাসে চিৎকার করে উঠেছেন, এই যে পিশাচের দল, তোমাদের লোক আমার ছেলেকে হত্যা করতে পেরেছে, এ খবর তোমরা পাওনি এখনো? এই দেখো ছেলের রক্তে চান করে আমরাই তোমাকে খবরটা দিতে এসেছি। ছেলে বলে গেছে শোধ নিতে. আমরা শোধ নেব নেব নেব। যদি চন্দ্র সূর্য্য সত্যি হয়, যদি আমরা সতী মায়ের মেয়ে হই—তোমাদের সর্বনাশ কেউ ঠেকাতে পারবে না, কেউ না। তোমাদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না, কেউ না।

হঠাৎ কচি গলার আর্তনাদ কানে আসতে সচকিত সকলেই। চাঁদ-মুখ তের বছরের সেই ছেলেটা কপালে রক্ত মাখা বউয়ের দিকে চেয়েছিল, সে-ই আচমকা এই আর্তনাদ করে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার বাপ ধরে নিল এই বীভৎস ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠে ছেলেটা অন্যত্র পালালো।

সেই উন্মাদিনী বিধবা মা তাই দেখে বীভৎসভাবে হেসে উঠল, ও বুঝেছে ওদের সকলকে খাব আমরা, তাই পালালো—কিন্তু যাবে কোথায়, কেউ রক্ষা পাবে না, আমাদের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই।

আসল অপরাধী যে, সে-পর্যন্ত এই দৃশ্য দেখে আর এই অভিসম্পাত শুনে ভয়ে কাঠ কয়েক মুহূর্ত। তারপর অবশ্য দরোয়ান দিয়ে ওই উন্মাদিনী আর তার ছেলের বউকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে।

সকলের বিশ্বাস, বিধবা মায়ের সেই অভিসম্পাত ওই রাত থেকেই ফলতে শুরু করেছে। কারণ, ছোট ভূস্বামীর সেই যে ধর্ম-পাগল ছেলেটা আর্তনাদ করে ঘর ছেড়ে ছুটে পালিয়েছিল তার সন্ধান আর মেলেনি। আসলে ছেলেটা বাড়ি থেকেই ছুটে বেরিয়ে গেছল। সমস্ত লোকের মনোযোগ সেই উন্মাদিনী মায়ের দিকে ছিল বলে কেউ লক্ষ্য করেনি। ক'দিন ধরে দশ বিশখানা গ্রাম তোলপাড় করেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পুত্রশোকাতুরা উন্মাদিনী বিধবা আর একটা দিনও সুস্থ হয়নি। যতদিন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে ফেলতে পেরেছে, ওই ভূস্বামীদের ওই এক অভিসম্পাত করে গেছে। তার পুত্রবধূ গরিব বাপের সেই রূপসী মেয়েও আধ-পাগল। কারো সঙ্গে একটি কথাও বলে না, দিবারাত্র কেবল হাতে করে নিজের কপাল মোছে। কিন্তু তার ধারণা কপাল থেকে রক্তের দাগ আর কিছুতে উঠছে না।

তিনমাস না যেতে বড় ভূস্বামীর সেই লম্পট ছেলের বাসনা এই রূপসী বউকে কেন্দ্র করে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। দিবারাত্র তাকে এই বাড়ির কাছাকাছি ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়। যে বউ সমস্তক্ষণ বোবা সে শুধু ওই লম্পটকে দেখলেই চেঁচিয়ে ওঠে, সময় ঘনিয়েছে, কাল ঘনিয়েছে, বোসো।

অবাক কাণ্ড, সত্যিই তার কাল ঘনালো। তিনদিন আগে মাত্র পুত্রশোকাতুরা সেই উন্মাদিনী মা হৃদরোগে আচমকা চোখ বুজেছেন। ঠিক তিনদিন বাদে খুব সকালে দেখা গেছে বড় ভূস্বামীর সেই লম্পট ছেলের মৃতদেহ দু'মাইল দূরের একটা পুকুরে ভাসছে। তার দু'হাত দু'পা শক্ত করে বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা।

অনেকেরই মনে মনে ধারণা ওই রূপসী বউয়ের স্বামীর অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের কাজ এটা। এই নির্মম প্রতিশোধ তারাই নিয়েছে।

আর সেই রাতের পর থেকেই ওই রূপসী বউকে গাঁয়ের মানুষ আর দেখেনি। কোনদিনও দেখেনি।

মায়ের মুখে ওই অত্যাচারের গল্প শুনেই বাধু স্তব্ধ, কারণ তার অন্তরাত্মাসুদ্ধ বলে উঠেছে এই বামাসাধিকাই সেই রূপসী বউ। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরে কাঁপুনি তার।...ওই নয়া বাবা তাহলে কে? ছোট ভূস্বামীর সেই ছেলে—কানে মন্ত্র দিয়ে সাধু যাকে অকালে ধর্মপাগল করে দিয়েছিল? যত ভেবেছে বাধুর কাঁপুনি বেড়েছে। বামাসাধিকা প্রথমদিন বেলা দ্বিপ্রহরে এই মহাশ্মশানে এসে যে-ভাবে দাঁড়িয়ে আসনে সমাসীন বাবাকে দেখছিল—সেই দৃশ্য মনে পড়তেই কাঁপুনি বেড়েছিল। এমন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল যে সেই প্রথম দেখা আগুন-পানা মেয়েছেলেকে পাগলই

মনে হয়েছিল।...আর এখনো মা যে-ভাবে এক-একসময় বাবাকে দেখে চেয়ে চেয়ে —তাও কেমন স্বাভাবিক মনে হয় না বাধুর।

ভয়ে ভয়ে এ-প্রসঙ্গ মায়ের কাছে আর কোনদিন তোলেনি বাধু। সে কেবলই ভাবতে চেষ্টা করেছে, আগের পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামানো মিথ্যে—তাদের নয়া বাবা মহাযোগী, আর মাসাধিকা মহাযোগিনী।

বিপদের সূত্রপাত বাধুকে নিয়েই। সে নিজেই স্বীকার করেছে তার স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল না। ওর দুটো নেশা ছিল। মদ আর মুন্না। কিন্তু মুন্নাকে পেলে মদের দরকার হত না। শুধু ওই মেয়ের জন্যেই নদীর ধার ছেড়ে, সগোত্রদের ছেড়ে এই দূরে এসে ডেরা বেঁধেছিল সে। মহাশ্মশানের এই নির্জনে রাত-দুপুরে বিরক্ত করতে আসবে এত বুকের পাটা ওর স্বজাতীয়দেরও নেই।

শুধু মুন্নাই আসত। একেবারে নির্ভয়ে আসত। অমন বুকের পাটাও বোধহয় কোনো মেয়েমানুষের হয়না। মুন্নার বাপ মানুষটা যেমন ক্রূর তেমনি লোভী। বাধুকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারতনা। পারবে কেন, বাধু যে কোনদিন তার হুকুমের পরোয়া করত না —সর্বদা বুক চিতিয়ে চলত। আবার ঠিক সেই কারণে মুন্না ওকে সক্কলের থেকে বেশি পছন্দ করত। ওর চোখে বাধুই একমাত্র মরদ। মুন্নার গায়ের রং সামান্য তামাটে। আর ঘাগরা পরা চৌদ্দ বছরের সেই মেয়ের পাথরে কোঁদা নিটোল স্বাস্থ্য দেখলে পুরুষগুলোর চোখে ঘোর লাগত। তার ওপর গায়ের ওই রঙের বাড়তি কদর। ...ষোল বছর বয়সে একরাশ টাকা গুনে নিয়ে বাপ ওকে চুলের ঝুঁটি ধরে একটা বদমাসের হাতে সঁপে দিল। বাধু তখন মুন্নার বাপকে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল-—মাতব্বরকে এভাবে অপমান করার দরুন তাঁরেদার স্বজাতীয়রা ওকে প্রায় বর্জনই করেছিল।

দু'বছর বাদে মুন্নার শয়তান স্বামীটাকে সাপে কাটতে মুন্নার হাড়ে বাতাস লেগেছিল। ওদিকে বাপও আবার মেয়ের ওপর দখল পেয়ে খুশি। আবার কারো কাছে মেয়ে বেচে মোটা দাঁও মারবে।

কিন্তু মেয়েও কম নয়, বাপের হাত থেকে বাঁচার রাস্তা সেই বার করল মাথা খাটিয়ে। ওর ওপর প্রেত ভর করল। ভর যে করবে বাধুকে ও সেটা আগেই জানিয়ে রেখেছিল। সারাক্ষণ আলুথালু বিকট মূর্তি মুন্নার কোনো পুরুষ মানুষ কাছে আসতে চাইলেই সে তাকে মারতে ছোটে। নেচে কুঁদে একাকার কাণ্ড করে। চার পাঁচটা জোয়ান মানুষও তখন ধরে রাখতে পারে না ওকে।

মুন্নার বাপও ঘাবড়ে গেল। দু'তিনটে ওঝা প্রেত ছাড়াতে এসে উল্টে নাজেহাল হয়ে ফিরে গেল। অবশ্য মুন্নারও হেনস্থা কম হলনা। ঝাঁটার পিটুনি খেয়ে তার সর্বাঙ্গ দাগড়া হয়ে গেল। মার খেয়ে ঝিম মেরে থাকে, আবার ফাঁক পেলেই ওই গুণীনদের টুঁটি কামড়ে ধরতে আসে। এক গুণীনের তো প্রাণান্ত দশাই করে ছেড়েছিল।

শেষে দূর থেকে এক বড় গুণীন এলো। বলা বাহুল্য এটা রাধুর কারসাজি। আসলে সে গুণীন-টুনিন কিছুই নয়। বাধুর মোটা টাকা খেয়ে সে গুণীন হয়ে এসেছে।

রোগের ফয়সলা করে দিলে মুন্নার বাপের কাছ থেকেও কিছু প্রাপ্তির আশা। মনের মত কাজ হলে বাধু তো প্রতিশ্রুতির টাকা কড়া-ক্রান্তিতে গুনে দেবেই।

সেই বড় গুণীন প্রথমে খুব ঘটা করেই চেষ্টা করল প্রেত ছাড়াতে। তারপর তার মুখ ভয়াল গম্ভীর। মুন্নার বাপকে কাছে ডেকে জানালো, মুন্নার স্বামীর প্রেত ভর করেছে ওর ওপর—সে-ই তার বহুকে আগলে রেখেছে। বহুর সামনে পুরুষ মানুষ দেখলেই সেই প্রেত ক্ষেপে যায়। এই মেয়েকে যে বিয়ে করবে এখন ওই প্রেত তার ঘাড় মটকাবেই। এখন একমাত্র পথ মেয়ের জন্য ডেরার কাছাকাছি একটা আলাদা ঘর তুলে দেওয়া। সেদিকে কোনো পুরুষ মানুষ ঘেষবে না। আর রাতে পুরুষ বা মেয়ে কেউ না। ধরে নিতে হবে মেয়ে এখনো তার স্বামীর ঘর করছে।

মুন্নার বাপ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, কতদিন এভাবে চলবে?

বড় গুণীন জবাব দিয়েছে, এক বছর কি দু'বছর কি তিন বছর কেউ বলতে পারবে না। মুন্না অর্থাৎ ওই প্রেতকে যত বিরক্ত করা হবে ততো অমঙ্গল। এক সময় সে নিজে থেকেই মুন্নাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। পুরোপুরি যেদিন ছাড়বে, ওই প্রেত নিজেই তার ডেরার এক দিক ভেঙে দিয়ে চলে যাবে।

অবিশ্বাস কেউ করেনি, কারণ অবিশ্বাসের কোনো পথ মুন্না রাখেনি। মাস দেড় সে ঠাণ্ডাভাবে কাটালো, সন্ধ্যার পর কোনো পুরুষকে ঘরের কাছাকাছি দেখলে তখন সে তার টুঁটি কামড়ে নিতে ছোটে। ওর বাপকেও ছেড়ে কথা কয় না।

তারপর থেকে ওদের নৈশ অভিসার ভালই চলছিল। বিশেষ করে কৃষ্ণপক্ষের আধার রাতে। অন্ধকারে মিশে মুন্না চলে যেত বাধুর ডেরায়—অনেকটা পথ, কিন্তু মুন্নার ভয় ডর কিছু ছিল না। ভোর হবার ঢের আগেই আবার ফিরে আসত। আর তখন থেকেই টাকা জমাবার চেষ্টায় মন দিয়েছে বাধু। হাতে কিছু জমলেই সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মুন্নাকে নিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে পালাবে।

সুখেই দিন যাচ্ছিল।

.সব ওলট পালট হয়ে গেল ওই নয়া বাবা এসে এখানে সহস্রমুণ্ডীর আসন পেতে বসতে। ওই ছোকরা সাধু যেন রাতারাতি বশ করে ফেলল ওকে। নিজের চোখে বাধু নয়া বাবার এমন সব তাজ্জব কাণ্ড দেখল যে মুন্না গোপনে তার ডেরায় এলে ওর কাঁপুনি ধরে। মুন্নার আসাই একরকম বন্ধ করে দিল বাধু। ফলে মুন্না আরো নয়া বাবার ওপর বিরূপ।

ওকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যেও বটে আবার প্রবৃত্তির তাড়নায়ও বটে, এর থেকে ব্যবস্থাটা উল্টে গেল। সুযোগ পেলেই বাধুই রাতের আধারে মুন্নার ডেরায় যায়। না, ভয় ডর তখন ওরও লেশমাত্র নেই। অতবড় বাবার চেলা হয়ে বসেছে, ও ভয় করবে কাকে? ভয় একমাত্র ওই নয়া বাবাকেই। গোড়ায় গোড়ায় মুন্নার ডেরা থেকে রাতের শেষ প্রহরে বা তার আগেই কাঁপতে কাঁপতে ফিরত। কিন্তু ভয়টা ক্রমে ক্রমে কমে আসতে লাগল। মুন্নাকেও অন্যরকম আশ্বাস দেবার সুযোগ মিলল, ভক্তদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা খাবার-দাবারের ভেট যা আসে নয়া বাবা তো সেদিকে ফিরেও

তাকায না। অতএব টাকা আবো অনেক আগেই জমবে, আব ওদেবও পালানোব সুবিধে হবে। মুন্নাব জন্য ভালো ভালো খাবাবও সঙ্গে নিযে যায সে।

...কিন্তু মুন্নাব প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও এখান থেকে বাবাকে ছেডে চলে যাওযাব ইচ্ছেটা যে ক্রমেই কমে আসছে, সে-কথা ওকে মুখ ফুটে বলতে পাবে না।

দ্বিতীয় দফা গণ্ডগোলেব ব্যাপাব হযে গেল মহাশ্মশানে বামাসাধিকাব পদার্পণেব পব। সেই সঙ্গে বাধুব ভিতবটাবও আব এক প্রস্থ ওলট পালট। মুন্নাব কাছে যাওযাব সুযোগ ওব আগে থেকে কমে গেল। প্রবৃত্তিব অন্ধ তাডনা যখন অসহ্য মনে হয তখনি শুধু চোবেব মতো চুপিচুপি যায। কিন্তু এবই ফলে আবাব মুন্নাব সঙ্গে খটাখটি লাগে, ঝগডা-ঝাঁটি হযে যায। বেশি বাগলে মুন্না শাসায ও-ই যাবে বাধুব ডেবায, নযা বাবা কেমন কবে ওকে ঠেকাতে পাবে দেখে নেবে।

ভযে ত্রাসে বাধু ওকে তখন কত ভাবে বোঝাতে চেষ্টা কবে ঠিক নেই। ত্রাসেব কাবণও আছে, ইদানীং ও বাইবে বাত কাটালেই ঠিক ঠিক যেন বুঝতে পাবে। এমন কবে তাকায তাব দিকে যে বাধুব বুকেব তলায কম্প শুরু হয। ও মনে মনে নাক কান মলে, আব কক্ষনো অমন কাজ কববে না—চুলোয যাক মুন্না।

আশ্চর্য, নযা বাবা আব সেই সঙ্গে বামাসাধিকা ওকে যেমন বশ কবেছে, তেমনি মুন্নাব প্রতি টানটাও কিছুতে যেন ছেঁডবাব নয। সেই অন্ধ তাডনা যখন ওকে পেযে বসে, তখন সব ভুল হযে যায। নেশাগ্রস্তেব মতই ও তখন না গিযে পাবে না। ওদিকে মুন্নাও তেডে আসে, ওকে তাডিযে দিতে চায। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাডিযে দেয না—ববং লোকটাকে দ্বিগুণ বশ কবাব নেশায সে-ও ভিতবে ভিতবে ঝলসে ওঠে।

দু'দিক থেকেই বাধুব নিগ্রহ বাডতে থাকে। বাবা ঠিক টেব পায। তাব ভ্রূকুটি আবো ভযাল হয। এক-একদিন এমন কবে তাকায যেন ভস্ম কবে ফেলবে ওকে। তখন আবাব মুন্নাকেই খুন কবতে ইচ্ছে যায বাধুব।

ব্যাপাবটা মা জেনে ফেলাব পব প্রথম দিনকতক খুব ভযে ভযে ছিল বাধু। কিন্তু বিপদ কিছু ঘটল না। তবু কিছুকাল নিজেকে সংযমেব শেকলে বেঁধে বাখল বাধু। বেশি যাতনা শুরু হলে ডবল মদ খেযে জ্বালা জুডোয।..আশ্চর্য এই নেশা কবলে নযা বাবা কিন্তু ভ্রুক্ষেপও কবে না।

...কিন্তু বাধু অসহায, একবাব প্রবৃত্তিব দাস হলে তাব বুঝি আব অব্যাহতি নেই। আবাবও গেছে মুন্নাব কাছে। অনেক দিন পবে গেছে। মুন্না ক্ষিপ্ত হযে উঠেছে আবাব কেঁদেও ভাসিযেছে। আগে আব কখনো কাঁদেনি মুন্না।

পবদিন নযা বাবাব সামনে আসতেই বাবা আঙ্গুলেব ইশাবায ওকে সামনে থেকে চলে যেতে হুকুম কবেছে। বামাসাধিকা তখন বাবাব সামনে বসে। সে-ও গম্ভীব। চোখে অন্ধকাব দেখতে দেখতে বাধু সবে এসেছে।

বিকেলে বাবাব সামনে মা-ই ওকে ডেকে পাঠালো। কাছে যেতে ধমকে উঠল, বলি কোথায মবে পডেছিলি সমস্ত দিন—কাঠ নেই, বলি এ-সব কি আমি বযে নিযে আসব।

বাধু পড়িমরি করে ছুটেছে সব সংগ্রহ করতে। কিন্তু আশ্চর্য, নিয়ে এসে দেখে কাঠ ধুনো সবই আছে—আর মায়েরও খুশি-খুশি মুখ।

সেই থেকে বাধু বুঝে নিয়েছে মায়ের অন্তত ওর ওপর রাগের লেশমাত্র নেই। আর পরে ক্রমশ এও অনুভব করেছে, ওকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে নয়া বাবার ঝগড়া-ঝাঁটিও হয় মাঝে মাঝে। ঝগড়ার হেতু যে মুন্না তাতে আর সন্দেহ কি।

.সেদিন রাতের শেষ যামে মুন্নার ডেরা থেকে ফিরে বাধু সকালে আর নয়া বাবার আসনের দিকে যায়নি। ভয়ে ভয়ে নিজের ডেরাতেই বসে আছে। এ-রকম আরো দুই একবার হয়েছে। পরে নয়া বাবার আর সে-রকম চাউনি দেখেনি। ওর ধারণা মা-ই নয়া বাবার মাথা ঠাণ্ডা করে ওর ফাড়া কাটিয়ে দেয়। কিন্তু এবারে আর তা হল না। একটু বেলা হতে মা এলো। গনগনে মুখ। ঝাঁঝিয়ে বলল, তোর নয়া বাবা যে এখান থেকে তাড়ারেই তোকে ঠিক করেছে সে খেয়াল আছে? এবারে যেখানে খুশি গিয়ে মর গে যা, আমি আর কিছুতে নেই।

সমস্ত পৃথিবীটা বুঝি বাধুর চোখের সামনে বনবন করে ঘুরে গেল। অন্ধকার দেখছে। মা ঝলমল পা ফেলে চলে যাচ্ছে।

বাধু ছুটে গিয়ে তার দুটো পা আঁকড়ে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

—ছাড়। ছাড় বলছি, পাজি হতচ্ছাড়া। চুলোয় যা, চুলোয় যা।

বাধু পা আঁকড়ে ধরে পড়েই রইল। নিশ্চল মুহূর্ত গোটাকতক।

—পা ছাড়। এই কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ আলাদা।

বাধু পা ছেড়ে উঠে বসল।

—যা, ঘরে যা। বিকেলে আসিস।

ছ'মাস কেটেছে তারপর। বাধুর সংযমে চিড় খায়নি আর। প্রবৃত্তির সেই অন্ধ আবেগের পাল্লায় পড়ার আগেই মদে ডুবেছে। বাবার বিরূপভাজন আর সে হবে না —তার আগে শরীরের ক্ষুধা টুঁটি টিপে শেষ করবে ও। ভিতরটা এখনো ছটফট করে এক একসময়। তখন সকলের ওপর রাগ হয়—নিজের ওপরে মুন্নার ওপরে, মায়ের ওপর, ওই নয়া বাবার ওপর—দুনিয়ার সকলের ওপর। মদে চুর হয়ে হয়ে ফাঁড়া কেটে যাবার পর মুখে হাসি ফোটে, নিজের ওপর আস্থা ফেরে।

.তারপর সেই এক ভয়াল রাত। প্রথম প্রহর হবে সেটা। মহাশ্মশান নিস্তব্ধ। নয়া বাবা কালীমন্দিরের সামনে বসে। অদূরে মা-ও বসে। তার হাত তিনেক দূরে বাধুও বসে ঝিমুচ্ছে।

হঠাৎ আঁতকে উঠল সে। ঠিক দেখছে কি স্বপ্ন দেখছে ভেবে না পেয়ে দু'চোখ রগড়ে নিল। যা দেখছে সত্যি, না বাধুর মাথা খারাপ হয়ে গেল? ফ্যালফ্যাল করে বাবার দিকে তাকালো, তারপর মায়ের দিকে। তারাও অবাক বিস্ময়ে একই দৃশ্য দেখছে।

কোমরে দু'হাত তুলে বাবার ঠিক দশ গজ দূরে মুন্না দাঁড়িয়ে আছে। দৃপ্ত উদ্ধত ফণা তুলে শত্রুকে দেখছে যেন সাপিনী। বাবাকেই দেখছে, বাবার দিকেই চেয়ে আছে, দু'চোখ জ্বলছে।

বাধু নির্বাক, বিমূঢ়। গলা কাঠ, জ্ঞান বিলুপ্ত যেন।

তেমনি জ্বলন্ত চোখে একবার সকলকেই দেখে নিল মুন্না। তারপর বাবার দিকে ফিরল আবার। হিসহিস করে বলল, তুমি এখানে এসেছ কেন? পাহাড়ে যাও, জঙ্গলে যাও। এখানে এসে মেয়ে মানুষের মরদ কেড়েছ—তোমার পুণ্যি হবে? তোমার পাপ লাগবে না?

ওরা তিনজন তেমনি নির্বাক, তেমনি নিশ্চল।

যেমন আচমকা এসেছিল তেমনি আচমকা অন্ধকারে মিশে গেল মুন্না। একটা অদ্ভুত মোহ ভেঙে সজাগ হল যেন বাধু ভূঙ্গী।

থমথমে মুখে নয়া বাবা উঠে নিজের কুটীরের দিকে চলে গেল।

মায়ের মুখভাব এখন শান্ত, নির্লিপ্ত।

বাধু উঠল। ক্লান্ত শরীরটা টেনে হিঁচড়ে ডেরার দিকে নিয়ে চলল। ঘরের কাছাকাছি এসে হুঁশ ফিরল আবার। ঘরে কুপী জ্বলছে।...আশ্চর্য, এ-রকম ভুল ওর বড় একটা হয় না। কুপী জ্বেলেই চলে গেছল।

ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্নায়ু লণ্ডভণ্ড করে দেবার মতই বিষম চমক আবার। সামনে মুন্না দাঁড়িয়ে। দু'হাত কোমরে তেমনি। কিন্তু হাসছে এখন। ওর চোখ হাসছে, মুখ হাসছে, সর্ব অঙ্গে হাসির বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে যেন। হাসির দমকে ওর ভরা বুক ফুলেফুলে উঠছে, সাদা দাঁত ঝকমক করছে।

..বাধু কি ওই অমোঘ ইচ্ছার সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে না হাতের কাছে কিছু একটা ধরে ভেসে ওঠার শেষ চেষ্টা করছে? হাতে ঠেকল কিছু। শেয়াল আর শুয়োর তাড়ানোর ডাণ্ডা।

তারপর কি হলো বাধু জানে না।

তীব্র তীক্ষ্ণ সত্তা থেঁতলানো আর্তনাদে শ্মশানের স্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে বাতাসের বক্ষে বক্ষে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল—ছুটন্ত আর্তনাদ—নাড়ি-ছেঁড়া আর্তনাদ করতে করতে মরণ-ছোটা ছুটছে।

স্থাণুর মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল বাধু জানে না। ঘরে এসে আবার কে দাড়াল। বামাসাধিকা। ঘোলাটে চোখে বাধু তাকালো তার দিকে।

সামনের লোহার ডাণ্ডাটা দেখল বামাসাধিকা। শিউরে উঠল একবার। এভাবে মারলি? এ-ভাবে মেরে শেষ করলি?

ঘোলাটে চোখে বাধু চেয়েই আছে।

কিন্তু কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে আবার একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল যেন বাধু। ...মায়ের এ-কি চোখ, এ-কি মুখ? সমস্ত মুখ দিয়ে আগুন ছুটছে, দু'টো চোখ যেন জ্বলন্ত কয়লা। শুধু মুখ নয়—মায়ের সমস্ত দেহখানাই যেন ধকধক করে জ্বলছে।

...ভেবেছিলাম ক্ষমা করেছি, ক্ষমা করব...ক্ষমা করিনি...ক্ষমা করব না।

খুব অস্ফুট স্বরে যেন টুকরো টুকরো আগুন ছড়াতে ছড়াতে বামাসাধিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিক্ষণ বাদে আচ্ছন্নের মতো বাধুও বেরুলো। আধারে পা ফেলে পর্ণ কুটিরের দিকে এগলো।

...দূরে বামাসাধিকা চলেছে। কিন্তু নিজের কুটিরে ঢুকল না। এগিয়ে গেল। অশ্বত্থ গাছটা ছাড়িয়ে নয়া বাবার কুটিরের দিকে চলল। বাধু দেখছে, নয়া বাবার ঘরের সামনে বামাসাধিকা দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর খুব ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে গেল।

সময় কেটে যাচ্ছে। অন্ধকারে বাধুর দু'চোখ ঘোরালো ধারালো কঠিন হয়ে উঠছে। শেষের প্রহরের শেয়াল ডেকে উঠল। বাধু তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে। দৃষ্টিশলাকা কুটিরের গায়ে বিঁধে আছে। পুবের আকাশের কালি-গোলা অন্ধকার তরল হয়ে আসছে।

বাধু ভৃঙ্গী নিজের ডেরার দিকে ফিরল।

বেশ বেলাতেই বেরুলো আবার। আসনের থানে লোক আসতে শুরু করেছে। কিন্তু সেখানে নয়া বাবাও নেই, বামাসাধিকাও নেই। তাদের দু'জনেরই কুটিরের দরজা বন্ধ।

অনেক বেলা পর্যন্ত, প্রায় বিকেল পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে একের পর এক ভক্ত বিদায় করল বাধু ভৃঙ্গী।. .বাবার দেখা আজ আর মিলবে না, তার দেহ অসুস্থ...ঘরের মধ্যেই ধ্যানে বসে আছে হয়তো।

শুধু নয়া বাবা নয়,বামাসাধিকারও দেখা পায়নি কেউ।

সব বিদায় হতে বাধু নিজের ডেরার দিকে তিরিশ চল্লিশ গজ এগিয়ে গেল। কিন্তু কি মনে হতে আর এগলো না। সেখানেই বসে পড়ল।

...আজ অমাবস্যা। আসন খালি থাকার কথা নয়।

সন্ধ্যা পেরুলো। রাত হল। রাত বাড়তে থাকল। পাথরের মূর্তির মতো বাধু ভৃঙ্গী বসে আছে।

হঠাৎ সচকিত। চোখে শাণিত দৃষ্টি। সহস্রমুণ্ডীর আসনের দিকে নয়া বাবা এগিয়ে আসছে। এগিয়ে গেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল একটু। বাধু দেখতে পাচ্ছে, কারণ অন্ধকারে তার চোখ সয়ে গেছে।

নয়া বাবা ধুনী জ্বালল। কাঠ জ্বালল। ধুনী আর জ্বলন্তকাঠ হাতে আসন প্রদক্ষিণ করল।

তারপর আসনে বসল। সামনে ধুনী জ্বলছে। কাঠ জ্বলছে।

—জ্বলে গেলাম। পুড়ে গেলাম। মরে গেলাম।

বাধু ভৃঙ্গী ছিটকে উঠে দাঁড়াল। ওই আর্তনাদ কানে যেন গলিত শিসা ঢেলে দিয়েছে। নয়া বাবা আর্তনাদ করে উঠে আসন থেকে লাফিয়ে নেমে এলো।

—জ্বলে গেলাম। পুড়ে গেলাম। মরে গেলাম।

মহাশ্মশানের স্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে আজ আবার মরণছোটা ছুটছে নয়া বাবা। আর্তনাদ দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। দূর থেকে দূরে। আরো দূরে, আরো দূরে।

সস্মিত ফিবতে বাধু ভৃঙ্গী ঘুবে তাকালো। নযা বাবাব কুটিবেব দিকে নয, অশ্বত্থ গাছেব এধাবেব কুটিবেব দিকে। অন্ধকাবে চোখ দেখা গেল না, মুখ দেখা গেল না, কিন্তু সাদা বসনে আবৃত নাবী মূর্তি স্পষ্ট দেখা গেল।

দাওযায স্থিব নিশ্চল দাঁড়িযে আছে বামাসাধিকা।

উৎকট বকমেব হাসি পেযেছে বাধু ভৃঙ্গীব। কিন্তু সর্বাঙ্গ জ্বলছেও। হাসতে পাবেনি।

পবদিন খুব ভোবে উঠে এসেছে আবাব। নযা বাবাব কুটিবেব দবজা খোলাই থাকবে জানে, কিন্তু বামাসাধিকাব ঘবেব দবজাও খোলা। ঘবেব পাশ কাটিযে এগিযে যেতেই সোজা মাথাব ওপবেই যেন মুগুবেব ঘা পডল একটা।

...অশ্বত্থ গাছে একটা দেহ ঝুলছে, এক নাবীদেহ ঝুলছে অশ্বত্থেব ঝুবিতে।

বামাসাধিকাব আগুনপানা দেহ ঝুলছে।

তাবপব বাধু ভৃঙ্গীব অট্টহাসিতে ভোবেব শ্মশান মুখবিত হযে উঠেছে। সেই হাসি বিকেলেও শোনা গেছে।

ফিবে চলেছি। সঙ্গে বাধু ভৃঙ্গীও আছে। আমাকে এগিযে দিচ্ছে। মুখে কিছু না বললেও ও বুঝেছে আব হযতো আসব না।

অশ্বত্থ গাছটা ছাডিযে মন্দিবেব পাশ কাটিযে সহস্রমুণ্ডীব আসনেব সামনে দাঁডালাম একটু। এখন আব সেই সকৌতুক চিন্তাটা মনে এলো না যে, ওই আসনটায গিযে বসলে কি হয। ফিবে একবাব বাধুব দিকে তাকালাম। মনে হল ও চোখ দুটোও আসনটাব মতই শূন্য।

পবদিনই ফেবাব জন্য প্রস্তুত আমি। বাব কযেক বলাব পব শ্রী মুখোপাধ্যায আটকালেন না। তাঁকে প্রণাম কবে বিকশয উঠলাম।

মন এখন শুধু ঘবমুখো। চলেছি।

...এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভিতবটা আচ্ছন্ন। এই যুগেব অভিশাপ হঠাৎ যেন বড কাছ থেকে দেখে উঠলাম...সর্বত্র আসন খালি পডে আছে, আব সকলে সেই আসনেব মানুষ খুঁজছে, শূন্যতাব প্রতিকাব খুঁজে বেডাচ্ছে।

সর্বত্র শূন্য আসনেব হাহাকাব বাজছে।

— অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত —